"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

ফাল্গুন :: ৬ষ্ঠ বর্ষ :: ১২শ সংখ্যা

চিত্রজগতের প্রখ্যাত শিল্পী কুন্দনলাল সায়গল

মহাকালের হিম-স্পর্শে মাধুর্যময় কণ্ঠ চির-রুদ্ধ

'গত আঠারই জানুয়ারী শনিবার, ১৯৪৭, জলন্ধরে স্বীয় বাসভবনে জনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী কুন্দনলাল সায়গল মারা যান।' সংবাদপত্রের ভীড় ঠেলে এই ছোট্ট একটী সংবাদ সমস্ত ভারতের চিত্রামোদীদের অন্তরকে আলোড়িত করে তোলে। যে সমাজের চোখে সায়গল এবং তাঁর সম-ধর্মীরা উচ্ছৃঙ্খল এবং ভ্রষ্ট ছাড়া অন্য রূপে পরিচিত নন—সেই সমাজ ধুরন্ধরদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় এর চেয়ে বেশী সংবাদ আশা করা চিত্রামোদীদের আস্পর্ধাই বলতে হবে। তাই ঐ ছোট্ট সংবাদটী ছাড়া তাঁরা আর কিছুই আশা করেন নি—দৈনিকের বিভিন্ন সংবাদ-ভিড়ের ভিতর থেকে ঐ ছোট্ট সংবাদটিই তাঁদের কাছে বিরাট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের শক্তি অপরিসীম। সামান্য একটু ছোঁয়াতে মানুষকে অসাড় করে তোলে। বিদ্যুতস্পর্শের মতই ঐ ছোট্ট সংবাদটী সমস্ত দর্শকমনকে যে অসাড় করে তুলেছিল—একথা উল্লেখ না করলেও চলবে। কিন্তু সায়গলের মৃত্যুর শোক শুধু যে চিত্রামোদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়—আশা করি সে কথা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। জাতীয় জাগরণের সংগে সংগে সায়গল এবং তাঁর সম-ধর্মীদের 'প্রতিভা' জাগ্রত জাতি যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নেবে—সেও আমরা জানি। সায়গলের মৃত্যু—আজ তাঁর অনুরাগীদের মনেই সবচেয়ে বেশী বেজেছে, একথা সত্য। যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন—যাঁরা তাঁর সুললিত কণ্ঠ-মাধুর্যের অমিয়ধারায় অভিভূত হ'য়েছেন—সমস্ত ভারতবর্ষে সায়গলের সেই গুণগ্রাহী চিত্রামোদীরা তাঁর মৃত্যুতে একজন আপন জনের বিয়োগ ব্যথায়ই অনুভব করেছেন। জাতির সৌভাগ্যাকাশে প্রতিভা সব সময় আত্মপ্রকাশ করে না। যখন আসে, পরম সৌভাগ্যই বলতে হ'বে। এই পরম সৌভাগ্যকে যদি জাতি মেনে নিতে না পারে, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কাকে বলবো। 'সংগীতে—কণ্ঠে ও সুর-মাধুর্যে যে প্রতিভা নিয়ে সায়গল আমাদের মাঝে এসেছিলেন—

এই সংখ্যার মুদ্রণ-পৃষ্ঠার [illegible] হয়েছে।

সেকথা যখন মনে হয়, তাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কথা কী ক'রে ভুলে যাই! তাই, আজ তাঁর মৃত্যুর ক্ষতি শুধু চিত্রামোদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়—এ ক্ষতি সমস্ত দেশের। দেশের কৃষ্টি ও কলা-জগতের।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল, কুন্দনলাল সায়গল জম্মু'তে একটী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সায়গল যখন স্কুলের ছাত্র, তাঁর পিতা সায়গলের দাদার সংগীতে বুৎপত্তি রয়েছে জেনে—তাকে সংগীত-শিক্ষা দেবার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। সংগীত জন্মের প্রথম দিবস থেকেই বালক সায়গলকে পেয়ে বসেছিল। বালক সায়গলের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন সংগীতের সুর বেজে উঠতো। সকলের অলক্ষে—তাঁর দাদার শিক্ষাই যেন সায়গলের মাঝে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সায়গলের ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারা যায়—তাঁর বাল্য অথবা ছাত্র-জীবন খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ছাত্র-জীবনের কোন চমকেই তিনি কাউকে ভুলাতে পারেন নি। তাই পড়াশুনা পরিত্যাগ করে জীবিকার্জনের জন্য তাঁকে কেরাণীগিরির জোয়াল ঘাড়ে নিতে হয়। 'নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে'র একটী কেরাণীর পদে তিনি বহাল হন। এর কয়েক বছর পরে তাঁকে টাইপিষ্টের কাজ করতে দেখা যায়—কখনও বা সেলস্‌ম্যান, কখনও হোটেল-ম্যানেজার রূপেও সায়গলকে আমরা দেখতে পাই।

চিত্র-জগতে প্রবেশ পথে তিনি সর্বপ্রথম বাংলার-গৌরব নিউথিয়েটার্স লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম দর্শনেই সায়গলের প্রতি শ্রীযুক্ত সরকার আকৃষ্ট হন। সায়গলের প্রতিভা শ্রীযুক্ত সরকারের অভিজ্ঞ-দৃষ্টির সামনে যেন সম্ভাবনার নিশ্চিত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। নইলে ইতিপূর্বে বোম্বাইর জনৈক প্রযোজকের দোর গোড়ায় ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়েই সায়গলকে ফিরে আসতে হয়। এমন কী, সায়গলের অপূর্ব কণ্ঠও তাঁকে মুগ্ধ করতে অসমর্থ হয়।

সায়গলের প্রথম চিত্র 'জিন্দালাস'। হিন্দি চণ্ডীদাসেও সায়গল দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু দেবদাসে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। দেবদাসের হিন্দি এবং বাংলা উভয় সংস্করণই সায়গলকে প্রভূত খ্যাতি এনে দেয়। এরপর নিউ থিয়েটার্সের পর পর অনেকগুলি হিন্দি এবং বাংলা চিত্রে সায়গলকে আমরা দেখতে পাই।

দেশের মাটী (হিন্দি ও বাংলা), দিদি (হিন্দি ও বাংলা), জীবন-মরণ (হিন্দি ও বাংলা), সাথী (হিন্দি ও বাংলা), ডাকু মনসুর (হিন্দি), করওবান-ই-হায়াৎ (হিন্দি), পরিচয় (হিন্দি ও বাংলা), ক্রোড়পতি (হিন্দি), মাই সিষ্টার (হিন্দি), জিন্দগী (হিন্দি)—প্রভৃতি নিউ থিয়েটার্সের চিত্রগুলিতে সায়গল তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যে ভারতের অগণিত দর্শক সাধারণকে বিমুগ্ধ করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে রণজিৎ মুভিটোন, কারদার প্রডাকসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি হিন্দি চিত্রে সায়গলকে অভিনয় করতে দেখি—এর ভিতর ভক্ত সুরদাস, তানসেন, সাজাহান, তদবীর, ওমর খৈয়াম, ভাউনরা (Bhaunra) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সায়গলের শেষ চিত্র 'পরওয়ানা'—চিত্রখানি এখনও মুক্তিলাভ করে নি।

ভারতের যতগুলি মঞ্চ ও পর্দা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা রয়েছে, সকলেই সায়গলের মৃত্যু সংবাদ গভীর বেদনার সংগে ঘোষণা করেছেন। সায়গলের অগণিত অনুরাগী, চিত্রামোদী ও বন্ধুদের বেদনার অংশীদার রূপে রূপ-মঞ্চ মারফৎ আমরা বাংলার দর্শক-সমাজের তরফ থেকে আমাদের আন্তরিক মর্ম বেদনার সংগে সেই প্রতিভাবান শিল্পীর আত্মার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সায়গল প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। তিনি তাঁর শিল্পের মাঝেই আমাদের কাছে অমর হ'য়ে থাকবেন। তাঁর রেকর্ড সংগীতগুলি জাতীয় সম্পদরূপে ভবিষ্যৎ জন-সমাজের কাছে আদৃত হবে—আমাদের চিত্র-জগতে সায়গলের মত শিল্পীরও যে আবির্ভাব হ'য়েছিল, সেকথা মনে করেও তখন তাঁরা হয়ত গর্ব অনুভব করবেন। সায়গলের প্রতিভাকে ছাড়িয়ে যাবার স্পর্ধা নিয়ে যদি নূতন কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয়—আজকের বেদনা কেবলমাত্র সেদিনকার সেই শুভদিনেই মুছে যেতে পারে—শিল্পীর অমর আত্মাও আমাদের সে সৌভাগ্যে তৃপ্তির নিঃশ্বাসই ছাড়বে।

সায়গলের অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক। —শ্রীকাঃ

সায়গল স্মরণে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার (কাল-বৈশাখী)

১৯শে জানুয়ারী রবিবার।—প্রত্যেক রবিবারের মত সেদিনও সকালে উঠে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর বাসায় গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, চির-আত্মভোলা এই সুলালদা'র মুখটা আজ অন্য দিনের মত হাসিতে ভরা নেই—সারা মুখে একটা বিষাদের দাগ। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গত কাল আবার একটা শিল্পীকে হারাতে হ'লো।" শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল—ভাবলাম গত কয়েক বছর থেকে কি মঞ্চ ও নাট্য জগতে হঠাৎ মড়কের শুরু হয়েছে? এক-জনের পর একজনকে শুধু হারাতেই হচ্ছে—কিন্তু শূন্যস্থান আর পূরণ হচ্ছে না। যাক্, জিজ্ঞাসা করলাম—"কাকে আবার হারাতে হ'লো?" উত্তর এ'লো,—"কুন্দনলাল।" আচ্‌কে গেলাম—বিখ্যাত গায়ক ও চিত্রাভিনেতা—আধুনিক কালের 'তানসেন'—কুন্দনলাল সায়গল এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! কথাটা শুনে অবশ্য বিশ্বাস করতে পারিনি—যেমন পারিনি অজয় ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস, রতীন, শৈলেন, হিমাংশু দত্ত প্রভৃতির হারাণো সংবাদ। কেমন করেই বা পারি? যাঁদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই পাবার আশা থাকে—যাঁদের ব্যবহার ও প্রতিভা আমাদের মুগ্ধ করে—তিনি শিল্পীই হউন বা অন্য যে কেউই হউন, তাঁদের আমরা চিরদিন আমাদের মাঝেই বেঁধে রাখতে চাই। কিন্তু তাঁদেরই হয় আগে হারাতে—এই যেন প্রকৃতির নিয়ম!

তারপর ১৬ই ফেব্রুয়ারী।—"দীপক" সিনেমায় ৺শৈলেন চৌধুরী, ৺অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতি তর্পণের সাথে সাথে সেদিন সায়গলেরও স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন ক'রে-ছিলেন আর্টিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন। শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে আমিও আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির হ'য়েছিলাম সেই স্মৃতি-সভায় একজন দর্শকরূপে।.........

সভায় পৌরহিত্য করেছিলেন—নাট্য-জগতের ঋষী মনোরঞ্জন। যখন সকলে তাঁকে সভাপতির আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি মাত্র কয়টি কথা বলে-ছিলেন,—"প্রাচীণেরাই চিরদিন আগে চলে যায়—আর নবীনেরা করে তাঁদের স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন—এইটেই ছিল সনাতন রীতি। কিন্তু আজ সব কিছুরই পরিবর্তন হ'য়েছে। তাই বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ প্রবীণ হ'য়েও আমাকে নবীনের শোক-সভায় পৌরহিত্য করতে হ'চ্ছে।—যাঁরা আমাদের শোক-সভা করবে বলেই চিরদিন মনে প্রাণে আশা ক'রেছিলাম—তাঁদের শোক-সভায় উপস্থিত থাকা যে কত বেদনাদায়ক—সে শুধু বুঝতে পারবেন আমাদের মত প্রবীণেরা।" যখন তিনি এই কথাগুলি বললেন, তখন তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে—স্বর হ'য়ে গেছে ভারী—সেই সাথে উপস্থিত সকলেরও।......

সেদিনের সভায় কবি শৈলেন রায় যে কথাকটি বলে-ছিলেন—আজ আমিও সেই কথা বল্‌ব—সেদিনের সভায় অনুপস্থিত শিল্পীদের ও অনুষ্ঠাতা আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে—"আমরা যখন কারো স্মৃতি-সভায় গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি—তখন আমরা শুধু তাঁর প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করি না—সেই সাথে নিজেদের প্রতিও করি এবং নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি বলেই—তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাতে পারি।" তাই এই সংগে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানাই—যখনই তাঁরা কোন শিল্পীর স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন করবেন—তখন যেন সেই অনুষ্ঠান থেকে দর্শকদের দূরে সরিয়ে না রাখেন। কারণ, যখন আমরা কোন শিল্পীর স্মৃতি-সভায় যাই—তখন তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলেই যাই—বাজে কাজে নয়। সুতরাং সেখানে শিল্পী ও দর্শকের মাঝে প্রভেদ রাখা মোটেই উচিত নয়। সেখানে সকলের সবচেয়ে বড় পরিচয়—পরলোকগতের অন্যতম অনুরাগী। আর সেই সব শিল্পীদের—যাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনুরূপ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন—সকল সময় কবি শৈলেন রায়ের কথা স্মরণ করতে বলি—এইজন্য যে, তাঁদের প্রতিও একদিন না একদিন অনুরূপ ব্যবহার হ'তে পারে।

গায়ক সায়গলের প্রতি আমার অনুরাগ সম্বন্ধে বলতে

গেলে বলতে হয়—যখনই কোন যায়গায় সায়গলের কোন গান শুনেছি—তখনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তাঁর সেই গানের মধ্যে। শুধু আমিই নই—তাঁর প্রতিটি অনুরাগীই। এমনই ছিল তাঁর গানের আকর্ষণ-শক্তি। সায়গল এমন দরদ দিয়ে গান গাইতেন যে, গান শুনলে—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত—সকলেই সেই গানের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। এমন কি অতি পাষাণের মনও গলে যেত তাঁর গানে। এ আমার অতিশয়োক্তি নয়, যাঁরাই তাঁর গান শুনেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন—এই গায়ক সম্বন্ধে আমার মন্তব্য সত্য কিনা। আজও যেন কানে বাজছে তাঁর প্রতিটি গান। তার মধ্যে তাঁর সেই বিনীত আবেদন—

"আমারে ভুলিয়া যেও,
মনে রেখো মোর গান,—"

শিল্পী! তোমার এই আবেদন নিশ্চয়ই সার্থক হবে—নিশ্চয়ই তোমার গানকে মনে রাখবে, তবে তোমাকে ভুলে নয়—তোমার গানের সাথে তোমাকেও চিরদিন মনে রাখবেন—তোমার প্রতিটি অনুরাগী। তুমি চিরদিন তাঁদের হৃদয়ে অমর হ'য়ে থাকবে—তোমার গানের মাঝে। যতদিন তোমার গান থাকবে-ততদিন তুমিও থাকবে—কেউই তোমাকে ভুলতে পারবে না—তুমি চির অমর।

আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে রূপ-মঞ্চের বিশেষ আমন্ত্রণ—দিল্লীতে আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কথা রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই শুনে থাকবেন। এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যদেশগুলি পরস্পরের কৃষ্টি, সভ্যতা ও রাজনৈতিক মতবাদের মধ্য দিয়ে পরস্পরের যাতে ঘনিষ্ট বন্ধু হ'য়ে নিজেদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তথা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ সাধন করতে পারেন—এই সম্মেলনের তাই হ'লো মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সম্মেলন উপলক্ষে এশিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছেন। পত্র-পত্রিকার এই প্রদর্শনীর নাম হ'য়েছে 'এশিয়ান নিউজ ফেয়ার।' মঞ্চ ও পর্দার জাতীয়তাবাদী পত্রিকা রূপে এই প্রদর্শনীতে রূপ-মঞ্চেরও বিশেষ আমন্ত্রণ এসেছে। এই সংবাদটী রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীকে যে খুশী করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা উদ্যোক্তাদের এই আমন্ত্রণ, পরম শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছি। এবং উক্ত প্রদর্শনীতে রূপ-মঞ্চের কয়েকটী বিশিষ্ট সংখ্যা পাঠানো হ'য়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মাঝে রূপ-মঞ্চ বিতরণের জন্য রূপ-মঞ্চের কতগুলি সংখ্যা বেশী করে পাঠানো হ'য়েছে—কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চের পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করবার জন্য স্বীকৃত হ'য়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশেই আবদ্ধ করেছেন। আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে, রূপ-মঞ্চকে বিশেষভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে রূপ মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। ২০শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ অবধি প্রদর্শনীর কাজ চলার কথা।

দি ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ ঘোষ বিরচিত 'ছন্দ পতন' নাটকের শুভ মহরৎ আচার্য মন্মথ মোহন বসুর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। নাটকখানি পরিচালনা করছেন জীবন গোস্বামী। সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন জীবন গোস্বামী, গোপাল চট্টো, অরুণ রক্ষিত, নন্দ মান্না, অমূল্য বসু, ভানু চট্টো, শিবদাস, রাধা মল্লিক, কার্তিক, শান্তি, ভানু, হেরম্বদা, ধরনী, উমাদত্ত, সনৎ চট্টো ও সুশীল দেব। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে মুক্তি প্রতীক্ষায়।

রূপ-মঞ্চ ও খেয়া—

রূপ-মঞ্চ ও খেয়াকে নিয়ে পরস্পরের ভিতর যে অপ্রীতিকর বাদানুবাদ চলছিল—গত ১৯শে মার্চ 'খেয়ার' তরফ থেকে শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী আমাদের কার্যালয়ে এসে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের সংগে আলাপ-আলোচনায় তা মিটমাট করে গেছেন। উভয়ের আলোচনা খুব হৃদ্যতা পূর্ণ ভাবেই হয়। উভয়ের মনে যে ভুল গড়ে উঠেছিল—খোলাখুলি ভাবে পরস্পরের আলোচনায় তা দূর হয়। আশা করি কোন কৌতূহলী পাঠক এ নিয়ে আর কোন বাদানুবাদের ভিতর যাবেন না।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'পরভৃতিকা' চিত্রে
সরযূবালা, অমিতা, নীলিমা ও শিবশঙ্কর। রূপ-মঞ্চ : মাঘ-ফাল্গুন : সংখ্যা : ১৩৫৩

উপরে -

রূপাঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণী চিত্র 'অলকনন্দা'র একটি দৃশ্যে: ডাঃ হরেন, ইন্দু মুখার্জি ও তুলসী চক্রবর্তী। চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে।

●

রূপ-মঞ্চ ১৩৫৩

— **নীচে**

রতন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'অলকনন্দা' চিত্রে জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা আশু বোস। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন সরোজ মুখোপাধ্যায়।

●

রূপ-মঞ্চ ১৩৫৩

(৩)

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

হলধরের বাড়ীর তিন পোতায় তিনখানা ঘর। পশ্চিম পোতায় দুইচাল শোনের ঘরখানিতে রান্না ও খাওয়া-দাওয়া হয়। দক্ষিণ পোতায় টিনের ছাপরা—সামনের দিকে বারান্দা। হলধরের ছেলেরা থাকে এই ঘরে। উত্তর পোতায় চারচালা বড় শোনের ঘর—সামনে ও পশ্চিম দিকে বারান্দা। পশ্চিম দিকের বারান্দাটা ঘিরে একটা ঢেকী পাতা হ'য়েছে। সামনের বারান্দাটা প্রায় উঠোনের সংগে মিশ-খেয়ে গেছে। এই বারান্দাটায় হলধরদের আড্ডা বসে। পারিবারিক আড্ডা। আত্মীয়-স্বজন, ইষ্টি-কুটুম বা পাড়া-প্রতিবেশী এলেও এখানেই আড্ডা বসে—গল্প-গুজব চলে। তাছাড়া জাল-বাওয়ার কাজে যখন অবসর থাকে—হলধরেরা এই দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করে আর জাল বুনতে থাকে। বাঁশের খুঁটিগুলিতে কোনটায় না কোনটায়—অর্ধ সমাপ্ত—কী কেবল আরম্ভ করা হ'য়েছে এরকম একটা না একটা নতুন জাল বাঁধা থাকেই। বারান্দাটার পশ্চিম দিকে অর্ধেকটা ঘিরে একটা মাঁচা। তার ভিতর জাল বুনবার এবং জাল-বাওয়ার সাজ-সরঞ্জাম। সদ্য কেনা কতকগুলি ফাঁদির সুতো রয়েছে—মাছ জিইয়ে রাখবার একটা প্রকাণ্ড খাঁচাও পড়ে রয়েছে—আরও কত কী। নীচে একধারে একটা সুতো জড়বার চরখী। এই চরখীতে প্রয়োজন মত দু'তিনটে ফাঁদি-সুতোর নালি এক সংগে জড়িয়ে নিয়ে জেলে-বৌ জাল বুনবার জন্য পাকিয়ে রাখে। সুতো জড়ানো আর সুতো পাকানোর কাজ জেলেবৌ-রই একচেটিয়া। আগুনের মালসাও রয়েছে একপাশে। মালসাটাকে ঘিরে নারকেলের 'ছোবা'—তামাকের ডিবে—দু'তিনটে কল্‌কেও সাজান রয়েছে। মালসাটার পাশেই হোগলার বেড়ায় ফাক ফাক হ'য়ে দু'তিনটে হুকো ঝুলছে। কোনটা হয়ত হলধরদের নিজেদের—বামুন-কায়েত উঁচু জাতদের যখন পায়ের ধুলো পড়ে, কোন কোনটা তাঁদেরও জন্য অপেক্ষায় থাকে। হলধরদের থেকে নীচু জাতের যদি কেউ আসে—তাদের আর হুকোর প্রয়োজন হয় না। কলকেটাই হাতে নিয়ে তারা দু'তিন টান মেরে নেয়।

জাল বুনবার সময় গল্পও চলে—তামাকও চলে। হলধরের ছেলেরা এবং জেলেবৌ ফাঁকে ফাঁকে তামাক সাজে। জেলে-বৌ তামাক সেজে দু'টান দিয়ে কলকেটা ধরিয়ে হলধরকে এগিয়ে দেয়। হলধর 'পেসাদ' করে ছেলেদের দিকে বাড়িয়ে ধরে হুকোটা। বাড়ীতে যে কয়জন সভ্য, প্রত্যেকেরই জাল বুনোনেতে হাত পাকাতে হয়। বাঁশের খুঁটিগুলিতে সকলেরই জাল বাঁধা রয়েছে। বাপ-ভাইদের আসতে আরো কিছুটা দেরী হবে—অথচ বাড়ী ছেড়েও এখন যেতে পারবে না—রাই তার আরম্ভ করা জালটাই বুনতে বসে যায়। জাল বুনতে রাই তত্তটা ওস্তাদ নয়। জেলের মেয়ে জন্মগত অধিকার এবং অভ্যাসে যেটুকু পারে, তাতে অপরের কাছে বাহবা পেলেও—হলধরদের কাছে সে আনাড়ীই। হলধর রাইকে বড় জাল বুনতে দেয় না। ভাইদের জন্য ছোট ছোট টাইকা-জাল আর খ্যাপলা-জালই সে বেশী বোনে।

জাল বুনতে বুনতে রাই-র দৃষ্টি যেয়ে পড়ে দূরে—ওদের বাড়ীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ ঘেসে যে ঝাকড়া গাব-গাছটা বেড়ে উঠেছে তারই মাথার 'পরে। গাছটার মাথার ওপরে বেশ কয়েকটা গাব পেকে হল্‌দে হ'য়ে আছে। জাল-বোনা রেখে বাঁশের কোটাটা নিয়ে রাই তাড়াতাড়ি 'গাব' পাড়তে যায়।

রাই-র কোটার গণ্ডির ভিতর আর গাবগুলি ধরা দেয় না। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রাই আবার চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু গাবগুলি তখনও তার কোটার নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একটা গাবও রাই পাড়তে পারে না। দেবুর কথা রাই-র মনের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। বৃথা চেষ্টা থেকে রাই বিরত হয়।

হ্যাঁ—ঠিকই হ'য়েছে, দেবুদা স্কুল থেকে ফিরে নিক—এলেই দেবুদাকে খবর দিয়ে আনবে—দেবুদার কাছে অতটা দূরত্ব দূরই নয়। রাই আবার জাল বুনতে বসে যায়।

গাব গাছটার এক পাশে বেতের ঝাড় আর এক পাশে

বাঁশের ঝাড়। এই গাব, বেত আর বাঁশ গাছ শুধু রাইদের বাড়ীরই নয়—প্রতি জেলেবাড়ীর যেন এক একটী অপরিহার্য অংগ। নূতন জাল বুনে গাবের রসে তাকে ভিজিয়ে মাজাই করে নিতে হয়। মাছের ডালি, খাঁচা এবং জেলেডিঙ্গির পাটাতন থেকে আরম্ভ করে জাল বুনবার চরখী-টেকো-মাকু সব তাতেই জেলেদের বাঁশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাঁশকে বাঁধবার জন্য বেতের শক্তিমত্তাকে কে অস্বীকার করবে! গাব গাছ, বেত আর বাঁশঝাড়ের জন্যই হলধরের বাড়ী থেকে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের ভীড় ছাড়ে না। বুড়ি পিসীমা-ঠাকুমার দল গাবগাছ ভরে যখন কচি লালচে রংএর পাতা গজিয়ে ওঠে, তখনই একবার করে পাতা নেবার জন্য নাতী-পুতিদের পাঠিয়ে থাকেন। গাবের পাতার ঘণ্টোর জন্য তাদের বুড়ো জীবগুলিও কচি গাবের পাতার মত লকলকিয়ে ওঠে। গাবগাছগুলি ভেঙ্গে যখন টোবা-টোবা ফুল আসে—গাছের মাথার পর দিয়ে যেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির দল মধুর নেশায় মাতাল হ'য়ে গুণ গুণ করে গান করতে থাকে—ঠিক তখনই গাছের নিচে ছেলেমেয়েদেরও গুণগুণানী আরম্ভ হয়। গাব-ফুলের বোটা শক্ত হ'লে কী হয়, তার গোড়ার মধু যখন ফুরিয়ে আসে, অসহায় শিশুর মত মাটির বুকে ফুলগুলি লুটিয়ে পড়ে। ভীড়-করা ছেলে মেয়ের দল কোঁচড় ভরতি করে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাঁথে। ফুল ঝরে ফল আসে, গাছের নীচেকার এবং উপরকার ভীড়ও কমতে থাকে। কাঁচা গাব দিয়ে ঘুড়ির আঠা তৈরী করবার জন্য বড় জোর দু'চারজন এসে ভীড় করে নীচে। এই কাঁচা গাবগুলি যখন রসে টুবু টুবু হ'য়ে ওঠে—হলধরের ছেলেরা সেগুলি পেড়ে জড়ো করে। যেগুলি গাছে রয়ে যায়—পাড়ার ছেলেমেয়েদের অপেক্ষায় তারা দিন গোনে। দিনে-দিনে রোদে পুড়ে পুড়ে ওরা পেকে ওঠে—দলে দলে ছেলে-মেয়েরা এসে, ভীড় করে দাঁড়ায়। ভীড়ের সংগে সংগে জেলেবৌর গলাও চড়ে ওঠে। প্রথম প্রথম বিনা ছাড়-পত্রেই সকলে আসতে পারে। কিন্তু যেই দু'একদিন বাদে দেখা যায়, কার যেন অবাধ্য চঞ্চল পদক্ষেপে জেলে-বৌর শশার চারাটী নিষ্পেষিত হ'য়েছে—কঞ্চির প্রয়োজনে

জেলেবৌর লাউ-মাঁচায় হাত পড়ে লাউগাছটা নেতিয়ে পড়েছে, তখন আর বিনা ছাড়পত্রে গাবতলায় কারোর যাবার উপায় থাকে না। জেলেবৌ'র অসাক্ষাতে যদি কেউ একবার চুপি চুপি বেয়ে গাছের উপর উঠেছে—জেলেবৌ'র উপস্থিতিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাব গাছের পাতা দিয়ে আড়াল করা ঝুপটার ভিতরই হয়ত তাকে কাটিয়ে দিতে হ'য়েছে। দেবুর ছাড়পত্র স্থায়ী ভাবেই থাকতো। শুধু রাই বা হলধরের কাছেই নয়, দেবু জেলেবৌর কাছ থেকেও প্রশ্রয় পেত বেশী। জেলেবৌ তার ছেলেমেয়েদের চেয়েও দেবুকে আদর করতো বেশী। ন্যাংটা বয়স থেকে দেবুকে জেলে-বৌ কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। দেবু জেলেবৌকে শুধু 'বৌ' বলে ডাকে। দেবুর 'বৌ' ডাকটী ভারী ভাল লাগে জেলেবৌ'র। ছোটবেলায় যখন কেবল কথা ফুটতে আরম্ভ হ'য়েছে দেবুর—ভাল করে কথা বলতে পারে না—কারোর কোলে হয়ত রয়েছে—জেলেবৌ যদি ওর সামনে দিয়ে যেত—তার কোলে যাবার জন্ম 'বাউ বাউ' করে ডেকে উঠতো। কাজের জন্য যদি জেলেবৌ দেবুকে এড়িয়ে যেত—দেবু 'বাউ বাউ' করে এমননি ডাকতে থাকতো যে, কাজ ফেলে রেখে দেবুকে তার কোলে নিতে হতো। সেই 'বাউ বাউ ডাক ধীরে ধীরে বৌ'তে রূপান্তরিত হ'য়েছে। বড় হ'য়েও 'বৌ' ছাড়া আর কিছু সে ডাকতে পারে না জেলেবৌকে। এখনও অনেকে দেবুর ছোটবেলার সেই 'বাউ বাউ' ডাক নিয়ে ওর সংগে হাসি তামাসা করে। হলধরও অনেক সময় রসিয়ে ঠাট্টা করে বলে, "ওরে আমার সতীন গো।"

জেলেবৌ আবার আদর করে বলে—"ওগো আমার ঠাকুর গো, আমার নাগর গো।"

দেবু তখন রেগে যায়। বলে, "ভাল হবে না কিন্তু বৌ—তাইলে কিন্তু আমি হলধরের বুড়ি বইলা] ডাখবো।"

নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে 'দেশের দাবী'র প্রদর্শনীতে শরৎচন্দ্র ও আই, এন-এর নেতৃবৃন্দ।

তাছাড়া ভীড়ের সময় জেলেবৌর চারাগুলি সম্পর্কে দেবু সকলকে সতর্কও করিয়ে দিত। দেবু গাছে উঠেছে—কেউ বলছে "দেবুদা আমারে এ্যাকটা —দেবুকা' আমাবে আর একটা।" দেবু উপর থেকে গাব ছুড়ে মারে—আর সংগে সংগে নীচেও ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। যে পায় সে খুশীতে মশগুল হ'য়ে ওঠে—যে পায় না, মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে—কী ভ্যা ভ্যা করে ভ্যাবানীই আরম্ভ করে দেয। দেবু তার কান্না থামাতে হয়ত নাম ধরে বলে, "নে ক্যাবলা এইট্যা তোর জইন্যে ফ্যাল্লাম।" ক্যাবলাব কান্না থামে। আবার অনেক সময় ক্যাবলার নাম কবে যেটা ফেলা হয়, ধবলাই হয়ত নিয়ে ছুট দিল। দেবু উপব থেকে চীৎকাব করে শাষায়, "দাঁড়া—নাইমানি—তোরে মজা দ্যাখাবো-খানে।" নীচের হই-হুল্লোড় যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায—জেলেবৌর টনকে যদি তা যেয়ে ঘা দেবার উপক্রম করে—জেলেবৌকে আসতে দেখেই গাছের উপর থেকে দেবু তার সৈন্য-সামন্তদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, "এই ক্যাবলা বৌ'র লাউ গাছ দ্যাখিস। ওদিকে গ্যালে কিন্তু কাউরে আস্ত রাখবো না।" হরিদাস হয়ত শশার চারাটার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। উপর থেকে দেবু দেখতে পায়। দেবু হাঁক দেয়, "হইর‍্যা সইড়া দাঁড়াইতে পারিস ন্যা! চোখ নাই তোর!"

হরিদাস নিজের অপবাধ খণ্ডন করতে যেয়ে সুর নামিয়ে বলে, "না দেবুদা, আমবাত কিছু করি নাই। লাউগাছ থিক্যা দুরেই আছি।" তবু হরিদাস একটু সরে দাঁড়ায়। জেলেবৌ হয়ত এসে হাজির হয়। পবখ করে নেয় সব। কিছু বলার না থাকলে চুপি চুপিই আবার চলে যায়।

বেতের ঝাড়েও দেবুদের আকর্ষণ কম নয়। বেতের ঝাড়ের প্রতি দেবুদেব চেয়ে তাদের বৌদি আর দিদি স্থানীয়দেরই লোভ বেশী। বুড়ি পিসীমা দিদিমার দল হয়ত একাদশী অমাবস্যা উপবাসের পব বেতেব ঝোলের

জন্য দু'একজনকে দু'চারখানা 'বেতাগু' (বেতের ডগা) দিতে পাঠান। কিন্তু লতিয়ে পড়া বেতগাছগুলি থেকে থোপায় থোপায় আঙুর ফলের মত যখন বেতুল (বেতফল) ঝুলে পড়ে—ফলগুলি যেই পাকতে আরম্ভ করে, পাড়ার বৌদি-দিদিদের প্রেরিত চরদের উৎপাত জেলেবৌকে কম সহ্য করতে হয় না। নুন আর শুকনো লঙ্কার গুড়ি মিশিয়ে বেতুলগুলিকে যখন মাখা হয়—তা দেখে এরা অনেকেই লোভ সামলাতে পারে না।

বাঁশঝাড়ের প্রতি অবশ্য ছোট ছোট ছেলেদেরই উৎপাৎ বেশী। হয়ত দেখছে, একটা কঞ্চি বেশ সাবলীল ভাবে অনেকদুর উঠে গেছে—দেবু কী হরিদাস অমনি সেটাকে কেটে আনবে বড়শীর ছিপ তৈরী কররার জন্য। আবার এরা যখন কেউ রবীন হুড সেজে বসে—কেউবা সব্যসাচী হ'য়ে ওঠে—অভিমন্যু হ'য়ে কেউ যখন সপ্তরথীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন সেই বীর যোদ্ধা-দের তীর ধনুক হলধরের এই বাঁশের ঝাড় থেকেই তৈরী হয়।

গাবগুলির জন্য রাইর মনটা উচাটন হ'য়ে উঠছিল। বাপ-ভাইদেরও আসতে দেরী হচ্ছে—রাইর আর জাল বোনায় মন টিকছে না। দু'ঘর বোনেত তিন ঘর খোলে।

"হলধর বাড়ী আছো নাকী?"

হঠাৎ চেনা গলার হাঁকে রাই সচকিত হয়ে ওঠে। জাল বুনতে মন না চাইলেও রাই জোর করে মন বসায়। হলধর এসময় বাড়ী থাকে না। বাড়ীতে আসে আরো একটু বাদে। স্যিয্যি মাথা ছেড়ে চলে না গেলে কোন জেলেই বাড়ী ফেরে না। মেজকত্তা তা জানেন। জেনে শুনেই তিনি এমনি সময় একবার জেলেবাড়ীগুলি টহল দিয়ে বেড়ান। মেজকত্তার পরিক্রমার প্রারম্ভে কোন দিন যান বিধে কী ফেলা মাঝির বাড়ীতে খোঁজ খবর নিতে, তারপর হয়ত আসেন হলধরের বাড়ী। আজ পরিক্রমা শেষেই তিনি হলধরের বাড়ী হাজির হ'য়েছেন। রাই জালের দিকে মুখ রেখে উত্তর দেয়, "তারাত এ লগনেও আসে নাই।"

"কখন আসবে?" মেজকত্তা দূরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করেন। সত্যিই যেন হলধরের কাছে তাঁর কত জরুরী কাজ!

ডান হাতে সুতো ভরতি মাকু আর বাঁ হাতে বুনোন-চটা চেপে ধরেই রাই বলে, "আসকার ত সময় অইয়া গ্যাছে।"

"ও! এসেত আবার খাওয়া দাওয়া করবে। আমি বরং বাড়ী হ'য়ে আসছি।" কিন্তু বাড়ীর দিকে পা না বাড়িয়ে মেজকত্তা রাইর কাছে এগিয়ে যেয়ে বলেন, "তোর মা কোথায় গেল রে?"

এক তরফা খবর কোনদিনই মেজকত্তা নেন না।

"ঘাটে কাপড় কাচতে গ্যাছে।" রাই ধরা গলায় উত্তর দেয়। বে-পরোয়া রাই বাপ-ভাইয়ের সামনে মেজকত্তাকেও মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলতে যায় একটুকুও বাধে না।—মেজকর্তার একক সান্নিধ্যে ভয়ে যেন বুকটা দুর দুর করে কেঁপে ওঠে ওর। ওর যেন মুখে কথা যোগায় না। মেজকত্তা তার স্বাভাবিক ভংগীতে রাইর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "জাল বুনছিস বুঝি!"

রাই উত্তর দেয়, "হু!"

মেজকত্তা আরো একটু কাছে এগিয়ে যেয়ে বলেন, "কী জাল বুনছিস?"

রাই বলে, "খ্যাপলা।"

"কত মালি,"

"এ্যাক কুড়ি।"

কোন কথা দিয়েই মেজকত্তা যেন জমাতে পাচ্ছেনা। বাড়ীতে বৌ'র কাছ থেকে যদি এমনি ছাড়াছাড়া কাটাকাটা উত্তর পেতেন মেজকত্তা, তাহ'লে তাকে চুলের গোছা ধরে দুই ঝাঁকুনী দিয়ে ছাড়তেন। অথচ পুচকে একটা জেলের মেয়ের কাছে মেজকত্তা কত ভদ্র! কত মোলায়েম ভাবে তার সংগে কথা বলছেন।

মেজকত্তার বৌ'র মাথায় এক রাশ চুল! পা পর্যন্ত যেয়ে নামে। পাড়ায় মেয়ে মহলে সে-চুল একটা উপমা হ'য়ে আছে। অথচ মেজকত্তার ভদ্র-স্বভাবের কাছে সে চুলও রেহাই পায়নি। সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে পাড়ার বৌ-ঝিয়েরা মেজকত্তার উদ্দেশ্যে

যে থুথু ফেলেন—অন্য লোক হ'লে পাড়ায় আর মুখ দেখাতো না। কিন্তু মেজকর্তা অত সহজে গায়ে মাখবার লোক নন। সেই ঘটনার কথাই বলছি—মেজকর্তার ছোট বোন বিজনবালা কী উপলক্ষ্যে একবার বাপের বাড়ীতে এসেছিল। মেজকর্তাদের পালান ছেয়ে তখন রাজগাঁদ্ধা ফুটে হলুদ হয়ে ছিল। বৌদির চুল বেঁধে ছোট ননদ সখ করে কয়েকটা ফুল তুলে খোঁপায় গুজে দিয়ে বলেছিল—"যাও রাই, এখন একটু অভিসার করে এসো।" মেজকর্তা তখন তার ঘরে ছিলেন। অনিচ্ছা সত্বেও ছোট ননদের অনুরোধে মেজকর্তার বৌ—গোলাপ সুন্দরী যখন তার সামনে যেয়ে দাঁড়ালো—মেজকর্তা তাকে যে মিষ্টি ভাষা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন—বামুন-কায়েতত দূরের কথা, জেলেরাও নিজেদের বৌকে ওকথা বলে না। মেজকর্তা বলেছিলেন,

"বা: ভাঙ্গার হাটের বেশ্যামাগীদেরও যে ছাড়িয়ে গ্যাছো।" ভাঙ্গা থানা-সহর। বল্লভপুর থেকে খুব বেশী দূর নয়। সেখানে কয়েক ঘর নীচু ঘরের বারবণিতা আছে। তারা রাতের অন্ধকারে নিজেদের রূপ ঢেকে গাঁদাফুল কী সরষেফুল খোঁপায় গুঁজে সেজেগুজে মেজকর্তার মত পথিকদের মন ভোলায়! গোলাপ সুন্দরী জানে সে কথা। সে জানে তার স্বামীটীর কিরূপ রামের মত চরিত্র। কিন্তু তাই বলে তিনি যে এতটা ইতর তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে—দরজার সামনেই ননদের সংগে দেখা। সে আড়ি পেতে শুনেছে সব। নারীর এত বড় অপমান কোন নারীই সইতে পারে না! গোলাপ সুন্দরী ননদের সংগে কথা না বলেই অন্য ঘরে চলে যায়। নিজের স্বামীর এই অপমানকর উক্তি—আর একজন নারীর কানেও গেছে—এই লজ্জা এবং অপমানের ভারে সে আর ননদের সংগে কথা বলতে পারলো না—চুপি চুপি গিয়ে পাশের ঘরে বিছানায় মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো। বিজনবালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দাদার সামনে যেয়ে দাঁড়ালো—না, এ অন্যায় নারী হ'য়ে সে মেনে নিতে পারেনা। দাদা গুরুজন হলেও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ তার করতেই হবে।

মেজকর্ত্তা নির্বিকার। কী আর এমন বলেছেন।] বোনকে আসতে দেখে উঠে বসেন।

"কী রে! কী খবর?"

বিজনবালার রাগে থর থর করে গা কাঁপছে—মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছেনা—অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে মেজকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি বৌকে কী বলেছো?" মেজকর্ত্তা এবার বুঝলেন।

"ও, আবার এর মাঝে লাগানোও হ'য়ে গ্যাছে—আচ্ছা নচ্ছার ত।"

বিজনবালা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, বলে বসলো, "তুমি দিন দিন এত ইতর হ'য়ে যাচ্ছো।" কারোর চোখ-রাঙ্গানো কথা শুনতে মেজকর্ত্তা জন্মাননি। কারোর শাসন তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই বোনকে ধমকে উঠলেন, "তোরে আর শিক্ষা দিতে হবেনা। দু'দিন বিয়ে হ'য়েই জ্যাঠা হ'য়ে গেছিস, দুই থাপ্পড়ে গাল ভেঙ্গে..."

"থামো তুমি!" বিজনবালা গর্জে ওঠে! "আমি তোমার বৌ নই—হাম্বিতাম্বি তার উপরই চালিও—তবে আমাদের সামনে নয়—"

"হ্যাঁ, তাই চালাবো—আমার বৌকে আমি যা খুশী বলবো—তোরা নাক গলাতে আসিস কেন।" মেজকর্ত্তার কথাগুলি শেষ হবার পূর্বে বিজনবালা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হয় না। মেজকর্ত্তার ঘাড়ে তখন ভূত চেপেছে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে একটা কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পালানের সমস্ত গাছগুলি উপড়ে ফেলেন। তাতেও কী তার গায়ের ঝাঁঝ মেটে! তৈরী হ'য়েই ছিলেন—রাত্রে কাজ কর্ম সেরে গোলাপসুন্দরী যখন ভয়ে ভয়ে

এম, পি, প্রডাকসন্সের স্বপ্ন ও সাধনা চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও জীবেন বসু

স্বামীর ঘরে ঢুকেছে—মেজকর্তা বৌর সেল্ফাইর বাক্স থেকে কাঁচিটা বের করে নিয়ে জোর করে চুলগুলি এবড়ো খেপড়ো করে কেটে দিলেন। গোলাপ সুন্দরী বাধা দিতে গেলে, বলে উঠলেন, "খবরদার, চীৎকার করলে কী বাধা দিলে গলা কেটে ফেলবো।"

গোলাপসুন্দরী নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে চোখের জলে জেগে সারা রাত কাটায়। পরের দিন সমস্ত ব্যাপারটা কারো কাছে গোপন থাকে না। এতদূর যে গড়াবে বিজনবালা তা ভাবতেও পারেনি। সেদিনই ছোট ভাইকে সংগে নিয়ে বাপের বাড়ী থেকে চলে যায়। সেই থেকে কোন দিন সে আর বাপের বাড়ী পা দেয়নি। কয়েক মাসের ভিতর গোলাপ-সুন্দরীও কোথাও বেরোতে পারেনি। পাড়ায় দু'এক দিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে। এহেন মেজকর্তার দৃষ্টি যেয়ে পড়লো রাইর খোঁপার দিকে। মেজকর্তা রাইর কাছে এগিয়ে যেয়ে খোঁপায় হাত দিয়ে বলেন, "বা কী ফুল গুজেছিস রে মাথায়! ভারি সুন্দরত।"

রাই মাথাটা টান মেরে সরিয়ে নেয়। কোন কথা কয় না। স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত ফুল রাই খোঁপায় গোঁজেনি। এমন কী—দেবু কী আর যারা বাগানে যত্ন করে যে সব ফুলের গাছ রুয়ে থাকে—রাই সে সব জাতেরও কোন ফুল খোঁপায় গোঁজেনী। রাই যে ফুল খোঁপায় গুঁজেছে—সে ফুলের গাছ পাড়াগাঁয়ে আঁদাড়ে—আঁঘাটে অযত্নে সকলের অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠে। পাড়াগাঁয়ে এই গাছগুলিকে 'বন্ধ্যা' গাছ বলে। বন্ধ্যার ফুল কোন ফুলেরই জাত নয়—কোন ভদ্রলোকই তাকে পোছে না! জেলে কী মুসলমান কৃষকদের মেয়েরা ঐ ফুল খোঁপায় গোঁজে। সেজন্য ভদ্রলোকদের ঠাট্টা তামাসাও তাদের কম সইতে হয় না। আজ সেই ফুল রাইয়ের খোঁপায় দেখে যেন মেজকর্তার চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন অপূর্ব জিনিষটা তিনি আর কোন দিন দেখেন নি। রাই মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে। সুবৌদি কী দেবুদা যদি রাইয়ের খোঁপার তারিফ করতো, ওর মনটা হয় ত খুশীতে ভরে উঠতো—কিন্তু মেজ-কর্তার প্রশংসা ও যেন সইতে পাচ্ছে না। এক একবার ইচ্ছা কচ্ছে একটান মেরে চুলগুলি খুলে ফেলে দেয়। জাল-বোনা রেখে মেজকর্তার উপস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য রাই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়।

মেজকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় যাস্‌রে?"

"যাই ভাত বাড়তে, বাপ ভাইদের আসফার লগন অইছে।" রাই একটু থেমে দাঁড়িয়েই উত্তর দেয়।

মেজকর্তা অবিবেচক নন, তিনি বোঝেন, এবার তাকে যেতেই হবে। তাই রাইকে ডেকেই বলেন, "আরে শোন। হলধর এলে বলিস আমি খুঁজে গেছি। মাছ যেন বেছে রেখে দেয়—আবার আসবো এখন।" রাইয়ের মনে এবং হলধরদের উদ্দেশ্যেও এই বিশ্বাসটাই মেজকর্তা রেখে যেতে চান যে, তিনি নিছক মাছের সন্ধানেই এসেছিলেন। রাইয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে, গলাটা একটু বদলে মেজকর্তা বলেন, "বাড়ীতে ইষ্টি-কুটুম রয়েছে—তাছাড়া ছেলেটার আবার পেট খারাপ, কতগুলি স্যাচ্‌ড়া মাছ রেখে দিতে বলিস।" রাই মাটির দিক চেয়ে মাথা নেড়ে মেনে নেয়—হ্যাঁ সে তাই বলবে।

মেজকর্তা অতর্কিতে রাইয়ের গাল দুটো টিপে বলেন, "বড় দুষ্টু হয়েছিস।" রাই এক ঝাঁকি দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রান্না ঘরে যায়। মেজকর্তার মেয়ের বয়সী রাই। আদর করে গাল টিপতেও তিনি পারেন। লোকের চোখেও অশোভন নয়। কিন্তু মেজকর্তা বলেই তা অশোভন হ'য়ে ওঠে। রাগে রাই ফুলতে থাকে। তাড়াতাড়ি একঘটা জল ঢেলে নিয়ে মুখটা রগড়ে ধুয়ে নেয়। যেন কোন অপবিত্র ছোঁয়াচে ওর সারা মুখটা বিষিয়ে গেছে। —(চলবে)

নির্মল রুদ্র
পর্দায় ও পর্দার বাইরে
রূপ-মঞ্চ : ১৩৫৩

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন পরিবেশিত নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় 'নার্স সিসি' চিত্রে

শ্রীমতী ভারতী

জানেন কী এঁদের

★

শ্রীনির্মল রুদ্র

জানেন কী এঁকে? জানেন বৈকী! অনেকেই আপনারা জানেন। রূপালী পর্দায় আপনাদের চোখের সামনে ইনি ইতিপূর্বেই ঝিলিক দিয়ে গেছেন। মনে ভেবেছেন—নতুন, তা এমনকী! কীইবা চেহারা! কিন্তু যে মুহূর্তে পর্দার গায়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠেছে—আপনারা মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। গা ঝাড়া দিয়ে কান খাড়া করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন রূপালী পর্দায়। হ্যাঁ, লোকটার গলাটা ভারী মিষ্টি। তাই প্রথম প্রকাশেই ইনি 'সাতনম্বর বাড়ী'তে আপনাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

সময়মত কাজ করিনা বলে আমার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠেছে সম্পাদকের কাছে। 'জানেন কী এঁদের'—এই বিভাগটীর প্রতিও গাফিলতির নাকি অন্ত নেই। বার বার পাঠকসাধারণ অভিযোগ উপস্থিত করেছেন—তাই সম্পাদকের কঠোর আদেশে ঘোরাঘুরিও যেমনি বেড়েছে—রূপ-মঞ্চ অফিসে টেবিলে মাথা গুঁজে কাজও তেমনি করে যেতে হ'চ্ছে। কারো সংগে কথা বলবার ফাঁক নেই—দৃষ্টিপাত করবারও সময়টুকু নষ্ট কচ্ছি না। লোক আসছে—যাচ্ছে। সম্পাদকের নির্দেশিত বিষয়কে কাগজের ওপর কালি দিয়ে রেখাপাত করে যাচ্ছি।

গুরু গম্ভীর কণ্ঠে আমারই টেবিলের পাশে আওয়াজ হ'লো—'নমস্কার'! 'হুঁ' করে মাথা নেড়ে না তাকিয়ে বল্লাম, 'সম্পাদক নেই—যা বলবার ঐ সামনের টেবিলে বলুন।' সামনের টেবিলে কাগজ পরিচালনায় সম্পাদকের ছায়া শ্রীমন বাহাদুর কেতুজী অর্থাৎ কার্যাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডলকে দেখিয়ে দিলাম। লিকলিকে খাটো হালকা চেহারার লোকটীকে কার্যাধ্যক্ষের গুরু গম্ভীর নামের সংগে মানায় না বলে—আমি প্রথমোক্ত নামটী দিয়ে তাঁকে গুরু গম্ভীর করে নিয়েছি। আমি কাজে মনোনিবেশ করলাম। আবার ভদ্রলোকটী আমারই টেবিলের সামনে এসে বল্লেন, "আজ্ঞে আমি আপনাকেই চাই। আমি নির্মল রুদ্র।" লেখা বন্ধ করে তাকালুম। উঁচু লম্বা-চেহারা। পাঞ্জাবীর পর গলায় চাদর জড়ানো—হাতে জলন্ত সিগারেট। স্মিত মুখে আসন দেখিয়ে দিয়ে বল্লাম, "হ্যাঁ আপনারই জন্ম আমি অপেক্ষা করছি। দেরী দেখে অন্য কাজ নিয়ে মেতে পড়েছিলাম।" নির্মলবাবু সিগারেট এগিয়ে দিলেন, আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, "মাপ করবেন—আমাদের এখানে এসে কাউকে কিছু খরচা করতে দেবো না। সম্পাদকের তাই নির্দেশ।" আড়চোখে কেতুজী বাহাদুরের দিকে একবার তাকালুম—কারণ, এইখানটাতেই সম্পাদকের সংগে ওর যতটা অমিল।

কয়েক বাটী 'কোকোর' হুকুম দিয়ে নির্মলবাবুকে নিয়ে মেতে পড়লাম।

অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক থাকলেও চিত্রজগতে পেশাদার শিল্পী রূপে প্রবেশ করবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলে নির্মলবাবু যখন নিজের মনের কথাটা বলে ফেল্লেন—আমিত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়েই উঠলাম। লোকটা বলে কী? 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' কথাটীকে একেবারে ব্যর্থ করে দিতে চায়! আর রূপ-মঞ্চের সংস্পর্শে এসেছি অবধি, এমন লোকের সংগে খুবই কম পরিচিত হ'য়েছি, যাকে বা যাদের বলতে শুনিনি, 'দেখুন, আমার মনে চিত্রজগতে প্রবেশ করতে উদগ্র বাসনা রয়েছে—একবার যদি সুযোগ পাই চন্দ্রাদি - ছবিদা এঁদেরও ছাড়িয়ে যাবার স্পর্ধা আছে'—এত উদগ্র বাসনা নিয়ে কতজন চিত্রজগতের প্রাচীরের বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছেন—আর ভিতরে প্রবেশ করে শ্রীযুক্ত রুদ্র বলেন কিনা, 'বিশ্বাস করুণ, আমার তেমন কোনই বাসনা ছিল না—খেলা ধুলার দিকেই ঝোঁকটা আমার ছিল বেশী। সাইকেল নিয়ে পোঁ পোঁ করে ঘুরে বেড়িয়ে ঘুরপাক খেতাম। সাঁতার কাটতে কাটতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে কাটিয়ে দিতাম। ফুটবল খেলতে খেলতে এতই মেতে পড়েছিলাম যে, রাত্রে ঘুমের ঘোরেও বিপরীত পক্ষের 'গোল' লক্ষ্য করে বল 'সট' করেছি।"

শ্রীযুক্ত রুদ্র যে এক সময় একজন খেলোয়াড় ছিলেন—তা তাঁর পেশীযুক্ত চেহারাই সাক্ষ্য দেয়—

তাছাড়া খেলা ধূলার কথা বলতে বলতে তাঁর যে উত্তেজনার পরিচয় পাচ্ছিলাম—তা থেকেও একথা অনুমান করা যেতে পারে। শ্যামবাজার ইউনাইটেড ক্লাবের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য এবং ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের সংগেও জড়িত ছিলেন। মটর সাইকেল এবং মটর গাড়ী চালাতেও তিনি ওস্তাদ। শ্যামবাজার মহারাজা কাশীমবাজার পলিটেকনিক ইনসটিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হবার পূর্বে'ই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়।

অভিনয় জগতে প্রবেশ করবার বাসনা ছিলনা—অথচ কী করে এলেন, একথা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীযুক্ত রুদ্র বলেন, "এজন্য যা কিছু কৃতিত্ব এবং প্রেরণা—তা আমার পরম সুহৃদ এম, পি, প্রডাকসন্সের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষের। অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক—আমার ছিল—তবে তা সৌখীন নাট্যাভিনয়ের। সিরাজদ্দৌলা নাট্যাভিনয়ে আমার নাম ভূমিকার অভিনয় দেখে শ্রীযুক্ত ঘোষ মুগ্ধ হন এবং চলচ্চিত্রে যোগদান করবার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানান—আমি তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ সুযোগ সাদরে গ্রহণ করি।"

ছাত্রজীবন থেকেই শ্রীযুক্ত রুদ্রের আবৃত্তি এবং অভিনয়ে পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। সৌখীন নাট্যাভিনয়ে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। বিভিন্ন অভিনয়ের ভিতর তাঁর চরিত্রহীনে উপেন, মারাঠা মোগলে জন এ্যালভারীগো, বিজয়ায় বিলাস, বিশবছর আগেতে দীপক, দুই পুরুষে নুটবিহারী, সিরাজদ্দৌলায়-সিরাজ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হ'য়েছে।

ছায়াচিত্রে 'সাতনম্বর বাড়ী'তে নির্ম্মলবাবুর প্রথম প্রকাশ। অপূর্ব্ব মিত্র এবং বিভূতি দাশ পরিচালিত 'তুমি আর আমি' ও 'তপোভঙ্গ'তেও,তাঁর সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে। বর্ত্তমানে স্বপ্ন ও সাধনা, ঝড়ের পর প্রভৃতি নির্মীয়মান চিত্রগুলিতে তিনি অভিনয় করছেন। সাতনম্বর বাড়ীতে রাজেন চরিত্র রূপায়িত করবার সময় সংগীতগুলি নিজে না গাইলেও, নির্ম্মলবাবু একজন গুণী সংগীত-শিল্পী। নিজে গাইতে পারেন—বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে। এর ভিতর বিশেষ করে বেহালার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল চৌধুরী নির্ম্মলবাবুর সংগীতগুরু এবং শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র অধিকারী ও পরেশ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি তবলা-বাজনা শিক্ষা করেন।

১৯১৬ খৃঃ কলিকাতার এক বিশিষ্ট কায়স্থ পরিবারে শ্রীযুক্ত রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামবাজার অঞ্চলে ৫,বৃন্দাবন বাই পাল লেনে—পৈতৃক বাড়ীতে বর্ত্তমানে তিনি পরিবারবর্গের সংগে বসবাস করছেন। দুই ভায়ের ভিতর শ্রীযুক্ত রুদ্র কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের ব্যবহার সমবয়সী বন্ধুর মতই প্রাণ-খোলা। শ্রীযুক্ত রুদ্রের পিতা 'ম্যাকসটোক কোং' নামে একটী জার্ম্মান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন। কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করবার পূর্বে'ই পিতার অফিসে হিসাবরক্ষক হিসাবে তিনি কাজ করেন। যুদ্ধের

সংগে সংগে শত্রু প্রতিষ্ঠান বলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটী বন্ধ হ'য়ে যায়। নির্মলবাবু কলিকাতা করপোরেশনের রাস্তা মেরামতের ঠিকাদারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এবং দু'ভাইয়ে ভবানীপুরের "আই জোলা বেলা" হোটেলটীর স্বত্ব খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুনন্দা দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ক্রয় করেন। পিতার মৃত্যুর পরেও দুই ভায়ের ভিতর কোন প্রকার বিরোধ দেখা দেয়নি—মা এবং জ্যেষ্ঠের অনুমতি নিয়েই শ্রীযুক্ত রুদ্র চলচ্চিত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন। ১৯৩৭ খৃঃ নির্মলবাবু সচিত্র শিশির পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রুদ্র চারিটী সন্তানের পিতা। চলচ্চিত্র জীবনের সংগে সংঘর্ষে কোনদিনই তাঁর পারিবারিক জীবনের মাধুর্য নষ্ট হয়নি।

চিত্রজগতের আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করলে শ্রীযুক্ত রুদ্র বলেন, "আমিত নিন্দনীয় এমন কোন উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। বরং আমি বলবো—কেউ যদি পংকিলই খুঁজতে আসেন—তার পক্ষে পাঁকে আটকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুষ্ঠু এবং সবল মন নিয়ে যাঁরা নেহাৎ শিল্প সাধনা এবং অর্থোপার্জনের জন্য চিত্রজগতে পা বাড়ান—তাঁদের কোন প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

স্বর্গত দুর্গাদাসের প্রতিভার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রুদ্র গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। চন্দ্রাবতী ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয়-দক্ষতাকে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যে কয়েকজন পরিচালকের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে নির্মলবাবু বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন না। এই প্রসংগে অভিনেতা এবং সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত অমর বসুর প্রতিও নিজের গভীর শ্রদ্ধার কথা জানান। আধুনিক মুক্তি প্রাপ্ত চিত্র গুলির ভিতর 'উদয়ের পথে' তাঁকে যতখানি খুশী করেছে—আর কোন ছবিই তা করতে পারেনি। চলচ্চিত্র জগতে যে কয়জন কাহিনীকারের আগমন হ'য়েছে—তার ভিতর নির্মলবাবু শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের অনুরক্ত।

সংগীত পরিচালকদের ভিতর প্রবীণ সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়ালের সুর সংযোজনা নির্মলবাবুকে বেশী আকৃষ্ট করে। চিত্রজগতের প্রতিটী কাজ নির্মলবাবু গভীর অভিনিবেশের সংগে অনুধাবন করে থাকেন—অভিনেতা রূপে সকলের মন কেড়ে নিয়েই তিনি শুধু ক্ষান্ত হ'তে চান না--প্রযোজক রূপেও তিনি সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে চান। তাই নির্মলবাবু নিজস্ব প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের জন্য সব সময়েই সচেতন।

শ্রীযুক্ত রুদ্র অমায়িক এবং সদালাপী। নিরপেক্ষ সমালোচনাকে অভিনন্দিত করবার অক্ষমতা কোন সময়ই তাঁর ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না—সে সমালোচনা তাঁর বিরুদ্ধে হ'লেও তিনি মেনে নিতে রাজী।

রূপ-মঞ্চের তিনি একজন গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত সভ্য। রূপ-মঞ্চের কর্মীদের প্রতি তাঁর রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা।

—শ্রীপার্থিব।

বাংলা সবাক ছায়াছবির প্রথম প্রকাশ

●

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)।

(১)

ইংরাজী ১৯৩১ সাল হইতে প্রথম বাংলা সবাক চিত্র দেখান আরম্ভ হয়। এই ১৬ বৎসর যতগুলি বাংলা সবাক চিত্র দেখান হইয়াছে তাহার একটী পূর্ণ তালিকা দিলাম। এই তালিকা একটী সংখ্যায় শেষ করা সম্ভব নয়, সুতরাং ক্রমশ: শেষ করিব। এই তালিকা আরম্ভ করিবার পূর্বে দু'চারটী কথা বলা প্রয়োজন। যথা :—

ক ১। তারকা চিহ্নিত চিত্রগুলি পূর্ণ দৈর্ঘ্য নহে।

২। "ক্রাউন"-এর বর্তমান নাম "উত্তরা"।

৩। "কর্ণওয়ালিস"-এর বর্তমান নাম "শ্রী"।

৪। "দীপালী"-র বর্তমান নাম "চিত্রলেখা"।

৫। "রূপকথা"-র বর্তমান নাম "রূপম"।

৬। "অভিনব" চিত্রটী নির্বাক যুগে "নিশির ডাক" নামে তোলা হয় এবং এই চিত্রে শব্দ যোগ করিয়া "অভিনব" নামে সবাক যুগে দেখান হয়।

খ ১। ১৪-২-৩১ তারিখে "ক্রাউন" সিনেমায় গায়িকা মুন্নিবাঈর একটী গান প্রথম শোনান হয়।

২। ১৬-৩-৩১ তারিখে ক্রাউন সিনেমায় কতকগুলি বাংলা নাটকের ৩১ বা ৩২টী নির্বাচিত দৃশ্য দেখান হয়। যথা :—

আলমগীর	আলমগীর	অহীন্দ্র চৌধুরী
আবুহোসেন	রোশেনা	রেণুবালা (সুখ)
কৃষ্ণকান্তের উইল	গোবিন্দলাল	দুর্গাদাস বন্দ্যো
„	রোহিণী	সরযূবালা
চাঁদবিবি	ইব্রাহিম	ভূমেন রায়
„	ফয়জান	রেণুবালা (সুখ)
মৃণালিনী	———	অহীন্দ্র চৌধুরী
রংবাহার	বীণা	রেণুবালা (সুখ)
সীতা	রাম	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
—	—	ধীরাজ ভট্টাচার্য
—	—	সত্যেন দে
২টী গান	—	কৃষ্ণচন্দ্র দে

গ ১। ১৯৩১ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে নিম্নে দিলাম।

১। **ঋষির প্রেম** — ম্যাডান কোম্পানী।
প্রথম আরম্ভ — ৩-৮-৩১।
চিত্রগৃহ — ক্রাউন সিনেমা।
কাহিনী — শ্রীকৃষ্ণধন দে।
পরিচালনা — শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলোক শিল্পী : মি: ডেনার্ড ও মি: টি, মার্কনী।
ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, হীরেন বসু, ধীরেন দাস, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গনেশ গোস্বামী, কানন দেবী ও সরযূ দেবী।

২। **জামাই ষষ্ঠী★** — ম্যাডান কোম্পানী
প্রথম আরম্ভ — ১১-৪-৩১
চিত্রগৃহ — ক্রাউন সিনেমা
কাহিনী ও পরিচালনা — শ্রীঅমর চৌধুরী
আলোক শিল্পী — মি: টি, মার্কনী
ভূমিকায়—অমর চৌধুরী, যতীন সিংহ, ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি গোলেলা ও শ্রীমতী রাণীসুন্দরী।

৩। **জোর বরাত★** — ম্যাডান কোম্পানী
প্রথম আরম্ভ — ২৭-৬-৩১
চিত্রগৃহ — ক্রাউন সিনেমা
কাহিনী — শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা — শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী — মি: টি, মার্কনী
ভূমিকায়—জয়নারায়ণ, কার্তিকচন্দ্র দে, কার্তিক রায়, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, কানন দেবী ও শ্রীমতী প্রকাশমণি।

৪। **তৃতীয়পক্ষ★** — ম্যাডান কোম্পানী
প্রথম আরম্ভ — ৬-১২-৩১

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

কাহিনী ও পরিচালনা শ্রীঅমর চৌধুরী

আলোক শিল্পী: শ্রীযতীন দাস ও মিঃ টি, মার্কনী

ভূমিকায়—অমর চৌধুরী, যতীন সিংহ, ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গোলেলা ও শ্রীমতী গোলাপ।

৫। **দেনাপাওনা** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ ২৪-১২-৩১

চিত্রগৃহ চিত্রা

কাহিনী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আলোক শিল্পী শ্রীনীতিন বসু

ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অমর, জহর, ভানু, ভূমেন, কুসুম, নিভাননী, উমাশশী, শিশুবালা, অনুপমা ও আভাবতী।

৬। **প্রহ্লাদ** ম্যাডান কোম্পানী

প্রথম আরম্ভ ২৯-১২-৩১

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

চিত্রনাট্য শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী শ্রীযতীন দাস ও মিঃ টি, মার্কনী

ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জয়নারায়ণ, কুঞ্জলাল, মৃণালকান্তি ঘোষ, ধীরেন দাস, শান্তিগুপ্তা, নীহারবালা, দেববালা, বীণাপাণি, জ্যোতি।

১৯৩২ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হইল।

৭। **কৃষ্ণকান্তের উইল** ম্যাডান কোম্পানী

প্রথম আরম্ভ ২৭-৯-৩২

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী শ্রীযতীন দাস

ভূমিকায়—কৃষ্ণকান্ত অহীন্দ্র চৌধুরী,

গোবিন্দলাল নির্মলেন্দু লাহিড়ী

নিশাকর ধীরাজ ভট্টাচার্য

হরলাল মণি ঘোষ

মাধবীনাথ কার্তিকচন্দ্র দে

সোণা কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

উড়েমালী চাণি দত্ত

রোহিণী শিশুবালা

ভ্রমর শান্তি গুপ্তা

ক্ষীরি নীরদা সুন্দরী

৮। **চিরকুমার সভা** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ ২৮-৫-৩২

চিত্রগৃহ চিত্রা

কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

পরিচালনা শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আলোক শিল্পী শ্রীনীতিন বসু

শব্দযন্ত্রী শ্রীমুকুল বসু

সঙ্গীত শ্রীরাইচাঁদ বড়াল

ভূমিকায়—তিনকড়ি চক্রবর্তী, অমর মল্লিক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ফণী বর্ম্মণ, নিভাননী, সুনীতি, অনুপমা, মলিনা, চানি দত্ত।

৯। **চিরকুমারী** ম্যাডান

প্রথম আরম্ভ ১-৭-৩২

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

পরিচালনা শ্রীঅমর চৌধুরী

আলোক শিল্পী: মিঃ মংলু, মিঃ মার্কনী ও মিঃ ব্রিফেট। ভূমিকায়—অমর চৌধুরী, ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, রাণীসুন্দরী ও রাধারাণী।

১০। **চণ্ডীদাস** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ ২৪-৯-৩২

চিত্রগৃহ চিত্রা

কথাশিল্পী ও পরিচালক শ্রীদেবকী বসু

আলোক শিল্পী শ্রীনীতিন বসু

শব্দযন্ত্রী শ্রীমুকুল বসু

সঙ্গীত শ্রীরাইচাঁদ বড়াল

ভূমিকায়—চণ্ডীদাস দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়নারায়ণ	অমর মল্লিক
আচার্য	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রীদাম	কৃষ্ণচন্দ্র দে
রামী	উমাশশী
কঙ্কণ	সুনীলা

১১। **"নটীরপূজা"★** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ	২২-৩-৩২
চিত্রগৃহ	চিত্রা
কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকায়—শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীগণ।

১২। **পুনর্জন্ম** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ	২-৪-৩২
চিত্রগৃহ	চিত্রা
কাহিনী	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
পরিচালনা	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী
আলোক শিল্পী	শ্রীনীতিন বসু

ভূমিকায়—কৃষ্ণ হালদার (পরিচালক ছদ্ম নামে অভিনয় করিয়াছিলেন) অমর মল্লিক ও দেববালা।

১৩। **পল্লীসমাজ** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ	১-৭-৩২
চিত্রগৃহ	চিত্রা
কাহিনী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী
আলোক শিল্পী	শ্রীনীতিন বসু
শব্দযন্ত্রী	শ্রীমুকুল বসু
ভূমিকায়—রমেশ	শিশির ভাদুড়ী
বেণী	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
গোবিন্দ	যোগেশ চৌধুরী
ধর্মদাস	অমলেন্দু লাহিড়ী
পরাণ	শৈলেন চৌধুরী
ভৈরব	নৃপেশ রায়
দীনু	শান্ত গোস্বামী
সনাতন	রাম চক্রবর্তী
আকবর	[illegible]
গোপাল	শীতল পাল
জ্যেঠাইমা	কঙ্কাবতী
রমা	প্রভা
রমার মাসী	ঊষা
কামিনীর মা	রাজলক্ষ্মী
লক্ষ্মী	লক্ষ্মী

১৪। **বিষ্ণুমায়া** ম্যাডান কোম্পানী

প্রথম আরম্ভ	২৫-৩-৩২
চিত্রগৃহ	ক্রাউন সিনেমা
পরিচালনা	শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জয়নারায়ণ, কার্তিক দে, কার্তিক রায়, গণেশ, কানন দেবী, রেণুবালা, শিশুবালা, বেলারাণী, জ্যোতি।

১৫। **বাঙলা ১৯৮৩** বড়ুয়া পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ	১৯-১২-৩২
চিত্রগৃহ	রূপবাণী
পরিচালনা	শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া

ভূমিকায়—প্রমথেশ বড়ুয়া, শৈলেন চৌধুরী, সুশীল মজুমদার, প্রভাবতী বড়ুয়া ও রেণুকা ঘোষ।

১৯৩৩ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হইল।

১৬। **কলঙ্কভঞ্জন** ম্যাডান কোম্পানী

প্রথম আরম্ভ	১৯৩৩ সাল
কাহিনী ও পরিচালনা	শ্রীঅমর চৌধুরী

ভূমিকায়—অমর চৌধুরী, ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, নীরদাসুন্দরী ও লক্ষ্মী।

১৭। **কপাল কুণ্ডলা** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ	৪-৫-৩৩
চিত্রগৃহ	চিত্রা
কাহিনী	বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী
আলোক শিল্পী	শ্রীনীতিন বসু
শব্দযন্ত্রী	শ্রীমুকুল বসু
সঙ্গীত	শ্রীরাইচাঁদ বড়াল

ভূমিকায়—দুর্গাদাস, মনোরঞ্জন, অমূল্য, উমাশশী, নিভাননী ও মলিনা।

১৮। **জয়দেব** ম্যাডান কোম্পানী
প্রথম আরম্ভ ১৯৩৩ সাল
পরিচালনা শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকায়—ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, শিশুবালা ও উষারাণী।

১৯। **বিল্বমঙ্গল** ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ
প্রথম আরম্ভ ৯-১২-৩৩
চিত্রগৃহ রূপবাণী
প্রযোজক শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কাহিনী গিরিশচন্দ্র ঘোষ
চিত্রনাট্য যোগেশ চৌধুরী
পরিচালনা শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
আলোক শিল্পী শ্রীননী সান্যাল
শব্দযন্ত্রী শ্রীমধু শীল
ভূমিকায়—রতীন, যোগেশ, শৈলেন, তিনকড়ি, দুর্গাপ্রসন্ন, রাণীবালা, ইন্দুবালা, শান্তবালা, মায়া, কমলা।

২০। **মীরাবাঈ** নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ ১১-১১-৩৩
চিত্রগৃহ চিত্রা
কাহিনী শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা শ্রীদেবকী কুমার বসু
আলোক শিল্পী শ্রীনীতিন বসু
শব্দযন্ত্রী শ্রীমুকুল বসু
সঙ্গীত শ্রীরাইচাঁদ বড়াল
ভূমিকায়—দুর্গাদাস, পাহাড়ী, অমর, মনোরঞ্জন, জিতেন, শৈলেন পাল, চন্দ্রাবতী, মলিনা, নিভাননী ও ইন্দুবালা।

২১। **যমুনা পুলিনে** ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম
দ্বিতীয়বার আরম্ভ ১-৪-৩৩
(এর কিছুদিন পূর্বে পাঁচ সপ্তাহ চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।)
চিত্রগৃহ রূপবাণী
কাহিনী শ্রীতুলসী লাহিড়ী
পরিচালনা শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ভূমিকায়—ধীরাজ, সবিতা, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা।

২২। **শ্রীগৌরাঙ্গ** রাধাফিল্ম
প্রথম আরম্ভ ×-৫-৩৩
চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা
পরিচালনা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ
আলোক শিল্পী মিঃ ডি, জি, গুণে
ভূমিকায়—বিনয় গোস্বামী, রবি রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, অহি সান্যাল, কানন দেবী, রাণীসুন্দরী, চারুবালা।

২৩। **সাবিত্রী** ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ
প্রথম আরম্ভ ১৫-৪-৩৩
চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা
প্রযোজনা শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
পরিচালনা জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী মিঃ পি, ব্রিফেট।
শব্দযন্ত্রী মিঃ পি, জুডাসাক

ভূমিকায়—

দ্যুমৎ সেন	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
অশ্বপতি	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
নারদ	ধীরেন দাস
সাবিত্রীদেবী	রেণুকা
শৈব্যা	শান্তবালা
সত্যবান	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
যম	শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
ভিখারী	গোপাল সেনগুপ্ত (অন্ধগায়ক)
মালতী	বেলারাণী
জয়া	কমলাবালা (শিশু)
সাবিত্রী	তারকবালা (লাইট)

২৪। **সাবিত্রী** ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম
প্রথম ৪-১১-৩৩
চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

কথাশিল্পী — শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা — শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
আলোক শিল্পী — শ্রীযতীন দাস
শব্দযন্ত্রী — মিঃ আর, সি, উইলম্যান
ভূমিকায়—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, তারাসুন্দরী ও কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)

২৫। **সীতা** — নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ — ২৬-১০-৩৩
চিত্রগৃহ — চিত্রা ও নিউ সিনেমা
পরিচালনা — শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী
আলোক শিল্পী — মিঃ ইউসুফ্ মুলজী
শব্দযন্ত্রী — শ্রীলোকেন বসু
সঙ্গীত — শ্রীবিষণচাঁদ বড়াল
ভূমিকায়—শিশির, বিশ্বনাথ, তারাকুমার, অয়স্কান্ত বক্সী, শীতল, মনোরঞ্জন, অহীন্দ্র, শৈলেন, সত্যেন, অমলেন্দু, শান্তশীল, প্রভাত, রমেশ, ক্ষীরোদ, মনোরমা, কঙ্কা, রাণী, প্রভা।

১৯৩৪ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হইল।

২৬। **ঋণমুক্তি** — কালী ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ — ৭-৪-৩৪
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী
আলোক শিল্পী — শ্রীননী সান্যাল
ভূমিকায়—তিনকড়ি চক্রবর্তী, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, রাধারাণী ও শিশুবালা।

২৭। **এক্সকিউজ-মি-স্যার★** — নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ — ৩০-৩-৩৪
চিত্রগৃহ — চিত্রা
কাহিনী ও পরিচালনা : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী — মিঃ ইউসুফ্ মুলজী
শব্দযন্ত্রী — শ্রীমুকুল বসু
ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অহিভূষণ সান্যাল, চানী দত্ত, ললিত মিত্র, শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী মলিনা।

২৮। **কেরাণী জীবনী★** — শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথমারম্ভ — ১৯৩৪

২৯। **কুহু-কে-কা★** — শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথমারম্ভ — ১৯৩৪ সাল

৩০। **চাঁদসদাগর** — শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ — ১৭-৩-৩৪
চিত্রগৃহ — ক্রাউন সিনেমা
কাহিনী — শ্রীমন্মথ রায়
পরিচালনা — শ্রীপ্রফুল্ল রায়
আলোক শিল্পী — শ্রীবিভূতি দাস
ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, শেফালিকা, দেববালা, পদ্মাবতী ও নীহারবালা।

৩১। **তরুণী** — কালী ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ — ৮-৯-৩৪
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
প্রযোজনা — শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কথা ও কাহিনী — শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়
আলোক শিল্পী — শ্রীননী সান্যাল
শব্দযন্ত্রী — শ্রীমধু শীল
ভূমিকায়—ভূমেন, জীবন, ললিত, রাধিকানন্দ, তিনকড়ি, জ্যোৎস্না, ডলি, রাণীবালা, পদ্মা ও হরিসুন্দরী।

৩২। **তুলসীদাস** — কালী ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ — ১-১২-৩৪
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
কাহিনী — শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালনা — শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী — শ্রীসুরেশ দাস
সঙ্গীত — শ্রীনিতাই মতিলাল

কয়েকখানি আগামী সুচিত্র-
এম.পি.প্রোডাকসন্সের
স্বপ্ন ও সাধনা
পরিচালনায় •
শ্রেঃ সন্ধ্যা, জহর, নরেশ মিত্র
রেবা • পরেশ ব্যানার্জি
নিউ সেঞ্চুরীর
রায় চৌধুরী
কাহিনী ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ
শ্রেঃ অহীন্দ্র, দেবী, প্রমীলা, পূর্ণিমা
নিউ থিয়েটার্সের
অঞ্জনগড়
সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' অবলম্বনে
পরিচালনা: বিমল রায়
শ্রেঃ সুনন্দা, দেবী মুখার্জি
পি.এন.গাঙ্গুলী প্রোডাকসন্সের
পরভৃতিকা
কাহিনী •• সীতা দেবী
পরিচালনা-বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
শ্রেঃ সরযু, নীলিমা, শিবশঙ্কর
আই.এন.এ.পিকচার্সের
স্বয়ংসিদ্ধা
পরিচালনা: নরেশ মিত্র
কাহিনী: মনিলাল বন্দ্যো
শ্রেঃ নরেশ মিত্র, শিবশঙ্কর,
অমর বসু, দীপ্তি, উমা, বন্দনা
ডি লুক্স পিকচার্সের
ললিতা সখী
পরিচালনা-নির্মল তালুকদার •
সঙ্গীত • রবীন চট্টোপাধ্যায় •
শ্রেঃ অনুভা, পূর্ণিমা, মিহির,
নরেশ মিত্র, কমল,

ভূমিকায়—জহর, জয়নারায়ণ, নগেন্দ্র বালা, রাণীবালা, শান্তবালা।

৩৩। **দক্ষযজ্ঞ** রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ ১৩-১০-৩৪

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী মিঃ ডি, জি, গুণে

ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, চন্দ্রাবতী ও বীণা।

৩৪। **ধ্রুব** পায়োনীয়ার ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ ১-১-৩৪

চিত্রগৃহ ক্রাউন সিনেমা

কাহিনী গিরিশ ঘোষ

পরিচালনা শ্রীসত্যেন দে

আলোক শিল্পী মিঃ টি, মার্কনী

সঙ্গীত কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকায়—নজরুল ইসলাম, জয়নারায়ণ, মাষ্টার প্রবোধ, শ্রীমতী আঙ্গুর ও মিস সরিফা।

৩৫। **মা** পায়োনীয়ার ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ ১২-১০-৩৪

চিত্রগৃহ ছায়া

কাহিনী শ্রীমতি অনুরূপা দেবী

প্রযোজনা ও পরিচালনা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ

আলোক শিল্পী মিঃ পল, ব্রিকে

শব্দযন্ত্রী মিঃ ব্রাড্‌বার্ণ

সঙ্গীত শ্রীবিনয় কুমার গোস্বামী

ভূমিকায়—সাহু গোস্বামী, ভাস্কর দেব, বিনয় গোস্বামী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, পদ্মাবতী, কানন দেবী, মনোরমা, সুরবালা, রেণুবালা।

৩৬। **মণিকাঞ্চন** (প্রথম পর্ব)★ কালী ফিল্মস

প্রথম আরম্ভ ৮-৯-৩৪

চিত্রগৃহ রূপবাণী

চিত্রনাট্য শ্রীতুলসী লাহিড়ী

পরিচালনা শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী শ্রীননী সান্যাল

শব্দযন্ত্রী শ্রীমধু শীল

ভূমিমায়—জয়নারায়ণ, তুলসী, ধীরেন, ভুজঙ্গ, সত্যধন, সতীশ, হারাধন, প্রভাবতী, বীণাপাণি।

৩৭। **মহুয়া** নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ ৩১-৮-৩৪

চিত্রগৃহ চিত্রা

কথা ও কাহিনী শ্রীমন্মথ রায়

পরিচালক শ্রীহীরেন বসু

আলোক শিল্পী শ্রীসুবোধ গাঙ্গুলী

শব্দযন্ত্রী শ্রীলোকেন বসু ও শ্রীবাণী দত্ত

সঙ্গীত শ্রীবিষণচাঁদ বড়াল

ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, ভূমেন, যোকেন, অহী, অনুপম, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী ও শ্রীমতী মলিনা।
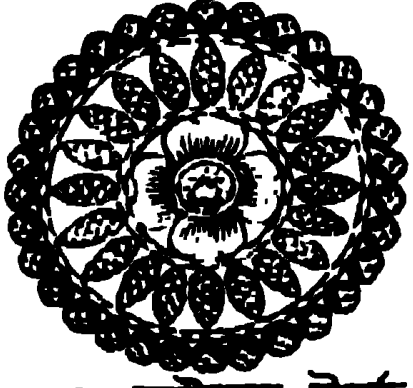
...ঘন কালো কেশ"

কবি-বর্ণিত নীপবনে এসে আর যা-যা চাই, তার সব কিছু যোগাতে আমরা অক্ষম। কিন্তু একটা দিকের ভার আমরা নিতে পারি। হিমকানন কেশ-তৈলের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে কেশ সমৃদ্ধি-শালী ও সুন্দর করা, মাথায় সুরভিত স্নিগ্ধতা এনে দেয়া।

আয়ুর্ব্বেদীয় সুরভিত কেশ তৈল

এইচ, এল, এস এণ্ড কোঃ লিঃ, ৭/১, আনন্দ লেন, কলিকাতা।

৩৫। **মাসতুত ভাই★** নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ ২৬-৫-৩৪
চিত্রগৃহ চিত্রা
কাহিনী ও পরিচালনা : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ভূমিকায়—ডি, জি, নির্ম্মল, বোকেন ও মলিনা।

৩৬। **রূপলেখা** নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ ১৪-৪-৩৪
চিত্রগৃহ চিত্রা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া
আলোক শিল্পী মিঃ ইউসুফ মুলজী
শব্দযন্ত্রী শ্রীলোকেন বসু
সঙ্গীত শ্রীরাইচাঁদ বড়াল
ভূমিকায়—বড়ুয়া, অহীন্দ্র, বিশ্বনাথ, মনোরঞ্জন ও উমাশশী।

৩৭। **রাজনটী বসন্ত সেনা** রাধা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ ২৯-১২-৩৪
চিত্রগৃহ চিত্রা
কাহিনী ও পরিচালনা শ্রীচারু রায়
আলোক শিল্পী মিঃ ওয়াশীকার
শব্দযন্ত্রী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল
ভূমিকায়—ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবি রায়, ফণী বর্ম্মা, বীণাদেবী।

৩৮। **শচীদুলাল** রাধা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ ১৮-৮-৩৪
চিত্রগৃহ কর্ণওয়ালিস সিনেমা
আলোক শিল্পী : মিঃ ডি, জি, গুণে ; মিঃ ওয়াশীকার
শব্দযন্ত্রী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল
ভূমিকায়—তুলসী, রবি, মৃণাল, পূর্ণ, কুমার, রাণী, পূর্ণিমা।

৩৯। **শুভব্রহ্মস্পর্শ্য★** শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ ২৯-১২-৩৪
চিত্রগৃহ ছায়া
কাহিনী শ্রীঅখিল নিয়োগী
প্রয়োগ শিল্পী শ্রীমন্মথ রায়
আলোক শিল্পী শ্রীবিভূতি দাস
ভূমিকায়—চিত্তরঞ্জন, জহর, ইন্দু, আশু ও শ্রীমতি ডলি।

১৯৩৫ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হইল।

৪০। **অবশেষে★** নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ ২৪-৮-৩৫
চিত্রগৃহ চিত্রা
কাহিনী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস
ভূমিকায়—অমর মল্লিক, প্রমথেশ বড়ুয়া, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও শ্রীমতী মলিনা দেবী।

৪১। **কণ্ঠহার** রাধা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ ২১-১২-৩৫
চিত্রগৃহ রূপবাণী
কাহিনী শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী মিঃ যশোবন্ত ওয়াশীকর
ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ভূমেন, ধীরাজ, জহর, মৃণাল, পদ্মাবতী, কানন দেবী।

৪২। **খাসদখল★** সোনোরে পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ ২৭-১২-৩৫
চিত্রগৃহ ছায়া
কাহিনী অমৃতলাল বসু
পরিচালনা শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত
আলোক শিল্পী শ্রীচরু ঘোষ
শব্দযন্ত্রী শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায়
ভূমিকায়—রমেশ, ইন্দু, যোগেশ, শৈলেন, পদ্মাবতী ও রেণুকা রায়।

৪৩। **দেবদাসী** পায়োনীয়ার ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ ২২-৬-৩৫
চিত্রগৃহ ছায়া

কাহিনী — শ্রীনলিনী চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ
আলোক শিল্পী — মিঃ মায়ার
শব্দযন্ত্রী — মিঃ ব্রাডবার্ণ
ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ভানু, ভাস্কর, ইন্দু, বিনয়, শান্তি, পদ্মা।

৪৪। **দেবদাস** — নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ — ৩০-৩-৩৫
চিত্রগৃহ — চিত্রা
কাহিনী — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া
আলোক শিল্পী — শ্রীনীতিন বসু
শব্দযন্ত্রী — শ্রীলোকেন বসু
সঙ্গীত — শ্রীরাইচাঁদ বড়াল
ভূমিকায়—বড়ুয়া, অমর, মনোরঞ্জন, দীনেশ, শৈলেন, অহি, কৃষ্ণচন্দ্র, যমুনা, চন্দ্রাবতী।

৪৫। **দিগদারী★** — কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ — ২৮-৯-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী

৪৬। **পায়ের ধুলা** — কালী ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ — ২৮-৯-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী

৪৭। **পাতালপুরী**
প্রথম আরম্ভ — ২৩-৩-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
কাহিনী ও চিত্রনাট্য — শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী — শ্রীননী সান্যাল
শব্দযন্ত্রী — শ্রীজগদীশ বসু
ভূমিকায়—তিনকড়ি, জীবন, শিশুবালা, মায়া মুখার্জি।

৪৮। **ফ্যানটম অফ ক্যালকাটা** — ম্যাডান
প্রথম আরম্ভ — ৬-৭-৩৫
চিত্রগৃহ — কর্ণওয়ালিস সিনেমা
কাহিনী ও পরিচালনা — শ্রীআনন্দমোহন রায়
আলোক শিল্পী — মিঃ সিং ; ও মিঃ ইরাণী
ভূমিকায়—আনন্দ, প্রফুল্ল, সন্তোষ, শ্রীমতী জনা ও শ্রীমতী পারুল।

৪৯। **বিদ্যাসুন্দর** — কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ — ২-১১-৩৫
চিত্রগৃহ — উত্তরা
কাহিনী ও কথা — শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়
আলোক শিল্পী — শ্রীসুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী — শ্রীজগদীশ বসু
সঙ্গীত — শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
ভূমিকায়—রণজিৎ, রাধিকানন্দ, ললিত, রাণীবালা, নীহারবালা।

৫০। **বিদ্রোহী** — ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ — ৩-৮-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
কথা — শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গো
আলোক শিল্পী — শ্রীপ্রবোধ দাস
শব্দযন্ত্রী — মিঃ সি, এস, নিগম
সঙ্গীত — শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীহিমাংশু দত্ত
ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ভূমেন, ললিত, বাণা, সরোজ, চিত্তরঞ্জন, জ্যোৎস্না, ডলি, পূর্ণিমা, ইন্দুবালা, অনুপম ঘটক ও শচীনদেব বর্ম্মণ।

৫১। **বাসব দত্তা** — কেশরী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ — ১৩-৪-৩৫
চিত্রগৃহ — ছায়া

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত
আলোক শিল্পী — শ্রীধীরেন দে
শব্দযন্ত্রী — জে, ডি, ইরাণী ; কে, ডি, পাণ্ডে ; ও এস, পি, শর্মা
সঙ্গীত — শ্রীনিতাই মতিলাল
ভূমিকায়—ধীরাজ, রবি, সত্যেন, কানন দেবী.

৫২। **বিরহ** — কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ — ১৮-৫-৩৫
চিত্রগৃহ — ক্রাউন সিনেমা
কাহিনী — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ভূমিকায়—তিনকড়ি, শৈলেন, তুলসী, শিশুবালা, ডলি দত্ত ও রাণীবালা।

৫৩। **ভাগ্যচক্র** — নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ — ৩-১০-৩৫
চিত্রগৃহ — চিত্রা
চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও আলোক শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু
শব্দযন্ত্রী — শ্রীমুকুল বসু
সঙ্গীত — শ্রীরাইচাঁদ বড়াল
ভূমিকায়—বিশ্বনাথ, অমর, পাহাড়ী, দুর্গাদাস, ইন্দু, শ্যাম, বোকেন, অহি, কৃষ্ণচন্দ্র, নিভাননী, উমাশশী।

৫৪। **মানময়ী গার্লস স্কুল** — রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ — ১১-৫-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
কাহিনী — রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী — মিঃ ডি, জি, গুণে
শব্দযন্ত্রী — শ্রীহৃষীকেশ রক্ষিত
সঙ্গীত—শ্রীঅনাথ বসু, শ্রীমৃণাল ঘোষ, ও শ্রীকুমার মিত্র
ভূমিকায়—তুলসী, জহর, মৃণাল, কুমার, জানকী, রাধারাণী, কানন দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা।

৫৫। **মন্ত্রশক্তি** — পপুলার পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ — ২১-৮-৩৫
চিত্রগৃহ — উত্তরা
কাহিনী — শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
পরিচালনা — শ্রীসতু সেন
আলোক শিল্পী — শ্রীসুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী — শ্রীমধু শীল
ভূমিকায়—নির্মলেন্দু, মনোরঞ্জন, রতীন, জহর, কৃষ্ণধন, শান্তি, চারুবালা, তারকবালা, রাজলক্ষ্মী, হরিমতি, কমলা, ঝরিয়া।

৫৬। **মণিকাঞ্চন** (দ্বিতীয় পর্ব)★ — কালী ফিল্ম

প্রথমারম্ভ — ২-১১-৩৫
চিত্রগৃহ — উত্তরা
কাহিনী ও পরিচালনা — শ্রীতুলসী লাহিড়ী
আলোক শিল্পী — শ্রীননী সান্যাল
শব্দযন্ত্রী — শ্রীমধু শীল
ভূমিকায়—তুলসী, রাণীবালা, শিশুবালা।

৫৭। **রাতকাণা**★ — ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ — ৩-৮-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপবাণী
কাহিনী — নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা ও আলোক শিল্পী — শ্রীযতীন দাস
শব্দযন্ত্রী — শ্রীজ্যোতিষ সিংহ
ভূমিকায়—রঞ্জিত, কেষ্ট, সুহাস, দুনিয়াবালা, ইন্দুবালা।

৫৮। **শেষপত্র**★ — এভারগ্রীণ পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ — ১৭-৮-৩৫
চিত্রগৃহ — দীপালী

৫৯। **স্বয়ম্বরা**★ — এভারগ্রীণ পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ — ১৪-১২-৩৫
চিত্রগৃহ — রূপ-কথা
কাহিনী — শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস

পরিচালনা — শ্রীকে, ভূষণ
আলোক শিল্পী — শ্রীদেবী ঘোষ
ভূমিকায়—ললিত, ভূপেন, জীবন, জনা, নমিতা, পুলিন।

৬০। **সত্য পথে** — ম্যাডান
প্রথম আরম্ভ — ২-১-৩৫
চিত্রগৃহ — কর্ণওয়ালিস সিনেমা
কাহিনী ও পরিচালনা — শ্রীঅমর চৌধুরী
আলোক শিল্পী : মিঃ মার্কনী ; মিঃ ইরানী, মিঃ সিং
ভূমিকায়—অমর, ধীরাজ, কার্তিক, ডলি, কিরণ, চুণীবালা।

[বাংলা ছায়াছবির কোন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস আজ অবধিও রচিত হয়নি। দেশের সুধীজনের দৃষ্টি আজও এদিকে পড়েনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—চলচ্চিত্র শিল্পকে নিয়ে নাড়া চাড়া করে হয়ত বাজে সময় নষ্ট করতে চান না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, একদিন তাঁদের টনক নড়বে। তাই তাঁদের জন্য কিছু মাল মসলা জড়ো করে রাখবার জন্যই রূপ-মঞ্চ চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি সংগ্রহ করবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে। ইতিপূর্বে শিল্পীদের প্রথম প্রকাশের কথা আমরা উল্লেখ করছি। বর্তমান সংখ্যা থেকে বাংলা সবাক ছবির প্রথম প্রকাশের দিনগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হ'লো। রূপ-মঞ্চের এই প্রচেষ্টায় রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি শ্রীমান স্নেহেন্দ্র গুপ্তকে এ বিষয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন—চিত্রজগতের সেই কর্মী-বন্ধুদের আমি রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভুল ত্রুটি অনেক কিছুই হয়ত রয়ে গেছে—থেকে যাওয়াও স্বাভাবিক। তাই, পাঠক সাধারণ এবং চিত্রজগতের বিভিন্ন বন্ধুদের আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—যদি কারোর চোখে কোন ভুল বেরিয়ে পড়ে, আমাদের দয়া জানিয়ে সংশোধন করে নেবার সুযোগ দেবেন। যদি এখন থেকেই ভুল সংশোধিত না হয়—তাহ'লে হয়ত ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসের পাতায় এই ভুল স্থায়ী ভাবেই থেকে যাবে। তাই এ বিষয়ে যে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে—সেকথা যেন সকলে অনুধাবন করেন। এই তালিকার ভিতর যে সব শিল্পী আজ আর বেঁচে নেই—তালিকা শেষ হ'লে তাঁদের নাম একসংগে দেওয়া হবে।

এই প্রসংগে আমরা বলে রাখতে চাই, রূপ-মঞ্চে শিল্পীদের জীবনী ও চিত্রজগত সম্পর্কে যে সব তথ্য এবং আলোচনা প্রকাশিত হয়—রূপ-মঞ্চের অনুমতি ছাড়া—সেগুলি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পুনঃপ্রকাশ ও মুদ্রণ করতে পারবেন না। এর স্বত্ব একমাত্র রূপ-মঞ্চেরই। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি এগুলি প্রয়োজনে আসে, তাঁদের সে প্রয়োজন মেটাতে—রূপ-মঞ্চ সব সময়ই প্রস্তুত থাকবে।]

(সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ)

হৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী (নওগাঁ, বাঙ্গালী পট্টি, আসাম) আজাদ হিন্দ ফৌজের 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা' এবং নেতাজীর "দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে" এই গান দু'খানি আমি আর আমার বোন মিলে নিজের সুরে সাধারণের জন্য রেকর্ড করতে চাই। সেজন্য আমাকে প্রথম কি করতে হবে এবং কার কাছে আবেদন জানাতে হবে ?

●● এই গানগুলি একাধিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠান দ্বারা রেকর্ডে রূপায়িত হ'য়েছে। এই জাতীয় সংগীতগুলি সম্পর্কে আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত অভিমত আছে, তা হয়ত অনেকের কাছে ভুলও হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস, জাতীয় সংগীতগুলির সুর একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন 'বন্দেমাতরম' বা 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যায়' বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বেজে উঠতে পারে কিন্তু সুর একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সংগীতগুলির সুর সংযোজনার পূর্বে বরং খ্যাতনামা সংগীতবিদগণ একসংগে পরামর্শ করে নিতে পারেন। আপনি শ্রীযুক্ত অমিয় নাথ বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজ কার্যালয়, গিনি হাউস, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় পত্রালাপ করে জানতে পারেন।

অনিল কুমার চন্দ্র (ক্যানিং হোষ্টেল, স্কট লেন, কলিকাতা)

●● আপনার অনুরোধ রাখতে পারলুম না—ক্ষমা করবেন।

জি, নবী চৌধুরী (টী হাউস, সৈয়দপুর, রংপুর) ডিলারের কাছ থেকে অগ্রহায়ণের 'রূপ-মঞ্চ' কিনে পড়ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো ছোট একটী আবেদন—'অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই।' দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, আমি বহুবার চেষ্টা করেছিলাম সিনেমায় ঢোকবার জন্য কিন্তু যখনই কোন চিত্রজগতের প্রযোজক বা পরিচালকের সংগে দেখা করেছি, তখনই বিফল মনোরথে ফিরে আসতে হ'য়েছে। তার কারণ শুধু এই যে, আমি 'মুসলমান'। সব বিষয়েই সকলের সংগে মেলে কিন্তু মেলেনা তখনই, যখন আমার উপরোক্ত নাম তাঁরা জানতে পারেন। তাই, এতদিন চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিজ্ঞাপন পড়ে বুকে নূতন আশা পেলাম। তাই ৫০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করে দিতে পারবো বলেই আমি বিস্তারীত বিবরণের জন্য আপনার নিকট আবেদন কচ্ছি। পর্দায় অভিনয় করার মত সমস্ত জিনিষই আমার আছে, শুধু চেহারাটি একটু পাতলা এই যা দোষ। বাংলার বহু যায়গায় এ্যামেচার অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করেছি। তাই আশা করি আপনি আমায় সব দিক থেকে সাহায্য করবেন।
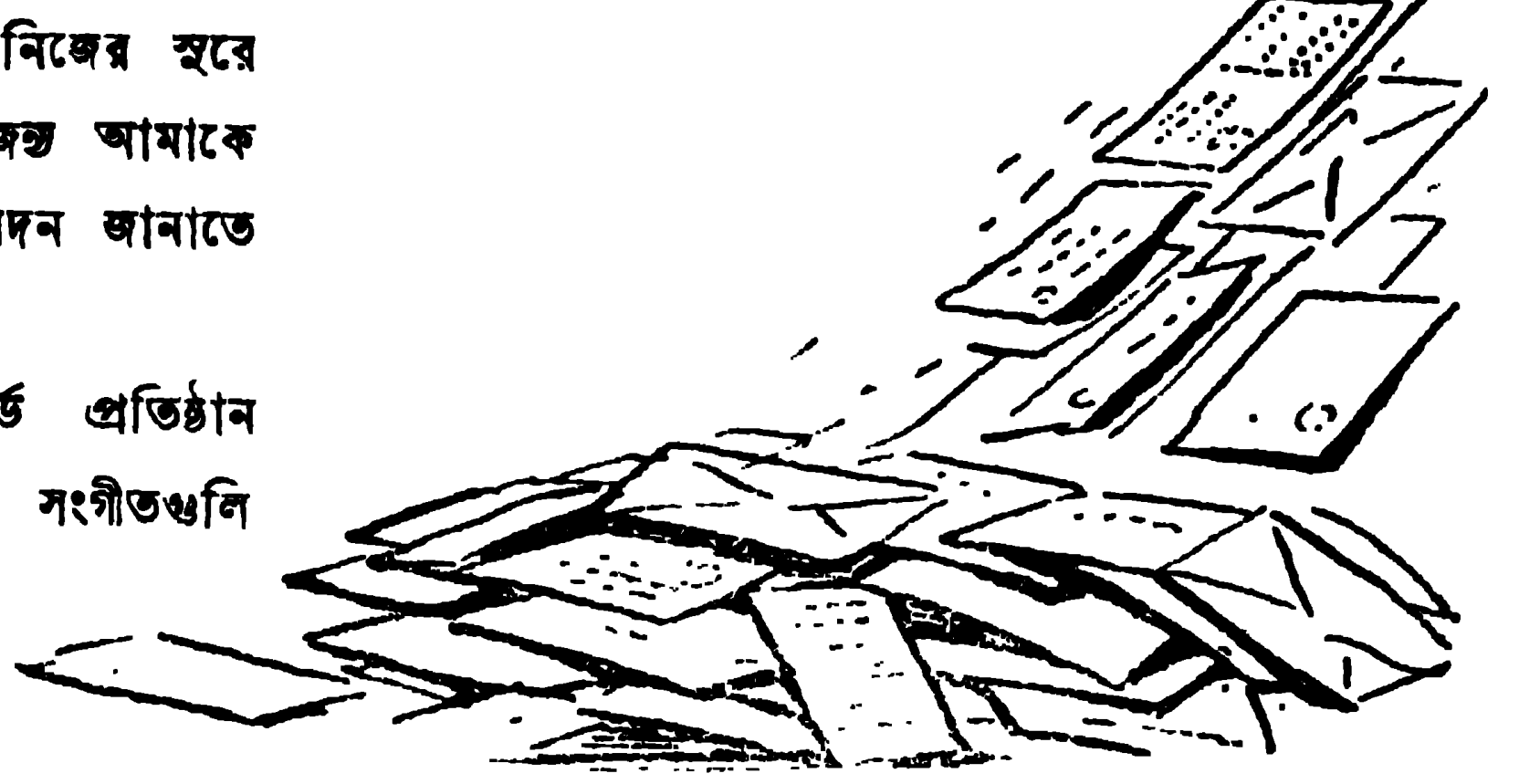
●● আপনি প্রথমেই একটা ভুল করেছেন—'অভিনেতা-অভিনেত্রী' চাই বলে যে বিজ্ঞাপন দেখে আপনি আশান্বিত হ'য়ে উঠেছেন—সেজন্য আবেদন আমার কাছে করলে চলবে না। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছেই করতে হবে। আমাদের এ ব্যাপারে কোন হাত নেই। কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে আমরা কোন উমেদারী করতে পারিনা—সমস্ত নতুনদের পক্ষেই চিত্র জগতের পথ যাতে সুগম হ'য়ে ওঠে, আমাদের প্রচেষ্টা সেদিকেই নিয়োজিত হবে। শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তিতে অভিনেতা রূপে গ্রহণ করবার যাঁরা লোভ দেখান, তাঁদের সততায় আমার কিছুটা সন্দেহ আছে। আপনার চিঠি পড়ে একটা বিষয়ে খুবই ব্যথিত হ'য়েছি। একথা আমরা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, চিত্র জগতে প্রবেশ করতে যে

বাধাবিঘ্ন রয়েছে—তা হিন্দু এবং মুসলমান সকলের পক্ষেই সমান। এবং যতদিন কোন নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে না উঠবে ততদিন এই বাধাবিঘ্ন সমান ভাবেই থাকবে।

সুধীর কুমার দাস (ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা) (১) পদ্মা দেবীকে অনেকদিন যাবৎ পর্দায় দেখিনা কেন? তিনি কি অবসর গ্রহণ করলেন নাকি? (২) বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্সের 'জাগরণ' এবং 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই বই দুটীর কতদূর কী হলো? (৩) পরিচালক হিসাবে হেমচন্দ্র চন্দ্র এবং সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় এই দুজনের মধ্যে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?

●● (১) আগামী কয়েকখানি চিত্রে তাঁকে দেখতে পাবেন। তিনি চিত্রজগত থেকে বিদায় নেননি। (২) 'জাগরণ'ই সম্ভবতঃ 'সবার উপরে মানুষ সত্য' নাম নিয়ে দেখা দিতে চেয়েছিল। বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্সের কর্তৃপক্ষ 'সবার উপরে মানুষ সত্য' রূপায়িত করতে যেয়ে প্রকৃত সত্যকেই হয়ত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। মানুষই যেখানে সত্য, সেখানে তার ছায়া 'সব ঝুটা হ্যায়' নিয়ে কেনই বা মাতামাতি করবেন! (৩) হেমচন্দ্র প্রবীণ—এক শ্রেণীর দর্শকদের কাছে তাঁর আবেদনও হয়ত রয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হেমচন্দ্রের পরিচালনায় আমি তৃপ্ত হ'তে পারিনি। সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় নবীন—নবীনের সম্ভাব্য আমায় মুগ্ধ করেছে। তাঁর সম্পর্কে এখনও কোন স্থির ধারণা গড়ে না উঠলেও, তাঁকে বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করছি।

হেমন্ত কুমার দাশ (শালিখা, হাওড়া) কে, এল, সাইগলের মৃত্যু সংবাদ শুনে বাস্তবিকই মর্মাহত হলুম। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে চিত্র জগতের যে ক্ষতি হ'লো তা সত্যিই অপূরণীয়। আমি একজন নগণ্য দর্শক হিসাবে তাঁর প্রতিভার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

●● শিল্পী অমর। তিনি তাঁর গুণগ্রাহীদের মাঝেই বেঁচে থাকবেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী (চুঁচুড়া) অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত কানে এলো, চিত্রজগতের জনপ্রিয় শিল্পী সায়গলের মৃত্যু হ'য়েছে। এ পৃথিবীতে কেউ অমর হ'য়ে থাকবে না—তাই তিনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে সায়গল একদিন আমাদের মাঝে এসেছিলেন আবার তাঁরই ডাকে তাঁরই কাছে চলে গেলেন। শিল্পী আজ আমাদের মাঝে নেই—কিন্তু তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর আজও আমাদের কানে বাজে—তাঁর অভিনয় আমরা ভুলতে পারবোনা—তিনি এরই মাঝে আমাদের কাছে বেঁচে থাকবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শিল্পীর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

●● সমস্ত দর্শক হৃদয়ই আজ সায়গলের বিরহ ব্যথায় কাতর—সায়গলের জনপ্রিয়তা এখানেই। দেশের সমস্ত দর্শক-মন জুড়ে যিনি রয়েছেন—মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শের এমন শক্তি নেই যে, তাঁকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে।

মহঃ নাজির আলি মিয়া (ব্রাঞ্চ হুইলার হোষ্টেল, বহরমপুর) হিন্দি ও উর্দু ছায়াচিত্রে প্রায়ই মোসলেম অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের এই বাংলা চিত্র জগতের মধ্যে কি কোন মোসলেম অভিনেত্রী নাই। দু' একটী বাংলা চিত্রে ছোট খাটো অভিনয়ের মধ্যে দু'একজন মোসলেম অভিনেতাকে দেখেছি বলে মনে হয়, তাহারা কি আছেন?

●● আজকাল বাঙ্গালী মুসলমান বন্ধুদের চিত্র জগতের প্রতি আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। কয়েকজন প্রযোজকও এসে দাঁড়িয়েছেন। ভবিষ্যতে হয়ত বহু মুসলমান অভিনেতা অভিনেত্রী দেখতে পাবেন। 'তপোভঙ্গ' চিত্রের নবাগতা অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী সম্ভবতঃ মুসলমান। কিরণ কুমার নামে একজন নবাগত তরুণ মুসলমান অভিনেতাকে দেখতে পেয়েছেন 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রে। এছাড়া আরো আছেন

কয়েকজন। ইতিপূর্বেও তাঁদের হয়ত দেখেছেন—তবে খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান শিল্পী বাংলা ছায়াজগতে নেই বল্লেই চলে।

এ, এইচ সালেহউদ্দীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) বিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা কুন্দলাল সায়গলের মৃত্যুতে অত্যাধিক মর্মাহত হ'য়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে সংগীতের প্রতি আমার বেশী অনুরাগ থাকায় অভিনেতা সায়গল অপেক্ষা গায়ক সম্রাট সায়গলের অভাবই বেশী বোধ করছি। কণ্ঠ মাধুর্যে কম চিত্রাভিনেতাই তাঁর সাথে তুলনীয়। আমাদের শিল্পীরা এখনও আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আসন দখল করতে পারেন নি, তাই শিল্পীদের বিদায়ের খবরও খবরের কাগজের এক কোন হ'তে আবিষ্কার করতে হ'য়েছে। মরণের ওপারে আত্মা তার শক্তি ও গুণ নিয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করে—এ আমার বিশ্বাস, তাই তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি। শিল্পীর কামনা—তাঁর শিল্প যাতে বেঁচে থাকে—তাই হয়ত শিল্পীর বিদেহী আত্মা আমাদের উদ্দেশ্য করে বলছে। "আমারে ভুলে যেও, মনে রেখো মোর গান।"

●● শুধু আপনি নন, সকলেই স্বীকার করবেন—সায়গলের কণ্ঠ ছিল অতুলনীয়। সমাজ এবং জাতীয় জীবনে চিত্র ও নাট্য শিল্প এবং শিল্পীদের স্থান আজ অবধিও স্বীকৃত হয়নি—সত্যি এজন্য দুঃখ হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে থাকাতে জাতি তার নিজের কথাই ভুলে গেছে—তাই এ অবহেলায় জাতিকেও বেশী দোষী করতে পারি না। জোয়াল ফেলে যেদিন মুক্ত জাতি উন্মুক্ত দেশের বুকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবে—সেদিন শিল্প এবং শিল্পীদের সমস্ত দাবীই জাতি মেনে নেবে। সেই আশায় আজকের সমস্ত অবহেলা আমাদের সহ্য করে যেতে হবে। সায়গলের গান কখনও আমরা ভুলতে পারবো না—তাঁরই মাঝে সায়গল বেঁচে থাকবেন।

রমেশ বিশ্বাস (হাজরা রোড, কলিকাতা) (১) জগন্ময় মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই তিন জনের ভিতর কণ্ঠস্বর কার বেশী মধুর এবং সবচেয়ে কে ভাল সুর দেন পর পর সাজিয়ে দিন না। (২)

পরভৃতিকায় শ্রীমতী অমিতা

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কোথায় আছেন তাঁর কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা কি। তিনি বর্তমানে সুর দেন কিনা?

●● (১) কণ্ঠ মাধুর্যে এঁরা তিনজনেই জনসাধারণের কাছে সমাদর পেয়েছেন। সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠ মাধুর্যের সংগে যে গাম্ভীর্যের রেশ থাকে, ব্যক্তিগত ভাবে তাই এঁদের তিনজনের ভিতর তিনিই আমায় বেশী মুগ্ধ করেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা উদ্দাম উচ্ছল ভাবে ভেসে যেয়ে যখন কানে কানে চুপি চুপি কিছু বলতে চায়—আমি যদি শ্রীরাধিকা হতাম—খাশুড়ী-ননদের গর্জনাকেও উপেক্ষা করে সাড়া দিতাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-মাধুর্যও আমায় কতখানি মুগ্ধ করে, আশা করি এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলতে হবে না। সন্তোষবাবু এবং হেমন্তবাবু যতখানি পাগলা করেন জগন্ময়বাবু ততখানি না করলেও, তাঁর কণ্ঠও কম মুগ্ধ করে না। সুর সংযোজনার কৃতিত্ব সম্পর্কে আমার বিচার শক্তি খুব ধারাল নয়—তাছাড়া পর্দায় এ পর্যন্ত কেবল হেমন্ত বাবুকেই দেখতে পেয়েছি—তাই আর দু'জনের সংগে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত কোন রায় দেওয়া চলে না। (২) শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে পণ্ডিচেরীতে শ্রীশ্রীঅরবিন্দ

আশ্রমে আছেন। আধ্যাত্মিক যে সুর তাঁর কানে বেজেছে—সেই সুরেই তিনি মাতাল হ'য়ে ঘর-বাড়ী ছেড়েছেন। তাই তাঁকে আর এখানকার সুর নিয়ে মাতামাতি করতে দেখা যাবে না। কলকাতা ৩০, সরকার লেনে—তাঁর স্ত্রী, পুত্র, তাঁর পিতা এবং ভাইদের কাছে আছেন।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় (বহু মিত্র লেন, শ্যামবাজার) (১) অহীন্দ্র চৌধুরী কি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন? অবশ্য বিশেষ রজনী বাদে। (২) বাংলার যে সব শিল্পী বম্বেতে আছেন যেমন পাহাড়ী সান্যাল, লীলা দেশাই প্রভৃতি তাঁরা কি আর বাংলা দেশে ফিরে আসবেন না?

●● (১) অহীন্দ্রবাবু বর্ত্তমানে মিনার্ভার সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে এঁদের নূতন নাটক কাশীনাথ-এ অভিনয় করছেন। (২) যে সব বাঙ্গালী শিল্পী বম্বে গিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে প্রীতি মজুমদার, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল এঁরা ফিরে এসেছেন। বিপিন গুপ্ত ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেছেন। পাহাড়ী সান্যাল এম, পি, প্রডাকসন্সের সংগে স্থায়ীভাবে চুক্তিবদ্ধ হবেন বলে শুনেছি। তবে বোসার্ট প্রডাকসন্সের আগামী চিত্র 'প্রিয়তমা'য় বর্ত্তমানে তিনি অভিনয় করছেন। লীলাদেশাই সম্পর্কে কোন খবর পাইনি।

নিমাই রায় (গরিফা, ২৪-পরগণা) ছবিবাবু আর দেবীবাবুর মধ্যে কে ভাল অভিনয় করেন।

●● নিঃসন্দেহে ছবি বিশ্বাস। দেবীবাবুর ভিতর যে সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছিলাম তা যেন একটু ঝাপসা হ'য়ে উঠছে। দেবীবাবুর কণ্ঠস্বর ছবিবাবুর চেয়েও প্রশংসনীয় একথা স্বীকার করবো। তাই ভবিষ্যতে ছবি বাবুকে ছাড়িয়ে যাবার স্পর্দ্ধাই তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছিলাম—কিন্তু সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর ভূমিকায় দেবীবাবুর ব্যর্থতায় তাঁর প্রতি বেশ কিছুটা সন্দেহ জেগেছে—'পথের দাবী'র ব্যর্থতার মূলে দেবী বাবুর ব্যর্থ অভিনয়ই অন্যতম প্রধান কারণ। সব্যসাচীর মত চরিত্রকে মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন নি।

গৌর চন্দ্র সাহা (কালীচরণ হাউস, ফরিদাবাদ, ঢাকা)

●● যে সব শিল্পীদের ঠিকানা আপনি চেয়েছেন, প্রকাশ করতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

নীলকণ্ঠ দাশগুপ্ত (খড়্গপুর, হিজলী)

(১) পি, আর, প্রডাকসন্সের 'বনফুলের' কী বাংলা সংস্করণ হয় নি? (২) শৈলজানন্দের "শহর থেকে দূরে"র সংগে ডি, এম, পাঞ্চোলীর "শহর সে দূর"-এর কোন সম্বন্ধ আছে কি? (৩) কানন দেবী ও অশোককুমার অভিনীত "চন্দ্রশেখরের" প্রযোজক কী পাইওনিয়ার্স পিকচার্স? অশোক কুমারকে কলিকাতার আর কোন বইতে দেখা যাবে? (৪) পরিচালক নীতিন বসু আর কতদিন বম্বে টকিজে থাকবেন? ওখানে ওদের 'মিলন' ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। নীতিন বাবু কি এর পরেই আবার নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসছেন?

●● (১) না। ( ) না। (৩) হ্যাঁ। (৪) সম্প্রতি নীতিন বাবু নাকি কলকাতায় এসেছেন একখানি ছবি তুলবার জন্য—বিস্তারীত এবং সঠিক খবর এখনও জানতে পারি নি। তবে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' তিনি নিউ থিয়েটার্সের হ'য়ে চিত্র রূপায়িত করবেন। এবং এর চিত্রনাট্যের ভার নিয়েছেন 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীদাস।

মুকুন্দ কান্ত বিশ্বাস (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

বিগত কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার রূপ-মঞ্চে চিত্র সংবাদ ও নানা কথার শিরোনামায় দেখতে পেলাম যে, আপনাদের মতে কানন দেবী পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে "তুমি আর আমি"তে প্রথম অভিনয় করছেন। প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি বাংলা চিত্রে তাঁদের প্রথম অভিনয়ের কথা উল্লেখ করছেন। কিন্তু পুনরায় ভাল করে পড়ে দেখলাম তেমন নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ নাই। কানন দেবীকে কী ইতিপূর্বে "কৃষ্ণলীলা"য় পরেশ ব্যানার্জির সংগে দেখতে পাই নি?

●● সংবাদ পরিবেশকের এই ত্রুটীর জন্য দুঃখিত। বাংলা ছবির কথাই তিনি মনে করেছিলেন—তবে তাঁর সে কথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। এই ত্রুটী ধরিয়ে দেবার জন্যে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দিলীপ কুমার দত্ত (বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) আমি রূপ-মঞ্চের একজন বিশেষ ভক্ত, তা হ'লেও রূপ মঞ্চের বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে—যা না জানিয়ে পারলাম না। এই অভিযোগ জানাতে যেয়ে যদি কোন রকম রূঢ় আচরণ করে ফেলি সেজন্য আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলাম। ষ্টুডিও সংবাদ যেটি প্রতি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়, সেটি সত্যি দিন দিন যেন কেমন একঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে। আর তা'ছাড়া এই ষ্টুডিও সংবাদে কেবলমাত্র কলকাতার নিকটবর্তী ষ্টুডিওগুলির সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও ইউরোপের এবং আমেরিকার ষ্টুডিওর কোন সংবাদ দেওয়া হয় না। আমার মনে হয়, এই ষ্টুডিও সংবাদের ভিতর দেশী ও বিদেশী ষ্টুডিওর সংবাদ দিলে বর্তমানের ষ্টুডিও সংবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল হ'তে পারে। বিদেশীয় ষ্টুডিও সম্বন্ধে আমার মত অনেকেরই বিশেষ কোন সংবাদ তেমন জানা নাই। সুতরাং আমাদের মনে যে কৌতুহল জাগে তা আর নিবৃত্ত হয় না। এই ষ্টুডিও সংবাদ পরিবেশন করতে যেয়ে কেবলমাত্র কয়েকটী বই এবং নায়ক নায়িকার তালিকা লিখলেই চলবে না। বর্তমানে যেমন বাংলার ষ্টুডিওগুলির সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই দিলে চলবে।

আর ষ্টুডিও সংবাদের ভিতর ষ্টুডিওর ভিতরকার দৃশ্যের কয়েকটী ছবি যদি দেওয়া হয়, তবে আমার অনুমান রূপ-মঞ্চের এই অংশটী পাঠকদের কাছে আরো বেশী চিত্তাকর্ষক হতে পারে।

(২) জানেন কি এঁদের এই বিভাগটী দেখতে পাই না কেন? (৩) শ্রীমতী যমুনা দেবীর প্রথম বাংলা চিত্র দেবদাস। আপনাদের হৈমন্তিক সংখ্যায় দেখলাম। আমার এক বন্ধুর মত যে, শ্রীমতী যমুনা দেবীর প্রথম বাংলা চিত্র 'মায়া'। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি হয়—কিন্তু তা অমীমাংসিত হয়ে আছে।

উত্তরা-অভিমন্যু চিত্রে শান্তা আপ্তে

(৪) "ফেলে আসা দিনগুলি মোর" ৭নং বাড়ীর কথা-চিত্রের এই গানখানি শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনার অভিমত কি?

●● (১) রূপ-মঞ্চের ভক্ত বলেই রূপ-মঞ্চের সমালোচনা করবার অধিকার থেকে আপনারা বঞ্চিত নন। রূপ-মঞ্চের পরিচালনায় আমরা যারা রয়েছি—তাদের থেকে আপনাদের পৃথক করে দেখতে চাইনা। বরং আপনারা যাঁরা রূপ-মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন, রূপ-মঞ্চের ভুলত্রুটি তাঁদের চোখে পড়াই স্বাভাবিক। এবং এই ভুলত্রুটী সংশোধন করে দেবার অথবা সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করিয়ে দেবার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের এই সতর্কবাণী সব সময়েই আমরা পরম শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করবো। ষ্টুডিও সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে আপনি যে কথার উল্লেখ করেছেন— তা সর্বোতভাবে বিজ্ঞজনোচিত। এই সংবাদ পরিবেশনাকে নানান ভাবে দর্শকদের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এজন্য প্রধানতঃ দায়িত্ব রয়েছে চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির। যেমন মনে করুণ, কোন ছবি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করতে যেয়ে যদি কেবলই লিখতে হয়, "অমুক ছবিতে অমুক অমুকে অভিনয় করছে—

সংবাদ
যাই,
। এই
চিত্র-
কিন্তু
ন। যদি
। হয়ত
অনুমতি
ং বোল
দ এই
প্রতিষ্ঠান
ম করে
ক ব্যয়
এখন

ঘরের খেয়ে বনের মশা তাড়াবার সময়ই বা আমাদের কোথায়? তাছাড়া কাগজের এই আর্থিক ঝুঁকি বহন করবার ক্ষমতা কোথায়? নইলে কোন দৃশ্যপটে উপস্থিত থেকে—সেই দৃশ্যপটের শিল্পী এবং কর্মীদের চিত্রগ্রহণ করে বিস্তারীত চিত্র সংবাদের সংগে প্রকাশ করলে খুবই আকর্ষণীয় হয়। এজন্য চিত্রগ্রহণ এবং ব্লক প্রভৃতি নির্মাণের ব্যয় বহন করে যদি আমরা উপস্থাপিত করি তখন হয়ত কর্তৃপক্ষ খুশী হ'য়ে আমাদের বলতে পারেন, "না বেশ করেছেনত?" "এই বেশ করেছেনত" টুকু ছাড়া আর কিছু তাঁরা ব্যয় করতে নারাজ। তবে আপনাদের কথা দিচ্ছি, রূপ-মঞ্চ যেদিন এই ব্যয়ভার বহন করবার মত সমর্থ হ'য়ে উঠবে, সেদিন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হ'য়ে আমরা থাকবো না। বৈদেশিক চিত্রগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। বাংলা কাগজের সংগে ইংরেজী এবং হিন্দি ছবির মালিকরা কোন ব্যবসায় সম্পর্কই রাখতে রাজী নন। বাঙ্গালী দর্শকেরা যতই ইংরেজী এবং হিন্দি ছবি দেখতে ভীড় করুন না কেন—বাংলা কাগজের কাছে ইংরেজী বা হিন্দি পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা যতই নগণ্য হউক না কেন—ভাবা-গত পার্থক্য কোনদিন তাঁদের কাছ থেকে দূর হবে না। এবিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। (২) এই সংখ্যাতেই আপনার অভিযোগ খণ্ডন করা হ'লো। আশা করি খুশী হবেন। (৩) দেবদাসের পরে মায়া গৃহীত হয়। (৪) হ্যাঁ ও গানখানি হেমন্ত বাবুই গেয়েছেন।

প্রহ্লাদ দাস (নৃত্যশিল্পী, সিঙ্গাপুর) একদিন বলেছিলাম হয়ত মনে পড়বে'—আমি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি। আজ আমি সেই পুণ্য তীর্থে, যেখানে ভারতের গৌরব ভারতের বীর সন্তান নেতাজীর কর্মক্ষেত্র ছিল। এখানকার প্রত্যেক সিঙ্গাপুরবাসী আজও মাথা নত করে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এখানকার সর্বোচ্চ সৌধ "ক্যাথে বিল্ডিং" যার শীরে একদিনের জন্যও গৌরবে উড়েছিল--ভারতের জাতীয় পতাকা। এই বিখ্যাত সৌধেই ছিল নেতাজীর হেড কোয়ার্টার্স, যদিও সাময়িক ভাবে। আজও সেই সৌধ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে—বুকে নিয়ে সেই বীর

সন্তানের পবিত্র স্মৃতি। এই সিঙ্গাপুরেই আই, এন, এর প্রথম কাজ আরম্ভ হয়। ফিরে এলে এখানকার অনেক কথাই জানাতে পারবো। জাভার অবস্থা খুব ভাল নয়, তাই সেখানে যাওয়া হলো না। এখানে একজন জাভানীজ নৃত্য-শিক্ষক পেয়েছি। তাঁর কাছে জাভা, বালির নাচ শিখছি। তিনি আমার কাছ থেকে ভারতীয় নাচ শিখছেন। এখান থেকে সুমাত্রা যাবো। আগামী মাসে কলকাতায় ফিরবো—ফিরে রূপ-মঞ্চের জন্য আমার নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ দিতে পারবো। আপনাদের এবং রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

●● আপনার চিঠি পেলাম। আপনার এতদিন-কার স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে জেনে খুবই খুশী হ'য়েছি। রূপ-মঞ্চ মারফৎ আমাদের সবাকার প্রত্যাভিবাদন গ্রহণ করুণ। আপনার সাধনা সফল হউক---সংগে সংগে সে কামনাও করি।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইউনিয়ন জ্যাক ক্লাব, লণ্ডন) সম্প্রতি এখানে প্যারামাউণ্টের ছবি 'Alan Ladd' অভিনীত 'Calcutta' দেখলাম। মূল ছবি সম্পর্কে বলবার কিছু নেই। ছবিখানা নেহাৎ মন্দ নয়। তবে 'Calcutta' নাম দেখে যারা যাবেন তারা বিশেষ উৎসাহ পাবেন না। কারণ Dum Dum Air-port, Calcutta লেখা একখানা Sign-board, হোটেলের বল' ও জুয়ার আড্ডা, কয়েকখানি গাড়ী—খানিকটা কর্কশ ভাঙ্গা হিন্দি, কতকগুলি সরু গলি আর পাগড়ীধারী ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত 'মালিক' নামধারী (ছবিতে হিন্দি বলে ক্ষেত্র বিশেষে পরিচিত) এই unimpressive ভারতীয় চিত্র। এছাড়া বাকী সব বিলেতী। তবু এই 'Calcutta' ছবি দেখতে গিয়ে আর একটা অতি পরিচিত কথা আবার মনে পড়ে গেল, "ছবি আমাদের কত কাজে লাগে এবং আমাদের দেশীয় প্রযোজকেরা তাকে কতটা কাজে লাগাচ্ছেন। ছবিঘরে পৌনে তিন ঘণ্টা বসেছিলাম। তার মধ্যে দেখলাম মূল ছবি "Calcutta"—popular science এর ছবি যাতে দেখানো হ'লো বিজ্ঞান আমাদের ঘর দোর সাজানয় কত সাহায্য করতে পারে এবং D.D.T.র ম্যালেরিয়া ধ্বংস করবার শক্তি কতখানি। তারপর দেখলাম British Federation Picturesএর 'Malini'। বেলজিয়ামের এই ক্ষুদ্র সহরটীতে সেই আদিম পদ্ধতিতে কাঠের ও তাঁতের কি সুন্দর সুন্দর কাজ করা হয় তাই দেখান হলো। আমাদের দেশেও এসব ছিল এবং তাড়াতাড়ি সভ্য (?) হওয়ার আশায় যদিও অনেক হারিয়েছি, তবু যা আছে তাকেও যদি এতটা 'importance' দিতে পারতাম তাহ'লেও অনেক কাজ হ'তো। তারপর আরো দু'খানা ছবি দেখলাম। একখানা কার্টুন "Birth day of Lalu" আর একখানা comedy, এই সব মোট পৌনে তিন ঘণ্টার মধ্যে। মূল ছবির অকারণ দৈর্ঘ্য কমিয়ে এই সব আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানোর আন্দোলন বহুদিন হ'লো চলছে এবং রূপ-মঞ্চ তার এক প্রধান পাণ্ডা। এবং এই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখা রূপ-মঞ্চের পাঠকদের কর্তব্য বিবেচনায় এই পত্রের অবতারণা। (২১-১২-৪৬)

●● যদিও 'এয়ার-মেইলে' চিঠি পাঠিয়েছেন, তবু চিঠি পেতেও যেমনি দেরী হ'য়েছে—প্রকাশ করতেও বিলম্ব হ'য়ে গেল, সেজন্য ক্ষমা করবেন। আপনারা বিদেশে যে সব রূপ মঞ্চের গুণগ্রাহী পাঠক আছেন এমনি ভাবে ওখানকার প্রদর্শনীগুলির যদি বিবরণ মাঝে মাঝে লিখে পাঠান, এখানকার রূপ-মঞ্চ পাঠকদের কাছে তা খুবই আদৃত হবে বলে মনে করি। এর ভিতর প্রেক্ষাগৃহগুলির নাম, অবস্থান এবং সে সম্পর্কে বিশেষ বিবরণী---টিকিট কাটার ব্যবস্থা - হকাররাও এখানকার মত উৎপাত করে কিনা, গুণ্ডামি কী রকম—প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারীদের ব্যবহার সবকিছু আশা করি বিশদ ভাবে জানাবেন। কার্টুন এবং খণ্ড-চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রূপ-মঞ্চ ভোলেনি—তার পাঠকরাও ভুলতে পারেন না। কিছুদিন পূর্বেও বাংলার কার্টুন-চিত্রের উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিকের সংগে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা চললো। পশুপক্ষীদের জীবন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সমস্যা নিয়ে তাঁকে কয়েকটী কার্টুন-চিত্র গ্রহণ করবার অনুরোধ

জানালুম। সম্প্রতি বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে তিনি একখানি কার্টুন চিত্র শেষ করেছেন।

জনৈক পাঠক (পিটার্স ফিল্ড, ইংল্যাণ্ড) দিন কয়েক হ'লো হৈমন্তিক সংখ্যা রূপ-মঞ্চ পেয়েছি। তাতে দর্শকদের নির্বাচিত শিল্পী ও ছবির নাম প্রকাশিত হ'য়েছে দেখলাম। সত্যি বড় খুশী হয়েছি। আমাদের দেশে একদল প্রযোজক আছেন (তারাই সংখ্যায় বেশী) যাদের প্রধান কাজ হ'লো সর্ববিষয়ে শিল্পীদের বাঁধা দেওয়া। পরিচালক কোন নতুন আদর্শকে রূপ দিতে চাইলে তাঁরা বাঁধা দেবেন। কোনও নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিতে চাইলে তাঁরা অনুমোদন করবেন না। তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে একজন অভিনেত্রীকে নিযুক্ত করবেন অথচ অন্য শিল্পীরা কিছুই পাবে না। ছবির কোথায় গান দেওয়া হবে, কোথায় নাচ থাকবে, কোন কাহিনীকে রূপায়িত করতে হবে সব তাঁরা বলে দেবেন। আর অজুহাত এই যে, তাঁরা নাকি দর্শকদের চাহিদানুযায়ীই এসব করে থাকেন। এই শ্রেণীর প্রযোজকদের আমরা বলতে চাই যে, দর্শকদের নামে তারা যা বলতে চাইছেন, তা তাদের বিকৃত রুচিরই পরিচায়ক। তাদের শিল্প বোধের অভাব এবং সর্বোপরি অর্থ লিপ্সার সাক্ষ্য দেবে। দর্শক সাধারণের নির্বাচনে তাদের রুচীর বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদই দেখতে পেয়েছি। তাই তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

●● এই অভিনন্দন আপনার নিজেরও প্রাপ্য। রূপ-মঞ্চ এবং তাঁর পাঠক সমাজ চিত্রজগতের যে অন্যায় ও হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে—আপনার সুরও তার সংগে মিশে একে শক্তিশালী করে তুলেছে।

শ্যামসুন্দর নাথ (বাগেরহাট পি. সি কলেজ, খুলনা) মলিনা, কানন, চন্দ্রাবতী, সুপ্রভা এদের পর পর সাজিয়ে দিন।

●● চন্দ্রাবতী, মলিনা, কানন, সুপ্রভা।

ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ (প্রতাপাদিত্য রোড, খুলনা) সিনেমায় অভিনয় করবার ইচ্ছা বহুদিন থেকে। কিন্তু সে সুযোগ বহু চেষ্টা করেও আসে না। যোগ্যতা হিসাবে বহুস্থানে অভিনয় করেছি এবং তার বদলে অনেক সুখ্যাতি অর্জন করেছি। আপনার নিকট আমার অনুরোধ যে, কী উপায়ে বা কি করলে সিনেমায় প্রবেশ করতে পারবো সেটা বাতলে দিন।

●● আপনার মত অনেকেরই এই ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু যতদিন কোন নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে না উঠে, এ সমস্যার সমাধান হবে না। এমন কোন নিশ্চিত উপায় নেই যা আমরা আপনাকে বলে দেবো। অনিশ্চিতের মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতেই চেষ্টা করে দেখতে হবে। সত্যই যদি আপনার উপযুক্ততা থাকে, অন্য কোন কাজে যদি কলকাতায় আসেন—কয়েকদিনের জন্য একটু ঘোরাঘুরি করে যেতে পারেন।

পরেশচন্দ্র দেব (চান্দখীরা, শ্রীহট্ট)

●● আপনার প্রশ্নগুলির জন্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে প্রবন্ধাকারে এগুলির উত্তর দেবার ইচ্ছা রইল। যদি ভুলে যাই, দু'তিন মাস বাদে একবার সতর্ক করে দেবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (বালি, হাওড়া)

●● যে জন্য আপনি সাহায্য চেয়েছেন, সত্যি এ বিষয়ে আমাদের হাত নেই। অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন।

কল্যাণী চক্রবর্ত্তী (কুমারটুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) আমার দাদা রূপ-মঞ্চের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। রূপ-মঞ্চের রূপের ফাঁদে দাদা যেন বাঁধা পড়েছে। দাদার স্নেহে রূপ-মঞ্চ ভাগ বসিয়ে আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। দাদা যেন রূপ-মঞ্চকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে। আপনার ওপর কিন্তু দাদার একটুখানি রাগ আছে। আপনি নাকি তার কোন চিঠির উত্তর দেন নি। এমন কি 'reminder' দেওয়া সত্ত্বেও। তবে রূপ-মঞ্চের ওপর দাদার একটুকুও রাগ নেই।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেগম নূর বানুর এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন, 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের প্রযোজক একজন আদর্শবাদী মুসলমান। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি তার আদর্শ কি? বিভক্ত ভারত আদর্শ না অখণ্ড ভারত আদর্শ? আমরা শুনেছি তিনি বিভক্ত ভারত আদর্শেই বিশ্বাসী! এবিষয়ে আলোক সম্পাত করবেন কী? অনেকদিন আগে মৌমাছি রচিত 'শ্রীমতীর স্বপ্ন' নামে একখানি চিত্রের আগমনী ঘোষিত হ'য়েছিল। কিন্তু এখন তো তার কিছু শুনছি না।

●● দাদার এই বাঁধন যাতে ছিন্ন না হয় সেজন্য রূপ-মঞ্চ সব সময়ই সতর্ক থাকবে। এ অপবাদ দেবেন না রূপ-মঞ্চের ঘাড়ে। বরং দাদাদের মারফৎ আপনাদেরও রূপ মঞ্চ কাছে টেনে নেবে। রূপ-মঞ্চের ওপর রাগ না করে আপনার দাদা আমার প্রতি যে রাগান্বিত হ'য়েছেন, এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রূপ-মঞ্চের পরিবেশনায় যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে—তার দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদেরই অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা রূপ-মঞ্চকে আরো সুন্দর এবং নিখুঁত করে তুলতে পারছে না। পাঠক সাধারণের নানান অভিযোগ থেকে রূপ-মঞ্চকে মুক্ত করতে যেয়ে বারবার ব্যর্থতার আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। তাই আপনার দাদার পর আমার কিন্তু একটুকুও রাগ নেই। কারণ, আমি বা আমরা জানি, আমাদের দুর্বলতা শুধরে নিয়ে যেদিন রূপ-মঞ্চকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারবো—সেদিন শুধু আপনার দাদা নন—বাংলার ঘরে ঘরে এমনি যত দাদা রয়েছেন, চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের ভিতর যাঁরা জাতির মহত্তর কল্যাণের বীজ নিহিত আছে বলে মনে করেন—আমাদের আন্তরিকতার পুরস্কার দিতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবেন। সেই শুভদিনের জন্যইত আমরা আজ সবাকার অনাদর দু'হাত দিয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছি। চিঠি পত্রের ভীড় খুব বেশী থাকে বলেই সব চিঠির উত্তর সব সময় দেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না।

'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের প্রযোজকের সংগে ব্যক্তিগত ভাবে আমার আলাপ হ'য়েছে। আমাদের এই আলাপের সময় তার ভিতর কোন সাম্প্রদায়িক উদ্‌গারের পরিচয় পাইনি। একটা কথা সব সময়ই মনে রাখবেন,

এই বিরাট দেশে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রয়োজন রয়েছে। কোন ব্যক্তি হীন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির ভিতর বাঁচতে পারে না। আমাদের পরস্পরের সৎবুদ্ধি আজ লোপ পেয়েছে। আজ এই অন্ধকারের মাঝে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি—হয়ত কোন ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু যেদিন পূর্বের সূর্য সমস্ত অন্ধকার দূর করে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—সেই আলোকের মাঝে নিজেদের লজ্জার কথায় নিজেরাই শিউরে উঠবো। জোর করে কাউকে কাছে টানা যায় না—তাই আজ যারা দূরে সরে থাকতে চান, তাদের দূরেই থাকতে দিন। কিন্তু আমাদের অন্তরের দ্বার সব সময়ই তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই কথা মনে রাখলেই বর্ত্তমানের সমস্ত বিদ্বেষের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারবো। 'শ্রীমতীর স্বপ্ন' ভ্যারাইটী পিকচার্স রূপ দেবেন বলে কথা ছিল কিন্তু ভ্যারাইটী পিকচার্স তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন। তাই শ্রীমতীর স্বপ্ন আর আপাততঃ পর্দায় ধরা দিল না।

এস, আলী মোহাম্মদ (বরিশাল) "বেতারের বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এবং আমিও জানি, আমি এখানে না এসে থাকতে পারি না যে, তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা নাইবা চাইলুম। এবারে পাখী কি বলে শুনুন"—

"বলে সে……গগনতীরে,
পাখী আজ ত কোন্ কথা কয় শুনিস কিরে?"

জীবন-মরণএর সুসংযত অভিনয় এবং তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের অমৃতধারা আজও ভুলতে পারিনি।

অবাঙালী হোয়েও চিরদিন বাঙালীর প্রাণে যে সুন্দর জীবনের মহান আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর অভিনয়, গান, সুরের মধ্য দিয়ে, দ্বিধাহীন চিত্তে বাঙালীদের মানস-মুকুরে তা' উজ্জীবিত থাকবে অনেক দিন।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুত কুন্দনলাল সায়গলের সংগে আমার পরিচয় না থাকলেও আজ একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে, সায়গলের মৃত্যুতে আমার একজন নিকট আত্মীয় হারিয়েছি। আমার জীবনের সেই কিশোরচপল দিন থেকে আজ পর্যন্ত সায়গলকে যে চোখে দেখেছি, তাতে সে হিন্দু, না মুসলিম, না অন্য কিছু ভাবতে পারিনি, তা' ভাববার অবসর হয়তো পাইনি। কারণ, সায়গল অভিনেতা, সুরসাগর, গায়ক। সেতো হিন্দু মুসলমান বিচার করেনি—তাই আজ অকাতরে আমার শ্রদ্ধা তাঁকে জানাতে, প্রাণের গভীরতম কন্দরে এতোটুকুও অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

"দেশের মাটি"র অশোকরূপী সায়গলের সেই কণ্ঠস্বর আজো ভুলতে পারিনি :—

"ছায়া ঘেরা ঐ পল্লী ডাকিছে মায়ের মতন করে"

"সাথী"র শেষ দৃশ্যটি সত্যিই অভূতপূর্ব। হারমোনিয়ামটি কাঁধে নিয়ে সায়গল বেরিয়ে পড়ে। "মঞ্জু আমার হারিয়ে গেছে।" নদীর ধারে সেই দোদুল্যমান ঝড়ের মাঝে সায়গলকে যখন কানন খুঁজে পেলো, তখনই ছবির পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানেও আমরা সায়গলকে পাই নিখুঁত অভিনেতারূপে।

অনেক ছবিতে সায়গল অভিনয় করেছেন। আজ পর্যন্ত একথা জোর গলায় বলতে পারি, সায়গল কোনো ছবিতে অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দেননি। সায়গল বাঙালীর মানসপটে এজন্যও বোধ করি, একটু বেশী দিনই উঁকি দেবেন।

সায়গল নেই, একথা ভাবতেও পারিনা। আজ রূপমঞ্চ পত্রিকার মারফত আমি আমার নির্মল শ্রদ্ধা সেই পরলোকগত অভিনেতা সায়গলকে জানাতে পারলুম; এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি।

●● শিল্পী যেখানেই থাকুন আপনাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন ব্যর্থ হবে না।

[ব্যক্তিগত উত্তরের আশায় কেউ যেন চিঠির সংগে ডাক টিকেট দিয়ে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হন। ব্যক্তিগত ভাবে কোন চিঠির উত্তর দিতে আমরা অপারক—তবে নিতান্তই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলে, আমরা নিজেরাই ডাকটিকেটের ব্যয় ভার বহন করবো।

[—সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ]

বেতারের অভ্যন্তরে

লাউড স্পীকার

সংঘর্ষ কি আসন্ন ?

আজকাল ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্র দাবীর কথা শোনা যাচ্ছে। কলের কুলি-মজুর থেকে সুরু করে অফিসের জীবন্মৃত কেরাণীরা আর স্কুলের চির-অনাদৃত শিক্ষকরা পর্যন্ত আজ আওয়াজ তুলেছেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে। তাঁদের সকলেরই বেঁচে থাকার এবং মানুষের মতো জীবন-যাপন করবার স্বল্পতম উপকরণ আদায়ের জন্যে সম্মিলিত দাবী ধ্বনিত হচ্ছে। ধনীতে শ্রমিকে, শোষক ও শোষিতে যেন এই দাবী নিয়ে 'ট্যাগ্ অব্ ওয়ার' সুরু হয়েছে। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা কিন্তু অনেক আগেই এই আওয়াজ তুলেছিলেন নিজেদের আদর্শ ও সম্মান বজায় রাখবার জন্যে। আমরা জানি কলিকাতা বেতারে প্রথম শিল্পী ধর্মঘটের সুরু ২১ জন ষ্টাফ্ আর্টিষ্টদের নিয়ে। এই শিল্পীদের সম্মানজনক দাবী আদায়ের সমবেত চেষ্টায় শিল্পীদের অভূতপূর্ব সংঘবদ্ধতা সত্যিই বিস্ময়কর! বেতার কর্তৃপক্ষকে অবশ্য শেষে শিল্পীদের সংগে রফা করতে হ'য়েছিল। কলিকাতা বেতারে দ্বিতীয় শিল্পী-ধর্মঘট অবশ্য শিল্পীদের আর্থিক সুবিধা আনয়ন করবার জন্য সৃষ্টি হয় নি—সে ধর্মঘটকে ত্বরান্বিত করে এনেছিলেন কলিকাতা বেতারের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী তাঁদের অশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা—সমস্ত বাংলার জনমত জাগ্রত হওয়ার ফলে অভিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের বাংলা দেশ হ'তে বিদায় নিতে হ'য়েছিল—এ ঘটনা খুব বেশী দিনের নয়।

কিন্তু কলিকাতা বেতারে শিল্পী ছাড়াও একশ্রেণীর অবজ্ঞাত মানুষ আছেন যাঁরা বেতারের অফিস সক্রিয় ও সচল রাখবার ঐকান্তিক আগ্রহে নিজেদের নিবেদন করেছেন। এঁরা কেরাণী, যুদ্ধের সময় জার্মাণী-বোমাও এঁদের দমিয়ে রাখতে পারে নি—সর্ববিধ অসুবিধা সত্বেও এঁরা হাসিমুখে অত্যন্ত ধৈর্যের ও সাহসিকতার সংগে নিজেদের কর্তব্য কাজ সম্পাদন করে এসেছেন—বেতারে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হবার আগে এঁদের সর্ববিধ যোগ্যতার পরিচয় দিতে হ'য়েছিল—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল—যুদ্ধের সময় এঁরা ছিলেন "Essential"—এতদিন এঁদের অন্যত্র চাকরীর আবেদন করার কোন রকম সুবিধা দেওয়া হয়নি—ভারত সরকার এঁদের আত্মার আত্মীয় করে রেখেছিলেন। যুদ্ধান্তে তাঁদের পুরস্কার মেলবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এঁদের বিদায় করে দেবার সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। এঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নতুন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে। পূর্বে বেতারে নিযুক্ত হবার আগে যে রকম নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছিল, তা কি তবে সব ভুয়ো? শতকরা ৭০ পদ যুদ্ধ-ফেরত বেকার লোকেদের দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। বাকি ৩০টি পদের জন্য পরীক্ষা দেবার জন্য এই অভিজ্ঞ লোকেদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে—মজার কথা এই যে, এই ৩০টি পদে এই সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই—কেননা বাইরের আরো বহু লোক এই ৩০টি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। শুধু কেরাণী নন—
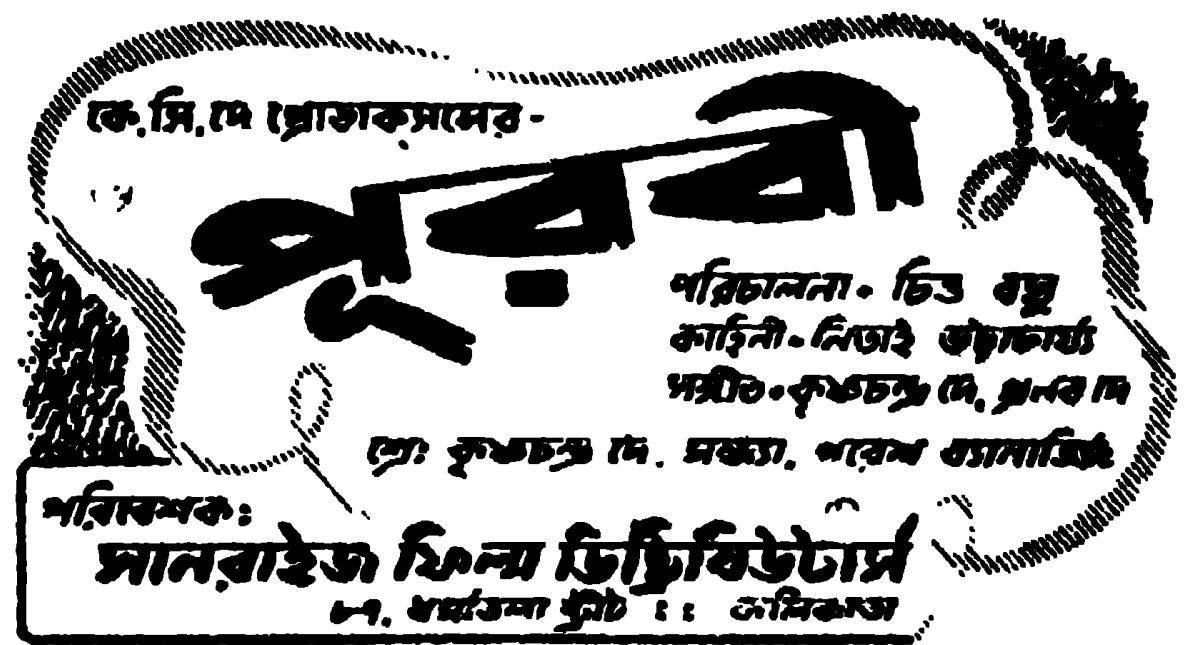
বেতারের প্রোগ্রাম সহকারীদের কয়েকজন বেতার থেকে বিদায় দিয়ে মিলিটারী (যুদ্ধ ফেরতকে এছাড়া আর কি বলবো?) নিয়োগ করা হ'বে। বেতারের এই সমস্ত প্রোগ্রাম সহকারী নত মস্তকে সরকারের অবিবেচক নির্দেশ মেনে নিলেও বেতারের কেরাণীরা তা মেনে নিতে পারেন নি। বেতার কর্মচারীদের সংঘ "অল ইণ্ডিয়া রেডিও এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন" (বেংগল) সম্প্রতি এই ভুয়ো পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে বয়কট করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

ভারত সরকারের সংগে তাঁরা একবার পাঞ্জা কষে দেখতে চান। মুক্ত কেরাণীদের নিজেদের দাবীর আওয়াজে মুখর হ'তে দেখে কলিকাতা বেতারে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে।

যুদ্ধ ফেরত লোকেদের চাকরীর সুব্যবস্থা করার নৈতিক দায়িত্ব ভারত সরকারের। এই নৈতিক দায়িত্ব পালন করার অজুহাতে অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কোন নীতি-শাস্ত্রের সমর্থন আছে তা আমাদের জানতে ইচ্ছা করে! যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও পুনঃসংস্থানের প্রয়োগ-রীতির নিষ্ঠুরতা ও অভিনব অব্যবস্থা দেখে আমরা কম বিস্মিত হই নি। আমরা সরকারের হৃদয়হীন নীতির প্রতিবাদ না করে পারি নি! এবং আমাদের বিশ্বাস এই উৎখাত নীতি কেউই সমর্থন করবেন না। বেতারের কেরাণীদের সংঘবদ্ধ দাবীর পিছনে আমাদের সমর্থন আছে একথা আমরা এখানেই স্বীকার করে রাখছি।

শিল্পী সংঘ কেরাণীদের এই দুঃসময় তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন বলে আমাদের মনে হয়। শ্রোতাদের উচিত সরকারী এই উৎখাত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে কেরাণীদের বাঁচবার পথটাকে প্রশস্ত করে দেওয়া।

হুকুম নড়ে কি হাকিম নড়ে—তা দেখা যাক!

এ, এল প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্রে সুপ্রভা মুখার্জী ও অশোকা গোস্বামী

মাপ করবেন.........

এই বিনয় ভাষণ বেতারে দিনে অন্ততঃ একুশ বার শোনা যায়—বিশেষ করে রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার সময়। একটা অভ্যস্ত রীতিতে যান্ত্রিকভাবে ঘোষক বলেন: মাপ করবেন—এ রেকর্ডটী খারাপ থাকায় বাজিয়ে শোনান সম্ভব হলো না.........

মজা হচ্ছে এই রেকর্ড দুর্ঘটনা একবার দু'বার বা এক-দিন দু'দিন নয়—কলিকাতা বেতারে প্রতিদিনই ঘটছে। এবং এই ভাঙা রেকর্ড সামান্য একটু বাজিয়ে হঠাৎ তুলে নেওয়া বেতারের অনুষ্ঠানের অংগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বিদ্যার্থী মণ্ডলে, গল্পদাদুর আসরে যেখানে ছাত্র ছাত্রীদের ও ছোটদের ভীড়—সেইখানেই আমরা অনেক সময় মন দেওয়া নেওয়া প্রেমের গান বাজাতে শুনেছি।

আমরা বেশ ভাল করেই জানি, বর্তমান বিচার বিহীন ব্যবস্থা চালু হবার আগে বেতারের প্রতিটি রেকর্ড ভাল করে টেষ্ট করে বাজিয়ে দেখে তবে নির্বাচন করা হতো। এই রেকর্ড নির্বাচনের ভার ছিল অধুনা বিস্মৃত শ্রীপূর্ণ ঘোষের ওপর। এই নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও আন্তরিক আগ্রহই সে সময়ে বেতারে 'মাপ করবেন'... কথাটির সংগে শ্রোতারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল প্রায় আট বছরের ওপর ঐকান্তিক ভাবে কাজ করার পর বিনা অপরাধে তাঁকে বেতার থেকে বিদায় করা হলো। শ্রীযুক্ত ঘোষের বিদায়ের পর থেকেই কোলকাতা বেতারে 'মাপ করবেন' ধ্বনি উঠতে সুরু করে এবং ভাঙা রেকর্ড বাজাবার মরশুম পড়ে যায়।

এখন রেকর্ড নির্বাচন করার দায়িত্ব পাঁচজনের হাতে থাকায় কারুর কাজ নয় হয়ে উঠেছে। যা হোক করে যে কোন রকমে রেকর্ড বাজিয়ে সময় পূরণ করাই বেতারের এখন বড় কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সুনির্বাচিত রেকর্ড সহযোগে নাটিকা, চরিত্র-চিত্র ইত্যাদি প্রচার করা এই সময়ে (বছর আট নয়ের আগে) কলিকাতা বেতারের অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল। কলিকাতা বেতারের এই রেকর্ড-সহযোগের নাটিকা ইত্যাদির সৃষ্টি সমস্ত বেতার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং রেকর্ড সহযোগে নাটিকার জনপ্রিয়তা অন্য বেতার কেন্দ্রগুলিকে কলিকাতা বেতারকে অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ করে। অন্যান্য বেতার কেন্দ্রগুলি কলিকাতাকে অনুসরণ করে রেকর্ড সহযোগে নাটিকা প্রচার সুরু করে—অথচ কলিকাতা বেতারেই সেই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটে স্বার্থপর দলগত প্রাধান্য প্রচেষ্টায়। কলিকাতা বেতারে রেকর্ড সংযোগ নাটিকার জনপ্রিয়তার মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপূর্ণ ঘোষ অন্যতম। সে আজ বিস্মৃত যুগের কাহিনী।

কলিকাতা বেতারকে এই ভাঙা রেকর্ড বাজার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে গেলে শ্রীযুক্ত ঘোষের মত কর্মঠ মানুষের দরকার। ভাঙা রেকর্ড শুনে শুনে শ্রোতাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। আমরা দাবী করছি পঙ্কজকুমারের মত শ্রীপূর্ণ ঘোষকে বেতারে ফিরিয়ে এনে বেতার কর্তৃপক্ষ ভাঙা রেকর্ড শোনাবার ঝামেলা থেকে শ্রোতাদের মুক্তি দিন।

"মাপ করবেন…" শোনা আমাদের অসহ্য!

'বাহাদুর-কা খেল'!

বোম্বাইয়ের ছবির সংগে যাঁরা পরিচিত আছেন এই 'বাহাদুর কা খেল' তাঁদের অজানা নেই। বাহাদুর একাই একশ, পাঁচশো জনের জনতাকে সে হাটিয়ে দেয়, পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে নামে নীচে, কিছু তার হয় না—আগুণে ঝাঁপ দিয়ে তরুণীকে উদ্ধার করে…সে জানে না এমন কিছু নেই—সে পারে না এমন কিছু নেই—এমনি অবিশ্বাস্য শক্তিধর অভিনব বাহাদুর বোম্বাই ছায়া-ছবিতে বর্তমানে বড় একটা দেখা না গেলেও কলিকাতা বেতারে সেই বাহাদুরের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে—শ্রীমতীর ছদ্মবেশে। আপনি যদি নিয়মিত বেতার শোনেন—এই বাহাদুরের সংগে আপনার পরিচয় আছে। যদি নিয়মিত বেতার না শোনেন তাহলে যে কোন দিনের যে কোন অনুষ্ঠানে একবার কর্ণপাত করবেন—কর্ণসুধায় আপনার কর্ণদ্বয় একেবারে জুড়িয়ে যাবে। হেন জিনিস নেই ইনি জানেন না—হেন কাজ নেই ইনি পারেন না। একেবারে বোম্বাই বাহাদুরের কার্বন-কপি আর কি! গানে, গল্পে, অভিনয়ে, আলোচনায়, ঘোষণায়, ব্যঞ্জনায়, শিশু মহলে, বিদ্যার্থীমণ্ডলে, গল্পদাদুর আসরে—বেতারের এমন কোন কিছু নেই যাতে আপনি এই মহিলা বাহাদুরের দেখা পাবেন না। ইনি একাই একশ, ঘোষণা করবার সময় শিস্ দিয়ে কথা বলেন, ঘোষণার শেষ শব্দটি বেমালুম গিলে বসে থাকেন। কিন্তু তাতে কি—ঘোষণা ইনি করবেনই! গান যা গান তা একেবারেই গান্ (Gun)—কিন্তু তবু তিনি গাইবেন এবং একেবারে রবীন্দ্র সংগীত। যা তিনি পারেন না তা

তিনি করবেনই। অভিনয় তবু এঁকে দিয়ে চলে কিন্তু সব বিভাগেই ইনি নিজেকে চালাতে সুরু করেছেন। একাধারে তিনি সব। বেতারের গোটা তিনেক ডিপার্টমেণ্ট ইনি একা কণ্ট্রোল করেন—কাকে প্রোগ্রাম দিতে হবে, কার প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হবে—ইনি সুনিপুণভাবে তা করতে পারেন। সমালোচনার পাশুপত অস্ত্র শ্রোতাদের তীক্ষ্ণ শায়ক সবই এঁর অংগ স্পর্শ করতে পারে না। বড়ো কর্তাদের বর্ম এঁকে অজয় অমর করে রেখেছে। এই অসম্ভব সম্ভব-কারিণীকে নমস্কার করতে ইচ্ছা যায়। এঁর সামান্যতম ইচ্ছায় এঁর পার্শ্বচর প্রযোজক হিসাবে বেতারে বিনা পরি-পরিশ্রমে ২৬০৲ টাকা মাসে পান, এঁরই অনুগ্রহে বাঁধা বলে কেউ মাসে মাসে বেতার থেকে ১৬০৲ টাকা পেন্‌সেন্ হিসেবে পান। ইনি ইচ্ছা করলে শিল্পীকে রাখতে পারেন আবার মারতেও পারেন—ইনি দনুজদলনির মতই নানারূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। এঁকে সত্যিই নমস্কার করতে ইচ্ছা যায়। এঁরই মোহিনী মায়ায় বেতার জগৎ আবদ্ধ। বর্ষশেষে এই বেতার-মোহিনীর কাছে কাতরভাবে বলতে ইচ্ছে করে 'দেবী প্রসন্না হও, বেতার শ্রোতাদের তোমার হিড়িম্বা সদৃশ কণ্ঠস্বর থেকে তুমি নিজেই ত্রান করো। মহিলা বাহাদুরের ভূমিকায় তোমার বাহাদুরী সত্যিই অদ্ভুত, অপূর্ব ও অভিনব। বেতারকে তুই সত্যিই নিলি মা?

নানাকথা

বেতারে স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার রেকর্ড লাইব্রেরী বিভাগে কাজ করেন। বিগত '৪৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে দেশভক্তিমূলক কতকগুলি রেকর্ড বাজাবার জন্যে নাকি তাঁকে অন্য বিভাগে বদল করা হয়েছে।

আরো জানতে পারা গেল বন্দেমাতরম গান বেতারে বাজাবার জন্যে তিনি নাকি বেতারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাইকে একটী চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিখানা কলিকাতা বেতারে ঘুরে এলে স্টেশন ডিরেক্টার মিঃ লক্ষ্মণম্ নাকি শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারকেখুব ভৎর্সনা করেছেন।

—একথা কি সত্য?

●

বেতারে আট বছর কাজ করছেন এই রকম একজন পদস্থ কর্মচারী যিনি অস্থায়ীভাবে গেজেটেড্ অফিসার হয়েছিলেন—তাঁকে চাকুরী বজায় রাখবার জন্যে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

—এও নশিবে ছিল!

●

এতকাল যাঁরা বেতারে প্রোগ্রাম সহকারী হয়ে কাজ করছিলেন—তাঁদের অনেকেরই চাকুরী থাকবে না। তাঁদের জায়গায় শতকরা ৭০টী আসন দেওয়া হবে যুদ্ধ ফেরত বেকার ব্যক্তিদের। বাকি ৩০টী পদের জন্যে এঁরা (উপস্থিত যাঁরা আছেন) ভিন্ন বাইরের বহু লোককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে!

—মুরগীর লড়াই দেখবার জন্যেই কি এই ব্যবস্থা?

শ্রোতা ও শিল্পীদের প্রতি

রূপ-মঞ্চ শ্রোতা ও শিল্পীদের সত্যিকারের মুখপত্র হতে চায়। বেতার শ্রোতাদের ও শিল্পীদের বেতার সম্পর্কীয় কোন অভিযোগ অনুযোগ থাকলে আমাদের পত্রাঘাত করতে পারেন। বেতার সম্পর্কীয় সমস্ত অভিযোগ ও অনাচারের যাতে প্রতিকার হয় সেজন্যে আমরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবো বলেই আমাদের এই নিবেদন বেতার শ্রোতা ও শিল্পীদের প্রতি। শ্রোতা ও শিল্পীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে আমরা খুশী হবো।

সমালোচনা ও নানাকথা

কাশীনাথ

কাহিনী : শরৎচন্দ্র। নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত। অভিনয়াংশে : অহীন্দ্র, ছবি, সন্তোষ, রবি, হরা, সরযুবালা, মুকুলজ্যোতি, সুহাসিনী, গিরিবালা, সীতাদেবী প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' নাট্য-রূপায়িত হ'য়ে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। সম্প্রতি এই প্রাচীন নাট্য-মঞ্চটী একরূপ বন্ধ ছিল বল্লেই চলে। নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এঁদের চলতে হ'য়েছে। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে মিনার্ভা যে পুনরায় নাট্যামোদীদের আহ্বান জানাতে পেরেছেন এজন্য মিনার্ভার কর্তৃপক্ষদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মিনার্ভার অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিনার্ভার শিল্পী ও কর্মীগোষ্ঠী এবং অন্যান্য পরিচালকবর্গের সাহচর্যে আশা করি চণ্ডী বাবু মিনার্ভার পূর্ব সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারবেন। নূতন আলোক সম্পাতে মিনার্ভা বাংলার নাট্যামোদীদের অন্তর জয় করতে তৎপর হ'য়ে উঠুক—কাশীনাথের সমালোচনা প্রারম্ভে মিনার্ভার উদ্দেশ্যে আমাদের সেই শুভ-কামনা জানিয়ে নিচ্ছি।

'কাশীনাথ' গল্পটী বাঙ্গালী নাট্যামোদীদের অপরিচিত নয়—ইতিপূর্বে পর্দায় রূপায়িত হ'য়ে 'কাশীনাথ' অনেকের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হ'য়েছে সত্য, কিন্তু পরিচালক নীতিন বসু কল্পনার রঙ্গিন পাখায় চড়ে এতদুরই উড়ে বেড়িয়েছিলেন যে, সে কাশীনাথ আর শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' ছিল না। যখনই কোন মৌলিক কাহিনীকে রূপায়িত করতে হবে—কর্তৃপক্ষের সব সময়ই মনে রাখতে হবে—কাহিনীর মূল উপপাদ্য বিষয় থেকে একটুকুও নড়া চড়া করা চলবে না। তাঁদের যদি বাহাদুরীই কিছু দেখাতে হয়, নতুন কাহিনী নিয়েই দেখানো উচিত। পর্দায় নীতিন বাবু যে অপরাধ করেছিলেন, 'কাশীনাথে'র বর্তমান নাট্য-রূপে দেবনারায়ণ বাবু ততখানি অপরাধ না করলেও—তাঁকে সম্পূর্ণ নিরপরাধী বলতে পারবো না। 'কাশীনাথে'র ওপর শ্রীযুক্ত গুপ্ত বিশেষ কোন অবিচার করেন নি—তিনি যেটুকু অপরাধ করেছেন, তা বেশীর ভাগই 'কমলা' চরিত্রটীর ওপর। কমলা এবং কাশীনাথকে যেভাবে শরৎচন্দ্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষাতে তা উল্লেখ করলে নাট্যামোদীরা আমাদের এই অভিযোগ স্বীকার করে নিতে পারবেন। কমলার সংগে কাশীনাথের পার্থক্য কোথায়—? কাশীনাথের বিবাহিত জীবন কেন তার কাছে অ-সুখের কারণ হ'য়ে উঠলো? তার মনঃপীড়ার কারণ—স্ত্রী কমলা বা নারী কমলা নয়। কমলার পিতার ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যের বন্ধনেই মুক্ত কাশীনাথ হাঁপিয়ে উঠলো।—"পূর্বে যাহাই হউক যখন সে দেখিল, সে রীতিমত স্থায়ী-রূপে ঘরজামাই হইয়া পড়িয়াছে, তখন কাশীনাথের মনে আর সুখ রহিল না—এখন সে যেখানে সেখানে যেতে পারে না। যথা ইচ্ছা তথায় দাঁড়াইতে পায় না—সব জিনিষ হইতেই তাহাকে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।" * * * * "সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দ্দিক-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা নহে—সেখানে ঝড় বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু নির্ম্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া, পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নাই।"—শরৎচন্দ্রের এই কাশীনাথকে দেবনারায়ণ বাবু সুন্দর ভাবেই এঁকেছেন এবং তা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে সুদক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের অভিনয় নৈপুণ্যে। কোথাও আতিশয্য নেই—সহজ সরল কথা দিয়ে—কাশীনাথের মর্মপীড়া শ্রীযুক্ত বিশ্বাস সুষ্ঠুভাবে তাঁর ব্যাঞ্জনার ভিতর ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য কাশীনাথের ভূমিকায় তাঁর বয়সটা নাট্যামোদীদের একটু চোক্‌লা মনে হবে। এবং পর্দার কাশীনাথ দর্শক মনে ছাপ মেরে থাকাতে—আরও বিশদৃশ্য লাগে। যদিও পর্দায় কাশীনাথের বয়স খুব কম করেই আঁকা হ'য়েছিল। কাশীনাথের যখন

বিয়ে হয়—তখনই তার বয়স ছিল আঠারো। কাশীনাথের বিয়ের বহু পরের ঘটনা নিয়ে আমাদের বর্তমান নাটক আরম্ভ—তাই কর্তৃপক্ষ এদিক দিয়ে ছবি বাবুর বয়সের অসামঞ্জস্যতা দূর করতে চেষ্টা করেছেন।

কমলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মঞ্চ-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা। তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে আমাদের কোনই অভিযোগ নেই। কিন্তু নাট্যরূপদাতার জন্যই 'কমলা' শরৎচন্দ্রের 'কমলা' থেকে একটু দূরে সরে গেছে। কমলাকে যে ভাবে নাট্যরূপদাতা এঁকেছেন—তাতে মনে হয় কমলা যেন কোমর বেঁধেই কাশীনাথের সংগে বিবাদ করতে লেগেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। পরস্পর পরস্পরকে খুব গভীর ভাবেই ভাল বাসত। কাশীনাথের কমলার প্রতি কোন অভিমান ছিল না। কমলারও কম অনুরাগ ছিল না। কিন্তু কমলায় ঐশ্বর্যের বাঁধন কাশীনাথকে বিষিয়ে তুলেছিল -- এবং কমলার কাছ থেকে তাকে যখন দূরে টেনে নিচ্ছিল তখনই ঐশ্বর্যশালী ধনীর আদুরে মেয়ে কমলার ভিতর আত্মাভিমান দেখা দিল। এবং কমলা নিজের ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে বললো—দেওয়ানের পরামর্শে নয়। "কমলা কর্ত্তার উপর কর্ত্তা, গৃহিণীর উপরও গৃহিণী। তাহার কথা কাটে, কিম্বা অমান্য করে বাড়ীর মধ্যে এ ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কমলা ধনবতী, বিদ্যাবতী, রূপবতী, গুণবতী, সর্ববিষয়ে সর্বময়ী কর্ত্রী; তথাপি একজনকে কিছুতেই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না; যাহাকে পারিল না সে তাহার স্বামী। কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে, আদর যত্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। একটা দরিদ্র লোক সে কতবড় মন লইয়া তাহার স্বামী হইয়া আসিছে, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না।" কাশীনাথের মন জয় করতে যখন কমলার সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হ'লো—তখনই ধনী কন্যার সম্পদের গৌরব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং সেই জোরেই কাশীনাথকে বশে আনতে চেষ্টা করলো—অথচ কাশীনাথের মন-পীড়ার প্রকৃত কারণ সে উদ্‌ঘাটন করতে পারলো না।

তিনটী অঙ্কে নাটকটী বিভক্ত। প্রারম্ভে নাটকটী একটু যেন ঝুলে পড়েছে। শেষ অঙ্ক সম্পর্কেও আমাদের অভিযোগ আছে। পরিণতির খুব সাবলীল ভাবে পরিসমাপ্তি হয়নি—তাই খুব দ্রুত এবং আকস্মিক মনে হ'য়েছে। তারপর আহত অবস্থায় কাশীনাথের দাঁড়িয়ে থাকাটাও খুব অস্বাভাবিক মনে হয়। শরৎচন্দ্রের যেভাবে পরিণতি এঁকেছেন সেই ভাবেই আঁকা উচিত ছিল। বিন্দুর চরিত্রটীকে নাট্যকার পর্দার বিন্দুর মত বিকৃত করেননি দেখে খুশী হ'য়েছি। বিন্দু চরিত্রে মুকুলজ্যোতি যথাযথ অভিনয়ই করেছেন। কমলার বাবার ভূমিকায় নটসূর্যের বিরুদ্ধেও আমাদের কোন অভিযোগ নেই। নবনিযুক্ত ম্যানেজার রূপে দেখতে পেয়েছি শ্যাম লাহাকে। এই চরিত্রটীতে একটু বৈপরীত্য ভাবও এসে গেছে। আর চরিত্রটীকে ফুটীয়ে তুলবারও শ্রীযুক্ত লাহা কোন অবকাশ পাননি, তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই—এজন্য দায়ী নাট্যরূপদাতাই। খাজাঞ্চি এবং দেওয়ান রূপে যথাক্রমে রবি রায় ও সন্তোষ সিংহ প্রশংসার দাবী করতে পারেন। বিন্দুর মা এবং ভাইয়ের ভূমিকায় সুহাসিনী ও নবাগত সমর মিত্রকে নিন্দা করবো না। বিন্দুর স্বামীরূপে সুশীল রায় (২)-কে প্রশংসা করবার কিছু নেই। গিরিবালার সন্থুখি চলনসই। কীর্তনীয়া রূপে সীতাদেবী সংগীতে আমাদের খুশী করেছেন—দর্শনেও আমরা অখুশী হয়নি। তবে কীর্তন দু'খানিই এত বড় হ'য়েছে যে, ধৈর্য রাখা দায়। দৃশ্যপটেরও প্রশংসা করবো। নাটকখানি খুব হৃদয়গ্রাহী এবং ঝরঝরে হয়নি—তবে অনেক ঝড় ঝাপটের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন—সেজন্য তাঁরা নাট্যামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতার দাবী করতে পারেন—এবং তাদের সে দাবী আমরা মেনে নেবো। (শীলভদ্র)

স্বর্গ থেকে বড়

স্টার থিয়েটারের নূতন নাটক "স্বর্গ থেকে বড়" রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত। 'কঙ্কাবতীর ঘাট' এর পর সম্ভবতঃ আলোচ্য নাটকখানিই শ্রীযুক্ত গুপ্তের মৌলিক সামাজিক নাটক। এই নাটকে মহেন্দ্র বাবু নিজেও একটী ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। নাটকখানি তিন অঙ্কে বিভক্ত। জাতীয় অনুপ্রেরণায় মহেন্দ্র

গুপ্ত তাঁর বর্তমান নাটকখানি রচনা করেছেন—তাঁর আন্তরিকতায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ করবো না। কিন্তু তিনি যে কথা বলতে চেয়েছেন এবং যা বলেছেন—তা স্পষ্ট করে এবং বাস্তব দৃষ্টিভংগী দিয়েই ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল। সামাজিক-রাজনীতিমূলক নাটক, তার চলন ভংগী রাজনৈতিক মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেইটাই হবে তার প্রধান বক্তব্য। কিন্তু বর্তমান নাটকে তা হয় নি। অনেক বাজে সমস্যা এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। অনেক বাজে কথাও মূল বক্তব্যকে এলোমেলো করে দিয়েছে। তারপর নানান রহস্য নাটকের গতিপথে এসে তাকে একটু ডিটেক্‌টিভ ভাবাপন্নও করে তুলেছে। এতে নাটকখানি অবশ্য শেষার্ধে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে—কিন্তু তার মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়েই পড়ে। কলকাতার ঘটনা নিয়ে যতক্ষণ নাটকখানিকে ব্যস্ত থাকতে দেখি, ততক্ষণ পর্যন্তও সে, তার মূল পথ খুঁজে পায় না। নাটকখানি জমে ওঠে তখনই, যখন কাজলা গায়ে বাগ্দীদের নিয়ে নাট্যকারকে মেতে পড়তে দেখি। এবং এই বাগ্দী-দের সমস্যাগুলি নাট্যকার সুষ্ঠু ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। এজন্য তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। অমরেশের চরিত্র নিয়ন্ত্রণে নাট্যকারকে প্রশংসা করতে পারবো না। অমরেশের ভূমিকায়ই নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে আমাদের বলবার কিছু না থাকলেও—অর্থাৎ কতকটা স্বীয় ব্যক্তিত্বে কেটে গেছেন—চরিত্রটীর কোন সার্থকতাই আমাদের চোখে পড়ে না।

অভিনয়ে বিনায়কের ভূমিকায় বিপিন মুখোপাধ্যায়ের কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। নাট্যকারও যেমনি চরিত্রটীর জন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন—বিপিন মুখোপাধ্যায়কেও তেমনি আমরা প্রশংসা করবো। নায়েব গোকুলের ভূমিকায় বিপিন গুপ্তও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ণিমার মানসী, অপর্ণার অমিতা এবং বাগ্দীসর্দার প্রহ্লাদ ও তার সহচর দেবলালের ভূমিকায় যাঁদের দেখতে পেয়েছি, তাঁদেরও প্রশংসা করবো। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেও তাঁর এই নাটকের সংযত অভিনয়ে খুশী হ'য়েছি। মণিশঙ্করের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের প্রশংসা করতে পারবো না। এমন কি নিজের অভিনয়াংশও তিনি ভাল করে মুখস্ত করেন নি। পল্লব, রুবী, ইলোরা ইত্যাদিদের নিয়ে যে ছ্যাবলামীর পরিচয় পেয়েছি, তার সমর্থন করা যায় না। পল্লবের ভূমিকাভিনয় যথাযথই হ'য়েছে। দৃশ্যপটে স্টার নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

—নিতাই সেন

মন্দির—

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের নিজস্ব চিত্র 'মন্দির', এঁদেরই পরিবেশনায় একযোগে মিনার, ছবিঘর, বিজলীতে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন ফণি বর্মা। শ্রীযুক্ত বর্মা বহু পূর্ব থেকেই চিত্রামোদীদের কাছে পরিচিত। আলোচ্যচিত্র পরিচালনায় তিনি তাঁর পূর্ব 'পরিচিতি'র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি সত্য, তবু তাঁর প্রাচীন দৃষ্টিভংগীর কোন রদ-বদল হ'য়েছে বলে মনে হয় না। তবে মন্দির সম্পর্কে আমাদের যা অভিযোগ, তা কাহিনী রচয়িতা এবং চিত্র-নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রণব রায়ের বিরুদ্ধেই। প্রণব বাবুও চিত্র-জগতে অপরিচিত নন—গীতিকাররূপে তাঁর দাবীকে মেনে নিতে কোনদিনই আমরা কুণ্ঠিত হই নি। চিত্র-নাট্য রচনাও তাঁর পাকা হাত আছে বলেই আমরা শুনেছি। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক সময় তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্তমান চিত্র-কাহিনী দেখে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা আমাদের মনে স্তূপীকৃত ছিল—তাতে বেশ খানিকটা ভাঙন ধরেছে। মন্দিরের কাহিনী কোন নূতন রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। ধনী পিতা আর আদর্শবাদী ছেলের বিরোধ থেকে আরম্ভ করে দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার কৃষক ও মজদুর আন্দোলন কোনটাই মন্দির থেকে বাদ যায় নি। এবং যায় নি বলেই শ্রীযুক্ত রায়ের জ্ঞানের মধুভাণ্ড সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জেগেছে। আর আমাদের নাট্য-মঞ্চের ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, তদানীন্তন নাটকগুলির কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকতো না। অর্থাৎ নাটকের ঘটনা সমুদ্রেও ঘটতে পারতো, গ্রামে বা সহরেও ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, বাস্তব জীবন থেকে নাটক কতখানি দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের

আলোচ্য চিত্র সম্পর্কেও একথা সাজে। এর স্থান গ্রাম না সহর তা বোঝা দায়। গ্রামের পরিবেশ মাঝে মাঝে দেখতে পাই—আবার সহরে চরিত্র এসেও ভীড় করে। আর এই গ্রাম সম্পর্কে আমাদের চিত্র-জগতের কর্তৃপক্ষদের অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে স্থূলতার পরিচয় পাই—এ ক্ষেত্রেও সে পরিচয়ের অভাব হয়নি। কোন্ গ্রামে কোন ধরণের লোক থাকে তার একটা অর্থনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ আছে। গ্রামে কোন মিল থাকে না। অন্ততঃ যে সব গ্রাম চাষাবাদ নিয়ে গড়ে ওঠে—সেখানে কোন মিল থাকতে পারে না। শ্রীযুক্ত রায় সহরের উপকণ্ঠ, যেমন ঢাকুরিয়া—পানিহাটী—বালী প্রভৃতিকে যদি গ্রামের পর্যায় ফেলেন—আমাদের বলবার কিছু নেই। এমন কী কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম—যেখানে বড় বড় পাকা বাড়ী এবং টিনের ঘরগুলি সম্পদের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে থাকে—পোষ্ট অফিস, বাজার প্রভৃতি থাকে। গ্রামের কৃষকদের সে গ্রামে ঠাঁই হয় না। তারপর কৃষক আর মজুর এক নয়। পরস্পরের সমস্যাও পৃথক। মজুর এবং কৃষকদের সম্পর্কে একথা আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, শ্রীযুক্ত রায়ের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। নেই বলেই দুইকে এক করে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। দুর্ভিক্ষে পেটের দায়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে লোকে লুটতরাজ করতে পারে—কিন্তু বিপ্লব আনতে পারে না। শক্তি সঞ্চয় না হ'লে কোন বিপ্লবই জয়যুক্ত হ'তে পারে না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন আমাদের চিত্র-জগতে কর্তৃপক্ষদের কাছে এমনই রূপ নিয়েছে এবং তারা যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান কর-ছেন—তাতে মনে হয়, পর পর এরূপ কয়েকখানি চিত্র উঠলেই বাংলার জমিদার সম্প্রদায় রাতারাতি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে উঠবেন। জমিদারী বা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর হবে তখনই, যখন প্রগতিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ দেশের শাসনভার জনসাধারণের হাতে পড়বে। এই শাসনভার হঠাৎ এসে পড়বে না—সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের দ্বারাই তাকে অর্জন করতে হবে। সত্যিই যদি আমাদের চিত্র-জগতের বন্ধুরা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন চান—তা'হলে চরম বিপ্লবের জন্য জনসাধারণকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে—বিপ্লবের মুখে দাঁড়াবার জন্য তাদের তৈরী করে নিতে হ'বে। যেহেতু কুলি মজুর বা কৃষক-দরিদ্রের সমস্যায় আজ দেশ আলোড়িত, অতএব তথাকথিত দেশবাসীকে খুশী করবার জন্য মজুর ও কৃষক আন্দোলনের নামে 'একটু কিছু ঢুকিয়ে দিলাম'—এই 'একটু কিছু ঢুকিয়ে দেবার' বিলাসের মায়া তাঁদের পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁদের আজ সব সময়ই মনে রাখতে হবে, দর্শকেরা তাঁদের চেয়ে অনেক দ্রুত তালে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছেন—আবোল-তাবোল দিয়ে তাঁদের মন-ভোলানোর দিন চলে গেছে।

গল্পের নায়ক অজয়কে কল্পনা-বিলাসী মনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবো না—এসব চরিত্র আমাদের ভাববিলাসীই করে তোলে, সত্যিকারের কোন কাজে আসে না। মিলের প্রবেশ পথে তার গরম গরম বক্তৃতা প্রহসনই মনে হয়। অজয়ের পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত ব্যাপারটা স্বামী-স্ত্রীর ভিতরই ঘুরতে থাকে। দ্বন্দ্বটা আদর্শ নিয়ে দেখাতে চাইলেও আসলে কিন্তু সেটা স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। অভিনয়ে অজয়ের ভূমিকায় ছবিবাবু নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্ত্রীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতীও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অজয়ের পিতার ভূমিকায় অহীন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও আমাদের কিছু বলবার নেই। পিসীমার ভূমিকায় প্রভাও প্রশংসনীয়। এই পিসীমা চরিত্রটির জন্য বরং কাহিনীকারকে প্রশংসা করতে পারবো। চিত্রজগতের চিরাচরিত প্রথার এই চরিত্রটীতেই খানিকটা ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছি। অন্যান্য ভূমিকায় জহর, বুদ্ধদেব, অমর মল্লিক, কৃষ্ণধন, রবি রায়, বেচু সিং, কানু বন্দ্যো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিরাজবৌর মায়া দেবীর কিছুটা আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। পরিচালনায়—ত্রুটিবিচ্যুতি যে না আছে তা নয়। 'ম্যয় ভুখা হুঁ' গানখানি যে দৃশ্যে দেখতে পাই—বাস্তব দৃষ্টিভংগী দিয়ে তাকে মোটেই সমর্থন করতে পারবো না। অবশ্য গানখানি সুগীত হ'য়েছে এবং একক ভাবে এ দৃশ্যটী খুব আকর্ষণীয়ও হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত সত্য চৌধুরীর উদাত্ত গলার প্রশংসাও করবো। সংগীত পরিচালনায় সুবল দাশগুপ্ত নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ

রেখেছেন। চিত্রগ্রহণ চলনসই। শব্দগ্রহণে মাঝে মাঝে বিকৃত স্বরের পরিচয় পেয়েছি। —অনিল মিত্র

অভিযাত্রী—

"উদয়ের পথে"—প্রখ্যাত জ্যোতির্ময় রায়, বিনতা, রাধামোহন এই চিত্রের বিশেষ আকর্ষণ। কিন্তু যে আশা নিয়ে আমরা চিত্রখানি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম—মোটামুটি ভাবে বল্‌তে গেলে সে আশা আমাদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যে কাহিনী শ্রীযুত রায় এবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাকে কাহিনী না বলে নক্সা বলা চলে। মূল কাহিনী এমনি বিচ্ছিন্ন যে, কোথাও তার পূর্ণ রূপ ধরা যায় না। অনেকগুলি ঘটনার অবতারণা আছে কিন্তু কোথাও গল্প গ'ড়ে ওঠেনি। ঘটনাগুলির পরিবেশনেও স্বচ্ছতার অভাব।

সমস্ত চিত্রটি অনেকগুলি ইংগিতে পূর্ণ ফটোগ্রাফের অ্যালবাম বলে মনে হয়। দেবেশকে ঘুরিয়ে আনা, বিজয়বাবুর বাড়ীতে সাহেবীপনার কসরৎ, মহেন্দ্রবাবুর বড় ছেলের যক্ষ্মা রোগ ইত্যাদি গল্পের পক্ষে অবাস্তর বলেই মনে করি। দর্শকের মনে স্থায়ী দাগ রাখার সদ্‌বৃত্তির সংগে এগুলির মিল নেই। পথে হল্লা করে, গাড়ী পুড়িয়ে, জয়হিন্দ বলিয়ে গল্পের আরম্ভ করা হয়েছে—মাঝখানে দেখি মেদিনীপুরের বন্যায় সেবাকার্য, তার পরেই মিলের ধর্মঘট ও পুলিশের গুলি। এই বাস্তব ঘটনাগুলি বিভিন্ন মতবাদের একটি কাল্পনিক প্রবাহে আনার ব্যর্থ চেষ্টা পীড়াদায়ক। সংঘের কার্যাবলীর রীতি অস্পষ্ট। মেদিনী-পুরের সেবাকার্যের পরিবেশ ও প্রণালী হাস্যকর। মনে হয় যেন মার্জিত রুচির প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের background ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে খানিকটা বাস্তবরূপ দেবার যে আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি, তাকে অস্বীকার করবো না। শেষ দৃশ্যে মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যুরও কোন অর্থ খুঁজে পাই না—মনে হল জয়া আর দেবেশের মধু মিলনের শহীদ হলেন মহেন্দ্রবাবু। কাহিনীর মধ্যে নতুন পরিস্থিতির এলোমেলো প্রয়োগ থাকা সত্বেও উদয়ের পথের প্রত্যক্ষ ছাপ অভিযাত্রীর সারা অংগে। জ্যোতির্ময় বাবুকে প্রশংসা করার ইচ্ছা এমন ক'রে ব্যহত হবে ভাবতে পারিনি। তবে উদয়ের পথে চিত্রে কথার অবতারণা ছিল বেশী আর অভিযাত্রী চিত্রে কাজের ইংগিত আছে বেশী। সেইখানে হয় তো শ্রীযুত রায়কে প্রশংসা না করলে অবিচার করা হবে। সর্বোপরি একটা কথা মনে হয়, শ্রমিক সমস্যা নিয়ে এক শ্রেণীর লোকের যেন একটা বিলাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সেখানে যাদের দাবী, তারা বড় হয়ে ওঠে না বড় হয়ে ওঠে অন্য লোক। যে সমস্যা নিয়ে আন্দোলন—সে সমস্যার কোন আলোকপাত হয় না। মনে হয় এই আন্দোলন—প্রেমিক প্রেমিকার চাওয়া পাওয়ার যেন এক সুদীর্ঘ অভিসার। এই ধরণের ছবিগুলি হয়তো এই কারণেই জনপ্রিয় হ'তে পাচ্ছে না। অভিযাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। outdoor shooting বাদ দিয়ে studio এর মধ্যে কাজ সারাই সব সময় কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সংগীত পরিচালনায় মুগ্ধ হলাম না। হেমন্ত বাবুর প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর সুনাম কতদূর রক্ষা করেছে তা বিবেচ্য। রবীন্দ্র সংগীতগুলির পরিবেশন সুষ্ঠু হয়নি। হেমন্তবাবুর কাছে উন্নততর কার্যের ভরসা করি।

যাঁরা যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মহেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর অংশ অনুযায়ী তিনি সুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এই চরিত্রটীর জন্য কাহিনীকারও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। মহেন্দ্র বাবুকে ঘিরে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের যে রূপ ফুটে উঠেছে এজন্যও কাহিনীকারকে প্রশংসা করবো। রাধামোহন ও বিনতা রায় অভিনয় কুশলী হলেও এঁরা এঁদের পূর্ব গৌরব রক্ষা করতে পারেননি। পরেশের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন—ইতিপূর্বে গণ-নাট্য সংঘের অভিনয়ে শ্রীযুক্ত মিত্রের যে দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি, আলোচ্য চিত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই মনে ভেসে ওঠে। হয়ত চরিত্রটী শ্রীযুক্ত মিত্রের উপযোগী হয়নি। তবু যেভাবে তিনি লাফালাফি আর দাঁত ভেংচা-ভেংচি করেছেন, তাতে তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেও কিছুটা সন্দেহ জেগেছে। চেহারার দিক থেকেও তাঁকে

এত বিশ্রী লেগেছে যে, যাঁরা তাঁকে দেখেছেনও তাঁরা চিনতেই হয়ত পারবেন না। অথচ তাকে সুপুরুষ বলেই জানি। কমল মিত্র চরিত্র অনুযায়ী অচল নন। আনন্দ ও অমলের ভূমিকায় অভিনেতাদের প্রশংসাই করবো। বেলারাণীর অভিনয় যেটুকু দেখেছি খারাপ হয়নি। ফটোগ্রাফী ও শব্দ গ্রহণ দুই-ই ভাল না হবার দরুণ ছবির মান অনেকখানি নীচে নেমে গেছে। বহু স্থানের কথা ভাল করে শোনাই যায়নি। বিশেষ করে প্রথম গানটি এত অস্পষ্ট যে, তার এক বর্ণও বোঝা যায় না। তবে সারা ছবিখানিতে একটা সংযত ভাবের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং চরিত্রগুলিকে চিরাচরিত প্রথা ভংগ করে নূতন ভাবে দর্শক সমাজের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াসের পরিচয় পেয়েছি। —শ্রীদীপঙ্কর

তপোভঙ্গ—

রজনী পিকচার্স প্রযোজিত 'তপোভঙ্গ' কলকাতায় একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল। বর্তমানে উত্তরায় প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতি দাস। চিত্র-পরিচালকরূপে এই সম্ভবতঃ প্রথম তাঁকে দেখতে পেলাম। তপোভঙ্গ একখানি হাস্য-রসাত্মক চিত্র। হাস্যরসাত্মক চিত্রের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কোনদিনই অস্বীকার করিনি। বরং বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় নিপীড়িত, দর্শক-মনের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর একঘেয়েমী চিত্রের জটলার মাঝে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাল্কা-হাসিতে ডুবে থাকবার সুযোগ যে-কোন বাঙ্গালী দর্শক গ্রহণ না করে ছাড়বেন না। কিন্তু হাসাবার ছবি হলেও তার যে মাথা-মুণ্ডু থাকবে না—এর কোন যুক্তি নেই। অথচ 'তপোভঙ্গ' সেই উপপাদ্যই উপস্থিত করেছে। তাই তাঁকে তারিফ করবো কী করে? তারপর কৌতুক রসের সংগে যদি আবার গাম্ভীর্য রসের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন তার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া দায়। তপোভঙ্গ সম্পর্কে সেই কথাই প্রযোজ্য। কৌতুক হ'লেই যে তা অবাস্তব এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে—তাত নয়। কৌতুক কাহিনীরও একটা নিজস্ব স্বাভাবিক গতি আছে। কৌতুক বলতে বাস্তব বর্জিত নয়। বাস্তব চরিত্রে এবং ঘটনায় যেটুকু সাধারণ থেকে পৃথক—সেইটেই সাধারণের হাসির সৃষ্টি করে। কৌতুকের সবটাই যদি কাল্পনিক হয়—তাও সহ্য করা যায়। কিন্তু যাই হবে অবিমিশ্র হওয়া চাই। এই অবিমিশ্র হয় না বলেই আমাদের অভিযোগ দিন দিন স্তূপীকৃতই হয়ে চলেছে। তপোভঙ্গও তা থেকে বাদ পড়ে না।

অভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা বনানী চৌধুরীকে দেখতে পেয়েছি। শ্রীমতী বনানী শিক্ষিতা এবং আলোচ্য চিত্রে যতটুকু তাঁর সম্ভাবনার পরিচয় পেয়েছি—তাতে তাঁকে অভিনন্দনই জানাবো। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর আড়ষ্টতা বেশ চোখে পড়ে—তবু আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের জোরে আশা করি শ্রীমতী বনানী বাঙ্গালী দর্শকদের মন জয় করতে সমর্থা হবেন। চটুল সন্ধ্যারাণী—চটুল অভিনয় করেছেন। প্রমীলা ত্রিবেদী বিভূতি বাবুর ক্যামেরার দৌলতে নানান ভাবে ঝিলিক দিয়ে আমাদের মন কেড়ে নিতে যেয়ে ব্যর্থ হ'য়েছেন। ইংরেজী কথাত দূরের কথা, বাংলা কথাও তিনি পরিষ্কার করে উচ্চাচরণ করতে পারেন না। যদি সত্যই অভিনেত্রী জীবনে তিনি বহাল থাকতে চান—যে টাকা উপার্জন করেন, তার সামান্য অংশ দিয়ে একজন মাষ্টার রেখে বর্ণবোধ উলটে যাবার জন্য অনুরোধ জানাবো। অবশ্য একথা যে, শুধু শ্রীমতী প্রমীলার উদ্দেশ্যেই বলা তা নয়—আমাদের চিত্র জগতের এই পর্যায়ের মহয়সী (!) তারকাদের এ বিষয়ে অবহিত হ'তে বলি। জহর, কমল, জীবেন,৺বিভূতি, নির্মল,সুপ্রভা—অভিনয়ে এঁদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। চরিত্র যেখানে দাঁড়ায়নি, সেখানে অযথা শিল্পীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাঁদের প্রতি অবিচার করতে চাই না। সংগীতে শচীনদাস মতিলালকে প্রশংসা করবো। পরিচালনায় বিভূতিবাবুর কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাইনি তবে চিত্রগ্রহণে তিনি আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারেন। কৌতুক চিত্রের গতি দ্রুত এবং সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তপোভঙ্গ কৌতুক চিত্রের সে ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হয়েছে, তাই 'তপোভঙ্গ' কোন সার্থকতা নিয়েই দেখা দেয়নি। —ডাঃ বিমল বসু

পথের দাবী

গত ৭ই মার্চ, শুক্রবার ১৯৪৭, রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে এসোসিয়েটেড পিকচার্স প্রযোজিত 'পথের দাবী' প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করেছে। চিত্রখানি কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে নূতন ক'রে কিছু বলতে হ'বে না। ধারাবাহিকভাবে যখন প্রথম 'পথের দাবী' অধুনা লুপ্ত দেশবন্ধুর একখানি সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হ'তে থাকে—তখনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু পাঠক সমাজেরই নয়—সরকারের শ্যেন দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে 'পথের দাবী'র পক্ষে খুব বেশী সময় লাগেনি। তাই বাংলা ১৩৩৩ সালে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই 'পথের দাবী'র পুনঃ প্রকাশ ও প্রচলনের ওপর সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করে সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিশ বছর আগেকার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে—তাঁদের ত কিছু বলবারই নেই—কিন্তু যাঁরা সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের মাঝে এমন খুব কমই আছেন, জাতীয় ইতিহাসের পাতা যাঁরা উল্‌টিয়ে যাননি—অথবা তখনকার জাতির জাগ্রত দেশাত্মবোধের অনাবিল ধারায় অবগাহন না করলেও দূরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন না করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি থেকে উদ্ভূত আইন অমান্য—সত্যাগ্রহ আন্দোলন—একদিকে যেমনি আমাদের সংঘবদ্ধ ও নৈতিকশক্তি বৃদ্ধির সহায়করূপে দেখা দিল—তেমনি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদেরও আমরা নিজেদের থেকে পৃথকভাবে দেখতে পারিনি। তাঁদের দেশাত্মবোধ—বৈদেশিক সরকারের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণকে অনেকে নিন্দা করলেও, অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারিনি। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু হ'য়ে দেশের সকলের অন্তর জয় করলেন—তরুণ মনের দীপ্ত তেজ নিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই জয়-পরাজয়, আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে বাংলার মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীকে 'পথের দাবী' উপহার দিলেন। আমাদের সমাজ-জীবনে জীর্ণ-মতবাদগুলি যেমনি ভাঙনের দেবতার চঞ্চলছন্দে নিষ্পেষিত হ'য়ে উঠছিল—রাজনীতি এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রেও যখন তার পদধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে কানে বাজছিল—আমাদের সাহিত্যেও সে সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। 'পথের দাবী'র ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করা সত্বেও, তার প্রচলন বন্ধ হয়নি—বাঙ্গালী পাঠক মনের উগ্র বাসনাকে সরকারের কোন বাধা নিষেধই দমিয়ে রাখতে পারেনি—তখনকার এই গোপন সত্য সকলেই স্বীকার করবেন। 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হ'লে আমরা তার নাট্যরূপ দেখতে পেয়েছি। নাট্যরূপ দেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এই প্রসংগে একটা কথা বলার দরকার। সরকার বাধা-নিষেধ আরোপ করেও 'পথের দাবী'র প্রচলন বন্ধ করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু 'পথের দাবী'র প্রকাশক শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শরৎ-চন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের পরস্পরের স্বার্থের সংঘাতে আজ 'পথের দাবী'র প্রচলন এক প্রকার বন্ধ হ'তে চলেছে। যতদূর আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, 'পথের দাবী'র দশ হাজার অবধি মুদ্রণের স্বত্ব শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের আছে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে কোন একটা মীমাংসা করে নিচ্ছেন না বলে, 'পথের দাবী'র প্রকাশও বন্ধ হ'য়ে আছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের তরফ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে না—কারণ দশ হাজারের পরেই নাকি স্বত্ব শরৎ বাবুর ওয়ারিশদের হাতেই চলে যাবে। প্রথম প্রকাশের ঝুঁকি শ্রীযুক্ত মুখো-পাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁর দাবীকে আমরা অগ্রাহ্য করবো না—তাই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে একটা আপোষ-রফা করে নিতে বলি। 'পথের দাবী' ব্যক্তিগত সম্পত্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় সম্পদ হ'য়ে উঠেছে—তাই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে তাঁরা 'পথের দাবী' থেকে বঞ্চিত করবেন—এই স্বার্থপরতাকে কোন মতেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। যদি তাঁরা পরস্পরের স্বার্থ ত্যাগ করতে নাই পারেন—তা'হলে 'পথের দাবী'র স্বত্ব হয়

শরৎ-স্মৃতি ভাণ্ডারে অথবা এরূপ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে 'পথের দাবী' পুণঃ প্রকাশের অনুরোধ করছি। আমাদের এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'পথের দাবী' সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহশীল হওয়া সত্বেও 'পথের দাবী' পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন না। যাঁরা বহুদিন পূর্বে পড়েছেন—সেই পুরোণ স্মৃতিকে ঝালাই করে নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আছেন। এবং বর্তমান ছবি দেখে কর্তৃপক্ষ 'পথের দাবী'র কতখানি মর্যাদা রেখেছেন অথবা রাখেননি তাও বিচার করতে পারবেন না।

'পথের দাবী'র চিত্ররূপ দেবার জন্য আমরা এসোসিয়েটেড পিকচার্সের কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই তাঁদের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু সংগে সংগে একথাও বলবো—'পথের দাবী'কে ঘিরে যে নিখুঁত একখানি ছায়াছবি গড়ে উঠতে পারতো—তাঁরা তার সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন। যদি 'পথের দাবী'র পূর্ণ মর্যাদা রাখতে পারতেন—আমাদের এই শেষোক্ত অভিযোগটি তাঁদের বিরুদ্ধে আনতাম না। 'পথের দাবী' যাঁরা পড়বার সুযোগ পান নি—'পথের দাবী' যাঁদের মনে অস্পষ্ট একটা ছাপ রেখেছে মাত্র—তাঁরা হয়ত 'পথের দাবী' দেখে খুশীই হবেন। কিন্তু যাঁদের মনে 'পথের দাবী'র সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে—শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সংস্কার এবং উচ্ছ্বাস কাটিয়ে—শরৎচন্দ্রের মানস চরিত্রগুলি বাস্তবের রূপ নিয়ে তাদের মূল বক্তব্য যাঁদের কাছে বলতে পেরেছে—'পথের দাবী'র দাবী যাঁদের কাছে সুস্পষ্ট—'পথের দাবী'র চিত্ররূপের ব্যর্থতায় তাঁরা সকলেই আমাদের সংগে একমত হবেন। তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন—'পথের দাবী'র কোন চরিত্রই ফুটে ওঠেনি। এজন্য কতকটা দায়ী নির্বাচিত শিল্পীবৃন্দ—কতকটা দায়ী চিত্র নাট্যকারগণ এবং পরিচালকদ্বয়। এক এক ক'রে বিশেষ চরিত্রগুলির আলোচনা করছি, তা'হলেই আমাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে। প্রথম ধরুণ অপূর্ব। অপূর্ব এম, এস-সি পাশ করেছিল। শরৎচন্দ্রের ভাষাতেই বলি, "অপূর্ব্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাশও করিত, ঘরে একাদশী, পূর্ণিমা ও সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না।"

"আসল কথা অপূর্ব্বর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্য ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজ দাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুর্গী ও হোটেলের রুটি খাইতে লাগিল, এবং স্নানের পুর্বে গল.র পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কী ধোপার বাড়ী দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রী করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কিনা আলোচনা করিয়া হাসি তামসা করিতে লাগিল। তখনও অপূর্ব্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও মায়ের গভীর নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না—একে বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত।"

"জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব চিঁড়া চিবাইয়া, সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্দ্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুন ঘাটে পৌছিল।" * * * "ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্ব্বর শ্রদ্ধা ছিল না, বরঞ্চ কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল...... মা ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা-যত্ন তাহার ভাল লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিনে পাশ করিয়াছে শুনিলে সে খুশী হইত না।...... তবে একটা জিনিষ ছিল তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র হৃদয়।" অপূর্ব একবার স্বদেশী হাঙ্গামায়ও মেতে পড়েছিল। তার ডেপুটী বাপের উমেদারীতেই খালাস পায়। শরৎচন্দ্রের এই অপূর্ব আমাদের অপরিচিত নয়। 'পথের দাবী' যখনকার সময় নিয়ে লেখা এবং যখন তার প্রচলন তখনও অপূর্ব চরিত্র সচরাচরই চোখে পড়েছে। পরস্পর বিরোধী আবহাওয়ায় অপূর্বর জন্ম এবং সে প্রতিপালিত। তখন স্বদেশী আন্দোলনকে চাকরী-সর্বস্ব তথাকথিত বাঙ্গালী-সাহেবেরা হাঙ্গামা বা অপরাধ বলেই মনে করতেন। সংস্কার মুক্ত হবার জন্য নয়—প্রাচীন নিষ্ঠা ও আচার-বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সাহেবীয়ানার প্রতি তাদের অহেতুক ঝোঁককে এক প্রকার বিলাসই বলা যেতে পারে। এই আবহাওয়ায় প্রতিপালিত যে অপূর্ব—তার

মনটির উপরেই শরৎচন্দ্র জোর দিয়েছেন। মানুষের মনটী যদি সাচ্চা হয়, তাকে যে কোন ভাবে গড়ে পিঠে নেওয়া চলে এবং শরৎচন্দ্র অপূর্বকে সেই ভাবেই গড়ে নিয়েছেন। প্রাচীন সংস্কার বা মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে নয়—সত্যের সংগে সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তিনি অপূর্বকে টেনে এনেছেন—এই অপূর্ব চরিত্রে দেখতে পেয়েছি মিহির ভট্টাচার্যকে। চিত্রনাট্যে যেভাবে অপূর্বকে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে—তিনি সেই ভাবেই অভিনয় করেছেন। চিত্র-নাট্যকারগণ অপূর্ব'র চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে শরৎচন্দ্রের মাল-মসলা নিয়ে টানাটানি করেন নি। বার্মাদেশে অপূর্বকে যতটুকু পাওয়া যায়—কোন রকমে ততটুকুই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এ ঠিক হ'য়েছে মূলকে বাদ দিয়ে আগা নিয়ে টানাটানির মত। তবু 'পথের দাবী'র অপূর্ব চরিত্র-টুকুই কিছুটা ফুটেছে।

ভারতীর জন্ম-পরিচিতির সামান্য আভাষ চিত্রে পাওয়া যায়। চিত্র-নাট্যকারগণ চরিত্রগুলির পরিচিতির প্রতি ততটা যত্ন নেননি। অথচ এই চরিত্র-পরিচিতির মূল্য যে অনেকখানি আছে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন—এবং এই প্রয়োজনীয়তার কথা পরে বলছি। অপূর্ব কোর্টেই প্রথম ভারতীর জন্ম-রহস্য টের পায়—"বাদীর সাক্ষী তাহার মেয়ে। আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটীর নাম এবং তাহার বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা। বাটী পূর্ব্বে ছিল বরিশাল—এখন বাঙ্গালোর। নিজের নাম মেরী ভারতী; ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন। তাহার স্বর্গীয় হওয়ার পর মা কোন এক মিশনরি দুহিতার দাসী হইয়া বাঙ্গালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈতৃক ভট্টাচার্য্য নামটী কদর্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই অবধি মিস্ মেরী ভারতী নামে পরিচিত।"

অপূর্বদের পরিবার যেমন বৈদেশিক শাসনের পরিণামের একদিককার সাক্ষ্য দেয়—ভারতীর পরিচিতিও তাই। এবং একথা পরে সব্যসাচীর মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র মিশনারীদের সম্পর্কে যে ইংগিত করেছেন, তাতে আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ভারতী এবং অপূর্ব'র দুইয়েরই মন ছিল নরম। ভারতী এবং অপূর্ব বৈদেশিক শাসনেরই পরিণাম। শরৎচন্দ্র এই দুইটী চরিত্রে আমাদের সামাজিক জীবনে বৈদেশিক শাসনের কু-ফল যেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি এদের সেই ভস্মাচ্ছাদিত কোমল হৃদয়কে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। তবু তিনি এই মনকে বিপ্লবের মাঝে টানতে চাননি। বিপ্লবের বিপদ সঙ্কুল পথ থেকে দূরে রেখে সুন্দর এবং শান্ত জীবনের আদর্শের মন্ত্রেই এদের দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। ভারতী চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী সুমিত্রা। সুমিত্রার দর্শন-শোভার বিরুদ্ধে আমরা কিছু মন্তব্য করবো না। কিন্তু চরিত্রোপলব্ধি এবং অভিনয়ে তাঁর অক্ষমতায় শরৎচন্দ্রের ভারতী ফুটে ওঠেনি। তারপর রূপ-সজ্জারও তারিফ করতে পারবো না। উপন্যাসে কোর্টের দৃশ্যের পূর্বেও 'ভারতী'কে দেখে অপূর্ব'র বাঙ্গালী বা ঐ ধরণের কিছুই মনে হয়নি—অথচ আমাদের সংগে যখন ভারতীর সাক্ষাৎ হয় চিত্রে—তাকে আমাদেরই ঘরের কোন মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। অভিনয়ে কেবল সিনেমেটিক কায়দায় শ্রীমতী সুমিত্রা কথাগুলি আউড়িয়ে গেছেন—চরিত্রটীকে ফুটিয়ে তুলবার কোন প্রয়াসই তাঁর মাঝে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রার জন্ম বৃত্তান্তের রহস্যও আমাদের কম প্রয়োজনীয় নয়। সুমিত্রার চরিত্রটী নানান অভিজ্ঞতায় ভরপুর। তাই ভারতীর চেয়ে সে কঠোর। সব্যসাচীর মুখে সুমিত্রার যে পরিচয় পাই, "শুনেছি ওর মা ছিল নাকি ইহুদীর মেয়ে কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। প্রথম সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান পরে সুরভায়া রেলওয়ে স্টেষণে চাকরী করতেন। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন সুমিত্রা মিশনারীদের স্কুলে লেখাপড়া শিখতো। তিনি মারা যাবার পরে বছর পঁচিশের ইতিহাস আর শুনে কাজ নেই।"***

"আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে মা, মেয়ে একটা চীনে এবং জন দুই মাদ্রাজী মুসলমান মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিঙ গাঁজা আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা করতো। তখনও কিছু জানিনে কি করেন, শুধু

দেখতে পেতাম ব্যাটাভিয়া থেকে সুরভায়া পথে রেল গাড়ীতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল এই পর্য্যন্তই। কিন্তু হঠাৎ একদিন পরিচয় হ'য়ে গেল তেগ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বাঙ্গালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর গেলাম।" * * "সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটা আমার দেওয়া নইলে তার নাম ছিল দাউদ।" এবং সব্যসাচীর কথা থেকে আরও জানতে পারা যায় যে, চোরাই মাল নিয়ে সুমিত্রা একবার ধরা পড়ে এবং সব্যসাচী নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে তাকে খালাস করেন। সব্যসাচীর বিপ্লবী কার্য কলাপ যে সব স্থানকে ঘিরে পরিকল্পিত ছিল —সমস্ত জায়গাই ছিল সুমিত্রার নখদর্পণে। তাছাড়া বিভিন্ন মুখীন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষায় সুমিত্রা যেভাবে গড়ে উঠেছিল—তাতে সব্যসাচীর কাজের সহায়ক হবার যোগ্যতা তার ভিতর অভাব হয়নি। তবু বিপ্লবের চেয়েও সুমিত্রা সব্যসাচীকে যেন বড় করে, নিজস্ব বলে দেখেছিল। সুমিত্রার এই দুর্বলতা কোনদিনই সব্যসাচী প্রশ্রয় দেননি। এই সুমিত্রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। সুমিত্রা চরিত্রে চন্দ্রাবতীর নির্বাচনের প্রশংসাই করবো। তবে এক সাধারণ সভা দৃশ্য ছাড়া শরৎ-চন্দ্রের সুমিত্রাকে কর্তৃপক্ষ চন্দ্রাবতীর ভিতর ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। নইলে অভিনয়ে যতটুকু অবকাশ পাওয়া গেছে, শ্রীমতী চন্দ্রা তার সদ্ব্যবহার করতে নিজের দুর্বলতার পরিচয় দেননি। তলোয়ারকরের ভূমিকায় কমল মিত্রকে দেখতে পেয়েছি। এই চরিত্রটীর সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। এবং সভাদৃশ্য ছাড়া কমল মিত্রের অভিনয়ের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ আনবো না। সভা দৃশ্যে যখন তলোয়ারকর বক্তৃতা দিচ্ছেন—তখন কমলবাবু কথাগুলি আউড়িয়েই গেছেন। যেখানে তার বক্তৃতায় সমস্ত লোক খেপে উঠলো—সেখানে তার বক্তৃতায় ক্ষেপে উঠবার মত ঝাঁঝ কোথায়? তাছাড়া কোন উত্তেজনার চিহ্নও তিনি অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বরং যখন তাকে ধরে নিয়ে গেল—তখন ছত্রভঙ্গ জনতার সংগে তার বক্তৃতাংশের সংমিশ্রণ দর্শক মনে কিছুটা রেখাপাত করে।

শশি কবির ভূমিকায় দেখতে পেয়েছি জহর গঙ্গো-পাধ্যায়কে। শশি কবির চরিত্রটীও কম প্রয়োজনীয় নয়—সব্যসাচীও শশি কবির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। জাতীয় ভাবধারা কাব্যে রূপায়িত করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেই তিনি শশি কবিকে অনুরোধ করেছেন। মাত্র শেষের দিকে একটী দৃশ্যে শশি কবির খানিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। যতটুকু ফুটে উঠেছে জহর ততটুকু অভিনয়ে নিন্দার কোন পরিচয় দেননি সত্য, কিন্তু কোন দক্ষতার পরিচয় পাইনি। রূপ-সজ্জার দুই পুরুষের সুশোভনের কথাই কেবল মনে হ'য়েছে। এই প্রসংগে মঞ্চে ৺অমল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত শশি কবির সার্থকতাকে মঞ্চাভিনয় যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন।

সামান্য কয়েকটা কথা—(yes, no ready) অথচ কত দায়িত্বপূর্ণ চরিত্র! হীরাসিং চরিত্রটী কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ই অবজ্ঞা করেছেন। বিজয় কার্তিক দাসের ব্রজেন্দ্রকেও প্রশংসা করতে পারবোনা। এখন সব্যসাচীর কথা বলবো। পথের দাবীর যিনি স্রষ্টা। সব্যসাচীকে শরৎচন্দ্র এমনি ভাবেই এঁকেছেন—বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ভারতের মুক্তিই যাঁর সর্বপ্রধান কামনা। কিন্তু সব্যসাচীর বিপ্লবী দৃষ্টিভংগী যেন সর্ব দেশের সর্বকালের বিপ্লবকে ঘিরে নিবদ্ধ। সব্যসাচী যে-কোন বিপ্লবের যেন এক মূর্ত অগ্নিখণ্ড। তার ভয় নেই, বন্ধন নেই—মৃত্যু নেই—মহাকালের মত বিজয় দম্ভে যেন চিরকালের চিরমুক্ত সে। শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী মনোভাব সব্যসাচীর ভিতর সুস্পষ্ট আমরা দেখতে পেয়েছি—এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ তার দুরদর্শিতার সাক্ষ্যই দেয়। নিমাই বাবুর মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র সব্যসাচী সম্পর্কে যে পরিচিতি দিয়েছেন। "ইনি হচ্ছেন রাজ বিদ্রোহী, রাজার শত্রু। হ্যাঁ শত্রু বলবার লোক বটে। বলিহারি তার প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটীর নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তার দু'টো হাতই সমানে চলত কিন্তু প্রবল

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : : ৭ম বর্ষ : : ২য় সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা

বিপ্লবী কবি নজরুল

নজরুলের প্রতিভা কোন নির্দিষ্ট পথ বেয়ে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেনি। বহুদিকে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। নজরুল কবি—নজরুল গীতিকার—নজরুল গায়ক—নজরুল সুরস্রষ্টা—নজরুল আধ্যাত্মিক সাধক। বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে হয়ত নজরুলের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপন সার্থক হবে। তবে এই বিভিন্নমুখীন প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করবার মত আমার যোগ্যতা নেই—যে দিকের যেটুকু নিয়ে আলোচনা করবো—তাতেও অনেকখানি দুর্বলতা থেকে যাওয়াও স্বাভাবিক। তাই, সেই দুর্বলতাকে বড় করে দেখে আমার আন্তরিকতায় আশা করি কেউ সন্দিহান হ'য়ে উঠবেন না।

নজরুলের আধ্যাত্মিক গবেষণা কোন বিশেষ ধর্মকে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ নয়। হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্ট, সর্ব ধর্মের সারটুকু যেন নজরুল বেটে খেয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁদের তাঁর সংগে আলাপ আছে—তাঁরা তাত স্বীকার করবেনই—যাঁদের নেই—নজরুলের কবিতা পড়েই আমার একথার সত্যতা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রত্যেক ধর্মের বাহ্যিক বাহুল্যকে চাবুক মেরে মর্মটুকু যিনি উঁচু করে তুলে ধরতে পারেন—তিনি ধর্মের অন্তরে প্রবেশ না করে পারেন না। নজরুলের আধ্যাত্মিক গবেষণার সপক্ষে এই কথাই সাক্ষ্য দেবে। তাই বোধহয় নজরুল কোন বিশেষ ধর্মের কবি নন। তাঁর চোখে কোন জাতিভেদ নেই। নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তির সাধক তিনি। 'সাম্যবাদী' কবিতায় একথা স্পষ্ট করে প্রতীয়মান হয়।

> 'গাহি সাম্যের গান—
> যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খৃষ্টান।'

বৈষ্ণব কবিদের মতই তিনি গেয়েছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" মসজিদ, মন্দির, গির্জাতে ভগবানের জন্য ছুটো ছুটি না করে হৃদয়ের মাঝেই ভগবানকে খুঁজে বের করবার

আবেদন জানিয়েছেন নজরুল। সত্য-দ্রষ্টা কবি সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলেই জোর দিয়ে বলেছেন,—

'হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই।'

* * * *

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

সংগীত ক্ষেত্রে নজরুলের গান, কথা এবং সুর আমাদের চেয়ে যাঁরা সংগীত চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁরাই তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে বাঙালী সাধারণ সংগীত-শ্রোতাদের মনে 'গজল' গানের কথা মনে জাগলেই—নজরুলের কথা ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। ভৈরবী, জৌনপুরী-আশাবরী, পিলু—খাম্বাজ—এমন কী আমাদের বাংলার সহজ সরল নিজস্ব পল্লীসম্পদ ভাটিয়ালী সংগীতও নজরুল অকর্ষিত রাখেন নি।

কবি-নজরুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব। তিনি মনে প্রাণে বিপ্লবী। প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায় সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। স্বদেশ বা বিদেশের যখন যে বিপ্লবী নেতা রাজশাসনের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে শোষিত জনশক্তির পক্ষ থেকে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন, নজরুল তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই অভিনন্দন জানাবার ভাব এবং ভাষায় বিপ্লবের টগবগনো সতেজতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। মনে প্রাণে যদি কেউ বিপ্লবী না হন, এমনভাবে বিপ্লবের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। নজরুলের এই বিপ্লবী-মনের তুলনা যদি করতে হয় তাহ'লে বোধহয় একমাত্র সুভাষ-চন্দ্রের সংগেই করা চলে। অরবিন্দ-বারীন্দ্র-যুগের কথা আমি বাদ দিয়েই বলছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে যে স্তরের বিপ্লবী নেতা বলে আমাদের মন মেনে নেয়, কবি নজরুলের বৈপ্লবিক মনোভাব তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং নজরুল সম্পর্কে আরো একটু বেশী বলা চলে যে, তিনি বিপ্লবী স্রষ্টা—যে স্রষ্টা সুভাষচন্দ্রের মত বিপ্লবীকেও প্রেরণা জাগিয়েছে। সুভাষ-চন্দ্রের দেশপ্রীতি—নির্জাতিতের জন্য তাঁর মর্মপীড়া যেমন এক জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের সংগে তুলনা করা চলে—নজরুলের বৈপ্লবিক মনকেও তার সংগে তুলনা করা চলে। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে—নজরুলের কবিতা জাতিকে কম উদ্বুদ্ধ করে তোলে নি। বিপ্লবীর পথ কুসুমাকীর্ণ নয়—কণ্টকাকীর্ণ। তার অভিযানের প্রতি পদক্ষেপে বাধা-বিঘ্ন ওত পেতে রয়েছে। বিপ্লবী নজরুল সে সম্পর্কে খুবই হুসিয়ার। তাই বিপ্লবীকে অভিযানারম্ভের পূর্বেই তিনি হুসিয়ার করে দিতে চান—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার।'

সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কদের উদ্দেশ্য করে ঠিক এই একই কথা অভিযান প্রারম্ভে বলেছিলেন—

"অগ্রসর হও—অগ্রসর হও— দূরে বহুদূরে ঐ নদী ছেড়ে
ঐ জংগল—ঐ পাহাড় পর্বত ছেড়ে—আমাদের দেশ
আমাদের জন্মভূমি—ঐ দেশে আবার ফিরে যাব।"

বিপ্লবীর বিপ্লব নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় বিকশিত। বিপ্লবী কখনও নৈরাশ্যবাদী নয়। সৃষ্টি এবং তার সার্থকতার আনন্দেই সে বিভোর থাকে।

'মন ছুটছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।'

ঘৃণীত বর্তমানকে ভেংগে চুরে সে নূতন ছাঁচে গড়তে চায়—উদ্দম উচ্ছল তার গতি। মহাকালের মত সমস্ত উলটে পালটে সে ছুটে চলে। তার কাছে কোন মায়া দয়া নেই—

'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।'

সমস্ত অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহীর অভিযান। পৃথিবী থেকে যেদিন সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচার বন্ধ হবে—সেদিনই বিদ্রোহীর অভিযান হবে ক্ষান্ত।

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

বিপ্লবী কবি চিরদিন পৌরুষকেই অভিবাদন জানিয়ে এসেছেন। এ পৌরুষ মেকী নয়—ভণ্ডামীকে আঘাত হেনে যে-পৌরুষ দীপ্ত পদ-ক্ষেপে এগিয়ে চলে—

'—গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।'

কিন্তু এই বিপ্লবীর মনটাও মাঝে মাঝে টনটনিয়ে ওঠে—যৌবনের দৃপ্ত দম্ভে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কারার লোহ প্রাচীরে অবরুদ্ধ দিন যাপন করে—ফাঁসির রজ্জুকেও যারা হার মানিয়েছে—যাদের তেজস্বিতা প্রোজ্জ্বল—তাদের জন্য কবির মন ব্যথাতুর হ'য়ে ওঠে।

'গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি ঐ হাসে!'

ফাঁসির রজ্জু কারার লৌহ প্রাচীর যেমন বিপ্লবীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি—বিপ্লবী কবিকেও নয়। তাঁদের প্রতি মন তাঁর ব্যথায় ভরে উঠেছে সত্য কিন্তু অবসাদ এনে দেয়নি। তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব শত ব্যর্থতায়ও মুসড়ে পড়েনি—তিনি সব সময়ই জয়ের আশায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন—আশার আলোকে উদ্দীপ্ত হ'য়ে নবীনদের উদ্দীপিত করেছেন—

'চল্ রে নৌ—জোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ—দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল চল চল।'

আজ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিষিয়ে উঠেছে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের উন্মত্ততায় আমরা নৈরাশ্যের হাহাকারে হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু কবি নজরুল এই মত্ততার মাঝেই সুন্দরকে দেখেছেন—হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ যেদিন থেকে ঘনীভূত হ'তে

লাগলো,সেদিনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে বর্তমানের এই কুহেলী আবরণের মাঝেও আমরা আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি। হয়ত বর্তমানের এই অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মাঝ খান থেকে আমরা প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবো -

'যে-লাঠিতে আজ টুটে গুম্বজ পড়ে মন্দির চূড়া'
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।'

বাংলার এই বিদ্রোহী কবিকে রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজ, বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদীদের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। বিপ্লবীর আশা কোনদিন বিফল হয় না—বিপ্লবী অজয় অমর। তাই এই বিপ্লবী কবি শুধু বাঙ্গালীর মনেই নয়—পৃথিবীর যে অংশে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব এবং বিপ্লবী মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌কনা কেন, তার মাঝেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই আমাদের নজরুলকে শুধু আমাদের মনে করে ছোট করতে চাই না। তিনি সমস্ত বিপ্লবী-জগতের একজন বলেই গর্ব করতে চাই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—বিপ্লব জয়যুক্ত হউক।

[কিছুদিন পূর্বে এই বিদ্রোহী কবির জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলার নটগুরু শিশিরকুমার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক সুধীজনই নজরুল-প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। যে প্রতিভা সারা বাংলার অভিনন্দন লাভে সমর্থ হ'য়েছে—যে প্রতিভা আপামর বাঙ্গালী জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করেছে—দীর্ঘদিন রোগ ভোগ ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মাঝে সে প্রতিভা আজ শুকিয়ে যেতে বসেছে। দারিদ্রের পীড়নে মাইকেল এবং আরো কত প্রতিভাকে সকলের অলক্ষ্যে শুকিয়ে যেতে দেখেছি—সেদিন বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি—কিন্তু সেদিনের সে লজ্জার কথা আজও কী বাঙ্গালীকে পীড়া দেয়না? আমাদের সেদিনকার সেই কর্তব্যচ্যুতিতে আজও কী আমরা অনুশোচনার ভারে নুইয়ে পড়ি না? তাই আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে আমাদের আকুল মিনতি—কবির দারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করতে তাঁরা সচেতন হ'য়ে উঠুন। যে কবি সারা জীবন ভরে বাঙ্গালীকে এত দিয়েছেন—প্রতিদানে বাঙ্গালীর কী কিছুই দেবার নেই!

কবি নজরুলের বহু কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হ'য়েছে—কবি নজরুল বহু চিত্রের সুর সংযোজনা করেছেন—তাঁর গান (কথা) বহু চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেছে—তাই এবিষয়ে চিত্রজগতের বন্ধুদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। বাংলা চিত্রজগতে নিউ থিয়েটার্স লিঃ এবং রীতেন এ্যাণ্ড কোং-এর নাম আজও সুবিদিত। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র (ছোটাইবাবু), রীতেন এ্যাণ্ড কোং শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-লাল চট্টোপাধ্যায় (হারুদা)—আমরা বিশেষ করে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এঁরা অগ্রণী হ'য়ে কয়েকটী বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন। যার সমস্ত অর্থ কবি নজরুলকে দেওয়া হবে। তাছাড়া বাংলার বিভিন্ন সুধীজনকে নিয়ে 'নজরুল-সাহায্য-ভাণ্ডার' গড়ে তোলা হউক—জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে কবির দারিদ্র্যের বোঝা কমাতে যাঁরা যত্নপর হ'য়ে উঠবেন। শুনেছি বাংলা সরকার কবিকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকেন—বাংলা সরকারের এই সাহায্যদানকে আমরা অভিনন্দিত করছি। কিন্তু তার পরিমাণ কতটুকু? তাই এ বিষয়ে সমস্ত বাঙ্গালী জনসাধারণেরই দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আজ জীবিতাবস্থায় যদি কবিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে আমরা রক্ষা করতে না পারি—আমাদের ভবিষ্যৎ জনসমাজের কাছে আমাদের এই কলঙ্কের কথা কী চিরদিনের জন্য লজ্জার কারণ হ'য়ে থাকবে না?—সম্পাদক রূঃ মঃ]

বেতার-জগৎ—

(বেতারের শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার পর)

কানুন আছে যা প্রত্যেক শিল্পীর ও কর্মীর ওপর প্রযোজ্য. এই সব প্রচলিত নিয়ম কানুনকে আমরা আইন হিসেবে ধরে নিতে পারি। আইনের চোখে সব মানুষই সমান। সাধারণ মানুষ আইনের এই নিরপেক্ষতাকে শ্রদ্ধার সংগেই গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বেতারে প্রচলিত আইনগুলি ব্যক্তি বিশেষে হেরফের ঘটে থাকে এবং এই জন্যেই আইনের বে-আইনী বেতারে বেশ চমৎকার ভাবে চলছে। কলিকাতা বেতারে দীর্ঘ ন বছর কাজ করার পর লাইব্রেরীয়ান এবং শব্দ-কুশলী শ্রীযুক্ত পূর্ণ ঘোষকে বিদায় করে দেয়া হলো, কেননা—জানা গেল শ্রীযুক্ত বেতারের তৎকালীন বড়বাবু শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাইয়ের শালা। বেতার থেকে অনুগ্রহ ও পোষ্য পোষণ বন্ধ করবার জন্যেই দূর দিল্লীর নির্দেশে কলিকাতার কর্তারা একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে হিংস্রভাবে কর্মীদলন ও শিল্পী বধ করতে লাগলেন—সে হলো ১৯৪০-৪১ সালের কথা। এই শুদ্ধি আন্দোলনের বলে একমাত্র শ্রীযুক্ত ঘোষই নন, বেতারের বাণীকুমারের ভাই কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং আরো অনেকে এই কারণেই বেতার থেকে বিদায় নিলেন। একটা বড় প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি দূর করতে গেলে কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং তাই বজায় রাখতে গেলে অনেক সময় অপরাধীদের সংগে নিরপরাধীকেও শাস্তি পেতে হয় সেজন্য আমরা বেতার কর্তৃপক্ষকে দোষ দিই নি। কিন্তু আমরা খবর পেলুম, কলিকাতা বেতারের সাম্প্রতিক অন্যতম "বড়বাবু" মিঃ জামানের ভাই কলিকাতা বেতারে কাজ পেয়েছেন। আমরা মিঃ জামানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার দক্ষতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করি না—কিন্তু ভেবে অবাক হই যে, আত্মীয়তার সূত্র ধরে একজন অভিজ্ঞ কর্মীকে বেতার থেকে বিদায় দেয়া হলো—সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই বেতারের গদিতে অন্য জন আসীন হয় কি করে?

আমরা কলিকাতার বর্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত সেনকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি এবং আশা করছি আইনের এই বে-আইনী রদ করে শ্রীযুক্ত পূর্ণ ঘোষকে আবার বেতারে আহ্বান করে আনবেন।

লাউড-স্পীকার

বড়কর্তার উপস্থিতি—

কিছুদিন পূর্বে বেতারের বড়কর্তা খাস কলিকাতায় এসে হাজির! কলিকাতার বেতার-রাজত্বে সাড়া পড়ে গেছে, বেতারের বিভাগীয় পরিচালকরা যাঁরা দিবা-নিদ্রায় না হোক গাল-গল্পে আর সিগারেট ফুঁকে কোন রকমে মাস কাবার করে মোটা রকমের মাহিনা মাসের শেষে নিজের নিজের জেবের মধ্যে আনয়ন করতে তৎপর—তাঁদের তৎপরতা দেখি বেড়ে গেছে। ভয়ানক ব্যস্ত তাঁরা, এক এক জনের টেবিলে চারটে পাঁচটা ফাইল—কোনটা খোলা, কোনটা আধখোলা। মাথা গুঁজে সব কাজ করছেন, অহেতুক এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটা-ছুটি করছেন—এমনি কাজে বিব্রত যে এঁদের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ যেন ভূ-ভারতে আর কেউ নেই—সত্যি এমন চাঞ্চল্য ও সজীবতা বেতারে অনেকদিন দেখি নি...হঠাৎ মনে পড়লো ছাত্র-বয়সে এমনি তৎপরতা দেখে ছিলুম স্কুলে স্কুল-ইনেস্‌পেক্টারের উপস্থিতির সময়। সমস্ত বছরে মাত্র একদিন—সব ঝাড় পোঁচ হত, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে রাখা হতো—ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে বলা হত। কথাটা ভেবে হাসি পেলো। হেসে ফেলতেই বেতার-বন্ধু বললেন: 'হাসছ যে'—উত্তর দিলুম: 'তোমাদের ইনেস্‌পেক্টার সাহেবের উপস্থিতি উপলক্ষে তোমাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখে!' 'বটে, চাকরী করলে বুঝ্‌তে কি ঠেলা! কোন উত্তর দিলুম না—উত্তর দিয়েই বা কি হবে। দায়িত্বশীল পদে থাকাটাকে এঁরা কেবল চাকরী মনে করেন—তা ছাড়া আর যেন কিছু নয়। তাঁরা যে দেশের ও দশের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারেন, সমাজ জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করতে পারেন—ভেদ বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতার পাঁক থেকে এদেশের মানুষকে উদ্ধার করে তার নবজীবনের সৃষ্টি করতে পারেন—এঁরা সে কথা ভুলে গেছেন, এঁরা জানেন এটা চাকরী ছাড়া আর কিছু নয়—আর কোন দিক নেই। তাই কোন রকমে মাস কাবার করে মোটা টাকা পকেটজাত করতে এঁরা তৎপর—তাই বড়কর্তার উপস্থিতিতে বছরে একবার বা দু'বার মাত্র এঁদের তৎপরতা দেখা যায়—বাকি সময় কাটে অলস কল্পনায়, গাল-গল্পে শিল্পীবধে, শিল্পী বিতাড়নে আর পরিচিত বন্ধু ও আত্মীয় পোষণে। বেতারকে সুন্দর করতে এরা জানে না—এই সব চাকুরীজীবি, অলস, উদ্যমহীন ব্যক্তিদের নিয়ে বেতার শুধু একই জায়গায় ঘুরপাক খাবে, কোন রকমে সময় পূরণ করে অনুষ্ঠান তৈরী হবে, রাম শ্যাম যদু মধু এসে গাইবে, বাজাবে, অভিনয় করবে। একটা অর্থহীন উদ্দেশ্য-।বহীন অনুষ্ঠান চলতে থাকবে—জনসাধারণের অর্থে। এতে প্রতিবাদ করার কেউ থাকবে না, নতুন শিল্প ও শিল্পী অন্বেষণের কোন চেষ্টাই হবে না......সমালোচনা করলে বলা হবে যে দুষ্টলোকের ঈর্ষা প্রণোদিত প্রচেষ্টা......এমনি চলবে চিরকাল.........?

ভাবতে ভাবতে আর একটা ঘরে উপস্থিত হলুম। শুনলুম বেতারের বড়কর্তা মিঃ পি, সি, চৌধুরী ইতিমধ্যেই এসে একটা কাজ করেছেন,—কলিকাতা বেতারের এম্‌প্লইজ এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ ইস্‌রাইলের সংগে এবং বেতার জগতের সহ-সম্পাদকের সংগে দেখা সাক্ষাত করে কলিকাতার চালচলন বোঝবার চেষ্টা করে গেছেন। অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘকালের কেরাণী-কর্মীদের বরখাস্ত করে লড়াই-ফেরত ব্যক্তিদের নিয়োগ-নীতি নিয়ে সম্প্রতি কেরাণী-কুল এবং বেতার-কর্তাদের মধ্যে একটা তপ্ত ও কটু সম্পর্ক স্থাপিত হবার উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছিল, কেরাণী-কর্মীরা নতুন করে পরীক্ষা না দিতে সঙ্কল্প হওয়ায় ধর্মঘটের প্রস্তুতিকে আরো দৃঢ় করে আনছিলেন,এমনি সময় বড় কর্তার উপস্থিতি খাস কলিকাতায়।

আশা করি বড় কর্তার উপস্থিতি এবং আশ্বাস বেতারের আবহাওয়াকে স্বাভাবিক করে আনবে।

সাবাস ভাই—

পাগলা মেহের আলির মতো আমরা বেতার প্রোগ্রাম "সব ঝুটা হ্যায়" বলি না। মাঝে মাঝে সৎ কাজের মতি কর্তাদের মাথায় আসে দেখে আমরা একটু উল্লসিত হই বৈকি! কতকগুলো অনুষ্ঠান

আমাদের ভালই লাগে যেমন 'অন্নপের আসর', বাণী কুমারের 'বেতার বিচিত্রা', লণ্ডন 'বিচিত্রা', বেতার-নাটক মাঝে মাঝে মনে ঝিলিক দিয়েও যায়। সম্প্রতি আন্তঃ এসিয়া সম্মেলন'-এর শেষ অধিবেশন রিলে করে শোনাবার জন্য কর্তাদের 'বেশ ভাই, সাবাস ভাই' বলতে ইচ্ছে করে বৈকি! সত্যি বিগত ২রা এপ্রিল রাত্রি ১০.৪০ মিঃ এই আন্তঃ এসিয়া সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী—ডাঃ শারীয়ার—ইণ্ডোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর একত্রিত সমাবেশ ও বাণী। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সামগ্রীক ও বাস্তব বর্ণনা দেবার ভার পড়েছিল জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোকের ওপর—তাঁর অনুপম বর্ণনা ভংগীমায় মহাত্মার, ডাঃ শারীয়ার প্রভৃতির বাণী, গান্ধীজির উপস্থিতি, পঁচিশ হাজার দর্শকের ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের তাঁকে নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন··· প্রতিনিধিদের বেশভূষা·· তাঁদের অবস্থান···ইত্যাদির বাস্তব ছবিটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলিয়েছিলেন। এই সম্মেলন ভারতের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এসিয়া সমস্ত জগতের আশার, জ্ঞানের ও প্রেমের পথ প্রদর্শক হবে—এই স্মরণীয় সম্মেলনের রিলে করবার ব্যবস্থা করে সত্যিই একটা কাজের মত কাজ করেছেন—তাছাড়া গণ-পরিষদের অধিবেশনের বিভিন্ন দিনের বক্তৃতাবলী ইত্যাদি রিলে করে বেতার-কর্তারা জনগণের সংগে বেতারের একটা যোগসূত্র স্থাপন করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করছেন। এজন্য তাঁদের আমরা সাধুবাদ দিচ্ছি—আর রায়বেঁশের ধ্বনির মত বলছি: বেশ ভাই! সাবাস ভাই!

গুজব তাহলে সত্যি—

বিগত ২৫শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস'—শ্রোতাদের 'অনুরোধের গানে' কতকগুলো স্বদেশী গানের রেকর্ড বাজানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এ রেকর্ডগুলো নিষিদ্ধ তো নয়-ই বরং সকালে-বিকালে যখন তখন বাজানো হয়ে থাকে। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী এই ভয়ানক (?) দিনে এই ধরণের রেকর্ড বাজালে ইংরেজ ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই ভারত ছেড়ে পালাতে পারে এই আশঙ্কায় স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহী কর্তারা এই "স্বদেশী" গানের রেকর্ডের পরিবর্তে "ভালবাসার" গান বাজিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই স্বদেশী গানের রেকর্ড বাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রসিদ্ধা সংগীত-শিল্পী শ্রীবিজন বালা ঘোষ দস্তিদার। কিছুদিন হ'ল তাঁকে "রেকর্ড বিভাগ" থেকে অন্যত্র বদল করা হয়েছে। লাইব্রেরীয়ান মিঃ গুপ্ত এই আকস্মিক পরিবর্তনের 'কারণ' জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে "সাবধান" (Warning) করে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি যে কাজে বিশেষ দক্ষ (Competent) নন—তিন বছর কাজ করবার পর মিঃ গুপ্তকে অকর্মণ্য বলে বেতার কর্তারা জানতে পারেন—সব চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার নয় কি? ১৯৪৬ সালে এই স্বদেশী রেকর্ড বাজাবার অপরাধে ঘোষক সুনীল দাশগুপ্তকে বেতার থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল—১৯৪৭ সালে এই অভিনব অপরাধে দুজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন—এঁদেরও হয়তো বেতার ত্যাগ করতে হবে।

সম্প্রতি আমরা খবর পেলুম শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের বাৎসরিক চুক্তি (Yearly Contract) করা হবে না বলে বেতার-কর্তারা স্থির করেছেন।

আমরা সত্যিই স্বাধীনতার দ্বার দেশে উপস্থিত হয়েছি। দেশদ্রোহী চাকুরী সর্বস্ব বেতার-বিচারকদের "বিচার ও রায়" অসহায়ভাবে আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। বেতার-কর্তাদের এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি এবং অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার প্রতিবাদ না করে আমরা পারি না।

১৯৪৬ সালের স্বাধীনতা দিবসের বলি: শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত।

১৯৪৭ সালের বলি কি শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার ও মিঃ গুপ্ত?

"বন্দেমাতরম্"

বিগত ২৮শে মে বুধবার রাত্রি ৭-৩৫ মিঃ "অনুরোধের আসর" অনুষ্ঠানে সমস্ত দেশকে বিস্মিত ও আনন্দে আপ্লুত করে বেতার কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বেতারে সর্ব-প্রথম "বন্দেমাতরম" ও অন্যান্য দেশভক্তিমূলক গান প্রচার

করেছেন। পরাধীনতার মনোবৃত্তিতে আমাদের প্রতিটি কাজ আজ কলংক-মলিন, বেতারে বিশেষ করে এই মনোবৃত্তি এত ব্যাপক ও উগ্র যে দেশভক্তিমূলক গানগুলোও বেতারে বাজান হয় না—জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম্" বাজান তো দূরের কথা। জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম" কলিকাতা থেকে প্রচারিত হয়ে কলিকাতা বেতারের সমস্ত পাপ, অপরাধের মালিন্য ধুয়ে মুছে দিল এবং জাতীয় জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তে "বন্দেমাতরম্" "জনগনমন অধিনায়ক", "হিন্দুস্থান হামরা হ্যায়" প্রভৃতি সমবেত গান প্রচারের ব্যবস্থা করে কলিকাতার কর্তারা একটি বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের সাধুবাদ দিই। পরিচালক শ্রীযুক্ত অশোক সেনকে এইজন্য বাংলা ও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও সমর্থন করবে।

সব ভাল যার শেষ ভাল—কি বলেন ?

জনমতের জয়—

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র বাংলা দেশের জনসাধারণের জন্য হলেও ব্যক্তি বা দল বিশেষের কুক্ষিগত হয়ে জনসাধারণের থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি ও দল বিশেষের খুসী ও খেয়ালকে আশ্রয় করে অনুষ্ঠান রচিত ও প্রচারিত হত। জনসাধারণের দাবী, মত এবং ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই বেতার দেয় নি। বেতারকে সাধারণের সামগ্রী এবং দল বিশেষের প্রাধান্য মুক্ত করে তাকে সাধারণের প্রিয় করে তোলার জন্যে 'রূপ-মঞ্চে' বেতার সমালোচনা সুরু করে তীব্রভাবে এই কঠোর দায়িত্ব পালন করবার জন্য অনেক সময় পরিচিত বন্ধুদেরও আমাদেব আঘাত দিতে হয়েছে। যেখানেই আমরা অন্যায় দেখেছি, দেখেছি অক্ষমের আস্ফালন ও দলবিশেষের দম্ভ, যখনই দেখেছি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির অহেতুক হত্যা, দেখেছি পোষ্য-পোষণের ও পরিচিতকে আর্থিক সুবিধা করে দেবার কুৎসিত প্রচেষ্টা তখনই আমরা আঘাত করেছি তীব্রভাবে। আজকে আমরা সগর্বে ঘোষণা করতে পারি যে, আমাদের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি—আঘাতে আঘাতে বেতার কর্তাদের ঘুম ভেঙ্গেছে—তাঁরা জনসাধারণের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেছেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'লো বিগত ১৮ই মে স্বনামধন্য পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও ছোটদের 'দাদুমনি' শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতা বেতারে একযোগে প্রত্যাবর্তন। ১৮ই মে সকাল সাড়ে ৯টায় "সংগীত শিক্ষার আসর" পুনঃ প্রবর্তন এবং তারই পরিচালক রূপে শ্রীযুক্ত মল্লিকের পুনরাবির্ভাব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রোতাদের সুস্পষ্ট অভিমত জানবার জন্যে কলিকাতার কর্তারা তাঁদের মুখপত্র "বেতার জগৎ" মারফত ভোট নেবার ব্যবস্থা করেছেন—শ্রীযুক্ত মল্লিকের জনপ্রিয়তা এবং গায়ক ও সংগীত শিক্ষক হিসাবে দক্ষতা নির্ধারণ করবার জন্যে। বিগত ১৮ই মে রবিবার সন্ধ্যায় "গল্পদাদুর আসর"-এর পরিচালক হিসাবে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বেতারে নতুন করে পদার্পণ করলেন। ষ্টেশন-পরিচালক শ্রীযুক্ত অশোক সেনকে শ্রোতাদের দাবী মেনে নেবার জন্যে আমরা অভিনন্দিত করছি। আমরা আশা করি, কালোদা-ভুলোদাদের কারবার তাহলে একেবারেই শেষ ?

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য রূপ মঞ্চ সম্পাদক মশাই শ্রীযুক্ত মল্লিককে অভিনন্দন জানিয়ে যে অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিলেন—শ্রীযুক্ত মল্লিক তার যোগ্য উত্তর দিয়েছেন, তাহলো এই :

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের চিঠি—

প্রিয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়,

আপনার ৩রা তারিখের পত্র পড়ে অতীব প্রীত হলাম এবং আপনাদের শুভেচ্ছা আমি অন্তরের সহিত গ্রহণ করলাম।

বেতার ষ্টেশনে "সংগীত শিক্ষার আসরের" পুণঃ প্রতিষ্ঠার জন্য "রূপ-মঞ্চকে" আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

ভবদীয়

পঙ্কজকুমার মল্লিক

আইনের বে-আইনী—

কলিকাতা বেতারে এমন কতকগুলি প্রচলিত নিয়ম

(বেতারের বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

চোখ ও চলচ্চিত্র

ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম্, বি ; বি, এম্, এস্।

★

কল্পনার জাল বোনা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এই কল্পনা বিলাসের বহিঃপ্রকাশেও ঘটেছে বিস্ময়কর রূপান্তর। নিদ্রার গভীরতম অবচেতন মনে এই কল্পনার ফুল ফুটে ওঠে স্বপ্নের বৈচিত্র্যে ও সীমাহীন অসম্ভবতায়। জাগ্রত চেতনে এরই বহিঃপ্রকাশের তাগিদে জন্ম হয় শিল্পের, সাহিত্যের, অভিনয়ের। এই শিল্পমনের অবদান আমরা লক্ষ্য ক'রেছি অতি আদিম গুহাবাসী মানবের প্রাচীর চিত্রে। অক্ষম অপটু হাতে তীক্ষ্ণধার পাথরের তুলিস্পর্শে এই আদিম শিল্পী এঁকে গেছে তার দেখা ও অদেখা নানা জানোয়ারের রূপ পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে। শুধু তাই নয়, চলমান ঘোড়া বা কুকুরের গতিকে রূপায়িত ক'রবার চেষ্টাও কোনো কোনো গুহাচিত্রে দেখা গেছে। সাধারণতঃ পা গুলির অস্বাভাবিক অবস্থানে বা পর পর কয়েকটি ছবিতে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের বিভিন্ন ভংগীতে অথবা একই জানোয়ারের অনেকগুলি পায়ের পর পর বিভিন্ন অবস্থানে—শিল্পী এই গতিকে চিত্রিত ক'রবার চেষ্টা ক'রে গেছে। আধুনিক অতি উন্নত চলচ্চিত্রের সূচনা ওখানেই নয় কি? প্রাক্‌চলচ্চিত্র যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা তাই অসভ্য আদিম চিত্রকারের অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণে হয়ত হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারেন নাই; কিন্তু পরবর্তী যুগের গতিশীল চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার প্রেরণাও হয়ত এগুলিই। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির সাথে সাথে এল স্থিরচিত্র—ফটোগ্রাফী। আর কল্পনার রেখায়ণ নয়, বাস্তবের মৌলিক প্রতিচ্ছবি ক্যামেরায় ধরা প'ড়ল। তারপর সুরু হ'ল চিত্রকে গতিশীল ক'রবার বৈজ্ঞানিক সাধনা। ১৮৩৩ সালের হর্ণার (Horner) নির্মিত জুওট্রোপ (Zoetrope) যন্ত্রে তার সূচনা এবং জর্জ ইষ্টম্যান (George Eastman), ফ্রীস্ গ্রীণ্ (Friese Greene), এডিসন্ (Edison), রবার্ট পল (Robert Paul) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বর্তমান সবাক ফটোফোন প্রোজেক্টর (Photophone Progector) যন্ত্রে তার পরিণতি। সম্প্রতি Stereoscopic বা অগ্র পশ্চাৎ ভেদ সংজ্ঞাপক ছবিও নির্মিত হ'চ্ছে।

আজ সমস্ত পৃথিবীতে সভ্যসমাজে চলচ্চিত্র এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রেছে; এর জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। প্রথমে নিছক আমোদ প্রমোদের অংগ হিসাবে সুরু হ'লেও শিক্ষা, সমর এবং সমাজ সংস্কারের একটি শক্তিশালী বাহনরূপে চলচ্চিত্র বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজ জীবনে অপরিহার্য। বস্তুতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের যেসব দুরূহ অংশ কল্পনায় চিন্তাশক্তির সাহায্যে অধিগত ক'রতে হয়, বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রের কল্যাণে সেগুলি চোখের সামনেই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। শব্দের সংযোগে বিষয়বস্তু আরও সজীব হ'য়ে ওঠে। চিত্র শব্দ সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সিনেমার আনন্দ বা সিনেমায় শিক্ষা মূলতঃ দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সভ্যমানুষের চিন্তাশীল চেতনায় যান্ত্রিক চলচ্চিত্রের প্রবেশপথ হ'চ্ছে এই চোখ। চক্ষুহীনের কাছে চলচ্চিত্র অর্থহীন। চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণকে স্পষ্ট ও বাস্তব ক'রে তুলবার এবং এই যন্ত্র গৃহীত ফিল্মকে ছবির পর্দায় স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে প্রতিফলনের চেষ্টায় খুবই উৎকর্ষ লাভ করা হ'য়েছে। আবার অভিনয় ও অন্যান্য বিষয়বস্তুও দর্শকদের চেতনা ও রুচি অনুযায়ী যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করার চেষ্টাও যথেষ্ট সাফল্যলাভ ক'রেছে। কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় বস্তু যা এই দু'টি জিনিষের প্রধান সংযোগ সাধক অর্থাৎ দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় এই চোখের স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য যথোচিত যত্ন নেয়া হয় নাই। বোধহয় এর কারণ, এই বিরাট চলচ্চিত্র শিল্পে বিজ্ঞান-যন্ত্রী, ইন্‌জিনীয়ার, অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক-সমালোচক প্রভৃতির পারস্পরিক সহযোগীতা আছে। কিন্তু চিকিৎসক বিশেষতঃ চক্ষু বিশেষজ্ঞের স্থান নাই। তাই সিনেমা

অধিষ্ঠিত শহরে চক্ষুরোগের প্রকোপও ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে পুরু পুরু কাঁচওয়ালা চশমা এখন আর অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না। একথা আর অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও চোখের অন্যান্য দুর্বলতার জন্য সিনেমা অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু আমোদ ও শিক্ষা প্রচারের জন্য সিনেমার আরও ব্যাপকতর প্রসারের প্রয়োজন। কাজেই যাতে চোখের স্বাস্থ্যও বজায় থাকে অথচ সিনেমার প্রয়োজনীয় প্রদর্শনও ক্ষুণ্ণ না হয় এমন আয়োজনের দরকার আছে। এবং এই উদ্দেশ্যে চিত্র নির্মাতা, চিত্র প্রদর্শক এবং চিত্রদর্শক এই তিনজনেরই কতগুলি নিজস্ব কর্তব্য আছে।

প্রথমে চিত্রনির্মাণের কথাই ধরা যাক। ফটোগ্রাফীর ভার অতি নিপুণ শিল্পীর হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিৎ যাতে সমস্ত ছবিগুলি সেলুলয়েডে সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হয়। অতিশয় দ্রুত গতি যুক্ত বা অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী বেশী না থাকাই ভাল। কারণ, কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশী ছবির ফোকাস্ চোখকে ক্লান্ত ক'রে ফেলে। এখানে একটা জিনিষ বলা দরকার। চোখের ভিতর অপটিক নার্ভের (Optic Nerve) একটি অতি কোমল স্নায়ুতন্ত্রীময় পর্দা আছে, এর নাম রেটিনা (Retina)। আমরা যা কিছু দেখি তার প্রতিচ্ছবি আগে এই রেটিনার উপর প্রতিফলিত হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রীযোগে মস্তিষ্কে এর সাড়া পৌঁছে যায়, ফলে আমরা "দেখি"। ক্রমশঃ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে। প্রত্যেক "দর্শনের" সাথে সাথে চোখের অভ্যন্তরে ভিস্যুয়াল পার্পল্ (Visual Purple) নামে একটি জৈব রাসায়নিক বস্তু ভেংগে যায় এবং "দর্শনের" শেষে আবার পুনর্গঠিত হয়। দর্শন ব্যাপারের এই সূক্ষ্ম ভাংগন ও গড়নে কিছু সময়ের দরকার; এই সময়ের ভিতরেই অতিদ্রুত চিত্র প্রতিফলনের ফলেই বিভিন্ন ছবির পার্থক্য চোখে ধরা পড়ে না এবং ছবি সচল ব'লে মনে হয়। এই হ'ল সিনেমার মূল তথ্য। এর উপর দৃশ্যটা যদি দ্রুত পরিবর্তনশীল হ'তে থাকে তবে রেটিনার স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হ'য়ে প'ড়বেই। আজকাল রঙীন ছবিও তোলা হ'চ্ছে। বড় বড় পূর্ণাংগ ছবি নানারঙে রঙীন ক'রে দেখানো হয়। এখানে জানা দরকার যে, চোখের পক্ষে নীল, সবুজ ও বেগুনে রঙ্ স্নিগ্ধকর এবং উগ্রলাল, সোনালী, রূপালী ও ফুলকাটা বুটিদার রঙ্ পীড়াদায়ক। তাছাড়া নানারঙের ভীড়ের ভিতর উপযুক্ত সামঞ্জস্য সাধনও রেটিনার রঙ্-উত্তেজনাকে অনেকটা শান্ত ক'রতে পারে।

এরপর আসে চিত্র প্রদর্শকের কথা। এর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। চিত্রগৃহ ও প্রদর্শকযন্ত্র এই দুইটিই হচ্ছে চিত্রপ্রদর্শনের প্রধান উপকরণ। প্রদর্শকযন্ত্রে কার্বন দণ্ড দুয়ের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ স্ফুলিংগ প্রেরণের ফলে উদ্ভূত অত্যুজ্জ্বল আলোর সাহায্য নেয়া হয়। এর ফলে ফিল্মের ছবি পর্দার উপর খুব সুষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়, অবশ্য জটিল ফোকাসিং ব্যবস্থার সাহায্যে। এর আবার দু'রকম প্রকার ভেদ আছে, অতি উজ্জ্বল (High Intensity) ও অনতি উজ্জ্বল (Low Intensity)। আজকাল প্রায় সমস্ত ভাল চিত্রগৃহেই অতি উজ্জ্বল প্রতিফলকযন্ত্র সন্নিবেশিত আছে। তার সাথে অবশ্য উপযুক্ত ফোটাফোন শব্দ যন্ত্রও স্থাপিত আছে। এই কার্বন বিচ্ছুরিত আলো ঈষৎ নীলাভ, কাজেই প্রতিফলিত ছবির ঈষৎ নীলাভ চোখের পক্ষে আরামদায়কই হয়। ভাল ফোকাস্ যাতে ঠিকমত বজায় থাকে সেজন্য অপারেটরের সতর্ক থাকা উচিৎ। কারণ, ফোকাস্ দুর্বল হয়ে পড়লেই দর্শকের চোখ চেষ্টা করবে পর্দার ছবির প্রতিচ্ছবি নিজেই ঠিকমত ফোকাস্ করে নিতে; আর এই চেষ্টায় অবসন্ন হ'য়ে পড়বে। ভাল চিত্র ও শব্দযন্ত্রের স্থাপন ও উন্নতি সাধনের দিকে আমদের চিত্রপ্রদর্শকের কড়া নজর আছে বটে, কিন্তু চিত্রগৃহ নির্মাণ ব্যাপারে তাঁরা চক্ষুবিজ্ঞানকে অত্যন্ত উপেক্ষা করেছেন। চটকদার দেয়ালচিত্র ও রকমারী আলোর বাহারই সব নয়। কলিকাতার দেশী সিনেমার মালিকদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, হলে যতদূর সম্ভব বেশী আসনের ব্যবস্থা করা। বৈজ্ঞানিক সংস্থাপনের বালাই খুব কম ছবিঘরেই নজরে পড়ে। ছবিঘরগুলির চতুর্থশ্রেণীর দর্শক আর

রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর একই অবস্থা; অবজ্ঞাত উপেক্ষিত এরা। ছয় আনার পয়সা দিয়ে যে হলের ভিতর ঢুকতে পেরেছে তাই যেন তাঁদের সৌভাগ্য! প্রায়ই দেখা যায়, চতুর্থ শ্রেণীর আসনগুলি দুপাশে অত্যন্ত বেশী বিস্তৃত। যার ফলে মাঝখানে আসীন ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যেরা ছবির অল্পবিস্তর বিকৃতরূপই দেখতে পায়। আর পিছনে ঘাড় বেঁকিয়ে ও অসম্ভব অ্যাংগেলে দু'চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবির মাধুর্য উপভোগ করতে হয়। ফলে ঘাড় ব্যথা ও মাথাধরা, আর অ্যাসপিরীন ভক্ষণ সিনেমা-প্রত্যাগতদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। অবশ্য উত্তর কলিকাতার তিনটি ছবিঘর ও দক্ষিণ কলিকাতার একটি হলে এই সামনের সারীগুলির আসনসংখ্যা অনেক কম করা হ'য়েছে—দু'পাশে অনেকটা জায়গা খালি রেখে। কিন্তু আশানুরূপভাবে নয়; মুনাফার দিক দিয়ে আর একটু নিঃস্বার্থ হলে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আরও নির্দোষ হয়ে উঠত। তারপর "ঢাল" বা "Slope" এর কথা। প্রায় সমস্ত হলেই সামনের চেয়ে পিছনের আসনশ্রেণীর উচ্চতা বেশী; এতে সম্মুখের দর্শকের মাথা পিছনের দর্শকের চোখে বাধা দেয় না। কিন্তু অল্প-বয়স্ক বালকবালিকাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না। ওদের জন্য একটু বেশী উঁচু আসনশ্রেণীর ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমেরিকায় আধুনিক চিত্রগৃহে এই ঢাল সম্মুখ হতে পিছন দিকে নেমে গেছে, যেমন কলকাতার লাইট হাউসে। এতে কষ্টকরে ঘাড় পিছন দিকে বেশী বেঁকাতে হয় না, ফলে চোখে জোরও লাগে কম। একটা কথা আছে যে, যতদূরে বসা যায় ছবি তত ভাল দেখা যায়। তাই পিছনের আসনের মূল্য বেশী। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। অনেক দূর থেকে ছবি স্পষ্টভাবে দেখা কষ্টকর। বাঙ্গালী পাড়ায় একটি মস্ত লম্বা হলের একধারে পিছনের আসনে বসে আমি এই অসুবিধা অনুভব করেছি। ছবিঘর অতিরিক্ত লম্বা হওয়া উচিৎ নয়।

ছুটির দিনে প্রত্যেক হলে ম্যাটিনি শো দেখান হয়। কলিকাতার হত্যালীলার পর সন্ধ্যার শো ত বন্ধ হয়েই আছে। অথচ সমস্ত ঘরটি সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার করার ব্যবস্থা না থাকলে ম্যাটিনি শো'র অনুষ্ঠান করা অনুচিত। কারণ, অন্ধকার না হলে পর্দায় ছবি স্পষ্ট হয় না, ফলে চোখের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে—ছবি স্পষ্টভাবে দেখবার চেষ্টায়। সাথে সাথে উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকাও অত্যাবশ্যক। তাছাড়া সারারাত ব্যাপী অবিরাম চিত্র প্রদর্শনী চোখের পক্ষে কতটা অপকার তা বলা বাহুল্য। এই প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিৎ। আমাদের চিত্রগৃহের মালিকদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি।

তৃতীয়তঃ নিজের চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় সিনেমা দর্শকের ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা আলোচ্য। চিত্রগ্রহণ বা চিত্র প্রদর্শনের ফলে যদি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয় তবে অনিষ্ট সবচেয়ে বেশী হবে দর্শকের নিজের, একথাটার সর্বদাই মনে রাখা উচিৎ। তাই সিনেমা দর্শনে সংযম পালন তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। চোখ যায় যাক্ কিন্তু ছবি দেখতেই হবে এরকম একটা মনোভাব একশ্রেণীর ছাত্রবন্ধুদের ভিতর লক্ষ্য করেছি। অবশ্য সিনেমা দেখা আমি মোটেই অনুচিত

বলে মনে করি না। তবে যাদের সিনেমা দেখলে মাথাধরা, চোখজ্বালা, বমিবমিভাব ইত্যাদি উপসর্গের সৃষ্টি হয়, তাদের উচিৎ উপযুক্ত চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা। এবিষয়ে অনেক সময় চশমার দরকার হয়, কখনও বা ভাইটামিনের অভাব লক্ষিত হয়। একদিনে দু'তিনটি শো বা শিবরাত্র উপলক্ষে সারারাত জেগে ছবি দেখার ফলে অনেক ছেলে মেয়ের দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণ দর্শকের আর একটি কদর্য অভ্যাস সিনেমা ঘরে ধূমপান করা। আবদ্ধ আবহাওয়ায়—বিশেষতঃ ম্যাটিনি শো'য়ে এই জ্বালাকর ধোঁয়া চোখকে অত্যন্ত পীড়িত করে। সিনেমা দেখার পরে চোখ ওঠার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখিছি। তাছাড়া ধোঁয়ার আবরণ পর্দার ছবিকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে বাধা দেয়।

যাহোক, বর্তমান সভ্যসমাজে সিনেমা একটি অপরিহার্য অংগ হ'য়ে পড়েছে; বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। আর সিনেমার রস আহরণে সাহায্য ক'রে প্রধানতঃ চোখ এবং কিছু পরিমাণে কান। গুরুভার লেখা পড়ায় পরিশ্রান্ত ছাত্রদের চোখ অবসর সময়ের আনন্দ খোঁজে সিনেমায়, যেখানে ওর উপর পড়ে আরও চাপ। তাই সিনেমা প্রদর্শক ও সিনেমা দর্শকের কর্তব্য এই চোখের শক্তিকে অনাহত রাখা। এরজন্য প্রয়োজন চিত্র ও চিত্রগৃহ নির্মাতাদের পরামর্শমণ্ডলীর মধ্যে উপযুক্ত চক্ষু বিজ্ঞানীর নির্দেশের ব্যবস্থা রাখা এবং আমাদের ছাত্রমহলে চোখের স্বাস্থ্য ও সিনেমার সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তার। পরিশেষে আমাদের চিত্রব্যবসায়ী ও চিত্রদর্শকগণ এই জরুরী বিষয়ে সম্যক সচেতন হ'য়ে উঠুন এই আশা নিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

যুদ্ধের পরে সিঙ্গাপুর

নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস

২৭শে নভেম্বর, বুধবার বেলা ২টায় "ডুনেরা" জাহাজে উঠলাম—কল্‌কাতা হতে সিঙ্গাপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জাহাজ ছাড়ল পরের দিন সকালে। বেলা তিনটার সময় জাহাজ এগিয়ে চল্‌ল ডায়মণ্ড হারবার ছেড়ে। দিনটা কেটে গেল—রাতের অন্ধকারের সংগে-সংগেই-শুনলাম আমরা সমুদ্রে এসে পড়েছি। সন্ধ্যা ৭টায় ডিনার সেরে উপরের ডেকে গিয়ে বস্‌লাম একা। অন্ধকার—শুধুই অন্ধকার—কোথায় চলেছি—কোন্ অজানা দেশে—এই বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে! মাটীর মায়া যে কী তা দেশ ছেড়ে যে বিদেশে না গেছে—সে উপলব্ধি করতে পারবে না। যাক্ পরের দিন ভোর হতে না হতেই—উপরের ডেকে এসে দাঁড়ালাম সূর্যোদয় দেখবার জন্য। সে কী অপূর্ব দৃশ্য! চারিদিকে নীল জল। দূরে—বহু দূরে—জলের ভিতর থেকে যেন একখানা সুবর্ণ থালা ধীরে ধীরে উঠল আকাশের গায়। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল রূপের জ্যোতি সমস্ত পৃথিবীর বুকে। বেলা ৭টায় ব্রেকফাষ্ট; সাড়ে নটায় লাইফ বেল্ট ট্রেনিং, ১২টায় লাঞ্চ, ৩টায় চা, সন্ধ্যা ৭টায় ডিনার এই ভাবে নিয়মের বাঁধা বাঁধির ভিতর দিয়ে কেটে গেল এক হপ্তা। ৪ঠা ডিসেম্বর সকালে জাহাজ সিঙ্গাপুরের নিকটে এল। অপূর্ব সে প্রাকৃতিক দৃশ্য। দূরে থেকে সহরটা যেন ছবির মত মনে হচ্ছিল। প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে "ক্যেথে বিল্‌ডিং"-এর ওপর সর্বোচ্চ সৌধ। এই ১৮তলা বিলডিং একদিন ছিল নেতাজীর সিঙ্গাপুরের হেড্ কোয়াটার। জাহাজ খারিতে প্রবেশ করতে দেখা গেল—বহু জাহাজ ইতঃস্তত ভাবে রয়েছে। বহু জাহাজের মাস্তুল, কোন কোন জাহাজের কিয়দংশ এখনও জলের উপর দেখা যাচ্ছিল—এই সকল জাহাজ গত কয়েক বৎসর আগের—জাপানী অত্যাচারের সাক্ষ্য রূপে এখনও রয়েছে জলের ভিতর। বেলা ১২টায় জাহাজ জেঠীতে লাগল—কাষ্টম অফিসারের অত্যাচারের হাত হতে রেহাই পেলাম কোন রকমে—অনেক খোঁজা খুঁজির পর যখন পেলনা কিছুই। বেলা ২টায় হোষ্টেলে পৌঁছলাম। সহরটা দেখবার খুবই ইচ্ছা হল, হাত মুখ ধুয়ে জিনিষ পত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম সহরে। প্রথমে ক্যাথে বিল্‌ডিং এখন সেখানে ক্যাথে সিনেমা, এবং উপরে নানা জাতীয় লোকের বাস। সম্মুখে ময়দান। যেখানে ঝাঁন্‌সীর রাণীর রেজিমেণ্ট ছিল এবং তাদের কুচকাওয়াজ হতো। জাহাজেই শুনেছিলাম—হেপী, নিউ এবং গ্রেট ওয়ার্লড এর কথা। আগ্রহ হলো দেখবার। অনেক খুঁজে একজন পাঞ্জাবী রিকসাওয়ালা পেলাম। এখানে বলা দরকার, রিকসা ওয়ালাদের প্রায় অধিকাংশই চীনা এবং মালয়ান, কিছু হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী। যাক পাঞ্জাবী রিকসাওয়ালাকে বল্‌লাম, যে-ওয়ার্লড কাছে আছে সেখানে নিয়ে চল। সে আমাদের নিয়ে গেল—হেপী-ওয়ার্লডএ—২০ সেণ্ট দিয়ে টিকিট কিনে ভিতরে গেলাম—গিয়ে দেখি আমাদের দেশের কার্নিভেলের মত। তবে অনেক উঁচু ধরণের। সিনেমা, মালয়ান ও চাইনিজ থিয়েটার, কাবেরে, অনেক বড় বড় রেঁস্তোরা, নাগর দোলা এবং বিভিন্ন ধরনের জুয়া, অনেক বড় বড় দোকান। প্রত্যেক দোকান-রেঁস্তোরা-জুয়ার আড্ডায় ২-৪ জন করে সুন্দরী চীনা মহিলা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আগন্তুকদের। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে মালয়ান নাচ। খোলা জায়গায় এক কোনে ছোট রঙ্গমঞ্চে, চার পাঁচজন মালয়ান মেয়ে—দেশীয় পোষাকে অর্থাৎ লুংগী এবং আমাদের দেশের ঢিলা হাতার পাঞ্জাবী, বপ্ হেয়ার কার্লিং—পায়ে জুতো—বেশ ভালভাবে সেজে গুজে মঞ্চের এক ধারে বসে আছে—মিউজিসিয়ানরা অর্থাৎ বেহালা, ড্রাম, এবং গং বাদক—তারা অনবরত বাজিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে চার পাঁচজন ছেলে ২৫ সেণ্ট করে টিকেট কিনে মঞ্চের ওপর উঠল—তখন মেয়েরা গান আরম্ভ করল এবং ছেলেদের সাথে নাচতে আরম্ভ করল। কতকটা বলরুম নাচের মত—তবে ছেলে মেয়ে সামনা সামনি থাকবে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করবে না। সাঁওতালিদের মত খুব সোজা ষ্টেপ্। নাচের সংগে মালয়ান ভাষায় গান—এদের গানের টিউন

বার্মিজ ও ভারতীয় সুরের একত্র সমাবেশ ; একটি গান শেষ হতে যতক্ষণ লাগে অর্থাৎ ৫-৬ মিনিট, নাচের পর গান শেষ হওয়ার সংগে সংগে—মেয়েরা গিয়ে বসে পড়ে তাদের আগের জায়গায়—আর ছেলেরা নেমে যায় মঞ্চ থেকে। আবার আর এক দল ছেলে আসে। এই ভাবে রাত ৮টা হতে রাত ১টা অবধি চলে এদের নাচ। এদের নাচের কোনই 'বিশেষত্ব নাই। তারপর দেখলাম—মালয়ান থিয়েটার। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের মত সাজ সজ্জা এবং দৃশ্যপট। তবে নাচ পাশ্চাত্য দেশের নাচের অনুকরণ, মাঝে মাঝে জাভা, বালীর নাচেরও কিছুটা দেখা যায়। হোষ্টেলে ফিরলাম রাত ১২টায়। সিঙ্গাপুরে ছিলাম প্রায় দেড় মাস। এর মধ্যে পরিচয় হলো এক জাভানিজ দম্পতির সাথে। এরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই শিল্পী। স্ত্রী বালীর মেয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী—স্বামী মুসলমান। এদের কাছ থেকে জাভা ও বালীর নাচ শেখবার সুবিধা করে নিলাম। বিনিময়ে তাদের শেখাতে হবে ভারতীয় নৃত্য। অনেক বাংগালী ভদ্র পরিবার এখানে আছেন। তাদের মুখ থেকে শুনলাম যুদ্ধের ইতিহাস, জাপানীরা যুদ্ধ জয় করে খুবই অত্যাচার করেছে স্থানীয় লোকদের ওপর। যদিও তাদের অধিকাংশ চীনা। চীনাদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী তাদের মুখ থেকে যা শুনলাম তা বর্বরোচিতই বলা চলে—ভারতীয়েরা পরিত্রাণ পেয়েছে শুধু নেতাজীর জন্য। কারণ যারা আই, এন, এর সভ্য হয়েছে, তারাই জাপানী অত্যাচার হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। তাই দেশের অধিকাংশ লোকই—কেউ ভয়ে কেউ দেশের ডাকে—সবাই যোগ দিয়েছিল আই, এন, এ-তে। দেশের যত বড় লোকই হোক না মাসে ২দিন অথবা ৪দিন রাস্তার কাজ এবং জংগলের কাজ তাকে করতেই হবে। না করলে ধরে নিয়ে যাবে এবং কঠোর শাস্তি দেবে। ওয়াই, এম, সি,-এ বিল্ডিং ছিল জাপানী আমলে টর্চার সেণ্টার—বিনাদোষেও কত লোক জীবন হারিয়েছে সেখানে। ওয়াই, এম, সির নামে লোকে তখন ভয় পেত। কোন দোকানে চুরি হলে তার আসেপাশের অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দিত এবং হয়ত নির্দোষী কারোর গলা কেটে রাস্তার মোড়ে লাইট পোষ্টে ঝুলিয়ে রাখত। এই রকম বর্বরোচিত প্রথা ছিল তাদের। মিঃ পেনাণ্ড বলে একজন বিখ্যাত সিংহলী ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় হয়েছিল। তার চার মেয়ে ছিল ঝাঁসির রাণীর দলে। তাদের মুখ থেকে শুনলাম নেতাজীর অদ্ভুত কার্য শক্তির কথা। তাদের বাড়ীতে কয়েকজন আই, এন, এর অফিসার যারা এখন ওখানে ব্যবসা করছে, তাদের কাছে শুনলাম, নেতাজীর শেষ বক্তৃতা ১৫ই তারিখে তারা শুনেছেন। নেতাজীর শেষ বাণী—"বৃটিশের এমন কোন বেয়নেট্ তৈয়ারী হয়নি যাতে আমার মৃত্যু হতে পারে—আমি যাচ্ছি কিছু দিনের জন্য তোমাদের কাছ হতে দূরে আবার সময় হলে একত্র হবো।" আরও অনেক কথা শুনলাম তাদের কাছ থেকে। নেতাজীর সাধারণ সৈনিকের মত জীবন যাপন। নেতাজীকে তারা ভক্তি করে দেবতার চাইতেও বেশী। অনেক শিক্ষিত মালায়ান ও চীনা পরিবারের সংগেও আলাপ হয়েছিল, চন্দ্র বোস্ বল্‌তে তারা কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান জানায়। সিঙ্গাপুরের রাফেল মিউজিয়মটী একটী দেখবার বিষয়। এখানের লাইব্রেরীতে জগতের সমস্ত ভাষার বই আছে। তন্মধ্যে জাভা বালী সম্বন্ধে অনেক বই আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য—এখানকার একটী শাখা শিশু-লাইব্রেরী-শিশুদের জন্য এত বড় বিরাট লাইব্রেরী বোধ হয় ভারতে কোথাও নাই। ওয়াই এম সির পার্শ্বেই এই মিউজিয়ম অবস্থিত। সিঙ্গাপুরে রাফেল হোটেল নামে একটী বিলেতী হোটেল আছে কলিকাতার গ্র্যাণ্ড বা গ্রেট ইষ্টার্ণের মত। রাফেল সাহেবের নামে একটী ইণ্টার ন্যাশনাল কলেজও আছে। এই কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টর ডোবে এবং মিসেস ডোবের সংগে আমার পরিচয় হয় এবং ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে অনেক কিছু তাঁদের সংগে আলোচনা হয়। ষ্টুডেণ্ট এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী মিস্ চৌ চাইনীজ মহিলার সংগে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে আলাপ হয় এবং ইনি চাইনীজ ও ভারতীয় নৃত্য ও নাটকের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে তা প্রমাণ করে দেন। সহরে দেখবার মত বিশেষ কিছুই নাই। চীনারা প্রায় সহরের সকল ব্যবসাই দখল করে বসে আছে। এখানের সব চেয়ে বেশী

আশ্চর্য, ঘরে ভাত থাকতেও অধিকাংশ লোক হোটেলে খায়। রাস্তাঘাটে সর্বত্রই বড় ছোট নানা রকমের হোটেল। এবং তার অধিকাংশই চীনাদের। সেখানে বেঙ, আরসুলা, ইন্দুর হতে আরম্ভ করে বড় সুকর রোষ্ট করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আর তার পরিবেশনের ভার সুন্দরী চীনা যুবতীদের হাতে। আমাদের চোখে দৃষ্টি কটু হলেও সহরের এইটাই হলো লাকসারী। চীনা মেয়েরা এখানে অত্যন্ত আধুনিকা। বাজার, হাট, দোকান ইত্যাদি হতে আরম্ভ করে সহরের প্রায় সব কাজই চীনা মেয়ে এবং ছেলেরা করে। এখানে টাকার মূল্য অনেক কম। একশত টাকার সমান ৬৪ ডলার। এক টাকা নয় আনার সমান এক ডলার অর্থাৎ ১০০ সেণ্ট এ একডলার। ডলার, সেণ্ট সবই কাগজ। অত্যন্ত দুর্মূল্য সব জিনিষ—যেমন একখিলি পান দশ সেণ্ট—একটি দেশলাই ২০ সেণ্ট এই ভাবে. আর একটি দৃষ্টান্ত—একদিন এক বাংগালী বন্ধুর সংগে বোটানিকেল গার্ডেনে বসে আছি। বিকেলের দিকে হঠাৎ পেছন হতে দুই জন অতি আধুনিকা চীনা মহিলা—ইংরাজিতে 'হ্যালো মিষ্টার' বলে সম্বোধন করে কাছে এগিয়ে এলো এবং বলল—'তোমরা কি কারো জন্য অপেক্ষা করছ?' তখন আমার বাংগালী বন্ধু বলল—'না—আমরা ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত। তাই এখানে বসে বিশ্রাম করছি এবং গল্প করছি।' তখন একটি মহিলা বলল—'দেখ আমরা তোমাদের সংগে গল্প করতে চাই—তোমরা আমাদের দুইজনকে দশ ডলার দিও।' বন্ধুবর তখন বলল—'আমাদের মাপ কর। কারণ, আমরা এখনই ঘরে ফিরব। তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না।' যেখানে মেয়েদের সংগে কথা বলা বা গল্প করার জন্য ১০ ডলার দিতে হয় সেখানে আমার মত গরীব বাংগালীর বেশী দিন থাকা সম্ভব নয় তাই তল্পী-তল্পা গুটিয়ে ১৬ই জানুয়ারী রওনা হলাম মালয়ের পুরাতন রাজধানী জহর বারুর উদ্দেশ্যে। ইচ্ছা ছিল যাভা বালী যাওয়ার কিন্তু ইন্দোনেসিয়ার গোলমালের জন্য অনুমতি পেলাম না। সুতরাং মালয় অভিযানই স্থির হলো।

(ক্রমশঃ)

বাংলা সবাক ছায়া ছবির প্রথম প্রকাশ

(৩)

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

★

১৯৩৮ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল।

১১৩। **অভিনয়** * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স।
প্রথম আরম্ভ—৩-৯-৩৮ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ চার্লস্ ক্রীড্ : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : নৃত্য—শ্রীমতী সাধনা বসু। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, বিভূতি, প্রীতি, তুলসী, সত্য, ভানু, ললিত, নবদ্বীপ, প্রভাত, সাধনা, প্রতিমা, লাবণ্য, সুলেখা।

১১৪। **অভিসারিকা★** মেট্রোপলিটান্ পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১২-১১-৩৮ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী : পরিচালনা—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীসত্যানন্দ দাস। ভূমিকায়—ডি, জি, সাবিত্রী, আশু, রাজলক্ষ্মী, হীরালাল, প্রকাশমণি, সত্য, ভবানীদেবী, নবদ্বীপ, কমলা।

১১৫। **অচিন প্রিয়া★** নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২৯-১০-৩৮ : চিত্রগৃহ—নিউ সিনেমা : কাহিনী, পরিচালনা ও ভূমিকায়—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

১১৬। **অর্ঘ★** নিউ থিয়েটার্স
চিত্রগৃহ—ছবিঘর :

১১৭। **অভিজ্ঞান** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১১-৬-৩৮ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবাণী দত্ত : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—জীবন, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, ভানু, মনোরঞ্জন, মলিনা, মেনকা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী।

১১৮। **একলব্য★** ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস্
প্রথম আরম্ভ—১৯-১১-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীহরিপদ হোম : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীধীরেন দাস। ভূমিকায়—জহর, অমল, তুলসী, তারক, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী।

১১৯। **খনা** * * * মেট্রোপলিটান পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১২-১১-৩৮ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদ্রোণাচার্য : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ এ, গফুর : সংগীত—শ্রীধীরেন দাস। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, সুশীল, অমল, ধীরেন, সমর, কালী, ছায়া, অরুণা, আঙুর।

১২০। **গোরা** * * * দেবদত্ত ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—৩০-৭-৩৮ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—মিঃ যশোবন্ত ওয়াশীকর : শব্দ-যন্ত্রী—সত্যেন দাশগুপ্ত : সংগীত—কাজী নজরুল ইসলাম। ভূমিকায়—জীবন, মোহন, নরেশ, মনোরঞ্জন, রবি, রাধিকানন্দ, ললিত, বিপিন, বেচু, প্রতিমা, রানীবালা, দেববালা, ইলা, বীণা।

১২১। **চোখের বালি** * এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার
প্রথম আরম্ভ—৩০-৭-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : সংগীত—শ্রীঅনাদি দস্তিদার। ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, ছবি, হরেন, সুপ্রভা, ইন্দিরা।

১২২। **জগাপসি★** দীনু পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—৮-৬-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু : পরিচালনা—শ্রীজানকী ভট্টাচার্য : আলোক-শিল্পী—শ্রীরাধিকা কর্মকার : সংগীত—শ্রীদেবরঞ্জন পণ্ডিত। ভূমিকায়—ধীরেশ, তারক, ধীরেন, কমলা, আঙুর।

১২৩। **দেশের মাটি** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—১৭-৯-৩৮ : চিত্রগৃহ—চিত্রা ও নিউ সিনেমা : পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। ভূমিকায়—দুর্গাদাস, সায়গল, ইন্দু, শ্যাম, পঙ্কজ, ভানু, অহি, অমর, টোনা, চন্দ্রাবতী, উমাশশী।

১২৪। **দেবী ফুল্লরা** * * * হাজরা পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—২৫-৬-৩৮ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, তিনকড়ি, মোহন, শিশুবালা, সাবিত্রী, চিত্রা, রাধারাণী।

১২৫। **বিদ্যাপতি** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—২-৪-৩৮ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—কাজী নজরুল ইসলাম : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীদেবকী কুমার বসু : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—পাহাড়ী, দুর্গাদাস, অমর, কৃষ্ণচন্দ্র, কানন, ছায়া, দেববালা, লীলা।

১২৬। **বেকার নাশন** * * * রাধাফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১৩-৮-৩৮ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ। ভূমিকায়—নরেশ, জহর, সুশীল, মন্মথ, কুমার, তুলসী, রাণীবালা, দেববালা, ছায়া।

১২৭। **রেশমী রুমাল★** দীপ্তি পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—৮-৬-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীমনোজ মোহন বসু : পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—হরেন, গোকুল, মুরারী, প্রভা, সাবিত্রী, উষা, কমলা।

১২৮। **রূপোর ঝুমকো★** ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস

প্রথম আরম্ভ ৯-১১-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ : সংগীত—শ্রীএস, এন, দাস। ভূমিকায়—ধীরাজ, সত্য, নীলু, কার্তিক, পারুল, কমলা, বেলা, রাজলক্ষ্মী, গীতা, বীণা।

১২৯। **সার্বজনীন বিবাহোৎসব** * কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—২৬-২-৩৮ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত। ভূমিকায়—জীবন, ধীরাজ, জহর, হরেন, মনোরঞ্জন, সত্য, হরিধন, বেচু, সন্তোষ, নবদ্বীপ, রাণাবালা, উষা, বীণা, সাবিত্রী।

১৩০। **সাথী** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—৩-১২-৩৮ : চিত্রগৃহ—চিত্রা ও নিউ সিনেমা : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীফণী মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীদীলিপ গুপ্ত, শ্রীসুধীশ ঘটক : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—সায়গল, অমর, শৈলেন, ভানু, কাননদেবী, রেখা, কমলা।

১৩১। **সখের শ্রমিক** * * * প্রফুল্ল পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—১৬-৩-৩৮ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীকেশব গুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীনির্মল গোস্বামী : আলোক-শিল্পী—মিঃ ডব্লিউ মায়ার বার্গেন্ট : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ ডগ্‌লাস ওয়ালটারস্ : সংগীত—শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত। ভূমিকায়—ভাস্কর, সত্যধন, সমর, ভানু, দেববালা, অরুণা।

১৩২। **হাল বাংলা** * * * মেট্রোপলিটন পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—১২-৩-৩৮ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদ্রোণাচার্য : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীধীরেন দাস। ভূমিকা—মহাদেব, ডি-জি, প্রভাত, ফণী, তুলসী, মৃণাল, সত্য, রঞ্জিৎ, হরিদাস, ছায়া, চন্দ্রিকা।

১৯৩৯ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল।

১৩৩। **অধিকার** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—১২-১-৩৯ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : সংলাপ ও সংগীত রচনা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : পরিচালনা—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীতিমিরবরণ। ভূমিকায়—বড়ুয়া, পঙ্কজ, পাহাড়ী, শৈলেন, ইন্দু, যমুনা, মেনকা, রাজলক্ষ্মী, চিত্রলেখা, উষাবতী।

১৩৪। **কল্পনা★** সিষ্টোফোন পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—১২-৮-৩৯ : চিত্রগৃহ—চিত্রা ও নিউ সিনেমা : কাহিনী—মিঃ উইনি ওয়াহেব : পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রী পি, সাণ্ডেল : শব্দ-যন্ত্রী—"সিষ্টোফোন" কর্মীবৃন্দ : সংগীত—শ্রীরামচন্দ্র পাল। ভূমিকায়—কান্তি, কল্পনা, নীলিমা।

১৩৫। **চাণক্য** * * * কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১৫-১২-৩৯ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায় : পরিচালনা—শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসমর বসু : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। ভূমিকায়—শিশির, নরেশ, বিশ্বনাথ, অহীন্দ্র, ছবি, রতীন, কঙ্কাবতী, রাধারাণী, বীণা, শুক্তিধারা, মুক্তিধারা।

১৩৬। **জীবন মরণ** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—১৪-১০-৩৯ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী ও সংলাপ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য, পরিচালনা, আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। ভূমিকায়—সায়গল, ভানু, অমর, শৈলেন, সত্য, লীলা দেশাই, নিভাননী, মনোরমা।

১৩৭। **জনক নন্দিনী** * * * রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—২১-১-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, জহর, রবি, মৃণাল, সুশীল, ধীরেন, সাবিত্রী, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, ছায়া।

১৩৮। **দেবযানী** * * * মতিমহল থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—৯-৯-৩৯ : চিত্রগৃহ—ছায়া : কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণধন দে : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা : আলোক-শিল্পী—শ্রীবীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকায়—নির্মলেন্দু, মনোরঞ্জন, মৃণাল, ছায়া, রাধারাণী, মীরা, কমলা, আঙ্গুর।

১৩৯। **নর নারায়ণ** * * * রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১৭-৬-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ। ভূমিকায়—শীলা, রেণুকা, রাণীবালা, অহীন্দ্র, ধীরাজ, জহর, রবি, ভূমেন, মৃণাল, তুলসী, মোহন।

১৪০। **পরশমণি** * * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—৫-৮-৩৯ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীযামিনী মিত্র : কাহিনীর চিত্ররূপ—শ্রীশচীন সেনগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ চার্লস ক্রীড ও শ্রীমান্নালাল লাডিয়া : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত। ভূমিকায়—দুর্গাদাস, তুলসী, ধীরাজ, রবি, সন্তোষ, সত্য, জীবেন, জ্যোৎস্না, রাণীবালা, বীণা, অরুণা, প্রভা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, আইলিন।

১৪১। **পথিক** * * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—৪-২-৩৯ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীমণি ঘোষ : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীচারু রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগোরা দাস। ভূমিকায়—ধীরাজ, মনোরঞ্জন, শীলা, সুহাসিনী, সত্য, ভোলা, রমলা, রাজলক্ষ্মী।

১৪২। **পরাণ পণ্ডিত★**
প্রথম আরম্ভ—১-৪-৩৯ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী।

১৪৩। **বড়দিদি** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—৭-৪-৩৯ : চিত্রগৃহ—নিউ সিনেমা ও রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীঅমর মল্লিক : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবাণী দত্ত : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। ভূমিকায়—পাহাড়ী, যোগেশ, শৈলেন, ভানু, নির্মল, সত্য, মলিনা, চন্দ্রাবতী, নিভাননী।

১৪৪। **বামন অবতার** * * * রাধা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২৩-১২-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীবরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীহরি ভঞ্জ : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, তিনকড়ি, মনোরঞ্জন, মৃণাল, তুলসী, রেণুকা, নিভাননী, শিশুবালা, ছায়া, ঊষা।

১৪৫। **মিটমাট★**

১৪৬। **যখের ধন** * * * ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী
প্রথম আরম্ভ—১-৪-৩৯ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীহরি ভঞ্জ : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যো : সংগীত—শ্রীশচীন দেব বর্মণ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রবি, জহর, সুশীল, শীলা, নিভাননী, শিশুবালা।

১৪৭। **রিক্তা** * * * ফিল্ম করপারেশন অফ ইণ্ডিয়া
প্রথম আরম্ভ—১৯-৮-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রতীন, তুলসী, সুশীল, মোহন, কানু, নৃপতি, সত্য, ছায়া, রমলা, দেববালা।

১৪৮। **রীতিমত প্রহসন★**
প্রথম আরম্ভ—২.-১-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী।

১৪৯। **রজত জয়ন্তী** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১২-৮-৩৯ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : পরিচালনা—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীন মজুমদার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—শৈলেন, দীনেশ, প্রমথেশ, পাহাড়ী, ভানু, পণ্ডিত শোর, ইন্দু, সত্য, মলিনা, মেনকা।

১৫০। **রুক্মিণী** * * * দেবদত্ত ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২-৯-৩৯ : চিত্রগৃহ—শ্রী : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীগীতা ঘোষ : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসত্যেন দাশগুপ্ত। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রতীন, রাধিকানন্দ, সন্তোষ, বেচু, পান্না, প্রতিমা, দেববালা, সুহাসিনী, ঊষারাণী।

১৫১। **শর্মিষ্ঠা** * * * কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—১৮-১০-৩৯ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীমনোজ বসু : পরিচালনা—শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, ছবি, জহর, রাণীবালা, চিত্রা, সুহাসিনী, ঊষা, রেখা।

১৫২। **সাপুড়ে** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২৭-৫-৩৯ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—কাজী নজরুল ইসলাম : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীদেবকী বসু : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, পাহাড়ী, রতীন, কৃষ্ণচন্দ্র, সত্য, শ্যাম, অহি, কাননদেবী, মেনকা।

১৫৩। **হাতে খড়ি★** আরোরা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২২-৭-৩৯ : চিত্রগৃহ—শ্রী :

১৫৪। **হারজিৎ★**
প্রথম আরম্ভ—১২-৬-৩৯ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী।

নতুন - সাহিত্য

★

সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ—কালীশ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা, ৩০, গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য : আড়াই টাকা। বোর্ড বাঁধাই।

রূপ-মঞ্চ সম্পাদক স্নেহাস্পদ শ্রীমান কালীশ মুখোপাধ্যায় একদিন একতাড়া ফাইল-প্রুফ আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—পড়ে দেখতে হবে, 'সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ'। সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। ও-সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের অভাব নেই। কালীশ বল্লেন ভূমিকা লিখে দিতে হবে। নবীনরা যখন লেখবার অনুরোধ না করে, তাঁদের বইয়ের ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে আসেন, তখন আমার মনে হয়, তাঁরা ধরে ফেলেচেন যে, আমরা যাত্রা-পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌচেছি। তাঁরা জানেন আমাদের শেষ, তাঁদের শুরু। ভূমিকা লিখে দিতেই হয়।

বছর কয়েক আগে রাশিয়ার রংগমঞ্চ নিয়ে আমি সাময়িক পত্রে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বলা আবশ্যক যে, রাশিয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার কিছুই নেই। রাশিয়াও দেখিনি, রাশিয়ার নাট্যমঞ্চও দেখিনি। তবুও পল্লবগ্রাহী হয়ে রাশিয়ার নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন মনে করেছিলাম আমাদের দেশের নাট্যমঞ্চের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু আমাদের দেশের হালের মঞ্চ-মালিকরা নিজেদের নাট্যশালা সম্বন্ধে এত উদাসীন যে, রাশিয়ার বা পৃথিবীর আর কোন দেশের নাট্যশালা কি করচে, তার খবর রাখা বাহুল্য মনে করেন। পনেরো বছর আগে এ-রকম ছিলনা। তখনকার মঞ্চ-মালিকদের এ-সব জানবার আগ্রহ ছিল। অভিনেতাদেরও ছিল। তখন মঞ্চ-মালিকরা, পরিচালকরা, অভিনেতারা, রস-বিচারক ক্রিটিকরা এবং নাট্যকাররা নানা দেশের থিয়েটারের, নানা সাহিত্যের নাট্যকর আলোচনা থিয়েটারের বৈঠকখানায় বসে করতেন। আজ তাঁরা তা করেন না। আ'জ থিয়েটারের বৈঠকখানায় বসে কেবলি শুনি সিনেমার কন্‌ট্রাক্টের কথা, শুটিংয়ের তারিখ নিয়ে সিনেমার প্রডাকশন ম্যানেজারে আর অভিনেতায় কথার কারসাজি, ইনকামট্যাক্সের উকিলের পরামর্শ। শুনি আর ভাবি আমাদের শেষ, এদের শুরু!

থিয়েটার নিয়ে মাথাব্যথা করচেন সাময়িক পত্রের সম্পাদকরা। কালীশ এমনই একজন সম্পাদক। থিয়েটারকে তিনি জাতির প্রগতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করেন। রাশিয়াও তাই করে। তাই কালীশ রাশিয়ার নাট্য-মঞ্চ সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েচেন এবং পড়া-শুনা করে যা জেনেচেন, তাই দেশের দশজনকে জানাবার উদ্দেশ্যে আলোচ্য বইখানি রচনা করেচেন। তিনি মৌলিক গবেষণার শ্রদ্ধা দাবি করেন নি। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় দিতে চান নি। স্রেফ তাঁর দেশের নাট্যশালার বর্তমান দৈন্যে ব্যথিত হয়ে তিনি মৃত-সঞ্জীবনীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে যা অমৃত মনে করে আহরণ করেচেন, তাই তাঁর দেশের লোকের কাছে নিবেদন করেচেন। অন্যায় কিছুই করেন নি। এজন্য তিনি প্রশংসাই আশা করতে পারেন। সত্যই, মৃতপ্রায় মানুষকে সঞ্জীবিত করবার অমৃত-ভাণ্ড হাতে নিয়ে মস্কৌ আজ আহ্বান জানিয়েচে। নবীন পৃথিবী সেই অমৃত আহরণ করবার আগ্রহে উদ্বেল। মস্কৌ আজ কেবল রাশিয়ার নয়, সমগ্র মুক্তি-কাম মানুষের অমৃতের উৎস।

আমারও মনে পড়চে শেখভের 'থ্রি সিস্টার্স' নাটকের কথা। তিন বোন বসে আছেন তাঁদের ঘরে, মস্কৌ যাবার আশা নিয়ে। মস্কৌ আলো ঢেলে দেবে তাঁদের জীবনে। মস্কৌ আশা জাগিয়ে তুলবে তাঁদের হতাশায় ক্লিষ্ট চিত্তে। মস্কৌ তাদের সর্ব রিক্ততা দূর করে তাঁদের জীবনকে সকল রকমে সফল করে তুলবে। দিন যায়, দিন আসে। তিন-বোন বসে বসে মস্কৌর ধ্যান করেন। শেখভের বিচিত্র নাটক 'তিন-বোন'। তাঁদের ধ্যানের মস্কৌ তখনো রূপধরে ফুটে ওঠেনি।

তাই শেখভ তাঁদের মস্কৌ পৌঁচে দিতে পারেন নি। 'তিন-বোনের' অন্তরের কামনা মঞ্চে রূপায়িত করে শেখভ চলে গেছেন। আজ মস্কৌ রূপধরে ফুটে উঠেচে। আজ যেন শেখভের সৃষ্টি তিন-বোন পতিত মানবের অন্তরে তাঁদেরই অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তুলেচেন। সবাই তাই ভাবচে—মস্কৌ আলো দেবে, আশা জাগাবে, সর্বরিক্ততা দূর করে বিফল মানব-জীবনকে সফল করে তুলবে।

মনে পড়চে ওই শেখভেরই চেরী-অকার্ড। দেউলে গৃহস্থের সব গেছে। কিন্তু তার চেরী কুঞ্জের ওপর যে নিবিড় মায়া রয়েচে, এ যায় নি। চেরী কুঞ্জকে সে বাঁচাতে পারে না। কারখানার মালিক কিনে নেয় জমি। চেরী গাছে কুড়ুলের আঘাত পড়ে। সে আঘাত চেরী গাছকে যেমন কাটে, তেমনিই কাটে চেরী গাছের মায়ায় মজে থাকা গৃহস্থকে। এই ব্যথায় নাটক শেষ। নাটকের ব্যথা ব্যর্থ হয়নি। স্বপ্নের চেরী কুঞ্জ বহুর বঞ্চনা দ্বারা রক্ষিত হোত। তাই তা কালের কুঠারাঘাতে লোপ পেল। তার জন্য স্বপ্নের মায়া মহাকালের বিবেচনার বিষয় হোলনা। কিন্তু মানুষের যে বেদনা ব্যক্ত করে শেখভ নাটক শেষ করলেন, সেই বেদনাকে সত্যি জেনে নতুন রাশিয়া শ্রমিকদের জন্যে রচনা করে দিলে নব-সব গার্ডেন সিটিজ। মানুষও আর দেউলে হবে না। তার চেরী কুঞ্জও আর বিকিয়ে যাবেনা। রাশিয়া সেই ব্যবস্থাই করেচে।

মনে পড়চে গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ'। কোথায় আশা? কোথায় আলো? কোথায় সৌন্দর্যের অভাবে বেদনার অনুভূতি? সবই মিথ্যে। হতাশায়, অন্ধকারে, কদর্যতায় মগ্ন মানুষ। জীবন ধারণের ব্যবস্থা যাদের নেই তারাই ত রাশিয়ার সংখ্যা-গরিষ্ঠ। তাদের দিকে কেউ চেয়ে দেখে না। গোর্কি তাদের এনে মঞ্চে উপস্থিত করলেন। মস্কৌ অভিভূত হোল। শেখভের তিন-বোন, চেরী-অকার্ড এমন কি অনন্ত সর্গের এবং অনন্ত আকাশের মাঝখান দিয়ে ছুটে যায় যে 'সী-গাল্' তাও বিলাসীর কল্পনা বলে মনে হোলো। একমাত্র সত্য হয়ে উঠল লোয়ার ডেফথের মানব-যূথ। মস্কৌ আর্ট থিয়েটার স্বপ্নের ভাব-বিলাস থেকে জাতিকে মুক্তিদান করল ভেবে উৎফুল্ল হোলো।

কিন্তু চিন্তাশীলরা ভাবলেন মস্কৌ আর্ট থিয়েটারের প্রয়াস সফল হতে পারে না। যাদের দুঃখ, যাদের অমানুষের জীবন থিয়েটার প্রকাশ করবে, তারা কি আসবে সম্পদের পীঠ ওই রংগ-পীঠে? আসবে না, আসতে পারবে না, আসতে চাইবেও না। যদি ধরে আনা যায় তাহলেও তারা কিছুই বুঝতে পারবে না, নাটকের-প্রকাশ-ভংগীর জন্যে, নাটকের জটিল ঠেকনিকের জন্যে। ব্যর্থ প্রয়াস মস্কৌ আর্ট থিয়েটারের। ওই থিয়েটার আলো জ্বালতে পারবে না, আশা জাগাতে পারবে না।

বিদ্রোহীরা বেরিয়ে গেল মস্কৌ আর্ট থিয়েটার থেকে। শুধু মায়ারহোল্ডই নয়, একে একে অনেকে। থিয়েটারকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে জনগণের সংগে তার সত্যিকারের যোগ করে দিতে হবে। থিয়েটারকে নিয়ে যাওয়া হলো চাষীর খামারে, নিয়ে যাওয়া হোলো শ্রমিকের ফ্যাক্টরীতে। তার টেকনিকের জটিলতা, তার রহস্যের জাল, সব খুলে দেওয়া হতে লাগল। নাটককার এলো সাহিত্যের অভিজাতদের বাহির থেকে। অভিনেতারা এলো পেশাদার অভিনেতৃমণ্ডলের বাহির থেকে। মুক্তি পেয়ে থিয়েটার নিজকে বিস্তৃত করে দিলে বিরাট দেশের বিচিত্র জাতি সমূহের নানা স্তরে, নানাস্থানে। এই হচ্ছে সংক্ষেপে রাশিয়ার থিয়েটারের ইতিহাস। শেখভের তিন-বোন হতাশা নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থ হয়নি, মস্কৌ আলো ঢেলেচে, মস্কৌ রিক্ত জাতিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেচে।

কালীশ চান আমাদের থিয়েটারও এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করুক। তাই তিনি রাশিয়ার থিয়েটারের অভি-যানের কাহিনী তাঁর দেশের নাট্যরসিকদের সামে উপস্থিত করে খুব ভালো কাজ করেচেন এ-কথা অবশ্যই বলব।

সংগে সংগে আর একটি কথাও বলব। আমাদের পরবশতার অবসান এবং স্বাধীনতা আজ সুস্পষ্ট। পরবশ যতদিন ছিলাম, ততদিন আমরা সকল প্রেরণা পাবার জন্যে পরের দিকেই চেয়ে থাকতাম। আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হয়ে আমাদের নিজেদের দিকে চেয়ে দেখতে হবে। বুঝতে হবে আমাদেরও একটা জাতীয় থিয়েটার পরম সার্থকতা নিয়েও বহুকাল আমাদের উপেক্ষার পাত্র হয়ে রয়েছে। সে থিয়েটারের প্রকাশ নানা বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে দীর্ঘকাল, অতি দীর্ঘকাল, জাতির কল্যাণ সাধন করেচে। সংস্কৃত নাটক থেকে শুরু করে যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা, কবি, তরজায়, ঝুমুর, কত নাম আর করব? কত রকমেই না তারা 'থিয়েটারকে' সর্বজনীন করে রেখেছিল। কত বৈচিত্রই না তাদের টেকনিকে, রস-সৃষ্টির কৌশলে! ইউরো-আমেরিকার থিয়েটারের যত আধুনিক পরিকল্পনায় আমরা মুগ্ধ হই তাদের মাঝে একমাত্র যন্ত্র-প্রভাবান্বিত পরিকল্পনা ছাড়া অপর কোন পরিকল্পনা যে ভারতবর্ষের কাছে নতুন নয়, এ-কথাটিও আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে। থিয়েটারকে সার্বজনীন করবার প্রয়াসে সোভিয়েট রাশিয়া এখনো ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি।

—নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

[সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চের ভূমিকা লিখতে যেয়ে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যে কথাগুলি বলেছেন--আমরা পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসংগে তাই হুবহু মুদ্রিত করলাম। সম্পূর্ণ আর্ট পেপারে মুদ্রিত—বোর্ড বাঁধাই। পুস্তকখানির আংগিক মান ও সম্পদ যে কোন নাট্যানুরাগীকে খুশী করবে।]

* * * *

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য নাটিকা
অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, প্রাপ্তিস্থান সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ১া১ এ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য, ১৷৷০। অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংগে রূপ-মঞ্চ পাঠক-গোষ্ঠী পরিচিত আছেন। বহু নাটিকা রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়ে ইনি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া অন্যান্য পত্র পত্রিকা, বেতারও রেকর্ড নাট্যে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর বহু নাটক রূপায়িত হ'য়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ—চরিত্র সৃষ্টি ও রস সৃষ্টিতে নাট্যকারের যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর ভিতর তার কোনটিরই অভাব নেই। আলোচ্য পুস্তকখানিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র (নাটক), মহুয়া, কঙ্ক ও লীলা, কবি চন্দ্রাবতী স্থান পেয়েছে। এর সব কয়টীই ইতিপূর্বে রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়ে যথেষ্ট সমাদর লাভে সমর্থ হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহান জীবনাদর্শের যেটুকু নিয়ে নাট্যকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র রচনা করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। পল্লী কাব্যের কয়েকটী জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে শেষোক্ত নাটিকা কয়টী রচিত। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর নাটকীয় ভাষায় এই কাহিনীগুলি আরও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পুস্তক খানির ভূমিকা লিখেছেন। শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংকিত সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি সম্বলিত প্রচ্ছদপটটী পুস্তক খানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

* * * *

মিশরের ডায়েরী—অধ্যাপক মাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক দেশ-বন্ধু বুক ডিপো, ৫৪।এ, বিবেকানন্দ রোড্‌ কলিকাতা। আলোচ্য পুস্তকখানি তিনটী খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে-কায়রো মূল্য ৩৷৷০, দ্বিতীয় খণ্ডে লেবানন, সিরিয়া, উত্তর আরব ও প্যালেষ্টাইন মূল্য-২৷৷০, তৃতীয় খণ্ডে বৃহত্তর মিশর ও লিবিয়া মূল্য ৩৲ টাকা। তিনখানি একত্রে আট টাকা।

অধ্যাপক চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক। শিক্ষার্থীরূপে তিনি মিশর গিয়ে-ছিলেন এবং বহুদিন ধরে মিশর, লেবানন, সিরিয়া, প্যালে-ষ্টাইন, তুর্কস্থান, সীমান্ত প্রভৃতি দেশপরিভ্রমণ করে এসেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তার দৈনন্দিন পরিভ্রমণের রোজ নামচা হলেও যে দৃষ্টি ভংগী দিয়ে মিশরের সমাজ, কৃষ্টি প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই অপূর্ব। বর্তমান মিশর

ও মিশরীয়দের সম্পর্কে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে অধ্যাপক রায় চৌধুরীর আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের সে কৌতূহল অতি সহজেই মেটাতে সমর্থ হবে। শ্রী লক্ষ্মীদাসের প্রচ্ছদ পট, বাঁধাই ও ছাপা চমৎকার।

* * * *

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী—গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক: কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র। ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য আট আনা। রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য কবি গোপাল ভৌমিকের নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আলোচ্য পুস্তিকা-খানিতে অতি সংক্ষেপের ভিতর রাষ্ট্রপতী কৃপালনীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও রাষ্ট্রপতির প্রথম জীবন—কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরূপে তাঁর কর্ম্মদক্ষতা, দাম্পত্য জীবন, রাজনৈতিক মতবাদ কোনটাই লেখকের সুচতুর লেখনীতে এড়িয়ে যায়নি। পুস্তিকা খানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

* * * *

পাথেয়—সম্পাদনা: শ্রীনলিনী কান্ত সরকার ও শ্রীবিমল বসু। পরিবেশক: কথা-সাহিত্য মন্দির, ১৬এ, ডফ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য: ১৷৹।

কথা-সাহিত্য মন্দিরের পরিচালিকা অঞ্জলি সরকার 'পাথেয়' সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন, 'পাথেয়' কোন সাময়িক পত্র্ নয়। সকল শ্রেণীর শক্তিমান লেখক লেখিকার নবীন ও প্রবীণের মিলনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ অ-দলীয় সংকলন গ্রন্থ এটী। শক্তিমান অথচ অবজ্ঞাত প্রতিভাকে আবিষ্কার করে সম্মান দিবার শুভ উদ্দেশ্য ও সংকল্প নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে।' 'পাথেয়'র এই উদ্দেশ্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আলোচ্য খণ্ডে লিখেছেন দিলীপকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মন্মথ নাথ ঘোষ, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, বাণী রায়, নিশিকান্ত, গজেন্দ্র মিত্র, পরিমল গোস্বামী, সুশীল রায়, কমলা মুখো, অজিত দে, কনাদ গুপ্ত প্রভৃতি। শিল্পী সমরদের প্রচ্ছদপটটী প্রশংসনীয়। বাঁধাই ও ছাপা চমৎকার।

নতুন সাহিত্য—ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিসিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতার পক্ষ থেকে সুশীল কুমার সিংহ। মূল্য: ১৲ টাকা।

নতুন সাহিত্য বামপন্থী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সমালোচনার সংকলনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আলোচ্য প্রথম খণ্ডে নারায়ণ গঙ্গো, সুনীল চট্টো, সুনীল জানা, বিষ্ণু মুখো, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ননী ভৌমিক, মুলক্‌রূপআনন্দ, অনিলকুমার সিংহ, ধ্রুব মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টো, মানিক বন্দ্যো, অমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি আরো অনেকের প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প প্রকাশিত হ'য়েছে। বামপন্থী প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার এই সংকলন প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবো। রচনা সমাবেশে তাঁরা নিজেদের সু-দৃষ্টি ভংগীর পরিচয় দিয়েছেন। সুনীল জানার ছবি কয়টী পুস্তক খানির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

* * * *

নতুন সকাল—সিকান্দার এস, এ জাফর। প্রকাশক: কথা বিজ্ঞান—১১বি, পালরোড, পার্কসার্কাস কলিকাতা। মূল্য: তিনটাকা।

দুর্ভিক্ষ ও কালোবাজারের পটভূমিকায় উপন্যাসখানি গড়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও ঝরঝরে। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টি ভংগীরও প্রশংসা করবো। আমাদের মুসলমান ভাইদের ভিতর এরূপ একজন শক্তিমান লেখকের আগমনে সত্যি খুশী হ'য়েছি। পুস্তকখানির বাঁধাই ও ছাপা চমৎকার।

* * * *

পলাশীর পরে (নাটক)—অজয় দাশগুপ্ত। প্রকাশক ডি, এম লাইব্রেরী, ৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: ১॥৹। মীরকাসিম ও পলাশীকে কেন্দ্র করে আলোচ্য ঐতিহাসিক নাটকখানি গড়ে উঠেছে। নাটকের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য পরিস্ফুটনে নাট্যকারের সম্ভাবনার পরিচয় পেয়েছি।

* * *

শতাব্দীর পরিচয় (নাটক)—যুগল দত্ত। প্রকাশক: ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

মূল্য : ১।।০। ১৯৪৩ এর পটভূমিকায় নাটকখানি রচিত। যে দরদী দৃষ্টি ভংগী দিয়ে নাট্যকার অত্যাচারিত ও বুভুক্ষুদের কথা ফুটিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চাবুক মেরেছেন তার প্রশংসাই করবো। —প্রীতি দেবী।

* * * *

বন-জ্যোৎস্না (গল্প সংকলন)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পুস্তকালয়—২৯, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য : দুই টাকা বার আনা।

সত্যকে বাদ দিয়ে নিছক ভাবালুতার আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করে আজকাল আর পাঠক মনকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু এই বস্তুবাদের নামে যেসব নগ্ন চিত্র পরিবেশন করা হচ্ছে তাকেও কোনমতেই সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য সত্যের মধ্য দিয়ে সুন্দরের অনুসন্ধান করা। এই সত্য ও সুন্দরের অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই নারায়ণবাবুর লেখায়। তিনি বস্তুধর্মী হলেও সুন্দরের উপাসক, তাই নগ্ন বাস্তবকে তিনি কাব্যিক পরিপ্রেক্ষিতে রসোত্তীর্ণ করে পাঠকদের কাছে এমন ভাবে তুলে ধরেন, যার আস্বাদনে মন পরম তৃপ্তি লাভ করে। প্রত্যেকটি গল্পের ভেতরেই লেখকের সমাজ ও সময় চেতনার সুস্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। একদিকে বর্তমান সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারীদের প্রতি বিদ্বেষ, আর একদিকে নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং অনাগত, অবশ্যম্ভাবি ভবিষ্যতের ইংগিত লেখকের রচনাকে অমরত্ব দান করেছে। তাঁর কাব্যিক মন, চরিত্র সৃষ্টির নিপুণতা, ঘটনা সমাবেশের দক্ষতা এবং রাজনৈতিক চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থের 'বন-জ্যোৎস্না', 'আলু খলিফার শেষ খুন', 'মৃত্যুবান' এবং 'বার সরিকের বিল' গল্পগুলিতে। পুস্তকখানির অংগসজ্জা প্রশংসনীয়। —ধীরেন রায়

* * * *

তীর ও তরংগ (উপন্যাস)—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ তিন টাকা।

পদ্মাপারে ভাংগনধরা একখানি গ্রাম। পদ্মা রাক্ষসীর জঠরজ্বালা জুড়াইতে যেমন দিনের পর দিন গ্রামখানির ভৌগলিক আয়তন কমিয়া আসিতেছে তেমনি নাগরিক সভ্যতার প্রয়োজন মিটাইতে অর্থনৈতিক বনিয়াদও ভাংগিয়া পড়িয়াছে। সংগতি সম্পন্নের দল গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে অনেক দিন। মধ্যবিত্ত চাকরি-জীবীরাও শহরের দিকে পাড়ি জমাইয়াছে—পূজাপার্বন উপলক্ষে তাহাদের কেহ কেহ গ্রামে যায়; কিন্তু গ্রামের সংগে নাড়ীর টান যেন তাহারা আর অনুভব করে না। মায়ার বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া দয়ার অনুগ্রহ দেখাইতেই যেন তাহাদের গ্রামে আসা। এমনি কারুণ্য প্রদর্শনের মনোভাব লইয়াই সুনীলও আসিল পূজার ছুটিতে দেশে; কিন্তু আসিয়া জড়াইয়া পড়িল তাহারই রচিত এক প্রেমের ফাঁদে। কৈশোরের সহচরী অণিমাকে কামনা করিল জীবন সংগিনীরূপে। অণিমাও বিশ্বাস করিল তাহার প্রেমে; কিন্তু প্রণয়ের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইলেন সুনীলের বিধবা মাতা। মায়ের অধিকারবোধ ছেলের আত্মমর্যাদায় আঘাত করে—জিদের বশে ভাবাতিশয্যে অণিমাকে দিয়ে বসে মিথ্যা আশ্বাস। পরিণামে দায়িত্বজ্ঞানহীন সুনীল এই জটিলতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় খোঁজে শহরের এক কাল্পনিক প্রণয়ের কোঠরে।

এমনি এক অতি সাধারণ ঘটনা লইয়া লেখক কাহিনীটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। সূক্ষ্ম রসবোধ ও ভাষার জন্য কাহিনীটি সাধারণ হইলেও অসাধারণত্বের দাবী করিতে পারে এবং এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব। একখানি ক্ষয়িষ্ণু গ্রামের পটভূমিকায় কতকগুলি বিপরীত মনোভাবাপন্ন লোকের জীবনচিত্র সুনিপুণ ভাবে অংকিত হইয়াছে। —দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নব জীবনের কূলে

(চলচ্চিত্র কাহিনী)

মন্মথ কুমার চৌধুরী

জ্ঞাতিদের সংগে মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া মনধন চৌধুরী অকস্মাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন। স্ত্রী অনেক দিন আগেই মাথার সিঁদুর বজায় রাখিয়া স্বামীর কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারসূত্রে পুরন্দরের ভাগ্যে কয়েক বিঘা জমি এবং কয়েকখানা বন্ধকী দলিল লাভ হইল। সংসারে তারা দুটি মাত্র প্রাণী—সে ও তার স্ত্রী নিরুপমা। সহধর্মিণীর মৃত্যুর পরই মনধন চৌধুরী সাত তাড়াতাড়ি করিয়া একটি ভদ্র বংশের শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মেয়েকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন। পুরন্দরের লেখাপড়ায় কোনদিনই মনোযোগ ছিল না। কিন্তু সুগঠিত দেহ এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য সে সহজেই গ্রামের ছেলেদের নেতার পদ অধিকার করিয়া বসিল। মড়া পোড়ান হইতে শুরু করিয়া রোগীর সেবা, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, পানাপুকুর পরিষ্কার প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার কার্যেই পুরন্দরের অসীম উৎসাহ। পিতা মামলা মোকদ্দমা নিয়াই ব্যস্ত ছিলেন—ছেলের দিকে মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। ভরসা ছিল—হাইকোর্টে মামলার নিষ্পত্তি অবশ্যই তাঁহার অনুকূলে হইবে—তারপর ছেলের উপর বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া তিনি জপতপ নিয়াই থাকিবেন। কিন্তু অকালে সে আশায় বাধা পড়িল।

পুরন্দরের মাথায় গোটা পরিবারের দায়িত্ব চাপিয়া বসিল। তাহার স্বচ্ছন্দ দিনগুলিও শেষ হইয়া গেল। মুহূর্তে সংসারের চেহারাটার পরিবর্তন সাধিত হইল। তেল নুন-লাকড়ির চিন্তাই এখন তার প্রধানতম সমস্যা। জমি জমা যে কয়েক বিঘা ছিল, মোকদ্দমাপ্রিয় মনধন চৌধুরী সে গুলি প্রায় নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন। আয়ের সংস্থান সামান্য—কিন্তু পরিবারে মাত্র দু'টি প্রাণী সত্ত্বেও খরচ পত্রের কোথাও কোন ত্রুটি হইলেই নিরুপমা রাগারাগি করে। স্বামীকে দুটি কড়া কথা শুনাইয়া দিতেও তাহার কুণ্ঠা নাই। শ্বশুর জীবিত থাকিতে এ বাড়ীর কাক পক্ষিও নিরুর গলার সুর শুনিতে পায় নাই। এমন অনুগতা আর সহিষ্ণু স্ত্রী পাইয়া ভবঘুরে পুরন্দর মনের সুখে কখনো সমাজ সংস্কার, কখনো শীকারের উৎসাহে সারাটা তল্লাট চষিয়া বেড়াইয়াছে। রাতবেরাতে কখন ঘরে আসিতেছে, কখনো বাহিরে যাইতেছে, সে খবর কেহ রাখে নাই। সংসার চালানোর সব দায়িত্ব পুত্রবধূর হাতে তুলিয়া দিয়া শ্বশুরমশায় জ্ঞাতি শত্রুদের দম্ভ চূর্ণ করিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুরন্দর শরীরে ফুঁ দিয়া 'সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ' প্রবাদটি স্মরণ করিয়া আপন খেয়াল খুসিতেই ডুবিয়া ছিল। ঝড় যাহা কিছু সব নিরুপমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সে প্রতিবাদ জানায় নাই, বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। তুলসী তলার প্রদীপের মতো সে একাকী জ্বলিয়া জ্বলিয়া এই ধ্বংসশীল পরিবারের সব অভাবের অন্ধকার এবং গ্লানি দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর দেখা গেলো একবোঝা ঋণ ছাড়া পুরন্দর পৈত্রিকসূত্রে আর কিছুই পায় নাই। পুরন্দর নতুন আয়ের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই আয়ের সংস্থান করা যায় না। স্বামীর ভবঘুরে স্বভাব এবং অকর্মণ্যতার উপর নিরুর আস্থা এমনি অটুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পুরন্দর সত্যি সত্যি উপার্জনের কোন চেষ্টা করিতেছে তাহা নিরুপমা মোটেই বিশ্বাস করিত না। এ নিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যটা ঝগড়ায় দাঁড়াইল। নিরুপমা রুক্ষ গলায় বলে, "এদ্দিন যেমন চলছিল—চলছিল—কিন্তু এমন টানাটানি করে সংসার চালাতে আর আমি পারিনে বাপু। আজ চাল বাড়ন্ত, কাল তেল বাড়ন্ত······ মেয়ে মানুষ গলা বিক্রী করে আর ক'দিক সামলাতে পারে?"

পুরন্দর নিজের দুর্বলতা জানে। এতদিন স্ত্রীকে অবহেলা করিলেও, সে মনে মনে তাকে ভয় করিত। বিশেষত স্ত্রী যে তাহার চেয়ে বেশী শিক্ষিতা এই জন্য সে সব সময়ই কুণ্ঠা বোধ করিত।

স্ত্রীকে শান্ত করিবার জন্য পুরন্দর অদূর ভবিষ্যতে ভালো চাকুরীর প্রলোভন তুলিয়া ধরে।

"তোমার সামনেইত 'কাগজের' বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠালুম। এই দু'চারদিনের মধ্যেই দেখবে—ডাক এসে গেছে। সারা জীবন কি আর পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে মশা তাড়াব আর পানাপুকুর সাফ্ করব"?

"তোমার যেরকম পল্লী সংস্কারের উৎসাহ—তুমি থাকলেও থাকতে পার। কিন্তু সারা জীবনের কথা পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত চাল ডালের কথাটা দয়া করে একটু ভাব। কবে চাকুরীর ডাক আসবে—সে সান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকলে ত আর পেট ভরবে না।"

"তা গোবিন্দের কাছ থেকে একবার বেরুতে হবে বৈ কি"?

"সে-ই যখন পরের কাছে হাত না পাতলে ঘরের হাঁড়ি চড়ে না, তখন একটু সকালে গেলেই ত পার। কাল থেকেই বলছি—লাকড়ি নেই। ঘরের চালাগুলি নেহাতই টীনের—নইলে লাকড়ির জন্য রোজ রোজ তোমাকে এসে দগ্ধে মারতাম না"।

এ কথার কোন জবাব নাই। পুরন্দর মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল—কাহারও নিকট আর ধার পাইবার উপায় নাই। ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার মুরলা, পোষ্ট মাষ্টার শ্যামরতন, চালের কারবারী গোপীমোহন, মদন সাহা সকলের নিকট হইতেই কোন কোন অজুহাতে টাকা কর্জ করিয়াছে পুরন্দর। কিন্তু বিপদ হইয়াছে কাবুলিওয়ালার টাকা নিয়া। গত শীতে মরিয়া হইয়া একখানি পশমী শাল কিনিয়াছিল—এখন অবধি টাকা শোধ করিতে পারে নাই। বিরাট দেহ কাবুলিওয়ালার। তিনবার শাসাইয়া গিয়াছে সামনের বার আসিলে সে টাকা আদায় করিয়া তবে যাইবে। এই জন্যে পুরন্দরের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। গ্রামের পাওনাদারদের কাছে ঋণের জন্যে সে চোর হইয়া আছে, কিন্তু কাবুলীওয়ালা তাহাকে সহজে ছাড়িবে না। অপমানের আর বাকী নাই—এবার চরম লাঞ্ছনা কপালে আছে। পুরন্দর জানে কাহারও নিকট একটি আধ্লাও পাওয়া যাইবে না—তবু স্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে।

* * *

গ্রামের মাতব্বররা দরবার করিতে জড়ো হইয়াছেন। পুরন্দরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়া ইহারা মাঝে মাঝে বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেন।

এবার কিন্তু বাগ্দির মড়া পোড়ান বা জোর করিয়া কাহারো পানাপুকুর পরিস্কার সম্পর্কে অভিযোগ নয়। দয়াল রায় তার ষোড়শী মেয়েকে টাকার লোভে এক ষাট্ বছরের বৃদ্ধের সংগে বিয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুরন্দর বিয়েব রাত্রে হৈ চৈ বাধাইয়া বিবাহটা ত পণ্ড করিলই—কোথাকার একটি ছোক্রাকে ডাকিয়া আনিয়া সেই রাত্রেই মেয়ের বিবাহ দিয়া দিল। ইহাতে গ্রামের বৃদ্ধরা খুবই চটিয়াছেন। এমন যথেচ্ছাচার চলিতে থাকিলে সমাজে থাকা দায়।

ত্রিপুরা চক্রবর্তী গলার আওয়াজ এমনভাবে বিকৃত করিলেন, যেন পৃথিবীটা রসাতলে যাইতেছে।

"বলি পুরন্দর বাড়ী আছ? রায়ের মেয়েকে উদ্ধার করে কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে বাবাজী? না সেনের পো, বিয়ে থার ব্যাপারে এরকম জুলুমবাজী চলতে থাকলে—গ্রামে আমাদের বাস তুলে দিতে হয়"।

পার্বতী সেনের কাছে কিছু টাকা ধার করিয়াছিল পুরন্দর। আজও সে টাকা শোধ হয় নাই। সেই হইতে পুরন্দরের উপর রাগ ছিল। সে সায় দিয়া বলিল, "আপনারা সমাজের মাথা, আপনারা যা বিধান দেবেন। তার উপর কথা কয়—এ গাঁয়ে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা"?

এই স্তুতিতে ত্রিপুরা চক্কোত্তি খুসি হইলেন। কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে পুরন্দরের নিকট হইতে দয়াল রায়ের জন্য কিছু খেসারৎ আদায় করা। বুড়ো বর নির্বাচনে ঘটকালি তিনিই করিয়াছিলেন—এতে তার মোটা বখ্‌রা ছিল। পুরন্দর তার সে গুড়ে বালি দিয়াছে।

ত্রিপুরা চক্রবর্তী সমবেত পার্বতী সেন, হরগোবিন্দ সাহা, রণদা বক্সী—সবাইকে শুনাইয়া বলিলেন, "বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তখন তাত আর ফেরান যাবে না, এখন পুরন্দর যদি দয়ালের অবস্থা বিবেচনা করে তার ক্ষেতিটা পূরণ করে দেয় তবেই ত সব গোলমাল চুকে যায়।"

কাপড় ব্যবসায়ী রণদা বক্সী, কবিরাজ হরগোবিন্দ, পশারী দোকানের মালিক কামিনী, ধানের দালাল নবীন—সবাই চক্রবর্তীর এই সময়োচিত প্রস্তাব সমর্থন করিল।

নিরুপমা দৈনিকের সাপ্তাহিক সংস্করণের সংবাদ নিয়া দূর সম্পর্কের দেবর নীলাম্বরের সংগে আলাপ আলোচনা করিতেছিল। শ্বশুর মশাই কাগজের ভক্ত ছিলেন। এই অর্থকষ্টেও কাগজখানা তাহারা ছাড়ে নাই। বাড়ীর সামনে হঠাৎ এই উত্তেজিত হল্লায় তাহাদের আলোচনায় হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইল।

নিরুপমা বলিল, "যাওত নীলু ঠাকুরপো, দেখে এসত বাইরে কারা ওকে ডাকাডাকি করছে?"

নীলু বাহির হইতে আসিয়া বলিল, "চক্রবর্তী মশাই, পার্বতী, রণদা বক্সি, কবরেজ মশাই এরা সব পুরন্দরদার মুণ্ডপাত করছেন"।

"তুমি বলে দিয়েছত—তিনি দিনের অধিকাংশ সময়ই বাইরে বাইরে কাটান"।

"তা কি আর ওদের জানা নেই। ওদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কথাগুলো তোমার কানে দেয়া। নইলে বাড়ী ব'য়ে এসে এসব হুজ্জতের কোন মানে হয় না"।

চক্রবর্তী শাসাইয়া যান—"সন্ধ্যার মধ্যেই যেন পুরন্দর এই বিষয়ে যা হোক একটা আপোষ নিষ্পত্তি করে আসে। নইলে দশজনের জমায়েতে কথাটা তুললে অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে।"

* * *

এই ব্যাপার নিয়া নিরুপমার সংগে পুরন্দরের বিরোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল।

ঝাঁঝাল গলায় নিরুপমা বলে, "বাড়ী বয়ে এসে অপমান করে যায়, লজ্জা করে না তোমার"।

পুরন্দর স্ত্রীর মেজাজ বহু সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এখন সে ও পাল্টা জবাব দিতে দ্বিধা করে না।

"লজ্জায় মুসড়ে পড়া তোমাদের মত সহুরে মেয়েদেরই স্বভাব। পাড়াগাঁয়ে ও হৈ হল্লা হয়েই থাকে। মাথা কাটা যাবার মত অপরাধও আমি করিনি।"

"পরের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেচ সেই দেমাকেইত মাটিতে পা পড়ছে না! এদিকে গাঁয়ে যে কানপাতা দায় হয়ে উঠেচে।"

"তার কারণ আর দশজনের মতো দু'ফালি জমি নিয়ে কথায় কথায় আইন আদলত করছি না, গ্রামের দলাদলিতে সায় দিচ্ছি না—তাইত হিতৈষীদের ঘুম হচ্ছে না কি না।"

"আর বাহাদুরী ফলাতে হবে না। নিজের পরিবারের ভাত কাপড় জোটাবর যার সাধ্য নেই, পরের মেয়ে বিয়ে কার সংগে হবে—তা নিয়ে বিক্রম প্রকাশ না করলেও কারো কোন ক্ষতি ছিল না।"

"হ্যাঁ ছিল, মেয়ে বিক্রি করে বাবার ট্যাঁকে পয়সা এলেও মেয়েটার জীবন চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত।"

"তাই বিয়ে ভেংগে দিয়ে নিজের জীবন ধন্য করলে বুঝি! চমৎকার।"

"ব্যঙ্গ তুমি করতে পার……"

"বাহাবা দেবার মত মহৎ কর্ম এটা নয়।"

"বেশ, এসবই যদি তোমার চক্ষুশূল হয়ে থাকে, বাপের বাড়ীতে গিয়ে ক'দিন সফর করে আসলেই পার।"

"তাই যেতাম, কিন্তু তাতে তোমার মুখে চুণকালি মাখিয়ে দেয়া হতো। তোমার লজ্জা ঢাকবার জন্যই আজ সকলের কাছে আমাকে নির্লজ্জ হতে হয়েছে।"

* * *

পুরন্দরের আর্থিক সংকট চরমে উঠিয়াছে। আর বুঝি ইজ্জৎ বাঁচাইয়া গ্রামে থাকা চলে না। পাওনাদাররা আর অপেক্ষা করিতে রাজি নয়। কলিকাতায় চাকুরী হওয়ার একটা কল্পিত আশায় সে সকলকে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া কয়দিন চলিবে?

সকাল হইতে কাবুলিওয়ালা বাড়ীর দরজায় কায়েম হইয়া বসিয়াছে। সকাল, বিকাল, দুপুর—সব সময়ই যখন পুরন্দর বাড়ী থাকে না, তখন বাড়ীর সামনে পাহারায় থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ পুরন্দরকে পাকড়াও করিয়া কাবুলীওয়ালা টাকা আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে। খবরটা দূত মারফতে পুরন্দরের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পুরন্দর চট্ করিয়া টাকাই বা জোগাড় করিবে কোথা হইতে? তার চাইতে সারাদিন বাইরে বাইরে গা ঢাকা দিয়া কাটাইয়া দিবে। কাবুলিওয়ালাকে বেশ নাস্তানাবুদ করা চলিবে।

সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর দিকে পা চালাইয়া দিল পুরন্দর। সারাদিন প্রতীক্ষার পর কাবুলিওয়ালার ম্লান মুখ কল্পনা করিয়া এই দুঃখেও পুরন্দরের হাসি পাইল। নেহাত শীতের প্রকোপে বাধ্য হইয়া একখানা শাল ধারে কিনিয়াছিল পুরন্দর, তাই বলিয়া টাকা আদায় করিবার জন্য এ কেমন ধারা জুলুম!

সন্ধ্যা মিলাইয়া আসিল। আকাশের শুক্লা নবমীর চাঁদ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া পড়িতেছে। মৃদু মন্দ বাতাস। পুরন্দর ক্ষণকালের জন্য কঠিন বাস্তবকে ভুলিয়া উন্মনা হইয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ দূরে একটি ছায়া মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। চক্ষুর নিমেষে পুরন্দর ছাতিম গাছটার আড়ালে গা-ঢাকা দিল। পুরন্দরের ভুল হয় নাই। রণদা দোকান হইতে ফিরিতেছে। কবে কোনদিন নিরুর জন্য একজোড়া শাড়ী কিনিয়াছিল, তাহার দাম আজও দেওয়া হয় নাই। দেখিতে পাইলে টাকার জন্য এক্ষুনি বাপান্ত করিয়া ছাড়িত। না, এত ঝক্কি সহ্য করিয়া আর সংসার চালানো যায় না। চন্দনার বাস তাহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে। ভাগ্যিস্ রণদা খেয়াল করে নাই। নইলে রাস্তায়ই একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধিত।

পুরন্দর আস্তে পা চালাইল। কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। সম্পূর্ণ অতর্কিতে পার্বতীর সংগে দেখা। পার্বতীর চোখের চশমা অবশ্য এখনো খসিয়া পড়ে নাই। খুব মোলায়েম ভাষায়ই যে পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিবে, তারপর বউ সম্পর্কে দুইটা সস্তা রসিকতা করিবে। লোকটার Vulgarity অসহ্য। কিন্তু পুরন্দর ইচ্ছা সত্বেও দুইটা কড়া কথা শুনাইতে পারে না।

"পুরন্দর যে! এত শীগগির বাড়ী ফিরছ যে? বউ এর কড়া হুকুম বুঝি"?

"একটু কাজ আছে পার্বতী। হ্যাঁ, তোমার টাকা ক'টা……তা খুব সম্ভব সামনের মাসেই কাজে ডাকবে। সব ত একরকম ঠিকই, শুধু যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছতে যা দেরী"।

কলিকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত কোন এক বিস্কুটের কারখানায় চাকুরী হইয়াছে অথবা শিগ্গিরই হইবে—এই ধরণের গল্প পুরন্দর অনেকের কাছে বহুবার শুনাইয়াছে। পাওনাদাররা যদি এই অজুহাতে কিছুদিন অপেক্ষা করে।

পার্বতীর মেজাজ ভাল ছিল। তাই সে পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া আগামী বারোয়ারী পূজায় কোন যাত্রাদলকে বায়না দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি খবর জিজ্ঞাসা করিয়া পুরন্দরকে রেহাই দিল।

পুরন্দর একজনের কাছ হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাচিল। বাড়ীর নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল পুরন্দর, কাবুলিওয়ালাটা তখনও শুধু যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। কী সর্বনাশ, টের পাইলে এক্ষুনি হয়ত·····পুরন্দর আর মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া চুপি চুপি পেছনের পথ দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। নিজের বাড়ীতে আজ সে চোরের মত ঢুকিতেছে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?······অনেকদিন পর নিরু আজ পাওনাদারদের এই অনবরত তাগিদের জন্য পুরন্দরকে তিরস্কার করে নাই। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো যেন স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। পুরন্দরের মন মুহূর্তে শোচনীয় দারিদ্রের কশাঘাত ভুলিয়া মদ-বিহ্বল হইয়া ওঠে। নিরু জানালায় দাঁড়াইয়া দূরের অস্পষ্ট রহস্যময় গাছপালা আর ধানক্ষেতের দিকে তাকাইয়া আছে। নিরুর মন আজ সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছতা ভুলিয়া এক কল্পরাজ্যে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে।

ধীরে ধীরে নিরুর কাঁধে হাত রাখিয়া পুরন্দর ডাকে "নিরু।"

নিরু জবাব দেয় না। কথা দিয়া আজকের সন্ধ্যার এই কাব্যকে হয়ত নিরু ব্যর্থ করিতে চায় না। শুধু আস্তে আস্তে পুরন্দরের বুকে মাথাটা এলাইয়া দেয়। পুরন্দর বলে, "তোমার স্বামী অক্ষম, অকর্মণ্য, এ দুঃখের আঘাত বুঝি তোমার জীবনেও ঘুচল না।"

নিরু জবাব দেয়, "আজকের দিনে আমার কোন অভাব নেই।"

"আজকের মুহূর্তটাই মিথ্যে, অভাবটাই সত্যি।"

"তোমার আমার জীবন যদি এমনি স্বপ্ন হয়ে উঠত।"

"কিন্তু হয়েছে দুঃস্বপ্ন······।"

"মাঝে মাঝে তাই সে দুঃস্বপ্ন ভুলে যেতে চাই। গরীব হওয়া সত্যি মস্ত বড় অপরাধ।"

নিরু একখানি গান শুরু করে। অনেকদিন গান গায় নাই নিরু। গান সে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। স্বামীর সব দুঃখ আর অভাববোধ সে আজ সুরের স্নিগ্ধ প্রলেপে ভুলাইয়া দিবে।

* * *

চা খাওয়ার পর দুইজনে বসিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা উদ্ভট আজগুবি কল্পনা করে। কীসে হটাৎ নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা যায়—সে সম্পর্কে অদ্ভুত সব কল্পনা। এমন সময় বাইরে হাঁক ডাক শোনা গেলো। পুরন্দর চট্ করে সুর নামাইয়া বলিল, "বলে দাও, আমি বাড়ীতে নেই। নিশ্চয় সেই নচ্ছার কাবুলিওয়ালা।" কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার আগেই পিওন একখানা খামের চিঠি দিয়া গেল। তবে কাবুলিওয়ালা নয়, পিওন।

চিঠি লিখিয়াছে—পুরন্দরের বন্ধু অক্ষয়। অক্ষয় কলিকাতায় লিলি গ্রাস্ ওয়ার্কসে চাকুরী করে। পুরন্দর যদি পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসে, তবে তাহারও একটা সুবিধা হইতে পারে। এই যুদ্ধের বাজারে সবাই যখন মোটা টাকা কামাই করিতেছে, তখন পুরন্দর কেন যে গ্রামে বসিয়া পিতৃবিত্ত নষ্ট করিতেছে, তাহা সত্যিই বোঝা কঠিন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরন্দর প্রথমে এই সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিরু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। তাহার প্রার্থনা কৃপাময়ের কাছে তাহা হইলে পৌঁছিয়াছে। ঈশ্বর সত্যিই দুঃখহরণ।

পুরন্দর ও নিরু আবার নতুন করিয়া জীবন শুরু করিবে —নতুন করিয়া বাঁচিবে—ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়।

* * *

অক্ষয় লিলি গ্রাস্ ওয়ার্কসে অনেকদিন হইতে কাজ করিতেছে। অক্ষয়কে আগে চিঠি লিখিলে চাকুরীটা অনেক আগেই পাইতে পারিত পুরন্দর। নিরুকে একা গ্রামে রাখিয়াই কলিকাতায় গেলো পুরন্দর। যুদ্ধের তখন সংকটপূর্ণ অবস্থা। কলিকাতায় কখন বোমা পড়ে সেই ভয়ে সবাই সংকিত। এই অবস্থায় নিরুকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া ঠিক নয়।

অক্ষয় ছোট একটি বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র নিয়া থাকে। পুরন্দর সেইখানেই সাময়িক ভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিল। অক্ষয় বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিল পুরন্দরকে। "এই যুদ্ধের হিড়িকে কত অধম চাকুরী পেয়ে তরে গেলো, শুধু তোর মত বোকারাই বউএর আচল ধরে গ্রামে বসে মশা তাড়াচ্ছিল।"

পুরন্দর হাসে।

"এই যুদ্ধের লুটের বাজারে যারা রোজগার করতে পারলে না, হয় তারা বদ্ধ পাগল আর না হয় অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ।"

পুরন্দর কিন্তু অচিরেই তাহার প্রতিভার পরিচয় দিলো। অনভিজ্ঞতার দরুণ সে কাচের কয়েকটা দামী জিনিষ ভাঙিয়া ফেলে। ইহাতে অফিস সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন। পুরন্দরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। চাকুরী করিতে আসিয়া এই অপমান। চট্‌পট্ সে ঘুসি মারিয়া নিজের মর্যাদাজ্ঞানের পরিচয় দিল। কর্মীরা অনেকদিন হইতেই সুপারিন্-টেনডেণ্টের উপর হাড়ে চটিয়াছিল। পুরন্দর তাহাদের উপর উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিল—ইহাতে সবাই উল্লসিত হইয়া উঠিল। শুধু মাথা হেট হইয়া গেল অক্ষয়ের।

বাড়ী আসিয়া দেখে পুরন্দর জিনিষপত্র গুছাইতেছে।

"কী কাণ্ডটা করলি বলত! গরীবদের মুখ বুঁজে অনেক সইতে হয়। আর দোষত তোরই। কোম্পানীর জিনিষ ভেঙে কত লোক্‌সান করলি বলত।"

পুরন্দর সংক্ষেপে শুধু বলিল, "পরের গোলামি আর করব না অক্ষয়। দেখি নিজে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে পারি কি না।"

অক্ষয় টিপ্‌পনি কাটে।

"তার মানে ত গ্রামে বসে ধান চালের ব্ল্যাকমার্কেট করা।"

"গ্রামে ফিরবার আর মুখ নেই অক্ষয়। বউ হয়ত টাকার অপেক্ষায় দিন গুনচে।"

"তা'ত বুঝলাম। কিন্তু অভিযানটা কোন দিকে হচ্ছে?"

"একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে—ইম্ফলে যাচ্ছি। কুড়িটা টাকা দিতে হবে।"

"তা নাহয় দিচ্ছি। কিন্তু বউ-এর কী হবে।"

"ভগবানের উপর ভরসা। তবু ছোট হয়ে আর বাঁচতে চাই না অক্ষয়।"

* * *

চিঠির প্রতীক্ষায় নিরুর উদ্বিগ্ন দিন কাটে। কিন্তু চিঠি আর আসে না। এদিকে পাওনাদাররা চঞ্চল হইয়া উঠে। শেষে পুরন্দর সম্পর্কে নানা গুজব গ্রামে রটনা হয়। কেউ বলে পুরন্দর অনেক টাকার মালিক—মেয়ে আর মদে ডুবে আছে। বউয়ের দিকে নজর দিবার ফুরসৎ কই! কেউ বলে পুরন্দরের চাকুরী পাওয়ার খবর পাওনাদারদের ঠকাবার একটা কৌশল মাত্র।

নিরুর অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠে। শেষে নিজের দু'গাছা চুড়ি দিয়া নীলুকে সে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়। নীলু যেন পুরন্দরের নামে একশ'টি টাকা পাঠাইয়া তাহার সম্মান রক্ষা করে। যথানির্দিষ্ট দিনে পূর্ব বন্দোবস্ত মত টাকা আসে। পাওনাদাররা আশ্বস্ত হয়, শত্রুদের মুখে চুনকালি পড়ে। কিন্তু নিরুর মনে শান্তি নেই।

নীলুর কাছে পুরন্দরের আসাম যাত্রার সব খবরই শুনে নিরু। এদিকে গ্রামে চাউলের ভয়ানক অভাব। অনেক চিন্তার পর মহকুমা সহরে ভাইয়ের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিল নিরু। গ্রামে থাকিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নীলুকে সংগে নিয়া সে ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেল। গ্রামে সবাই জানিল—নিরু কলিকাতায় স্বামীর নিকট যাইতেছে। স্বামী ছুটি না পাওয়ায় নীলুই তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিবে।

* * *

নিরুপমার বড়দা সুবিমলবাবু কোন এক মফঃস্বল

সহরের হোমিওপ্যাথ্। আমেরিকার ডিগ্রীধারী হইয়াও ভদ্রলোক পশার জমাইতে পারিলেন না—এই জন্য স্ত্রীর নিকট নিয়তই তাহাকে গঞ্জনা সহিতে হয়! অবশ্য আমেরিকায় তিনি যান নাই। সাধারণত যে ভাবে টাকা দিয়া 'হোমিও' ডিগ্রী কিনিতে হয়, তিনি ও সেই মহাজন পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। সুবিমলবাবুর আয়ের তুলনায় অনেক পোষ্য—তাই স্ত্রীর মেজাজটা সব সময়েই সপ্তমে চড়া থাকে। তাহার উপর নিরুর বোঝা বৃদ্ধিতে স্ত্রী চিন্ময়ীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

ঝংকার দিয়া তিনি বলেন, "কই সাত জন্মেও ত বোন একখানা চিঠি দিয়ে ভাইঝি বোনপোর খোঁজ করেনি, এখন আকাল সুরু হতেই সদাব্রত ভায়ের কথা মনে পড়েছে।"

সুবিমলবাবু নিরীহ লোক—স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অনুগত। তিনি দুকূল সামলাইবার চেষ্টা করেন।

"আঃ, নিরু শুনতে পেলে কি ভাববে বলত? অনেক দিন পর ভায়ের বাড়ীতে এসেছে। থাক্ না দুদিন..."

"তা তোমার বোন তুমি খাওয়াবে তাতে আমার কি? কিন্তু নবাব নন্দিনীর ঘুম থেকে উঠে এটা চাই, ওটা চাই... খবরের কাগজ চাই, পোড়া কপাল আমার—নইলে এ বয়সে পরের ঝামেলা সইতে বেঁচে থাকব কোন সুখে? তার চেয়ে আমাকে দাদার ওখানে পাঠিয়ে দাও।"

"নিরুর যখন এখানে ঠাঁই হচ্ছে না, তোমার দাদার ওখানে কী তোমার খুব রাজকীয় অভ্যর্থনা হবে?"

"হবে গো হবে, সবাইত তোমার মত হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ্ নয়।"

সুবিমল চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান করিল নিরুপমা নিজে। 'রায়পুর' এষ্টেটের মেয়ে স্কুলের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। নিরুর আবেদনের জবাব আসিয়া পৌছিল। অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সুবিমল, নিরু ও চিন্ময়ী—তিন জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

২

ছয় মাস পর 'রায়পুরে' গল্পের যবনিকা উঠিল। নিরুপমা অনেক আশা ভরসা নিয়া বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়াছিল কিন্তু তাহার স্বপ্ন ভাঙিতে বেশী দেরী হইল না। কুমার কন্দর্প নারায়ণ শীকার নিয়াই ব্যস্ত। গ্রামের উন্নতির দিকে তাহার নজর খুব কম। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে স্কুলটা রাজবাড়ীর মর্যাদার অংগরূপে শোভা পাইতেছে। রায়পুরের আসল কর্তা কৌশিক সামন্ত। চণ্ডীতলার বিদ্রোহী প্রজাদের সংগে কুমার বাহাদুরের বিরোধ চলিতেছে। কিন্তু আসল কল ঘুরাইতেছে কুচক্রী ম্যানেজার কৌশিক সামন্ত। কিন্তু প্রজারা দমিবার পাত্র নহে। মাতব্বর হারাণদাসের বাড়ীতে এ নিয়া মস্ত মন্ত্রণা সভা বসিল। অশ্বিনী, নদীয়া, মকরম, গফুর সবাই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। জমিদারের অন্যায় জুলুম আর তাহারা সহ্য করিবে না।

নিরুপমা দেখিল—স্কুল শুধু নামেই। মেয়েরা খুসিমত আসে যায়—ডিসিপ্লিনের বালাই নাই। অভিযোগ করিলে কৌশিক সামন্ত গোঁপের আড়ালে বাঁকা হাসিয়া বলে, "গ্রামে নতুন এসেছেন নিরুপমা দেবী। এর হালচাল বুঝতে দেরি হবে। আর স্কুলের ভালোমন্দ নিয়ে আপনারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? মাসান্তে পুরো মাইনেটি গুণে নেবেন—আর বলা যায় না কপালের জোরে যদি কখনও কুমারবাহাদুরের নজরে পড়তে পারেন......"

এ, এল, প্রডাকসনের বাংলা ছবি 'ঘরোয়া'য়
নায়কের ভূমিকায় নবাগত শ্রীশিশির মিত্র

—উপরে—

বোস আর্ট প্রোডাকসন্সের 'প্রিয়তমা চিত্রে' নবাগতা অনিতা মজুমদার (আরতি নয়) ও পাহাড়ী সান্যাল। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

●

রূপ-মঞ্চ

২য় সংখ্যা

সপ্তম বর্ষ

১৩৫৪

—নীচে—

নবাগত দীপ্তি কুমার (এঃ) বহু সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয় করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ইউ, সি, এ ফিল্ম-এর আগতপ্রায় চিত্র 'যা হয়না'য় একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

●

রূপ-মঞ্চ

২য় সংখ্যা

১৩৫৪

কৌশিক কথাটা শেষ না করিয়া এমন বিশ্রী ভাবে হাসিতে থাকে যে নিরুপমার ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে লোকটার মুখের উপর কাগজ পত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দেয়। কিন্তু তাহার পর কোথায়ই বা যাইবে? আশ্রয় বলিতে ছিল বড়দার বাড়ী—সেখানেও যাওয়া চলিবে না। সত্যিই স্বামীর আশ্রয়চ্যুত হইলে মেয়েরা বড় অসহায়। তবু শেষ পর্যন্ত হার মানিবে না নিরু। প্রতিকূল অবস্থার সংগে লড়িয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যে স্বামী স্ত্রীর খোঁজ করা পর্যন্ত কর্তব্য মনে করে না, শত অবস্থা-বিপর্যয়েও সে এমন নীতি-ভ্রষ্ট স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবে না।

*　　*　　*

চন্দনা গ্রামের লোক পুরন্দরের ভাগ্য-পরিবর্তনে একেবারে হতবম্ব হইয়া গেল। সেই পুরন্দর। ঋণে যে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিল। পাওনাদেরর ভয়ে যে বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিত। এক বৎসরে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। আসামে নাকি টাকা ছড়াইতেছে—পুরন্দরকে না দেখিলে কেহই সে কথা বিশ্বাস করিত না। ভাঙা বাড়ীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া বিরাট পাকা বাড়ী উঠিয়াছে। ডিষ্টীক বোর্ডের রাস্তা দিয়া কংগ্রেস পতাকা উড়াইয়া পুরন্দরের মোটর যে দিন গ্রামে ঢুকিল—সে দিন চন্দনায় কী বিপুল চাঞ্চল্য।

ইতিমধ্যেই পুরন্দরের অনেক ভক্ত এবং চাটুকার জুটিয়া গেলো। কিন্তু শত্রুরা পুরন্দরের বিরুদ্ধে গ্রামে নানা রটনা প্রচার করিতে লাগিল।

পুরন্দর দারিদ্র্যের অভিশাপ মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল। তাই হঠাৎ-ধনী হইয়াও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষের বিধ্বস্ত জীবনকে আবার সুস্থ, সবল এবং সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক দারিদ্র। যাহাদের পেটে ভাত নাই, কোন বড় আদর্শের বুলি দিয়া তাহাদের কর্মে অনুপ্রেরিত করা সহজ নয়। চাষই পরাধীন দেশের রাজনীতি। কিন্তু শুধু চাষ নয়—একটা জাতিকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই শিল্পের প্রসার। পুরন্দর তাই 'চন্দনা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল' গড়িয়া তুলিয়াছে। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের কুটীর শিল্পে অভিজ্ঞ করিয়া তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলাই তাহার প্রাথমিক কর্ম-প্রচেষ্টা। সমবায় ভিত্তিতে বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনাও তাহার আছে। আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক অগ্রগতি কী করিয়া সম্ভব? শুধু মিটিং করিয়া বড় বড় কথার আওয়াজে ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া পালাইবে না। শিল্প-বিপ্লবকে রাজনৈতিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করিতে হইবে। শত্রুরা বলে, 'সোমত্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিশোরীভজনের দলটি খুব জাঁকিয়ে বসেছে পুরন্দর।'

পুরন্দর এ সব কুৎসার কোন জবাব দেয় না। পরাধীন দেশে আপনার জনের নিকট হইতেই আঘাত আসে সব চেয়ে বেশি। নিরুপমাকে নিয়া গ্রামে কত কথাই না প্রচার হইয়াছে। নিরুর জন্য মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠে। বেচারী সারা জীবন দুঃখে কাটাইয়াছে। আজ যদি নিরু পাশে থাকিত—তবে কাজের অনেক উৎসাহ পাইত পুরন্দর। কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও নিরুর কোন সন্ধান মিলে নাই।

*　　*　　*

দুর্ভাগ্যক্রমে ডিষ্টিক বোর্ডের রাস্তায় ডাঃ সত্যকিঙ্কর রায়ের মোটর বিগড়াইয়া গেলো। ডাঃ রায় মেয়েকে নিয়া কলিকাতা ফিরিতে ছিলেন। হঠাৎ এই দুর্ঘটনা। ড্রাইভার জানাইল অন্ততঃ ঘণ্টা ছয়েকের আগে গাড়ী সচল হইবে না।

বাধ্য হইয়া তাহারা পুরন্দরের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। রক্ত-মিশ্রণ ডাঃ রায় বাঙালীর সম্পর্কে সর্বদাই উদ্বিগ্ন। তিনি Blood theory'র একজন প্রচণ্ড সমর্থক। বলেন, "স্বাধীনতাই বলো আর 'Quit India' বলেই চেঁচাও—গোড়ার গলদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এ জাতের মুক্তি নেই। বাঙালীর Brain Weak হয়ে যাচ্ছে—তার কারণ Eugenics নিয়মগুলো সম্পর্কে আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ।

ডাক্তারের অদ্ভুত সব মতবাদ।

মেয়ে তপতী চঞ্চল। প্রাণদীপ্ত এবং অকুণ্ঠ।

ডাক্তার বলেন, "এই দেখো আমার মেয়ে তপতী—কোথায় পড়াশোনা করবে—না সারাদিন পলিটিক্স্ নিয়ে মত্ত।"

পুরন্দরের সংগে তপতীর প্রথম আলাপেই মত-বিরোধ প্রকাশ পায়।

তপতী বলে, "আপনিও কি বাবার মতো মেয়েদের সুগৃহিনী হ'বার জন্যে জন্ম থেকেই সাধনা শুরু করতে বলেন?"

পুরন্দর জবাব দেয়, "সে হচ্ছে আদর্শের কথা। সকলের দৃষ্টিভংগী সমান নয়। কিন্তু আজকের রাজনীতির সব চেয়ে বড় মন্ত্র হচ্ছে—বেঁচে থাকা। সুস্থ, সবল মানুষই শুধু জোর গলায় তাদের দাবী জানাতে পারে। নইলে যাদের পেটে দুমুঠো ভাতও জুটে না—তাদের কাছে 'জাপানকে রুখ্‌তে হবে' আর 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও'—এসব শ্লোগান অর্থহীন ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয় তপতী দেবী।" এই সূত্রে ডাঃ রায়ের সংগে পুরন্দরের পরিচয় ক্রমশঃ অন্তরংগ হইয়া আসিল। মতের অমিল সত্ত্বেও পুরন্দরের ব্যক্তিত্ব তপতীকে আকর্ষণ করে। লোকটা সাধারণের চেয়ে নতুন ধারা চিন্তা করিতে পারে। পুরন্দর বলে, "দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রয়াসে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু ফ্রী ক্যান্টীন্ খুলে আর ফ্যান্ খাইয়ে চিরদিন একটা জাতকে বাঁচানো যায় না। এদের মুক্তির জন্যে নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

......তপতী একদিন আবিষ্কার করে সে পুরন্দরকে আপনার অজ্ঞাতসারে ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? একটা সুদূর বিহারী কল্পনা চকিতে তাহার মনকে দোলা দিয়ে গেলো।

৩

কুমার কন্দর্পনারায়ণের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ সত্যকিঙ্কর রায়। টেলিফোনে প্রায়ই ডাক্তারের ডাক আসে 'রায়পুর' হইতে। সম্পত্তি হাতে পাইয়া বাঙলা দেশের অপরিণামদর্শী জমিদারদের মত কন্দর্পনারায়ণও বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। তপতীর প্রতি কুমারের আসক্তি ছিল। ডাঃ রায় ত কুমারের সংগে মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে হাতে স্বর্গ পান। কিন্তু তপতী এই স্বেচ্ছাচারী বিলাসী জমিদারের হাতে নিছক সঁপিয়া দিতে সম্মত ছিল না। এই নিয়া বাপ-মেয়েতে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই ছিল। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে নতুন আদর্শ নিয়া পুরন্দরের আবির্ভাব হইল। পুরন্দরের আর্থিক সমৃদ্ধির পরিকল্পনা তপতীর রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী। তাহা সত্বেও পুরন্দরের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তপতীকে মুগ্ধ করিয়াছে।

কন্দর্পনারায়ণ ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখাইয়া যতই তপতীকে করায়ত্ত করিতে চান—তপতী ততই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়।

কুমার তখন তপতীর মন জয় করিবার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করিলেন। গ্রামে তিনি আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিয়া দুঃস্থ এবং নিরন্নদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিলেন। এমনি করিয়া কুমার নিজেকে তপতীর চোখে মহৎ করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। তপতীদের বাড়ীতে পুরন্দরের সংগে তাহার আলাপ-পরিচয় হয়। একদিন তিনি নিজ গ্রামে সেবা-কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য তপতী ও পুরন্দরকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

তপতী অনেকদিন পুরন্দরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছে। অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থ জবাব দিয়া বরাবরই পুরন্দর তপতীর প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছে। তপতী তাই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই যে পুরন্দর বিবাহিত!

আর নারী যখন পুরুষকে হৃদয় দান করে তখন কোন প্রতিবন্ধক এবং সংস্কারই তাহার ভালোবাসার স্রোতকে প্রতিহত করিতে পারে না।

তপতীর জীবনে রাজনৈতিক আদর্শের সংগে প্রেমাস্পদের এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিল।

* * *

কুমার বাহাদুর ঋণে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিলেন। তাই চণ্ডীতলা

অঞ্চলটি তিনি কাপড় কল বসাইবার জন্য একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রী করিতে উদ্যত হইলে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল। কৌশিক সামন্ত দেখিল—এই অঞ্চল নির্দিষ্ট কোম্পানীর নিকট বিক্রী না হইলে তাহার বখ্‌রা বাবৎ একটি মোটা টাকা মারা যায়। সে গ্রামে চক্রান্ত করিয়া আগুণ ধরাইয়া দিল।

নিরুপমার জীবন কুমারবাহাদুরের সাংগপাংগদের আব্‌দারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। চাকরের তাবেদারী করা অসহ্য। কিন্তু কৌশিকের কুৎসিত ব্যবহার চরমে উঠিল।

কৌশিক একদিন দুঃসাহসী হইয়া কুপ্রস্তাব করিয়া বসিল নিরুর কাছে। নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে নিরুকে এই কথা বলিল যে, নিজের স্বার্থ গুছাইতে হইলে রায়পুরে কাহারও পক্ষে ভালো থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

"নেহাৎ কুমারবাহাদুর আজকাল কলকাতার রথে মত্ত হয়ে উঠেছেন। নইলে দিদিমণির একটা সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু রায়পুরের নিয়মই এই—কুমার যাদের দিকে নজর দেন না—তার নায়েব গোমস্তারাই তাদের সুখসুবিধার ভার নিজের উপরই টেনে নেয়।"

লোকটার সীমাহীন স্পর্ধা এবং নির্লজ্জ নগ্নতায় নিরুর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! সে ঠাস্‌ করিয়া কৌশিকের গালে এক চড় বসাইয়া দিল।

ইতরদের এমনি করিয়াই শিক্ষা দিতে হয়। কৌশিক ঝানু লোক। বহু মেয়ের সর্বনাশ করিয়া এ বিদ্যাতে যে পাকা জহুরী হইয়া উঠিয়াছে। সে ক্রোধ চাপিয়া হাসির ভান করিয়া বলিল, "মারলে? মেয়েদের এত দেমাক্‌ ভালো নয় নিরু দিদি। সিঁথিতে লোক দেখানো সিঁদুর দিয়ে ত আর ভেক্‌ মিলবে না। তাই প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখো। কৌশিক সামন্ত ইচ্ছে করলে রায়পুরের ভিখিরিকেও গাছে চড়াতে পারে। সুতরাং ঝগড়া করবেন দু'জনেরই সমান ক্ষতি। আর আজকাল ভালো থেকে লাভ নেই।"

নিরুপমা পরদিনই রায়পুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

পরদিন কুমারবাহাদুরের আমন্ত্রণক্রমে পুরন্দর ও তপতী রায়পুরে আসিতেছে। এদিকে চণ্ডীতলার প্রজারা সর্বস্বান্ত হইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। রায়পুরে ঢুকিবার পথেই চণ্ডীতলা। কুমারবাহাদুর মোটর ড্রাইভ্‌ করিতেছেন। পেছনে পুরন্দর ও তপতী। প্রজারা দা, বর্শা, লাঠি প্রভৃতি নিয়া মোটর আক্রমণ করিল। কুমার ভীরু ন'ন। মোটরের ষ্টার্ট দিবার হ্যাণ্ডেল নিয়াই তিনি জনতার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। জনতার সর্দার হারাণ, অশ্বিনী, মকরম প্রভৃতি মাতব্বর প্রজারা।

সেই পথ দিয়া গরুর গাড়ীতে নিরু কলিকাতা রওনা হইয়াছে। হৈ চৈ শুনিয়া সে গরুর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

এ কি? পুরন্দর না? চেহারার কান্তি অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু নিরুর ভুল হয় নাই। পাশে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া। পুরন্দর আবার বিবাহ করে নাই ত? মেয়েটির মাথায় ঘোমটা নাই। তা আজকালের মেয়েরা ঘোম্‌টার বড় একটা ধার ধারে না।

নিরু আত্মগোপন করিয়া কোথায় যাইবে তাহাই ভাবিতেছে। স্বামীর কাছে সে এখন মৃতের সমান। বেহালার ভাঙা তার জোড়া দিতে গেলে বেসুরো তালই বাজিবে। হঠাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজাদের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিয়া নিরুর বুকে বিঁধিল। মুহূর্তে সংঘর্ষের রূপ বদ্‌লাইয়া গেলো।

পুরন্দর ও কন্দর্পনারায়ণ ছুটিয়া আসিলেন। তপতী নিরুর রক্তাক্ত দেহ বুকে তুলিয়া নিল।

৪

নিরুর সংগে পুরন্দরের পুণঃর্মিলন হইল নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া—প্রায় অন্তিম মুহূর্তে।

তপতী আশ্চর্য একাগ্রতা ও নিষ্ঠায় নিরুর শুশ্রূষা করিতেছে। কিন্তু ডাঃ রায় কোন ভরসাই দিতে পারিলেন না।

তপতী শান্ত, স্থির। মুখে বিরক্তির কিছুমাত্র ছাপ নাই। পুরন্দর কেন এতদিন নিরুপমার কথা গোপন রাখিয়াছিল—তপতীর সে সম্পর্কেও কোন অনুযোগ নাই।

পুরন্দর আজ যেন তপতীর অন্তরে নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছে।

নিরু বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

সে তপতীর হাত চাপিয়া ধরে।

"আমি ত চল্লেম। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটি অনুরোধ রইলো। ওকে জীবনে সুখী করতে পারিনি। বল আজ থেকে তার সব ভার তুমি নিলে—তাই শুনলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।"

তপতীর চোখের কোণে জল ঝরিয়া পড়ে। ভাষাহীন, নীরব বেদনার মধ্যে দিয়া তপতীর আশ্বাস বাণী নিরুর মনে সান্ত্বনার স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

নিরুপমার চোখে ঘুম নামিয়া আসে—এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

* * *

ডাঃ সত্যশঙ্কর তপতীকে পুরন্দরের সংগে বিবাহ দিতে সম্মত হ'ন। কিন্তু তপতী আদর্শের নতুন পতাকা হাতে তুলিয়া লইয়াছে। বিবাহ দ্বারা সে নিরুপমার স্মৃতিকে অপমান করিতে পারিবে না। বড় প্রেম নিজকে বিলাইয়া দিয়াই আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া পায়।

'চন্দনা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল' রূপান্তরিত হইল 'নিরুপমা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলে'। তপতীকে নিয়া পুরন্দর স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিপুল উদ্যমে কার্যকরী শিক্ষার বিরাট পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে এই স্কুলে। পুরন্দরের আজীবনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপলাভ করিতেছে।
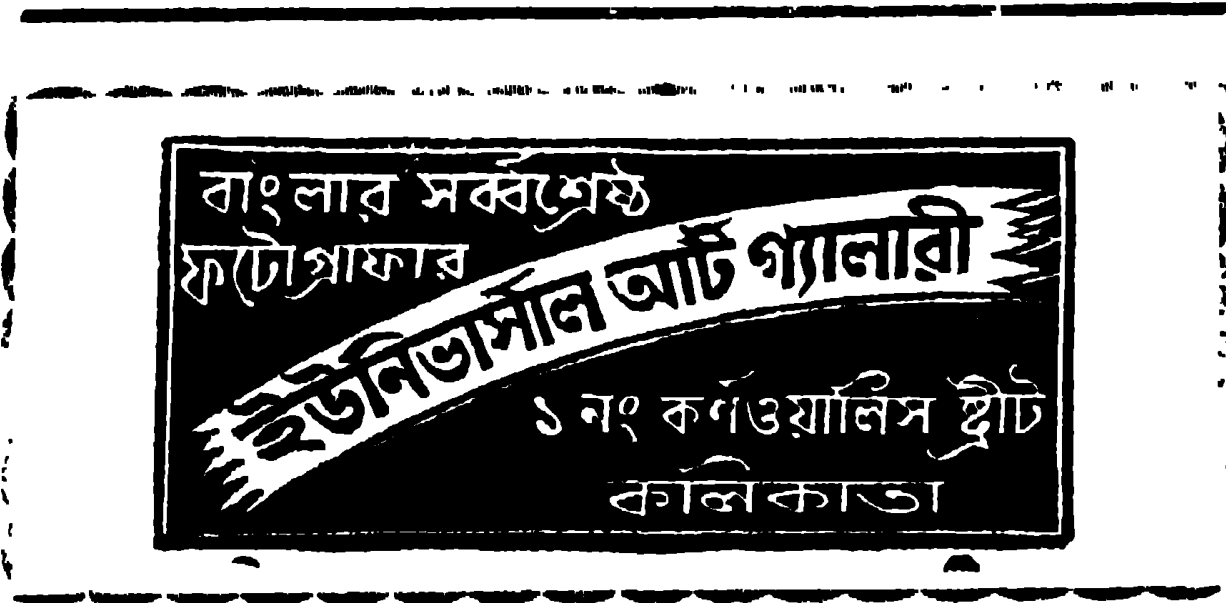
স্কুলের ছেলেমেয়েরা সারবন্দীভাবে দাঁড়াইয়া 'জয়হিন্দ' ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে পুরন্দর ও তপতীকে অভিবাদন জানাইল।

পুরন্দর বলিল, "'জয়হিন্দ' বা 'বন্দেমাতরম্' তোমাদের মন্ত্র হোক্ কিন্তু এই কথাটি সর্বাগ্রে মনে রেখো বড় ধ্বনি উচ্চারণ করলে দেশের কাজ হয় না। বাঙালীর বাক্সর্বস্ব বলে অপবাদ আছে। তাই কর্মক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়েচি। একটা পরাধীন জাতির শৃঙ্খলোন্মোচনের জন্য আজ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েচে। কিন্তু দেশকে নানা ভাবে বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দেয়া চলে। যারা বৃটিশের আইন ভেঙে কারা বরণ করে—তাদের দেশসেবার সংগে যারা স্বাবলম্বী হয়ে স্বদেশী শিল্প প্রচার দ্বারা দেশের দারিদ্র দূর করতে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে—তাদের কর্মসাধনার কোন প্রভেদ নেই। এটা নীরব দেশ সেবা। মাতৃভূমির দাসত্ব মোচনের এই ব্রত তোমাদের ভবিষ্যৎ ভারতকে দুঃখদারিদ্র থেকে মুক্ত করে সম্পদশালী করে গড়ে তুলবে তোমরা—ভাবী-কালের বীর সৈনিকরা—তোমাদের নমস্কার করি।"

ছেলেমেয়েরা ঐক্যতানে গাইলো

'হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে

......ইত্যাদি'

খদ্দরের গান্ধী টুপি পরিহিত সৌম্যমূর্তি পুরন্দরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

......তপতীর কাছে সরিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পুরন্দর বলে, "মেয়েরা ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু, আমার অনেক অবিচার তুমি নীরবে সয়েছ। কিন্তু তোমার কাছে আমার অনেক দাবী। নিরুপমার কথা স্মরণ করেও তোমাকে এর মেয়ে বিভাগের ভার নিতে হবে। আজ থেকে 'নিরুপমা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল স্কুলের' উন্নতিই হোক্ তোমার ধ্যান, ধারণা—তপতী এর শ্রীবৃদ্ধি সাধনা হোক তোমার তপস্যা।"

(৫)

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

★

কয়েকবছর কেটে গেছে। দেবু বি, এ, পাশ করে কলকাতার একটী দৈনিক খবরের কাগজে কাজ করছে। দু'বছর পুজোয় বাড়ী আসতে পারেনি। এবার কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী আসছে। শিবশঙ্কর ভাইয়ের আসবার আনন্দে যেন ঠিক ছোট্ট ছেলেটী হ'য়ে গেছেন। হলধরকে ডেকে বলছেন, "দেবু আমার মাছটা ভালবাসে, দেখো মাছ-ঠাচের কিন্তু অভাব না হয়।"

রাইকে আবার পৃথকভাবে বলেন, "রাই, তোর দেবুদা আসছে। কলকাতায়ত আর তাজা মাছ খেতে পায় না! তোর বাবাকেও বলেছি। জিয়েল মাছের যোগাড় রাখিস।"

রাই মুখ টিপে টিপে হাসে আর সুনন্দাকে বলে, "কবে ভাই আইসবে তার নাই ঠিক—। শিবদার যেন একন থাইকাই ঘুম নাই।"

মদন শেখের বাড়ী যেয়ে শিবশঙ্কর তার গরুর দু'সের দুধই এক'দিনের জন্য রোজ করে আসেন। মদনশেখের সংগে কথা বলে খানিকটা দূরে এসে মনে পড়ে, চাচিকেত খবরটা দেওয়া হ'লো না! আবার ফিরে যেয়ে মদনকে জিজ্ঞাসা করেন, "চাচি কোথায় চাচা?"

মদন তার বৌকে হাক দেয়, "আরে হোনছো নি—ঠাহুর ডাইকছে।" চাচি এসে হাজির হয়। শিবশঙ্কর বলেন, "চাচি, তোমাদের ছোঠাকুর আজ-কালের ভিতরই বাড়ী আসছে। দুধটুক এই জন্যই রোজ করে গেলাম। আর 'ঢ্যাপের' মোয়া তৈরী করে রেখো। নইলে তোমার 'জালা' ভেংগে তছনছ করে দেবে।" মদন শিবশঙ্করের বাবার বয়সী। হালুটি করে। তাছাড়া শিবশঙ্করদের এবং গায়ের অনেক বাড়ীর খেজুর গাছ কেটে সংসার চালায়। দেবু এদের সকলেরই প্রিয়। মদন শেখের অভাব অভিযোগের সংসারে কাপড়ের কোছায় বেঁধে কতদিন যে দেবু বৌদির কাছ থেকে চাল দিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। মদন শেখের বড় ছেলেটা দেবুরই বয়সী। শিবশঙ্কর গায়ের স্কুলে বিনে মাইনেতে তাকে পড়াবার ব্যবস্থা করে দেন। ছেলেটীর পড়াশুনায় খুব মাথা ছিল। মদন সবসময় বই পত্রও কিনে দিতে পারতো না। দেবুর বই ওরা দু'জনে ভাগাভাগি করে পড়তো। মাইনর ক্লাস উত্তরিয়ে সে পুলিশে চাকরী পেয়ে যায়। মদনের অভাব অনাটনের সংসার আগের চেয়ে অনেকটা সচল হ'য়ে উঠেচে।

মদনের বৌ বলে, "আল্লায় তারে ভাল্ রাউখ। এ্যানে কী আর চাচির মোয়া ভাল্ নাগবে?"

শিবশঙ্কর উত্তর দেন, "তুমি কী যে বল চাচি? দেবু তোমাদের সেরকম নয়। দেখলে না—সেবারও বাড়ী এসে কেমন নৌকো বেয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ালো। ওপাড়ার ছেলেরাত একবার কলকাতা ঘুরে এলে গায়ের সবই যেন ভুলে যায়।" চাচি সায় দিয়ে বলে, "তা সাচ্চি বাক্যি। আমরাত তাজ্জি বইনা গ্যালাম। ছাই লগি দিয়া আগের সামাল ক্যামনধারা নাও ঠ্যাইল্যা নিল।"

মদনশেখের বৌ'র সংগে কথা বলে শিবশঙ্কর বাড়ীতে ফিরে আসেন। মদন আর হলধরের বাড়ীর মাঝখানে জলনিকাষের উপযোগী ছোট্ট ঢালু জায়গা। তিন চার হাত পাশে। খালডাংগা আর গ্রামের শস্য শ্যামল মাঠের সংগে সংযোগ স্থাপন করেছে। শুকনোর দিনে এটা শুকিয়ে যায়। বর্ষায় যাতায়াতের জন্য একটা বাঁশের সাঁকো থাকে। এর দু'ধারে হিন্দু এবং মুসলমানের বসতি। পরস্পরের ধর্ম আলাদা—খাওয়াখাওয়ি—পোষাক পরিচ্ছদও পৃথক। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না এরা পরস্পরের অনাত্মীয়। সৃষ্টির কোন আদিম যুগ থেকে পরস্পরের স্রষ্টা পরস্পরকে এমনি নিগূঢ় বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন—বাইরের কোন বিভেদই এদের অন্তরের যোগসূত্রকে ছিন্ন করতে পারেনি। পরস্পরের স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিত্ব পরস্পরে অক্ষুণ্ণ রেখে পরস্পরকে অতি আপনার করে কাছে টেনে নিয়েছে।

বল্লভপুরের মাঠের উর্বর জমিতে সময়ের বিভিন্নতায় নানাজাতীয় শস্যে ক্ষেত ভরে ওঠে। এদের আকার—গঠন ও প্রয়োজনীয়তা এক নয়। কিন্তু মাটির সংগে এদের প্রত্যেকেরই যোগসূত্র এক এবং অভিন্ন। যেমনি বল্লভপুর মাঠের নানাজাতীয় শস্য একই মাটির রস গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে—তেমনি বল্লভপুর গায়ের কয়েক ঘর মুসলমান কৃষি-জেলে-বামুন-কায়েত এবং আরো অনেকে ঐ একই মাটির রস গ্রহন করে বেঁচে আছে। পরস্পরের প্রয়োজন ও চাহিদায় পরস্পরের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বল্লভপুরের জল হাওয়া আর মাটির মধ্য দিয়ে এরা পরস্পরের অন্তরের সংগে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

মদনের ছেলের অসুখ মদনের চেয়ে শিবশঙ্করকে কম বিচলিত করে তোলে না। ডাক্তার ডাকা—পথ্য যোগান এমনকী সময়ে অসময়ে দশবার করে খোঁজ খবর নিতে হাজির থাকতেও দেখা যায়। আবার শিবশঙ্কর বা আর কারো বাড়ীতে যদি কোন অসুখ বিসুখ হয়, সহর থেকে বড় ডাক্তার আনতে হ'লে বুড়ো মদন শেখ দুপুর রাত্রে কাঁদা জল ভেংগে মধু মিঞাকে সংগে নিয়ে হেরিকেনের আলোয় পথ দেখে দু'ক্রোশ রাস্তা পাড়ি দিতেও দ্বিধা করে না। পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কারকে পরস্পরের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতায় অবগাহন করিয়ে পরস্পরের মাঝে এরা যে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে—তাকে বিষিয়ে তুলবার মত শক্তি বিশল্যাকরণীরও আজ অবধি হয়নি। এদের ভিতর যে বিভেদ, তা হিন্দু আর মুসলমানের নয়। শোষক আর শোষিতের—সুদখোর অবিনাশ মজুমদার আর দেনাদার শিবশঙ্করের—অত্যাচারী জমিদার ভগবান মল্লিক আর অত্যাচারিত প্রজা মধু মিঞার।

রায়দের বাড়ী প্রতি বছর দুর্গা পুজা হয়। পূর্বে এই পুজা উপলক্ষে যে জাকজমক আর ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যেত, দীন গ্রাম্যশিক্ষক শিবশঙ্করের পক্ষে সে ব্যয়ভার কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। দেবত্তর সম্পত্তি যা আছে—তারই ওপর নির্ভর করে শিবশঙ্কর পৈতৃক রীতিটা রক্ষা করে চলেছেন। অভাব অভিযোগের চরম দুর্দিনেও পৈতৃক পুজা বন্ধ হ'য়ে যেতে দেন নি। কিন্তু সম্পদের মায়াজাল কাটিয়ে আজ রিক্ততার মাঝে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রকৃত সত্য যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। রায়বাড়ীর সম্পদের দিনে যে অনুষ্ঠানের মূর্চ্ছনা পারিবারিক গণ্ডির সংগে আঘাত খেয়ে গুমরে গুমরে ফিরতো। আজ সম্পদ-হীনতার মাঝে সেই মূর্চ্ছনা সমস্ত বেড়াজাল ভেঙে যেন উদ্দাম বেগে সমস্ত বল্লভপুর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দেবী দশভুজা তাঁর দশবাহু বল্লভপুর গায়ের দশদিক প্রসারিত করে সকলকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছেন। পূর্বে যেখানে নামকরা যাত্রাদলের অভিনয় হ'তো—আজ সেখানে স্থান দখল করেছে পাড়ার যুবকদের সৌখীন নাট্যাভিনয়। পূর্বে পুজোর দশদিন আগে বড় বড় পানসী নিয়ে সহরে সহরে পুজোর বাজার করতে লোক ছুটতো। আজ ছোট ডিঙ্গি নিয়ে মধু শেখ আশে পাশের গায়ের হাটে ঘুরে ঘুরে সস্তায় পুজোর হাট করে আনে। কারোর ক্ষেতের আখগুলি বড় হ'য়ে উঠেছে—নতুন কলা গাছ গুলি ভেংগে কলার কাঁদি ঝুলে পড়েছে—ক্ষেত বা বাগানের মালিক রায়বাড়ীর পুজোয় দেবার জন্যই তা মনে মনে পূর্বে থেকে সংকল্প করে রাখে। নিজেদের শত অভাব অভিযোগ থাকলেও এজন্য তারা কোন মূল্য নেয় না—নিতে চায় না। আজ রায় বাড়ীকে ঘিরেই যে তাদের সবাকার আনন্দ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে! পুরোন দেওরী পূর্বে যেখানে পঞ্চাশ টাকা নিয়েও আপত্তি জানাতো, আজ কুড়ি টাকাতেও তার মুখে হাসির অভাব হয় না।

আটচালায় বসে পুরোন দেওরী প্রতিমার বাকী কাজটুকু সেরে ফেলছে। শিবশঙ্কর একটা টুলে বসে আছেন। তাঁর সাত আট বছরের মেয়ে চন্দ্রলেখা গা ঘেসে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে প্রতিমার পানে চেয়ে আছে। পাড়ার আরো অনেকে জড়ো হ'য়েছে। কেউ বেঞ্চে—কেউ চাটাই পেতে—কেউবা উটকো ভাবেই মাটিতে বসে পড়েছে।

কেউ বলছে, "দেওরী দা, এবার তুমি অসুরের গোঁফটা যা দিয়েছো—তোফা।"

কেউ বলছে, "সরস্বতীর মুখটা ভারী সুন্দর হ'য়েছে—যেন হাসছেন।"

আবার কেউ বলছে, "সিংহের ল্যাজ সুইয়া গ্যালো ক্যান।" দেওরীকে সকলেই দেওরী দা বলে ডাকে। শিবশঙ্করও—তার ছোট্ট মেয়ে চন্দ্রলেখাও।

ছোট ছোট ছেলেরা ভগবতীকে বিভিন্ন অস্ত্রে সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। কেউবা বাঁশের চটা দিয়ে সড়কী তৈরী করছে। কেউ কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরী করছে ঢাল ও খাড়া। আবার কেউ কার্ত্তিকের তীর ধনুক নিয়ে মেতে পড়েছে। কেউবা সরস্বতীর বীণায় তার লাগাচ্ছে। দেওরীর সংগে দু'টো ছেলে এসেছে তাকে যোগান দেবার জন্য। তারা প্রতিমার গয়না গড়ায় মত্ত। পূর্বে এসব গয়না এবং অস্ত্র শস্ত্র কিনে আনা হ'তো। গয়না তৈরী হ'তো বিলেতী রাঙতা দিয়ে—স্বদেশী আন্দোলনে তা বন্ধ হ'য়েছে। অর্থাভাবে দেবীর অস্ত্র শস্ত্র তৈরী হচ্ছে পাড়ার ছেলেদের অস্ত্রশালায়। দানবদলনী দেবীর যুদ্ধোপকরণ যোগাবার আর্থিক সংগতি শিবশঙ্করের নেই সত্যি—কিন্তু দেবতাদের আর্থিক সম্পদও বৃত্রসংহার করতে পারেনি—সেজন্য প্রয়োজন হ'য়েছিল দধিচীর অস্থি'র। রায়বাড়ীর প্রাচীন সম্পদও দশ প্রহারিণীর যে রূপ দিতে পারেনি—আজ সবাকার অন্তর নিঙড়ে যে রস-সৃষ্টি হয়েছে তার প্রলেপে দেবীর সর্বাংগ অপরূপ রূপ লাভ করেছে—একথা পাড়ার বুড়ো বুড়ির দলও স্বীকার করেন। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে শিবশঙ্করের চোখ সজল হ'য়ে ওঠে। মনে মনে মিনতি জানিয়ে বলেন, "যে নবীন রূপ-কারেরা তোমার অংগ-সজ্জার ভার নিয়েছে—তাদের আন্তরিকতায় তুমি আশীর্বাদ জানিও মা!" মৃণ্ময়ী প্রতিমার তখন অবধি চক্ষুদানও হয়নি—প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হয়নি। কিন্তু মায়ের আগমনীর সাড়া যেন এরা আগে থেকেই টের পেয়েছে। অভিভূত শিবশঙ্কর অপলকনেত্রে চেয়ে থাকেন সমাপ্তপ্রায় প্রতিমার পানে। পাড়ার যুবক সম্প্রদায়ের কয়েকজনের হাকে শিবশঙ্করের চমক ভাংগে। কাছারীতে ওদের নাটকের জোর মহলা চলেছে। শিবশঙ্কর নিজেই পল্লী উন্নয়ন নিয়ে নাটকখানি লিখেছেন। একটী বিশিষ্ট ভূমিকার দেবুর অভিনয় করবার কথা। ভূমিকাটী ইতিপূর্বে'ই তাকে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। ওদের ভিতরই একজন রিহার্সেলে দেবুর প্রক্সী দিয়ে যাচ্ছে। সমিতির সম্পাদক বিমল মিত্র জিজ্ঞাসা করে, "দেবু আসবে কবে দাদা!"

শিবশঙ্কর একটু টেনে টেনে উত্তর দেন, "আসবে, আসবারত কথা আছে আজ কালের ভিতরই। সঠিক কোন তারিখ লেখেনি। তবে সপ্তমীর পূর্বে'ইত আসা উচিত।"

কিন্তু এই উচিত আর উচিত হ'য়ে দেখা দেয় না। সপ্তমী যায়—অষ্টমী যায়—নবমীতেও দেবুর দেখা নেই। পূজোর আনন্দ মুখরিত দিনগুলি এক কারুণ্যের রেশ নিয়ে শিবশঙ্কর ও তার স্ত্রীর মনে বেজে ওঠে। না আসবেত না আসবে—কয়েকবার ত আসতেও পারেনি—কিন্তু আসবে বলে না আসার ব্যথা এঁরা সহ্য করতে পারেন না। বিজয়া দশমীর দিন সকাল অবধিও যখন এলো না—শিবশঙ্কর দেবুর আশা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে বলতে থাকেন, "কলকাতার ছোঁয়াচ ওরও গায়ে লেগেছে।"

পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলেন, "তোমরা আজকের দিনটা দেখ। নইলে যাকে দিয়ে প্রক্সী দেওয়াচ্ছিলে তাকে দিয়েই চালিয়ে নাও।"

পূজোর হই হুল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ আর বিলের দিকে তাকিয়ে এঁদের চোখে ধাঁধাঁ পড়ে গেছে। জলে ভাসা ধানে ভরা মাঠের বুক দিয়ে যখনই কোন কেড়ায়ে নৌকা চলেছে—শিবশঙ্কর নিজেও উদগ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য করেছেন। ঝালডাঙ্গার বিল দিয়েও এমনি ভাবে কোন নৌকো সুনন্দার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুনন্দার অনুপস্থিতিতে রাই পাহারা দিয়েছে।

বিজয়া দশমীর বিকেল বেলা। প্রতিমা মণ্ডপ থেকে আটচালা ঘরে নামানো হ'য়েছে। আজ দেবীর বিদায়ের দিন। ঢাকের বোলে বিসর্জনীর করুণ রাগিনী বেজে উঠেছে। শিবশঙ্কর ও সুনন্দার মনে সে কারুণ্য আরো গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। পাড়ার মেয়েরা প্রতিমা বরণের জন্য ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। পুরুষেরা কোমরে গামছা বেঁধে এখানে ওখানে পায়চারী করছে। মেয়েদের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর পর পুকুরে নিয়ে প্রতিমা বিসর্জন

দিতে হবে। তার উদ্যোগ আয়োজনে অনেকে ব্যস্ত। বাঁশ, কাছি, পাথর আরো অনেক কিছু জড়ো করা হ'য়েছে।

বল্লভপুরের জলে ভাসা মাঠে জলের ওপর ভর দিয়ে ধানগাছগুলি বাতাসের বেগে বেড়ে বেড়ে উঠেছে—আউস ধানগুলি শস্তভারে নুইয়ে পড়েছে—তাদের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ওরই ভিতর দিয়ে একখানা কেড়ায়ে নৌকা রায়বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। রায়বাড়ী আর হলধরের বাড়ীর মাঝখানের লিচু গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রাই অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছে নৌকোটাকে। ধপ ধপ করছে সাদা জামা গায়ে এক ভদ্রলোক ছইতে ঠ্যাস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পাটের জমি নৌকাটাকে আড়াল করে দাঁড়ালো।• রাই লিচু গাছ থেকে দু' পা এগিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক! এবার তার ভুল হয়নি! দেবুদাইত! কতটা লম্বা হ'য়ে গেছে। চেনাই যায় না। রাই আর দেরী করে না। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সুনন্দার কাছে।

"বৌদি, বৌদি ত্যাখো যাইয়া ক্যাডা আইছে।" সুনন্দা বরণের জোগাড়ে ছিলেন। মনটাও ভাল ছিল না। রাইকে ধমকে উঠলেন, "নে আর জ্বালাসনে। অত আধিক্যাতা ভাল লাগে না।"

রাই তাঁকে বাধা দিয়ে বলে, "আরে না-না, সত্যি, দেবুদা আইছে।" সুনন্দা তখনও রাইর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নিতে পারছিল না। ইতিমধ্যেই কাছারী বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেছে। কেউ বলছে, "আরে দেবুদা আইছে—আরে দেবুকা" ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গলা উৎসব মুখরিত রায় বাড়ীটাকে আরও মাতিয়ে তুলেছে। সুনন্দা বরণ-কুলা রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, হ্যাঁ দেবুই বটে। নৌকো থেকে লাফিয়ে নামলো।

ছোট ছোট সৈন্য সামন্তের দল কেউ দেবুর সুটকেস, কেউ বিছানা, কেউ রসগোল্লার হাঁড়িটা, ফলের ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে চললো। কেউ কিছু নিতে পারলো না বলে মুখ ভার করে রইলো। দেবু তাদের অভিমান ভাংগাতে চেষ্টা করে। লেখা'ত হাত ধরেই ঝুলে পড়ে। দেবু এক পা এগোয়ত পাঁচ সাতজন তার পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে। সব ছোটর দল। কেউ সামনে থেকে—কেউ পেছন থেকে দেবুকে প্রণাম করে। এরা গাঁয়ের বিভিন্ন বাড়ীর ছেলে মেয়ে। অনেকে দেবুর চেনা—অনেকে অচেনা। ওদেরও অনেকে জানে না এই লোকটাকে—ওরা জানবার প্রয়োজনও মনে করে না—জানতেও চায়না কেনই বা প্রণাম করছে। কেউ ওদের বলেও দেয়নি—বলে দিতে হয়ও না। ওরা শুধু জানে, কেউ যদি বাইরে থেকে গায়ে আসে ওদের একজনে তাকে প্রণাম করলে সকলকেই প্রণাম করতে হয়। ওদের বাপ-দাদাদের দেখেই ওরা এ রীতিটা শিখে নিয়েছে। দেবু ওদের ভীড় ঠেলে উঠানে এসে দাঁড়ালো। ঠিক ওদেরই মত ওর প্রণম্যদের এক এক করে প্রণাম করলো। শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, "সপ্তমীর দিন আসতে পারলি না কেন?"

দেবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয়, "এবার পূজা বার্ষিকীর সম্পাদনার ভার পড়েছিল আমার ওপর। ঝামেলা মেটাতে দেরী হ'য়ে গেল।"

শিবশঙ্করের মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। বাইরে কিছু প্রকাশ না করেই বলেন, "আমরা ত ভেবে অস্থির। যাক—যা কাপড় জামা ছাড়গে। কখন ট্রেণ থেকে নেমেছিস?"

"সকালে।"

"সারাদিন খাওয়া হয়নি!"

"না—চিড়ে দৈ খেয়েছি।"

"যা বাড়ীর ভিতর যা।"

দেবু বাড়ীর ভিতরের দিকে রওনা দেয়। তার পোটলা পুটলিগুলি আগেই পৌঁছে গেছে। যাবার সময় প্রতিমা দেখে যায়। সেখানে পাড়ার বৌদি-দিদি-পিসীমা-মাসীমা স্থানীয় অনেকেই উপস্থিত। প্রতিমার সামনে কাউকে প্রণাম করা রীতি নয়—তাই মুচকী হেসে তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে ঘরে যেয়ে ওঠে। সামনে বৌদিকে দেখেই পায়ের ধুলো নেয়। সুনন্দা অনুযোগের সুরে বলে ওঠে, "কলকাতায় বিবি ঠিবি যোগাড় করেছো নাকি?"

"তোমাকেও ত সেখান থেকে যোগাড় করা হয়েছিল"। সুনন্দার বাপের বাড়ী পূর্ববঙ্গে হ'লেও তার বাবা চাকরী উপলক্ষে কলকাতায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

"আর দোষটাই বা কী! তোমরাত যোগাড় করে দেবে না—কী করবো?"

পাঁচ সাত বছর পূর্বেও বোধ হয় দেওর-বৌদিতে এতটা রসিকতা হ'তো না। কিন্তু এটা বোধ হয় মেয়েদের স্বভাবজাত ধর্ম। সময়ের মাপকাঠিতে সবকিছুকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের অসম্ভব।

ঘোর হ'য়ে এসেছে। প্রতিমা বিসর্জনের সময় হ'য়ে গেছে। দেবু এরই ফাঁকে এবাড়ী ওবাড়ী টহল দিয়ে এসেছে। রাই সবসময়ই দেবুকে এড়িয়ে চলছে। দেবুরও রাইর কথা দু' একবার যে মনে না হ'য়েছে—তা নয়। কিন্তু উপযাচক হ'য়ে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনি কাউকে—রাইত আর সেদিনকার সেই ছোট্টটী নেই! রাইও দূর থেকে তার দেবুদাকে লক্ষ্য করছে—কিন্তু দার্ঘদিনের অদেখায় যে সংকোচ দেখা দিয়েছে—বারবারই দেবুর কাছ থেকে সে-সংকোচ ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। 'বন্দেমাতরম' ও দুর্গা প্রতিমা কী জয়' ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রতিমা পুকুর পাড়ে নিয়ে হাজির করা হলো—দেবুও মালকোছা মেরে কোমরে গামছা বেধে ওদের সকলের সাথে যেয়ে মিশেছে। মেয়েদের উলুধ্বনি আর ঢোলের বাদ্যের ভিতর প্রতিমাকে আস্তে আস্তে পুকুরের মাঝে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া হ'লো। সংগে সংগে সমবেত লোকজনের ঝাপাঝাপিতে রায়বাড়ীর পুকুরের জল তোলপাড় হ'তে লাগলো। আজ পুরুষদের সকলকেই জলে অবগাহন করতে হয়—যারা অক্ষম, অসুস্থ তাদের এবং মেয়েদের মাথায় বিসর্জনী জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ বাদে সকলে এসে পাড়ে ওঠে। হলধর সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। সে জয়গান ধরে—

"জয় দেলো রামের মা তোর গোপাল এলো ঘরে।
আড়িয়া বরিয়া গোপাল তুইলা নাও ঘরে॥
জয় দেলো রামের মা তোর গোপাল এলো ঘরে।
ধান দুর্বা বরণকুলা তুইলা নাও ঘরে॥
জয় দেলো রামের মা তোর গোপাল এল ঘরে।
জয় জয় ধ্বনি হ'লো অযোধ্যা নগরে
জয় দেলো রামের মা তোর গোপাল এলো ঘরে॥"

অন্যান্য সকলে তার পিছু পিছু গাইতে গাইতে উঠোনে আসে ভিজে কাপড়ে। তার পর মণ্ডপে প্রণাম করে বাড়ী চলে যায়। শিবশঙ্কর সকলকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে দেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর সকলেই প্রতি বছর রায় বাড়ীতে আহার করে। রায়বাড়ীর কোন পুরুষ বিসর্জনের পর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে বাড়ীর ভিতর যেতে পারে না। মেয়েরা কাপড় নিয়ে এগিয়ে দেয়। তাদের ছাড়া কাপড় ধুয়ে নিয়ে আসে। সুনন্দা রাইকে দিয়ে শিবশঙ্কর আর দেবুর কাপড় পাঠিয়েছে। রাই শিবশঙ্করের কাছে কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেবু কাউকে না দেখে সটান চলে এলো ওদের ঘর আর মণ্ডপের মাঝের গলিতে। সুনন্দা মণ্ডপে ছিলো। দেবু বাইরে থেকে হাকদিল,—"বৌদি—ও বৌদি, কাপড় কোথায়—"

সুনন্দা ভিতর থেকেই উত্তর দেয়, "কেন, কাপড়ত রাই নিয়ে গেছে।"

"কোথায় তোমার রাই! কতক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকবো।"

রাই ইতিমধ্যে কাপড় নিয়ে দেবুর সামনে হাজির হয়। সুনন্দা দরজার কাছে এসে রাইকে দেখেই বলে, "কেন ঐত রাই। তুমি কী চশমা ছাড়া দেখতেই পাও না।"

দেবু রাইর দিকে তাকিয়েই বেয়াকুব বনে যায়। থতমত খেয়ে বলে, "তাইত! আমি দেখিনি।" আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলতে আর পারলো না—রাইর হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে পরতে লাগলো। রাই একটু সরে যেয়ে দেবুর ছাড়া কাপড়টার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছারী বাড়ীর হ্যাজাকের এক ফালি আলো এসে ওর মুখের পর পড়েছে। দেবু কাপড়টা ছেড়ে রাইর দিকে চাইতেই দুজনের চোখাচুখি হ'য়ে যায়। রাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবুর যেন

একটু ভাবান্তর দেখা যায়। মনে মনে ভাবে,—এ রাইত সে রাই নয়। সংকোচের বোঝা কাটাতে যেয়ে গামছাটা রাইর হাতে দিতে দিতে সুনন্দাকে বলে, "রাই কত বড় হয়েছে বৌদি? আমিত চিনতেই পারিনি।" রাই ও অনেকটা সহজ হ'য়ে উঠেছে। উত্তর দেয়, "হ, তা চিনতে পারবা ক্যান—আমরা ত গাইয়া। কইলকাত্তা যাইয়া কী আর তাশের কথা মনে থাকে!"

সুনন্দা চিরুণী এনে রেখেছিলো। দেবু চুল আচড়াতে আচড়াতে বলে, "না তা কী আর থাকে। দেখেছো বৌদি, ওর জীব কিন্তু একটুকুও কমেনি। অনেকদিন কীল…"বলেই দেবু থেমে গেল। রাই সুনন্দার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। দেবু জিজ্ঞাসা করে, "কী হাসছিস যে বড্ড। বড় হ'য়েছো বলে গায়ে হাত দিতে পারবো না?"

রাই বলে, "না, তুমি কেমন কইলকাত্তার কথা কইতে শেখছো তাই। আগেত বৌদিকে ঘটী বইল্যা খ্যাপাইতা। একন তোমারে আমরা খ্যাপাবো।"

দেবু শুধু "হু" বলে উত্তর দেয়। এর মাঝে হাক আসে, "দেবুদা আইসো—বাজীকর আইছে।" দেবু দরজার সামনে চিরুণীটা রেখে চলে যায়। রাই দেবুর ছাড়া কাপড় গামছা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে পা বাড়ায়। (চলবে)

সম্পাদকের দপ্তর
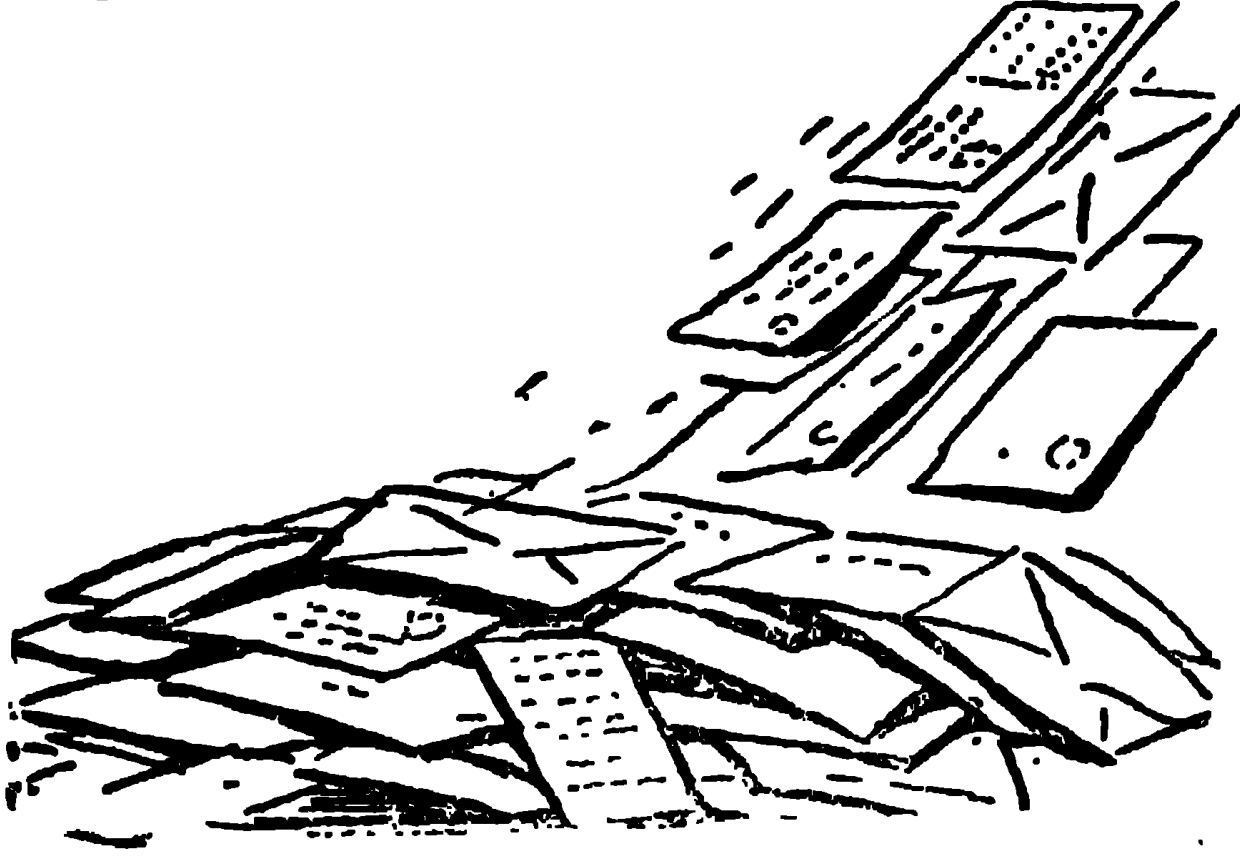
জনৈকা পাঠিকা (হাজারিবাগ)

● ● দু'টোই কানন দেবীর বাড়ী। আমাদের প্রতিনিধি যখন সাক্ষাৎ করেন, কবীর রোডের বাড়ীতেই সে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। গড়ে একখানা ছবিতে একলক্ষ টাকা কানন দেবী গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট ছবিতে কত গ্রহণ করেন সে কথা বলতে আমরা অপারক। কারণ কর্তৃপক্ষ সে সংবাদ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। আমাদের প্রচেষ্টা বাংলা ছবির উন্নতিতেই প্রথম নিয়োগ করবো—তাই হিন্দি বা ইংরেজী ছবির বিষয়ে আমরা ততটা আগ্রহশীল নই। তবে সেরূপ উল্লেখযোগ্য হিন্দি ছবির সমালোচনা প্রকাশ করতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকবো। আপনার অনুরোধ মত নাম প্রকাশ করা হ'লো না। তবে যখনই কোন প্রশ্ন করবেন—নাম এবং ঠিকানা পুরো লিখবেন। নইলে সে প্রশ্ন তখনই বাতিল করে দেওয়া হয়। কানন দেবী সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত প্রশ্নটী করেছেন—তার উত্তর দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

এন, এন, বসাক (পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া)

'মানুষের ভগবান' এর কাজ কী আরম্ভ হ'য়েছে? দুঃখে যাদের জীবনগড়ার সুরশিল্পী আব্দুল আহাদ কী এই চিত্রের সুর দিচ্ছেন?

● ● চিত্রখানির কাজ ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে মিঃ উদয়ণের পরিচালনায় আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আব্দুল আহাদেরই 'মানুষের ভগবানের' সুর সংযোজনা করবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মৈত্র সুরশিল্পী নির্বাচিত হ'য়েছেন।

নীরোদ পাল (গৌহাটী)

১। শিল্পীরা চিত্রে যে সমস্ত পোষাক ব্যবহার করেন—তা কী তাদের নিজস্ব? (২) মমতাজ শান্তি কী নিজে গেয়ে থাকেন? (৩) পূজারী চিত্রে বিপিন গুপ্তের যে গান শুনতে পেয়েছি—তা কী তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর?

● ● (১) না। অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই সংগ্রহ করে থাকেন আবার ষ্টুডিও মালিকরাও সরবরাহ করে থাকেন। (২) না। (৩) না।

সরোজ কুমার রায় (খুলনা)

(১) 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জির মেয়েই কি সিপ্রা দেবী? (২) কিসমতের যিনি সুরের আগুণ জ্বেলেছেন তিনিই কি আমীর কর্ণাটকী?

● ● (১) না। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের এক মেয়ের নামও সিপ্রা। এবং তাঁরও পর্দায় নামবার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বোধহয় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি ভাল গান গাইতে জানেন—নাচতেও জানেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁকে অলইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বৈদেশিক সংগীত গাইতে শুনেছি—তাঁর দক্ষতার সত্যিই প্রশংসা করবো। (২) সম্ভবতঃ না। তিনি একজন বাঙালী মেয়ে বলেই শুনেছি—নাম পারুল ঘোষ।

আরতি দত্ত (শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) 'তুমি আর আমি' ছবি মুক্তির পূর্বে বহু দৈনিক, মাসিক এবং রূপ-মঞ্চে এম, পি প্রডাকসন্সের ছবি বলে প্রচার কার্য করা হ'য়েছিল—কিন্তু মুক্তির পর দেখা গেল ছবিখানি ডি, ল্যুক্স এর। এর কারণ কী? (২) বড়ুয়ার আগামী ছবির খবর কি?

● ● (১) চিত্রখানি প্রথমে এম, পি প্রডাকসন্সের

প্রযোজনায় গড়ে উঠছিল—পরে ডি, ল্যুক্স পিকচার্স তার স্বত্ব ক্রয় করেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের সংগে যোগসূত্রে আবদ্ধ। (২) কিছুদিন অবসর গ্রহণ করবার পর শ্রীযুক্ত বড়ুয়া আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করেছেন। উর্মিলা চিত্রপটের 'অগ্রগামী' এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর 'মায়া কানন' এই দু'খানি বাংলা ছবি নিয়ে তিনি মেতে পড়েছেন।

আয়ুব হোসেন (মৈহেম তলা, বাঁকুড়া)

সুমিত্রা দেবীকে আজকাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে না কেন?

●● কেন? এইত সম্প্রতি তাকে 'পথের দাবী'তে দেখতে পেয়েছেন। ভ্যানগার্ডের এবং বাসন্তিকার আগামী চিত্র 'জয় যাত্রা' ও 'বাসন্তিকা'তেও তাঁকে দেখতে পাবেন।

জ্যোতির্ময় ভৌমিক (আইডিয়েল হোষ্টেল, দৌলতপুর, খুলনা)
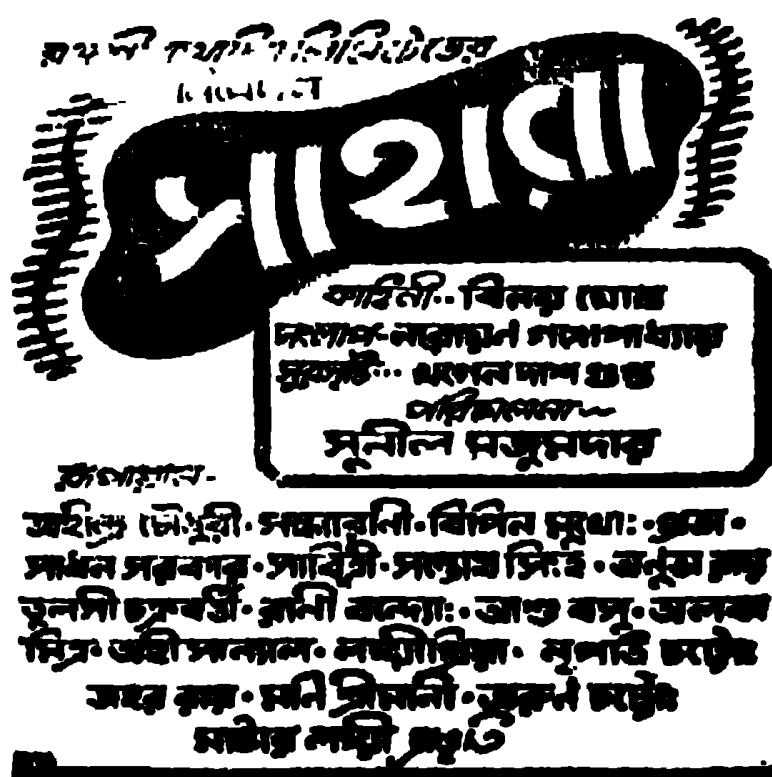
(১) রূপ-মঞ্চে আলোক চিত্র শিল্প সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনা হয় না কেন? আলোক চিত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আপনারা গ্রহণ করবেন কী? (২) বর্তমান ভারতে আলোক চিত্র শিল্পীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ কে? আর সেই হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার স্থান কোথায়? নীতিন বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়ার ভিতর শ্রেষ্ঠ কে?

●● (১) আলোক চিত্র সম্পর্কে রচনা প্রকাশে আমরা সব সময়ই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকি। এই ধরণের রচনাগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই লেখানো উচিত। তাই তাঁদের বারবার অনুরোধ করেও আমরা কৃতকার্য হতে পারি না। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া অনেকদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চে আলোক চিত্র শিল্প সম্পর্কে লিখেছিলেন। রচনাটী খুবই সমাদর পেয়েছিল—চিত্রশিল্পী বিভূতি লাহাও কিছুদিন পূর্বে এসম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু আরো অনেকেই আছেন, বার বার অনুরোধ করা সত্বেও তাঁদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি। আমাদের বিশেষজ্ঞরা ষ্টুডিওর বাইরে আর কোন দিকেই মন দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। আলোক চিত্র সম্পর্কে যে কোন অভিজ্ঞ লোকের রচনা আমরা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকবো। (২) এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন—তাছাড়া সর্বভারতের শিল্পীদের সংস্পর্শেও যেমনি আসিনি, তাঁদের প্রতিভা বিচার করবার মত স্মৃতিশক্তি ও বর্তমানে নেই। তাই বাংলা চিত্রশিল্পের কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর নাম করছি। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, বিমল রায়, সুরেশ দাস, অজিত সেনগুপ্ত, বিভূতি দাস, বিভূতি লাহা, প্রবোধ দাস, অজয় কর প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এবং বসু দুজনের মাঝে কোন তারতম্য রাখতে চাই না। তবে ব্যক্তিগতভাবে বড়ুয়াকে আমার ভাল লাগে।

নরেশ সেন (একডালিয়া প্লেস, বালীগঞ্জ)

(১) মতিমহলের প্রথম হাস্য-কৌতুক চিত্র 'সরকারী জামাই'তে যিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর নাম কী? এবং ইনিই কী ম্যাডান থিয়েটারের কবি জয়দেব এ কবি শ্রুতিধর এর ভূমিকায় অভিনয় করে

ছিলেন কী? (২) কানন বালা নাকি বম্বে টকীজের সংগে চুক্তি বদ্ধা হ'য়েছেন!

● ● (১) আমার জানা নেই। পরে জানাবো। (২) না।

বি, রায় চৌধুরী (কলিকাতা)

মিহির ভট্টাচার্য কোন বইয়ে প্রথম নামেন। তাঁর ঠিকানা কী।

● ● শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত কমলা টকীজের 'রাজকুমারের নির্বাসন' চিত্রে। আগামী সংখ্যায় শ্রীপার্থিব এর উত্তর দেবেন।

মিহির দাশগুপ্ত (তামিলি পাড়া লেন, হুগলী)

(১) পথের দাবীর হিন্দি সংস্করণ উঠবে কী? (২) পর পর সাজিয়ে দিন প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, ভি, শান্তারাম, জয়ন্ত দেশাই।

● ● (১) হ্যাঁ। (২) প্রথমোক্ত তিনজনকে এক পর্যায়ে ফেলতে পারেন--তারপর শেষোক্ত জনের নামোল্লেখ করতে চাই।

মীনাক্ষী দেবী (আসাম)

(১), (২) সত্য চৌধুরী 'রাঙ্গামাটী'তে কি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। রাঙ্গামাটীর পর আর কোন নতুন বইতে তাঁকে দেখতে পাব? (৩) বর্মার পথের সুরশিল্পী কে?

●● (১) যে বইখানি এবং লেখিকার নাম করেছেন আমি সে বই এবং লেখিকার রচনার সংগে পরিচিত নই বা ঐ নামে যে কোন চিত্র গড়ে উঠছে তাও শুনতে পাইনি—তাই এসম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারলুম না। (২) হ্যাঁ। মন্দিরে অবশ্য একটী গানের দৃশ্যে সত্যবাবু আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রাঙ্গামাটীর পর কোন চিত্রে অভিনয় করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। (৩) প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

ইলা সেন (একডালিয়া রোড, কলিকাতা)

তালাত মামুদ ও তপন কুমার কি একই লোক? তাঁর আসল নাম কি? (২) হিন্দুস্থান ফিল্মস নামে যে প্রতিষ্ঠান 'নীল দর্পণ' চিত্রে রূপায়িত করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন—সুরশিল্পী গঙ্গাপদ আচার্য নাকি তাদের সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন? (৩) হামরাহীর 'মধু গন্ধে ভরা' গানখানি কে কে গেয়েছিল।

● ● হ্যাঁ। তালাত মামুদ আসল। (২) এক ঘোষণা ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আর কোন খবরই আমরা পাইনি—চিত্রের কাজই যদি আরম্ভ না হয় তাহ'লে নির্বাচন নিয়ে এত আগে থেকে টানাটানি করে লাভ কী? (৩) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিনতা রায় প্রভৃতি।

এম, হায়দার আলী ধীৎপুরী (পিস্‌কা, রাঁচী)

● ● (১) নবাগত কিরণ কুমার—মুসলমান। মাতৃহারার অনামী চৌধুরী সম্পর্কে সমালোচনা প্রসংগে আমরা যে কথা উল্লেখ করেছিলাম—তার বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য জানতে পারলে আপনি এই অভিযোগ থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন বলেই বিশ্বাস রাখি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিষ চিত্রজগতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং কয়েকজন মুসলমান শিল্পী ও কর্মীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত হিন্দু শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের 'টিটকারী' মারার কথা আমাদের কানে আসে এবং এমন কী আমরা শুনতে পাই, মুসলমান শিল্পীরা হিন্দু দর্শকদের কাছে যদি মুসলমান বলেই অভিনন্দন লাভে অসমর্থ হন—এই জন্য অনেকে মুসলমানী নাম পরিত্যাগ করে ছদ্মনাম গ্রহণে তৎপর হ'য়ে ওঠেন। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগী দিয়ে যাতে দর্শক এবং চিত্রজগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরস্পরকে বিচার না করেন—সেটা সতর্ক করিয়ে দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি—সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে যদি কেউ ছদ্মনাম গ্রহণ করেন আমরা মোটেই তা সমর্থন করবো না। বাংলার চিত্রামোদীদের সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প থেকে আত্মরক্ষার জন্য রূপ-মঞ্চ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পিছপাও হবে না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। আপনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী—রূপ-মঞ্চের পাঠক। আমি রূপ-মঞ্চের সম্পাদক—হিন্দু। আমি যদি আপনাকে খুশী করবার জন্য

আমার হিন্দুত্বকে একটা মুখোস পরিয়ে ঢেকে রেখে আপনার কাছে নিজের পরিচয় দি—তাতেই আপনি খুশী হবেন—না আমি একজন খাঁটি হিন্দু হ'য়ে যদি আমার মুসলমান ভাইয়ের কাছে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের দাবী নিয়ে হাজির হই তাতে বেশী খুশী হবেন? আমি হিন্দু বা মুসলমানের পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে পরস্পরের সংগে মিলতে বলি না—পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে বলি। এবং ইসলাম বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান আছে—তা থেকেত আমার মনে হয়, আমাদের পরস্পরের ধর্ম'ও এই কথাই বলে। (২) হ্যাঁ উমাশশী চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। (৩) না। আপনাদের অংকিত ছবি ছাপবার পরিকল্পনা এখনও আমরা গ্রহণ করিনি। (৪) যে কোন মাস থেকে আপনি রূপ-মঞ্চের গ্রাহক হতে পারেন। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাক আটটাকা। একবছরের কম গ্রাহক করা হয় না। মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠালেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

অনাথ দে (নিমতলা, বাঁকুড়া)

বর্তমানে প্রমথেশ বড়ুয়া কোন চিত্রে অভিনয় করছেন কি?

● ● ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর হ'য়ে 'মায়া কানন' নাম দিয়ে বড়ুয়া একখানি বাংলা চিত্র পরিচালনা করছেন—মায়া কাননে তাঁকে দেখতে পাবেন।

শ্রীসলিল দে (অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা)

আমি একজন শিল্পানুরাগী। বিশেষতঃ চিত্রশিল্পকে আমি সত্যিই ভালবাসি অন্তরের সংগে। আমি কায়-মনোবাক্যে কামনা করি আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পের ক্রমোন্নতি এবং আমি চাই যে আমাদের সমাজ এই চিত্রশিল্পকে অর্থাৎ চিত্রজগতকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করুক। কিন্তু এ আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়, আমাদের সমাজ এই শিল্পীসমাজকে আংশিকভাবে সমর্থন করলেও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে এখনও পারেনি—এর কারণ অনুসন্ধান করলে হয়তো অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। তারই মধ্যে প্রধান কারণ বলে যেটা আমার সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে 'drinking'। সোজা কথায় বাংলায় যাকে বলে মদ্যপান। শুনতে পাই আজকাল অধিকাংশ চিত্রশিল্পীদের 'পান' না করলে চলে না। কেন চলে না তার সঠিক কারণ বলা অসম্ভব। তবে আভিজাত্যের প্রশ্নটা উঠতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের 'aristrocracy'তে এই 'Drinking' জিনিষটা দৃষ্টিকটু না হ'লেও মাতাল আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কাছে এখনও সমানভাবে হেয় নয় কি? কথা উঠতে পারে 'drinking' জিনিষটা বিলাসিতা। কিন্তু বিলাসিতার কি অন্য উপকরণ নেই? আর এটাও তো সত্যি যে আধুনিক প্রথায় যে 'drinking সেতো আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ। তাই বিবেকানন্দের সংগে গলা মিলিয়ে আবার আমার বলতে ইচ্ছে করে যে—পাশ্চাত্যের অনুকরণই যদি কোরবো, তবে তাদের

ভালো জিনিষটা বাদ দিয়ে শুধু কি মন্দ জিনিষটাই করা উচিত? অনুকরণ-প্রিয় নয় কে? কিন্তু যেখানে ভাল জিনিষের অনুকরণ আমরা একেবারেই করতে পারিনে সেখানে মন্দ জিনিষটার অনুকরণেই কি আসবে আমাদের চরম সার্থকতা! মদ্যপানকে আমি চরিত্রহীনতা বলে মনে করি না। কিন্তু মনে করি সম্পূর্ণ illegal। জানিনা আপনার সংগে আমার মতভেদ আছে কিনা। কিন্তু তবুও মদ্যপানই যে চিত্র-সমাজকে আমাদের সমাজের কাছে এখনও হেয় করে রেখেছে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। সমাজ আমি মানিনা কিন্তু তারই মাঝে বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় বলে দু'টো কথা আছে। আমার আজও মনে আছে প্রথম যেদিন রূপবাণীতে 'গরমিল' দেখে আসি, সেদিন বিশেষ করে একজনের অভিনয় আমাকে কি মুগ্ধই না করেছিল। আমি তাঁর নাম করবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, বর্তমানে তিনি একজন বিখ্যাত অভিনেতা। সত্যিই তাঁর অভিনয় আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু যখনই কানে এলো তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানের কথা (যাঁর প্রমাণ —অনেক জায়গায় পেয়েছিলাম) তখন কেমন করে জানিনা তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা অনেক কমে গিয়েছিল। চিত্রজগতে গেলেই লোকে 'পান' আরম্ভ করে এর কারণইতো জানতে চাই আপনার কাছে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছিনে। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যাতিক্রম কতখানি আশার কারণ হ'তে পারে? একমাত্র মদ্যপানই যে আমাদের প্রিয় অভিনেতাদের অকাল মৃত্যুর কারণ, একি তারা বোঝেন না? অজুহাততো কতরকমে পাড়া যায় যে, drink না করলে অভিনয়ে inspiration আসে না। অভিনেতার অবসাদগ্রস্ত জীবনে 'Drinking' হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বন্ধু ইত্যাদি। কিন্তু আমিতো জানি যে, drinking-এ inspiration যতোটা না আসে ততোটা আসে intoxication।

● ● আপনার চিঠির উত্তর দেবার পূর্বে প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি—ব্যক্তিগত ভাবে আমি মদ্যপানের ঘোর বিরোধী। শুধু মদ্যপান কেন—ধূমপান- চা-পান প্রভৃতিও যদি পরিত্যাগ করা যেত—আমি খুশীই হতাম। কিন্তু আমার আপনার ব্যক্তিগত খুশী অখুশীকে নিয়ে জগৎ চলে না—চলতে পারে না। তাই সংখ্যাধিক্যের অভ্যাস ও রুচীর বিরুদ্ধে আমরা কেবল প্রতিবাদ জানাতে পারি—অথবা নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলতে পারি—তার বেশী কিছু নয়।

আপনি একজন শিল্পানুরাগী—চিত্রশিল্পের প্রতি আপনার আন্তরিক অনুকম্পাকে আমি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করি। কিন্তু আপনার মত মদ্যপানের জন্য সমাজের কাছ থেকে শিল্পীরা যে তাচ্ছিল্য পেয়ে থাকেন—তাকে মোটেই সমর্থন করতে পারবো না। প্রাচীন কাল থেকে প্রত্যেক দেশেই মদ্যপান প্রচলিত হ'য়ে আসছে —ব্যক্তিগত ভাবে মদ্যপানের রীতির কথা ছেড়ে দিলেও—পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব—ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতিকে ঘিরে মদ্যপান যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও প্রচলিত দেখেছি—তেমনি আমাদের দেশেও। তারপর বর্তমান কালেও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিজ্ঞ ও প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও মদ্যপান করে থাকেন। শুধু এই মদ্যপানের জন্য তাঁরা কোনদিন তাঁদের সমাজের কাছ থেকে তাচ্ছিল্য লাভ করেন না—বা এই মদ্যপানের জন্য তাঁরা ঘৃণার্হ হ'য়ে ওঠেন না। আপনি বলতে পারেন, ওসবদেশ আর আমাদের দেশে পার্থক্য আছে অনেকখানি। স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের দেশের সে সব নীতিবিদরা মদ্যপানের জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে নাসিকা কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নেন—তাঁরা মদ্যপান করে রাতের আঁধারে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেন—তখনত তাঁদের বিরুদ্ধে সমাজের গুঞ্জন শুনতে পাই না? যে নেতাকে সকলে জনসভায় মালা পরিয়ে বরণ করে নেন—নীতিবাদ সম্পর্কে যাঁর গরম বক্তৃতায়-জনসমাজ মুগ্ধ বিস্ময়ে মোহিত হ'য়ে যান—সকলের অলক্ষ্যে তিনি যে গর্হিত কাজ করেন—তার বিরুদ্ধে ত কোন প্রতিবাদ শুনতে পাই না? তাঁর এই গোপন কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লেও বরং তাকে চাপা দিয়ে রাখতেই

দেখি। সমাজের কাছে এর কৈফিয়ৎ চাইলেই উত্তর আসে—ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমাদের টানাটানি করবার কী দরকার? সমাজ নেতাদের সম্পর্কে যদি একথা খাটে আমাদের শিল্পীদের বেলায় কেন খাটবে না? আপনারা শিল্পের পূজারী। শিল্প জীবনে একজন শিল্পী কী দিল আর না দিল তারই বিচার করবেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কী করেন আর না করেন তা নিয়ে সমালোচনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। যদি ব্যক্তিগত জীবন শিল্প জীবনের ক্ষতি করে তবেই অভিযোগ আসতে পারে।

তাও প্রতিভার অত্যাচার কিছুটা আমাদের সহ্য করতে হবে বৈকী! তারপর মদ্যপান করে বলেই যে ঘৃণা করতে হবে—এ যুক্তিকে আমি মেনে নিতে পারবোনা। মদ্যপায়ীদের আগে ভালবাসতে হবে। তাদের পর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার অধিকার জন্মাতে পারে—তার পূর্বে নয়! আপনারা দর্শক—আমরা সমালোচক। আমাদের শিল্পীদের বিরুদ্ধে আপনাদের এবং আমাদেরই বলবার অধিকার আছে। কারণ তাঁরা আমাদের সুখ দুঃখের সাথী। তাঁদের যেমনি আমরা ভালও বাসি তেমনি শাসনের দাবীও রাখি। কিন্তু সমাজ তাঁদের কী চোখে দেখলো আর না দেখলো—সমাজ তাঁদের ভাল বললো কী খারাপ বললো—সেই বলাকে আমল দিতে আমি রাজী নই। রাজী হবো তখনই, যখন দেখবো—সমাজ সত্যিই এঁদের প্রতি দরদশীল হ'য়ে উঠেছে। সমাজ আর দশজনের সংগেই এক পঙক্তিতে এঁদের আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার পূর্বে নয়।•

মদ যাঁরা খান—কেন খান এবং খেয়ে কী লাভ পান তা তাঁরাই বলতে পারেন। অতিরিক্ত মদ্যপান যে ক্ষতি করে তা দেখেছি। আবার স্বাভাবিক মদ্যপানে শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে (অবশ্য যারা মদ্যপান করেন) যে সাহায্য করে তারও পরিচয় পেয়েছি। মদই বলুন—চা'ই বলুন সিগারেটই বলুন—এমন কী খাদ্যদ্রব্যও অতিরিক্ত গ্রহণ করলে ফল বিপরীত দাঁড়ায়। তাই সে সম্পর্কে শিল্পীদের

সতর্ক থাকতে হবে। মদ—চা—সিগারেট—পান—যাই বলুন না কেন—যেগুলি খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় পড়ে না—অথচ ব্যক্তি বিশেষে যেগুলির প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়েন—এ সবগুলির আধিক্যই দোষনীয় মনে করবেন। আমি সিগারেট খাই দিনে অন্ততঃ ৭০-৮০টা। আমি নিজে বেশ বুঝতে পারি এটা ক্ষতিকর—তাছাড়া যে পয়সাটা এর পেছনে ব্যয় করি তা দিয়ে অনেকের আহারের সংস্থান হ'তো। অথচ আমি এটা পরিত্যাগ করতে পারিনা। ব্যক্তিগতভাবে একজন মদ্যপায়ীর চেয়ে নিজেকে আমি কম অপরাধী বলে মনে করিনা। আপনি বলতে পারেন মদ্যপান আর ধূমপান এক জাতের নয়। এই জন্য পরিমিত পানের কথা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া একজন মদ্যপায়ী যিনি মদ খাননা, তার কাছে যতখানি অসহ্য হ'য়ে ওঠেন—একজন সিগারেট সেবী যিনি সিগারেট খাননা তার কাছেও কম অসহ্য নন। প্রেক্ষাগৃহে আপনি ছবি দেখছেন। আপনি অনবরত সিগারেট খাচ্ছেন। আপনার পাশের মহিলা বা ভদ্রলোকটী সিগারেট খান না—ধোঁয়াটাও সহ্য করতে পারেন না। আপনার মুহূর্মুহূ সিগারেট সেবনের জন্য ছবি দেখবার আনন্দ তার অনেকখানি নষ্ট হবে। আমার কথা হচ্ছে মদ খান বলেই যে শিল্পীদের ঘৃণা করবেন এ যুক্তিকে আমি মেনে নিতে পারবো না। অবশ্য সমগ্রভাবে মাদক বর্জন আন্দোলন যদি আরম্ভ হয়—আমি তার হ'বো পয়লা নম্বরের পাণ্ডা।

মাকুজার রহমান (বনগ্রাম, প্রগতি সাহিত্য-ভবন, যশোহর)

(১) (২) 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের পরিচালক হিমাদ্রি চৌধুরী হিন্দু না মুসলমান? (৩) আমি মুসলমান। এখানে মঞ্চে বহুবার অভিনয় করেছি। পর্দায় অভিনয় করতে চাই। আপনি এমন কোন উপায় আমাকে বলে দিতে পারেন যে 'মুসলমান' হ'য়েও পর্দায় অভিনয় করা যায়?

●● (১) আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র দেখুন।

(২) মুসলমান। (৩) যে কোন প্রযোজক অথবা পরিচালকের শরণাপন্ন হউন। মুসলমান হ'য়ে আপনি এমন কোন অপরাধ করেননি যেজন্য আমাদের চিত্র জগতের দ্বার আপনার কাছে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। চিত্র জগতের প্রবেশ পথে যে বাধা বিপত্তি রয়েছে—তা হিন্দু এবং মুসলমান সকলের পক্ষেই সমান। প্রত্যেকটী বিষয়কে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করতে যাবেন না। অন্ততঃ রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িকতার হীনতা থেকে উর্দ্ধে থাকতেই আমি অনুরোধ করবো।

দীপ্তি সরকার (আলিপুর)

●● সায়গলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আপনি যে কবিতাটী পাঠিয়েছিলেন তা প্রকাশ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। সময়মত এলে হয়ত চেষ্টা করে দেখা যেত। সাধারণতঃ কবিতা আমরা প্রকাশ করিনা এই জন্য যে, কবিতা প্রকাশ করবার জন্য বাংলা ভাষায় বহু উচ্চস্তরের পত্র-পত্রিকা রয়েছে।

শম্ভীনাথ পালিত (নৈহাটী, ২৪ পরগণা)

(১) বড়ুয়া পরিচালিত 'পয়ছান' ছবিটীর খবর কী? (২) সুরশিল্পী হিসাবে পঙ্কজ কুমার মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়াল এই দুই জনের মধ্যে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

●● (১) বর্তমানে কোন খবরই নেই। (২) জনপ্রিয়তার দিক থেকে পঙ্কজবাবু খ্যাতি অর্জন করলেও রাইবাবুর শ্রেষ্ঠত্বকে আমি অস্বীকার করবো না।

শ্রীপ্রিতম কুমার সিংহ (কলেজ রোড, শিলচর)

●● নীরেন লাহিড়ী উর্বশী (হিন্দি) চিত্রের পরিচালনা করেননি। কর্তৃপক্ষের এই হীনতায় আপনাদেরই প্রতিবাদ জানানো উচিত।

সুধীর রায় (ব্যানার্জি পাড়া, ঢাকুরিয়া)

অভিনেতা বিপীন মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা কী? বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর স্থান কোথায়? (২) পরিচালক শান্তারাম ডাঃ কোটনীশের পর কোন বই নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

●● (১) বিপিন মুখোপাধ্যায়, ৭।সি, গোখেল রোড, ফ্লাটনম্বর ১৩। বিপিনবাবুর সম্ভাবনাকে আমি প্রথম থেকেই স্বীকার করে আসছি। (২) ডাঃ কুটনীশের পর কয়েকখানি চিত্রের বিজ্ঞপ্তিই দেখেছিলাম—কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম, তিনি সাময়িকভাবে চিত্র প্রযোজনার কাজ বন্ধ রেখেছেন।

'মানুষের ভগবান' সন্ধানে

শ্রীপার্থিব

সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিকে সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কারে তার অধৈর্য মন মানা মানে না। অপরদিকে স্রষ্টাকে খুঁজে বের করবার চাঞ্চল্য ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে মানুষ শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বনানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে—নির্জন নদীতটে যেয়ে কুটীর বেঁধেছে—অন্ধকার পর্বত গুহায় গভীর তপস্যায় আজীবন কাটিয়ে দিয়েছে। লোকালয়ে মসজিদ—গির্জা—মন্দির গড়ে উঠেছে—মানুষ 'হা ভগবান—হা ভগবান' বলে তার উদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়ে মরছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের কতই না অভিব্যক্তি দেখতে পাই। কিন্তু কোথায় ভগবান? কে সেই সত্য দ্রষ্টা ঋষি যিনি ভগবানের সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কারে সক্ষম হ'য়েছেন! সৃষ্টি ও স্রষ্টার জন্য আজীবন লোকে ঘুরে ফিরে মরে—কতজন ব্যর্থতার আঘাতে জীবনপাত করেছে—কতজন আশার আলোকে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছে—কিন্তু আজও সৃষ্টি ও স্রষ্টার অনুসন্ধান থেকে মানুষ বিরত হয়নি। ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে অনেকে বিদ্রোহ করেছে। একপথ ছেড়ে আর এক পথ ধরেছে।

বিলাস-ব্যসনের মত্ততায় যাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ডুবে রয়েছে—মত্ততার মাঝে তাঁরা হয়ত স্রষ্টাকে ভুলে যেতে পেরেছে। কিন্তু দুঃখ কষ্টে—দারিদ্র্যের পীড়নে যারা জর্জরিত—বেদনার ভার কমাতে তারা যখন অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়—স্রষ্টার কথাই তাদের মনে পড়ে সর্বাগ্রে। সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে চলতে পথিক যখন হাঁপিয়ে ওঠে—ক্ষতবিক্ষত পদযুগল যখন অবসন্ন হ'য়ে পড়ে—ভগবান অলক্ষ্যে থেকে একদিন তাদের সকল কাঁটা সরিয়ে দেবেন: একথা মনে করেই ক্লান্তি দূর করে—আবার পথ বেয়ে চলে। কিন্তু অন্যায় ও অত্যাচারের আঘাত যখন তাদের পথে নেমে আসে—তাদের মনে তখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ভগবানের অস্তিত্বে তারা সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। তাদের মনে এই প্রশ্নই দোল খেতে থাকে, "ভগবান তুমি আছো—কী নেই?—তোমার রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য—তুমি যেখানে বিরাজ করো—কোন অন্যায় সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। তাহলে কী এই অন্যায়ের মাঝে তুমি নেই?"

এই প্রশ্নের মীমাংসা আমরা অনেকেই করতে পারি না। তবু সেই পরমপিতার অস্তিত্বকেও কী অস্বীকার করতে পারি? পারি না। তাই আপনিও খোঁজেন, আমিও খুঁজি—সবাই আমরা ঐ একই অদৃশ্য শক্তির পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছি। কিন্তু স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি রহস্য আজিও আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত।

খুঁজে খুঁজেও যাঁকে পাওয়া যাচ্ছেনা। হঠাৎ কেউ যদি এসে বলেন, "আসুন, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।" তাহলে মনের অবস্থাটা কী হয় বলুনত?

দুপুর বেলা বসে আছি। জনৈক বন্ধু এসে বল্লেন, "শ্রীপার্থিব, আসুন আপনার মানুষের ভগবানের সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।" আমিত হচ্‌কচিয়ে উঠলাম, "আরে মশায় আপনি কী যাদুকর?"

রূপ-মঞ্চ সম্পাদক পাশের টেবিলে ছিলেন। তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করে বল্লেন, "চলুন না দেখেই আসি।"

শুধু তিনিই নন, আরও দু'একজন সংগ নিলেন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সদর দিয়ে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করলো। সত্যি, বাড়ীটা যেন একটা স্বপনপুরী। পুকুরে থৈ থৈ করছে জল। রাস্তার দু'ধার দিয়ে সুপারী গাছের সারি মনটাকে বেশ উন্মনা করে ফেললো। নির্বাক বিস্ময়ে বন্ধুবরের সংগে যে বাড়ীর সামনে হাজির হলাম, তাকে বাড়ীও বলা চলেনা—কুটীর বলা ও যায় না। তাই বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম," "কী মশায়, একী সরকারের চালের গুদামে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?" তিনি মুচকী হেসে বল্লেন,

"আসুন না?" যাঁরা তাজমহল দেখেছেন—কুতবমিনার দেখেছেন—বুদ্ধগয়ায় গেছেন—অজন্তার গিরিগহ্বরে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সামনে যখন উৎসুক মন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন—'গাইড' বা প্রদর্শক যেটাকে যা বলে চালান বিনা প্রতিবাদে অন্ততঃ তখনকার মত তা মেনে নেবার অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। আমাদের অবস্থাও তাই। তবে চালের গুদামের ভ্রম কাটলো। আমরা যে ঘরের ভিতর উপস্থিত হলাম তার পরিবেশটা বেশ আকর্ষণ করলো। বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমেলো বেশ চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করলো। ঘরটা আধুনিক কায়দায় সাজানো। সেল্‌ফ-এর মোটামোটা বইগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে মনে হ'লো কোন আইনজ্ঞের বাড়ী। একটা চাকর নিবিষ্ট চিত্তে ঝাড়পোঁচ করছে। ভগবানেরত পাত্তাই নেই! তবু অপেক্ষা করছি। দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! এর মাঝে চকিতে চমক মেরে এক আধুনিকার আবির্ভাব হ'লো। চাকরটাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেষ্ট, ও কেষ্ট! তোমার দাদাবাবু কোথায়?"

"এই যে এসো দিদিমনি। দাদাবাবুর কথা আর বলোনি। সেই কখন বেরিয়েছে— দেখ যেয়ে কোন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে দেশ সেবা করছে। তা তুমি একটু বসো দিদিমনি। আমি আসছি। দাদাবাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন।"

দিদিমনি সোফায় বসে পড়লেন। মনে হ'লো বাড়ীর মালিকের সংগে তিনি খুবই পরিচিতা। কিছুক্ষণ বাদেই যে যুবকটী প্রবেশ করলেন—দেখে আর চিনতে দেরী হ'লো না যে ইনিই দাদাবাবু—গৃহের মালিক।

"আপনি যে! আপনি কখন এলেন?" যুবকটি জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই কিছুক্ষণ" মেয়েটা উত্তর দিল।

"সেদিন আপনার বাড়ীতে যেয়ে অপমান করে এসেছি তারই প্রতিশোধ নিতে এলেন বুঝি!" যুবকটী একটু ব্যঙ্গ অথচ দীপ্তস্বরে উত্তর দিলেন।

"আমাকে খুব চিনেছেন তাহ'লে?" মেয়েটীও দমবার পাত্রী নন। দু'জনের কথাবার্তা এই ধরণেরই হচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পড়লো। বহুজনের কলহাস্যে ঘরটা মুখরিত হ'য়ে
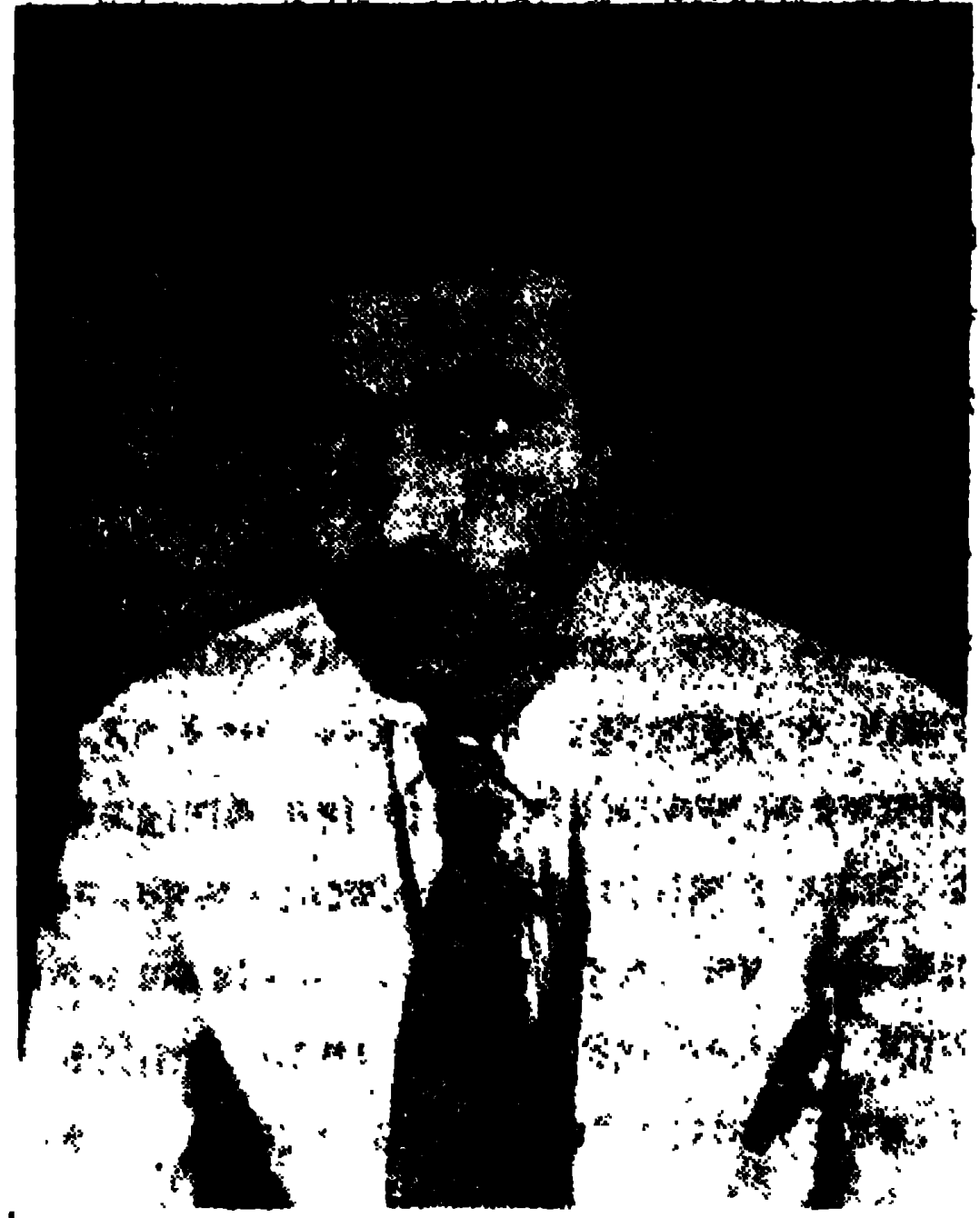
মিঃ উদয়ণ 'মানুষের ভগবান'এর পরিচালক ও কাহিনীকার

উঠলো। বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী মশায়! ধাপ্পাবাজীর আর স্থান পাননি।" সম্পাদক মশায় আমাকে থামাতে চেষ্টা করেন। আমি কিন্তু অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছি। বন্ধুবর নির্বিকার। মুখে মুচকী হাসি। বল্লেন, "চলুন আমরা পাশের ঘরে একটু নির্জনে যাই। এত হৈ-চৈর ভিতর কী আর ভগবান দেখা দেন!" কথাটা মন্দ লাগলো না। আমরা পাশের ঘরে যেয়ে বসলাম। অল্পবয়স্ক এক যুবকের সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বল্লেন, "উদয়ণ, ইনিই 'মানুষের ভগবানের' বিস্তারীত সন্ধান দিতে পারবেন।" লোকটীর দিকে আমি তাকালুম—তাঁর প্রতিভাদীপ্ত চাহনী—চেহারার সহজ সরল ছাপ আমায় আকৃষ্ট করলো। তার কথা শুনবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে রইলাম। অতি অমায়িক ভাবে মিঃ উদয়ণ—বলে যেতে লাগলেন, "আপনাদের বন্ধু—আমার সহকর্মী ও পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ আমার সম্পর্কে

খুব বেশী বলেছেন আপনাদের কাছে। আমি নিজেই যাকে খুঁজে বেড়াই—তাঁর সন্ধান কী করে আপনাদের দেবো? শুনেছি ভগবানের রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য—কিন্তু যখনই এই ন্যায়ের রাজ্যে অন্যায়ের আধিপত্য দেখতে পাই—যখনই দেখতে পাই একটী লোক সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে না খেতে পেয়ে কুঁকড়ে মরে যাচ্ছে- আর তারই পরিশ্রম-এর ফল ভোগ করে আর একজন লোক স্ফীত হচ্ছে—তখনই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে—ভগবান আছে কী নেই। নিরপরাধ ও বুভুক্ষিতের মহশ্মশানের ওপর শঠ, প্রবঞ্চক ও শোষকের আস্ফালনের বিরুদ্ধে চিরদিন আমার মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে দ্বন্দ্ব জেগেছে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে—এ দ্বন্দ্ব শুধু আপনার আমার নয়—সকলেরই—আমি আমাদের এই সবাকার দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করছি আমার "মানুষের ভগবানে।" সেলুলয়েডের ফিতেয় রূপালী পর্দায় আপনাদের সামনে তা প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে। যে দৃশ্যটী আপনারা দেখলেন, তাতে 'মানুষের ভগবানের' দুইটী বিশিষ্ট চরিত্রের সংগে আপনাদের পরিচয় হ'য়েছে। যুবকটীর নাম ছবি। আইনজ্ঞ, আদর্শবাদী। সন্ত্রাসবাদী অমরের বন্ধু। অমর গুপ্তভাবে অর্থ সংগ্রহ করে অসহায়দের প্রতিপালন করে। যেখানে অন্যায় সেখানেই যেয়ে হাজির হয়—অত্যাচার ও শোষণের করাল গ্রাস থেকে অত্যাচারীত ও শোষিতদের রক্ষা করতে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হ'তে দ্বিধা করে না। ছবি অমরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ও'ঠে। মহিলাটী অর্থাৎ সিপ্রা ধনীর মেয়ে। ছবির সহপাঠিনী। ধনী যুবক নীরেশ তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হ'লেও ছবির প্রতি মনের কোনে যে শ্রদ্ধা জমে ওঠে, ছবিকে নানানভাবে নানান সময়ে তার আদর্শ নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও ধীরে ধীরে তারই প্রতি প্রণয়াসক্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকেও হার মানাতে চায় না। আদর্শ এবং প্রণয়ের এই সংঘাত দিন দিন বেড়েই চলে। ছবি প্রণয়ের কাছে—

তার ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের কাছে আদর্শকে বিকিয়ে দিতে চায় না। অশিক্ষা, অনাহার ও রোগ ব্যাধির সামনে সে অমরের মতই যেয়ে হাজির হয়। ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীতে এত হাসি—এত গান থাকতে কিছুতেই সে এত প্রাণ ধুলোয় লুটিয়ে যেতে দেবো না। অমরের আশ্রম থেকে একদিন বেরোবার সময় এমনিভাবে ধুলো থেকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল সুকুমারকে। অমরের নির্দেশেই তাকে মানুষ করে তুলতে লাগলো। তার সমস্ত কল্পনা সুকুমারের ভিতর দিয়েই সে বিকশিত করে তুলবে। অনাহার ও শোষণের মাঝেও তার জিজ্ঞাসু মন বারে বার প্রশ্ন করেছে—ভগবান তুমি আছো কী নেই—। কিন্তু সমস্ত অন্যায়ের মূল উৎপাটন করে সে প্রমাণ করবে—হ্যাঁ ভগবান আছে! ছবির এই প্রশ্নেরই অবতারণা করেছি—সমাধান করিনি। ছবির এই সুকঠিন চরিত্রটী রূপায়িত করে তুলেছেন বাংলার উদীয়-মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়।

সিপ্রা—ঐশ্বর্য ও আদর্শের মাঝে আদর্শকে ঘিরে সে তার প্রেমকে পল্লবিত করে তুলতে চেয়েছিল। তার সে চাওয়া যখন ব্যর্থতার আঘাতে চুরমার হ'য়ে গেল—তখনও তার মনের কোণে এই প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল—ভগবান আছে কী নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থকে যখন বৃহত্তর স্বার্থের কাছে সে বলি দিল—দয়িতের অসমাপ্ত কাজের যে দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিল—তার এই আন্তরিকতাও যখন ব্যর্থতার সম্মুখীন—তখনও কী তার মনে এই দ্বন্দ্বই জাগা স্বাভাবিক নয়—ভগবান আছে কী নেই? এই সিপ্রা চরিত্রটী প্রমীলার আবেদনাকুল অভিনয় নৈপুণ্যে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

সুকুমার—অনাদৃত, পরিত্যাক্ত নিষ্পাপ শিশু। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এই শিশু ছবির পরিচয় নিয়ে বাড়তে লাগলো। প্রতিষ্ঠা ও যশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যৌবনের দীপ্ত প্রভাতে দয়িতাকে পাবার জন্য যখন হাত বাড়িয়ে দিল—নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে তার সে স্বপ্ন গেল টুটে। তার জন্মরহস্য দয়িতার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। এমনি একটী নিষ্পাপ পল্লবিত যৌবনোদীপ্ত জীবন ব্যর্থতার আঘাতে যখন চুরমার হ'য়ে যেতে দেখা যায়—তখন কার
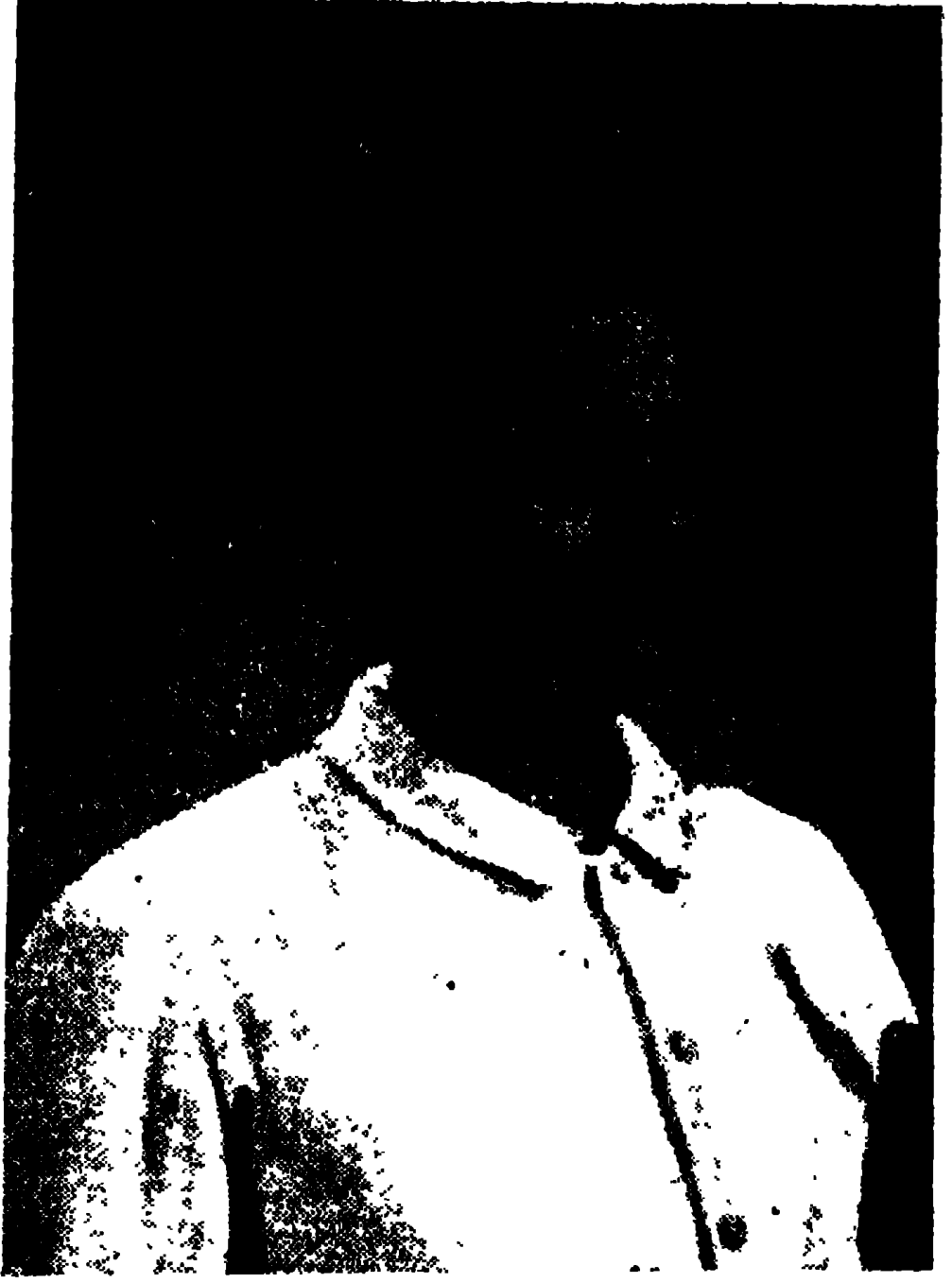
ছবির সুকঠিন চরিত্রটী রূপায়িত করে তুলছেন বাংলার উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়।

না মনে জাগে, ভগবান নেই। অথচ তারই পিতা দেবকুমার—অনাহারক্লিষ্ট, দারিদ্র্য প্রপীড়িত—পুত্রহারা—হাসপাতালে অন্তিম শয্যায়। তারও মনে যদি ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেটা কী অস্বাভাবিক?

স্রষ্টাকে ঘিরে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মনে যে দ্বন্দ্ব জেগেছে তাকেই আমি রূপায়িত করে তুলছি—'মানুষের ভগবান'-এ। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা দর্শক সাধারণই করবেন, আমি নই।"

নির্বাক শ্রোতার মত আমরা মিঃ উদয়ণের কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিলেন—ব্যথিতের বেদনার ছাপ তার চোখ মুখে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। আমি শুধু বল্লাম, "আপনার প্রচেষ্টা সার্থক হউক।"

বন্ধুবরের দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লাম, "আপনি যে একজন ওস্তাদ প্রচার সচিব তা স্বীকার করতেই হবে। কী ধোকাবাজীটাই না খেলেছেন আমাদের সংগে!" আমার হাসির সংগে সকলেই যোগ দিলেন। তারপর কোকো

বাংলা ও বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান !

চিত্র প্রদর্শনা, পরিবেশনা, প্রযোজনা ও ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ
পরিচালনায় দীপ্ত অভিযান সুরু হ'য়েছে।

ছায়া ও কায়া
লিমিটেড

সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি—সুদৃঢ় পরিচালকমণ্ডলী —অভিজ্ঞ ম্যানেজিং এজেন্টসদের পরিচালনায় প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠছে।

অনুমোদিত মূলধন পাঁচলক্ষ টাকা। প্রত্যেকটী অর্ডিনারী শেয়ার ৫৲, প্রেফারেন্স শেয়ার ২৫৲, টাকা করে শেয়ারে বিভক্ত। আবেদনের সংগে অর্ডিনারী শেয়ার প্রতি ৩৲ ও প্রেফারেন্স শেয়ার প্রতি ১৫৲ করে দেয়। প্রত্যেক আবেদনের সংগে ১৲ সার্টিফিকেট ফি দিতে হয়। বাকী টাকা ৬ মাসের মধ্যে সমান দুই কিস্তিতে দেয়।
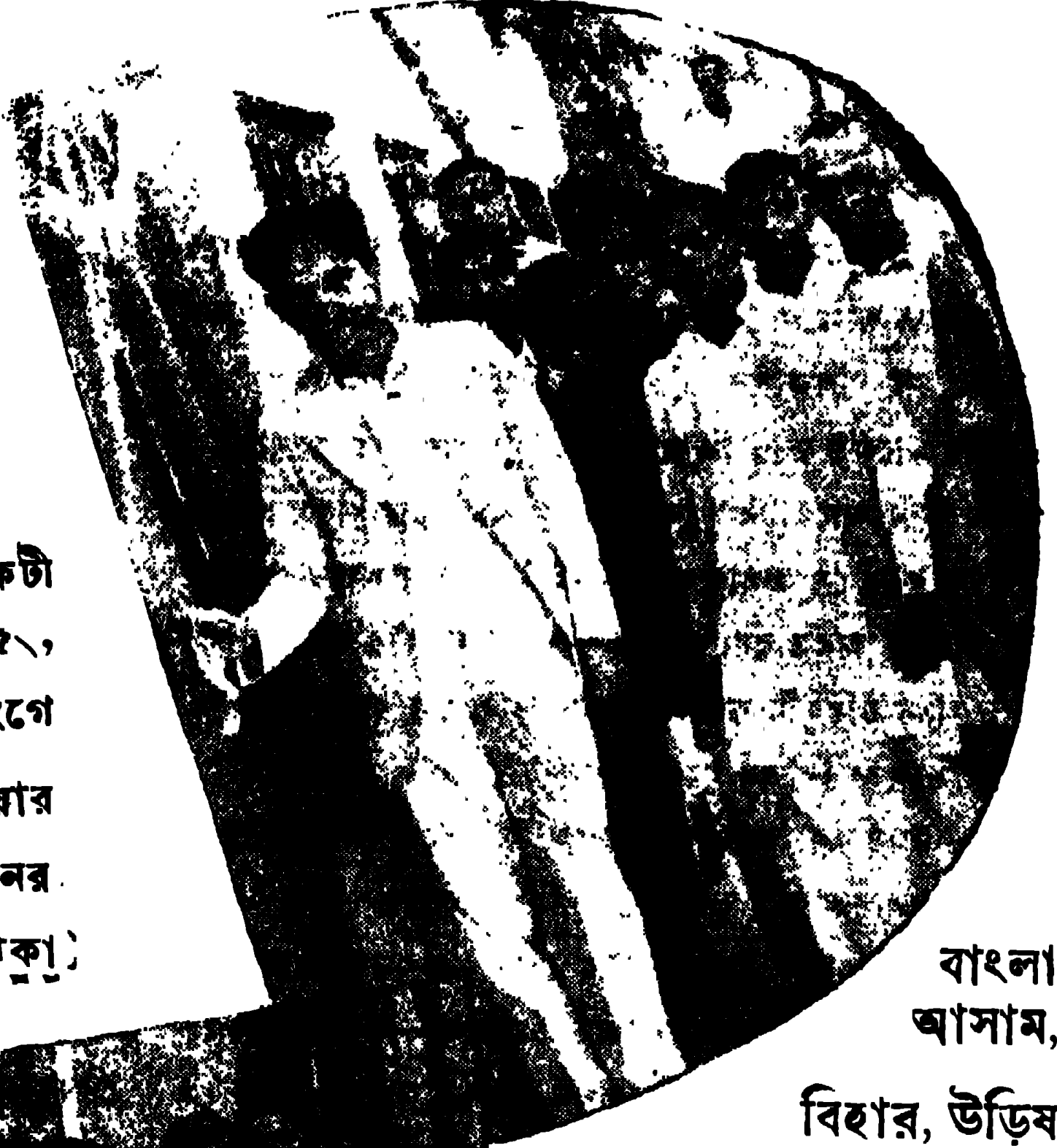
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ইউ, পি, ও সি, পিতে কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সুদক্ষ পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক। এজেন্সীর সর্তাবলী উত্তম। এজেন্সীর জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছে সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস

মেসার্স বিললা ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ
ডক্টর কে. ডি. ঘোষ রোড : খুলনা

বাংলা ও বিহারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় ও শিল্প কেন্দ্রে আধুনিক ধরণের কলকজাসমন্বিত
প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

এবং সিগারেটের ধুঁয়োয় আমাদের আলোচনার, পরিবেশটাকে একটু হালকা করে নিলাম। নব গঠিত ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স লিমিটেডের প্রথম বাণীচিত্র 'মানুষের ভগবান' ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে নবীন পরিচালক মিঃ উদয়ণের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। একদল অক্লান্ত নবীন কর্মীর পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায়ই এই প্রতিষ্ঠানটী গড়ে উঠেছে। মিঃ উদয়ণ রয়েছেন প্রতিষ্ঠানটীর পুরোভাবে। এখানে মিঃ উদয়ণের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে আসবার এঁর সৌভাগ্য হ'য়েছে। কর্মজীবনে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সে সুযোগ অনেকের জীবনেই আসে না। ছোট বেলা থেকেই নাট্যাভিনয়ের প্রতি এঁর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বহু সৌখীন নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করেন। ঢাকা-বেতার কেন্দ্র থেকে এঁর রচিত বহু নাটক ও গান অভিনীত ও গীত হ'য়েছে। তাছাড়া 'ওমার খৈয়াম' ও 'জোয়ার' নামক এঁর রচিত দু'খানা নাটক কল্‌কাতায় সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হ'য়ে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। দু'খানি নাটকই ইনি পরিচালনা করেছিলেন।

চিত্রজগতে এই নবীন প্রগতিবাদী পরিচালককে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। এঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'মানুষের ভগবান' মানুষের মনের এক বিরাট সমস্যার কথা তুলে ধরে দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হউক তাই আমরা কামনা করি। 'মানুষের ভগবানে'র শিল্প-নির্দেশনার ভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। আধুনিক শিল্পীদের ভিতর ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। অধুনালুপ্ত 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়ার' সংগে বহুদিন জড়িত ছিলেন। 'Goverments Commercial Art School' থেকে পাশ করেন। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটী দৃশ্যপট রচনায় নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হ'য়েছেন। 'মানুষের ভগবান' এঁর শিল্প-দৃষ্টির পরিচয় নিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে। 'মানুষের ভগবানের' সুর-সংযোজনা করছেন নবীন সুরকার বিশ্বনাথ মৈত্র—বেতার কেন্দ্রের শ্রোতারা এর কণ্ঠসংগীতের সংগে নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। যদিও বেতার কর্তৃপক্ষের

'মানুষের ভগবান' চিত্রের সিপ্রা চরিত্রটী শ্রীমতী প্রমীলা ত্রিবেদীর আবেদনাকুল অভিনয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠছে।

বহু অবিচার এঁকে সহ্য করতে হ'য়েছে—তবু এঁর সংগীত চর্চায় ছেদ পড়েনি। পরিচালনায় মিঃ উদয়ণকে সহযোগীতা করছেন চিত্ত মুখোপাধ্যায়। এবং সর্ব বিষয়ে ব্যবস্থাপনা করছেন এস, সান্যাল ও সমর রায়। শ্রীযুক্ত রায় দেবদত্ত ফিল্মের সংগে জড়িত ছিলেন। 'মানুষের ভগবানে'র প্রচার কার্যেরভারও ন্যস্ত করা হ'য়েছে এক নবীনের ওপর। তাঁর শিক্ষা ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী মিঃ উদয়ণকে আকৃষ্ট করে। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ শুধু প্রচার সচিব রূপেই আমাদের সংগে পরিচিত নন—সাংবাদিক জগতের সংগেও তিনি জড়িত। মানুষের ভগবানের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করে তুলছেন বিপিন মুখোপাধ্যায়, প্রমীলা ত্রিবেদী, প্রশান্তকুমার, বাণীবাবু রাজলক্ষ্মী (বড়), স্বপনকুমার, গৌরসী (নূতন), শুভ্রা দেবী (নূতন), লুসীবল, পুষ্পলতা (নূতন) ও আরো অনেকে। ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওর শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্র পরিচালক) শ্রীযুক্ত পঙ্কজ দত্ত (সাংবাদিক) নানাদিক দিয়ে এঁদের সাহায্য করছেন। সকলের সাহচর্য ও সহানুভূতিতে নবীনেরা যে ছবি রূপায়িত করে তুলছেন—বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের তা খুশী করবে—সেই আশাই আমরা করি।

চিত্র সমালোচনা, সংবাদ ও নানা কথা

●

রায়-চৌধুরী

এস, আর, হেমাদের নিবেদন। রচনা ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ। নিউ সেঞ্চুরীর ছবি।

ভূমিকায়: অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবী মুখার্জী, কমল মিত্র, নবদ্বীপ হালদার, নরেশ মিত্র, প্রমীলা ত্রিবেদী, প্রভা, সুপ্রভা, পূর্ণিমা আরও অনেকে। একযোগে উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলাতে চল্‌ছে।

রায়-চৌধুরীর কাহিনী শৈলজানন্দের বহুপূর্ব প্রকাশিত রায়-চৌধুরী নামক মৌলিক উপন্যাস থেকে গৃহীত। আধুনিকতার রঙ লাগাতে হয়েছে ছবিতে তাই মৌলিক গল্পের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারা যায়নি, সেকথা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন নি। মৌলিক গল্পের রায়—ছবিতে চৌধুরী হয়েছেন আর চৌধুরী হয়েছেন রায়। "রায়-চৌধুরী" পশ্চিম বঙ্গের রাংগামাটির দেশের এক গ্রামের কাহিনী। দুই জমিদার রায় আর চৌধুরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী বিবাদের বিবরণ। বহুকালক্ষেপে এবং বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত শৈলজানন্দের এই নবতম অর্ঘ্য আমাদের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। মনে হয়েছে এই কী সেই শৈলজানন্দ—নন্দিনী, শহর থেকে দূরে প্রভৃতি চিত্রে যাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম! মধ্যাহ্ন সূর্যের পরে যে সূর্যকে আমরা দেখতে পাই তারই অস্তোন্মুখ রশ্মি যেন শৈলজানন্দের এই নবতম সৃষ্টির সারা অংগে। সারা ছবিতে বিচিত্র দৃশ্যাবলী ও চরিত্র সমূহের অবতারণা আছে কিন্ত রস সৃষ্টি কোথায়? পারিবারিক বিবাদের এক শাশ্বত সমস্যা নিয়ে রায়-চৌধুরীর দীর্ঘ কাহিনী রচিত। ছবির প্রারম্ভ থেকেই একটা "প্যাচ" মারার নীতি গ্রহণ করায় সমস্ত ছবিটাই একটা "প্যাচ ওয়ার্ক" হয়ে গেছে। জটিল সমস্যা কিছু নেই অথচ ঘটনাকে জটিলতার ব্যর্থরূপ দেবার প্রয়াস আছে খুব। এবং সেকারণে ছবিতে অবান্তর চরিত্র সৃষ্টির অভাব ঘটেনি তবে রস পরিবেশনের অভাব ঘটেছে অনেকখানি। সমস্ত ছবিটা একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন পরিচালকের ছেলেখেলা বলে মনে হয়—মনে হয়না এর পেছনে আছেন জনপ্রিয় কথা-শিল্পী পরিচালক শৈলজানন্দ। শৈলজানন্দকে দোষ দেবনা—তাঁর রায়-চৌধুরী তাঁর দেউলিয়া মনের পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—শুধু এজন্য দুঃখ প্রকাশ করবো।

চিত্রের প্রারম্ভেই দেখি সেদিন বিজয়া দশমীর দিন—ছোট বিজয় ও ছোট বিমলা একটা পাখী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। শেষে বিজয়, বিমলাকে ছোট একটা চড়ও দিয়েছে। এবং সেই মুহূর্তে রায় ও চৌধুরী বাড়ীতে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন হচ্ছিল। পল্লী-গ্রামে বিজয়া দশমীর দিন মণ্ডপ প্রাংগনের ঠিক প্রতিমা মণ্ডপ থেকে বের করার সময় যে পরিবেশ তা অমন করে পাখী নিয়ে ঝগড়া বাধাবার অবসর দেয় না। অশ্বিনীরায় মেয়েকে মেরেছে জেনে আগুন—আর ঠিক এমন সময়ে কার্তিক চক্রবর্তী সংবাদ দিল—চৌধুরী বাড়ীর প্রতিমা বড় হয়েছে। অশ্বিনী চীৎকার ক'রে উঠলেন—"চৌধুরীদের প্রতিমা বড় হয়েছে?" বিবাদমান দুই জমিদারের প্রতিমা যখন তৈরী হতে থাকে মণ্ডপে, তখনইত জানাজানি হয়ে যায়—কার বাড়ীর প্রতিমা বড় হয়েছে। ঠিক বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জন দিতে নিয়ে যাবে এই সময়ে কার্তিক চক্রবর্তীর সংবাদের উপরে রায়-চৌধুরীর বিবাদ শুরু হলো। এ যেন ধর মার কাট। 'পাখী নিয়ে ঝগড়া'—'প্রতিমা বড়'—'গেট তৈরী', কাটো গেট, ছেলে চুরি, মার বন্দুক, —ব্যস—কিষণ সিং মারা গেল। সবই হলো কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশ এর মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। পল্লীর পট ভূমিকায় যে চিত্র গ্রহণ করা হবে পল্লী-পরিবেশের কথা পরিচালকগণ যদি এমন ইচ্ছে করে ভুলে যেতে চেষ্টা করেন, সেটা তাঁদের পক্ষে অপরাধ বলেই মনে করি। পরিচালকদের গ্রাম সম্বন্ধে সম্যক

পরিচয় লাভ করেই এইরূপ চিত্র নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্র পরিচালক ঠিক আছে, OK—করেই সব "প্যাক আপ" করে আমাদের কাছে পাঠাতে সুরু করেছেন। শৈলজানন্দের গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞানের অগভীরতা নেই একথা স্বীকার করবো। তবে আলোচ্য চিত্রে তাঁর নিষ্ঠার অভাব একান্ত ভাবে লক্ষিত হয়েছে।

কিষণ সিংহের মৃত্যুর পরে এল রায়-চৌধুরীদের মামলার পালা। ভবানী চৌধুরীর হাজত বাস ইত্যাদি—এই অংশটুকু বোধহয় ছবির সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অংশ। সুন্দর একটা সাবলীল গতি এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশল এই টুকুর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। ভবানী চৌধুরীর মৃত্যু পর্যন্ত এই অংশ টুকুর ব্যাপ্তি। এর পরেই আসে ১৫ বছর পরের ঘটনা—বিজয় বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে গ্রামে এসে বসেছে। একেবারে পুরা দস্তর সাহেব। গ্রামবাসীদের জন্য তার দরদ খুব—ছবিতে তা দেখানোর একটা ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়েছে। কয়লার খনির সাঁওতালী কুলি অশ্বিনী রায়ের অব্যবস্থায় তারা রোগ-ক্লিষ্ট—দুস্থ। বিজয়ের মা তাদের সেবায় সাড়া দেয়। বিজয় দেখা করতে যায় কয়লার খনির ডাক্তারের কাছে। কয়লার খনির এই ডাক্তারটি বিজয়কে দিলেন মস্ত "সারমন"—কি সে বক্তৃতার ঘটা! এই ডাক্তার চরিত্রটির প্রয়োজন যে কি ছিল চিত্রে, সে এক পরিচালক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন বলে আমরা ভরসা রাখিনা। কুলীদের ডাক্তারী করতে গিয়ে বিজয় অশ্বিনী রায়ের বিরাগভাজন হলো। নতুন করে বিবাদের সূত্রপাত হলো। তারপর হঠাৎ এল এক ডিনামাইট। কুলীদের কার্যপক্ষের অস্বাস্থ্যকর স্থান গুলো—বিজয় ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গ্রাম সেবার চরম নিদর্শন দেখাল। কতখানি যে অসংগতি এখানে চোখ পড়ে! ডিনামাইট ফাটলে একটা শব্দ অবশ্য হয়, হয়েছেও। কিন্তু দর্শকের মনে চমক লাগিয়ে ধাঁধাঁ সৃষ্টি করা যায় না। তারপরেই ডিনামাইটের সংগে সংগে বিজয়ের গ্রাম সেবার "মাইট"ও উড়ে গেল। প্রেমিক বিজয়ের সংগে এর পরে আমাদের দেখা।

অশ্বিনী রায়ের কৌশলে বিজয় ধৃত হয়ে এলো রায়দের বাড়ীতে। এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হ'লো বিজয়ের সংগে বিমলার বিয়েতে। বিজয় অর্থশালী নয়—অশ্বিনী চান তার মেয়ে রায়দের বাড়ীতে থাকবে না—বিজয় ঘরজামাই হ'য়ে থাকবে। বিয়ের পরে ঐ যে অশ্বিনী রায় মেয়েকে বাড়ীতে আনলেন—আর পাঠালেন না। বিজয়ও ঘরজামাই হ'লোনা। কিন্তু বিজয় মায়ের অজ্ঞাতে শ্বশুর বাড়ীতে যাতায়াত করে আর স্ত্রীর সংগে মধু আলাপনে মত্ত হয়ে যায়, যে দৃঢ় চারিত্রিক সৌন্দর্য বিজয়ের গৌরবের বস্তু হওয়া উচিৎ ছিল—বারবার "লাঞ্ছিত ভ্রমরের"

ভূমিকায় তাকে দেখে মন বিষিয়ে ওঠে। মা বিজয়ের এই নিভৃত যাতায়াত পছন্দ করেন নি। শৈলজানন্দের আদর্শ দেশ প্রেমিক—"প্রেমের লাগিয়া" দেশছাড়া হলেন। একেবারে কলকাতার পাইস হোটেলে। এই পাইস হোটেলের কোন সার্থকতা ছিল কি এই চিত্রে? শতদলের সংগে পরিচয় এইতো? তা পাইস হোটেলে, হোটেলের পরিচয় পেলাম না—পেলাম কয়েকটি অবান্তর পাগল চরিত্রের পরিচয়। আর শতদল (আহা কাব্যের উপেক্ষিতা বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি) হোটেল সংলগ্ন টাইপ স্কুলের কেরাণী ও প্রয়োজন হলে হোটেলের পরিবেশনিকা। এই অনুপম যৌবনশ্রী মণ্ডিতা মেয়েটিকে দিয়ে পরিচালক কত কাজই না করালেন—একেবারে শেষ পর্যন্ত বিজয়ের সংগে ভাব এবং গ্রামে দুর্গা পূজার নাম শুনেই—বিজয়ের সংগে গ্রামে চলে এল। এমন একটা অবাস্তব 'পাইস হোটেল-কাম টাইপ-স্কুলে'র পরিকল্পনা শৈলজানন্দ কেমন করে করলেন তাই ভাবি। পাইস হোটেল নাকি হাসির খোরাকের জন্যে—এমন করে এতখানি কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে শৈলজানন্দকে পূর্বে কখনও দেখিনি।

বিজয় গ্রামে ফিরে গেল - সংগে গেল শতদল। শতদলের সংবাদে বিমলা রুষ্ট হ'লো—কিন্তু তার অন্তর্দ্বন্দ্ব দানা বাঁধল না। হঠাৎ এল খনি ধ্বসে যাবার পালা—রায় রায়দের বাড়ী পর্যন্ত ভেংগে পড়তে লাগল। এই বাড়ীঘর ভাংগার দৃশ্যগুলি হাস্যকর। কয়েকটি কাঠের চেড়া আর থাম আর বাক্স ধুপ ধাপ করে পড়লেই কী বাড়ীভাঙ্গার বাস্তব রূপ দেওয়া যায়? যা দেখাতে পারবেন না তা দেখাতে যান কেন তাই বলি। এইখানে জোর করে গল্পের ড্রামেটিক রূপ দিতে গিয়ে অপ্রাকৃত গতি সঞ্চারের প্রয়াস আছে। কিন্তু সত্যিকারের গতি যদি কাহিনীতে দুর্বল হয়ে পড়ে—জোর করে আর কতটুকু সাফল্য তাতে অর্জন করা যায়! এর পরেই সার্বজনীন দুর্গাপূজা—বিজয় তার উদ্যোক্তা—রায় এলেন—মিলন হলো রায় ও চৌধুরীর—পরিশেষে বন্দেমাতরম ও ন্যাশনাল ফ্লাগ—সাম্প্রতিক যুগের অর্থ উপার্জনের "ট্রিকস্" দিয়ে গল্পের শেষ করেছেন পরিচালক। শুধু তাঁকে একটা কথাই বলি এইসব বাজে 'ট্রিকস্' দিয়ে আর তিনি আসর মাত করতে পারবে না।

চিত্রে অহীনবাবু প্রতাপ রায়ের অভিনয় করেছেন। এই চরিত্রটির একটি প্রয়োজন দেখলাম ছবিতে সেটা হচ্ছে বিজয় ও বিমলার ঘটকালী ব্যাপারে—বাস—আর কোন প্রয়োজন এই চরিত্রটির নেই। অহীনবাবু অভিনয় চরিত্র অনুযায়ীই করেছেন। ভবানী চৌধুরীর ভূমিকায় মনোরঞ্জনবাবু সুন্দর অভিনয় করেছেন—ভাল লেগেছে ওর অভিনয়। উদ্ধত প্রকৃতি জমিদার অশ্বিনীরায়—এই একটিমাত্র চরিত্র যার জন্যে চিত্র পরিচালককে প্রশংসা করব। অশ্বিনী চরিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দৃঢ় কাঠামো চোখে পড়ে—কমল মিত্রের অভিনয়ে চরিত্রটির সম্যক রূপারোপ দেখতে পেয়েছি। কমল মিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য আমাদের ভাল লেগেছে।

বড় বিজয়ের ভূমিকায় দেবী মুখার্জির অভিনয় একঘেয়ে—অভিনয়ে যেন তিনি নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছেন—এই কথাই মনে হয়। প্রমীলা ত্রিবেদী—বড় বিমলার ভূমিকায় মন্দ লাগেনি। শ্রীমতী প্রভা, সুপ্রভা দেবী, পূর্ণিমা দেবী চরিত্র উপযোগী অভিনয় করেছেন। কার্তিক চক্রবর্তীর ভূমিকাটির চিত্রে একটা বিশেষ স্থান আছে। ঐ চরিত্রটাকে "কমিক" করতে গিয়ে গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি খুবই দুর্বল হ'য়ে গেছে একথা বলতে হবে। কার্তিক চক্রবর্তীর ভূমিকায় নবদ্বীপ হালদার বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কালু মামার ভূমিকায়—হরিধন উপভোগ্য। রঞ্জিৎ রায়ের রামাগো--গান ও নাচ—উঃ যাকে বলে "আনকুথ"। শৈলজাবাবুকে এই মামুলী পথটা ছাড়তে বলি। আর কতকাল এ রকম করে ঝুমুরের নাচে দর্শকগণকে তিনি নাচাবেন? স্তাবকদের গণ্ডী ভেংগে ফেলে একটু নিজের স্বাধীন চোখে সব দেখতে অনুরোধ করি। অপ্রাসংগিক হলেও একথাটা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে, দরদী কথাশিল্পী শৈলজানন্দ যেদিন চিত্র পরিচালক হ'য়ে দেখা দিলেন—সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম—শুধু এই

ভেবেই যে, অমানুষদের মধ্যে মানুষ বুঝি একজন এল। কিন্তু পরিচালক শৈলজানন্দ নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে অতি বিশ্বাসী হ'য়ে উঠলেন। আমাদের আশা-ভরসা ষ্টুডিও স্তাবকদের পাকচক্রে ঘোর পাকই খেতে লাগল—শুধু জানলাম কোথায় সেই শৈলজানন্দ! এবার প্রসংগে ফিরে আসি। ছবির ছোট ছোট ভূমিকায়: নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যোঃ, বেচু সিংহ, প্রবোধবাবু, ৺ন্যাংটেশ্বর প্রভৃতি মন্দ করেন নি। বনমালীর চরিত্রটি সুঅভিনীত হয়েছে।

সংগীত পরিচালনায় ও সুর সংযোজনায় শৈলেশ দত্ত গুপ্তের নতুন ধরণের কৃতিত্বও নেই। একেবারেই মামুলী। ছবির গানগুলি মনে কোন দাগ কাটে না। এবজন্য মূল কাহিনীর গতিহীনতাই হয়তো অনেকখানি দায়ী। মোহিনী চৌধুরীর সংগীত রচনা মন্দ বলব না।

চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ দোষ-ত্রুটি থাকলেও চলনসই। সম্পাদনায় ত্রুটি আছে।

একটা কথা রায়চৌধুরী চিত্রখানির বিফলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটা হচ্ছে গল্পের মূল সমস্যার ছেদ। ভবানী চৌধুরীর মৃত্যুর পরে রায়চৌধুরী বিবাদ কোথায়? ঐ যে ছোট বিজয় পট্ করে next shot এ ডাক্তার হয়ে এল—এই ছেদটি দর্শকের মনে আঘাত হানে—তাঁরা কিছুতেই আর কাহিনীর শেষ অংশটুকু স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে চান না। শৈলজাবাবুকে দর্শক হয়ে এই কথাটা চিন্তা করতে অনুরোধ করি। —দীপঙ্কর

চোরাবালি—

প্রযোজনা: রথীন্দ্রনাথ সেন। কথা, কাহিনী ও পরিচালনা: তুলসী লাহিড়ী। সুর সংযোজনা: বীরেন বসু। গীতিকার: শৈলেন রায়। চিত্রশিল্পী: বীরেন দে। শব্দধর: পরিতোষ বসু। বিভিন্নাংশে: তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত, প্রশান্ত, সুনীল, বলীন, মণি, নৃপতি, পূর্ণ, গোপাল, অমিয়, স্মরপতি, পদ্মা, প্রভা, রমা, বন্দনা, নীলিমা, উমা প্রভৃতি। পরিবেশনা: ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ।

'স্বপনপুরী' প্রডাকসনের 'চোরাবালি' কিছুদিন পূর্বে সহরের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল। চোরাবালিতে ঘর বাঁধলে যে স্থায়ী হয় না—এই সত্যকে প্রচার করতে যেয়ে কর্তৃপক্ষও ভুল করে ফেলেছিলেন অর্থাৎ চোরাবালির ওপরই তাঁরা 'চোরাবালি' গড়ে তুলেছিলেন। তাই প্রেক্ষাগৃহ থেকে চোরাবালি অকালেই ঝরে পড়লো। স্বপন পুরীর পক্ষেই চোরাবালির ওপর ঘর তোলা সহজ। আমাদের কষাঘাতের পূর্বেই চোরাবালি ধ্বসে পড়লো। কর্তৃপক্ষকে তাহ'লে আর বেশী বুঝিয়ে বলতে হবে না যে, কী হালকা বনিয়াদের ওপর তাঁরা চোরাবালি বেঁধে তুলেছিলেন।

'চোরাবালি'র কথা, কাহিনী ও পরিচালনার দায়িত্ব একাধারে ছিল শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর ওপর। তুলসী বাবু শিক্ষিত দক্ষ অভিনেতা। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক কাহিনী চিত্র রূপায়িত হ'তে দেখেছি। সম্প্রতি তাঁর 'দুঃখীর ইমান' নাটক সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দীর্ঘদিন তিনি বাংলা চিত্র জগতের সংগে জড়িত রয়েছেন। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর বলবার অধিকারকে আমরা অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু 'দুঃখীর ইমানে' তুলসী বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি যে শ্রদ্ধা জেগেছিল 'চোরাবালিতে' সে প্রতিভায় কিছুটা সন্দেহ জাগা কী অস্বাভাবিক?

প্রতিভা সাধারণতঃ দুই রকমের। জন্মগত ও অর্জিত বা অধ্যবসায়গত। জন্মগত প্রতিভাকেও বিকাশ করতে হ'লে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ঘসে মেজে নিতে হয়। এবং তখন এই প্রতিভার যে রূপ বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তার জৌলুষে আমরা মুগ্ধ না হ'য়ে পারি না। অধ্যবসায়গত

প্রতিভার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যতই থাক না কেন, জন্মগত বিকাশপ্রাপ্ত প্রতিভার কাছে তা ম্রিয়মান্ হ'য়ে পড়বেই। একথা এখানে উল্লেখ করলাম এই জন্ম যে, শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর একাধিক কাহিনী চিত্রে এবং নাট্যে রূপায়িত হ'লেও, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা যে জন্মগত নয়—একথা আমরা জোর দিয়ে বলবো। তাঁর কাহিনীতে বিভিন্ন সমস্যা থাকে—তিনি তা সমাধানের ইংগিতও দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সে সমস্যাগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত করতে পারেন না। এবং যে আধার মারফৎ সমস্যাগুলি উপস্থিত করতে চান—তার নির্বাচন ও পরিবেশকেও প্রশংসা করতে পারা যায় না অনেক ক্ষেত্রে। সুতোটা কোথায় যেন কেটে গেছে বলে মনে হয়। জন্মগত প্রতিভা নিয়ে যে সাহিত্যিক দেখা দেন—তিনি যা বলতে চান এমনি সুচতুর ভাবে তা ব্যক্ত করেন যে পাঠকের মনে অলক্ষ্যে তা গেঁপে যায়। এবং যখন যা বলেন জোরালো ভাবেই বলেন। অর্থাৎ নিজে যা বলেন বা বলতে চান—তাতে তাঁর নিজের অভ্রান্ত মতবাদ স্পষ্ট হ'য়েই দেখা দেয়। আলোচ্য চিত্রের কাহিনীতে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী কী বলতে চেয়েছেন? তিনি নীতি-সুধার মত বাঙ্গালী দর্শক সাধারণকে বলতে চেয়েছেন, "সদা সত্য কথা বলিবে—মিথ্যা কথা বলিবে না—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।"—"চোরাবালির ওপর ঘর বাঁধিও না তাহা হইলে সে ঘর ধ্বংসিয়া পড়িবে।" এবং যা বলছেন তা বলতে পেরেছেন কি না সে বিষয়েও তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। তাই বার বার এই 'বলা'কে নিয়ে ঢাক পেটাতে দেখি। তাছাড়া শুধু এইত তাঁর বলার বিষয় বা উপপাদ্য নয়। চোরাবালির পুস্তিকার প্রথম পংক্তিতেই আমাদের নজরে পড়ে, "কয়লা খনি অঞ্চলে অমর গিয়াছিল কুলী মজুরদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের বাণী প্রচার করিতে—সেইখানেই বৃদ্ধ দামোদরের সঙ্গে তার পরিচয়।" তাহ'লে 'সমাজতন্ত্রবাদের বাণী' প্রচারের ইচ্ছাও তুলসী বাবুর ছিল। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা চিত্রে কোথাও ফুটে উঠতে দেখিনি। তবু চিত্র পুস্তিকার পাতা থেকে তুলসী বাবুর এই অব্যক্ত ইচ্ছা জানা গেল। কারণ, দামোদরের সংগে সংগে পরিচয়ে নায়ক অমরকে আর সমাজতন্ত্রবাদের বাণী প্রচার দেখতে পাইনি, তাকে দেখতে পাই চিত্র জগতের চিরচেনা প্রেমের বাণীর প্রচারক হিসাবে।

তাছাড়া আরও একটী ইচ্ছা ছিল তুলসীবাবুর—অন্য লোক হ'লে বলতাম—সে ইচ্ছা যৌন-বিলাস নিয়ে একটু ছ্যাবলামী করা। কিন্তু তুলসীবাবু সম্পর্কে এখনও অতটা হীন ধারণা করতে পারবো না বলে—তাঁর এই 'ইচ্ছাটী'র যে সম্ভাবনা ছিল তাকে মেনে নেবো। এবং তা যদি সুষ্ঠু ভাবে তিনি রূপায়িত করতে পারতেন একখানি যৌন-বিজ্ঞানের মনস্তত্বমূলক হাস্যরসাত্মক চিত্র গড়ে উঠতে পারতো। এবং 'চোরাবালি'তে ছ্যাবলামীর গড্ডালিকা ভেদ করে যেটুকু প্রশংসা করবার, তা তুলসী বাবুর এই ইচ্ছার জন্যই। সে ইচ্ছাটী অমরের খুড়ো মহাশয়ের চরিত্রটীর ভিতর দিয়ে আংশিক বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। যৌন-মনস্তত্ব নিয়ে যাঁরা ঘাটাঘাটি করেন এবং সাধারণ পরিণত বয়স্কদেরও, এই চরিত্রটীকে কেন্দ্র করে চিত্র গড়ে উঠলে খুশীই করতো। তাছাড়া চিত্রখানি একখানি কৌতুক চিত্রের সম্ভাবনা নিয়েই দেখা দিত। অথচ সেদিক না যেয়ে আলোচ্য চিত্রে এই চরিত্রটীকে ঘিরে তুলসী বাবু যে ছ্যাবলামী এবং নগ্ন যৌন-স্পৃহার খেলা দেখিয়েছেন—অন্ততঃ তাঁর মত প্রবীণ ও বিজ্ঞের কাছ থেকে আশা করিনি। 'চোরাবালি'র সমালোচনা করতে গেলে এতই দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ে যে, বালির স্তূপ থেকে এক একটী 'কণা' গুণে রাখার মত আমাদের হিমসিম খেয়ে উঠতে হবে। তাই সে কার্য থেকে বিরত থাকলাম। এই শ্রেণীর চিত্রগুলিকে এমন ভাবে অকালে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েই আশা করি বাঙ্গালী দর্শক সমাজ প্রযোজকদের যথেচ্ছাচারিতার সমুচিত উত্তর দেবেন। তাহলেই তাঁদের টনক নড়বে।

অভিনয়াংশে কয়েকজন নূতনকে দেখতে পেয়েছি। তাঁদের সম্ভাবনাকে প্রশংসা করবো। এবং কর্তৃপক্ষ এই চিত্রে যে কয়েকজন নূতনদের উপস্থিত করেছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের এই কথায় চোরাবালির নূতনেরা যেন মনে না করেন, তাঁদের অভিনয়-দক্ষতাকে আমরা

মেনে নিয়েছি। অভিনয়াংশে তুলসীবাবু ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। পদ্মা ও বন্দনাকেও প্রশংসা করবো। চিত্রের বহিদৃশ্যগুলি মাঝে মাঝে চোখকে একটু বিরাম দিয়েছে। চিত্র-পুস্তিকায় প্রথমেই কর্তৃপক্ষ প্রচার করেছেন, 'ইষ্টার্ণ টকীজের মিচেল ক্যামেরা ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত'—কিন্তু দুঃখের বিষয় চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণকে মোটেই তারিফ করতে পারলুম না। কোন্ জাহাজ করে—কবে সাগর পার থেকে এসেছে কর্তৃপক্ষ এটুকু আর বলতে বাকী রাখলেন কেন?

সংগীতাংশও কানে বাজেনি। —শ্রীপার্থিব

রাত্রি

চিত্রবাণীর রাত্রি দেখতে গিয়েছিলাম অনেক আশা নিয়ে। ভাবলাম, সিনেমার তরল প্রেমকাহিনী আর নায়ক নায়িকাদের মুগ্ধ চাহনীর একঘেয়েমি আমাদের চক্ষুকে পীড়িত ও মনকে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে। এসময় রহস্যময়ী রাত্রি যদি রোমাঞ্চের রক্তশয্যায় বিরাট আদর্শের গৈরিক পতাকা সঞ্চালনে আমাদের আহ্বান করে তবে তা নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলবেনা।

কিন্তু রাত্রি দেখে এই ঔৎসুক্য আর উৎফুল্ল থাকলো না। রাত্রি নিরাশই ক'রেছে, নিরেট অন্ধকারের বুকে যে বিশাল রক্তধ্বজা দেখব বলে আশা ক'রেছিলাম তা দেখতে পাইনি। কিন্তু তবু ছবির পরিশেষে মনে হ'য়েছে, পরিচালকের অনিপুণতা ও কাহিনীকারের অবিবেচনা আর কিছুদূর পিছিয়ে থাকলেই রাত্রি নিশ্চয়ই আমাদের মনোরঞ্জন করতে পারতো।

রাত্রির একা যাত্রী কালোকোর্তা। কিন্তু এ কালো-কোর্তার মাঝে কাহিনীকার প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি। রাত্রির তীর্থযাত্রা তাই ব্যর্থ হ'য়েছে। জীবনের

অলৌকিক বিপর্যয় যা আমাদের মনকে সমূলে আন্দোলিত করে তোলে—তেমন বিষয়বস্তু নিয়ে যদি কোনো শক্তিশালী রোমাঞ্চকর কাহিনী একটি শানিত দীপ্ত তলোয়ারের মতো—একটি আতংকজনক দুঃস্বপ্নের মতো আমাদের চোখের সমুখে জীবন্ত হ'য়ে উঠতো তবে আমরা তাকে নিশ্চয়ই আন্তরিক অভিনন্দন জানাতাম।

রাত্রির প্রথম প্রহরেই সুরু হ'লো ছ্যাবলামি। যে ভাবে কালোকোর্তা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো তা দেখলে মনে হয় কালোকোর্তা যেন কোনো যাদুমন্ত্রে পুলিশবাহিনীকে ভেড়া বানিয়ে নিয়েছে। ইন্‌স্পেক্টরের হাতে রিভলবার, কনষ্টেবলেরাও সশস্ত্র ও সজাগ—এমন একটি বাহিনীর একেবারে চোখের সমুখ দিয়ে কালোকোর্তা দিব্যি হেঁটে হেঁটে চলে গেলো, আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফুরিত হ'লোনা, পুলিশেরা পেছু ধাওয়া ক'রলেনা, সবাই যেন ভেলকি দেখার মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলো, 'হিজ্ ম্যাজেষ্টি' কালোকোর্তা চ'লে যাচ্ছেন। এখানে কালোকোর্তার বুদ্ধি ও কৌশলের যে 'খেল্' দেখানো হ'য়েছে আমাদের দেশের ছিঁচকে চোরেরাও পলায়নের ব্যাপারে বুদ্ধিকৌশলে এর চেয়ে বিচক্ষণতা ও নিপুণতা দেখিয়ে থাকে।

এরপর গুপ্ত অনুচর হীরালালের সংগে কালোকোর্তার সাক্ষাৎকার। বলিহারি কালোকোর্তার বুদ্ধি! গোপনীয় দেখা সাক্ষাতের কী জায়গাটাই তিনি পছন্দ ক'রেছেন! কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী যে কালোকোর্তাকে ধরবার জন্যে শহরের পুলিশ ব্যতিব্যস্ত, তিনি অনুচরের সাথে দেখা ক'রছেন দিল্লীর এক রাস্তার এমন কোনো স্থানে, যেখানে দু'পাশের দোতলা-তেতলা বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোয় এবং রাস্তার গ্যাসপোষ্টের আলোয় চারিদিক দিনের মতো সুস্পষ্ট। আর পুলিশবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে কালোকোর্তা তাঁর কোর্তা না বদলেই এলেন সেই হীরালালের সংগে দেখা ক'র্তে সেই নির্দিষ্ট জাগায়, এই অল্পসাহস কাহিনীকারের থাকলেও কালোকোর্তার মতো বুদ্ধিমানের থাকতে পারে না।

মিষ্টার চৌধুরীর মুখে শুনতে পেলাম, কালোকোর্তা প্রতিমাসে ইন্‌সিওর-করা খামে মোটা টাকা কোনো-না-কোনো ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয় গরিবদের বিতরণ করবার জন্যে। এর চেয়ে উপহাসের খোরাক এই ছবিতে বোধ হয় আর কোথাও নেই।

পার্টিতে হার চুরি করার পর কালোকোর্তাকে তল্লাস ক'র্তে চাইলে তিনি যেরকম ঘাবড়ে গেলেন আমাদের চোখে তা বিষদৃশ্যই ঠেকেছে। যে পার্টিতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দু'দলই উপস্থিত, সেখানে অতো দামী জিনিষ কিছু চুরি গেলে ব্যাপক খানাতল্লাসী যে হবে সেটা ভেবে নেওয়া ও সে অনুসারে তৈরী হ'য়ে কাজে নামা কালোকোর্তার পক্ষে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ছিলোনা। আর আলো নিভিয়ে দেবার পর পার্টির হল যেরকম অন্ধকার হওয়া উচিত ছিলো তা দেখতে পাইনি এবং হাল্‌কা আঁধারের বুকে যে অস্পষ্ট স্বচ্ছতা ছিলো তার মধ্যে কালো বা লাল কোনো কোর্তার পক্ষেই কারো গলার হার চুরি করা সম্ভবপর নয়।

কালোকোর্তার অনুচর হীরালাল টাকা বিলিয়ে দেবার সময় ধরা পড়লো এর চেয়ে ছেলেমানুষি আর কী হ'তে পারে? যে কালোকোর্তা টাকা কেড়ে নিয়ে আসে নিরাপদে, তাঁর ধরা পড়বার পথে প্রশস্ত হ'য়ে এলো কিনা টাকা বিতরণ করবার নিখুঁত ব্যবস্থা না ক'র্তে পারায়! তা—পিপড়ের কামড়ে হাতী মরে—রূপকথায় এমন শোনা যায় বটে!

রমার হার ফিরিয়ে দিতে গেলো কালোকোর্তা। পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলো, এখানে যেরকম আলোর প্রাচুর্য দেখানো হ'য়েছে, অতো রাত্রে কারো বাড়ীর পিছন দিকে ওরকম আলো থাকা স্বাভাবিক নয়। বাড়ীর সমুখ দিক দিয়ে যে কালোকোর্তা উঠবেনা সেটা নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া চলে। এবং অন্ধকার কোণের কোনো একটি পাইপ যে কালোকোর্তা বেছে নেবে এটাও যুক্তিসংগত বলা চলে।

খেয়ালী ধনী রামনাথের বাড়ীতে কালোকোর্তা গেলো মিসেস্ চৌধুরীর হার ফিরিয়ে আনতে। সেখানে

রামনাথের চোখে প'ড়ে গেলেন: কালোকোর্তা। হার রামনাথ কিছুতেই ফিরিয়ে দেবেনা, এমন কি উচিত মূল্য ফিরে পেলেও না। কিন্তু সে বাজী রাখ্‌তে রাজী হলো। তার বহুমূল্য রত্নাগার সুরক্ষিত করার যে সুদৃঢ় ব্যবস্থা সে ক'রেছে, যে বিচক্ষণ প্রহরীদের নিয়োগ ক'রেছে, তাদের সতর্কতা অবস্থায় যদি কালো-কোর্তা হার নিয়ে পালাতে পারেন তবে হার তাঁরই। কালোকোর্তা রাজী হলেন। হার নিয়ে তিনি রামনাথের প্রদর্শিত পথে পা বাড়ালেন। শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌লো, ভাবলাম মহাভারতের অভিমন্যুর মতো কালো-কোর্তা এবার বুঝি অটুট ব্যূহের বেড়াজালে প'ড়্‌লো। —যেখানে শুধু ঢোকাই যায়, বেরোনা যায়না কিছুতেই। শরীরটা কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌লো, ভাবলাম এবার বুঝি সত্যিকারের রোমাঞ্চের আস্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু যে ডিগ্‌বাজীটা দেখানো হ'লো তা একমাত্র ছেলে-পিলেদের 'চোর-দারোগা' খেলাতেই সাজে। এ যেন জলযোগের নেমন্তন্ন ক'রে শুধু এক গ্লাস জল দিয়ে বিদেয় করা!

গভীর রাত্রিতে রমাকে সাথে নিয়ে কালোকোর্তা গেলেন মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে। রমার স্বপক্ষে দলিল লিখিয়ে নিলেন, রমার ভবিষ্যৎ নিরঙ্কুশ করার জন্য শাসালেন মিঃ চৌধুরীকে, কাঠের খেলনা দিয়ে ভয় দেখিয়ে হুকুম তামিল করালেন। সবি যেন ভোজবাজী! ভয় দেখিয়ে পারিবারিক অশান্তি দূর ক'রতে রবীন হুডের যুগে রবীনহুডও পেরেছিলেন কিনা কাহিনীকার সে খোঁজ একবার নিয়ে দেখ্‌লে পারেন। শক্তিমানের বজ্রমুষ্টি কোন কোন ক্ষেত্রে হ'য়তো অন্যায় জবরদস্তির শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু দস্যুর দ্বারা জোর ক'রে লিখিয়ে নেওয়া দলিল মিঃ রমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পারে কিনা কাহিনীকার আইনজীবীদের কাছে একবার জিজ্ঞেস্‌ ক'রে নিলে পারতেন! এভাবে রমার সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট নেওয়া এবং রমার ভবিষ্যৎ জীবন মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে নিরুপদ্রবে কাটাতে দেওয়ার পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি নেওয়া একেবারেই হাস্যকর।

ছবির প্রথমদিকে নমিতার দৈহিক অভিব্যক্তিতে যে হাল্‌কা ফ্যাসানের হ্যাংলামি দেখেছি তা প্রীতিপ্রদ নয়। কলেজে পড়া মেয়ে হলেও ফ্যাসানের এই অনাচার নমিতার চরিত্রকে লঘু ও সামান্য ক'রে তুলেছে। কিন্তু যে মেয়ে বিদুষী, দুরন্ত দুঃসাহসিক জীবনের স্বপ্ন যার মনে মোহসঞ্চার করে, দস্যুবীর কালোকোর্তার আত্মপ্রকাশ যার প্রাণে একটুও আতঙ্কসঞ্চার করেনি, বরং সেই আশ্চর্য মানুষটির বুদ্ধির প্রখরতা, সাহসের অন্তহীনতা ও মনুষ্যত্বের মহনীয়তা যাকে রোমাঞ্চিত ক'রেছে এবং মুখোমুখী বিভীষিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে প্রেরণা দিয়েছে—এই বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বে যে মেয়ে মহিমান্বিতা তার চরিত্রের গুরুত্ব ও গভীরতা স্বীকার না ক'রলে চলেনা। তবে, সাহিত্যিক সূর্যকান্ত রায়ের বাড়ী যাওয়ার পর থেকেই নমিতাকে অনেকটা মানিয়ে নেওয়া হ'য়েছে এবং এর তিন-চারটি দৃশ্যের পর হ'তে নমিতা সম্পূর্ণরূপেই শুধ্‌রে গেছে। ভীতিকর কালোকোর্তার দর্শনে রমার মতো সাধারণ মেয়ের যে ভাবান্তর হওয়া স্বাভাবিক চিত্রে তা মোটেই ফুটে ওঠেনি। কিন্তু এখানে প্রশংসা করবো কাহিনীকারের—নমিতাকে কালোকোর্তার সাথে বাক্যালাপ ক'রতে দিয়ে একটি চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি ক'রেছেন ব'লে।

সূর্যরায় যখন অদৃষ্টের করাল নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নমিতাকে বিচ্ছেদের পাষাণব্যবধান হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে এলো তার নিকটে, তার বুকের উত্তাপের গণ্ডীমাঝে, তার দু'বাহুর নাগালে, তার হৃদয়ের রক্তিম অনুরাগের অতলে তখন তাদের দু'জনার মাঝে মুন্নির উপস্থিতি বিরক্তিকর। বস্তুতঃ, চিত্রকাহিনীর মাঝে মুন্নির গানে ও কথায় অস্পষ্ট ইসারায় যা জানিয়ে দেয়, সূর্য রায়ের প্রতি আশ্রিতা নারীর সেই নিগূঢ় আকর্ষণ দর্শকের মনে কোনো রোমাঞ্চ কোনো মাধুর্য বা কোনো সমবেদনা জাগায় না। বিরাট ব্যক্তিত্ব-শালী সূর্যরায়ের প্রতি বিশিষ্টা ব্যক্তিত্বশালিনী নমিতার হৃদয়ের রক্তকমল কোন্‌ প্রভাতের অরুণিমায় প্রথম প্রণতি জানাবে তারই অধীর প্রতীক্ষায় দর্শক যখন তৃষ্ণার্ত মুহূর্ত-গুলি আবেগে আবেশে রোমাঞ্চে শিহরণে কাটায়, তখন সহসা মুন্নির আবির্ভাব দর্শকের অনুভূতির নিবিড়তা

একেবারে ওলটপালট ক'রে দেয়। আর, মুন্নির অভিনয় আরো আলাকর। মুন্নিকে রূপায়িত ক'রেছেন সাবিত্রী।

অভিনয়ে সূর্যরায় অর্থাৎ কালোকোর্তার ভূমিকায় কমল মিত্র যে সুযোগ পেয়েছেন স্বীয় অভিনয় নৈপুণ্যে চরিত্রটী ফুটিয়ে তুলতে অক্ষমতার পরিচয় দেন নি—তিনি যেটুকু পারেননি তা তাঁর অভিনয়ের জন্য নয়, চরিত্রটীর অপরিস্ফুটনের জন্য।

রাত্রির আরেকটি প্রধান চরিত্র বিখ্যাত সখের গোয়েন্দা বিমল ঘোষ। ভূমিকাটি রূপায়িত ক'রেছেন সুবিখ্যাত শ্রীযুত জহর গাঙ্গুলী। এই জাতের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী একেবারেই অচল। তাই, এ চরিত্রটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখিনা। শুধু পরিচালককে একথাটি মনে রাখতে বলবো, অপরাধপ্রবণ দস্যু ও অপরাধ-বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা দুইয়েরই কর্মক্ষেত্রে প্রায় একই গুণের দরকার। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যে নির্ভীকতা, যে চিন্তাশীলতা, যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব একজন বিচক্ষণ দস্যুর থাকা দরকার ঠিক সেই সব গুণই একজন নিপুণ গোয়েন্দার থাকা প্রয়োজন। মিঃ চৌধুরীর শ্যালকরূপে ইন্দু মুখার্জী হাস্যরস সৃষ্টি করতে চেষ্টা ক'রে আমাদের হাস্যাস্পদ হ'য়েছেন। দোষটা শুধু তাঁরই নয়, ছবির কাহিনীতে হাস্যরস কোথাও দানা বেঁধে ওঠেনি। মিঃ চৌধুরীর ভূমিকায় অমর মল্লিক চলতি অভিনয় করেছেন। প্রাধান্য দেবার মতো কোনো বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। হীরালালের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখার্জী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। পান্নালালের ভূমিকায় শ্যামলাহা নিখুঁত অভিনয় করেছেন। কানু বন্দ্যোর রামনাথ বেশ প্রাণবন্ত হয়েছে। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার সিং একেবারে অচল। কালোকোর্তার মা'র ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জীকে সচল বলা চলে। মিসেস্ চৌধুরীর ভূমিকায় সুহাসিনীকে ভালোই ব'ল্‌বো। রমার ভূমিকায় অমিতা চরিত্রানুরূপ সুন্দর অভিনয় করেছেন। নর্তকীরূপে নীলিমা দাসকে বড়ো বিশেষণ কিছু দিতে পারবো না। ছবির সংগীতাংশ হ'য়েছে অনবদ্য। নমিতার গান দু'টির সুর ও কথা হ'য়েছে অপূর্ব। কথা ও সুরে গান দুটির সার্থকতা আমাদের কানে সত্যিই মাধুর্য ঢেলেছে। মুন্নির গানেরও প্রশংসা ক'রবো। অবশেষে পান্থশালার গান। মাছভাতের পরে দই মিষ্টি দেবার মতো পরিচালক সব শেষে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে অমর সংগীত আমাদের পরিবেশন করেছেন। সুরশিল্পী কালিপদ সেনকে ধন্যবাদ। তাঁর প্রতিভা আগামী দিনের বুকে স্বর্গীয় সংগীতের মোহ-মদিরা ঢেলে চলুক—এই কামনা করি। ছবির আলোকনিয়ন্ত্রণ নিন্দনীয়। চিত্রশিল্পেরও প্রশংসা ক'র্তে পারিনা, শব্দযন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোয়ালিটি ফিল্মস

এঁদের পরিবেশনায় ওরিয়েণ্টাল ফিল্মের দেশের দাবী মুক্তির দিন গুণছে। ছবিখানি ইতিপুর্বে 'নেতাজী জন্ম দিবস' উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কদের উপস্থিতিতে দেখানো হ'য়েছিল। এই বিশেষ প্রদর্শনীতে আমাদেরও উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল।

চিত্রখানি দর্শক সমাজের কাছে কিরূপ সমাদর পায় সেজন্য আমরা সমালোচনার জন্য অপেক্ষা করছি। 'দেশের দাবী' পরিচালনা করেছেন নৃত্যশিল্পী সমর ঘোষ। উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায় নায়কের চরিত্রটী রূপায়িত করেছেন। অপরাংশে জ্যোৎস্না গুপ্তা, সাবিত্রী, ভানু বন্দ্যো প্রভৃতি আরো অনেকে রয়েছেন। সাধন নামে একজন নবাগতকেও এই চিত্রের একটী বিশিষ্ট অংশে দেখা যাবে। কোয়ালিটি ফিল্মের কর্ণধার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মল্লিক বহুদিন চিত্রপরিবেশনা ক্ষেত্রে রয়েছেন। ইতিপূর্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক চিত্র প্রতিষ্ঠান 'টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফকস'-এর দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা শুনে খুশী হলাম যে, সম্প্রতি তিনি চিত্র প্রযোজনার সংগেও জড়িত হ'য়ে পড়ছেন।

নবগঠিত ওরিয়েণ্টাল পিকচার্স ও কসমোপলিটান প্রতিষ্ঠানের সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে তিনি চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'রূপান্তর' নামে একখানি সামাজিক চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত। দেবনারায়ণবাবু নাট্যকার হিসাবে ইতিপূর্বে বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন—সম্প্রতি 'রামপ্রসাদ' চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন। 'রূপান্তর' এর সংগীত পরিচালনা করবেন নবীন সুরকার পরেশ ধর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত এই সুরশিল্পীকে সুযোগ দিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের দুরদৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছেন। এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য বহু নূতনকে সুযোগ দেবেন বলে কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রূপ-মঞ্চের গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্তা অলকা দেবীকে কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের অনুমোদনে নিজস্ব স্থায়ী শিল্পীরূপে গ্রহণ করেছেন। অলকা দেবী রূপান্তরের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন। কালী চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুধা রায় বি, এ, (নবাগতা) তাছাড়া আরও বহু নবাগত ও নবাগতাদের ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হ'য়েছে। অভিনয়েচ্ছুক উপযুক্ত নূতনেরা রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মল্লিক, পি ১৩, ভূপেন বসু এ্যাভেন্যু, ফ্লাট নং ৩, কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন। আবেদন করবার সময় নিজেদের উপযুক্ততার কথা নূতনদের সব সময় মনে রাখতে বলি। কসমোপলিটান পিকচার্সের প্রযোজনায় একখানি পৌরাণিক জীবনী মূলক চিত্র গড়ে উঠবে। এই চিত্রখানিও সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালনা করবেন। চিত্রখানি সম্পর্কে বিস্তারীত বিবরণ পরে জানানো হবে।

পাইয়োনীয়ার পিকচার্স

পাইয়োনীয়ার পিকচার্সের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল আমাদের জানিয়েছেন, এঁদের দ্বিভাষী চিত্র চন্দ্রশেখরের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। অভিজ্ঞ দেবকী বসুর পরিচালনা দর্শকদের চোখে ঐন্দ্রজালের সৃষ্টি করবে বলে প্রকাশ। চন্দ্রশেখরের বিভিন্নাংশে দেখতে পাওয়া যাবে—অশোক কুমার, কানন দেবী, ভারতী এবং আরো অনেককে। আমরা চন্দ্রশেখরের জন্য অধৈর্য প্রতীক্ষায় আছি।

ছায়াবাণী

আমরা শুনে সুখী হলাম আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কবি রমেন চৌধুরী উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে দু'খানি ছবি তুলবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছেন। ছবি দু'খানির নাম যথাক্রমে 'শবরীর প্রতীক্ষা' ও 'সূর্য প্রণাম'। 'সূর্য প্রণাম' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় একটী নৃত্য-নাট্য। 'শবরীর প্রতীক্ষা' সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গল্প। চিত্র দু'খানির প্রযোজনা করছেন আসাম বেঙ্গল সাপ্লাইং এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমিয় বসু।

এ, এল, প্রডাকসন

এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র 'ঘরোয়া' রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত মণি ঘোষের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। ঘরোয়া'র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল। নায়কের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন নবাগত শিশির মিত্র। 'পূর্ব পরিষদে'র সংগে ইনি জড়িত ছিলেন—এঁর

অভিনয়ও আমরা দেখেছি। পৌরুষদীপ্ত চেহারা ও অভিনয় নৈপুণ্যে আশা করি শিশির বাবু প্রথম প্রকাশেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবেন। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন মলিনা দেবী। বাংগালী চিত্রামোদীদের কাছে যাঁর সম্পর্কে কিছু বলবার প্রয়োজন করে না।

'ঘরোয়া'র সংগীত পরিচালনা করছেন নবীন সুরকার কালোবরণ দাস। বেতার ও রেকর্ড জগতের শ্রোতারা কালোবরণের সংগীতের সংগে পরিচিত। 'ঘরোয়া'য় সংগীত গতানুগতিকতার গণ্ডি ভেংগে নূতন সুর মূর্চ্ছনার দর্শক সাধারণকে অভিভূত ক'রবে বলে প্রকাশ। এবং এজন্য শ্রীযুক্ত দাস যে কঠোর পরিশ্রম করছেন, তা ছবিটীর সংগীত গ্রহণের সময় উপস্থিত থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আশা করি শ্রীযুক্ত দাসের আন্তরিকতা দর্শক অভিনন্দনে সাথক হ'য়ে উঠবে।

এ, আর, প্রডাকসন

শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এঁদের প্রথম বাংলা বাণী চিত্র 'আমার দেশ'-এর চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হ'য়ে এসেছে। যুগোপযোগী যে সমস্যা ছবি খানিতে সমাবেশ করা হ'য়েছে তা যেমনি স্পষ্ট তেমনি তীক্ষ্ণ বলেই প্রকাশ। 'আমার দেশ'-এর সংগীত পরিচালনা ও শিল্প নির্দেশনা করছেন যথাক্রমে জটাধর পাইন ও শুভো মুখোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন জ্যোৎস্না গুপ্তা, পরেশ বন্দ্যো, পূর্ণিমা, বাণীব্রত, অলকা, বিজন বোস, সুশীল রায়, শিশুবালা, বেচু সিংহ, যূথিকা, আশু বোস, শেফালী, বঙ্কিম দত্ত, উমা চৌধুরী, ধীরেন পাত্র, হাজুবাবু, বাণীবাবু প্রভৃতি। লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স লিঃ এর পরিবেশনায় আমার দেশ পূজার পূর্বেই একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে বলে প্রকাশ।

মহাজাতি ফিল্ম কর্পোরেশন

এঁরা স্থির করেছেন প্রথমে একখানি অপরাধমূলক বাংলা বাণীচিত্র নির্মাণ করবেন। ছবিখানির নামকরণ হ'য়েছে

'তারপর'। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা ও সংগীত পরিচালনা করবেন সত্য ঘোষ। সাংবাদিক ও প্রচার শিল্পী নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান ব্যবস্থাপকের কাজ করছেন। কর্মসচিবরূপে কাজ করবেন সত্যেন মিত্র। 'তারপর'এর কয়েকখানি গান লিখেছেন সুধীন মিত্র।

হিন্দুস্থান ফিল্মস লিঃ

গত ৩০শে মে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'সংসার'এর মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

সান সাইন প্রডাকসন

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত নবগঠিত সান সাইন প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র 'কুহেলিকা'র গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিঃ

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সত্যেন সিংহের প্রযোজনায় এদের প্রথম বাংলা চিত্র 'সাহারা'র কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুনীল মজুমদার। 'সাহারা' তথাকথিত মন-দেয়া-নেয়া কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি—আমাদের সমাজ জীবনে যে বৈষম্য ও ব্যবধান আছে তা দূর করবার দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান কোন দুরন্ত তরুণের অভিনব অভিযানের কাহিনী নিয়েই 'সাহারা' গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সংবাদ জানবার জন্য তাঁর বহু গুণগ্রাহীর দল বার বার আমাদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। সাময়িক ভাবে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া তাঁর পরিচালিত চিত্রগুলির কাজ স্থগিত রেখেছিলেন বলে আমরা কোন সংবাদ জানাতে পারিনি। সম্প্রতি শুনলাম, তিনি উর্মিলা চিত্রপটের 'অগ্রগামী' এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর 'মায়াকানন' চিত্র দু'খানির কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। মায়াকাননের বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া, সাধন লাহিড়ী, কল্পনা, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোঃ (রেডিও-খ্যাত), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাত সিংহ, মণি ঘোষ (রেডিও-খ্যাত, রাজলক্ষ্মী বড়) প্রভৃতি।

সুধা প্রডাকসন

সাংবাদিক বন্ধু খগেন রায় নবগঠিত সুধা প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র 'ভাঙা দেউলে পূজারিণী'র পরিচালনা করবেন বলে প্রকাশ। 'ভাঙা দেউলে পূজারিণী'র কাহিনী রচনা করেছেন পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়। এই নব গঠিত প্রতিষ্ঠানটী শ্রীযুক্ত জহর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ও তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। চিত্রখানির সুর সংযোজনাও তিনিই করবেন।

চিত্রশিল্পী অভিনন্দিত

কিছুদিন পূর্বে উদয়ের পথে উপন্যাস-খ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়—তাঁর স্ত্রী খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনতা রায়কে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ তাঁদের দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে এঁদের দু'জনকে অভিনন্দিত করে এক মানপত্র দেওয়া হয়।

ছায়া ও কায়া লিঃ

চিত্র প্রদর্শনার পরিকল্পনা নিয়ে খুলনা সহরে উক্ত প্রতিষ্ঠানটী গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই এদের পরিচালনাধীনে দু'টী প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হ'য়েছে। চিত্র প্রদর্শনা ছাড়াও ভবিষ্যতে চিত্র ব্যবসায়ের বিভিন্ন পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছা এদের আছে। কয়েক জন উৎসাহী কর্মীর প্রচেষ্টায়ই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। এর ভিতর মিঃ এম, চ্যাটার্জী, সুশোভন দত্ত ও মিঃ এস, এম, কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটীর পরিচালকবর্গের ভিতর এরা ব্যতীত রয়েছেন—মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়—খ্যাতনামা চিত্র ব্যবসায়ী, প্রেমেন্দ্র মিত্র—সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক, এন, এন, বিষ্ণু—ব্যবসায়ী, সরোজ চ্যাটার্জী—ব্যবসায়ী, বি,সি, দত্ত—ব্যবসায়ী, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল—লাইসেন্স অফিসার কলিকাতা কর-পোরেশন। প্রতিষ্ঠানটির সংগে যে সব লোক যোগ দিয়েছেন তাতেই বলা যায় যে, এঁরা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ স্থান দখল করতে পারবেন।

পরলোকে দময়ন্তী সাহানী

বম্বের প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী শ্রীযুক্তা দময়ন্তী সাহানী গত ২১শে এপ্রিল সোমবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতে মারা গেছেন। ইতিপূর্বে রূপ-মঞ্চে মিসেস সাহানীর ছবি প্রকাশিত হ'য়েছিল, ইনি বম্বের পিপলস 'থিয়েটার'-এর সংগে জড়িত ছিলেন। এর স্বামী বলরাজ সাহানীও পিপলস থিয়েটারের একজন উৎসাহী কর্মী। ধাত্রীকা-লাল, দূর চলে, এক কদম, প্রভৃতি চিত্রে মিসেস সাহানী অভিনয় করেন। এবং 'দেওয়ার' নাটকে তাঁর অভিনয় বম্বে বাসীদের খুবই আকৃষ্ট করে। মিসেস সাহানী ভারতীয় চিত্র-জগতের একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করে অনেকদিন তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজে লিপ্ত ছিলেন। ওয়ার্ধা শিক্ষা পরি-কল্পনার সংগেও তিনি কিছুদিন জড়িত ছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভের দুই বছর মিসেস সাহানী তাঁর স্বামীর সংগে বি, বি, সির কাজে লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বামী ও দুইটী সন্তান রেখে গেছেন। আমরা মৃতার আত্মার শান্তি কামনা করি।

রূপ-মঞ্চ কর্মীর মাতৃ-বিয়োগ

আমাদের অন্যতম সহকর্মী শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্তের (বিণ্টু) মাতা শ্রীমতী মহামায়া দেবী গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সকাল ১১-৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫১ বৎসর হ'য়েছিল। ২৪ পরগণা জেলার হালিসহর নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সাবজজ স্বর্গতঃ ঘনশ্যাম গুপ্তের পুত্র পুলিশ ইনসপেকটর স্বর্গতঃ ক্ষিতীন্দ্র নাথ গুপ্ত এর স্বামী ছিলেন। এর পিতা স্বর্গতঃ চারু চন্দ্র গোস্বামী আসাম সেক্রেটারিয়েটএর সর্বপ্রথম ভারতীয় রেজিষ্টার ছিলেন। পিতৃ এবং শ্বশুর উভয়কুলই বংশ মর্যাদায় উল্লেখযোগ্য। এই মহীয়সী নারী গোপনে বহু দুস্থকে সাহায্য করতেন। একটী অবাঙালী পিতৃহীন বালককে প্রতি-পালন করে শিক্ষিত করে তোলেন—এরই দানে এই বালকটী পরবর্তীকালে এম, বি, পাশ করে চিকিৎসক হন। শেষ বয়সে পূজা পার্বণ ও দানধ্যানেই মত্ত ছিলেন। মৃত স্বামীর ফটো পূজা না করে কোনদিন জলস্পর্শ করতেন না। প্রৌঢ় বয়সেও নিজে হাতে রান্না করতেন। এবং আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের স্বহস্তে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। মৃত্যু-কালে একমাত্র পুত্র স্নেহেন্দ্র ও কন্যা কুমারী লীলাকে রেখে গেছেন।

স্নেহেন্দ্র গুপ্ত—রূপ-মঞ্চে ধারাবাহিক ভাবে যার সবাক ছায়াছবির তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে—রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাছে সাংবাদিকতা শিক্ষা করছেন। আমরা মৃতার আত্মার মংগল কামনা করি এবং আমাদের অন্যতম সহকর্মীর মাতৃ-বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

ভ্রম সংশোধন

সম্পাদকের দপ্তরে জনৈক পাঠকের প্রশ্নের উত্তর বলা হ'য়েছে সিপ্রা দেবী নামে কর্ণেল চ্যাটার্জির এক মেয়ে আছে। কিন্তু আমাদের এই সংবাদ ভুল। কর্ণেল চ্যাটার্জির যে মেয়ের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, তাঁর নাম প্রিয়া চ্যাটার্জি—কমল দাশগুপ্ত সুর সংযোজিত 'কদম কদম বাড়ায়ে' গানটী ইনিও গেয়েছেন। যে মেয়ের চিত্রে নামার কথা ছিল তাঁর নাম ঊষা চ্যাটার্জি ইনি নৃত্যে পারদর্শিণী।

কথাচিত্র লিঃ

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'পূর্বরাগ' রূপবাণী ও পূর্ণতে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরি-চালনা করেছেন 'সংগ্রাম'-খ্যাত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন বিপিন, কমল, দীপক, জীবেন, ইন্দু, প্রমীলা, বনানী, সুপ্রভা, মাস্টার শম্ভু, জহর রায়, অজিত, নরেশ বোস, শকুন্তলা প্রভৃতি। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আগামী সংখ্যায় 'পূর্বরাগের' সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স

এদের পরিবেশনায় 'ঝড়ের পরে' শ্রী, পূরবী, রূপম ও

চিত্রলেখায় একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'ঝড়ের পরে' গড়ে উঠেছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন জহর, ছায়া, জ্যোৎস্না, সন্তোষ, রবি রায় প্রভৃতি। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন সন্ধি-খ্যাত পরিচালক অপূর্ব মিত্র। আগামী সংখ্যায় সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

'ঝড়ের পরে'র একটী দৃশ্যে রবি রায় ও জ্যোৎস্না গুপ্তা

ভুলের ভুত

ভয় নেই, আপনাদের ঘাড়ে চাপবে না। প্রভু আমাদের ঘাড়েই চেপেছেন। গত সংখ্যায় রূপ-মঞ্চে শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের স্ত্রী যিনি 'প্রিয়তমায়' অভিনয় করছেন, তাঁর নাম আরতি মজুমদারের স্থলে ভুলবশতঃ 'অনিতা' মজুমদার মুদ্রিত হয়। এবার যে আর্ট প্লেট মুদ্রিত হ'য়েছে তাতে আমরা ঐ ভুল সম্পর্কে ইংগিত দিয়ে লিখে দি—আরতি মজুমদার—অনিতা মজুমদার নহে। কিন্তু সে ভুল ভুত হ'য়েই আবার আমাদের কমপোজিটারের দৌলতে মুদ্রিত হ'য়েছে। আশা করি এজন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন। শ্রীযুক্তা মজুমদারের নাম 'আরতি' অনিতা নয়।

প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী

এবৎসর দোল পূর্ণিমায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কীর্তি-বহুল রাজধানী খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলের ধূমঘাট, ঈশ্বরীপুর, গোপালপুরে যে বিরাটভাবে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী, প্রদর্শনী ও মহামেলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে ও এই মেলায় বাংলার রেডিও, ছায়াচিত্র ও মঞ্চ-শিল্পীগণ উন্মুক্ত আকাশতলে যে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ১লা জুন রবিবার, বৈকালে ও ২রা জুন সকালে কুমার বিশ্বনাথ রায় এম, এল, সি'র (রাজা পার্ক) ২৯ নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে রেডিও, ছায়াচিত্র ও মঞ্চ-শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী ও কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের উপস্থিতিতে একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বসু সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জয়ন্তীর অর্গানাইজার সুন্দরবন অঞ্চলের ব্রহ্মচারী ভোলানাথ আগামী দোল পূর্ণিমায় জয়ন্তী প্রদর্শনী ও মহামেলার পরিকল্পনাটী বিবৃত করেন। সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতির কীর্তিবহুল স্থানে আগামী জয়ন্তী ও মহামেলায় বাংলার রেডিও, ছায়াচিত্র ও মঞ্চ-শিল্পীগণ

নূতন ধরণের কি রকম "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন সে সম্বন্ধে প্রথিতযশা নাট্যকার ও সাংবাদিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীরবি রায় ও নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন।

ইহা স্থির হয় যে, উন্মুক্ত আকাশতলে অভিনয়ের উপযোগী নূতন ধরণের নাটক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচনা করবেন ও অধ্যাপক আচার্য শ্রীমন্মথমোহন বসু এ সম্বন্ধে নির্দেশাদি দেবেন এবং শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নাটকটীর প্রযোজনা ভার গ্রহণ করবেন।

এসম্বন্ধে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী বলেন যে, শীঘ্রই প্রোডাকসান কমিটির সদস্যের নাম ঘোষণা করা হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব তিনি, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের নাট্য বিভাগীয় সম্পাদক মহোদয়গণের সহিত এবং জয়ন্তীর ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রভৃতিকে সংগে নিয়ে প্রতাপাদিত্যের কীর্তিবহুল স্থানগুলি পরিদর্শন করে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয় করবার স্থান নির্বাচন করে আসবেন এবং তিনি ইহাও বলেন, এই নূতন ধরণের অভিনয়ে পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া আরও বহু অভিনয়েচ্ছুক শিক্ষিত রুচীবান এবং আদর্শবাদী (মেয়ে ও পুরুষ) শিল্পীর প্রয়োজন। যাঁহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁরা যেন শীঘ্রই রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, (ফোন বি. বি. ৪১৯২) ৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতায় পত্র ব্যবহার করেন। নটসূর্য সর্বসমক্ষে ইহাও ঘোষণা করেন যে, প্রতাপাদিত্যের কীর্তিবহুল রাজধানীতে উন্মুক্ত আকাশতলে নূতন ধরণে প্রতাপাদিত্য অভিনয়ের পর কলিকাতার উত্তরাংশে ও দক্ষিণাংশে দুইটী পার্কে নূতন ধরণে প্রতাপাদিত্য অভিনয় করে দেশবাসীকে দেখান হবে। আর প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী ফাণ্ডে বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য, কলিকাতার চারিটী থিয়েটারের শিল্পীদের সহিত রেডিও ও ছায়াচিত্র শিল্পীদের নিয়ে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত প্রতাপাদিত্য নাটকটী কোনও একটী প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ রজনী উপলক্ষে মঞ্চস্থ করবার ভারও নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী গ্রহণ করছেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রস্তাবমতে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুকে প্রেসিডেণ্ট ও কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিককে সদস্য এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে সেক্রেটারী করে একটী "প্রতাপাদিত্য রিসার্চ কমিটি" করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটির সদস্যদের নাম পরে জানানো হবে।

আগামী দোল পূর্ণিমায় যে সুন্দরবন প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী, প্রদর্শনী ও মহামেলার পরিকল্পনা করা হল সেই পরিকল্পনাটিকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুকে প্রেসিডেণ্ট; খুলনার শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট; বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমাখনলাল সেন (ভারত), শ্রীসজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ), শ্রীবসন্তলাল চট্টোপাধ্যায় (দীপালী), শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরাগ), শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (নকীপুর), শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ কুমার জয়ন্তনাথ রায়, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র নস্কর এম, এল, এ, শ্রীপতিরাম রায় এম এল, সি, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম, এল, এ, নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায় এম, এল, সি, ভারতাচার্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রভৃতিকে সদস্য, অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে জেনারেল সেক্রেটারী, সাতক্ষীরা মহকুমার বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীঅরবিন্দ সর্দারকে ট্রেজারার এবং জয়ন্তীর অর্গানাইজার সুন্দরবন বিখ্যাত ব্রহ্মচারী ভোলানাথকে জয়েণ্ট সেক্রেটারী করে একটী শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ও গঠিত অন্যান্য সাব কমিটির পূর্ণ বিবরণ জানানো হবে।

পরিশেষে কুমার বিশ্বনাথ রায় সমাগত সকলকে পরিতৃপ্ত সহকারে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।
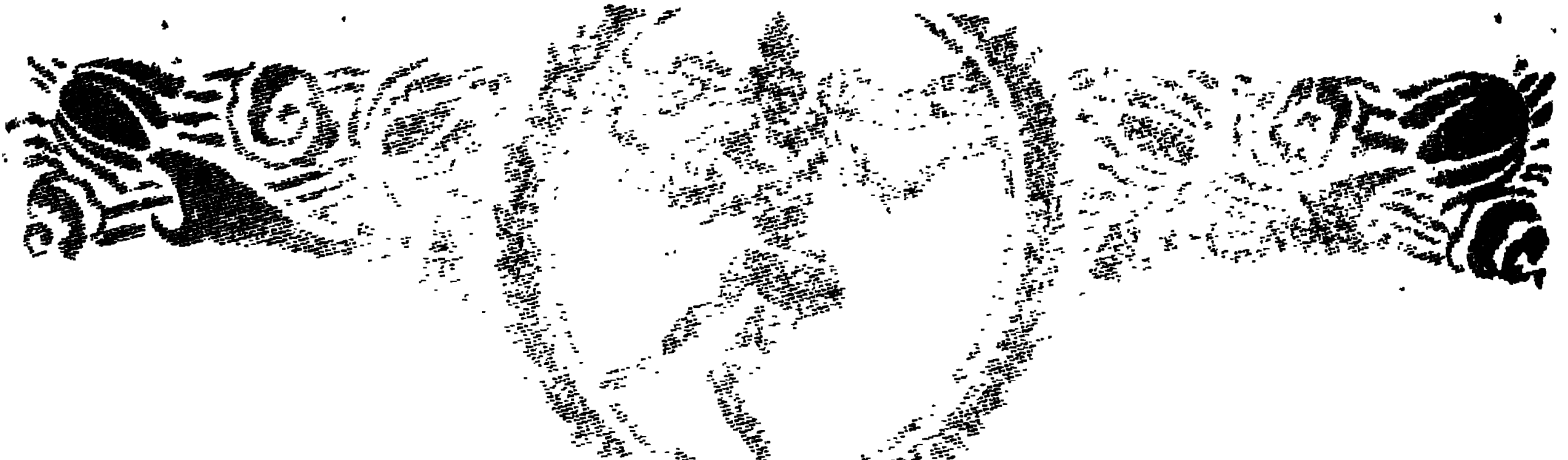
আশ্বিন - কার্তিক ঃঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃঃ ৮-ম সংখ্যা

পরলোকে অনাদিনাথ বসু

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বেলা ১৪-৩০ ঘটিকায় বাংলা চিত্রশিল্পের অগ্রণী অনাদি নাথ বসু মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ১৯০৬ সালে তিনি অরোরা সিনেমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে কয়েকখানি খণ্ডচিত্র নির্মাণ করে ১৯২১ সালে বাংলা দেশের প্রথম বাংলা বড় ছবি "রত্নাকর" নির্মাণে প্রবৃত্ত হন, যদিও সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয় অপরের তোলা অন্য আর একখানি ছবি। ১৯২৯ সালে তিনি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৪৫ সালে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন 'লিমিটেড' হয়, এবং তিনি হন তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৩০ সালে তিনি বড়ুয়া পিকচার্স লিমিটেড ক্রয় করে ১৯৩৬ সালে নিজস্ব ষ্টুডিও নির্মাণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মাদ্রাজে একটি শাখা অফিস খোলেন। ১৯৩৭ সালে মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন প্রথম স্থাপিত হয় এবং তিনি হন তার প্রথম সভাপতি। তাঁর ন্যায় সদালাপী মিষ্টভাষী এবং মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বাংলার চিত্রজগতে খুব কমই আছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে বাংলার চিত্রশিল্পের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং পত্নীকে রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বন্দেমাতরম

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে ১১৭৬ সালে বিপদ শঙ্কুল অরণ্যে নিপীড়িত মানবাত্মার রক্ষাকল্পে ঋষি বঙ্কিমের মাতৃ-সেবার বীর সৈনিকদল 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে সংঘ-বদ্ধ হ'য়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অত্যা-চারী শাসকদের কবল থেকে নিপীড়িতদের রক্ষা করাই ছিল সন্তানধর্মের মূলমন্ত্র। বৈদেশিক সরকারের কবল থেকে দেশ-মাতৃকার উদ্ধার কল্পে মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিকদল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে হাসি মুখে ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পবিত্র বাণীতে উদ্বুদ্ধ— চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'বন্দেমাতরম' মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে শত সহস্র দর্শকের অন্তরে প্রেরণা জাগিয়েছে। আরো শত সহস্রের জন্য তার অম্লান অভিযান অপ্রতিহত। বহু সুধীজন ও সংবাদ-পত্রের অভিনন্দন লাভ করে প্রত্যহ **মিনার-ছবিঘর ও বিজলীতে প্রদর্শিত হচ্ছে সুধীরবন্ধু পরিচালিত বন্দেমাতরম।**
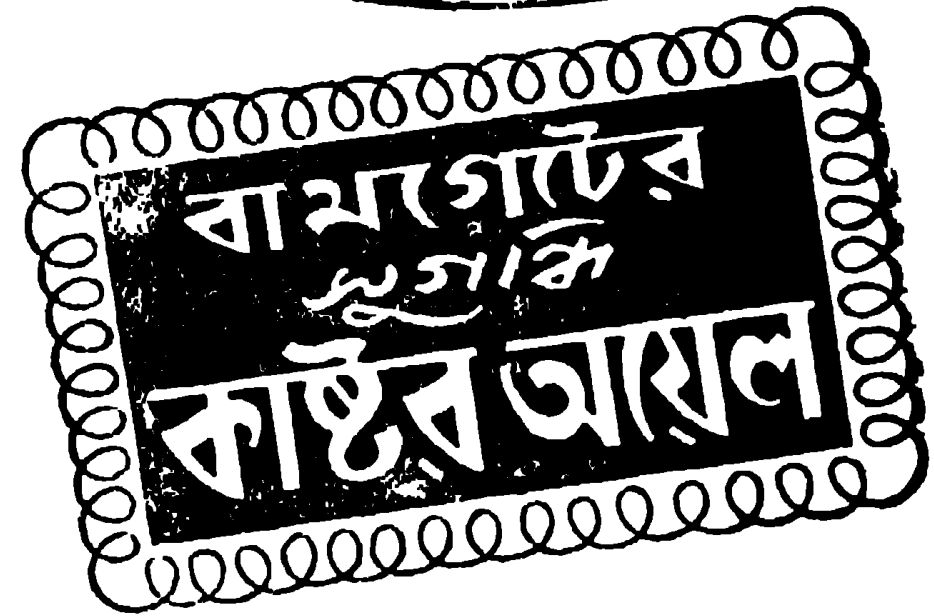
রাশিয়ার ব্যালেট প্রসংগে

কালীশ মুখোপাধ্যায়

★

অংগভংগী, সংগীত এবং নৃত্যের ভিতর দিয়ে কাহিনী বা ঘটনাকে রূপ দেবার পদ্ধতিকেই সাধারণতঃ ব্যালেট (Ballet) বলা হয়। ইউরোপে বহু পূর্বে থেকেই ব্যালেটের প্রচলন খুঁজে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি বলতে গেলে গ্রীস এবং রোমে। সংগীত এবং সংলাপের ভিতর দিয়ে আধুনিক ব্যালেটের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায় ফ্রান্স এবং ইতালী তার প্রথম জন্মদাতা বলে গৌরব করতে পারে। ফ্রান্স এবং ইতালী থেকে ইংল্যাণ্ডে ব্যালেটের আগমন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে ব্যালেট ছিল না বললে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হবে না। রাজ-দরবার বা সম্ভ্রান্ত ধনীদের বাড়ীতে ব্যালেট অনুষ্ঠানের সংবাদ ইউরোপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেও আমরা পাই। অবশ্য তার রূপ বর্তমান ব্যালেটের চেয়ে পৃথকই ছিল। তারপর ব্যালেটের ইতিহাস ঘাটতে বসে জীন জর্জেস নোভারীর (Jean Georges Noverre) নাম পাওয়া যায় ১৭২৭-১৮০ খৃঃ। নোভারী সর্বপ্রথম ব্যালেটকে এক পৃথক শিল্পের গোষ্ঠীতে উন্নিত করেন। নোভারীর পূর্ব পর্যন্ত ব্যালেটের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র রূপ ছিল না বল্লেই চলে। তিনিই প্রথম ব্যালেটের নিয়ম কানুন শৃঙ্খলানুযায়ী বেঁধে দেন। সচ্ছল গতি যাতে অভিব্যাক্তিপূর্ণ হয় তার ওপর জোর দেন। তিনিই ব্যালেটকে সংমিশ্রিত করেন। পোষাক পরিচ্ছদ এবং সংগীতের সাহায্য নিয়ে বহু ব্যালেট তৈরী করেন। ফরাসী বিপ্লবে ব্যালেট ইউরোপ থেকে অন্তর্ধান হ'য়ে যায়। যদিও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অপেরা হাউস যে না ছিল তা নয়, কিন্তু ব্যালেট দিন দিন তার সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। বলতে গেলে একমাত্র রাশিয়াতেই প্রাচীন ব্যালেট যত্নসহকারে রক্ষিত ছিল। রাশিয়ার ব্যালেটের মূলে মাইকেল ফকিনের (Michael Fokine) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ক্লাসিক্যাল ব্যালেটের নূতন রূপ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁকে আধুনিক ব্যালেটের আবিষ্কারক বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁরই সৃজনী প্রতিভার জন্য আধুনিক ব্যালেটের জন্ম থেকে আজ অবধি একটা সূত্র পাওয়া যায়। তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল টেকনিকের দিকে লক্ষ্য দিলেই চলবে না—সমস্ত বিষয়টীকে সুষ্ঠুরূপে ফুটিয়ে তুলতে হলে সজীবতার আশ্রয়ও গ্রহণ করতে হবে। "Animination and spirit were essential to complete harmony". তিনিই প্রথম বল্লেন, "কেবলমাত্র প্রধান শিল্পীর দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে না—ব্যালেটগঠনের মূলে যেসব অপ্রধান শিল্পী থাকেন, তাঁদের দিকেও পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রধান শিল্পীর যত নৈপুণ্যই থাক না কেন—অনেকসময় পার্শ্ব শিল্পীদের অযোগ্যতায় সমস্ত সৃষ্টিই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হ'য়ে যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসাডোরা ডানকান (Isadora Duncan) (১৮৭৮—১৯২৭) নূতন ধরণের নৃত্যের প্রবর্তন করেন। তাঁর নৃত্য খুব সহজ এবং সাবলীল মনে হ'তো—অবশ্য তা কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সাধ্য ছিল।

ফকিন তাঁর পদ্ধতির ভয়ানক ভক্ত হ'য়ে পড়েন।
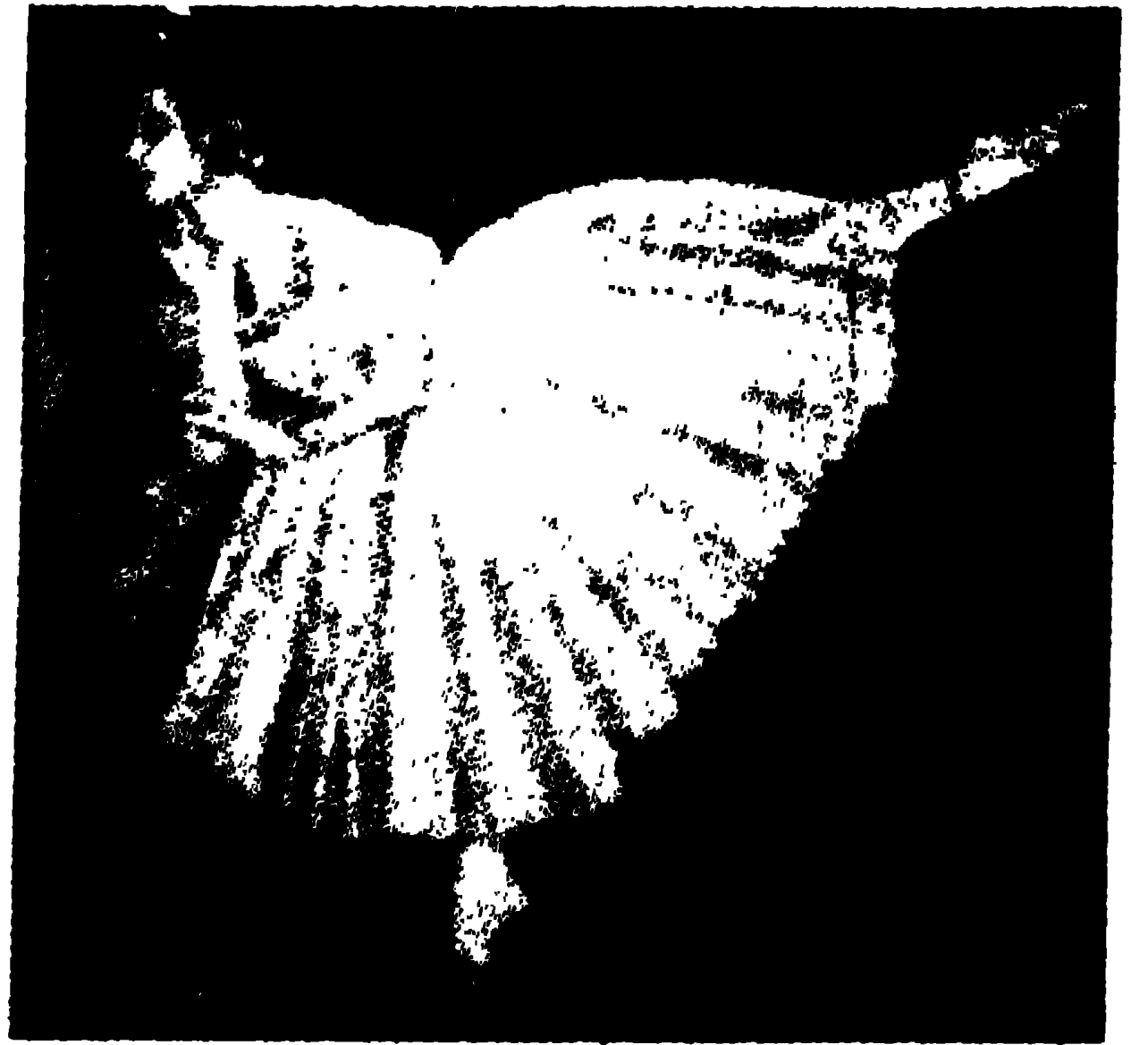
একটী বিশেষ ভংগীমায় এ্যানাপ্যাভলোভা

যদিও তিনি প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন নি—তবু ডানকানের পদ্ধতির অনেকখানি অনুকরণ করেছিলেন। উঁচু 'প্যাড' দেওয়া জুতোর পরিবর্তে ডানকান খালি পায়েই নৃত্য করতেন। পোষাক এবং সংগীতের সুরেরও কিছুটা পরিবর্তন করেন—ফকিন অনেকাংশে তাঁকে অনুসরণ করেন। ফকিন রাশিয়ার লোকনৃত্যও ব্যালেটে প্রবর্তন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাইরের জগত রাশিয়ার ব্যালেট সম্পর্কে ততটা কিছু জানতে পারেনি। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ম্যারিয়েনস্কী থিয়েটার (Mariensky Theatre) থেকে একদল শিল্পী সার্জ ডাইঘিলেফ্ (Serge Diaghileff) (১৮৭২-১৯২৯) —এর অধিনায়কত্বে প্যারিস ভ্রমণে যান। সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীও তাঁরা পরিভ্রমণ করেন। রাশিয়ার শিল্পের ইতিহাসে যুবক নেতাদের অন্যতম ছিলেন ডাইঘিলেফ্। তাই ব্যালেটের উন্নতির মূলে ডাইঘিলেফ্-এর প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা চলে না কোন মতেই। এর পূর্বে নৃত্য-শিল্পী কেবল সংগীতের তাল ও লয়কেই অনুসরণ করতেন। কিন্তু ডাইঘিলেফ্ ফকিনের পদ্ধতির প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ফকিনের পদ্ধতিকেও তিনি কিছুটা সংস্কার করে নেন। তাঁর মতে শিল্পীকে প্রথম সংগীত শিক্ষা করতে হবে—তারপর তার বিশ্লেষণ দক্ষতাও আয়ত্ব করতে হবে। "The technique became more and more a means to an end" তাল ও লয়ের সংগে আত্মার বিকাশের দিকেও তিনি তীব্র দৃষ্টি দিতেন। "Acting and mind could no longer exist as things apart, music had to be the inspiration and action and music bound up together." পায়ের পাতাই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করবার রইলো না—শিল্পীর সমস্ত দেহ এবং মুখাবয়বে ব্যঞ্জনার বিকাশই ছিল সর্বে সর্বা। সংগীত—পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অভিব্যক্তি নৃত্যের বিভিন্ন অংগের সমান অংশীদাররূপে পরিগণিত হ'লো। ডাইঘিলেফ্-এর অন্যতম প্রধান দক্ষতা ছিল—পৃথিবীর

দাঁড়িয়ে বাঁ দিক থেকে : জে, মস্কভিন, এফ্ চ্যাপলিন, এল, সোবিন ভি কা চালোভ, বসে : স্টানিস্লাভস্কি। পেছনে প্যাভলোভার প্রতিকৃতি।

মস্কোর গ্রণ্ডি অপেরায় অভিনীত একটী ব্যালেটের দৃশ্য

অন্যান্য শিল্পীদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রতিভার সংস্পর্শে এসে তাঁদের সাহায্য এবং সহযোগীতা লাভ করা। এঁদের ভিতর বাক্সট (Bakst), পিকাসো (Picasso), বিনোইচ (Benois), দেরেইন (Derain), রোইরিক (Roerich), র‍্যাভেল (Ravel), দিবুসি (Debussy) রিচার্ড স্ট্রাস (Richard Strauss), পোউলেন্‌ক্‌ (Poulenc), গ্লাজুনোভ (Glazunov), প্রভৃতির কথা এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবং এঁদের সকলের ওপরে ছিলেন স্ট্রাভিনস্কী (Stravinski) এবং চাইকোভস্কী (Tchaikovski)। চাইকোভস্কি ব্যালেটের জন্য বিশেষভাবে সংগীত রচনায় সর্বপ্রথম বলে দাবী করতে পারেন, যদিও তখন অবধি তা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প বলে পরিগণিত হ'তো। কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন, অন্য কোন শিল্প থেকে ব্যালেট নিম্নশ্রেণীর শিল্প নয়। এবং ব্যালেটের জন্য সংগীত রচনার প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ছিলেন। এবং এর ক্ষেত্রও ছিল বিস্তীর্ণ। রাশিয়ার ব্যালেটে বহু লোকনৃত্য সংযোজিত হ'য়েছিল। রাশিয়ার জাতির বিভিন্নতার দরুণ—তাদের জাতীয় লোকনৃত্যেরও বিভিন্নতা ছিল। জাতীয় লোকনৃত্যের রূপ দিতে হ'লে তার উৎপত্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছিলেন। কারণ, প্রত্যেক লোক-নৃত্যেরই বিশেষ ধরণ আছে। বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্যের সংগে তার লোকনৃত্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। দেশের মাটি, জল, আবহাওয়া, অধিবাসীদের পেশা, অভ্যাস, জীবনযাত্রা এবং এমন কী চলন পদ্ধতির সংগেও তার লোকনৃত্যের যোগ রয়েছে। "Gaits of different nationalities retain their different characteristics from which their way of living may be recognised." যেমন মনে করুণ, কৃষি-প্রধান দেশের অধিবাসীরা বড় বড় পা ফেলে চলেন এবং তাঁদের সমস্ত দেহটাই সঞ্চালিত হয়। পর্ব্বত-বাসীরা আবার তাঁদের পায়ের পাতাতেই বেশী ভর দিয়ে চলেন। শুধু অধিবাসীদের চলনই নয়—যদি তাঁদের জাতীয় নৃত্যগুলিও আমরা লক্ষ্য করি, পরস্পরের

পার্থক্যও বুঝতে পারবো। যদি কসাক এবং ইউক্রেনবাসীর নাচের সংগে তুলনা করি আমরা দেখতে পাবো, প্রথমোক্ত দল পায়ের পাতার পর ভর দেন—শেষোক্ত দল আবার জোর দেন দেহটার ওপর। বিভিন্ন জাতির ধাত আলাদা এবং তা' নাচের ভিতর দিয়ে রূপ পেয়ে থাকে অনেকাংশে। একথা ঠিকই লোক নৃত্যকে যখন মঞ্চে স্থান দেওয়া হয় তখন তার স্বাভাবিক রূপের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার সংগে নাট্যশিল্পের খানিকটা মিশ্রণও অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য বৈশিষ্ট্যগুলি যথাসাধ্য বজায় রাখা হয়। রাশিয়ার ব্যালেটের অন্যতম নৃত্যশিল্পী ছিলেন ভ্যাসলাভ নিজিনস্কী (Va lav Nizinski)। তিনি এবং এ্যানা প্যাভলোভা (Anna Pavlova) নৃত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মানে ভূষিত আছেন। নিজিনস্কীর টেকনিকই যে শুধু বিশেষ ধরণের ছিল তাই নয়, তিনি শিল্পীও ছিলেন খুব উঁচু ধরণের। যখন তিনি নাচতেন, মনে হ'তো তিনি মাটি স্পর্শ করছেন না—যেন শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছেন। "His elevation, his ability to leap into the air was prodigious." এজন্য তার একটুও পরিশ্রম হ'তো না। তিনি যেন পাখীর মত সাবলীল ভাবে উড়ে বেড়াতেন। তাঁর নৃত্যে অপূর্ব ব্যাঞ্জনা এবং আভিজাত্য এমনিভাবে ফুটে উঠতো যে, তাঁর দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হ'য়ে যেতেন। এ্যানা প্যাভলোভা পুরোণ ব্যালেটকে নিখুঁত রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশভংগী এবং ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের ভিতর তামারা (Tamara), কারসাভিনা (Karsavina), ফকিনা (Fokina) দানিলোভা (Danilova), নিকিটনা (Nikitina), চেরনিসেভা (Tchernisheva) নেমচিনোভা (Nemchinova), ক্রুজের (Kruger), ফকিন (Fokin), দোলিন (Doline), ম্যাসিন (Massine), বোলেম (Bolem), ওজিকোভস্কি (Wozikovski), ইডজিডোভস্কি (Idzidovski), লিফার (Lifar), মেছারার (Messrer) এবং আরো অনেকের নাম করা যেতে পারে।

'স্লিপিং প্রিনসেস'-এ ভেরা নেমচিনোভা

রাশিয়ার ব্যালেটের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে—। ব্যালেটের বিভিন্ন খুঁটি নাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পৃথকভাবে তাই একটি বই হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই সে বিস্তারীতে না যেয়ে রাশিয়ার ব্যালেটের কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা করে আমার বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।

'চেহারা-কাদে' লিউবোভ্ চেরনিচেভা

সার্জ প্যাভলোভিচ ডাইঘিলেফ্ ১৮৭২ খৃঃ পার্ম-এ (Perm) জন্মগ্রহণ করেন। সুরকার হবার আকাঙ্খা বহুদিন থেকেই তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে। তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে আইন অধ্যয়ন করবার জন্য আগমন করেন। প্রথম প্রথম ব্যালেটের প্রতি তাঁর ততটা আগ্রহ দেখা যায় নি। বরং তদানীন্তন অনেক ব্যালেটের প্রদর্শনী দেখে তার অস্বাভাবিকতায় তিনি ব্যথিতই হ'তেন। বেনোইস (Benois), নাউয়েল (Nouel) প্রভৃতি ডাইঘিলেফ্-এর আরো কয়েকজন বন্ধু ব্যালেটের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করবার মূলে রয়েছেন। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের পরিচালক প্রিন্স সার্জ উলকোনস্কি ডাইঘিলেফ্‌কে উক্ত থিয়েটারের পরিচালক পদের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ডাইঘিলেফ্ ইতিপূর্বে 'The world of Art' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন—এই পত্রিকার নির্ভীক সমালোচনা এবং তারপর থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে তিনি বহু শত্রু তৈরী করেন। এমন কি ডোলবেসের 'Sylvia' প্রযোজনার দায়িত্ব যখন সম্পূর্ণ ভাবে ডাইঘিলেফ্ এর ওপর ন্যস্ত করা হয় তখন – সকলে একসংগে একরকম বিদ্রোহ করেই বসে ছিলেন। ডাইঘিলেফ্‌কে অপসারিত হ'তে হয়—উলকোনস্কিও প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। এরপর ডাইঘিলেফ্ বিভিন্ন প্রদর্শনীর কৃতকার্যতার সংগে প্রযোজনা করেন। এরপর নানান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ১৯০৯ খৃঃ তিনি একটি দল গঠন করে প্যারিস ভ্রমণে বের হন। সমসাময়িক প্রত্যেকটি বড় বড় শিল্পীর সংস্পর্শেই ডাইঘিলেফ্ এসেছেন। ১৯২৯ খৃঃ ভেনিসে ডাইঘিলিয়েফ্-এর মৃত্যু হয়।

এ্যানো প্যাভলোভা (Anna Pavlova) ১৮৮২ খৃঃ ৩১ জানুয়ারী সেণ্ট পিটার্সবার্গে এ্যানা প্যাভলোভার জন্ম হয়। জন্মের প্রথম দিন থেকেই এ্যানা এতই ক্ষীণজীবি ছিল যে, আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর জীবনের আশা এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। তারপর হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তাঁকে সহরের বাইরে লিগোভোতে (Ligovo) নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিনকার সেই ক্ষীণজীবি বালিকা পরবর্তী কালে একজন খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যশিল্পীরূপে পরিচিতা হ'য়ে ওঠেন। ১৯০৫ খৃঃ এ্যানা কেকেটি (Cecchetti)-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বহুদিন ধরে Cecchetti এ্যানার শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ প্যাভলোভা পরিভ্রমণে বের হন এবং সর্বপ্রথম Riga-য় পদার্পণ করেন। ঐ বৎসরই স্কানডিনেভিয়া এবং জার্মানীও পরিভ্রমণ করেন। প্যাভলোভার ব্যালেটের ভিতর The Dragon fly, The Californian Pup-

মস্কো বলসই থিয়েটার অফ অপেরা এ্যাণ্ড ব্যালেট

py, Autumn Leanes, The dying swan, প্রভৃতি আরো বহু ব্যালেটের ভিতর প্যাভলোভা অমর হ'য়ে আছেন।

আলেকজান্দ্রা ডানিলোভা (Alexandra Danilova) আলেকজান্দ্রা ডানিলোভাও একজন খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী। ১৯২৭ খৃঃ ইনি জর্জে'স ব্যালান চাইনের (Georges Balanchine) সংগে লণ্ডনে আসেন। ঐ বৎসরই তিনি ডাইঘিলেফ্ ব্যালেট সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন। The swan lake, Le Peau Dunube, La Boutique. Fantasque; The Good humoured Ladies প্রভৃতি ব্যালেটে তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

ইরিণা ব্যারোনোভা (Irina Faronova) এঁর পিতামাতা রুশ বিপ্লবের সময় রুমানিয়ায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। নয় বৎসর বয়সের সময় প্যারিসে শিক্ষা গ্রহণে আসেন। বারো বৎসর বয়সের সময় তিনি ব্যালেটে আত্মপ্রকাশ করেন। Les Sylphides, Les Presages, Le Eean Danbel, Le coqd' Or, প্রভৃতি ব্যালেটে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

তামারা তৌমানোভা (Tamara Toumanova) রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়াতে এর জন্ম হয়। এর পিতামাতা সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে সাংহাইতে এসে বসবাস করতে থাকেন। সাত বছর বয়সের সময় তামারা প্যারিসে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। নয় বছর বয়সে প্যরিসে 'Opera'তে অতিথি শিল্পীরূপে যোগদান করেন। Concurrence, Cotillon, Jeuxd' Enfants, Aurora's Wedding. The Three cornered Hat প্রভৃতি ব্যালেটে তামারা স্বীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থা হন।

তাতিয়ানা রিয়াবৌ চিনস্কা (Tatiana Riabou chinska). তাতিয়ানার মা একজন প্রখ্যাতনামা নৃত্য-শিল্পী ছিলেন। তিনি প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩২ খৃঃ Basil সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। Carnaval, Les Presages. Jeuxd' Enfants প্রভৃতি ব্যালটে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হ'য়েছেন।

আলিসিয়া মারকোভা (Alicia Markova) ১৯২৫ খৃঃ তিনি ডাইঘিলেফ্ ব্যালেট সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর The Swan Lake, the Nightingle, the Cat, the Blue Bird প্রভৃতি নৃত্যে তাঁর দক্ষতা ফুটে ওঠে।

ভরতনাট্যম

প্রহ্লাদ দাস (কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ)

●

পাঞ্জাবের ভরতনাট্যমই ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে অতি পুরাতন নৃত্য। এই নৃত্যের স্থান ছিল দেব মন্দিরে—শিল্পীরা দেবদাসী নামে অভিহিত ছিল। এই নাচের বিশেষ কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না—আদি যুগে দেবদাসীরা নাচত, গাইত দেবতার পায়ে বিলিয়ে দিত নিজেদের। বহু বছর পূর্বে তাঞ্জোরের মহারাজা শিবাজীর রাজত্বকালে—চার ভাই যথাক্রমে—লেখক—গায়ক, বাদক ও নৃত্য শিক্ষকরূপে মহারাজের রাজ সভায় নিযুক্ত ছিলেন।

লেখক রচনা করতেন গান, গায়ক করতেন সুর সংযোজনা, আর নৃত্য শিক্ষক শেখাতেন নাচ। নিয়মিত দেবদাসী থাকৃত যারা মন্দিরে—তাদের এইভাবে নিত্য নূতন গান ও নাচ শিখিয়ে নেওয়া হতো আরতির সময় নাচবার জন্য। এই সকল দেবদাসীদের চির কুমারী থাকতে হতো ও দেবতাকেই জানত তারা স্বামীরূপে—দেবতার মনস্তুষ্টিই ছিল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন যেতে লাগল,—এলো দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া। দেবদাসীদের নৃত্যের স্থান হলো তখন মন্দিরের পরিবর্তে রাজা মহারাজাদের বিলাস কক্ষে, দেবতার মনস্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের মনস্তুষ্টি। এই সকল সম্প্রদায় তখন এমন নিম্নস্তরে নেমে এলো যে, তাদের স্থান হলো তখন সমাজের বাইরে—শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের নাচ শেখাত দূরের কথা—নাচ দেখাতেও ছিল অভিভাবকদের অমত। প্রায় ১৫।১৬ বছর হলো—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত শিল্পী উদয়শঙ্করের চেষ্টায় মৃতপ্রায় নৃত্যকলার আবার পুনর্জীবন ফিরে এসেছে—আজ আবার ঘরে ঘরে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরাও নাচ শিখতে আরম্ভ করেছে। এইবার দেখা যাক ভরতনাট্যম নাচের বিশেষত্ব কী?

ভরতনাট্যম নাচের উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর-

শ্রীমতী বালা সরস্বতী

জেলা হতে—এ ছাড়াও বেজওয়াদার নিকটে কুচীপুরীতে ভরত নাট্যম নামে একপ্রকার নাচ আছে—কিন্তু সে নাচ ততটা প্রসিদ্ধ নয়—যতটা প্রসিদ্ধ তাঞ্জোরের ভরত নাট্যম। এই নাচ শুধু মেয়েদেরই জন্য। এই নাচে লাস্যের অংশই বেশী—তাণ্ডবের ভাব খুবই কম। ভরত নাট্যম নাচ প্রধানত সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—আলা রিপ্পু (বন্দনা), যতিসরম্, সপ্তম, বর্ণম, পদম্, তিলানা, অভিনয়ম্।

আলা রিপ্পু—প্রথমে শিল্পী ভূমি দেবীকে তার বুকে পদবিক্ষেপ করবার পূর্বে নমস্কার করে। তারপর শিল্পী প্রথমে মস্তক, ভ্রূ, চোখ, গ্রীবা, স্কন্ধ এবং সর্বশেষে পদদ্বয় সঞ্চালন করে এবং সমস্ত অংগ প্রত্যংগ দিয়ে প্রণতি জানায়। এই অংশে পায়ের কাজ খুব কম। এই নাচ সাধারণতঃ তিন মাত্রার তালের সংগেই করা হয়। কেউ কেউ বা সাত মাত্রার সংগেও করে থাকে।

যতিসরম্ নানারকম—সরলিপির সংগে এই নাচ করা হয়।

সপ্তম, বর্ণম্ ও পদম্ বেশীর ভাগই গান ও মাঝে মাঝে সরলিপিও থাকে।

তিলানা—এই নাচে পায়ের কাজ খুব বেশী এবং খুব দ্রুত লয়ের সংগেই সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

অভিনয়ম্—নানারকম তামিল, তেলেগু—অথবা সংস্কৃত শ্লোক বা গানের সংগে গানের অর্থানুযায়ী অংগভংগী এবং অভিব্যক্তি, পায়ের কাজ খুবই কম।

দক্ষিণ ভারতে তালকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা:—তিস্র, চতুস্র, মিশ্র, খণ্ডম, ও সংকীর্ণ জাতি তাল।

তিস্র—৩ মাত্রা, চতুস্র—৪ মাত্রা, মিশ্র—৭ মাত্রা, সংকীর্ণ ৯ মাত্রার তাল। যেকোন তালকে এই পাঁচ জাতিতে পরিণত করা যায়। বিভিন্ন তালের নাম, যথা:—ত্রিপুটা, ঝম্প, রূপক, মাটি, আডা ইত্যাদি। ভরতনাট্যম নাচে আদি তাল বেশী ব্যবহার করা হয়। চতুস্র জাতি ত্রিপুটার নাম—আদি তাল।

ভরতনাট্যম নাচের আনুসংগিক যন্ত্র সংগীতের মধ্যে বেহালা, বীণা, নাগস্বরম, ঢোল ও মাদলই প্রধান। গুরু মুখে বোল বলেন এবং গান করেন—হাতে মন্দিরা বাজিয়ে-নৃত্য শিল্পীর পায়ের কাজের সংগে মিলিয়ে। এইসকল গুরুদেব বিদ্বান অথবা নাট্যকার বলে। এই সকল গুরুদেব মধ্যে—গুরু মিনাক্ষী সুন্দরম পিল্লাই, ৺কন্দর্প পিল্লাই (বালা সরস্বতীর গুরু), গুরু রামচন্দ্র পিল্লাই—আলাপ্পা মুদালিয়র রামাইয়া পিল্লাই, চোক লিংগম, এদের নাম বিখ্যাত। নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে বালা সরস্বতী, রুক্মিণী দেবী, রাধা, শান্তা জয়লক্ষ্মী, লক্ষ্মীশান্তা (উদয় শঙ্করের ভ্রাতৃবধু) শুভলক্ষ্মী, যোগম, মংগলম এবং ছেলেদের মধ্যে একমাত্র রামগোপাল। এই নাচ অতি কষ্টসাধ্য। প্রথমত দাঁড়াবার ভংগী এবং প্রায় চল্লিশটী ষ্টেপ অভ্যাস করার পর আলা রিপু আরম্ভ করা হয়। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে তিন চার বছরের কম সমস্ত নাচগুলি অর্জিত করা কঠিন। যাক, এখন একটী ভরত নাট্যমের প্রসিদ্ধ গান—যে গানটী শিব নৃত্য নামে অভিহিত—তার উল্লেখ করছি।

নটনম্ আডিনার্ বেণুনাসারিকা মাগাবে
কনক সাভাইল—আনন্দম্
বাডা কাইলাইল্ মুন্মার মা মুনি
আরু সেইদা পাডিত্তওয়া রামন্
তিরেই পাদিইল বন্ধে তেই মাদতিল্
গুরু পুছাতিল্ পাহল নেরত্তিল্

অর্থ—কনক সভায় তুমি মনের আনন্দে নৃত্য করেছিলে, কৈলাসে বসে তুমি কথা দিয়েছিলে…মহামুনিদের কাছে যে, তুমি মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে চিদাম্বরমের কনক সভায় নৃত্য করবে সেকথা তুমি রেখেছিলে।

অষ্ট দিশাউম্ গিড গিডিংগা সেডন্
তালে নাডেংগা। আশু মদিবা গংগেই
তুলিসীদারা, পুন্নাডারুম কুনডাডা।

অর্থ—অষ্ট দিক কেঁপে উঠেছিল তোমার নাচে—আদি নাগের ফণা দুলছিল—(দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বলে—আদি নাগের ফণার ওপর পৃথিবী)। তোমার জটা হতে গঙ্গার ধারা বয়ে যাচ্ছিল, দেবতারা তোমার সেই মূর্তির স্তব করছিল।

ইষ্ট মুদানে গোপাল কৃষ্ণনন্, পাড
সেডাই আডা অবারু বাডাম্আডা
আদন পাডামাড তোম্ তোম্ ইন্‌ড্রি
পাদবিতান্দো মিন্‌ড্রি।

অর্থ—গোপাল কৃষ্ণ তোমার নাচের সংগে বাঁশী বাজছিল, নাচের ছন্দে তোমার জটা ও সাপের মালা দুলছিল—এবং নৃত্যের ছন্দে বাজছিল। তোম্ তোম্ ইনড্রি বোল্। এইভাবে তুমি নৃত্য করেছিলে। ভক্তদের জন্য এইভাবে বহু গান আছে—শিবের, সুব্রমণ্যের (কার্তিকের) গণেশের, বিষ্ণুর, লক্ষ্মীর॥

এই নাচে করণ ও অঙ্গহারের অনেক ব্যবহার দেখা যায়—তাতেই মনে হয়—ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে ভরত নাট্যমই শাস্ত্রোক্ত এবং প্রাচীন নৃত্য। কিন্তু এই সম্প্রদায় যেসব মুদ্রা ব্যবহার করে—তার প্রায় অধিকাংশই নন্দীসর-কৃত অভিনয় দর্পণ হতে। যাই হোক্ যে, মতই এরা অনুসরণ করুক—এই নৃত্য, প্রাচীন নৃত্য একথা স্বীকার করতেই হবে।

কথক নৃত্য

যুথিকা মুখোপাধ্যায়
(সম্পাদিকা, উইমেনস, মিউজিক স্কুল)

★

কথক নৃত্য লাস্য জাতির মধ্যে পড়ে। কথক নৃত্যে প্রাচীন হিন্দু নৃত্যের অনুপম রূপ মাধুর্যের অভাব। প্রাচীন হিন্দু নৃত্য চিরদিন চাহিয়াছে অতীন্দ্রিয় লোকের আভাষ দিতে। কথক নৃত্যের উদ্দেশ্য ক্ষণিকের জন্য মনোহরণ; মনের মধ্যে কোন স্থায়ী ভাব রাখিয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে নৃত্যের কাহিনীকে দেহের লীলায়িত ভংগীর মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। কথক নৃত্যে দেহভংগীর বৈচিত্র্য খুব কম—অঙ্গহার ও মুদ্রা ইহাতে নাই।

কথক নৃত্যের বিশেষত্ব পায়ের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র কাজ। ছন্দ, তাল ও লয়ের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের দিক হইতে ইহা অবশ্য সুন্দর। সঙ্গীতজ্ঞ লোকের আসরে তাই ইহার আদর এত বেশী। কিন্তু তবু কথক নৃত্য প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। পায়ের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হওয়ায়, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশের একটী অক্ষম চেষ্টা কথক নৃত্যে দেখা যায়। নৃত্যশিল্পীর দেহের সহিত তাহার সহযোগিতা না থাকায় কথক নৃত্য যন্ত্র চালিতের ন্যায় হইয়া পড়ে।

মুসলমান বাদশাহদের খেয়ালে পারস্য ও ভারতীয় নৃত্যের সমন্বয়ে কথক নৃত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাদশাহদের দরবারের বিলাসনৃত্য সমাজের অবনতির যুগে সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাইজীর নৃত্য আজ সমাজে অচল।

কথক নৃত্য লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর অঞ্চলে প্রচলিত। এই নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য পায়ের কাজ—বোল্। ইহার সংগে হাতের সঞ্চালন ও চোখের ভংগী দিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিলেও তাহা প্রধান নয়। নর্তকী একস্থানে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া নাচে—অন্যান্য নৃত্যের ন্যায় ইহাতে নৃত্যকালে স্থান পরিবর্তন করা হয় না।

বর্তমানে বাইজীর নাচ কথক নাচের উদাহরণ। তবলার তালের সংগে পা ফেলিয়া বাইজী নাচে। পিছনে

মনোরম ভংগীমায় মমতাজ শান্তি

উঠে সারেঙ্গীর একটানা সুর, তার সংগে কণ্ঠ মিলাইয়া বাইজী গান গায়। বাইজীদের গান হালকা ঠুংরী। পায়ে থাকে ছোট ছোট ঘুঘুর! পায়ের ঘুঘুরের আওয়াজ কখনো খুব জোর, আবার কখনো অস্পষ্ট চাপা গুঞ্জনে পরিণত হয়।

তবলচি তবলায় বাঁধা বোলগুলি বাজায়। নর্তকী সেই বোলের অনুকরণে পা ফেলিয়া নাচে। বাইজীর নাচে স্বাধীনতা নাই—তাহাকে তবলার অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। বাইজী মধ্যে মধ্যে নৃত্যকালে হাত সোজা প্রসারিত করে। হস্ত সঞ্চালনকালে চোখের ভংগী করা হয়। কিন্তু হাত ও চোখের ভংগী সবই তবলার বোলে বাঁধা।

বাইজীর গানের বিষয় সাধারণত: রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমের কাহিনী। যেমন শ্রীরাধা জল আনিতে যমুনায় যাইতেছেন, পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাত।

বিখ্যাত কথক নৃত্য-শিল্পী কালকা প্রসাদ ও বৃন্দাবন মহারাজ কৃষ্ণ ও রাধার অংশ অভিনয় করিতেন। কথক নৃত্য দুই জাতীয়—

(১) জয়পুরী ভংগী—জয়পুরী কথক নৃত্যে অনেক ছোট ছোট বোল ব্যবহৃত হয়। বোলের সংগে চলে আলাপ। বাইজী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে। এই নৃত্যে ভাব প্রকাশের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম। (২) লাক্ষ্ণৌএর বাইজী নৃত্যে—সুরের বৈচিত্র্য ও ভাবপ্রকাশের মাধুর্য বেশী।

যাঁরা অভিনয় করেন

মনোরঞ্জন বড়াল

★

অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী—থিয়েটার কিংবা সিনেমায় বেশ জনপ্রিয়। প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা বা সম্মান তাঁদিগকে কতজনে দেন তা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু তাঁরা যে বহুজন পরিচিত এবং বহু আলোচ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। স্কুলের ছেলেমেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, নবদম্পতি, প্রৌঢ় পিতামাতা, নিম্নতম মূল্যের দর্শক থেকে বক্স দর্শক অনেকদিন অনেক সময় বিভিন্ন পরিবেশে অভিনেতা অভিনেত্রীদের গুণাগুণ, তাঁদের ব্যক্তিগত খবরাখবর আলোচনা করে থাকেন। তরুণতরুণীর মহলে, বড়দেরও কম নয়—কোন অভিনেতা বিশেষ করে অভিনেত্রীর পরিচয় কাহিনী বা তারকা বনবার ইতিহাস অত্যন্ত লোভনীয়।

এর অবশ্য কারণ আছে। আনন্দদান সিনেমা-থিয়েটারের কাজ এবং সেই আনন্দদানে অভিনেতা অভিনেত্রীরাই প্রত্যক্ষ ভাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। সিনেমা থিয়েটারের পটভূমিকার কর্মীদের যতই মূল্য বা গুণ থাকুক না কেন, দর্শক সাক্ষাৎভাবে পর্দায় বা মঞ্চে পায় তাঁদের, যাঁরা অভিনয় করেন।

অভিনয়াদির ঐতিহ্য আমাদের দেশে প্রাচীন বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব অভিনয় কলার আমূল পরিবর্তন এনেছে। অতীতকালে রাজরাজড়াদের দরবার এবং বাদশাদের আসরে বহুগুণী লোক আদর পেত। ব্যাপক ভাবে গানের বা অভিনয়াদি সংযুক্ত উৎসব যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সামাজিক প্রথায় এই সব শিল্পীদের ছোটখাট সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—ঢুলীসম্প্রদায়, কীর্তনীয়া সম্প্রদায়, নটীসম্প্রদায়, যাত্রাগানাদিতে, যেখানে অভিনয়, গান, বাজনায় একত্র সমাবেশ সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র হয়ে দল গড়েছে।

আধুনিক শহরের প্রথম পত্তন সুরু হবার সাথে অভিনয়াদি কলাবিদ্যায় তার ছাপ ফুটে উঠল। কলকাতা প্রভৃতি স্থানে সাহেবদের সহযোগিতা ও উৎসাহে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় থিয়েটার আরম্ভ করে। কলকাতায় বড় বড় লোকদের বাড়ীতে স্টেজ বেঁধে এই সব অভিনয়াদি হত। ও দেশের খানিকটা অনুকরণে আরম্ভ করলেও সব দিক থেকে অনুকরণ করা গেল না—যেমন স্ত্রী চরিত্রাভিনয়। মেয়েলী চেহারার পুরুষদের দ্বারা স্ত্রী ভূমিকাগুলি অভিনীত হত। এই থিয়েটার মহলে আগত লোকদের সামাজিক মর্যাদা খুব কমই দেওয়া হত, যদিও থিয়েটার দেখে তাহাদিগকে বাহাবা দেওয়া হত। বাধ্য হয়ে এই সব নটদের সামাজিক পথ বিকৃতির পথ ধরত। তবে পুরুষ মানুষ বলে খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে তাদের তেমন বেগ পেতে হত না।

ইতিমধ্যে প্রতিভাবান নাট্যকার, অভিনেতারা এ দিকে বেশ ঝুঁকে পড়লেন। তাঁরা বাইরে গালমন্দ শুনেও মেয়েদের দিয়ে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করায় সাহস দেখান। কিন্তু মুস্কিল হল। পুরুষরা ভদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অভিনয়াদি করলে নেহাৎ নয় একটু চারিত্রিক দুর্নাম হত—কিন্তু ভদ্র ঘরের মেয়েরাত আর এই চারিত্রিক দুর্নাম নিয়ে নেমে আসতে পারত না। তাই স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের জন্য সহরের সুন্দরী অভিনয়দক্ষ বারাঙ্গনাদের খোঁজ নেওয়া হল। ত্রুটি সত্ত্বেও এর ফল ভাল হল। বড় লোকদের বৈঠকখানা থেকে ভেঙ্গে এসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হল। টিকেট বিক্রী করে জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনী খোলা হল। ভিড় বেড়ে গেল। এর অনেক কারণ—যেমন সাধারণের সহজলভ্যতা, মেয়েদের অভিনয়, সর্বোপরি অভিনয়কলার অগ্রগতি ও প্রসার—আর এই অভিনয় কলার উৎকর্ষ এবং প্রসারই প্রধান কারণ। কেননা মেয়েদের থিয়েটারে নামার বৈচিত্র্য প্রথম প্রথম থাকলেও কিছুদিন পরে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হল।

অভিনেতা এবং এই নবাগতা অভিনেত্রীদের জীবনেও এর ফল সুদূর প্রসারী হল। আষ্টে পিষ্টে বাঁধা সমাজ নটদের, বিশেষ করে নটীদের ভাল চোখে দেখত না। যদিও থিয়েটারে

সাধরণ লোকের ভিড় জমে উঠ্‌ল, তবুও অভিনেতা অভি-নেত্রীদের সামাজিক সম্মান বাড়ল না। বড় জোর মজলিসে এবং রেঁস্তোরায় তাঁদের নিয়ে খানিকটা রসাল আলোচনা হত—যার অনেকটা রূপ বর্তমানেও আছে। নট-নটীদের আর্থিক সম্ভাবনার দিকও খুলে গেল। গান এবং অভিনয়-ক্ষমতাসম্পন্ন একদল পতিতা মেয়ে ঘৃণ্যতম জীবনের হাত থেকে আংশিকভাবে মুক্তি পেয়ে এই সব কলা বিস্তার চর্চা করতে লাগল। জমিদার সামন্তদের চারিত্রিক অসারতার নিদর্শনের পরম্পরা মেয়েদের আগমন, খামখেয়ালী ধনী নন্দনদের যৌবন বিলাস প্রভৃতি মিলে প্রথমতঃ একটা অসহ্য ও অশোভন আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেও ক্রমে ক্রমে একটা মোটামুটি সংযত রূপ পেয়ে—অভিনয়াদিরই উৎকর্ষ হতে লাগল। নটনটীরা জানত—সমাজের মাপ কাঠিতে, তারা ঘৃণ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়। সুতরাং তাদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রদায় গড়ে উঠ্‌ল। সমাজ চেতনার অভাব, রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত সম্পর্কহীনতা এবং সমাজের সনাতনী কশাঘাত তাদের দূষিত আবহাওয়ার দিকেই টেনে নিয়ে যেত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একদল শিল্পীর এই সব চারু কলার দিকে অদ্ভুত আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। দোষ ত্রুটী থাক্‌লেও দু'চারজন সত্যিকারের কলাপিপাসু শিল্পী বেরিয়ে আসলেন। মুষ্টিমেয় হলেও থিয়েটার জগতের গতানুগতিক পঙ্কিলতা ছেড়ে কয়েকজন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল। এর ফলে সম্পূর্ণভাবে থিয়েটার জগতে অগ্রগতির লক্ষণ ফুটে উঠ্‌ল।

ইতিমধ্যে দেশে সিনেমার যুগ এসে গেছে। এর ফলে শিল্পীদের প্রশস্ততর ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে দুর-দুরান্ত গ্রামেও থিয়েটারের প্রভাব পড়ে গেল। একদল যুবক অভিনয় জগতের দিকে অনায়াসে ঝুঁকে পড়লেন। সমাজের আপত্তি বিশেষতঃ কল্কাতায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে লাগল। অসীম সাহসে ভর করে দু'-চার জন ভদ্র ঘরের মেয়েও এ দিকে পা বাড়ালেন। অর্থের একটা বিশেষ সুযোগ থাকার দরুণ থিয়েটার—সিনেমায় অভিনয় বেশ কিছু লোকের পেশা হয়ে দাঁড়াল।
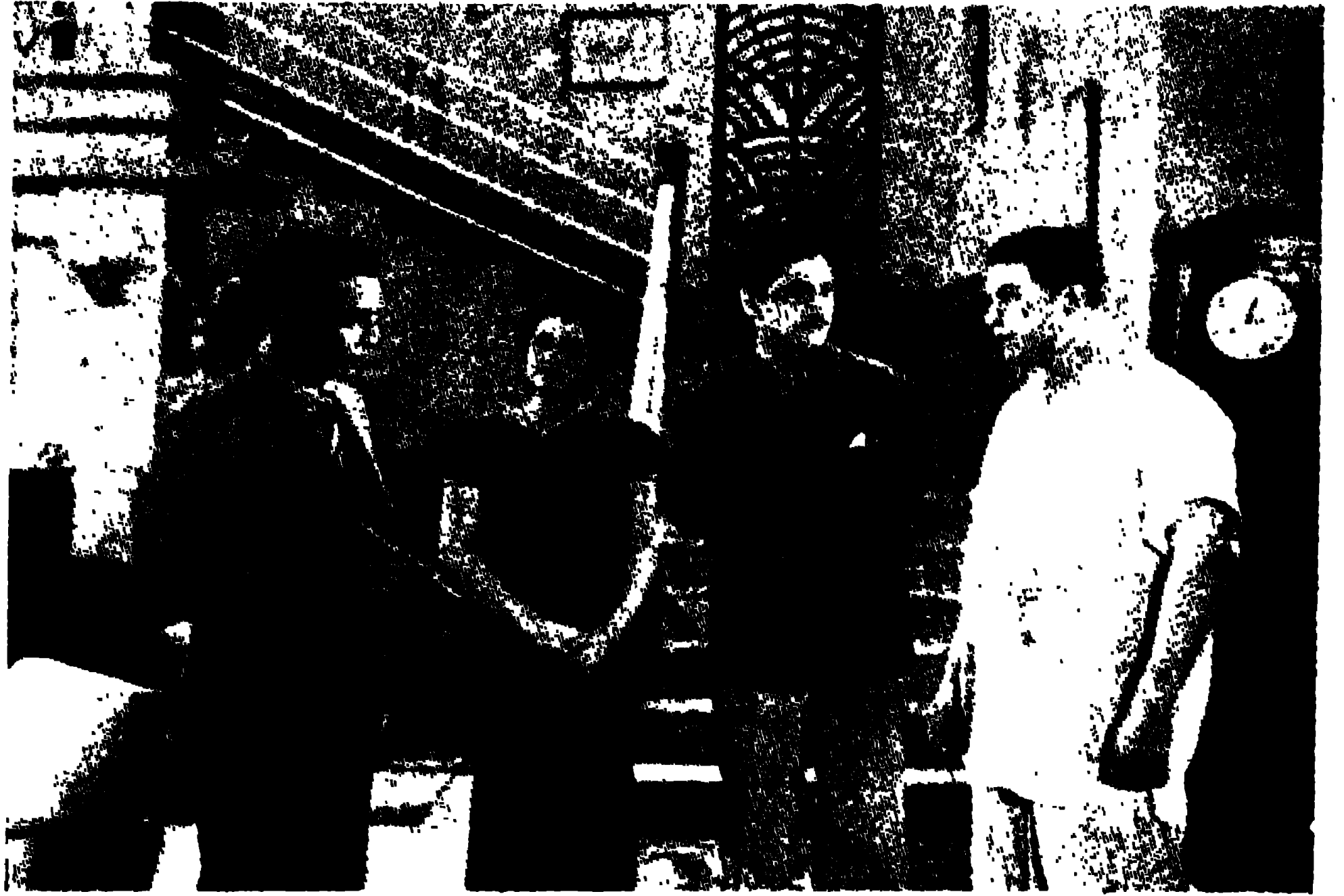
কথাচিত্র লিঃ-এর 'পূর্বরাগ'-এর একটী দৃশ্যে ভানু বন্দ্যো, প্রমীলা, জীবেন বসু প্রভৃতি।

আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন, সমাজ চেতনার সূচনা অনেক দিন থেকেই। কিন্তু থিয়েটার, সিনেমা, অভিনয়জগৎ প্রভৃতির সাথে তেমন যোগাযোগ ছিল না। স্থানীয় দেশ নেতারাও এদিকটার কোন মূল্য দেন নাই। দু'একজন ছাড়া অনেকেই এদিকটার প্রতি অসম্মানের চোখে চাইতেন। জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার ভাটায় এদিকে তেমন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি। মাঝেমাঝে দু'একজন অবশ্য ভিতর কিংবা বাইরে থেকে সাময়িক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে বিশেষ কোন কিছু দানা বেঁধে উঠেনি। আনন্দ-স্ফূর্তি—মেয়ে—মদ-যুক্ত আবহাওয়া নিয়েই অভিনয় জগৎ মোটামুটি চলে এসেছিল। শিল্পীদের জীবনে তাই জাতীয় জীবনছন্দের কোন সাড়া মেলে না। হালে কিছুদিন হল সিনেমা থিয়েটারে স্বাদেশিকতার একটু প্রভাব এসেছে সত্য। তবে তা' এখন পর্যন্ত খুবই কম। স্বাদেশিকতার নামে ব্যবসায়ই এর প্রধান লক্ষ্য। সিনেমা থিয়েটারের মালিকেরা ব্যবসার খাতিরেই দেশের আবহাওয়া বুঝে স্বাদেশিকতার স্থান করে দিচ্ছে। তবু মন্দের ভাল। এর ফল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে আজকাল কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সক্রিয়তার কোন রূপ এখনো পাওয়া যায় নি।

এই প্রসংগে মনে পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের এক ঘটনা। নাৎসী নেতা হিটলারকে তুষ্ট করতে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন মিউনিকে চুক্তি করে এলেন। এর প্রতিবাদ উঠল পৃথিবীর প্রগতিশীল শিবির থেকে। ইংল্যাণ্ডের অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংবাদ পত্রে বিরাট বিবৃতি দিয়ে এই অন্যায় চুক্তির প্রতিবাদ জানালেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিনয়-শিল্পীরা দেশের সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি শৃঙ্খলার সাথে জড়িত—অথচ এদের কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত জীবন প্রভৃতিতে জাতীয় আন্দোলনের প্রমাণ নেই।

পূর্বেই বলেছি সময়ের চাহিদা মেটাতে ভুলত্রুটি সমেত স্বাদিশকতার প্রভাব এসে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অভিনেতা অভিনেত্রীরা সমাজের দেশ প্রেমের সুষ্ঠু চরিত্র অভিনয় করেও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে তার এতটুকু প্রভাব মেনে নেন না।

অভিনয়-শিল্পীরা দেশের বিরাট এক জনসংখ্যার সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁদের শিল্পদক্ষতার সকলে প্রশংসা করে। এর পর তাঁরা যদি নাগরিক হিসাবে নিজেদের সহজ মানুষ করে চরিত্র মাধুর্যে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা পালন করেন, তবে তাঁদের দান শিল্পী হিসাবে আরো স্বার্থকতা লাভ করবে। অভিনয়াদি দর্শন করে দর্শক-সমাজ বিভিন্ন শিল্পীকে আরো সমাদর করবে। ধরুণ, কোন অভিনেতা ভ্রাতৃপ্রেমের চরিত্র কোন অভিনয়ে দেখালেন—তারপর যদি সেই অভিনেতার সামাজিক জীবনে দেখা যায় নগ্নভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে কুৎসীৎ কলহ, হয়ত বা পানাসক্তি ও নারী ব্যাপার—দর্শকসমূহ তাঁর অভিনয়ে যতই মুগ্ধ হোন না কেন, সামাজিক জীবনে তাঁকে ঘৃণাই করবেন।

বর্তমানেও অভিনেতা-অভিনেত্রী মহলের মদ আর দেহ বিলাসের কাহিনী সর্বজন বিদিত। অবশ্য যতটা বাইরে প্রচার, আসলে হয়ত ততটা নয়। বিশেষতঃ স্বাভাবিক জীবন নিয়ে এইসব অভিনয়-শিল্পীরা লোক-সমাজে দেখা দেন না। প্রচুর টাকা রোজগার করে রহস্যজনক ভাবে ওড়ান—সব মিলিয়ে উপরোক্ত ধারণা গড়ে উঠবার অবকাশও রয়েছে প্রচুর। অনেক শিল্পীই মনে করেন—বাইরে লোক-সমাজে বেরুলে শিল্পী হিসাবে তাঁদের কদর কমে যাবে কিন্তু এধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আর্থিক সমস্যাও কম কথা নয়। যাঁরা খুদে অভিনেতা বা অভিনেত্রী সত্যই তাঁদের বহুকষ্টে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়। এই শিল্পী মহলেও শ্রেণী বিভাগের রূপ সুস্পষ্ট, যার জন্য একবার ছলেবলে কৌশলে একটু স্থান করে নিতে পারলে বেশ রোজগার করা যায়। ৩।৪টী প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবস্থা করে, অভিনয় কলার শ্রাদ্ধ করে কত বেশী টাকা রোজগার করা যায়—তার জন্য তাঁরা ঘুরে বেড়ান। আর উপার্জিত অর্থ বেশী মদ আর রুচিবিরোধী কার্যা-

বলিতে ব্যয় করেন। যাঁরা নিম্ন স্তরের, তাঁদের আবার সংসার ধর্ম নিয়ে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করেই জীবন বেরিয়ে যেতে চায়। অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন, যাঁরা প্রথমে সত্যিই শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন—কিন্তু তাঁদের বাজার দর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিল্পদক্ষতার কোন উৎকর্ষতাই পরিলক্ষিত হয় নি। টাকা-টাকা করে জীবনান্ত করছেন।

এসব নয় বাদই দেওয়া যাক। আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মানদণ্ড হিসাবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের উপার্জন অশোভন নয়—বরং অবিশ্বাস্য। ৪০।৫০ টাকার কেরাণীগিরি করেও লোকে সংসার চালায়—অথচ সাধারণ অভিনেতা অভিনেত্রীরাও এর চেয়ে ৪।৫ গুণ আয় করেও সন্তুষ্ট নন, আর্থিক অনটন মেটাতে পারেন না। এর একটা মস্তবড় কারণ - আয়ের একটা মস্তবড় অংশ অবাঞ্ছিত ভাবে খরচ হয়। জীবনযাত্রার মানদণ্ড বিচারে তারকাদের উপার্জন রূপকথার যখেরধন পাওয়ার মত। অর্থের অহেতুক তৃষ্ণাকে সংযত করে একদল প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি হওয়া অভিনয় শিল্পের সুশোভন ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত দরকার। সিনেমা-থিয়েটার প্রতিষ্ঠানগুলি আজকাল দেশের ধনপতিদের অর্থাগমের কারখানা বিশেষ—তাই শিল্পীরাও পুঁজিপাতিদের ঐসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক বিশেষ—শিল্পী-শ্রমিক। যতশীঘ্র শিল্পীদের সচেতনভাবে এই উপলব্ধিতে সচেতন হয়ে ওঠেন ততই মঙ্গল প্রতিভাবান ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীরা যাতে নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীদের পক্ষে প্রতিবন্ধক না হয়ে সহায়ক হন—এই বোধ জাগ্রত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এক একটি প্রতিষ্ঠানে এক এক জন প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেন প্রতিষ্ঠান-মালিকের সর্দার বা মূলধন। এর জন্য শিল্পীদের মধ্যে সৌহার্দ না গড়ে উঠে প্রতিবিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দেখা দেয়। নতুন যাঁরা অভিনয় জগতে আসবেন, তাঁদেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে; শুধু খেয়াল বা অসামাজিক অসংযত জীবন ভোগের লালসায় মত্ত হয়ে কিংবা শিল্পক্ষমতাহীনতা সত্ত্বেও অভিনয় জগতে ভিড় করে কোন লাভ নেই; বরং এদ্বারা অভিনয় কলায় উৎকর্ষতা বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাঁদের ভিতর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদের প্রতিবন্ধকতা করা হয়।

অভিনয় কলার জয় যাত্রার পথে উপরোক্ত বাধা-বিপত্তি ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করতে শিল্পীদের সংঘবদ্ধ সংগঠন চাই। বিশেষতঃ অদূর ভবিষ্যতে দেশে মুক্তির নিশানা উড়বে এ নিশ্চিত; তখন সুখ দুঃখের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দরদী শিল্পীদের একান্ত প্রয়োজন হবে। জাতীয় থিয়েটার, সিনেমা, শিল্প ও কলার বিরাট দায়িত্ব পড়বে অভিনয়-শিল্পীদের উপর—সুতরাং শিল্পীদের কাছে একান্ত অনুরোধ—যুগের দাবী বুঝে যথোপযুক্তরূপে শিল্পীর কর্তব্য-পালনে প্রস্তুত হউন।

সাধারণ দর্শক সমাজ ও রঙ্গমঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহকে নিছক অবসর বিনোদনের অথবা উল্লেখহীন হই-হুল্লোড়ের আড্ডা না ভেবে—অভিনেতা-নেত্রীদের সমাজ-জীবনে সুষ্ঠু মর্যাদা দিয়ে তাঁদের প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেবেন—অভিনয় কলার সুপ্রসারে সাহায্য করবেন—এ আশা একান্ত ভাবেই করি।

ইণ্ডিয়া পিকচার্সের

নিবেদন!

নীচা নগর

★

★

ভূমিকায়

উমা আনন্দ

রফিক আনওয়ার

কামিনী কৌশল

রফি পীর : হামিদ ভাট

মোহন সায়গল : ভাটিয়া : জোহরা

এবং এম, ভাস

কাহিনী	শিল্প নির্দেশক	চিত্র গ্রহণ	সম্পাদনা
হিয়াতুল্লা আনসারী	কামেশ্বর শেগল	বিদ্যাপতি ঘোষ	এন, আর, চোহান

সংগীত

রবীশঙ্কর

গীতিকার

বিশ্বামিত্র আদিত্ত এবং মনমোহন আনন্দ

★

প্রযোজনা

রসিদ আনওয়ার

পরিচালনা

চেতান আনন্দ

বুমার শুভেন্দ্র

●

সরাইলোর 'ছউ-নৃত্যে'র খ্যাতনামা শিল্পী স্বর্গত কুমার শুভেন্দ্র'র পুণ্য-স্মৃতি আপনাদের মনে জাগরুক রাখবার জন্য আসুন, 'ছউ-নৃত্যে'র কয়েকজন শিল্পীর সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি।

কুমার ভবেন্দ্র

ময়ূর-নৃত্য
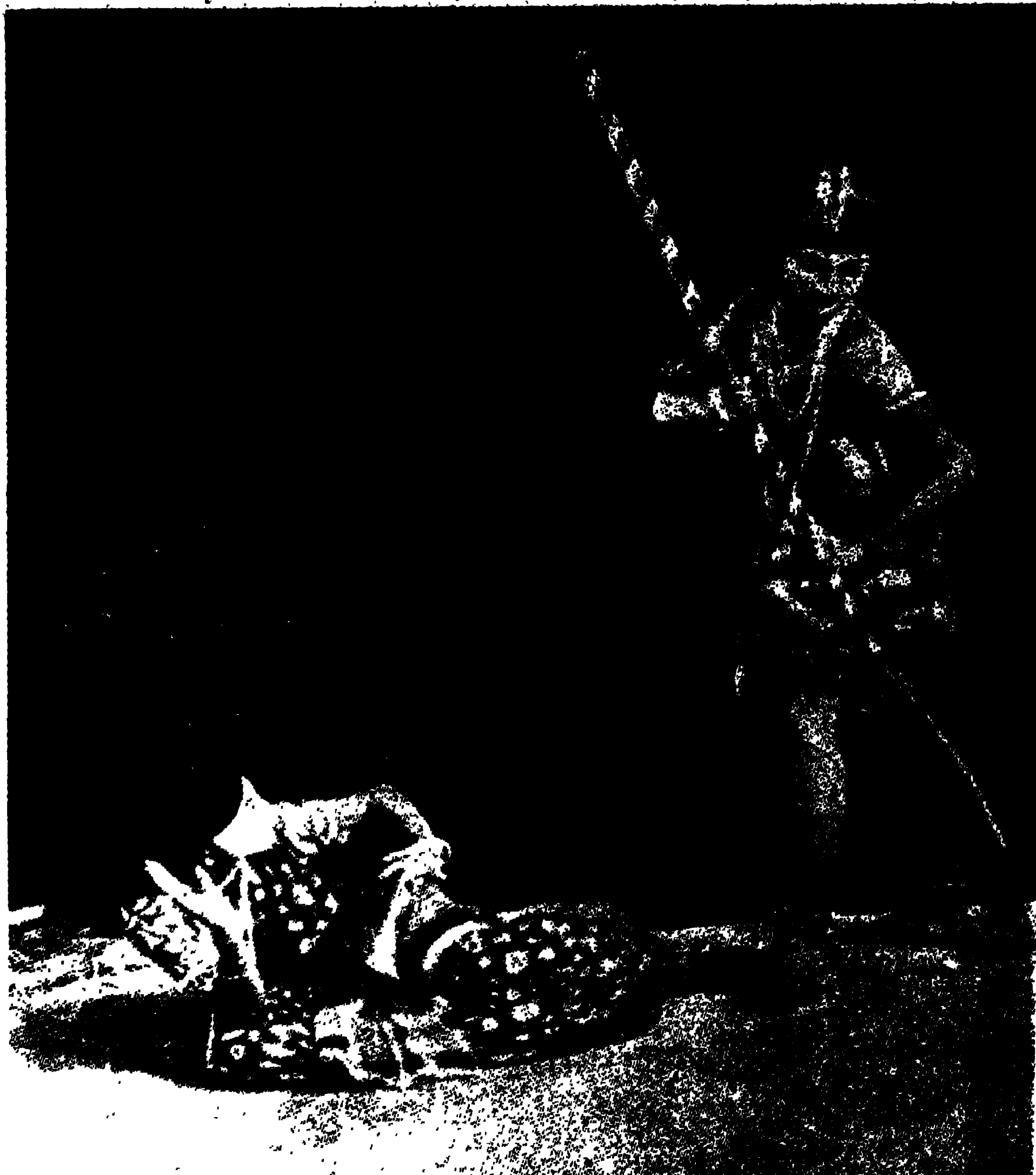
শুভেন্দ্র ও কেদার
নাবিক-নৃত্যে
রূপ-মঞ্চ—হৈমন্তিক '৫৩

সরাইকেলা—ছোট একটা দেশীয় রাজ্য কিন্তু তার কৃষ্টি ও কলা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত হ'য়ে আসছে। সরাইকেলার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শিল্প-কলা বিশেষ করে নৃত্য-কলা সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে সরাই-কেলার 'ছউ নৃত্য' বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে। ছউ-নৃত্যে মুখোস ব্যবহার করা হয় এবং এই মুখোস চরিত্রানু-যায়ী অদ্ভুত রূপ লাভ করে। মুখোস নির্মাতারা সুনিপুণ শিল্পী। এই শিল্প তাদের আয়ত্বে।

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে নটরাজ [illegible] উৎকলস্থ সরাইকেলায় চৈত্র মাসে 'ছৌ-নৃত্যোৎসব' অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। মানুষের মন বসন্তের আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, তারই অভিব্যক্তি রূপলাভ করেছে ছৌ-নৃত্যে। এই ছউ-নৃত্য দিয়েই সরাইকেলা রাজ্যে বসন্তোৎসব করা হয়। নৃত্য শিল্পীদের নিয়ে এই সময় এক প্রতিযোগিতা হয়। সরাইকেলার রাজা এই নৃত্য-প্রতিযোগিতায় সভাপতি বা বিচারকের আসন গ্রহণ করে উপযুক্তকে সম্মানিত করেন।..........

বাঁয়ের পাতায় :—

উপরে :

শুভেন্দ্র বন্দীর স্বপ্ন-নৃত্যে।

মধ্যে : বনবিহারী।

নীচে : হীরেন্দ্র।

ডানের পাতায় :

উপরে : শুভেন্দ্র।

চন্দ্রভাগে : সূর্য-দেবতা।

নীচে : ব্রজেন্দ্র।

ত্রৈমাসিক-রূপ-মঞ্চ—১৩৫৩

বনবিহারী

আরতি-নৃত্যে

রূপ-মঞ্চ হৈমন্তিক—'৫৩
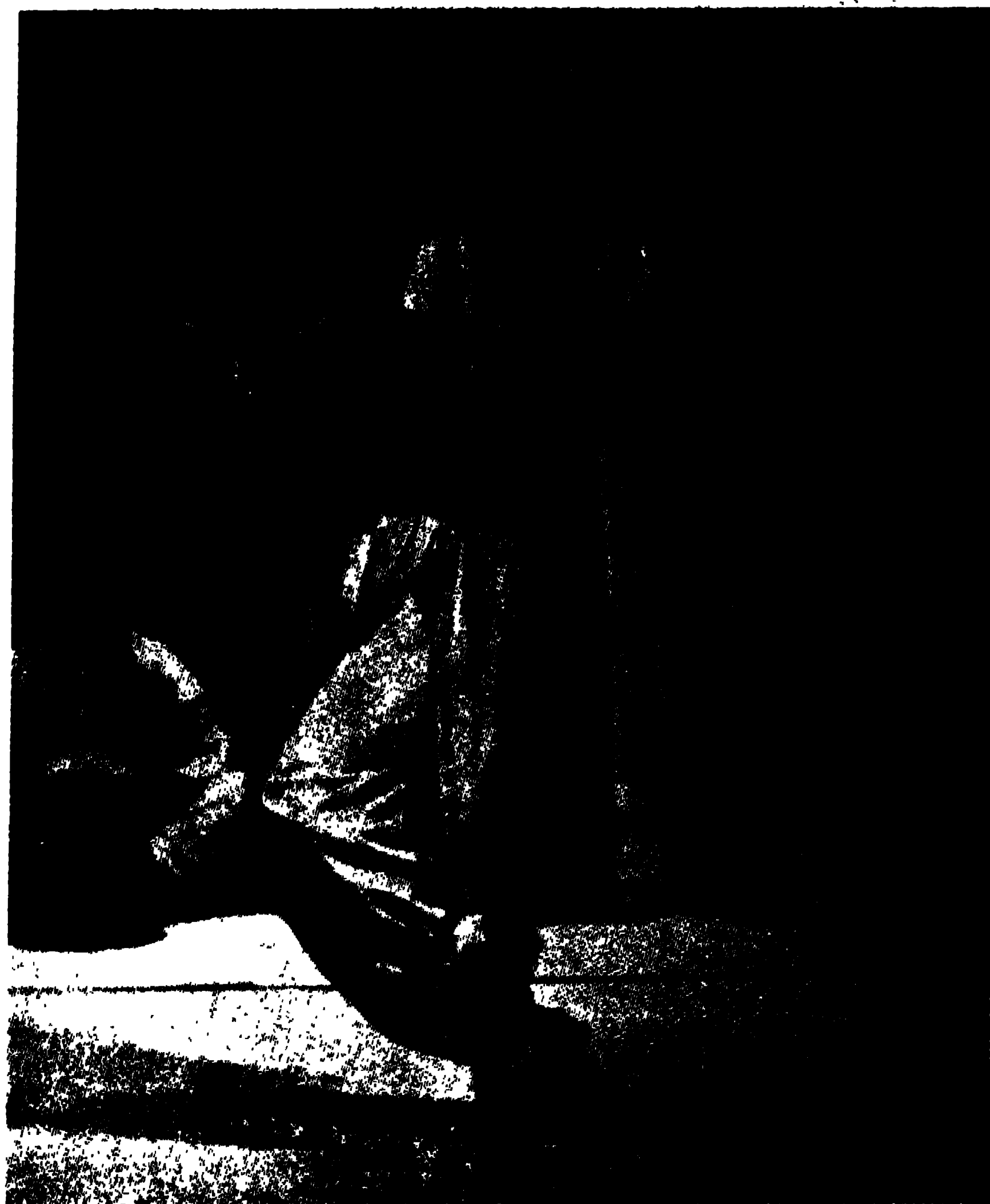
হীরেন্দ্র
শিকারী-নৃত্যে
রূপ-মঞ্চ হৈমন্তিক—'৫৩

ছউ-নৃত্যের দর্শক রূপে ভারতের মহামানব
মহাত্মা গান্ধী। এবং এ যুগের বিপ্লবীবীর
সর্বজনপ্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র।.........
রূপ-মঞ্চ হৈমন্তিক—১৩৫৩

প্রথম কবে এঁদের সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হয়—

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

★

[•যদি কোন ভুল ধরা পড়ে সহৃদয় পাঠকবর্গ সংশোধন করে দিলে বাধিত হ'বো—সম্পাদক]

অভিনেতা—

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। ইনি প্রথম চিত্রে যোগদেন ১৯২৩ সালে। অধুনালুপ্ত "ফটো প্লে সিণ্ডিকেট" কোম্পানীর প্রথম চিত্র "সোল অফ এ স্লেভ" চিত্রে ধর্মদাসের ভূমিকায়। এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আলোক শিল্পী ছিলেন মিঃ চার্লস ক্রীড। অহীনবাবু প্রথম সবাক চিত্রে অভিনয় করেন ১৯৩১ সালে। ম্যাডান কোম্পানীর "ঋষির প্রেম" চিত্রে কর্ণাট রাজের ভূমিকায়। এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীঅমর মল্লিক। ইনি প্রথম চিত্রে যোগ দেন ১৯৩১ সালে। "ইন্টার ন্যাশান্যাল ফিল্ম ক্রাফ্‌ট" (বর্তমান নিউথিয়েটার্স) কোম্পানীর "চোর কাঁটা" চিত্রে পশুপতির ভূমিকায়। এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন শ্রীচারু রায়। "চোর কাঁটা" শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা। অমরবাবুর প্রথম সবাক চিত্র "দেনাপাওনা।" ১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী স্বর্গীয় শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "দেনাপাওনা" উপন্যাসের চিত্ররূপ দেন এবং এই চিত্রে অমরবাবু এককড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই চিত্রের পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

শ্রীঅহি সান্যাল। ইনিও নির্বাক যুগের অভিনেতা। ইনি প্রথম চিত্রে যোগদেন ১৯২৬ সালে। "কিনেমা আর্টস" কোম্পানীর "শঙ্করাচার্য" চিত্রে ইনি কাপালিক ও শিষ্য—দুটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করেন। "শঙ্করাচার্য" পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষ। স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ঘোষের পরিচালনায় রাধা ফিল্ম কোম্পানীর "শ্রীগৌরাঙ্গ" চিত্রে যবন হরিদাস এঁর প্রথম সবাক চিত্র।

শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীহেম চন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স-এর সবাক চিত্র "প্রতিশ্রুতি"তে অরুণ-এর ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়। এঁর প্রথম নির্বাক চিত্র "মানভঞ্জন।" ১৯২২ সালে শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রে গোপীনাথের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এঁর প্রথম সবাক চিত্র 'চিরকুমার সভায়' শ্রীশ-এর ভূমিকা। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স এই ছবি তোলেন।

শ্রীকমল মিত্র। ১৯৪৬ সালে শ্রীসুকুমার দাসগুপ্তের পরিচালনায় "এম, পি, প্রোডাকসন্স"-এর "সাত নম্বর বাড়ী"তে অমরনাথের ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন। যদিও ইনি প্রথম অভিনয় করেন শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "সংগ্রাম" চিত্রে, তথাপি "সংগ্রামের" পূর্বে "সাত নম্বর বাড়ী" আত্মপ্রকাশ করায় এঁর প্রথম চিত্র "সাত নম্বর বাড়ী।"

শ্রী কে, এল, সাইগল। দিল্লীর মিঃ কে, এইচ, কাজীর বাড়ীতে এঁর গান শুনে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার মুগ্ধ হন এবং এঁকে নিউ থিয়েটার্স-এ নিয়ে আসেন। এঁর প্রথম চিত্র "মহাব্বৎ কা আঁসু।" নিউ থিয়েটার্স-এর এই উর্দ্দু চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সাইগলের প্রথম বাঙলা চিত্র "দেবদাস"। ১৯৩৫ সালে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় "দেবদাসে" চুনীলাল-এর বন্ধুর ক্ষুদ্র ভূমিকাই এঁর প্রথম বাঙলা চিত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "ম্যাডান" কোম্পানীর

সবাক চিত্র "কৃষ্ণকান্তের উইলে" সোনার ভূমিকায়ই এঁর প্রথম চিত্রে অভিনয়।

শ্রীছবি বিশ্বাস। এঁর প্রথম চিত্রে অভিনয় "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" বিশুর ভূমিকা। ১৯৩৬ সালে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী "কালী ফিল্ম"-এর হইয়া এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ ভট্টাচার্য। ১৯৩৯ সালে "সাপুড়ে" চিত্রে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় ইনি প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন। "নিউ থিয়েটার্স"-এর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদেবকী বসু। জ্যোতিঃপ্রকাশ এই চিত্রে সহকারী পরিচালক ছিলেন।

শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি নির্বাক যুগের অভিনেতা। পর্দায় জহর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন নির্বাক যুগে রাধা ফিল্মের 'গীতা' চিত্রে। "গীতা" চিত্রে নায়ক জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। "গীতা" রচনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী। এঁর প্রথম সবাক চিত্র শ্রীভারতলক্ষ্মীর চাঁদ সদাগর।

শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী। ইনি প্রথম নির্বাক যুগে"মানভঞ্জন" চিত্রে সরকারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২২ সালে "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর হইয়া শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনকড়ি বাবুর প্রথম সবাক অভিনয় "চিরকুমার সভাতে" অক্ষয়। "নিউ থিয়েটার্স"-এর এই চিত্রখানি শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীতুলসী লাহিড়ী। ১৯৩৩ সালে "কালী ফিল্ম" কোম্পানীর "মণি কাঞ্চন" (প্রথম পর্ব) চিত্রে গণপতির ভূমিকাই এঁর প্রথম অভিনয়। "মণি কাঞ্চন" রচনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন তুলসী বাবু নিজে।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়। ১৯২২ সালে নির্বাক "মানভঞ্জন" চিত্রে জনতার মধ্যে দুর্গাবাবুকে প্রথম দেখা যায়; তারপর ১৯২৪ সালে "চন্দ্রনাথ" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় ইনি অতি সুন্দর অভিনয় করেন। "চন্দ্রনাথ" ও "মানভঞ্জন" শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর হইয়া পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাবাবুর প্রথম সবাক অভিনয় "দেনা-পাওনাতে" নায়ক জীবানন্দ। "নিউ থিয়েটার্স"-এর এই চিত্রখানি ১৯৩২ সালে শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাবাবুর শেষ চিত্র নিউ থিয়েটার্স-এর "প্রিয় বান্ধবী"। এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীসৌম্যেন মুখোপাধ্যায়। দুর্গাবাবু ১৯৪৩ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেন (প্রিয় বান্ধবী)। দুর্গাদাস বাবুর জন্ম ১২৯৬ সাল, মৃত্যু ৫ই আষাঢ় ১৩৫০ সাল।

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১ সালে "রাধা ফিল্ম" কোম্পানীর "প্রভাস মিলন" চিত্রে বসুদাম-এর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীফণী বর্মা।

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য। ইনি নির্বাক যুগের অভিনেতা। প্রথম অভিনয় করেন ১৯২৫ সালে "ম্যাডান" কোম্পানীর "সতীলক্ষ্মী" চিত্রে একটী বকাটে যুবকের

ভূমিকায়। "সতীলক্ষ্মী" পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় "কৃষ্ণকান্তের উইলে" নিশাকরের ভূমিকা। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র। ১৯২২ সালে "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর "আঁধারে আলো" চিত্রে অমরকালীর ভূমিকায় এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয়। এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী ও শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র। নরেশবাবুর প্রথম সবাক অভিনয় "বিষ্ণুমায়াতে" বসুদেব-এর ভূমিকা। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী। নির্বাক যুগে ১৯২৪ সালে "ম্যাডান" কোম্পানীর "পাপের পরিণাম" চিত্রে নায়ক-এর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। সবাক যুগে এঁর প্রথম অভিনয় "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলাল-এর ভূমিকা। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রভাত সিংহ। ১৯২৮ সালে "কণ্ঠহার" চিত্রে মধুর ভূমিকায় এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয়। "কিনেমা আর্টস" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ। সবাক যুগে এঁর প্রথম অভিনয় "হালবাংলা" চিত্রে মিঃ ব্যানার্জীর ভূমিকা। ১৯৩৭ সালে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম" কোম্পানীর হইয়া এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে শ্রীহীরেন বসুর পরিচালনায় "ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া" কোম্পানীর "অমরগীতি" চিত্রে প্রশা॰র ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়।

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল। এঁর আসল নাম নগেন্দ্রনাথ নাথ সান্যাল। ১৯৩৩ সালে "মীরাবাঈ" চিত্রে চাঁদভট্ট এঁর প্রথম অভিনয়। "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদেবকী বসু।

শ্রীফণী রায়। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" রামশঙ্করের ভূমিকা। ১৯৩৬ সালে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী "কালী ফিল্ম" কোম্পানীর হইয়া এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত "শহর থেকে দূরে" চিত্রে অভিনয় করিয়া ফণীবাবু চিত্ররাজ্যে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।

শ্রীবোকেন চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রথম নির্বাক যুগে "বুকের বোঝা" চিত্রে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করেন। "আর্য ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রখানি শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২৯ সালে পরিচালনা করিয়াছিলেন। বোকেন বাবুর প্রথম সবাক চিত্র "মাসতুত ভাই"। ১৯৩৩ সালে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রে খাবারওয়ালার একটী ভূমিকায় ইনি অভিনয় করেন।

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। নির্বাক যুগে ১৯২৮ সালে "বিচারক" চিত্রে বিনোদের ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রটী শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী পরিচালনা করিয়াছিলেন। এঁর প্রথম সবাক চিত্র "পল্লীসমাজ"-এ বেণীর ভূমিকা। "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী।

শ্রীবিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসতীশ দাস গুপ্তের পরিচালনায় "ভ্যারাইটী পিকচার্স" কোম্পানীর "কর্ণার্জুন" চিত্রে সহদেব এর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীবিপিন মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সালে শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "চিত্র ভারতী" কোম্পানীর "শেষরক্ষা" চিত্রে বিনোদ-এর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "শেষরক্ষা" প্রযোজনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল এবং "চিত্রভারতীর" এইটী প্রথম চিত্র।

শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। "কিনেমা আর্টস" কোম্পানীর "নিষিদ্ধ ফল" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় এঁর

প্রথম নির্বাক অভিনয়। শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ ১৯২৮ সালে এই চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছিলেন। এঁর প্রথম সবাক চিত্র "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "দেনাপাওনাতে" প্রফুল্লর ভূমিকা। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৯৩২ সালে এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীভূপেন রায়। "কিনেমা আর্টস" কোম্পানীর "অপহৃতা" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয়। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষ। এঁর প্রথম সবাক চিত্র "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "দেনাপাওনা" চিত্রে নির্মল-এর ভূমিকা। ১৯৩২ সালে শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এঁর প্রথম নির্বাক চিত্র "ম্যাডান" কোম্পানীর "রজনী" চিত্রে শচীন-এর ভূমিকা। ১৯২৮ সালে শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন। এঁর প্রথম সবাক চিত্র "দেনাপাওনাতে" শিরমণির ভূমিকা। "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৯৩২ সালে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমিহির ভট্টাচার্য। ১৯৪০ সালে শ্রীসুকুমার দাস গুপ্তের পরিচালনায় "কমলা টকীজ" কোম্পানীর "রাজকুমারের নির্বাসন" চিত্রে প্রমোদরঞ্জন-এর ভূমিকায় এঁর প্রথম চিত্রে অভিনয়।

স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী। শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী ও শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর "আঁধারে আলো" চিত্রে দেওয়ান-এর ভূমিকায় ১৯২২ সালে ইনি প্রথম নির্বাক অভিনয় করেন। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় "পল্লীসমাজ" চিত্রে গোবিন্দ গাঙ্গুলির ভূমিকা। "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী।

শ্রীরবী রায়। ইনি "রাধা ফিল্ম" কোম্পানীর সবাক "শ্রীগৌরাঙ্গ" চিত্রে গোপালচাপাল-এর ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন স্বর্গীয় শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ।

স্বর্গীয় শ্রীরথীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাক "সহধর্ম্মিণী" চিত্রে সুধাংশুর ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়। "রূপম ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীসুধাংশু মুস্তাফী। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় ১৯৩৩ সালে "বিল্বমঙ্গল" চিত্রে নায়কের ভূমিকা।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ মজুমদার। ১৯৪০ সালে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "জীন্দগী" হিন্দি চিত্রে জনতার মধ্যে অভিনয় করেন। এরপর ১৯৪০ সালেই "শাপমুক্তি" চিত্রে রাজেন-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। "কৃষ্ণ মুভিটোন" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া।

শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য। ইনি প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন, বোম্বেতে একটী ঘৃতের প্রচার চিত্রে জনতার মধ্যে। তারপর ১৯৪২ সালে "অপরাধ" চিত্রে

বিবাহ বিশারদ-এর ভূমিকায়। "মুভিটেকনিক" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীফণী মজুমদার। ইনি "অপরাধ" চিত্রে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য নামে অভিনয় করেন তারপর জনখ্যাতি লাভ করেন "উদয়ের পথে" চিত্রে ১৯৪৪ সালের।

স্বর্গীয় শৈলেন চৌধুরী। এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয় "সরলা" চিত্রে ডাক্তারের ভূমিকা। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁর প্রথম সবাক চিত্র "বড়ুয়া পিকচার্স" কোম্পানীর "বাঙলা ১৯৮৩"। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া।

শ্রীশ্যাম লাহা। ১৯৩৫ সালে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "দেবদাস" চিত্রে জনতার মধ্যে প্রথম অভিনয় করেন। এরপর ১৯৩৫ সালেই শ্রীনীতিন বসু পরিচালিত "ভাগ্যচক্র" চিত্রে ডিটেকটিভের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী। ১৯২২ সালে "তাজমহল ফিল্ম" কোম্পানীর প্রথম নির্বাক চিত্র "আঁধারে আলো"। এই চিত্রে শিশিরবাবু সত্যেন-এর ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এই চিত্রটী শিশির বাবুর পরিচালনায় প্রথমার্ধ তোলা হয় এবং শেষার্ধ শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় তোলা হয়। শিশির বাবুর প্রথম সবাক চিত্র "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "পল্লীসমাজ" চিত্রে রমেশ। এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন শিশির বাবু নিজে।

শ্রীসন্তোষ সিংহ। "কৃষ্ণসখা" চিত্রে সুদামার ভূমিকা এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয়। ১৯২৬ সালে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী "অরোরা পিকচার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন। সন্তোষ বাবুর প্রথম সবাক অভিনয় "যমুনাপুলিনে" চিত্রে আয়ন-এর ভূমিকা। ১৯৩২ সালে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিনেত্রী—

শ্রীমতী উমাশশী দেবী। এঁর প্রথম নির্বাক অভিনয় ১৯২৯ সালে "গ্রাফিক আর্টস" কোম্পানীর প্রথম চিত্র "বঙ্গবালা"তে সুবর্ণর ভূমিকা। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় "দেনাপাওনা" চিত্রে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা। এরপর "ম্যাডান" কোম্পানীর "বিষ্ণুমায়া" চিত্রে অস্থির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "চণ্ডীদাস" চিত্রে রামীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া ইনি বিখ্যাত হইয়া পড়েন। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদেবকী বসু।

শ্রীমতী কানন দেবী। ১৯২৬ সালে নির্বাক "জয়দেব" চিত্রে শ্রীরাধার ক্ষুদ্র ভূমিকা এঁর প্রথম অভিনয়। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় "জোরবরাত" চিত্রে প্রভার ভূমিকা। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপধ্যায়।

স্বর্গীয়া কঙ্কাবতী দেবী। ১৯২৮ সালে নির্বাক "বিচারক" চিত্রে ক্ষীরোদার ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "পল্লীসমাজ" চিত্রে জ্যাঠাইমার ভূমিকায় এঁর প্রথম সবাক অভিনয়।

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী। ১৯২৯ সালে "মুভি প্রোডিউসার" কোম্পানী সৌরীন্দ্রমোহনের "পিয়ারী" উপন্যাসের চিত্ররূপ দেন। চন্দ্রাবতী এই চিত্রে নাম ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীবিমল পাল। এঁর প্রথম সবাক অভিনয় ১৯৩৩ সালে "মীরাবাঈ" চিত্রে নামভূমিকায়। "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদেবকী কুমার বসু।

শ্রীমতী ছায়া দেবী। ইনি প্রথম "পথের শেষে" চিত্রে রাধার ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করেন। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর" এই চিত্রটী পরিচালনা

করিয়াছিলেন স্বর্গীয় শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এরপর ১৯৩৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "সোনার সংসার" চিত্রে রমার ভূমিকায় অভিনয় করেন। "সোনার সংসার" পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদেবকী কুমার বসু।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা। নির্বাক যুগে ১৯৩১ সালে "চোরকাঁটা" চিত্রে উল্লাসীর ভূমিকায় ইনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। "ইনটার ন্যাশানাল ফিল্ম ক্রাফ্‌ট"-এর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীচারু রায়। জ্যোৎস্নার প্রথম সবাক অভিনয় "তরুণী" চিত্রে উমা। ১৯:৪ সালে শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখা এই চিত্রটা "কালী ফিল্ম" কোম্পানী তোলেন।

শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা। ১৯৩৮ সালে শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "দেবদত্ত ফিল্ম" কোম্পানীর "গোরা" চিত্রে ললিতার ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী। ১৯৩৩ সালে "কালী ফিল্ম" কোম্পানীর "বিল্বমঙ্গল" চিত্রে শ্রীকৃষ্ণর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী প্রভা দেবী। ১৯২৪ সালে "ম্যাডান" কোম্পানীর নির্বাক "পাপের পরিণাম" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। ইনি প্রথম সবাক অভিনয় করেন "পল্লীসমাজ" চিত্রে রমার ভূমিকায়। "নিউ থিয়েটার্স"

কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী।

শ্রীমতী বিনতা বসু। ১৯৪৪ সালে শ্রীবিমল রায়-এর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "উদয়ের পথে" চিত্রে গোপার ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়।

শ্রীমতী ভারতী দেবী। ১৯৭০ সালে "ডাক্তার" চিত্রে শিবানীর ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়।

শ্রীমতী মলিনা দেবী। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "চিরকুমার সভা" চিত্রে নির্মলার ভূমিকায় এঁর প্রথম অভিনয়।

শ্রীমতী মণিকা গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর "দেবদত্ত ফিল্ম" কোম্পানীর "পথ ভুলে" চিত্রে মায়ার ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী যমুনা দেবী। ১৯৩৪ সালে "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর হিন্দী "রূপলেখা" চিত্রে ইনি প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৩৫ সালে "নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীর" "দেবদাস" চিত্রে পার্বতীর ভূমিকায় এঁর প্রথম বাঙলা চিত্রে অভিনয়। হিন্দি "রূপলেখা" ও "দেবদাস"-এর পরিচালক ছিলেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া।

শ্রীমতী রেণুকা রায়। স্বর্গীয় শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্তের পরিচালনায় "সোনোরে পিকচার্স" কোম্পানীর "খাসদখল" চিত্রে ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "খাসদখল" ১৯৩৫ সালে তোলা হয়।

শ্রীমতী লীলা দেশাই। ১৯৩১ সালে শ্রীনীতিন বসুর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স"-এর "দিদি" চিত্রে শীলার ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা। ১৯২৯ সালে "কপালকুণ্ডলা" চিত্রে মা কালীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন, তারপর ১৯৩০ সালে "কালপরিণয়" চিত্রে কালীঋষির ভূমিকায় অভিনয় করেন। "কপালকুণ্ডলা" ও "কালপরিণয়" "ম্যাডান কোম্পানীর" চিত্র এবং পরিচালনা করেন শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি প্রথম সবাক অভিনয় করেন ১৯৩১ সালে "প্রহ্লাদ" চিত্রে কয়াধুর ভূমিকায়। "ম্যাডান" কোম্পানীর এই চিত্রটী পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী সুনন্দা দেবী। ১৯৪৩ সালে শ্রীনীতিন বসুর পরিচালনায় "নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীর "কাশীনাথ" চিত্রে কমলার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী। ১৯৪৪ সালে শ্রীঅপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় "চিত্ররূপা" কোম্পানীর "সন্ধি" চিত্রে রেখার ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। প্রথম চিত্রে অভিনয় করিয়া ইনি ১৯৪৪ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী। ১৯৩৮ সালে শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "রাধা ফিল্ম কোম্পানীর" "বেকারনাশন" চিত্রে একটী নর্তকীর ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "বেকারনাশন" চিত্রে ইনি আঙ্গুর নামে অভিনয় করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাণী নামে ইনি প্রথম "বাঙলার মেয়ে"তে অভিনয় করেন।

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী। ১৯৩১ সালে শ্রীজ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "ম্যাডান কোম্পানীর" "ঋষির প্রেম" চিত্রে চিত্রার ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। "ঋষির প্রেম" প্রথম বাঙলা পূর্ণ দৈর্ঘ চিত্র।

অভিনেতা-পরিচালক—

শ্রীদেবকী কুমার বসু। ১৯২৯ সালে স্বর্গীয় শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাসের পরিচালনায় "বৃটিশ ডোমিনিয়ানস কোম্পানীর" "কামনার আগুণ" বা "Flames of flesh" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম চিত্র "পঞ্চশর" (নির্বাক)। "বৃটিশ ডোমিনিয়ানস কোম্পানী" এই চিত্রটি তোলেন। "পঞ্চশর"-এর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন দেবকীবাবু, এবং নিজে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক চিত্র "নিউ থিয়েটার্স কোম্পা-

নীর "চণ্ডীদাস।" এঁর পরিচালনায় এখন "স্যার শঙ্কর-নাথ" তোলা হইতেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি ডি, জি, (D. G.) নামে বিখ্যাত। ১৯২০ সালে শ্রীনীতিশ চন্দ্র লাহিড়ীর পরিচালনায় "ইণ্ডো বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানীর" "বিলাত ফেরত" বা England-Returned" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম চিত্র "লোটাস ফিল্ম কোম্পানীর" "লেডিটিচার" (নির্বাক)। এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক চিত্র "এক্সকিউজ মি স্যার।" এঁর পরিচালনায় এখন "শৃঙ্খল" তোলা হইতেছে।

শ্রীনীরেন লাহিড়ী। "নিশির ডাক" চিত্রে একটী ভূমিকায় ইনি প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত "ভাবীকাল" ১৯৩৫ সালে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এঁর পরিচালনায় "ভ্যান্‌গার্ড প্রোডাকসন্"-এর "জয়যাত্রা" গৃহীত হচ্ছে।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১৯২৭ সালে "কিনেমা আর্টস কোম্পানীর" স্বলিখিত "পুনর্জন্ম" চিত্রে রাজার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৩১ সালে "চাষার মেয়ে" চিত্রে ইনি প্রথম সহকারী পরিচালকের কাজ করেন। ১৯৩২ সালে "দেনাপাওনা" চিত্রটী ইনি প্রথম পরিচালনা করেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়। শ্রীচারু রায়-এর পরিচালনায় "ইষ্টার্ণ ফিল্ম কর্পোরেশন"-এর "লাভস অফ এ মোগল প্রিন্স" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম নির্বাক চিত্র "সন্দিগ্ধা।" এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক চিত্র "চাঁদসদাগর।" ইনি উপস্থিত কলিকাতায় একটী বাঙলা ছবি তোলার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া। ১৯২৯ সালে শ্রীদেবকী বসুর পরিচালনায় "বৃটিশ ডোমিনিয়ান্স ফিল্ম কোম্পানীর" "পঞ্চশর" চিত্রে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর "কিনেমা আর্ট কোম্পানীর" "ভাগ্যলক্ষ্মী" চিত্রে সরিতের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। "ভাগ্যলক্ষ্মী"র পরিচালক ছিলেন শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ। 'বড়ুয়া সাহেব' ১৯৩০ সালে "বড়ুয়া পিকচার্স কর্পোরেশন"-এর প্রথম চিত্র "অপরাধী" প্রযোজনা করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম চিত্র "বাঙলা ১৯৮৩।" "বাঙলা ১৯৮৩" চিত্র দিয়া "রূপবাণী" প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন হয়। এঁর পরিচালনায় এখন "অগ্রগামী" তোলা হইতেছে।

শ্রীমধু বসু। এঁর আসল নাম শ্রীসুকুমার বসু। ইনি ১৯২৩ সালে "ম্যাডান" কোম্পানীর একটি উর্দ্দু চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। ১৯২৭ সালে "All Burma Film Co"তে যোগ দিয়া "Dark House of life" চিত্রে আলোক শিল্পীর (Cameraman) কাজ করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম নির্বাক চিত্র "গিরিবালা।" "ম্যাডান" কোম্পানী "১৯২৯ সালে "গিরিবালা" তুলিয়াছিলেন। এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক চিত্র "সেলিনা" (উর্দ্দু)। এঁর পরিচালিত প্রথম বাঙলা সবাক "শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স কোম্পানীর" "আলিবাবা।" এই চিত্রটী ১৯৩৭ সালে তোলা হয়। এঁর পরিচালনায় এখন "গিরিবালা" সবাক তোলা হইতেছে।

শ্রীসুশীল কুমার মজুমদার। ইনি ১৯৩১খৃঃ "জীবন প্রভাত" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম নির্বাক ছবি "একদা।" এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক চিত্র "তরুবালা।" ইনি এখন "বাসন্তিকা প্রোডাকসান"-এর হইয়া "অভিযোগ" চিত্রখানি পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ১৯৩৫ সালে "পাতালপুরী" চিত্রে কুলিসর্দারে-র ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালনায় এখন "রায়-চৌধুরী" তোলা হইতেছে।

পুস্তক পরিচয়

নেতাজী—গোপাল ভৌমিক লিখিত। প্রকাশক শ্রীপাবলিশিং কোম্পানী। ২০৩।৪, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য: ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লেখক শ্রীযুত গোপাল ভৌমিক সম্পর্কে নূতন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। রূপ-মঞ্চ লেখক গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সভ্য। সাংবাদিক এবং কবি হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। 'নেতাজী'র বাল্য থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ও প্রচেষ্টা নিয়ে বর্তমান পুস্তকে আলোচনা করা হ'য়েছে। নেতাজীর রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী—দেশের আজীবন মুক্তি যুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রামশীলতা সুষ্ঠভাবেই আলোচ্য পুস্তকে ফুঠে উঠেছে। সেদিক থেকে যেমনি নেতাজীর কোন মর্যাদা হানি হয়নি, তেমনি আলোচ্যগ্রন্থে লেখক নিজের সুনামও অক্ষুন্নই রেখেছেন। পুস্তক খানির মুদ্রণ এবং বাধাই চমৎকার। —শ্রীতি দেবী

সুভাষ প্রশস্তি—শ্রীসুকান্ত কুমার মজুমদার কাব্যনিধি। প্রকাশক: জে, এন দত্ত এ্যাণ্ড ব্রাদার্স' ৭৭, বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য: দশ আনা। কবিতায় সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হ'য়েছে।

তোমাদের সুভাষচন্দ্র—শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লি: ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট: কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

'তোমাদের সুভাষচন্দ্র' ছোটদের জন্যই বিশেষ ভাবে রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ পর্যন্ত দেশের জন্য সুভাষচন্দ্রের আজীবন প্রচেষ্টার কথা বাংলার ভাবী বংশধরদের কাছে তুলে ধরে তাদের সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক দেশ প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'তেই লেখক বহু নির্দেশ দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বাল্য থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্যও আমরা আলোচ্য গ্রন্থে দেখতে পাই। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র ও বসু পারিবারের সংশ্লে সংশ্লিষ্ট ভারতীয়, জাতীয় আন্দোলনের বহু যোদ্ধার প্রতিকৃতি এই পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। রঙ্গিন মোটা কাগজে ছাপা—বোর্ড বাধাই প্রভৃতি ব্যাপারেও প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় দর্শন সৌন্দর্যের দিকে থেকে পুস্তক খানিকে শিশুমনের উপযোগী করে তুলবার জন্য যে ব্যয় ভার বহন করেছেন, সেজন্যও তাঁকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদপদটির প্রশংসা করতে পারবো না। পুস্তকের মূল্য দুর্মূল্যের বাজারের কথা চিন্তা করেও একটু কম হওয়া উচিত ছিল। —শ্রীতি দেবী

গল্পদাদার কথা—শ্রীকমল বসু সঙ্কলিত, পরিবেশক ছোটদের আসর ১৬।এ ডফ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম: একটাকা বারো আনা।

শ্রীমতী সুরাইয়া হিন্দি চিত্রে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

গল্পদাদার নামের সংগে পরিচিত নয়—এমন ছেলে মেয়ে এদেশে নেই বল্লেই চলে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ছোটদের জন্যে এক নিজস্ব আনন্দ ও শিক্ষার জগৎ সৃষ্টি করার জন্যে বেতারে ছোটদের আসর প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ও বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের প্রথম বন্ধু হয়ে দেখা দিলেন এই গল্পদাদা। সে অনেক দিনের কথা। তাঁর আসল নাম অনেকেই জানে না। বেতারের মধ্যে দিয়ে প্রতি মঙ্গলবার বা শুক্রবার তাঁর আনন্দ আহ্বান বাণী শুনতে পেয়ে বাংলার ও বৃহত্তর বাংলার বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষাভাষী ছেলে মেয়েরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে একত্রিত হয়েছিল ছোটদের আসরে। বেতারে তাঁর ছোটদের আসর আজ গল্পদাদার আসর নাম নিয়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের আনন্দ, শিক্ষার ও জ্ঞানের আনন্দ তীর্থ হয়ে আছে। গল্পদাদার কথা পড়লে মনে হয় গল্প গুলি যেন কানে শুনছি। মোটবত্রিশটা গল্প এতে স্থান পেয়েছে। নানান ধরনের ও নানান শ্রেণীর গল্প। আনন্দের সংগে শিক্ষা ও উপদেশের কেমন করে মিলন ঘটান যায় তারই হদিশ পাওয়া যাবে গল্পদাদার কথা'য়। এটা তাঁর জীবিত কালের প্রথম ও শেষ বই। বইখানি প্রকাশিত হবার পর প্রায় চৌদ্দ বছর অনাদৃত হয়ে পড়েছিল। ছোটদের আসর বইখানির পরিবেশনের ভার নিয়ে ভাল কাজই করেছেন। যারা গল্পদাদার নাম শুনেছে, চোখে দেখে নি বা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনে নি—তারা এবই খানির মধ্যে গল্পদাদাকে খুঁজে পাবে। সব গল্পগুলিই চমৎকার এই বই খানির স্থান বাংলার ঘরে ঘরে হওয়া উচিত। শ্রীগৌরী বসু।

থিয়েটার প্রসংগে—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রকাশক: প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ: ৪৬ ধর্মতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য: একটাকা। লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার এবং নাট্য সমালোচক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা নাট্যমঞ্চের বিভিন্ন সমস্যা, কয়েকটি বাংলা নাটকের বিখ্যাত চরিত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বাংলা থিয়েটার ও বাঙ্গালী মুসলমান প্রসংগে তিনি যে কথা গুলি বলেছেন, আমাদের কর্তৃপক্ষদের তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

নাট্যমঞ্চ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে দু'একখানার বেশী পুস্তক নেই—শ্রীযুত ভট্টাচার্যের এই বইখানি সে অভাব কতকাংশে মেটাতে পারবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। —শীলভদ্র

চাওয়া ও পাওয়া

[গল্প]

শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়

মোটা বাঁধানো একটা খাতা সাম্‌নে রেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আন্‌মনে কী ভাব্‌ছিলেন যেন!······সদ্যস্নাতা একটী তরুণী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার হোল বাবা?" প্রৌঢ় ভদ্রলোক চমকে উঠে বলেন—"হ্যাঁ মা। শুধু তোমাদেরই অপেক্ষা! আর একজন কোথায়?" সুদর্শন তরুণ একজন ঘরে ঢুকে বলে—"এই যে আমি। আপনি আরম্ভ করুণ।" তরুণ-তরুণী দুটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করে। প্রৌঢ় কিছুক্ষণ চুপ্‌ ক'রে থাকেন। একটু পরে বলেন—"আমার উপন্যাসের নাম দিয়েছি—"চাওয়া ও পাওয়া।" এর প্রত্যেকটী অক্ষর, এর প্রত্যেকটী হাসি কান্না, আলো-ছায়া,—সব সত্যি, সব জীবন্ত। শোন এবার—"প্রৌঢ় একাগ্রচিত্তে পাতার পর পাতা পড়ে যান। তরুণ-তরুণী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে যায়। তাদের চোখের সাম্‌নে যেন মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ········ বাইশ বছর আগে নিঃসম্বল অবস্থায় যুবক দুর্গানারায়ণ দেবপুর গ্রামে প্রথম এসে উপস্থিত হয়। সেদিন সবাই জান্‌ত ত্রিভুবনে দুর্গানারায়ণের আর কেউ নেই। গ্রামের নাম 'দেবপুর' হলেও শতাব্দীর অশিক্ষা, মহামারী, কুসংস্কার ও দলাদলী, সবকিছু মিলে গ্রামটাকে প্রায় 'নরক' করে' তুলেছিল সেদিন। দুর্গানারায়ণ দুর্গতদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম সহস্র বাধা-বিপত্তি তার অন্তরায় হলেও, কিছুদিনের মধ্যেই সে সকলকারই ভালবাসা পায়। তার দীপ্তিময় চেহারা, নিঃস্বার্থ সাহায্য, যুক্তিপুর্ণ পরামর্শ ক্রমে ক্রমে তাঁকে গ্রামের একজন মাতব্বর ক'রে তোলে। ······গ্রামেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হ'তে থাকে যুবকটীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। ···ধাপের পর ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে বছর পাঁচেকের মধ্যেই দুর্গানারায়ণ গ্রামের সেরা লোক হ'য়ে ওঠে। সদ্যস্থাপিত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্‌ সে,······। জমিদারের সাথে ঝগড়া-ঝাঁটির মীমাংসাকারী সে ·····গ্রামের বারোয়ারী পূজার পাণ্ডা হলো সে। আর্থিক দিক দিয়েও ক্রমে ক্রমে সেদিন-কার নিঃসম্বল দুর্গানারায়ণ ক্রমে গ্রামের সবচেয়ে বিত্তশালী ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে। কী ক'রে যে এমনটা সম্ভব হয়, তা আজ কেউ সঠিকভাবে বল্‌তে না পারলেও, ক্রমশঃ দেখা যায় যে, দেবপুর এবং আশে-পাশের আরো দু'একটা গ্রামের অধিকাংশ জমি-জমাই দুর্গা-নারায়ণের হেফাজতে এসে পৌঁছয়। চাষী মহলে চার আনা বার আনা হিসাবে ভাগ ক'রে দিয়ে দুর্গানারায়ণ চাষ করতে থাকে। চাষীরাও এতে খুব খুসী। খাজনার ঝক্কী নেই, জমিদারের হুম্‌কী নেই, বীজের ভাবনা নেই,—শুধু চাষ ক'রেই তারা খালাস। আর আশ্চর্য্য এই যে, যে জমির পিছনে আজীবন খেটেও তারা একমুঠো অন্নের যোগাড় করতে পারেনি, সেই জমিতেই দুর্গানারায়ণের কপালগুণে অথবা হাত যশে যেন সোনা ফলতে থাকে। মাত্র চার আনা ভাগ তাদের—তবু তাতেই তাদের বেশ চলে যায়। তাই তারা সন্তুষ্ট। লোকে তাকে বলে 'দেবতা'। জমিদার সহরে থাকেন। তাঁর দেখা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটেনি। তাদের কাছে দুর্গানারায়ণই হ'য়ে দাঁড়ায়,—দেবতা, জমিদার, মোড়ল—তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! দুর্গানারায়ণেরই চেষ্টায় গ্রামে মাইনর ইস্কুলও একটী খোলা হয়েছে কয়েক বছর আগে। গ্রামবাসীরা মহাখুসী। কিছুদিন পরে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী বলে—"দাদা, এবার একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলো"।

দুর্গানারায়ণ আশ্বাস দেন। কথাটা হয়ত তাঁরও মনে ধরে। আয়োজন চলে। শেষে একদিন মেয়ে ইস্কুল তৈরী হয়। সহর থেকে মাষ্টারণী আস্‌বে। গ্রামে হৈ চৈ পড়ে যায়।

পরিষ্কার উজ্জ্বল আকাশে মেঘ ওঠে······কালো ······ঝড়ের সঙ্কেত·····। দুর্গানারায়ণের এতদিনকার নির্বিঘ্ন জীবনে বিপদ আসে। মেয়ে ইস্কুল থেকেই তার সূত্রপাত। গ্রামের লোকের মাষ্টারণী সম্বন্ধে সমস্ত

বিকৃত কল্পনাকে ভেঙে দিয়ে যে মেয়েটী মেয়েইস্কুলের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্যে সহর থেকে এসে উপস্থিত হয়, তার দিকে চেয়ে সবাই বিস্মিত হয়। বিস্ময়ের কারণও ছিল বৈকী। ভারতী সুন্দরী····· দীপ্তিময়ী। তার সমস্ত অবয়বকে ঘিরে আছে একটা সহজ অথচ পরিচ্ছন্ন আভিজাত্য। গ্রামবাসীরা অনুমান ক'রে, কুড়ির বেশী নিশ্চয়ই বয়স হবে না। সাদাসিধে ঘরোয়া পরিচ্ছদ অংগে······মুখে সদাই যেন আঁকা আছে একটুকরো মিষ্টি হাসি। ······যেন ঘরের লোক ····আপনার জন। মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার পৃথ্বীশ রায় ভারতীকে নিয়ে যেতে আসে খেয়াঘাটে। ভারতীর সংগে তার বিধবা মা·········। দুদিনের পরিচয়েই ভারতী গাঁয়ের সবার সাথে ভাব করে নেয়। কেউ মাসী, কেউ দিদি, কেউ রাঙা বউদি! ছোট্ট মেয়েগুলি। যাদের দায়িত্বভার নিতে ভারতীর আগমন, তারা তো দিদি ছাড়া আর কথাই জানে না। মোটকথা, সবাই খুসী হয় ভারতীকে গ্রামের মধ্যে পেয়ে। শুধু ক'জন ছাড়া। তারা—

বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপ!······গ্রামের এজ্‌মালী বৈঠকখানা······প্রধানদের মন্ত্রণাগৃহ। অতি বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে নয়ান হাল্‌দার মন্তব্য করে—"উঁহু! এতো ভালো নয়। ভালো কথা নয়!" সমবেত কণ্ঠে সায় আসে। ত্রিলোচন বলে—"মান্‌লাম না হয় তোরা সহুরে মানুষ। তোদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা! তা'বলে এটা তো সহর নয়। সোমত্ত বয়েস তোর,—হেড্‌মাষ্টারের সাথে তোর অত মাখামাখির দরকার কী শুনি? তখনি বলেছিলাম ছেলে ছোক্‌রা রেখ না।" কুঞ্জ বোষ্টম কুঁড়োজালির মধ্যে হাত চালান বন্ধ করে বলে—"আর হেড্‌মাষ্টারেরই বা আক্কেলটা কী বল দেখি? না হয়, থাকিস্ তোরা কাছাকাছি। তা বলে দিবা-রাত্তির ওই মেয়েটার ওখানে ফুরসৎ পেলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে ধন্না দিতে হবে? কেন?" ·····গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে রসাল আলোচনা জমে উঠ্‌তে দেরী হয় না। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ নিম্নগামী হতে থাকে সকলকার। দা—কাটা তামাকের কল্‌কে নিভ্‌তে পায় না। ······ পরিশেষে স্থির হয়, প্রেসিডেণ্ট্ দুর্গানারায়ণের কাছে খবরগুলো পৌঁছে দেওয়ার! বিহীত যা কর্‌বার তিনিই কর্‌বেন। হাজার হোক্, গ্রামের মোড়ল!

পরামর্শ মত খবর পৌঁছেও দেওয়া হয়! কিন্তু না দিলেও হয়ত চল্‌ত!······দুর্গানারায়ণ আজকাল বুঝ্‌তে পারে, তার নিজের হাতে তৈরী সুখের কেল্লায় কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ফাটল ধরেছে। কারণটা ঠিকমত ধরতে না পারলেও, মেজাজটা তার যেন অকারণেই মাঝে মাঝে উগ্র হ'য়ে ওঠে হেড্‌মাষ্টার পৃথ্বীশের ওপর। অথচ কেন? ·····এমনিতে ছোক্‌রা মন্দ নয়! ভালোই বল্‌তে হবে। শুধু ছেলে ঠেঙিয়েই চুপ্ ক'রে থাকেনা! সবার বিপদে-আপদে যেন দশখানা হ'য়ে ছুটে আসে। ছোট্ট একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে ওর। কারো অসুখের খবর পেলেই সেটা হাতে নিয়ে ছোটে। ডাক্‌তে হয় না। পয়সাও নেয় না। কাজও হয় বেশ। গ্রামের প্রবীণ কবিরাজের শেকড় বিক্রি প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। রাগ তাই তাঁর কম নয়! কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না! গ্রামের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর কাছে পৃথ্বীশের ভীষণ খাতির!······

খাতির?······দুর্গানারায়ণের আপত্তিটা যেন ওইখানেই। চোখের ওপর দেখ্‌তে পায়, দিন দিন ছোক্‌রা কী রকম ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে। দুর্গানারায়ণের ভয় হয়। হয়ত তার এতদিনের প্রতিষ্ঠা একদিন এই ছোক্‌রা হেড্‌মাষ্টারের জন্যই হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। যদি তাই হয়?·········

দুর্গানারায়ণের হাসি পায়। তাই কী হয়? এই তো আজও লোকে বিপদে-আপদে, সম্পদে-পরামর্শে তারই কাছে ছুটে আসে। হ্যাঁ, অবশ্য ওর কাছেও অনেকে যায়, কিন্তু ক'জন? যারা যায়, তারা সব

চাষা-ভূষোর দল। ওদের জন্যে আবার ভয় কী? ওদের ভাত-কাপড় সবাই যে দুর্গানারায়ণের হাতে। ভাগের জমি ছাড়া আজ আর ওদের উপায় কী? ……রাগ হয়তো মাঝে মাঝে হয় পৃথ্বীশের ওপর, কিন্তু দুর্গানারায়ণ তবু ওকে ভাল না বেসেও পারে না। পৃথ্বীশকে বেশ লাগে ওর। পৃথ্বীশ যেন সেই আগের দিনের হারানো দুর্গানারায়ণ। ওর মধ্যে দুর্গানারায়ণ যেন ফিরে পায় নিজেকে। ঠিক তেম্‌নি কর্মঠ, তেমনি উৎসাহী! ……প্রায় প্রতিদিনই পৃথ্বীশ আসে দুর্গানারায়ণের কাছে। কত কথা হয়। পৃথ্বীশ হয়ত কোন কোন গ্রামোন্নয়ণ বিষয়ে ওর পরামর্শ চায়। অনেক সময় দুর্গানারায়ণ কথা প্রসংগে বলে যায়, নিজের অতীতের কথা! সহায় সম্বলহীন এক যুবকের প্রাণান্তকর উন্নতির সাধনা! পৃথ্বীশ একমনে শুনে যায়। এ যেন তার নিজের সাধনার কথাই শুনছে সে এক পূর্ববর্তীর কাছ হতে। …এমনি কতদিন। দুর্গানারায়ণ বলে—"সত্যি বল্‌তে কী পৃথ্বীশ, লোকে যতই নিঃস্বার্থ দেবতা বলে পুজো করুক না কেন, সত্যিই কি আমি তাই? আমার সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ কী নেই? তুমি 'না' বল্লে কী হবে? আমি নিজে জানি যে!" আবার কখনও বলে—"জান পৃথ্বীশ, আমি ছিলাম লেখক, কবি! কত গান লিখেছি।" মোটা একটা খাতা দেখিয়ে বলে—"একটা উপন্যাস লিখ্‌ছি। জানি না,—কবে কি ভাবে শেষ হবে?" পৃথ্বীশ হয়ত জিজ্ঞাসা করে—"আরো লেখেন না কেন?" দুর্গানারায়ণ হঠাৎ যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। বলে—"কী হবে লিখে? ওর দাম কেউ দেয় না। পেট চলে না। তাই ছেড়ে দিতে হোল। টাকা বড় জিনিষ! ওর পায়ে সব কিছুই দিতে হয়!" বল্‌তে বল্‌তে দুর্গানারায়ণ কিছুক্ষণের জন্য চুপ্‌ করে যায়! একটু পরে আবার বলে—"সুখ-দুঃখের দুটো মুখ এক করা বোধ হয় যায় না। টাকা তো পেলাম, কিন্তু কী হোল তাতে বল তো পৃথ্বীশ? কার জন্যে এত কিছু? কেউ কী আর আছে আজ?" দুর্গানারায়ণের গলা ভারী হয়ে আসে। পৃথ্বীশ বিস্মিত হয়। আশ্চর্য লাগে তার! যেন কী একটা ধূমাচ্ছন্ন হেঁয়ালী। পৃথ্বীশ বোঝে। একটা কোন ব্যথা এই লোকটীর বুকে বাসা বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে তারই বহিঃপ্রকাশ এসব! ……

নিঃস্বার্থ পরোপকারের একটা মোহ আছে নিশ্চয়, নইলে ভারতীর কোন প্রয়োজন ছিল না পৃথ্বীশের সাথে বেগার-খাটায় যোগ দেওয়ার। ওরা দুজনে মিলে কাজের অবসরে সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়! শোনে গ্রামবাসীর অভিযোগ, আনন্দের ভাগ নেয়, কলেরা রোগীর চিকিৎসা করতে ছোটে রাত দুপুরে গ্রামের প্রান্তে অস্পৃশ্য পল্লীতে!………

আবার কখনও দুজনকে বিকালের পড়ন্ত রোদে শীর্ণা নদী তপতীর তীরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে নরম ঘাসের ওপর ব'সে ওরা জিরিয়ে নেয়। পৃথ্বীশ হয়ত বেহালা বাজায়, ভারতী শোনে। …… চমৎকার বাজায় পৃথ্বীশ। মাঝে মাঝে ভারতী গান গায়। পৃথ্বীশ মুগ্ধ হয়ে শোনে। ……এমনিধারা কত কী!……ওদের ঘনিষ্টতা বেড়ে চলে। মুষ্টিমেয় বিরুদ্ধবাসীরা নূতন উৎসাহে আলোচনা কদর্যতায় রসতিক্ত করে তোলে। ……

ভারতী অনুযোগ করে—"তুমি না বলেছিলে মা, যে, বাবা আশে-পাশে কোথায় থাকেন? এখানে এলে তাঁর দেখা পাবই। কই? কেউ তো জানে না এখানে তাঁকে!" মা ব্যথা পান। একমাত্র সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে দেখেনি। তার জন্মের এক বছর পরেই তিনি একদিন অভাবের তাড়নায় হঠাৎ না বলে কোথায় চলে যান। সেই থেকে……অতীত-স্মৃতি…… কত কষ্ট—লাঞ্ছনা……নিরুপায় নারী ……ক্রোড়ে শিশু! ……ওঃ! সে কতদিনের কথা!……যেন দুঃস্বপ্ন! ……বহুকাল পরে! নারী সংবাদ পায় স্বামী তার দেবপুর গ্রামের কাছেই আছেন। … চক্রীর ইংগিত! মেয়ে ভারতী কাজ পায় সেই দেবপুর গাঁয়েরই মেয়েস্কুলে।…… অসীম আশা ছিল যার মনে। কিন্তু হায়…

. মার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে।... ভারতী বোঝে মা'র ব্যথা। দু'হাতে ছোট্ট আদুরে মেয়ের মত মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলে- "মাগো, মা। কী ছিঁচ্‌কাঁদুনে যে হোচ্ছ তুমি দিন দিন! লক্ষ্মী মা আমার! কাঁদে না - ছিঃ! আর কখনও বল্‌ব না ওকথা! এমন মা রয়েছে আমার—নাই বা এলো বাবা!" মা আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠেন—"চুপ্‌-চুপ্‌! অমন কথা বলিস্‌নে খুকী! বল্‌তে নেই।"—

ঝগড়াটা বেশ পেকে ওঠে! গ্রামে সার্বজনীন দুর্গাপূজা! খুব ধুম!...ঢাকের বাজনা...ছোট ছেলেমেয়ে...যাত্রা!... মহাষ্টমী। দলে দলে গ্রামবাসী ছেলেমেয়ে সবাই অঞ্জলি দেয়...মানত্‌ করে। পৃথ্বীশ ও ভারতী মহা উৎসাহে খাটাখাটী করে। দেখাদেখি গ্রামের তরুণ দলও তাদের সংগে যোগ দেয়। দুর্গানারায়ণ দাঁড়িয়ে দেখে...তদারক করে মুগ্ধ হয়।...হঠাৎ গোলমাল ওঠে পূজামণ্ডপে। পুরোহিত চিৎকার ক'রে ওঠেন—"এ অশাস্ত্রীয়"—পৃথ্বীশ প্রতিবাদ করে—'না। পূজো যখন সার্বজনীন্‌—সর্বজনের অধিকার সেখানে থাক্‌বেই। অস্পৃশ্যর চাঁদায় যদি পুজো হ'তে পারে, তার পুষ্পাঞ্জলীও মা'কে গ্রহণ কর্তেই হবে। নইলে জগজ্জননী কিসের?"...তর্ক বেড়ে চলে। একদিকে তরুণ দল, অপরদিকে প্রবীণদের অনেকে!... শেষপর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী প্রবীণদের দল রাগ ক'রে পুরোহিতকে সংগে নিয়ে মণ্ডপ ত্যাগ করেন। যাবার সময় পৃথ্বীশকে শাসিয়ে যান—"পুজো আচ্চা নিয়ে ছেলেমানুষী ক'রো না! মায়ের অভিশাপে সর্বনাশ হবে। সাবধান!"......

পৃথ্বীশ হেসে বলে—"অভয়ার যে সর্বনাশী হওয়াই দরকার হয়েছে আজ!"...অস্পৃশ্যদের মুখে হাসি ফোটে। তারা পুষ্পাঞ্জলীর অধিকার পায়। পৃথ্বীশ নিজে পৌরহিত্য করে।

অভিযোগ আসে—"বিহিত একটা করো!"

দুর্গানারায়ণ আশ্বাস দেয়—"হুঁ! তাইতো দরকার দেখ্‌ছি! আচ্ছা হবে!" দুর্গানারায়ণ আবার ভাবে। তাইতো! আশঙ্কা তার সত্যি হবে নাকি? চাষার দল কেমন যেন ভিন্ন সুর ধর্‌তে চায়। ভাগ নিয়ে এতকাল বাদে হঠাৎ গোলমাল আরম্ভ করে আজকাল। শুধু ওরা কেন? ভদ্র দলের অনেকেও তো আজকাল ওদের সুরে কথা কয়। · তাইতো! দুর্গানারায়ণ আরও চিন্তিত হয়,— হয়ত একটু শঙ্কিতও! .....

দিনকয়েক পরে। সন্ধ্যাবেলা সদর থেকে ফেরবার পথে দুর্গানারায়ণ একবার পৃথ্বীশের সাথে দেখা ক'রে একটা মীমাংসা ক'রে যেতে চায়! পৃথ্বীশের বাসার আগে একটা ছোট মাঠ।...মাঠের ধারে ছোট্ট একটী খোড়ো বাড়ী! ভারতী আর তার মা থাকে বাড়ীটায়। হঠাৎ দুর্গানারায়ণের কাণে যায় মেয়েলী কণ্ঠের গানের একটা টুক্‌রা। দুর্গানারায়ণ চম্‌কে ওঠে।...এ গান ভারতী কি ক'রে গায়? এযে তার নিজের লেখা! একটু ইতস্ততঃ ক'রে দুর্গানারায়ণ ওদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সামনের খোলা ঘরটাতে বসে ভারতী আর পৃথ্বীশ। ভারতী গায়, মুগ্ধ

পৃথ্বীশ শোনে। দুর্গানারায়ণের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন কোথায় জ্বালা করে ওঠে। মুহূর্তমাত্র···। ওকে এরা আদর-অভ্যর্থনা জানায়। আসন গ্রহণ ক'রে দুর্গানারায়ণ জিজ্ঞাসা ক'রে—"একটা কথা মা! এ গান তোমায় কে শেখাল?" ভারতী জবাব দেয়, "আমার এক আত্মীয়দের কাছে পাওয়া! বেশ গান, না?" দুর্গানারায়ণ বলে—"হাঁ! ইচ্ছা হয় আত্মীয়টীর নাম জান্তে! ইচ্ছা দমন করে! পৃথ্বীশ কথা আরম্ভ করে দুর্গানারায়ণের সংগে। একসময় এরি ফাঁকে ভিতর হ'তে ঘুরে এসে ভারতী জানায়—"যদি বা এলেন, একটু কিছু খেয়ে যেতে হবে কিন্তু! আমি মাকে বলে এলাম।" সসব্যস্তে দুর্গানারায়ণ বলেন—"আবার ওসব কেন মা? এ তোমার বাড়াবাড়ি।"—"হাঁ, তা বৈকি! বলবেন ওকথা মাকে!"—ভারতী হেসে বলে। কথা চল্‌তে থাকে নানারকম। হঠাৎ একসময় ঘরের ভিতর দিক্‌কার দরজার কাছে গোটাকতক কাংসপাত্রের সাথে গুরুভার পতনের শব্দে সকলে চম্‌কে ওঠে। ভারতী তাড়াতাড়ি পর্দা ঠেলে ভিতরে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বার হ'য়ে আসে। বলে—খাবার থালা সমেত মা হঠাৎ পড়ে গিয়েছেন। পৃথ্বীশ ছুটে ভিতরে যায়। বিব্রতভাবে দুর্গানারায়ণ বলে—"না—না, এ অন্যায়—অন্যায়! আমার জন্যেই,—আমি যাই। কব্‌রেজ্‌কে পাঠিয়ে দিই।" বল্‌তে বল্‌তে সে বার হয়ে যায়। একদিকে ভারতী আর পৃথ্বীশ,—অপরদিকে মা। দুদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলে। কিন্তু কিছুই হয় না। মারা যাবার আগের ক্ষণটীতে মা তাদের কাছে ডেকে বলেন—"পৃথ্বীশ, ভারতী তোমার।"

মেয়েকে বলেন—"যাকে তুই প্রেসিডেন্ট বলে জানিস্ তার আসল নাম দুর্গানারায়ণ নয়। ওই তোর বাবা"

দুর্গানারায়ণ বসে বসে ভাবে।···ঝড় তাহ'লে সত্যিই উঠ্‌ল। আশ্চর্য। দুর্গানারায়ণ ভেবে পায় না এতো সাহস ওদের হোল কোথা হতে? কোন সাহসে এতদিন পরে প্রকাশ্য হাটে ওরা দুর্গানারায়ণকে তার ন্যায্য ভাগ দিতে অস্বীকার করে? এ নিশ্চয়ই পৃথ্বীশের কাজ। অথচ আইন কানুন ও দেশের এমন বিশ্রি হচ্ছে দিন দিন। ওর নিজের জমিও ইচ্ছামত কেড়ে নিতে পারবে না? দুর্গানারায়ণকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয় দেখায় গণ্ডমূর্খ্য চাষারা? সাহস বটে! বলে—"বাবু চিরটাকালই তো ফাঁকী দিয়ে সিকি বখ্‌রায় খাটিয়ে নিলে। এবার থেকে আধাআধি নাও। নইলে মোরা ধান জমা দেব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে! তেনাই বখ্‌রা কর্বেন।" "ওঃ! অসহ্য! কে শেখাল ওদের এসব?···নিশ্চয়ই ওই হেড্‌মাষ্টার। ঝরের মত ঘরে ঢোকে ভারতী! তার বেশবাস অবিন্যস্ত। বলে—"চলুন"—বিস্মিত দুর্গানারায়ণ বলে—"একি মা? কোথায় যেতে হবে?"—"শ্মশানে!" আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রীর মুখাগ্নি করতে!" ভারতী একদমে বলে যায়। দুর্গানারায়ণ চম্‌কে ওঠেন—"কী," কার কথা বল্‌লে মা?" ভারতী যেন ফেটে পড়ে। বলে—"আপনার স্ত্রী যোগমায়া দেবীর—আমার মা! তিনিই আমাকে বলে গেছেন আপনার নাম দুর্গানারায়ণ নয়—! আর লুকিয়ে লাভ কী?" আকস্মিকতায় দুর্গানারায়ণ যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যেন তার সম্বিৎ থাকে না। ভারতী আবার বলে—"কী যাবেন?" অর্ধ চেতনের মত দুর্গানারায়ণ বলে—"হাঁ, হাঁ, যাব বৈকী। কিন্তু—তুমি—আমার মিনু—সেই এতটুকু মিনু—? কাছে আয়তো মা—" দুর্গানারায়ণ ভারতীকে ধরতে যায়। ভারতী ঠিক্‌রে গিয়ে বলে—"না—না! তুমি আমার কেউ নও। আমার মাকে যে মেরে ফেলেছে তিল তিল ক'রে, সে আমার কেউ নয়!"

ভারতী আর দুর্গানারায়ণ...যেন দুটি সমান্তরাল সরল রেখা। দুর্গানারায়ণ তার সমস্ত অতীতকে মুছে দিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে একান্ত ক'রে ফিরে পেতে চায় তার হারাণো মেয়েকে নিজের বুকের মধ্যে। বিক্ষুব্ধ পিতৃস্নেহ বারবার পাষাণে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ভারতী ধরা দেয় না—দিতে চায় না। দুর্গানারায়ণ নিত্য ভারতীর বাসায় গিয়ে অনুরোধ জানায়। বলে—"আমায় মাপ কর্তে কী পার্বে না মা? স্বীকার করি, আমার কর্তব্য পালন না ক'রে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তোদের ছেড়ে; কিন্তু সেওতো তোদের জন্যে। আমার একার জন্যে এতো অর্থোপার্জনের কোন দরকার তো ছিল না মা।" ভারতী সে কথায়

কোন কাণ দেয় না। সে বলে, "টাকা তোমার কী কাজে লাগ্‌ল?" তার মনে পড়ে পিছনে ফেলে-আসা দুঃখ-বন্ধুর দিনগুলির কথা। তার মা কত কষ্টে…লাঞ্ছনা…অপমান শুধু তার জন্যে? যার কর্তব্য সে পালাল,…অসহায়া নারী পড়ে রইল সন্তান বুকে নিয়ে।…মনে আশা ছিল তার, হয়ত একদিন…সেই মা তার…ওঃ। ভারতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে…দুর্গানারায়ণ মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলেন—"কাঁদিস্‌নে মা। তোর মা'র কাছে আমার অপরাধ জমা হয়ে আছে। তোকে অবলম্বন ক'রে আমায় তা'র বোঝা হাল্কা কর্‌তে দে। ভারতী মুখ না তুলেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে—"না—না, তা হ'বে না। তুমি তা' কর্‌তে চেও না! আমি তাহলে চলে যাব এখান হ'তে।" "দুর্গানারায়ণ অপরাধীর মত বার হয়ে আসে। বুকের মধ্যে তারও যেন অভিমান গুমরে উঠ্‌তে থাকে. বাঃ রে বাঃ! তার ব্যথা কী কেউ বুঝ্‌বে না? খোঁজ কী সে করিনি? এক বোঝা খবরের কাগজ বিজ্ঞাপন সমেত আজও যে তার ঘরে জমা হয়ে আছে সাক্ষ্য দিতে। কী না করেছে সে ওদের সন্ধান কর্‌তে? অথচ, আজ সেকথা কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না, কেউ শুন্‌তে পর্যন্ত চাইবে না। চমৎকার…।

গ্রামের লোকে বিপদে-আপদে দুর্গানারায়ণকে আর তাদের মধ্যে পায় না। ও যেন আজকাল এক অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছে!…এই সুযোগে পৃথ্বীশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সবাই আজকাল তারই কাছে ছোটে। ক্রমে সেই যেন মোড়ল হয়ে উঠ্‌তে থাকে।…ত্রিলোচন বলে—"দাদা, এম্‌নি ক'রে থেক না তুমি! যাহোক্‌ একটা করো!" নয়ান হাল্‌দার বলে—"শেষপর্যন্ত ব্যাঙাচীর মাথায় ছাতা ধর্‌তে হবে? আরে ছোঃ!" কুঞ্জ বৈষ্ণব বলে—"নামের মাহাত্ম্য থাক্‌বে নাকি ঐ ম্লেচ্ছটার কাণ্ডর চোটে?" দুর্গানারায়ণ আশ্বাস দেয়—"আর ক'টা দিন সবুর কর' ভাই।"

উনপঞ্চাশ সাল এসে পড়ে। বন্যা—অনাহার…মহামারী-হাহাকার!…দুর্গানারায়ণ কড়া হতে চায়। অনাহারক্লিষ্ট, বিপর্যস্ত গ্রামবাসী বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। পৃথ্বীশ আর ভারতী আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তাদের জন্যে। পৃথ্বীশ প্রায়ই আজকাল সদরে ছোটে সরকারী সাহায্যের বন্দোবস্ত কর্তে! কিছু কিছু সুবিধা হয়ও তাতে। উপকৃতের দল পৃথ্বীশকে পূজা করে!…দুর্গানারায়ণ বিদ্রোহী দলকে জব্দ কর্বার ফন্দী আঁটে। গ্রামের বখাটে ছোঁড়া হলধরকে হাত করে পাঠায় সে মজিলপুরের কারখানা-ওয়ালাদের কাছে। দিনকতক উভয়পক্ষে গুপ্ত পরামর্শ চলে। চুপেচুপে…একান্ত সঙ্গোপনে!…হঠাৎ একদিন দেখা যায়, দলে দলে অনাহারক্লিষ্ট গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে হাসিমুখে চলেছে কারখানায় কাজ কর্‌তে। আড়কাঠি—হলধর—। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বা বাধা দিলে তারা বলে—"গ্রামেই তো ছিলেম এতকাল। এবার দেখি কম্‌নে চাল মাপা আছে!" পৃথ্বীশ অনেক চেষ্টা করে বোঝাবার! কোন ফল হয় না। দলে দলে গ্রামের সমর্থ লোকেরা

গ্রামছাড়া হয়ে যায়। আগে পুরুষ, তারপরে মেয়েরা!… অবিবাহিতা কুমারী,—ঘরের বৌ!…দুর্গানারায়ণ বলে,—"কৈ? বাঁচাক্ এবার ওদের! দিক্ খেতে!"…কিছুদিন পরে ভাগ্যান্বেষীর দল আবার ফিরে আস্তে থাকে। চাকুরী গেছে তাদের। পুরুষের যখন সামর্থ্য নেই, নারীর নেই রূপ যৌবন তখন তাদের দরকারও নেই কারখানায়! হতভাগ্যের দল বুক চাপড়ে কাঁদে!…সদরে ছুটোছুটি ক'রে পৃথ্বীশ শেষপর্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তায় কাজের নামে লোক চালান বন্ধ ক'রে।

হলধরের নামে হুলিয়া বার হয়।

সেদিন হাট্‌বার। দলে দলে লোক ভিড় করে। যদি কিছু চাল পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় চাল? গ্রামের সমস্ত চাল দুর্গানারায়ণের গুদামে তালা বন্ধ। দুর্গানারায়ণও এসেছিল। বোধ হয়, বিদ্রোহী দলের দুঃখে মজা দেখ্‌তে। সংগে মোসাহেব দল। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা মোটর এসে থামে সেথায়। ভিতর হ'তে নামে ম্যাজিষ্ট্রেট্, জমিদার আর পৃথ্বীশ। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে শেষপর্যন্ত দুর্গানারায়ণকে গুদাম খুলে দিতে হয়। সকলের মত নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ আর জমিদার শস্যভাগের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যান পৃথ্বীশকে। দুর্গানারায়ণের প্রতিবাদের উত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলেন—"হাঁ, চালের দাম আপনি পাবেন বৈকি। তবে চাল আর এখন আপনার নয়। আপনি শিক্ষিত, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট্। আপনার বোঝা উচিৎ যে, গ্রামশুদ্ধ অনাহারে রেখে চাল গুদামজাত করা আইন সংগতও নয়, উচিতও নয়। জমিদার আরও দিন কয়েক গ্রামে থেকে যান। পৃথ্বীশ তাঁকে সংগে করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রামের অবস্থা দেখায়। যাওয়ার আগে ইউনিয়ন বোর্ডের জরুরী মিটিং করে জমি ভাগ বাটোয়ারার দায়িত্ব দুর্গানারায়ণের কাছ হ'তে নিয়ে তিনি পৃথ্বীশের হাতে দিয়ে যান। দুর্গানারায়ণকে তিনি বলেন—"অনেকদিন তো আপনি খাটলেন, এবার বিশ্রাম করুণ। অবশ্য জমি আপনি আবার নিতে পারেন চাষ কর্‌বার জন্যে, তবে তার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে আপনাকে পৃথ্বীশ বাবুর সাথে।" পরাজয়ের গ্লানিতে দুর্গানারায়ণ মুখ তুল্‌তে পারে না।……পরাজয়ের ওপর পরাজয়।……ইউনিয়ন বোর্ডের নূতন নির্বাচনী। দুর্গানারায়ণের সহস্র চেষ্টা ও বাধাদান সত্ত্বেও শেষ প[র্যন্ত] ভোটাধিক্যে পৃথ্বীশই দুর্গানারায়ণের ২০ বছরের প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করে প্রেসিডেন্ট্ নির্বাচিত হয়।……প্রৌঢ় দুর্গানারায়ণ অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য ক'রে এতদিন এলেও এর আঘাত সহ্য কর্‌তে পারে না। শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হয়।……ত্রিলোচন আসে সহানুভূতি জানাতে, নয়ান হালদার গাল পাড়ে পৃথ্বীশকে, কুঞ্জ-বোষ্টম ধর্মাভাবের সম্ভাবনায় শিউরে ওঠে। দুর্গানারায়ণ ভাবে। আব ভাবে। তার মধ্যে চল্‌তে থাকে প্রচণ্ড একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। মন জুড়ে অপমানের অন্ধকার মাঝে নিত্য নিয়ত জ্বলে দীপ্তিময় একটা মুখ। সে মুখ ভারতীর। ভারতী খবর পায়, পৃথ্বীশও। ভারতী প্রথমে যেতে চায় না। পৃথ্বীশ বোঝায় তাকে। শেষ পর্যন্ত তারা রুগ্নের প[রি]চর্যা ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। দুর্গানা[রায়]ণ তখন জ্বরে বেহুঁস্। মাঝে মাঝে ভুল বকে—"মায়া, মিনু যে আমার কোলে আস্‌ছে না! ওকে বলনা তুমি আস্‌তে! একবার-শুধু একটীবার।—" ভারতী রোগীর মাথায় জলপটী পাল্‌টে দেয়।…… কিছুক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থেকে দুর্গানারায়ণ আবার হয়ত প্রলাপ আরম্ভ করে—"মিনু! মা আমার! তুমি 'ভারতী' হ'লে কেন? তাইতো আমায় কাছে যেতে দাওনা! তুমি আবার মিনু হও—সেই ছোট্ট মিনু"—এমনি আরও কত কী!…… ভারতী বলে—'তুমি একটু বস!' পৃথ্বীশ তার হাত থেকে পাখা নিতে গিয়ে দেখে ভারতীর চোখের পাতা উপ্‌চে পড়ে জলে। চোখাচোখি হতেই সে আর চাপ্‌তে পারে না। পৃথ্বীশ সান্তনা দেয়—"ছিঃ! কাঁদ্‌তে আছে কী রুগীর কাছে? আমরা ওঁকে ভাল করে তুলবই!……"

পৃথ্বীশ আর ভারতীর অক্লান্ত সেবা আর পরিচর্যায় দুর্গানারায়ণ সে যাত্রা মাসাধিক কাল শয্যাগত থেকেও সেরে ওঠেন। ভারতী ফিরে যায় তার বাসায়। কিন্তু

তাদের নিয়মিতভাবে আস্তেই হয়। রোগশীর্ণ দুর্গা-নারায়ণ অসীম আগ্রহে পথ চেয়ে থাকে। ভারতীর মৃদুতম পদশব্দটীও তার কান এড়ায় না। মায়ের মত ভারতী তাকে পথ্য করায়। —বিছানা ক'রে শোয়ায়। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়।......যেন একটী অসহায় শিশু।......ভারতীরও কী মায়া পড়ে যায় দুর্গা-নারায়ণের ওপর। পরিচর্যাকারিণীর সহজ কর্তব্য ছাড়া তা' কিন্তু আর কোন পথেই প্রকাশ পায় না।...... দুর্গানারায়ণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে। আজও হয়ত আশা আছে তার মনে হারানিধি ফিরে পাওয়ার! কিন্তু সেদিন আস্বে কবে? কবে?......

অপেক্ষার শেষ হয় দুর্গানারায়ণের! বৃথা আশা। ......গ্রাম ছেড়ে যেতে মনস্থ করে সে! কেন থাক্বে? কোন আশয়? পৃথ্বীশ অনুরোধ ক'রে, "আপনি থাকুন! সবকিছু আপনাকে ফেরৎ দিয়ে আমিই না হয় চলে যাব!" দুর্গানারায়ণ জবাব দেয়—'তোমার সহৃদয়তায় আমার সন্দেহ নেই পৃথ্বীশ। কিন্তু ভিক্ষে আমি চাই না! যা' আমি একদিন নিজের সামর্থে উপার্জন বা লাভ করেছিলাম, তা' যদি আজ আমার হাতছাড়া হয়েই যায়—আমি বুঝব সে আমার দুর্বল অক্ষমতা। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, তোমায় আমি প্রথম দিন থেকেই ভালবেসেছি। পৃথ্বীশের সব যুক্তি হার মানে। হতাশ হয়ে সে ফিরে যায়। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। —পৃথ্বীশ আর ভারতী এসে দাঁড়ায়!......

দুর্গানারায়ণ বলে—"ভালই হোল তোমরা এসেছ। আমার মেয়ে হ'তে তুমি রাজী না হলেও, আমি তোমাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। তোমারই জন্যে রইল আমার এতদিনের সবকিছু সঞ্চয়। ইচ্ছে হয় নিও—নয়ত বিলিয়ে দিও!" পৃথ্বীশ বলে—"যাওয়া আপনার হবে না—ফিরে চলুন" দুর্গানারায়ণ দৃপ্তকণ্ঠে বলে—"আমাকে আদেশ কর্বার স্পর্ধা তোমার হয় কোথা হ'তে পৃথ্বীশ? যাওয়ার সময় প্রীতি বজায় রাখাই ভাল!" দুর্গানারায়ণ পা বাড়ান। ......ভারতী ডাকে – "বাবা—যেয়োনা"—দুর্গানারায়ণ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ান জীবনে এই প্রথম। ভারতী বলে—"তোমায় আমি যেতে দেব না বাবা! তুমি থাকবে আমাদের সংগে। আমাদের বিয়েয় করবে আশীর্বাদ। মা' আমাকে এঁর হাতে দিয়ে গেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে তুমি রাখ্বে না?" যাওয়া আর হয়না দুর্গানারায়ণের। ......মৃতা-পত্নীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে মেয়ে জামাইয়ের কাছে তাঁকে থাক্তে হয়। এ বয়সে তারা দুর্গানারায়ণকে একা ছেড়ে দেয় না। ......দুর্গানারায়ণকে তারা কোন কাজ কর্তে দেয়না। সে শুধু বসে বসে তার অসমাপ্ত উপন্যাস লিখে যায়। ভারতী আর পৃথ্বীশের অনুরোধে আর আব্দারের জুলুমে। রোজ তারা এসে খোঁজ নেয়—"আর কত বাকী?"......শেষে উপন্যাস রচনা সমাপ্ত হয় একদিন। দুর্গানারায়ণের ঘটনা বহুল আত্ম-জীবনী।......

প্রৌঢ়ের পাঠ শেষ হয়।......

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে যেন একটা জীবন্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

একসময়ে প্রৌঢ় বলে—"চাওয়া আমার শেষ হ'য়ে গেছে মা, পাওয়াও হয়েছে সার্থক। এখন শুধু দেনা পাওনার হিসাব শেষ হওয়ার অপেক্ষা। তবে একথা আজ আমি বল্ব—যতবড় লোকসানই দিতে হোক না আমায়—জীবনের নিক্তি আমার দিকেই লাভের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। মিনু আর পৃথ্বীশের দাম কী দিয়ে মাপ্ব আমি?"

পৃথ্বীশ আর ভারতী নিঃশব্দে প্রৌঢ় দুর্গানারায়ণকে প্রণাম করে। প্রৌঢ়ের মুখে ফুটে ওঠে পরম তৃপ্তি ও প্রসন্নতার আভা।

পর্দার চরিত্র সৃষ্টি

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

★

কথা সাহিত্যের মত কথাচিত্র মুখর ছবির একটি প্রধান অঙ্গ চরিত্র-চিত্রণ। দুইয়েরই আবেদন এবং উৎকর্ষ বিশেষভাবে সার্থক ও সজীব চরিত্র সৃষ্টির মুখাপেক্ষী। চরিত্রকে রূপায়িত এবং রসায়িত করার জন্যেই নিপুণ ঘটনা সংস্থাপন, বিষয়বস্তুর প্রসার ও পরিধি বিস্তার, প্রকাশভঙ্গীর গতিশীলতা—এইসব উপকরণের সাহায্য নিতে হয় যেমন কথাশিল্পীকে তেমনি সবাকচিত্রের স্রষ্টাকে। চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের জন্যইত যত কিছু আয়োজন, যত কলা কৌশল যেমন সাহিত্যের এলাকায় তেমনি সিনেমায়।

আর্টের এই দুটি বিশিষ্ট বিভাগে চরিত্রসৃষ্টি আর্টরস পিপাসুর মনে স্থায়ীভাবের সঞ্চার একইভাবে করলেও পাঠকের মনে একটির স্থায়িত্ব যেমন, দর্শকমনে অন্যটির তেমন নয়। পর্দার চরিত্রসৃষ্টির সাময়িক জনপ্রিয়তা যে পরিমাণে বেশী, দর্শকের স্মৃতিপুষ্ট হ'য়ে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা সেই পরিমাণেই কম। বছর বছর ছবির পর ছবি তৈরী হচ্ছে, ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে, কাগজে কাগজে অল্পবিস্তর প্রশংসা এবং অনুকূল সমালোচনা চলেছে, হাজার হাজার দর্শক দেখে আসছেন। সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটার যবনিকাপাত ঐখানেই। দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার পর চিত্রপ্রিয় দর্শকমনের ওপর তাদের কতটুকু ছাপই বা থাকছে? অথচ তারা যে সাময়িক উত্তেজনা ও আবেগের সঞ্চার করছে চিত্রগৃহের স্বল্প পরিসরটুকুর মধ্যে, তা'ও কত সত্যি! কত অশ্রুবর্ষণ, কত শিহরণ, পুলক, রোমাঞ্চ, হাসির রোল সহানুভূতির অস্ফুট শব্দ আর হাততালি ছবিঘরের বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে—স্বপ্নের মতই তাদের ক্ষণস্থায়িত্ব—ছায়াছবির ছায়া-অংশের মতই যেন অসার ও অলীক, ছবির অংশ যেন কিছুই নয়। এই যে ক্ষণিক উন্মাদনা এবং মোহের আবেশ সৃষ্টি করে বাণীচিত্র, তার শক্তির উৎস রয়েছে এর মূল দুটি উপাদানে—বাণীতে আর চরিত্রে; দর্শকের শ্রেষ্ঠ দুটি ইন্দ্রিয় কানে আর চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দিয়ে যায়।

কথাসাহিত্যের আর যে গুণই থাক, হাতে হাতে এইরকম ফল লাভের ক্ষমতাটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনা এবং রচনানৈপুণ্য সত্ত্বেও এর চরিত্রের আবেদন পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হ'তে সময় লাগে কিন্তু স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়না সহজে। এই কারণেই এর চরিত্র রচনায় রূপ ও রেখা, বলিষ্ঠতা এবং সাবলীলতার প্রয়োজন তুলনায় অনেক বেশী। তাই দেখি, কি দেশী কি বিদেশী সাহিত্যের এলাকায় যতো বেশী চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে আর নিজস্বতায়, মহিমায় আর ঐশ্বর্যে আমাদের পাঠকমনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, সেলুলয়েডে সৃষ্ট এতো বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্র বা ভূমিকার মধ্যে অতি সামান্য এমনকি নগণ্য অংশই আমাদের দর্শকমনে তেমনভাবে বেঁচে আছে। ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড আর ইউরায়া হিপ, গোর্কির প্যাভেল আর 'মা', স্কটের আইভ্যানহো আর রেবেকা, ডুমার 'ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক'—এ রাওল আর হেনরিয়েটা, বঙ্কিমের কমলাকান্ত, রোহিণী আর গোবিন্দলাল, রবীন্দ্রনাথের গোরা সুচরিতা, নিখিলেশ-বিমলা, মহেন্দ্র-বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত—সব্যসাচী, কিরণময়ী-রাজলক্ষ্মী, রাম যাদব, পরশুরামের লম্বকর্ণ আর বিরিঞ্চিবাবা, তারাশঙ্করের রামেশ্বর-বিশ্বনাথ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু আর দুর্গা, বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ক্যাবলা-ঘোৎলা আর গণশা—এরকম আরো বহু সার্থক চরিত্র সৃষ্টির নাম করতে পারি যা আমাদের পাঠকমনের চিরকালের সম্পদ হ'য়ে আছে। কিন্তু দেশের এবং সাগরপারের ছায়ালোক থেকে আজো অবধি যতো ভূমিকা আমাদের দর্শক চক্ষুর সামনে মেলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকলেও সংখ্যার অনুপাতে কয়টি মৌলিক ব'লে চিরকালীন হ'য়ে জেগে রইলো আমাদের মনের মধ্যে? মঞ্চ এখানে বরং পর্দার চেয়ে সার্থক এবং মৌলিক চরিত্রসৃষ্টির গৌরব দাবী করতে পারে অনেক বেশী। নাট্যজগত থেকে

আমরা এমন বহু অমর চরিত্রের উদাহরণ দেখাতে পারি, যেমন সেক্সপীয়ারের রচিত অনবদ্য এবং বিশ্ববিখ্যাত চরিত্র বা ভূমিকাগুলি। কিন্তু নাটককেও আমরা কথা সাহিত্যের এলাকাতেই স্থান দিই। কাজেই দেখা যায় এই কথা, সাহিত্যের অর্থাৎ গল্প উপন্যাস বা নাটকের চিত্ররূপ বাদ দিলে পর্দায় প্রতিফলিত এবং অভিনীত নিজস্ব চরিত্রের মধ্যে খুব অল্পই কি এ দেশের কি ও দেশের চিত্রজগতে কল্পনা ও বর্ণনার অভিনবত্ব চাতুর্য ও মাধুর্যের জোরে দর্শকমনে চিরন্তনত্ব পাওয়ার দুর্লভ প্রশংসাপত্র পেতে পারে। ঠিক এই কারণেই কি নির্বাক ছবির যুগে কি সবাক ছবির যুগে আর সকল কলা কৌশল সত্ত্বেও মৌলিক সৃজন ক্ষমতার দান পর্দার কাছ থেকে আমরা কমই পেয়েছি এবং যুগে যুগে দেশে দেশে পর্দাকে নির্ভর করতে হয়েছে কথা সাহিত্যের কাছে, চিত্রশিল্পীকে ঋণী হ'য়ে থাকতে হয়েছে কথা শিল্পীর কাছে।

সেলুলয়েডের এই যে অক্ষমতা এর মূল কারণটিও রয়েছে এর আকর্ষণ আবেদন এবং সাময়িক চিত্তজয়ের মধ্যে। যত অনুগত ভক্তই হোন আপনি ছায়াছবির, একখানি ছবি আপনি খুব বেশী কতবার দেখে থাকেন? সে জায়গায় একখানি নির্দিষ্ট গ্রন্থ ছাপার হরফে খুসীমত যতবার যখন তখন পড়ার অখণ্ড সুযোগ রয়েছে বিশেষ ক'রে সাধারণ পাঠাগারের কল্যাণে। এদেশে থাকলেও বিদেশের বহু জায়গায় অবশ্য ফিল্ম লাইব্রেরী আছে কিন্তু আরও বেশীর ভাগ জুড়ে আছে শিক্ষামূলক নীতিমূলক এবং ডকুমেণ্টারী জাতীয় ছবি—যা' মোটামুটিভাবে কিশোর উপযোগীই বলা যেতে পারে যদিও বয়স্কদের কাছে যে প্রিয় নয় তা' বলছি না। নাটকও অভিনয়ের সময় বা পরে সকল দেশে এবং সকল কালেই মুদ্রিত হ'য়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হ'তে দেখা যায়। এদিক দিয়ে সিনেমার একটা বড় দৈন্য চোখে পড়ে। চিত্র যত জনপ্রিয়ই হোক, তার মূল আদ্যন্ত চিত্রনাট্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন কোনো চিত্র প্রতিষ্ঠান মনে করেছেন বা দর্শক সাধারণকে জানিয়েছেন ব'লে ত আজো অবধি কোনো দেশের চিত্র-জগত থেকে খবর পাওয়া যায়নি। ছবি তৈরীর আগে হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠান কাহিনীর অংশবিশেষ বা সংক্ষিপ্ত-সার ছাপিয়েছেন ছবির ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। বাংলাদেশের কোনো কোনো পত্র পত্রিকায় ক্বচিৎ কখনো চিত্রনাট্য প্রকাশিত হ'তে দেখা গেছে ইতিপূর্বে, কিন্তু সেও কতকটা আমাদের পাঠকমনের কৌতুহল মেটাবার জন্যে, সেই কয়েকটি চিত্রনাট্যকে ভিত্তি ক'রে কোনো ছবি তৈরী হ'তে দেখা যায়নি। সুতরাং সেই রচনাগুলিকেও আমরা স্বচ্ছন্দে কথা-বস্তুর পর্যায়ে ফেলতে পারি।

কথাচিত্রে চরিত্রকে স্মরণীয় ক'রে রাখার ব্যাপারে আর এক মুস্কিল হোলো চিত্রতারকার একচেটিয়া প্রাধান্য। ছায়াছবির আকাশে চরিত্রের নিজস্বতা বৈশিষ্ট্য বা

স্মরণীয়তা একান্তভাবেই ম্লান হ'য়ে পড়ে চিত্রতারকার লোকপ্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব এবং গ্ল্যামারের কাছে। সকল দেশেই চিত্রমালিকের দৃষ্টি এবং চেষ্টা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং স্মরণযোগ্য চরিত্ররচনার দিকে ততটা থাকেনা যতটা চিত্রতারকার ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তার দিকে। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রকাহিনীও সংলাপ এবং চিত্রনাট্যও অনুসরণ করে তারকার নির্দিষ্ট অভিনয় ক্ষমতা, ঝোঁক ও মর্জিকে। পরিচালক বা প্রতিষ্ঠানকেও স্বচ্ছন্দে এতে রাজী হ'তে হয়, কেননা চিত্রজগতের ব্যবসায়কে সাফল্য এবং ছবি থেকে নগদ প্রাপ্তিযোগটা ভূমিকালিপি বণ্টন আর অভিনেতৃসম্প্রদায়ের নামডাক আবেদনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। নামকরা সমাদৃত প্রিয় শিল্পীকে সম্ভব অসম্ভব সকল উপায়ে দর্শকের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্যে আর প্রযোজকের একমাত্র প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কাজে লাগানোর নির্দেশ যেমন পালন করতে হয়, কাহিনী ও সংলাপ রচয়িতাকে তেমনি আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রীকে। দর্শক-সাধারণেরও প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ থাকে ছবির রূপশিল্পীর তালিকার মধ্যে। চিত্রানুরাগী ভক্ত-জনের এই Star-worship এর দরুণই চরিত্রের বা ভূমিকার নিজস্ব আবেদনের হানি ঘটে একথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। এই তারকাপ্রীতিকে অটুট রাখার জন্যেই চিত্রবিধাতাকে বিখ্যাত শিল্পীদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় বিস্ময়কর পারিশ্রমিকের বদলে এবং শিল্পীকেও বারবার নিজের খুসীমাফিক পরিকল্পিত ও রচিত গতানুগতিক চরিত্র রূপায়িত করতে হয় অলক্ষিত অগণিত অনুরক্তজনের মুখ চেয়ে, চরিত্রটির নিজের খাতিরে নিতান্ত কমই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং নির্দিষ্ট ভাবভংগী রীতিপদ্ধতিকে বাদ দিয়ে বা ঢেকে রেখে অভিনয় চরিত্রকে প্রাধান্য ও মর্যাদা দিলে, চরিত্রটির গুরুত্ব এবং বলিষ্ঠতাকেই সর্বস্ব ক'রে তুললে তাঁদের নিজেদের জনপ্রিয়তাহানি এবং দর্শক চিত্তজয়ের মন্ত্রশক্তি হারানোর যে আশঙ্কা তাঁরা করেন, তা' অতিরিক্ত হ'লেও কোনোমতেই অমূলক বা যুক্তিবিরুদ্ধ এমন কথা বলা চলে না। সিনেমা ফ্যানের সমাদর আর প্রীতির আসনটি থেকে পারতপক্ষে চ্যুত না হওয়ার এই ইচ্ছা এবং জিদটুকুকে সমর্থন করতেই হয়।

চিত্ররসিক এবং রসপিপাসুর সংখ্যাকে স্ফীত এবং বর্ধিত করার শক্তি কাজেই পর্দার চরিত্রসৃষ্টির ধার বিশেষ ধারে না এবং সেই কারণেই চিত্রজগতে আধিপত্য যাঁরা ক'রে থাকেন, তাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামানো বা এর ওপর জোর দেওয়ার দরকার বোধ করেন না। এসব নিয়ে পরখ ও পরীক্ষা করার ব্যাপারেও তাঁরা তেমন ভরসা পান না। এমনকি নামকরা কথাশিল্পীর জনপ্রিয় রচনাতে চিত্ররূপ আরোপের সময়ও অবিস্মরণীয় অমর চরিত্রের একটু আধটু অদলবদল তাঁরা না ক'রে পারেন না, চরিত্রটি অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত গুণী শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সংগে খাপ খাওয়াতে গিয়ে। অবশ্য অনেকসময় মৌলিক কাহিনী রচনা ক'রে মৌলিক চরিত্র খাড়া করার চেষ্টার উদাহরণ পর্দার ইতিহাসে একেবারেই অমিল এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সেখানেও চিত্ররচয়িতা এবং দর্শকের মনে তারকার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আবেদন সৃষ্ট চরিত্রগুলির এইসব বহু আকাঙ্খিত গুণগুলির চেয়ে বেশী হ'তে দেখা গেছে। বিদেশী ছবির মধ্যে 'কুইন ক্রিশ্চিয়ানা'তে কুইনক্রিশ্চিয়ানাকে, 'মেরী এ্যান্টয়নেট'এ মেরী এ্যান্টয়নেটকে, 'মেরী ওয়ালেস্কা'তে মেরী ওয়ালস্কাকে, 'ক্যাথারিন্ দি গ্রেট'এ ক্যাথারিন্কে, 'মেরী অফ স্কটল্যাণ্ড'র মেরীকে 'প্রাইভেট লাইফ অফ্ হেনরী দি এইট্থ্' ছবিতে হেনরীকে, 'লাইফ্ অফ্ লুই পাস্তুরে' পাস্তুরকে 'এমিল জোলা' ছবিতে জোলাকে 'এডিসন' ছবিতে বৈজ্ঞানিককে এবং এমনকি 'মাদামকুরী'তে মাদামকুরীকে দেখবার লোভ বা আগ্রহ নিয়ে ক'জন দর্শক চিত্রগৃহে ভিড় জমিয়েছিলেন? গ্রেটা গার্বো, নর্মা শিয়ারার, পল মুনি, স্পেন্সার ট্রেসি এবং গ্রিয়ার গার্সন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ও কৃতী শিল্পীর আকর্ষণই কি তাঁদের রূপ-দেওয়া চরিত্রগুলির চেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি? দেশী ছবির মধ্যে 'বিদ্যাপতি'তে অনুরাধা ও বিদ্যাপতি, 'চণ্ডীদাস'এ রামী ও চণ্ডীদাস, 'তানসেন'এ তানসেন আর তানী, 'ভক্ত সুরদাস'এ 'সুরদাস' এবং সোরাব মোদীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছবিগুলিতে যে অভিনয় শিল্পীরা তাঁদের রূপায়িত ভূমিকাগুলির চেয়ে অনেক বেশী মনোরম ও আকর্ষণীয় রূপে

সেলুলয়েডে আত্মপ্রকাশ করেছেন এ কথাও নির্ভয়ে বলতে পারি। এমনি আরও বহু উদাহরণই দেওয়া চলে।

'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড', রোমিও জুলিয়েট', 'ডক্টর জেকিল, মিষ্টার হাইড', 'গুড আর্থ' 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'ভ্যালি অফ ডিসিসন' ইত্যাদি বিদেশী এবং 'হিন্দী ও বাংলা শকুন্তলা' 'কপালকুণ্ডলা' 'গোরা', বিরাজ বৌ' প্রভৃতি দেশী কথা সাহিত্যের চিত্ররূপের ভিতরে অভিনয় শিল্পীকে জন অভিনন্দন ধন্য, চিরসমাদৃত এবং অনন্য সাধারণ চরিত্রগুলির চেয়ে অল্পবিস্তর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এটা লক্ষ্য করা যায়। তা' হ'লেও সেগুলির অসামান্য সাফল্যের মূলে কথা-শিল্পীর সার্থক পরিকল্পনা এবং নিখুঁত মনোজ্ঞ রচনাশৈলীর কৃতিত্বকে কোনোকালেই অস্বীকার করা যাবে না।

মনে ক'রে রাখার মত অনবদ্য ও অকৃত্রিম, মৌলিক ও অদ্বিতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা কখনো কখনো পেয়েছি সেলুলয়েডে। এর মধ্যে নাম মনে পড়ে 'সিটিজেন কেন', 'মিষ্টার ডিড্‌স্ গোস টু টাউন', 'লাভ ক্রেজী', 'থিনম্যান সিরিজ', 'গোল্ড রাশ', 'মডার্ণ টাইমস্', 'প্রফেসর বিওয়্যার', 'সিটাডেল' 'ইউ' ক্যাণ্ট টেক ইট উইথ ইউ' আর বাংলায় 'উদয়ের পথে', 'ভাবীকাল' এবং 'সংগ্রাম' জাতীয় ছবি—এগুলির মধ্যে কয়েকটি স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট শক্তিশালী সত্যকার মৌলিক চরিত্র পরিকল্পনা ও রচনার নিদর্শন মেলে। এই সংগেই স্মরণ করতে হয় এ যুগের অবিনশ্বর এবং রূপবিদ্য ও স্রষ্টা ওয়াল্টার ইলায়েস ডিসনেকে। শুধু কার্টুন ছবির প্রবর্তক এবং উদ্ভাবক ব'লেই নয়, তাঁর এইসব অভূতপূর্ব এবং নিপুণ শিল্প রচনায় 'ডোনাল্ড ডাক' বা 'মিকি মাউসের' মত মনুষ্যেতর অলৌকিক চরিত্র পরিকল্পনার জন্যেও তিনি যেমন দুনিয়ার চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবেন, তেমনি সেইসব অতুলনীয় চরিত্রগুলি আপন মহিমা ও মনোহারিত্বে অমর ও স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে অনাগত দিনের চিত্রভক্তবৃন্দের কাছে। তাঁর 'ডাম্বো' 'বাম্বো' ছবিগুলিও উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টির শাশ্বত দৃষ্টান্ত। এমনিধারা ক্লাসিকধর্মী চরিত্রের প্রচলন এবং তাকে সৃষ্টি ও সার্থক ক'রে তোলার উপযোগী লোকান্তর প্রতিভার অভ্যুদয় যত বেশী এবং শীঘ্র হয় ততই ভালো। তাতে বিশ্বের ছায়া-ছবির ইতিহাসে গৌরবময় নিত্যনতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে সন্দেহ নেই।

একটী সশ্রদ্ধ অনুরোধ---

বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে—যে কোন চিন্তাশীল শান্তিপ্রিয় দেশবাসী বিপথগামী ভাইয়েদের এই নীচতায়-লজ্জিত-চিন্তিত ও মর্মাহত হ'য়েছেন সন্দেহ নেই। রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারা ভারতের যে অংশেই থাকুন না কেন, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই বীভৎসতায় বিবদমান ভাইয়েদের কাছে—তাঁরা যেন শান্তির বাণী প্রচার করে পরস্পরকে এই নীচতা থেকে রক্ষা করেন। এবং এই দাঙ্গায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন—তাঁদের সাহায্যের জন্য নিজেদের শক্তি অনুযায়ী যে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাহায্য প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করেন।

রূপ-মঞ্চ সাহায্য ভাণ্ডারে যাঁরা টাকা পাঠাতে চান—সাদরে তাঁদের প্রেরিত অর্থ গ্রহণ করা হবে এবং ঐ অর্থ দাতাদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে যাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা পাঠাবেন-- কোন প্রতিষ্ঠানে ঐ অর্থ দেওয়া হবে—নাম, ঠিকানার সংগে তাও লিখে দিতে অনুরোধ করছি। জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, এবং বিভিন্ন পল্লীর শান্তিরক্ষা সমিতিতে আমাদের সংগৃহীত অর্থ প্রদান করা হবে। এবং অর্থ প্রেরকদের নাম যথাক্রমে পরবর্তী সংখ্যা থেকে রূপ মঞ্চে প্রকাশ করা হবে। আশা করি রূপ-মঞ্চের পাঠকবর্গ এবিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠবেন।

সম্পাদক ঃ রূপ-মঞ্চ সাহায্য-ভাণ্ডার
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৫

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৩৫২ সালের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতার ফল !

শ্রেষ্ঠ-চিত্র

(১) **ভাবীকাল**— ১৫,৬১৩

(২) **দুইপুরুষ**— ১৩,৪০৯

(৩) **মানে না মানা**— ১২,৬০৪

(৪) বন্দিতা— ১৮১৭

(৫) মৌচাকে ঢিল— ২৪১৯

(৬) পথ বেঁধে দিল— ১২১০

(৭) পথের সাথী— ৬১৬

ভাবীকাল, দুইপুরুষ, মানে না মানা, শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে এই তিনখানি নির্বাচিত হয়েছে।

কাহিনী

(১) **ভাবীকাল** (প্রেমেন্দ্র মিত্র)—১৪,৪৭২

(২) মানে না-মানা—(শৈলজানন্দ)— ১৮১০

(৩) পথ বেঁধে দিল—(প্রেমেন্দ্রমিত্র)— ১০৩৪

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাবীকাল কাহিনীর জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার নির্বাচিত হ'য়েছেন।

চিত্ররূপ (চিত্রনাট্য)

(১) ভাবীকাল— ৬৬০৩

(২) পথ বেঁধে দিল— ১২০৬

(৩) **দুইপুরুষ**— ৭,২৩৪

(৪) মানে না মানা— ৪৯১৬

দুইপুরুষের চিত্রনাট্যকার শ্রীযুক্ত বিনয় চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন।

পরিচালনা

(১) নীরেন লাহিড়ী— ৬৭৩২

(২) **শৈলজানন্দ**— ৬৭৫৪

(৩) প্রেমেন্দ্রমিত্র— ৬৩০

(৪) সুবোধমিত্র— ৩৬১১

(৫) মনুজেন্দ্র ভঞ্জ— ৬১৬

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'মানে না মানা' চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ—পরিচালকের সম্মানে ভূষিত হ'য়েছেন।

অভিনেতা

(১) **ছবি বিশ্বাস**— ১৫,৬৪৩

(২) **অহীন্দ্র চৌধুরী**— ১০২০১

(৩) **দেবী মুখোপাধ্যায়**— ১৩২১৯

(৪) অমর মল্লিক— ১৮০৬

(৫) নরেশ মিত্র— ৬১৩

(৬) জহর গঙ্গোপাধ্যায়— ৩৬২০

(৭) রবি রায়— ৬০১

(৮) ভানু ব্যানার্জি— ১২৩৩

শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস (দুইপুরুষ), শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী (মানে-না মানা), শ্রীযুক্ত দেবী মুখোপাধ্যায় (ভাবীকাল) তিনজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হ'য়েছেন।

অভিনেত্রী

(১) **শ্রীমতী চন্দ্রাবতী**— ১৬২০১

(২) „ **সুনন্দা দেবী**— ৯৬১৭

(৩) „ সন্ধ্যারাণী— ১২৪৬

(৪) „ **মলিনা**— ১২,১১৪

(৫) „ ছায়া দেবী— ২,৪৩৬

(৬) „ প্রভা— ৬১১

(৭) „ কানন দেবী— ১৮৩৪

(৮) „ রেখা মল্লিক— ১২৫৬

(৯) „ রেণুকা— ১২৮৭

(১০) „ পদ্মাবতী— ৭৬৩

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী (দুইপুরুষ), শ্রীমতী সুনন্দা (দুইপুরুষ) শ্রীমতী মলিনা (মানে-না-মানে) এই তিনজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন।

চিত্রগ্রহণ

দুই পুরুষ (সুধীন মজুমদার)—

কুইন এ্যানোফেলিস— ৫৮৯

অজয় কর— ৩৬২৪

বিভূতি লাহা— ২৪০৭

শ্রীযুক্ত সুধীন মজুমদার শ্রেষ্ঠ—চিত্রশিল্পী নির্বাচিত হ'য়েছেন।

শব্দগ্রহণ

জে, ডি, ইরাণী— ৩,১৯৫

গৌর দাস ৫৪২

যতীন দত্ত— ১৩৪৬

লোকেন বসু— ৬১৩৬

দুইপুরুষ— ৭,২১০

দুইপুরুষ চিত্রে শ্রীযুক্ত লোকেন বসু শ্রেষ্ঠ—শব্দযন্ত্রী নির্বাচিত হ'য়েছেন।

দৃশ্যরচনা

ভাবীকাল— ৩১৩৬

মানে না মানা— ৬৩৩

দুইপুরুষ— ৯,৩০০

পথ বেঁধে দিল— ২,১০৩

শ্রীদুর্গা— ৪৫৬

দুইপুরুষ চিত্রের দৃশ্যরচনায় শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন।

গান (কথা)

মোহিনী চৌধুরী— ২,৫০১

শৈলেন রায়— ১১,৫১৪

প্রণব রায়— ৩,০৬০

শ্রীযুক্ত শৈলেন রায় শ্রেষ্ঠ গীতিকার নির্বাচিত হ'য়েছেন।

সুর সংযোজনা

মানে না মানা— ৬,৭১১

পথ বেঁধে দিল— ১,৩০২

কলঙ্কিণী— ৮০১

পথের সাথী— ৪০৩

দুইপুরুষ— ৭,২০১

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক দুইপুরুষ চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ সুরকার নির্বাচিত হ'য়েছেন।

আঠারো হাজার দর্শকের প্রতিযোগিতায় যোগদান।

বেতারের অভ্যন্তরে

: লাউড স্পীকার

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগে

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগে কলিকাতায় তথা সারা বাংলায় একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। শিল্পী সংঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, ছাত্র কংগ্রেস, প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠান গুলোর একত্রিত বেতার বয়কট আন্দোলনে। ২৯শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের দিন ছাত্রী পিকেটারদের প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার এবং তাদের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবার যোগ্য প্রত্যুত্তর সমগ্র বাংলা দিয়েছে। এই বেতার বয়কটের ফলে বেশ কয়েকদিন বেতারে কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নি—পিত্তিরক্ষা করবার জন্যে ভাঙা রেকর্ড বাজান হয়েছিল ক'দিন ধরে। সম্মিলিত বাংলার তীব্র প্রতিবাদ দূর দিল্লীকে কাঁপিয়ে ছিল বলেই বেতারের প্রধান ঘাঁটি থেকে ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ লক্ষ্মণম এসে শিল্পী সংঘের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলির সংগে আপোষ-আলাপ করবার জন্য ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় ও আগ্রহে হীন অপরাধে অভিযুক্ত কুখ্যাত সুনীল বসু ও অতি কুখ্যাত প্রভাত মুখোপাধ্যায় বাংলা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সে সময়ের ষ্টেশন ডিরেক্টার মিঃ চীব ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১৩ই আগষ্ট থেকে বেতার বয়কট প্রত্যাহার করা হয়। ১৫ই আগষ্ট বেতার শিল্পীরা শিল্পী সংঘের সিদ্ধান্ত জানতে না পারায় বেতারে অংশগ্রহণ করেন নি। ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু। অসংখ্য নর-নারীর রক্ত-স্রোতে বিধৌত কলিকাতা নগরী কলঙ্ক মলিন। অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু। তখন থেকে আজও এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা কলিকাতা বেতারের অনুষ্ঠান প্রাণহীন করে রেখেছে। সন্ধ্যার পর সাবধান!—কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা তাই সান্ধ্য-অনুষ্ঠানকে আড়ষ্ট করে রেখেছে।
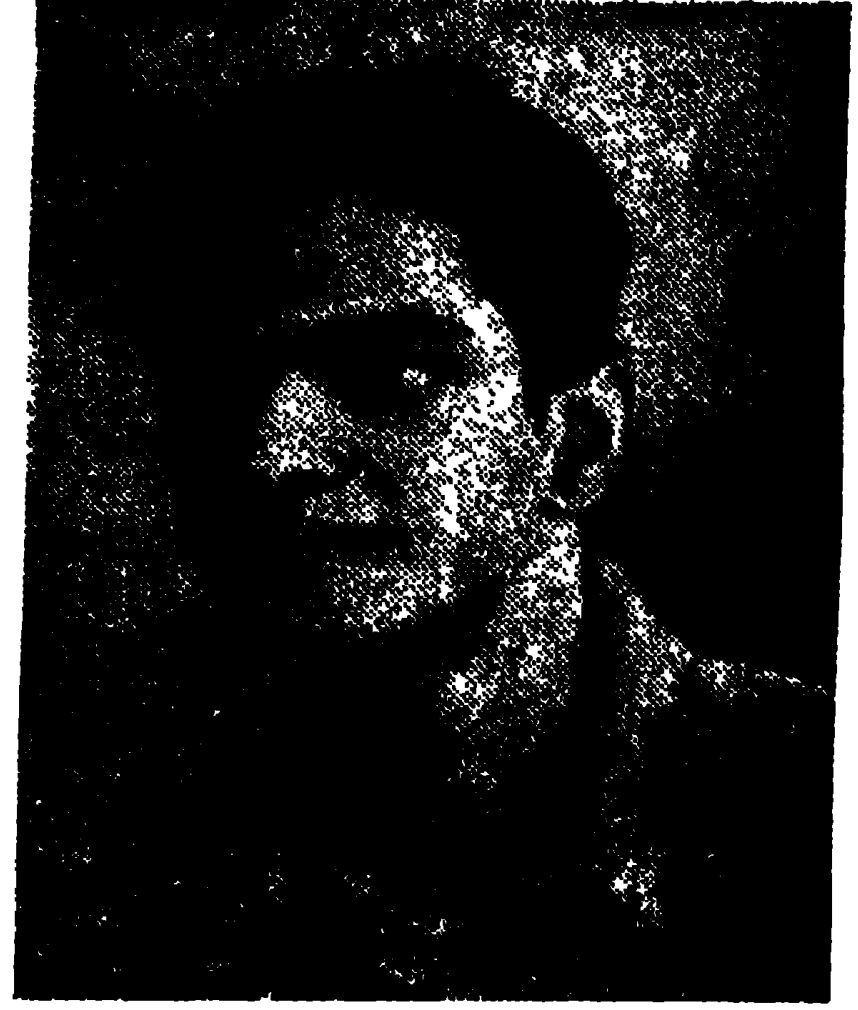
শিল্পী পান্না সেন

শিল্পী ও শ্রোতাদের সংঘবদ্ধতায় অসাধ্য সাধন করা যেতে পারে তার প্রমাণ সারা বাংলা ও ভারত দেখেছে।

দুর্নীতি কি শেষ হয়েছে?

সুনীল বসু ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কলিকাতা বেতার থেকে বিদায় নিলেও দুর্নীতির পোষ্য পোষণের ঘুঘুর বাসা কি ভেঙে গেছে কলিকাতা থেকে?—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ অনেকের মনে জাগতে পারে—তার উত্তরে আমরা বলবো, না। বসু-মুখোপাধ্যায়ের সহযোগীরা আজকে শান্তশিষ্ট গোপাল অতি সুবোধ বালকের মতো হয়ে উঠলেন—পোষ্য-পোষণ আজও চলছে অতি চমৎকারভাবে। ব্যাপক বেতার বয়কট আন্দোলনে সমস্ত শিল্পীরা যোগদান করলেও এদেশে মিরজাফরের অভাব হবে না কোনদিন। কয়েক খণ্ড রৌপ্য খণ্ডে বিক্রীতআত্মা বিকৃতরুচি বৃকোদর বিভীষণ শিল্পী মহিতোষ চট্টোপাধ্যায় বেতার বয়কট আন্দোলনের সময়ে বেতারের কুখ্যাত কর্তাদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। শিল্পী-বন্ধুদের এই প্রতিবাদ আন্দোলনে ইয়োরোপীয় শিল্পীরাও স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন বেতারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে। অথচ বাঙালী শিল্পীদের কুল কলংক স্বধর্মদ্রোহী মহিতোষ চট্টোপাধ্যায় কেমন করে নিজেকে কয়েকটি টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রী করলেন তা আমাদের ভাবতেও অবাক

লাগে। চোখের পর্দা আর গায়ের চামড়া কতখানি পুরু ও মোটা হলে এবং আত্মসম্মানবোধ কতখানি নিম্নস্তরের হলে এই কুকার্য সাধন সম্ভব তারও আমরা হিসেব করে খুঁজে পাই না। এই আত্মবিক্রীত ও আত্ম-বিকৃত শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের বিভীষণ বৃত্তির জন্য বেতার থেকে নানাভাবে তাঁকে অর্থ পাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন কুখ্যাত বসু মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিরা—প্রয়োজনবোধে আমরা তাঁদের নাম করতেও পারি। বেতারে ঘোষক থাকতেও কেবল মাত্র ঘোষণা করিয়ে নিয়ে, দুটো কথা বলিয়ে নিয়ে কোন অবসর-পরিচালকের পোষাক পরিয়েও বেতারে অনুপস্থিত শিল্পীদের সাঙ্কেত অর্থে মহিতোষবাবুর 'মোচ্ছব'-এর ব্যবস্থা করেছেন পোষ্য পোষণকারী বেতারে তথাকথিত কর্তারা। এসব দেখেও কেমন করে বলবো যে, বেতার বর্তমানে শিল্পীদের স্বর্গ!

এঁদের নমস্কার করি

বেতারে বয়কট আন্দোলনে ছায়াচিত্রের, রঙ্গ-মঞ্চের, রেকর্ডের ও বেতারের সমস্ত শিল্পীদের ও পরিচালকদের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। বেতার বয়কটের প্রথম দিনে রবিবারের সকালে বেতারের দ্বারদেশে পিকেটিং রত ছাত্র বন্ধুদের সংগে দেখি স্বনামধন্য শিল্পী বন্ধুদের—পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, মুস্তাক আলি, কবি শৈলেন রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর শিল্পীদের। এই একত্র সমাবেশ দেখবার জন্যে সারা কোলকাতা বেতারের দ্বারদেশে ভেংগে পড়েছিল। আই-এন এ সি-র কর্তৃপক্ষ পিকেটিং রত বন্ধুদের আহারের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। কলিকাতা বেতারের গার্স্টিন প্লেস সহস্র সহস্র জনের পদধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে জেগে উঠেছিল। ছাত্র বন্ধুদের ও শিল্পীদের ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় জয়ী হয়েছেন। শিল্পী সংঘের তরফ থেকে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করেছিলেন মুস্তাক আলি, সুধী প্রধান ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। ক্যামেরার যাদুকর শিল্পী পান্না সেন বেতার কর্তাদের কু-কীর্তির কাহিনী ক্যামেরায় ধরে রেখে শিল্পী সংঘের দাবীর ও প্রতিবাদের বাস্তব সত্যতা উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আক্রমণ রত পুলিশ বাহিনীর ও বেতার কর্তাদের কীর্তি কাহিনীর ক্যামেরায় ধরা ছবিগুলির এক প্রদর্শনী হয় গার্স্টিন প্লেসে—বেতারে প্রবেশ পথে। সে প্রদর্শনী দেখবার জন্যে ক'দিন গার্স্টিন প্লেসে তিল ধারণের স্থান ছিল না। অন্যায়ের প্রতিবাদ-কারী শিল্পী সৈনিকদের ও ছাত্র বন্ধুদের আমরা তাঁদের সংগ্রামের জন্য অভিনন্দিত করছি এবং নমস্কার করি।

বেতার বয়কটের প্রথম বলি

বেতার বয়কট আন্দোলনে বেতারের সুকুমার-কণ্ঠ ঘোষক ও অভিনেতা শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন এবং বিগত ১২ই আগষ্ট সোমবার ইউনিভারসিটি ইনিস্টিউটে অনুষ্ঠিত বিরাট এক সাধারণ সভায় বেতারের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করেন। বিগত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস-এ দুপুর বেলায় 'জনগণ মন জয় হে ও ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা' ইত্যাদি দেশভক্তিমূলক রেকর্ড বাজানোর অপরাধে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়, তাঁর মাহিনা বৃদ্ধি করা হয় না যদিও এই সমস্ত রেকর্ডগুলো সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নি। আরো প্রকাশ, বসু-মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী মিঃ জামান এবং শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (দুজনেই বেতারের পদস্থ কর্মচারী) পদাঘাতে 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' রেকর্ডখানি ভেঙে দেন। শ্রীসুনীল দাশগুপ্তের এই গুরুতর অভিযোগের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও বেতার থেকে তার কোন প্রতিবাদ করা হয় নি।

বেতার বয়কট আন্দোলনে যোগদানকারী শিল্পীদের বরখাস্ত করা বা কোনভাবে পীড়ন করা হবে না বলে ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেল আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং শিল্পী সংঘের সংগে বেতারের আপোষ আলোচনার অন্যতম সর্ত্ত এইই ছিল। কিন্তু আমরা শুনে দুঃখিত হলাম যে, কলিকাতা বেতার এই চুক্তি ভংগ করে শ্রীসুনীল দাশগুপ্তকে বরখাস্ত করেছেন। বেতার বয়কট আন্দোলনের প্রথম বলি সুনীল দাশগুপ্ত সম্পর্কে শিল্পী সংঘ কি পন্থা অবলম্বন করবেন তা জানতে ইচ্ছা হয়। এবং সুনীল দাশগুপ্ত

উত্থাপিত অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে অবিলম্বে এই পর পদলেহী দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন চাকরী-সর্বস্বদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত যদি বিস্তারীত-ভাবে আমাদের সমস্ত ঘটনা জানান, তাহলে আমরা খুশী হবো।

শিল্পী সংঘের সংগঠন সম্পাদক সুধী প্রধানের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি।

বাঙালী ষ্টেশন ডিরেক্টার

শ্রীযুক্ত অশোক সেন কলিকাতা বেতারের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বাংলা দেশের বেতারের প্রধান পরিচালকের পদে বাঙালী থাকা প্রয়োজন এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আলুকে পটল বলে চালাবার অপকৌশল তা' হলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পোষ্য পোষণের অর্থহানি থেকে কলিকাতা বেতার অব্যাহতি পেতে পারে। যদিও মিঃ মংগলম সুপার হিসেবে ঢাকা ও কলিকাতা বেতার সুপারভাইজ করবেন। শ্রীযুক্ত অশোক সেনকে প্রথম বাঙালী ষ্টেশন ডিরেক্টার হিসাবে আমরা অভিনন্দিত করছি এবং আশা করছি, তিনি তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও দূরদৃষ্টির দ্বারা কলিকাতা বেতারকে সর্বজনপ্রিয় এবং কলংকমুক্ত করবেন।

সম্পাদকের দপ্তর

লিলি সেনগুপ্তা (শীতলাতলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা)

প্রথমেই ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি রূপ-মঞ্চের জন্মদাতাদের, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এর জন্ম। দাদার রূপ মঞ্চ একদিন চুরি করে নিয়ে পড়ে এর মধুর আস্বাদ পাওয়ার সংগে সংগেই আমি রূপ-মঞ্চের একজন নিয়মিত পাঠিকা। চুরি করে নিয়েছি এর মানে, দাদার কাছ থেকে কয়েকদিন রূপ-মঞ্চ সাধু ভাবে চেয়ে বিফল মনোরথ হওয়ায় বাধ্য হয়ে চৌর্য বৃত্তির আশ্রয় নিতে হলো। দাদার রূপ-মঞ্চ না দেওয়ার কারণ বের করা মোটেই কষ্টকর নয়। কেননা দাদা বই-খানা পড়ে প্রতি মাসে কতগুলো প্রশ্ন আওড়িয়ে এসে আমাদের প্রশ্ন বানে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলতো। যেমন বলতো, চিত্র জগতে শ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকা কে? শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী কে? ঠিক উত্তর দিতে না পারলে দাদা নিজেই বলে দিয়ে বাহাদুরী নেয়। কোন ষ্টুডিওতে কোন কোন ছবির স্যুটিং চলছে তা দাদার নখাগ্রে। কোন ছবি দেখে এসে দাদা হা করে প্রতীক্ষা করে রূপ-মঞ্চ প্রকাশের দিনটীর জন্য। দাদা নিজেও ছবিটীর সমালোচনা লিখে রাখে। তারপর মিলিয়ে দেখে চরম ভাবে শ্রীপার্থিবের সমালোচনার সংগে। আমরা আশ্চর্য হ'য়ে যাই এই দেখে যে, দুটোরই সারাংশ এক। শুধু প্রকাশ বিভিন্ন ভাষায়। যে কোন লোক যদি রূপ-মঞ্চের অযৌক্তিক ভাবে দোষত্রুটি বের করে, দাদা তাকে বোঝায় প্রথমে যুক্তি দিয়ে, সে বুলি রূপ-মঞ্চ থেকে চুরি করা। তবু যদি সেই ভদ্রলোক এইরূপ মত পোষণ করেন যে, রূপ-মঞ্চ নিউথিয়েটার্সে'র ধামা ধরা, তাহ'লে দাদা বেশ চটে যায় এবং বলে, রূপ-মঞ্চ প্রায় প্রত্যেকেরই যাঁরা ভারতের মঞ্চ ও চিত্রের উন্নতি চায় তাদের authority। কেননা, রূপ-মঞ্চের মত জনসাধারণেরই। কেউ যদি এর বিরোধী মতাবলম্বী হয়, তাহ'লে সে ভারতের চিত্র ও মঞ্চের উন্নতি চায় না, সে উহার প্রতিবন্ধক।

এছাড়া দাদা বন্ধু মহলে রূপ-মঞ্চের গুণ-কীর্তন করে বেড়ায় আর এর গ্রাহক হবার জন্য জোর করে বলে, রূপ-মঞ্চের একজন গ্রাহক যদি বাড়াতে পারি, তবে মনে করি বাংলার তথা ভারতের চিত্র ও মঞ্চের একটু সেবা করলাম।

অভিনয়, আবৃত্তি, সংগীত, বাজনা প্রভৃতির দিকেও দাদার বেশ ঝোঁক আছে। মাসে মাসে রূপ-মঞ্চ এবং অন্যান্য কাগজ তার কেনা চাইই। বাসা থেকে আপোষে টাকা না পেলে কলেজের টিফিন আর বাস ট্রামের ভাড়া থেকে অথবা বাজার করবার টাকা থেকে সে ঐ সমস্ত বই কিনবেই। তিন টাকার বাজার করতে দিলে আট আনার আনবে কাগজ। বাড়ীতে সবাই জানলে তিন টাকার বাজারই করে এনেছে। জুতো কিনতে টাকা দিয়েছে পনেরো টাকা, তা দিয়ে নিয়ে এলো একজোড়া বায়া তবলা। বাড়ীতে এইসব কাণ্ড দেখেত সবাই অবাক। দাদা খালি পায়েই কলেজে যাবে বলে ভয় দেখায়। বড়দাদা বাধ্য হ'য়ে আবার জুতো কিনে দেয় নিজে সংগে গিয়ে। সুবোধ বাবু নামে এক ভদ্রলোক কথা প্রসংগে দাদার কাছে এসে বললে, বাংলা বই আর দেখতে ইচ্ছে করে না। একঘেয়ে। নূতনত্ব নেই কিছু। ভাল অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক নেই ইত্যাদি—সামনেই আমি বসেছিলাম। এ কথাটা শুনে দাদা যে কী উত্তর দেবে তারই প্রমাদ গুনছি। কেননা, এরকম প্রশ্ন অনেকে দাদার কাছে পেড়ে নাকাল বনে গেছে। দাদা ধীর সংযত

কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন দেশী ছবি দেখতে ভাল লাগে।" উত্তর এলো, "বই দেখতে হয় হিন্দি দেখ— বাংলাতে কিছু নেই।" দাদা গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললে, "এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বাংলা বই ছেড়ে English-literature বগলে করে হাটতে ভালবাসে। তেমনি দশা হ'য়েছে আপনার।" এইভাবে বেশ কথা কাটাকাটি চললো পুরোদমে। ভদ্রলোক কিছুতেই নতি স্বীকার করলেন না। পরের দিন রাত্রে অফিস থেকে ফিরে এসে বল্লেন ঐ ভদ্রলোকটী, "খোকন, তুমি ঠিকই বলেছো, বাঙ্গালীর প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow' তা সত্য।" সেদিন এক তর্কস্থলে দাদা বলে, ছবি বিশ্বাসের অভিনয় প্রতিভা প্রায় ৺দুর্গাদাস ব্যানার্জিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। যদি স্বর্গত ব্যানার্জি বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়ত তাঁর প্রতিভাব সংগে ছবি বাবুর তুলনা হোতনা। কিন্তু বর্তমানে ছবি বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ নট বলা যেতে পারে। এই নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। যাক্, এ বিষয়ে আপনার মতই চূড়ান্ত বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে দাদা অসুস্থ। খুব দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। শয্যাগত। আশীর্বাদ করবেন যেন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। এই অসুস্থতার জন্যই দাদা রূপ-মঞ্চে তার শুভেচ্ছা পাঠাতে পারেনি। যদিও দাদার খাতার পৃষ্ঠায় তা এখনো লেখা রয়েছে। তাই উদ্ধৃত করে দিলাম। "রূপ-মঞ্চ বাংলার তথা ভারতের রূপ ও মঞ্চ জগতেরই শুধু একটি স্বচ্ছ মুকুর নয়—এর প্রত্যেকটী পৃষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের একটি সুষ্ঠু মূর্তির পরিবেশনা দেখতে পাই। তাই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সকলেই এর প্রসারতা কামনা করে (শ্রীকান্তি সেন)। জয়হিন্দ বলে বিদায় নিচ্ছি।

●● শারদীয়ার পূর্বে আপনাদের কাছ থেকে যে চিঠিগুলি এসে স্তূপীকৃত হয়ে আছে—সেগুলি আপাততঃ চাপা দেওয়াই রইলো—শারদীয়ার পর—প্রশ্নের সংগে শুভেচ্ছা পাঠিয়ে যাঁরা চিঠি দিয়েছেন—তাঁদের মাত্র হয়ত কয়েকজনের উত্তর দিতে বসলাম। যাঁদের উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠলো না, তাঁদের কাছে আপনাদের অর্থাৎ
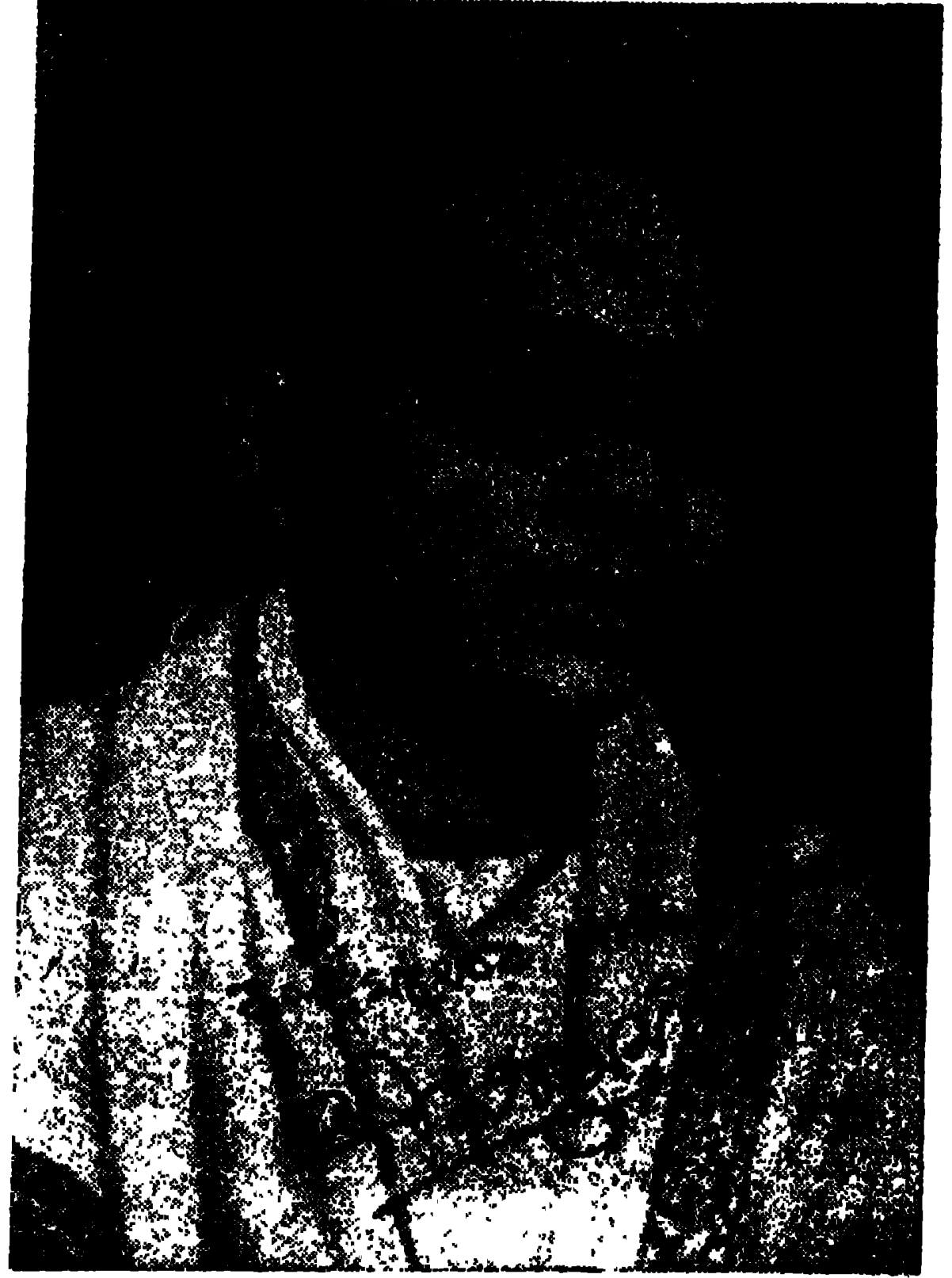
ক্লাসিক ফিল্মের 'তোমারই হউক জয়' চিত্রের সুর সংযোজনা করবেন শিল্পী জগন্ময় মিত্র

যাঁদের উত্তর দেওয়া হ'লো তাঁদের মারফৎ প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ঈদের সময় রূপ-মঞ্চের বহু মুসলমান বন্ধুদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পেয়েছি—তাঁদের একজন হিন্দু ভাই বলে আজ হিন্দুর এই পবিত্র তিথিতে আমি সমস্ত হিন্দু পাঠক পাঠিকাদের প্রতিনিধি হ'য়ে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি। রূপ-মঞ্চের ক্ষুদ্রতম সামর্থে যতটুকু কুলোয় আসুন, আমরা আমাদের পরস্পরের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস দূর করে প্রীতির বন্ধনে পরস্পরের সম্পর্ককে চির অমলিন করে রাখি।

যে চিঠিগুলির উত্তর দিচ্ছি তার ভিতর প্রথমেই আপনাকে উত্তর দেবার মূলেও যে বিশেষ কারণ আছে, আশা করি আপনি এবং রূপ-মঞ্চের অন্যান্য বন্ধুরাও তা স্বীকার করবেন। আপনার চিঠিখানা শেষ করে কিছুক্ষণ

চুপ করে থাকতে হয়েছে আমাকে। আমার কল্পনায় ভেসে উঠেছে আপনার রোগ শয্যাশায়ী দাদার ছবি। রোগ শয্যায় শায়িত হ'য়েও যিনি রূপ-মঞ্চের কথা তুলতে পারেন নি—রূপ-মঞ্চের শুভ কামনা করে যিনি তাঁর খাতায় লিখে রেখে ছিলেন, "রূপ-মঞ্চ বাংলার তথা ভারতের রূপ ও মঞ্চ জগতেরই শুধু একটী স্বচ্ছ মুকুর নয়—এর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের একটি সুষ্ঠু মূর্তির পরিবেশনা দেখতে পাই। তাই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সকলেই এর প্রসারতা কামনা করে।" আপনার দাদা আপনাদের পরিবারের নিকটতম প্রিয়জন—তিনি রূপ মঞ্চের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—রূপ-মঞ্চের নগণ্যতম কর্মী হ'য়ে তাঁর এরূপ একজন সুহৃদের আরোগ্য কামনা—আমাদের প্রিয়জনদের চেয়েও বেশী আন্তরিকতা দিয়েই করবো। আমরা, রূপ-মঞ্চের কর্মীরা রূপ-মঞ্চের এরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদেরই নিকটতম প্রিয়জন বলে মনে করি—তাই, তাঁদের একজনের আরোগ্য কামনায় যে কোন ফাঁক থাকতে পারে না, আশা করি তা স্বীকার করবেন। যাঁরা রূপ-মঞ্চকে এমনিভাবে ভাল বেসেছেন, যাঁরা রূপ-মঞ্চের জয়-পরাজয়ের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তাঁদের সে ভালবাসা এবং বিশ্বাসের ভিত্তি যাতে দিন দিন আরো দৃঢ় করতে পারি—আপনাদের সেদিকেই সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে বলি। দুর্গাদাস এবং ছবিবিশ্বাসের ভিতর কে বড় কে ছোট এ তুলনা না করাই ভাল। কারণ, যাঁরা আমাদের ছেড়ে গেছেন—যাঁরা যখনি এই দুইকে এক সংগে বিচার করা উচিত হবে না। যাঁরা আছেন, তাঁদের ভিতর শ্রীযুক্ত বিশ্বাস যে একজন শ্রেষ্ঠ নট, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং আপনার দাদার সংগে আমি একমত। রূপ-মঞ্চ এবং অন্যান্য কাগজ কিনবার জন্য আপনার দাদা পরিবারের অসন্তোষভাজন হতে পারেন—এরূপ কাজ থেকে তাঁকে বিরত হ'তে অনুরোধ করবেন। তার টিফিনের পয়সা রূপ-মঞ্চ কেড়ে নেয়—একথা শুনে সত্যিই ব্যথিত হ'য়েছি। যখন তিনি নিজে সক্ষম হবেন—তখন যেন কিনে রূপ-মঞ্চ পড়েন—তার পূর্বে কোন বন্ধু-বান্ধব অথবা লাইব্রেরী থেকে পড়তেই আমি অনুরোধ জানাবো। রূপ-মঞ্চকে নিয়ে তিনি যেন কারোর সংগে অযথা তর্কও না করেন—রূপ-মঞ্চ যুক্তি তর্ক দিয়ে তার প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করতে চায় না—নিজের সত্যরূপকে নগ্নভাবে তুলে ধরে সকলের অন্তর জয় করবার দিকেই তার দৃষ্টি। আজ যদি কেউ আমাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, আমাদের আপসোস নেই—আমরা জানি, আগামীকাল আমাদের সত্য রূপ যখন তিনি উদ্ঘাটন করতে পারবেন—অথবা আমাদের সত্যকার রূপ দিয়ে যখন তাঁর অন্তর জয় করতে পারবো—সেই জয়ই হবে আমাদের সত্যকার জয়।

নিবারণ চন্দ্র সাহা (ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) অনেক আশা আকাঙ্খার পর শারদীয়া রূপ-মঞ্চখানা যখন হাতে পেলাম, তখন কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি ভাব মনে আসতেই আমাদের বাংলা দেশের একটী প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে গেলো। "পাগলা খেতে পড়া" কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে তুলি অবস্থা। প্রচ্ছদপটের রূপ-মঞ্চ থেকে মূল্য দুইটাকা পর্যন্ত কয়েকবার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত চোখ বুলিয়ে গেলাম। ছায়া-চিত্র-জগতের অনেক শিল্পীর বহু ভংগীমাময় ছবিতে ভরপুর রূপ-মঞ্চখানা দেখতে বেশ ভালই লাগলো। এত রকমারি ছবি দেখতে পাবো আশাও করিনি। কিন্তু এত আগ্রহে যার ছবি খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেলাম, সে ছবি কোথায়? মা শারদ জননী, দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গা, যাঁর আগমনে দুর্গত বাংলা বুকফাটা হাহাকারের মধ্যেও চোখের জলে হাসিমুখে মা'র আগমন প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হ'য়ে রয়েছিল।

আমি যেন দেখতে চেয়েছিলাম, শ্রীমতী কানন বা সিপ্রা দেবীর পাতায় অসুরদলনী দশভূজা মা শ্রীদুর্গার ছবি, আর তার পাশেইতো ছিল শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের ভাষায়…"তাই দেবী…বড় প্রার্থনা।"

● ●

রূপ-মঞ্চে 'দেবী দুর্গার' ছবির প্রয়োজন যে বেশী নেই আশা করি সেকথা বুঝবেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকা-

রা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাই কোন বিশেষ ধর্মের গুরুত্ব নিয়ে বা কোন বিশেষ ধর্মের দেব-দেবীদের ছবি নিয়ে নাড়াচাড়াটা শোভন নয়—বিশেষ করে বর্তমানের এই সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার সময়, যেখানে আমাদের শুভবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যে ধর্মের যে সারাংশটুকুর ভিতর সার্বজনীনতা রয়েছে, আমরা আমাদের প্রয়োজনে শুধু সেইটুকু গ্রহণ করবো। তাছাড়া অভিনয়, সংগীত ও নৃত্যকলার কথা ঘাটতে যেয়ে যে ধর্মে যতটুকু পাবো—আমরা তাও গ্রহণ করবো। অর্থাৎ যে ধর্মের সংস্কৃতির সংগে রূপ-মঞ্চ যতটুকু সম্পর্কিত, ততটুকুই তার আলোচনার গণ্ডির ভিতর পড়ে। রূপ-মঞ্চের সম্পাদক হিন্দু বলে রূপ-মঞ্চের পাতায় যদি হিন্দু ধর্মের আদর্শ প্রাধান্য পায়—তাহলে রূপ-মঞ্চের সম্পাদনা না করে—হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত কোন পত্রিকা সম্পাদনা করাই আমার উচিত হবে। ঈদ—দুর্গাপূজা এবং বড়দিনের উৎসব শুধু মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টানরাই উপভোগ করেন না—আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের উৎসবে অংশ গ্রহণ করি। এই উৎসবে বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবতা, পয়গম্বর—বা ধর্মপ্রচারকের ছবির চেয়ে এই উৎসবে আনন্দানুষ্ঠানের পদ্ধতি কোন ধর্ম কীভাবে নির্দেশ দিয়েছেন···কোন ধর্ম নৃত্য, গান, অভিনয় প্রভৃতিকে স্থান দিয়েছেন তাই আমাদের আলোচনার বিষয় এবং সেই বিষয়কে অনুসরণ করে যদি কোন প্রতিকৃতি প্রকাশ করবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি—তা সব সময়ই প্রকাশ করবার জন্য সচেষ্ট থাকবো।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (এইচ, এম, এস, কলিংউড, ফারেহাম হাণ্টস, ইংল্যাণ্ড) আজ কয়েক দিন হ'লো এখানে এসেছি। বম্বে থেকে Empress of Scotland জাহাজে Liverpool আসি। জাহাজ রাস্তায় কোথাও দাঁড়ায়নি। Liverpool থেকে বাসে Fareham এসেছি। এ জায়গাটা বড় সুন্দর। লণ্ডন থেকে মাত্র ১॥০ ঘণ্টার রাস্তা অথচ গ্রামের মত শান্ত আবেষ্টনী। একটা মস্ত বড় 'training centre'-এ আছি। চীন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের নেভীর লোকেরা এখানে training নিতে আসে। বর্তমানে প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভালই। অবশ্য বিলিতি খানা প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা লাগে। প্রায় একবছর এখানে থাকতে হবে। বর্তমানে Work-shop এর কাজে শেখাচ্ছে সর্বশেষে Radio-র কাজ শেখাবে। জাহাজে আমাদের সংগে প্রায় ৮০।৯০ জন ভারতীয় ছাত্র এসেছে। কেউ অক্সফোর্ড, কেউ কেম্বিজ, কেউ মেডিক্যাল, কেউ Engineering Department এর। জাহাজে আরামেই আসা গেছে। আপনাদের খবর জানাবেন। রূপ-মঞ্চের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি—আশা করি 'শারদীয়া সংখ্যা' শীঘ্রই পড়বার সুযোগ পাবো। কলকাতার হইহুল্লোড় একটু কমলো কিনা জানাবেন। নতুন ছবি সব কি রকম উঠছে। বিমল রায়ের অঞ্জনগড়ের অবস্থা কতদূর? 'রাত্রির' সংবাদও দেবেন। ভ্যানগার্ড কী ছবি তোলার মনস্থ করেছেন—আশা করি রূপ-মঞ্চ মারফৎ সব খবর পাবো। এই সুদূর থেকে—রূপ-মঞ্চের মারফৎ তার অগণিত হিন্দু এবং মুসলমান ভাইদের আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি—তাঁদের কাছে আমার এই অভিনন্দন পৌঁছে দেবার ভার রইল আপনার ওপর।

● ●

সুদূর বিদেশে যেয়েও আপনি রূপ-মঞ্চ এবং তার পাঠক-সমাজকে ভুলতে পারেন নি—রূপ-মঞ্চ এবং তার পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাকেও আন্তরিক প্রত্যভিনন্দন জানাচ্ছি—আপনার বিদেশ যাত্রা সাফল্য-মণ্ডিত হউক, অভিনন্দনের সংগে সেই কামনাও করি। কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক। আমাদের অবিমৃশ্যকারীতায় পরস্পরের যে রক্তপাত—জীবননষ্ট ও সম্পদহানি হ'য়েছে—তার প্রায়শ্চিত্ত করবার দায়িত্ব আমরা হিন্দু-মুসলমান সমানভাবেই গ্রহণ করছি। নিজেদের এই লজ্জার কথা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করতে চাই না। বিমল রায়ের অঞ্জনগড়ের কাজ যথাযথ এগিয়ে চলেছে। বিস্তারীত যথাসময়ে রূপ-মঞ্চ মারফতই জানতে পারবেন। ভ্যানগার্ডের প্রথম চিত্র 'জয়যাত্রা' হিন্দি এবং বাংলায় গৃহীত হবে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত নীরেন

লাহিড়ী। জয়যাত্রার কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—চিত্রখানির সুর সংযোজনা করছেন শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত। এবং বিভিন্নাংশে সুনন্দা, সুমিত্রা, দেবী মুখার্জি, অহীন্দ্র, জহর, ধীরাজ, রাইমোহন, কৃষ্ণধন, ধ্রুব চক্রবর্তী প্রভৃতি অভিনয় করছেন। চিত্রবাণী লিঃ এর রাত্রির সংবাদ ইতিমধ্যেই রূপ-মঞ্চের মারফৎ পেয়েছেন আশা করি। 'বাদির' কাজ যদিও হাঙ্গামার জন্য একটু বাধাপ্রাপ্ত ছিল বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। রাত্রিতে দেখতে পাবেন প্রতিমা দাশগুপ্তা, সাবিত্রী, সুহাসিনী, অমিতা, কমল মিত্র, জহর, অমর, কৃষ্ণধন, ধ্রুব চক্রবর্তী (অপরাধ-খ্যাত) সুপ্রভা প্রভৃতিকে। শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ীর প্রযোজনায় মানু সেন চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন। কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন। চিত্রবাণীর স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত আর, কে, দাস তাঁর প্রত্যেকটী চিত্রই যাতে দর্শক সমাদর লাভে সমর্থ হয় সেজন্য সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন।

কুমারী রমা বসু (কাঁথি, মেদিনীপুর) রূপ-মঞ্চ শারদীয়া সংখ্যা পেয়ে সত্যি খুব আনন্দ হলো। ভেবেছিলাম যে, হয়তো শারদীয়া-সংখ্যা নাও পেতে পারি। সত্যি, আপনাদের রূপ-মঞ্চ আমাকে এত আনন্দ দেয় যে, প্রত্যেক মাসের শেষে রূপ-মঞ্চ পাবার জন্য দিন গুনি। রূপ মঞ্চ পেতে একটু দেরী হ'লে মন ভীষণ খারাপ হ'য়ে যায়। কতগুলি প্রশ্ন এই সংগে পাঠাচ্ছি। আশা করি উত্তর দেবেন। (১) শ্রীমতী চিত্রাদেবী কি অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছেন? (২) শ্রীমতী বিজয়া দাস কী আর বাংলা ছবিতে অভিনয় করবেন না? (৩) শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর পুরো নাম আমার মতে চন্দ্রাবতী সাহু। আপনার মত কী? (৪) পর পর সাজিয়ে দিন—চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, সুমিত্রা, কানন, মলিনা, রেণুকা। (৫) শ্রীমতী মেনকা দেবীকে অনেকদিন দেখতে পাইনি। তিনি কী চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন?

● ●

শারদীয়া-সংখ্যা আপনাদের আনন্দ দিতে সমর্থ হ'য়েছে, আমাদের পরিশ্রম তাই সার্থক বলেই মনে করি—বর্তমানের ভুলত্রুটি—আগামীবারে শুধরে নিয়ে আপনাদের প্রশংসা কেড়ে নেবার জন্য আমরা সচেতন থাকবো। (১) বর্তমানে শ্রীমতী চিত্রার চিত্রাবতরণ সম্পর্কে অবশ্য কোন সংবাদ পাচ্ছি না তাই বলে চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন—সেরূপ কেন নিশ্চয়তারও সংবাদ পাই নি। তাই ভবিষ্যতে হয়ত তাঁকে আবার দেখতে পাবেন। (২) অভিনয় করবেন না এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেন নি। বিশেষ করে তিনি বাংলার মেয়ে এবং শিক্ষা ও আভিজাত্যে চিত্রজগতের অনেককেই ঠোকর মেরে চলে যাবার স্পর্ধা রাখেন। যদিও অভিনয়কলা সম্পর্কে যাঁদের বর্ণমালার জ্ঞানও নেই, তাদেরই কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে শ্রীমতী বিজয়া নিজের ভাগ্যান্বেষণের জন্য বম্বে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবার সংবাদ পেলেই দেখবেন এখান থেকে ডাকাডাকি হাকাহাকি আরম্ভ হবে। (৩) হ্যাঁ, আপনার সংগে আমি একমত। (৪) চন্দ্রাবতী, মলিনা, কানন, সুনন্দা, সুমিত্রা, রেণুকা। (৫) না। শ্রীমতী মেনকাদেবী বম্বেতে একাধিক হিন্দি চিত্রে অভিনয় করছেন।

শ্রীবিমলকান্তি সরকার (পদ্ম রোড, কদমা, জামসেদপুর) (১) কয়েক বছর পূর্বে কোন একটী সাপ্তাহিকে অভিনেতা অশোক কুমার ও ছায়াদেবীর (বড়) একটী মিলিত ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে লেখা ছিল, "এটা কোন সিনেমা সংক্রান্ত ছবি নয়, এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক।" তাদের এই পারিবারিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু জানাবেন কী? (২) সুমিত্রাদেবী প্রথম কোন বইয়ে অভিনয় করেন? (৩) বন্দেমাতরম চিত্রের নায়িকা শকুন্তলা রায় ও দিকশূল চিত্রের নায়িকা অঞ্জলি রায়ের মধ্যে কোন পারিবারিক সম্বন্ধ আছে কী?

● ●

(১) হ্যাঁ শ্রীযুক্ত অশোক কুমার এবং ছায়াদেবী মামাত-পিসতুত ভাইবোন। (২) সন্ধি চিত্রে। (৩) অঞ্জলি রায়ের ব্যর্থতাকে শকুন্তলার সার্থকতা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

সুকুমার মুখোপাধ্যায় (খুরোপ, হাওড়া)

(১) আমি বরাবরই দেখে আসছি যে, আপনারা প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই কয়েকজন গ্রাহকের উত্তর দিচ্ছেন—এটা দেখে বড়ই হতাশ হ'তে হয়! কোন কিছু জানবারও বাসনা থাকেনা আর যদিও থাকে তা জোর করেই এরকম মন থেকে মুছে ফেলতে হয়। আশা করি আপনারা সকলেরই বাসনা কিছু কিছু পূর্ণ করবার চেষ্টা করবেন। (২) আমার বাবা কোন বিশিষ্ট ষ্টুডিও কিংবা সিনেমার শেয়ার কিনতে ইচ্ছুক। আপনারা এ বিষয়ে তাঁকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারেন কি? (৩) বটকৃষ্ণ দাস সম্প্রতি কোন ষ্টুডিওর সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—তাকে কত শীঘ্র কোন ছবিতে দেখা যাবে? (৪) প্রত্যেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর জীবনী রূপ-মঞ্চে বাহির হওয়ার কথা যে শুনা গেল তার কী হ'লো? সত্যিই প্রত্যেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর জীবনী জানতে বড়ই ইচ্ছা হয়। এটা জানি যে, পত্রিকায় বিস্তারীতভাবে জানানো সম্ভব নয়—তবু মোটামুটী জানালেতো পারেন?

● ●

(১) সমস্ত গ্রাহক বা পত্র লেখকদের উত্তর দেওয়া যে সম্ভব নয়—যাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে পত্রের পরিমাণ দেখে যান—তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। প্রশ্নের সার্বজনীনতা এবং প্রয়োজনীয়তার দিক বিচার করেই উত্তর দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত কৌতূহল না মিটিয়ে সকলের কৌতূহল রয়েছে যে, বিষয়ে তাই মেটানো কী উচিত নয়? তবে যাতে আরো বেশী সংখ্যক পত্রের উত্তর দিতে পারি সেদিকে আমরা নজর দিচ্ছি—এবং আগামী সংখ্যা থেকে এর প্রমাণও পাবেন। তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ—একসংগে ৪।৫টার প্রশ্ন করবেন না। একটা বা দুইটা প্রশ্ন করলে অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতেই আমরা সক্ষম হবো। এবং এমন ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করবেন না—যার উত্তর দিতে কাগজের বেশী স্থান অধিকার করে বসে। আপনি যেমন আপনার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে অধীর হ'য়ে ওঠেন, প্রশ্ন করবার সময় মনে রাখবেন আপনার মত আরো অনেকে—কৌতূহলী মন নিয়ে অপেক্ষা করছেন। (২) এ ব্যাপারে আমরা কোন নির্দেশ দিতে পারি না। কারণ, যাঁরা যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে চিত্র ব্যবসায়ে নেমেছেন—তাঁদের অতীত যাই থাকুক না কেন, বর্তমানের কার্যকলাপ সম্পর্কে যতক্ষণ না আমাদের কাছে কোন বিরুদ্ধমত আসছে কোন মন্তব্যই করতে পারি না। এবং বিশেষভাবে কাউকে আমরা অনুমোদন করতেও পারি না—তাহ'লে অপরের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই যাঁরা যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে চিত্র-শিল্পের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন, আপনার পিতা যদি তাদের কোন 'শেয়ার' কিনতে চান—এ বিষয়ে কোন ব্যবসায়ীর পরামর্শ নিতেই পরামর্শ দেবো। এবং কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনে যদি তিনি প্রবঞ্চিত হ'ন, তখন উক্ত কোম্পানীর মুখস খুলে দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো। (৩) এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোন সংবাদও আসেনি আর তাছাড়া শ্রীযুক্ত দাসের নামের সংগেও আমরা পরিচিত নই (৪) অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী কী রূপ-মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন না? আপনারা বাইরে থেকে কিছু না জেনে এমন অভিযোগ আনেন—যা রূপ-মঞ্চের পাঠকদের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। আমাদের দুর্বলতা শুধরে নেবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি—সে চেষ্টা সফলতালাভ করতে সময় সাপেক্ষ। আপনারা হয়ত কোন অভিযোগ করে পরের মাসেই তা শুধরে নেবার দাবী করলেন—যা মোটেই সম্ভবপর নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী সুযোগ এবং সুবিধামত রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হচ্ছে। হাতের নাগালে যদি কোন গাছে ফল ধরে থাকে - বলা মাত্র তা পেরে এনে দেওয়া যায়—কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী সংগ্রহ করা গাছের ফলের মত অত সহজ নয়। তাঁরা সবাই ব্যস্ত। আমরাও ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝে ফাঁক খুঁজে যখনই সময় পাই, তাঁদের জীবনী সংগ্রহ করে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়। এ ব্যাপারে অতটা অধৈর্য হ'লে চলবে কেন? অভিনেতা কবে জন্মেছেন—কী খান—কী ভালবাসেন—কী ভাবে

চলেন—কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সম্পর্কে সেইটেই সবচেয়ে বড় জানা নয়। এবং আলোচনাপ্রসংগে যেসব শিল্পীদের জীবনী প্রকাশিত হ'য়েছে—তা থেকেই আমাদের আলোচনার ধারা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। কোন বিষয়েই ধৈর্য হারাবেন না। আপনাদের ইচ্ছাকেই রূপ-মঞ্চে রূপ দেবার জন্য রূপ-মঞ্চের কর্মীরা সবসময় সচেষ্ট। আমাদের কার্যকলাপ থেকে আশা করি এটুকু বিশ্বাস করতে পারবেন।

কল্পনা দাশগুপ্তা (জামসেদপুর) (১) রাধামোহন বর্তমানে কোন বইতে অংশগ্রহণ করিতেছেন? (২) বাঙ্গালী অভিনেত্রীদের মধ্যে সংগীতে শ্রেষ্ঠা কে?

● ●

(১) রাধামোহন বর্তমানে অভিযাত্রী, সি, আই, ডি ও অঞ্জনগড়ে অভিনয় করছেন। (২) শ্রীমতী কানন দেবী।

গোবিন্দ বিশ্বাস (টাটানগর, বি, এন, আর) আমি একজন রূপ-মঞ্চের ভক্ত; বাংলা সিনেমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে, আশা করি আমার এ অভিযোগ আপনার পত্রিকায় একটু স্থান পাবে! প্রেম, ভালবাসা, মাতলামি, জোচ্চুরী, ভণ্ডামী এগুলো বাদ দিয়ে কি কোন বাংলা ছবি হয় না। যুবক যুবতীর ভালবাসা ছাড়া কি আর কোন জিনিষ ভালবাসতে আমরা জানিনা! দেশকে ও দেশবাসীগণকে ভালবাসতে পারিনা! মা, ভাই, বোন, বন্ধু এঁদের কি ভালবাসতে শিখিনি! শুধু একঘেয়ে নায়ক নায়িকার সমুদ্র মন্থন দেখে মন তেঁতো হয়ে গেছে! এইসব অপদার্থ ছবি তুলে বাঙ্গালী জাতির অসম্মান করা হয়। সিনেমার ভেতর দিয়েও মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে। বালক, কিশোর, যুবা যারা বাংলার ভবিষ্যত তারা কি শিক্ষা পায়? দেশকে চেনাতে হবে, দেশবাসীকে ভালবাসতে শেখাতে হবে! ভীরুতা, কাপুরুষতা, বর্বরতা দুর করে সাহসী, বলবান, কষ্ট-সহিষ্ণুতার পথ দেখিয়ে দিতে হবে! বড় বড় মনিষী যাঁরা দেশের ও দশের সেবা করে প্রাতঃ-স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের জীবনীকে কেন্দ্র করে ছবি তুলে দেশবাসীর মনের দুর্বলতা দুর করতে হবে। সিনেমার ভেতর দিয়ে জাতিকে গড়ে তুলতে হবে মনের মতন করে! শুধু অর্থোপার্জনের জন্য বাজে ছবি তৈরি করে বাঙ্গালী জাতিকে অন্যান্য জাতির সমক্ষে হীন প্রতিপন্ন না করাই বাঞ্ছনীয়। মাটীর ঘরে চঞ্চল যেখানে তার স্ত্রীকে চাবুক মারছে সেই দৃশ্যে কতকগুলি অবাঙ্গালী দর্শক বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে কটুক্তি করতে ছাড়ে নি। তারা স্পষ্ট-ভাবেই বল্লে, বাঙ্গালী লোক ঔরৎলোকা এইসা মারতা! আজকাল অনেকে ভুঁইফোড়ের দল, সিনেমা কোম্পানী খুলে বসেছেন! তাঁরা শুধু নিজেদের স্বার্থের দিকেই তাকাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সম্মুখে যে বিরাট কর্তব্য রয়েছে সেটা মোটেই চিন্তা করেন না! বাজে ছবি তোলার জন্য মোটামুটি ৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারা যায়। প্রথম—সিনেমা কোম্পানীর মালিকগণ! দ্বিতীয়—Story writer তৃতীয়—পরিচালকগণ।

আজকাল অনেক নূতন নূতন পরিচালকের নাম শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে দু-একখানি ছবি তুলে কৃতিত্ব অর্জন করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন! তন্মধ্যে আমি নিউ থিয়েটার্সের বিমল বাবু ও সংগ্রামের পরিচালক অর্ধেন্দু বাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি! আশা করি অন্যান্য পরিচালকেরা এঁদেরই মত সুনাম অর্জন করে বাংলা চিত্রশিল্পের মর্যাদা রক্ষা করবেন। মালিকদের কাছে আমার এই অনুরোধ তাঁরা যেন চিত্র-শিল্পকে ব্যবসার গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে বাংলা ছবির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেন! যাঁরা গল্প রচনা করেন, লেখবার আগে তাঁরা যেন দেশের চতুর্দিকে ভালভাবে চোখ বুলিয়ে নেন, দেশ তাঁদের হাতে কলম দিয়ে অনেক কিছু আশা করে।

তারাশঙ্কর বাবুর বড় আদরের "ধাত্রীদেবতা" আমরা মঞ্চে দেখতে চাই! আশা করি তিনি আমাদের নিরাশা করবেন না! এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন!

● ●

আপনার অভিযোগ এবং স্বীকৃতির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই।

ধাত্রীদেবতা চিত্রে রূপায়িত হ'চ্ছে। চিত্রখানি পরি-চালনা করছেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ।

বন্দেমাতরম

প্রযোজনা : চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরী। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও ও পরিচালনা : সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা : সুকৃতি সেন। শব্দযন্ত্রী : জগদীশ বসু। চিত্রশিল্পী : ধীরেন দে। রাসায়নাগারিক : ধীরেন দে (কে, বি)। শিল্প নির্দেশক : শুভ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : রবীন দাস। প্রধান কর্মসচিব : নরেশ চন্দ্র চৌধুরী। ভূমিকায় : মলিনা, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, শকুন্তলা, মনোরমা, ছবি, জহর, নির্মলেন্দু, অমর, ইন্দু, তুলসী, আশু, বেচু, মনোরঞ্জন, ন্যাংটেশ্বর, মাষ্টার শম্ভু, নবদ্বীপ, নৃপতি, অহী প্রভৃতি। পরিবেশক : সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর, চলন্তিকা চিত্র প্রডাকসন্সের প্রথম চিত্র 'বন্দেমাতরম' মিনার, ছবিঘর এবং বিজলী প্রেক্ষাগৃহে নব প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করেছে।

'বন্দেমাতরম' এর প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী সম্পর্কে প্রথমে দু'চারটী কথা বলে নিতে চাই। মৈমনসিংহ জেলার হেমনগরের (আমবাড়িয়াগড়) জমিদার দানবীর স্বর্গত হেমচন্দ্র চৌধুরীর তিনি তৃতীয় পুত্র। এরূপ একটী প্রাচীন বংশ থেকে আমরা একজন প্রযোজককে পেয়েছি বলে কিছুটা আশার কারণ আছে বৈকী? সাধারণতঃ আমাদের দেশের ধনীরা চিত্র ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে চান না—তারপর জমিদারদের কথাত ছেড়েই দিলাম। তাঁরা কুবেরের ভাণ্ডারের মত কেউ ধনসম্পত্তি আগলে আছেন—আবার উচ্ছৃঙ্খলতার হাতেও যে অনেকে সমস্ত উজার করে দিয়েছেন, তারও খবর কারো অজানা নয়। তবু চিত্র ব্যবসায়ে ঠিক ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভংগী নিয়ে অনেককেই অগ্রসর হতে দেখি না। শ্রীযুক্ত চৌধুরী সেদিক থেকে তাই আমাদের ধন্যবাদার্হ। জমিদার পরিবারের সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন বলে—তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদের যোগ্য। এবং মৈমনসিংহ তথা বাংলার আরো শিক্ষিত জমিদারদের এবং ধনীদের এই প্রসংগে চিত্র ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই প্রসংগে চিত্রের সমালোচনা করবার পূর্বে আমরা আর একটী কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন অনুভব করি। চিত্র ব্যবসায়ে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সাফল্যই যে আমাদের কাম্য—চিত্র সমালোচনা দেখে সে বিষয়ে তাঁর মনে যেন কোন বিরুদ্ধ ভাব না জাগে। কারণ, সাংবাদিকের আদর্শ এবং ধর্মের চেয়ে আমাদের কাছে আর কিছুই বড় নয়। সেদিক থেকে যদি তাঁকে কোন আঘাত দিয়ে বসি সেজন্য পূর্ব থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এবং এই আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর আছে বলেই মনে করি। তাই তিনি যেন এই সমালোচনাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বে পর পর কয়েকজন দর্শক কয়েকখানি পত্রাঘাতে অভিযোগ করেছেন—'জাতীয়তাবাদের নামে তার জারস রস পরিবেশন করে চিত্র প্রযোজকেরা বাংলা ছবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার মূলে কুঠার হানছেন'—এই অভিযোগ শুধু আমরাই নই—সমাজের প্রত্যেক স্তরের চিন্তাশীল মনিষীরাই স্বীকার করেছেন। কিছুদিন থেকে আমরা লক্ষ্য করছি, জনসাধারণের জাগ্রত দেশাত্মবোধকে কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থ সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করে নিয়েছেন। বর্তমানকালের কতগুলি চিত্রে জাতীয়তাবাদের নামে তার ফাঁকা বুলির নিদর্শনগুলি আমাদের এই উক্তির সাক্ষ্য দেবে। প্রথম প্রথম আমাদের মনে হ'য়েছে—জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এঁদের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই বলে এই বিকৃত বিশ্লেষণ দেখতে পাচ্ছি। সেকথা যদিও নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়—তবু তার চেয়েও যে

কথা বড়, তা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের শোষণ-স্পৃহা 'Exploiting tendency'।

কোন বিষয় সম্পর্কে যাদের কোন জ্ঞান থাকেনা—যা খেতে খেতে তারা তা শুধরে নিতে পারে এবং তাদের অজ্ঞানতাকে ক্ষমা করা মহানুভবতারই পরিচয়। কিন্তু শোষণ-স্পৃহার ছলকে দেশাত্মবোধের শঠরূপ দিয়ে যারা ঢেকে রাখতে চায়, তাদের ক্ষমা করবো কী করে? বেশীর ভাগ প্রযোজক এবং চিত্র পরিচালকদের ছবির ভিতর এই 'Exploiting tendency'র পরিচয় পাচ্ছি বলেই এদের শঠতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য দর্শক সাধারণকে সব সময় সচেতন থাকতে অনুরোধ জানাবো। আলোচ্য চিত্র 'বন্দেমাতরম'ও আমাদের এই অভিযোগ থেকে বাদ পড়ে না। আলোচ্য চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে ইতিপূর্বে 'গোঁজামিলে' আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। 'বন্দেমাতরম' চিত্রের কাহিনীটিও তাঁরই লেখনী প্রসূত। তাই 'বন্দেমাতরম' এর কাহিনী, চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা সংস্থাপনের চিত্রে যে রূপ দেখতে পেয়েছি এবং চিত্রের মারফৎ মূল বিষয়বস্তুটী কাহিনী আকারে কী ছিল তাও যা কল্পনা করে নিয়েছি—তার নিন্দা এবং স্তুতি সব কিছুর দায়িত্বই তাঁর। একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কাহিনীকার আর কেউ হতেন, চিত্রের ব্যর্থতা এবং ঐ হীনতার বোঝাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারতেন—যা অনেক সময় পরিচালকেরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে কাহিনী এবং পরিচালনা দুইই তাঁর—তাই তাঁর খালাস পাবার কোন উপায় নেই।

পরিচালনার কথা বাদ দিয়ে গল্পটীর কথা যদি কেউ চিন্তা করেন—গল্প বলায় গাল্পিকের কাঁচা হাতের কথাই মনে হবে। রূপকথার রাজকুমারীকে নিয়ে যেমনি মায়াজাল বোনা হয়—বন্দেমাতরম চিত্রের কাহিনীর সমস্ত চরিত্রগুলি নিয়ে তেমনি মায়াজাল বুনেছেন। রেস খেলায় যেমন অনেক ধনী সন্তান বিলাসের পরিচয় দিয়ে থাকেন—শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাহিনীটীতে চরিত্র এবং ঘটনা সংস্থাপনে স্বীয় কল্পনার রূপ ফুটিয়ে তেমনি বিলাস উপভোগ করেছেন।

'বন্দেমাতরম' এর নায়ক নবেন্দু তরুণ কবি—গণ-কবি। পূর্বে অবস্থা সংগতিপূর্ণ থাকলেও তাঁর সংগে যখন আমাদের পরিচয়, তখন বাজারের খরচা চলেনা ঠিক এমনি অবস্থা। চরিত্রও খারাপ নয়—পান দোষও নেই, তাই টাকা যে কী ভাবে উড়িয়ে দিল বলা কঠিন। আদর্শ বিলাসী তাই আদর্শের নামে হয়ত টাকা উড়িয়েছে—অথবা কবি-বাতিক মনের জন্যও টাকা নষ্ট হতে পারে। সে যাক। তরুলতা নবেন্দুর সংগে একসাথে পড়তো! তার বাড়ীতে কবি-সম্বর্ধনা সভার পৌরহিত্য করেন কবির অন্যতম সহপাঠী তরুলতাদের বাড়ীর নিকটস্থ আশ্রম 'আনন্দ মঠের' ব্রহ্মচারী বা মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ। তরুলতার সংগে নবেন্দুর মায়েরও দেখা হয়। তরুলতাকে পুত্রবধূ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তরুলতার ব্যবহার এবং রূপ ছাড়া সে যে ধনীর মেয়ে তাও নবেন্দুর মা'কে কম আকৃষ্ট করেনি; নবেন্দুর মা বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হ'লেন তরুলতাদের বাড়ীতে—নবেন্দু দরিদ্র তাই তার মাকে অপমানিত হ'য়ে ফিরে আসতে হ'লো। মায়ের মর্যাদা রক্ষায় কবি 'তরুলতার বন্ধুত্ব বিসর্জন দিল।'

হঠাৎ নবেন্দুর ভাগ্য ঘুরে গেল—একমাত্র মামা এবং তাঁর একমাত্র ছেলে—দু'জনেই মারা যাওয়াতে মামার বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হ'লো সে। তাঁকে কম্বুলীটোলায় মামার বাড়ীতে আসতে হ'লো। মায়ের পেড়াপীড়িতে বিয়েও করতে হ'লো। তরুলতা বিয়ে করলো না—ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে যেয়ে মা আনন্দময়ী হ'য়ে উঠলো সে। নবেন্দুর ছেলে হ'য়েছে একটী—বেশ বড় হ'য়ে উঠলো—তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে দেওয়া হ'লো। এদিকে কম্বুলী-টোলায় সে আনন্দমঠের আদর্শে 'মহাজাতি সদন' নামে আর একটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলো এবং আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তার সম্পত্তিও দান করলো। নবেন্দুর এক দূর সম্পর্কীয় মামা—চরণ তার নাম, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবেন্দু ও তার মায়ের মাঝে একটা ব্যবধান গড়ে তুললো। নবেন্দুর আশ্রম প্রভৃতিকে তার মা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। নবেন্দুর স্ত্রীর আহ্বানে আনন্দময়ী এলো একদিন নবেন্দুদের বাড়ী। নবেন্দুর

মা তাকে অপমান করলো। নবেন্দু মায়ের এই আচরণের প্রতিবাদ করতে যেয়ে মাকে রূঢ় কথা বলে বসে। তারপর তাঁর মস্তিষ্কের সাময়িক বিকৃতি দেখতে পাই এবং বৌকে ধাক্কা মেরে আঘাত করে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। স্ত্রী শয্যা নেয়—শয্যা চিরদিনের মত ত্যাগ করে। তারপর নবেন্দুকে দেখি তাঁর কলকাতার পূর্বের বাড়ীতে—বাড়ীটা সে নিজেই কিনে নিয়েছিল। চরণ এবং তাঁর আর একজন ভক্ত তাঁর পাশে। চরণের পরিবর্তনও দেখি এইসময়ে। তরুলতা এবং পুরোন চাকরও এসে হাজির হয়। তারা নবেন্দু'কে নিয়ে কম্বুলীটোলায় 'মহাজাতি সদনে' হাজির হয়। নবেন্দুর মাও তাঁর সবস্ব আশ্রমে দান করেন। সেখানেই সংগীতের ভিতর দিয়ে কবির মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া হয়।

মোটামুটি 'বন্দেমাতরম'-এর এই হ'লো কাহিনী। প্রথম নায়ক নবেন্দুর কথা বলি। নবেন্দু কবি—গণকবি। কবি নবেন্দুকে আঁকতে যেয়ে কাহিনীকার কল্পনার পাখায় চড়ে এত দূরে চলে গেছেন যে, তিনি তাঁর কল্পনার নবেন্দুকে রবীন্দ্রনাথ না হ'লেও তাঁরই কাছাকাছি স্তরে বসানো যায় এমনভাবে একজনকে ধরে নিয়েছেন। এই কল্পনাকে প্রশংসাই করতাম—যদি বাস্তবে তা সুষ্ঠু রূপ পেত। বিরাট চরিত্র আঁকতে হ'লে—বিরাটত্ব সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কাহিনীকারের সে বাস্তব দৃষ্টিভংগীর অভাব বলেই তাঁর নবেন্দু ব্যর্থ হ'য়েছে। বাস্তব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় তখনই পেতাম, যখন দেখতাম চরিত্র নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু সুধীরবন্ধুর নবেন্দু তা দিতে পারে নি। তাঁকেই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে—কথার ভিতর দিয়ে চরিত্রের পরিচয় দিতে হ'য়েছে—কাজের ভিতর দিয়ে নয়—তাই 'নবেন্দু' কল্পনার বিলাসে একটী অবাস্তব চরিত্র হ'য়ে দর্শকদের কাছে দেখা দিয়েছে। আগাগোড়া স্বামীজির মুখ দিয়ে—মায়ের মুখ দিয়ে—তরুলতার মুখ দিয়ে—অনুগতদের মুখ দিয়ে—নবেন্দুকে বিরাট চরিত্ররূপে আঁকতে চেষ্টা করা হ'য়েছে।

এত বড় প্রতিভা—এত বড় আদর্শবাদী—যাঁর প্রেরণায় ব্রহ্মানন্দ বিরাট জাকজমকময় (!) 'আনন্দ-মঠ' প্রতিষ্ঠা করলো—তার বিকাশ দেখতে পেলাম—দু'মিনিটেই খাতা পেনসিল নিয়ে কবিতা লিখে ফেলতে পারেন—কাঠি দিয়েও তরতর করে যেখানে সেখানে কবিতা লিখতে পারেন—তাছাড়া যেটুকু পরিচয় পেলাম, তা কবি নবেন্দুর পরিচয় নয়—বিরাট প্রতিভারও নয়—মাতুলের হঠাৎ পাওয়া সম্পত্তির মালিক কল্পনাবিলাসী নবেন্দুর—যার সাক্ষ্য মহাজাতি সদন। আর পেয়েছি হৃদয়বান স্পষ্টবাদী জমিদার ও বন্ধুবৎসল নবেন্দুর। নবেন্দুকে গণকবি বলে অভিহিত করা হ'য়েছে! এই 'গণ' কথাটা স্টুডিও মহলের '555' এবং 'Black' and 'White' প্রভৃতি সিগারেটগুলি ব্যবহারের মত কর্তৃপক্ষদের আর এক ধরণের বিলাস বা তথাকথিত 'স্টাইল'-এর মত পেয়ে বসেছে। 'গণ' কথাটা কোন সম্প্রদায় বা ধর্মকে অনুসরণ করে না। কিন্তু গণকবি নবেন্দুর পরিকল্পনা যে হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে একথা কী কাহিনীকার অস্বীকার করতে পারেন? আশা করি ভবিষ্যতে 'গণ' কথাটার এরূপ অপব্যবহার তিনি করবেন না। তরুলতার চরিত্রটীও অতি সাধারণ চরিত্র হ'য়েছে। তরুলতার আশা আকাঙ্খা যখন সামাজিক জীবনে পূর্ণ হ'লো না—তখনই তাকে আনন্দময়ীরূপে আশ্রমে দেখতে পাই। ব্যক্তিগত জীবনে সে যখন তার প্রেমাস্পদকে পেলনা—জীবনের সেই ব্যর্থতাকে ভুলে যেতেই সে এলো 'আনন্দ-মঠে'—আনন্দমঠের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়—নবেন্দুর আদর্শের মাঝে ডুবে থেকে অন্ততঃ কিছুটা শান্তি পেতে। অর্থাৎ "সখি কৃষ্ণ কালো—তমাল কালো তাইতো তমাল ভালবাসি।"

নবেন্দুর মায়ের চরিত্রটীও স্থানে স্থানে হীনতায় ঢাকা পড়েছে। যেমন মনে করুন, তরুলতাকে দেখেই মা পছন্দ করে ফেললেন। তরুলতার অন্তরের মাধুর্য থেকে সে বড়লোকের মেয়ে—এই তথ্যটা নবেন্দুর মাকে কম আকৃষ্ট করেনি। অবশ্য এই মাতৃ চরিত্রটী একটী স্থানে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কাহিনীকার। মাতৃহৃদয়ের চাপা আবেগ—পুত্র এবং পুত্রবধূর প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ফল্গুর ধারার মত সে দৃশ্যে বিকাশলাভ করতে দেখে খুশীই হ'য়েছি। এই দৃশ্যটী হচ্ছে, পুত্রবধূর চোখের জল

দেখতে পেয়ে যখন তিনি বল্লেন, 'তোমার চোখে জল কেন বউমা! ছিঃ বোঝনা, আমি যে তোমাদেরই জন্য বকি।'

হেড-সারভ্যাণ্টের এবং চরণের চরিত্রটীরও প্রশংসা করবো। কাহিনীর অপরাংশের সমালোচনা পরিচালনা ও চিত্রের আনুসংগিক প্রসংগে বলছি। নবেন্দু চরিত্রে দেখতে পেয়েছি খ্যাতনামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে ইদানীং কতগুলি চরিত্রে অভিনয় করবার সময় কতগুলি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি—সেগুলি সম্পর্কে তাঁকে একটু সতর্ক করিয়ে দিতে চাই। চরিত্রে অভিনয় করবার সময় চরিত্রের মূল বক্তব্যটী সম্পর্কে তিনি যতখানি না ভাবেন—তার চেয়ে বেশী অহমিকার ভাবপ্রকাশ পেয়ে থাকে তাঁর অভিনয়ে।

অর্থাৎ আমি বড় অভিনেতা এবং যে চরিত্রে অভিনয় করছি সে চরিত্রটীও বড় এই ভাব আর কী। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস যদি বলেন, এটা আমার ব্যক্তিত্ব তা হ'লে তাঁর সংগে একমত হ'তে পারবো না—কারণ, ব্যক্তিত্ব আর অহমিকায় প্রভেদ অনেকখানি। ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিক চরিত্রকে নিজের কাছে ভালবেসে আকর্ষণ ক'রে—আর অহমিকা চোখ রাঙিয়ে আকর্ষণ করতে চায়। এই ব্যক্তিত্বের উদাহরণ রাধামোহন অভিনীত অনুপ চরিত্রটী। সেখানে দর্শকেরা চরিত্রটীর নিজস্ব শক্তির জন্যত বটেই—তাছাড়া অভিনেতার জন্য বেশী আকৃষ্ট হ'য়েছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস অভিনীত মুটবিহারীর কথাও বলতে পারি। নবেন্দু চরিত্রটী যদিও কাহিনীকারের দুর্বলতার জন্য সবলভাবে দাঁড়াতে পারেনি তবু তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে যে চ্যুত হ'য়েছেন, একথা বলা দরকার বলেই মনে করি। নবেন্দু চরিত্রটীর জন্য কাহিনীকার শুধু একটী দৃশ্যে প্রশংসা পেতে পারেন—যখন স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিরোধিতা নিয়ে আর দু'জন জমিদারকে দেখতে পাই। ছবি বাবুর অভিনয়ে কবি নবেন্দুকে কোন স্থানেই পাইনি অবশ্য একথাও স্বীকার করবো এজন্য দায়ী চরিত্রটীর যিনি স্রষ্টা। তবু তরুলতার ভূমিকায় মলিনা দেবী যতখানি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ছবি বাবু তা দিতে পারেন নি। তরুলতার চরিত্রটীকে একজন ব্যর্থ প্রেমিকার চরিত্র ছাড়া আর কিছুই আমরা ভাবতে পারি না।

মায়ের চরিত্রটীকে রূপদান করেছেন শ্রীমতী প্রভা—চরিত্রানুযায়ী তাঁর অভিনয়কে প্রশংসা করবো। চরণ এবং হেড সারভ্যাণ্টের ভূমিকায় যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী এবং ইন্দু মুখার্জি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। জহরের একঘেয়েমী যেমন আমাদের পেয়ে বসেছিল—চরণে একটু মুখ বদলে নেওয়া গেল। ইন্দু মুখার্জি অভিনীত চরিত্রটীতে নতুনত্ব কিছু নেই—এরূপ চরিত্রের সংগে পূর্বে বহুবার আমাদের পরিচয় হ'য়েছে—তবে তাঁর অভিনয় আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর ভূমিকায় দেখতে পেয়েছি—অভিজ্ঞ নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে। ব্রহ্মানন্দের আশ্রম 'আনন্দ মঠের' আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের চরিত্রটীর যে কী সার্থকতা এবং তার যে কী কাজ তা বুঝতে পারলাম না। হয়ত কাহিনীকারের মত কল্পনা শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত তাই, আমরা যা দেখেছি তা হ'চ্ছে, তিনি মোটা তাকিয়ায় ঠ্যাস দিয়ে বসে থাকেন। ভূতের মত কে যেন তাঁকে অর্থ জোগায়। তিনি কতগুলি ছেলেদের নিয়ে আছেন—যাদের কাজ হচ্ছে কুচকাওয়াজ করা। তাই ব্রহ্মানন্দকে একজন মহন্ত বলা যেতে পারে। ধর্মচর্চা ছাড়া বালকদের হিন্দু ধর্মাদর্শে শিক্ষিত করার স্পৃহাও যাঁর আছে। এ ছাড়া দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের বড় বড় কাজের কথাগুলি শুনলেও কার্যক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দের ভিতর তার কিছুই পরিচয় পাইনি। নির্মলেন্দুর উদাত্ত কণ্ঠে বড় বড় কথাগুলি এবং রূপসজ্জার স্বামীজি স্বামীজি ভাব বেশ ফুটে উঠেছে এবং দর্শকদের তা আনন্দই দেবে। নবেন্দুর স্ত্রীর ভূমিকায় শকুন্তলা রায়—অঞ্জলি রায়ের বিগত অভিনেত্রী জীবনের ব্যর্থতাকে নূতন নাম নিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হ'য়েছেন। তাঁর বর্তমান অভিনয়ে মজবার মত এমন কোন নৈপুণ্যের পরিচয় পাইনি। এই ধরণের চরিত্রে হয়ত কোনরকমে তিনি পাড়ি দিতে পারেন এবং এখানেও তাই দিয়েছেন। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। অথচ দেখতেও তিনি ভাল, কণ্ঠস্বরও বেশ—অভিনয় শিল্পের সেবায় যে তাঁর আগ্রহ রয়েছে, তারও পরিচয় তাঁর নাম

পরিবর্তন থেকেও বুঝতে পারি -তাই তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগে—আশা করি দর্শকেরাও অন্ততঃ আরো দু'একটী ছবিতে তাঁকে সহানুভূতির সংগে দেখবেন।

অন্যান্য ভূমিকায় আশু বোস—স্যাংটেশ্বর, তুলসী চক্রবর্তী এবং নবদ্বীপের নির্বাকাভিনয়ের প্রশংসাই করবো।

এবার সমগ্রভাবে চিত্র পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কয়েকটী কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করি। প্রথম 'বন্দেমাতরম' নাম গ্রহণের কী তাৎপর্য থাকতে পারে। বন্দেমাতরম—আনন্দমঠ—জয় হিন্দ্—এমনকী মহাজাতি-সদন প্রভৃতিকে এভাবে টেনে এনে মর্যাদাহানি না করে—একজন আদর্শবাদী কবি ও জমিদার কীভাবে তার আদর্শের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেল সে কথা বললে বলাটা বেশ ঝরঝরে হ'তো—এবং পরিচালকের 'Exploiting-tendency'-র কোন পরিচয়ই আমরা পেতাম না। জয়-হিন্দ্—বন্দেমাতরম এইসব কথাগুলির অযথা ব্যবহার দর্শকসমাজ মোটেই বরদাস্ত করবেন না। তাঁরা চান কাজের কথা। বন্দেমাতরমের কথাই যদি ধরি, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ-মঠের সন্তানরা নিষ্ক্রীয় নন। তাঁরা কোন বিশেষ ধর্মকে আশ্রয় করে উঠলেও অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং নিরীহ ও আর্তকে আশ্রয় দেওয়াই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। মুসলমান তখন শাসক ছিল, তাই তাদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের আনন্দ-মঠের সন্তানরা দাঁড়িয়েছিলেন—অনেকে বঙ্কিমের সন্তানদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভংগীতে বিচার করেন কিন্তু তখন রেজাখাঁর পরিবর্তে যদি অন্য কোন অত্যাচারী হিন্দু রাজাকে দেখতে পেতাম, বঙ্কিমের সন্তানরা তার বিরুদ্ধেও খড়্গ তুলতে দ্বিধা করতেন না। বঙ্কিমের আনন্দমঠ এবং তাঁর সন্তানদের কথা থাক। আমাদের সুধীরবন্ধুর আনন্দমঠই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সুধীরবন্ধুর আনন্দমঠ দেখে দর্শকদের মনে কী একটুকুও প্রেরণা জেগেছে? তাত জাগেইনি, বরং ঐ ছেলেমানুষীতে যেকোন চিন্তাশীল দর্শকের মনে বাংলা ছায়াছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে—এবং ব্যথিতও হ'য়েছেন। কীভাবে কর্তৃপক্ষ তাজা তাজা ভুলগুলি পরিবেশন করছেন—আমরা দর্শকেরা ভোম-ভোলানাথের মত আকণ্ঠ তা পান করছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশ্রমটাকে দেশের মনীষীদের ছবি দিয়ে যত আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা হ'য়েছে—তার এক শতাংশও যদি কাজের পরিচয় পেতাম আমাদের দুঃখ হ'তো না। কতগুলি বালক প্রতিপালিত হচ্ছে এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে। তবু চরকা নিয়ে একটু ছেলেখেলা করলেও প্রশংসা করবো। সবচেয়ে হাসি পায় তখন, যখন ছেলেরা কুচ কাওয়াজ করে—বিশেষ করে যখন মা আনন্দময়ীকে ঘিরে তারা বেশ একটু কায়দাকলম করে কুচকাওয়াজ করে বেরিয়ে পড়লো। এই দৃশ্যটা দেখে পাড়াগাঁয়ের যাত্রাদলের কথা মনে পড়ে।

মহাজাতি-সদন নামটা গ্রহণে দর্শকসমাজ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি—প্রথমতঃ আইনতঃ সুধীরবন্ধু এই নাম গ্রহণ করতে পারেন না—দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববরেণ্য কবির আশীর্বাদ নিয়ে যুগাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে মহাজাতি-সদন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হ'য়েছিলেন --সুধীরবন্ধুর মহাজাতি সদনে তার মূল আদর্শ বিকৃত হ'য়েছে—এবং একে একমাত্র ব্যঙ্গ রূপ বলেই মনে করতে পারি।

আট দশ বছর একটা ফুলের তোড়াকে—যেভাবে জিইয়ে রাখতে দেখেছি তাতে সুধীরবন্ধুকে শুক্রাচার্য বলে মনে ভাবাটাও অস্বাভাবিক নয়। অথবা উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর এমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান আছে যেজন্য ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকার একটা বড় 'post' দেবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করতেও হয়ত পারেন। পণ্ডিত জওহরলাল অথবা আর কাউকে ছবিখানা একবার দেখিয়ে দিলে মন্দ কী? যদি সুযোগটা মিলে যায়!

গানের সংগে সংগে গায়ের যে দৃশ্যাবলী দেখেছি—সুধীরবন্ধু ত গাঁয়ের ছেলে—তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি—বাংলার কোন গায়ে ঐ রূপ তিনি দেখেছেন! চরণকে যখন তখন হাত গুজে টাকা দেওয়া হচ্ছে—এটাও অস্বাভাবিক। টেবিলের পর ধুলোয় লেখা কবিতা ৮।১০ বছর ফুলের তোড়া জিইয়ে রাখবার মতই হাস্যকর। নবেন্দুবেশী ছবি বিশ্বাস এবং তরুলতাবেশী মলিনা যখন প্রেমাভিনয় করেন—বয়সের কথাটা দর্শকদের মনে জাগাটাও

অস্বাভাবিক নয়। 'বন্দেমাতরম' এর দোষত্রুটি আরো যে না আছে তা নয়—পূর্ণাংগ চিত্রের পরিচালনায় সর্বপ্রথম হাতে খড়ি বলে সেগুলি ক্ষমাই করবো।

কিছুটা প্রশংসার ভাগ থেকে সুধীরবন্ধুকে বঞ্চিত করবো, এমন কৃপণ আমরা নই। চিত্রের গানগুলি নিছক প্রেমের গান নয় যা বাংলা ছায়াছবিকে সংক্রামক ব্যাধির মত পেয়ে বসে আছে। তাই এদিক থেকে তিনি দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন। সুরশিল্পী সুকৃতি সেনকে সর্বপ্রথম চিত্রে সুযোগ দিয়েও তিনি আমাদের ধন্যবাদ পেতে পারেন। শ্রীযুক্ত সেন সে-সুযোগের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবেই রেখেছেন। এই প্রসংগে সংগীতগুলি অন্তরাল থেকে যিনি বা যাঁরা গেয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গীত রচনায় 'সুপ্রভাতের প্রথম মন্ত্র জন্মভূমির নাম' গানটীর জন্য শ্রীযুক্ত মোহিনী চৌধুরী মৌলিকত্বের দাবী করতে পারেন না। শ্রীযুক্ত সজনী দাস রচিত একজাতি একপ্রাণ একতা (কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ) গানটীর ভাব এবং কথার চৌর্যবৃত্তি বলতে পারি না—ছাপ গ্রহণের জন্য নিন্দাই করবো। সেই সংগে তাঁর 'মৃত্যু যখন হবেই হবে' গানটীর প্রশংসাও করবো।

নবেন্দুর বিয়ে হ'য়ে গেল—সেই সংগে তরুলতার অন্তর্দ্বন্দ্বের দৃশ্যাবলীর জন্য সুধীর বন্ধু প্রশংসা পেতে পারেন —যদিও এগুলির সংগে দর্শকদের বহু পূর্বেই পরিচয় হ'য়েছে—। সংলাপও খুব ধারালো হ'য়েছে—কিন্তু সেগুলি একটা রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন শিশুকে কাপড় জামা পরিয়ে সাজানো গোজানোর মত হ'য়েছে। মহাজাতি-সদন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই কাহিনীর শেষ হওয়া উচিত ছিল—মায়ের স্বীকৃতি পাবার জন্য অযথা টেনে নিয়ে দু'টোকে হত্যা করা হ'য়েছে। দৃশ্যপট খুব জাকজমকময় হ'য়েচে কিন্তু শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার খুব নৈপুণ্যের পরিচয় পাইনি। সম্পাদকেরও কেরামতির পরিচয় সেরূপ পাইনি। সম্বর্ধনা সভার পরই নবেন্দুর আনন্দমঠ পরিদর্শনের মাঝে আরও একটু সময় নেওয়া উচিত ছিল। চিত্রগ্রহণ এবং শব্দগ্রহণ চলনসই। আশা করি সুধীরবন্ধু তাঁর পরবর্তী চিত্রের সময় বর্তমানের দোষত্রুটি শুধরে নিতে পারবেন। —নিতাই সেন

রায়গড়

শ্রীযুক্তমহেন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত এবং রচিত ঐতিহাসিক নাটক। ভূমিকায় ভূমেন, জয়নারায়ণ, শিবকালী, পঞ্চানন, পূর্ণিমা, শান্তিগুপ্তা, অপর্ণা প্রভৃতি।

বাংলার গৌরব প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটী রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ জলদস্যু দমনে প্রতাপের শৌর্য এবং দেশদ্রোহীদের চক্রান্তজাল ছিন্ন করতে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা নাটকে দেখতে পাই।

'রায়গড়' নাটকে নাট্যকার তাঁর পূর্বে গৌরব হারিয়ে ফেলেছেন বলতে হবে! বাছাই করা কয়েকটি শব্দেরই উল্লেখ আছে, নইলে নাটকটী হয়ত বটতলারই সমকক্ষ হত। নাটকীয় উপাদান কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র যে দৃশ্যে জলদস্যু পেড্রো তার জীবন কাহিনী ব্যক্ত করছে সেটাই মুগ্ধকর। এ দৃশ্যের রচনায় নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত নন্দকুমার, মীরকাশিম, টিপু সুলতান প্রভৃতি নাটকের ছাপ এই বইখানিতে ভালভাবেই দেখা যায়।

পেড্রোর অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে দর্শক মন কেঁদে উঠে। আপনা থেকেই নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা এনে দেয় তার রচনার চাতুর্যে, কিন্তু তার পরদৃশ্যেই একটা সস্তা নাচের আমদানী করে নাট্যকার দর্শক মন থেকে অনেক দূরে সরে যান। পেড্রোর পরিচয় দৃশ্যের পরই বিরতি দেওয়া ভাল ছিল নাকি?

অভিনয় সম্পর্কে বলতে গেলে একমাত্র ভূমেন রায়কেই প্রশংসা করব। তার অভিনয় নৈপুণ্য সত্যিই মুগ্ধ কর। পল্লো রূপে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করতে করতে তিনি দর্শকদের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করান।

পেড্রোর জন্য দর্শকদের চোখে জল দেখা দেয়। এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দের ভূমিকায় শিবকালীর অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছে। মনে হয় তাঁর পূর্ব খ্যাতিও এর কাছে ম্লান হয়েছে।

পূর্ণিমা ও শান্তি গুপ্তা তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তবে শ্রীমতি পূর্ণিমা সিনেমার মারপ্যাচ এখনও ভুলতে পারেন নি।

রূপরাম রূপী জয় নারায়ণ মন্দ নয়।

প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তাঁকে যে কেন পরিচালক এখনও চালাচ্ছেন তা বুঝতে পারি না। উক্ত অভিনেতাকে একমাত্র নির্বাক সৈনিকের ভূমিকায় নামালেই ভাল হত। কারণ, দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়া তাঁর ভিতর আর কিছুই নেই! অভিনয় শিখতে তাঁর এখনও দেরী আছে। যে নাটকের প্রাণ প্রতাপাদিত্য সেখানে এমন একটি 'মাকাল' ফল নামিয়ে পরিচালক মোটেই বুদ্ধির পরিচয় দেন নি। প্রতাপরূপী উক্ত অভিনেতার মুখ দিয়ে তিনি যে সার্বজনীন বাণী শুনিয়েছেন তা শুনে দর্শকমন বিষিয়ে ওঠে।

উদয়াদিত্যের ভূমিকাটীও তেমনি হয়েছে। কথায় বলে, "বাপকে বেটা—"।

কন্দর্পনারায়ণের অভিনয় শুনে মনে হয় যেন গ্রামোফোন চলছে। অর্থাৎ দম দিয়ে গ্রামোফোন ছেড়ে দিলে যেমন চলতে থাকে এর অভিনয় তেমনি। ছোট ছেলেরা যেমন "পাখী সব করে রব" মুখস্ত বলে, চোখ বুজে শুনলে এর অভিনয়ও ঠিক তেমনি শোনা যায়।

কাশীনাথের ভূমিকায় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিনয়ও নিকৃষ্ট ধরণের। তিনি কৃত্রিম স্বরে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন আর শেষ রাখতে না পেরে উৎকট নিজস্ব স্বর জানিয়ে প্রস্থান করেন। যেখানে করুণ অংশ তিনি অভিনয় করেন সেটা হাস্যদ্দীপক হয়।

পরিশেষে পরিচালককে বলব তিনি এই অভিনেতাদের বিদায় দিন। নইলে বিজ্ঞাপনে লিখিত, "অর্দ্ধ শতাব্দীর জনপ্রিয় নাট্যগৃহে" এই কথাটি মুছে ফেলতে হবে। যশোহরের প্রাসাদচত্বরের দৃশ্যে তিনি যে পর্বতরাজি দেখিয়েছেন তা দেখে মনে হয় শস্য শ্যামলা বাংলা দেশে পর্বতের সৃষ্টি করে তিনি চিরদিন আবিষ্কারকরূপে প্রসিদ্ধ থাকবেন। সর্বশেষে পেড্রোর মুখে "জয়-হিন্দ" বাণী শুনিয়ে তিনি বাজীমাৎ করবার যে চেষ্টা করেছেন, সেটা না করলেই ভাল হত। তাঁর এই চেষ্টাকে "জয়-হিন্দ" শব্দের অবমাননা করা বলতে হয়।

নাটকের সংগীতাংশ ভালই।

—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

রাজপথ—

কাহিনী: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যরূপ: দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রযোজনা: শরৎ চট্টোপাধ্যায়। গীতিকার: দিলীপ দাশগুপ্ত। সুর ও আবহ সংগীত: অনিল বাগচী। মঞ্চ ও দৃশ্য: মনীন্দ্রনাথ দাস। ব্যবস্থাপনা: সন্তোষ বন্দ্যো ও বিনয় চট্টো। প্রস্তুতি: প্রভাত সিংহ। রূপায়ণে: শরৎ চট্টো, মিহির ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, বিজয় দাস, সাধন লাহিড়ী, বিপিন বসু, বাণীবালা, রাজলক্ষ্মী (ছোট), বেলারাণী, উমা মুখার্জি রমা ব্যানার্জি, বন্দনা দেবী প্রভৃতি।

প্রবীণ কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত 'রাজপথ' উপন্যাসখানি নাট্য রূপায়িত হয়ে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। নাট্যরূপ দান করেছেন নবীন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' উপন্যাসখানি সম্পর্কে বেশী কিছু ভূমিকা দেবার প্রয়োজন যে নেই, যাঁরা উপন্যাসখানি পড়েছেন তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন—অহিংসাবাদ এবং খাদি প্রচলনের পটভূমিকায় প্রতিফলিত 'রাজপথ'কে একখানি প্রথম

শ্রেণীর প্রচারমূলক রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। অথচ মানব হৃদয়ের সহজাত আবেগ ও দৌর্বল্য এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থেকেও 'রাজপথের' চরিত্রগুলি দূরে সড়ে নেই। প্রকৃত কংগ্রেসকর্মীর নিষ্ঠা ও কর্মপন্থার সুস্পষ্ট ইংগিত কাহিনীকার সুরেশ্বরের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছেন। তাই এরূপ একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে যেমনি দেবনারায়ণ বাবু আমাদের ধন্যবাদ আশা করতে পাবেন—তেমনি তা মঞ্চস্থ করে রঙমহলের কর্তৃপক্ষও। এই প্রসংগে আর একটী কথা বিশেষ করে বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদীদের কাছে বলবার আছে। নিউথিয়েটাসের বহুজন প্রশংসিত উদয়েরপথে চিত্রখানির কথা আশা করি দর্শকসমাজ এখনও ভুলে যান নি। চিত্রখানি প্রথম মুক্তির পর অনেকে তাতে 'রাজপথের' হুবহু ছাপ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। উপন্যাসখানি তার পূর্বে পড়বার সুযোগ পেলেও স্মৃতিশক্তির অক্ষমতার জন্য তখন এই অভিযোগের সঠিক উত্তর দেবার মত আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। 'রাজপথ' পুনর্বার পড়ে নিয়ে আমাদের স্মৃতিশক্তিকে যখন আবার ঝালাই করে নিলাম—তখন ঐ অভিযোগ নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে অপ্রাসংগিক হবে বলে চুপ করে ছিলাম। তাই শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' সম্পর্কে কিছুটা অবিচার আমরা করেছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যাঁরা 'উদয়ের পথে' সম্পর্কে তখন অভিযোগ এনেছিলেন, আজ 'রাজপথের' সমালোচনা লিখতে বসে সেই অভিযোগকে মেনে নিতে একটুকুও আমরা কুণ্ঠা প্রকাশ করবো না। 'রাজপথের' সুরেশ্বর, মাধবী এবং তারাসুন্দরীকে 'উদয়ের পথে' অনুপ, সুমিতা এবং এদের মায়ের মাঝে খুঁজে পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সুমিত্রা এবং গোপার কথাও উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না। 'রাজপথে' সুরেশ্বরকে সুমিত্রাকে অবলম্বন করে একটি আভিজাত পরিবারের সংগে লড়াই করতে দেখি। রাজপথের নায়ক উদয়ের পথের চেয়েও বলিষ্ঠ—শুধু নায়কই নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রই বাস্তবের রূপ নিয়ে ফুঠে উঠেছে। রাজপথের বক্তব্যও উদয়ের পথের চেয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট এবং নিখুঁত—যদিও দুইয়ের এই বক্তব্য বিষয়টুকুতেই যা প্রভেদ। তাই দুঃখ হয়, যিনি সত্যিকারের প্রশংসা পাবার যোগ্য—চরিত্র চিত্রণে মৌলিকত্বের দাবী যাঁর সর্বাগ্রে, সেই দীন প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রতি আমরা কি অবিচারটাই না করেছি। আমাদের এবং আমাদের মত আরো অনেকের ভুল শুধরে নেবার সুযোগ যে রঙমহল কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন, এজন্য বিশেষ ভাবে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'রাজপথের' নাট্যরূপদাতা দেবনারায়ণ গুপ্তকেও প্রশংসা করবো—মূল উপন্যাসখানির কোন মর্যাদাহানিই তিনি করেন নি। পরিণতির দিকে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য পড়ে—উপন্যাসিকের অনুমতি নিয়েই এ পরিবর্তন করা হয়েছে জেনে আমরা খুশী হলুম এবং এই পরিবর্তন টুকুও প্রশংসনীয়।

যে অভিনেত্রী গোষ্ঠীকে শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ পরীক্ষামূলক ভাবে নাট্যামোদীদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

'রাজপথে'—তাতে অভিনয়ের মান একটু নীচু হলেও তাঁর সৎসাহসের প্রশংসা করবো। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতৃদের সুযোগ দিয়ে এঁদের প্রতিভা বিকাশে তিনি সাহায্যই করেছেন।

ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানের এ ক্ষতিটুকু স্বীকার করে নিতে আমরা কুণ্ঠিত নই। এই প্রসংগে প্রথমে বলা চলে মিহির ভট্টাচার্যের কথা। বিপ্রদাসে দ্বিজদাসরূপে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য আমাদের যতখানি খুশী করতে পেরেছিলেন—রাজপথে সুরেশ্বররূপে তার চেয়ে কম খুশী হইনি। দ্বিজদাসরূপে যে প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন অমাদের কাছ থেকে—সুরেশ্বররূপেও সে প্রশংসা দাবী করলে মুক্ত কণ্ঠে আমরা তা মেনে নেবো। বিমানের ভূমিকায় বেচু সিংহও অক্ষমতার পরিচয় দেন নি। সুমিত্রার ভূমিকায় বন্দনা সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারে। মলিনার অভিনয় প্রতিভাকে যদি শ্রীমতী বন্দনা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন—তবে সুমিত্রাকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। চঞ্চলা বিমলার ভূমিকায় রমা ব্যানার্জির কথাও বলবো। তবে নাচের দৃশ্যটীতে—নাচটা বাদ দিয়ে বরং গান দিলেই ভাল হ'তো। একথা বলছি ঘূর্ণমান হালকা মঞ্চের কথা মনে করে। কারণ, যখন বিমলা তার নাচটী আরম্ভ করে—মঞ্চের অন্যান্য চরিত্রগুলি দুলতে থাকে—রস গ্রহণের দিক থেকে অনেকাংশে তা বাধা সৃষ্টি করে। রাজলক্ষ্মীর 'মাধবী'র অভিনয়ের বিরুদ্ধে কিছু না বললেও—তিনি যে মাধবীর ভূমিকায় সম্পূর্ণ বেমানান একথা উল্লেখ করতেই হবে। সাধন সরকার নামে আর একজন নবাগতকে দেখতে পেলাম। প্রিয়দর্শন—গানও জানেন। যে ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পেয়েছি—সে ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাবার সুযোগ না পেলেও—তাঁর ভবিষ্যৎ অভিনেতা-জীবন সম্পর্কে আমরা একটু আগ্রহেই অপেক্ষা করবো। বেলারাণীর জয়ন্তী, উমা মুখার্জির সুরমাও নিন্দনীয় নয়। বেলারাণী একটু বেশী প্রশংসা পেতে পারেন। প্রমদাচরণের ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায় যথাযথ অভিনয় করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর আভিজাত্য তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তবে যেখানে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রী ধরে টান দিতে হয়—সেখানে খুব চতুরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেসব স্থানে কেবল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা অভিনয়ের সময় আমাদের মনে হ'য়েছে। তারাসুন্দরীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা নিখুঁত অভিনয় করেছেন। একমাত্র তাঁর অভিনয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের কোন অভিযোগ নেই। দুইটী অংকে নাটকটী লিখিত। প্রথম অংকে পাঁচটী এবং দ্বিতীয় অংকে ছয়টী দৃশ্য। দৃশ্যসজ্জারও প্রশংসা করবো। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটীর পরিকল্পনার জন্য। গানের কথা এবং সুর কোনটাই কানে লাগে না। সুরশিল্পী থেকে গীতিকারই এজন্য দায়ী। কারণ, গানগুলির কথাগুলি যেন জোর করে সাজানো হ'য়েছে—তার সাবলীল গতি নেই—সুর তাই তাকে অনুসরণ করে ব্যর্থ হ'য়েছে।

রাজপথ আমাদের ভাল লেগেছে—এরূপ প্রচারমূলক নাটকের প্রচারই আমরা কামনা করি। —শ্রীপার্থিব

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

এম, পি, প্রডাকসন্স : এম, পি, প্রডাকসন্সের দোভাষী চিত্র, 'তুমি আর আমি'র কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্র। কবি শৈলেন রায়ের একটা নূতন ধরণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'তুমি আর আমি' গড়ে উঠেছে। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন কাননদেবী, সন্ধ্যারাণী, পূর্ণিমা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, পরেশ ব্যানার্জি, নির্মল রুদ্র প্রভৃতি আরো অনেকে। 'তুমি আর আমি'র যে কাজটুকু বাকী আছে তা শীঘ্রই শেষ হ'য়ে যাবে। এবং আগামী বড়দিনে 'তুমি আর আমি' মুক্তির লাভ করবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি।

ডি, লুক্স পিকচার্স : ডি, লুক্স পিকচার্সের নিজস্ব প্রযোজনায় আগামী বাংলা ছবি 'ললিতা সখী'র কাজ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আরম্ভ হ'য়েছে। চিত্রখানির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত নির্মল তালুকদার। স্বর্গত কবি ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আরো অনেকের সংস্পর্শে এসে এবং সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করে শ্রীযুক্ত তালুকদার চিত্রজগত সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন স্বাধীনভাবে চিত্র পরিচালনা করবার সুযোগ বহু পূর্বেই তাঁর পাওয়া উচিত ছিল—একথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছিলাম। ডি, লুক্স পিকচার্স শ্রীযুক্ত তালুকদারকে সে সুযোগ দিয়ে আমাদের খুশী করেছেন। আশা করি নির্মলবাবু আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেন। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করবেন সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত রবীন চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী সংখ্যায় 'ললিতা-সখী'র ভূমিকালিপি জানাতে চেষ্টা করবো।

কে, সি, দে প্রডাকসন্স : জনপ্রিয় অন্ধ গায়ক ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রযোজনায় আগামী বাংলা চিত্র 'পূরবী' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত চিত্ত বসু। ইতিপূ[র্বে] 'কতদূর' চিত্রে তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। 'পূরবী'র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচা[র্য]। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। শ্রীম[তী] সন্ধ্যাবাণীকে একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। 'পূরবী'র কাহিনী দু'জন সংগীতজ্ঞের বিভিন্নমুখীন দ্বন্দ্বে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ।

পাইয়োনীয়ার পিকচার্স : শ্রীযুক্ত নেপা[ল] দত্ত প্রযোজিত পাইয়োনীয়ার পিকচার্সের 'চন্দ্রশেখর' শ্রীযু[ক্ত] দেবকী বসুর পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। ঋষি বঙ্কিমের অমর উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' কে ভিত্তি করে শ্রীযুক্ত বসুর বর্তমান চিত্র হিন্দি এবং বাংলাতে গৃহী[ত] হচ্ছে। চন্দ্রশেখরের সুর সংযোজনা করছেন জনপ্রিয় সু[র] শিল্পী কমল দাশগুপ্ত। বাংলার মধুকণ্ঠি শ্রীমতী কানন দে[বী] ও জনপ্রিয় অভিনেতা অশোক কুমারকে সর্বপ্রথম এক[সঙ্গে] এই চিত্রে দেখা যাবে। তাছাড়া অপরাংশে রয়েছেন ছ[বি] বিশ্বাস, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, সুন্দর সিং এ[বং] আরো অনেকে। ইতি মধ্যে আমরা একটি বিরাট জা[...] জমকময় দৃশ্যে উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্প[না] দেবকী বসুর বাস্তব দৃষ্টিতে যে রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল— তার মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা অভিভূত হ[য়ে] পড়েছিলাম। ওদিন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ভারতী সুন্দর সিং, কুমারী গীতাশ্রী প্রভৃতিকে নিয়ে দৃশ্য গ্রহণ ক[রা] হয়। প্রযোজক নেপাল দত্ত অকৃপণ ভাবে চি[ত্র]খানিকে নিখুঁত করে তুলতে অর্থ ব্যয় করছেন। প্রবী[ণ] অভিজ্ঞ পরিচালক দেবকী বসুর শিল্পদৃষ্টি এবং প্রতিভা ঔজ্জ্বল্যে চন্দ্রশেখর নিখুঁত রূপে আমাদের কাছে ধরা দে[বে] বলেই বিশ্বাস রাখি।

এস, কে, প্রডাকসন্স : এস, কে, প্রডাকসন্সে[র] বর্তমান চিত্র 'ভ্রান্তি'র সংলাপ রচনা করেছে[ন] নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। চিত্রখানি পরিচালনা করবা[র] দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত কমল চট্টোপাধ্যায়। 'ভ্রান্তি'তে নায়করূপে দেখা যাবে উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়কে। শ্রীমতী চিত্রা তার স্ত্রীর ভূমিকা

অভিনয় করছেন। শ্রীমতী সাবিত্রীকেও একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি এখনও আমরা জানতে পারিনি। চিত্রখানি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। এদের প্রথম চিত্র সংগ্রাম দর্শকসাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছে—বর্তমান চিত্রও আশা করি তা থেকে বঞ্চিত হবে না।

রজনী পিকচার্স: শ্রীযুক্ত বিভূতি দাশের পরিচালনায় রজনী পিকচার্সের বর্তমান চিত্র 'তপোভঙ্গ' সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তপোভঙ্গের কাহিনী রচনা করেছেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। গীত রচনা করেছেন কবি শৈলেন রায় এবং সুর সংযোজনা করছেন শ্রীযুক্ত শচীন দাস মতিলাল। বাংলায় বর্তমানে যে কজন উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী আছেন—তাঁদের মাঝে শচীন বাবুর যে বিশিষ্ট স্থান রয়েছে একথা তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করবেন না। পর্দায় ইতিপূর্বে 'তরবার' ছবির সংগীত পরিচালকরূপে তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। 'তপোভঙ্গ'–চিত্রের অভিনয়াংশে দেখা যাবে প্রমীলা ত্রিবেদী, সন্ধ্যা, বনানী চৌধুরী, বি, এ, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, জীবেন বসু প্রভৃতিকে। শ্রীমতী বনানী চৌধুরী একজন শিক্ষিতা নবাগতা। তাঁর অভিনয় প্রতিভার সংগে পরিচিত হবার জন্য আমরা একটু উন্মুখ হ'য়েই আছি। তপোভঙ্গের পরিচালক বিভূতি দাশ ইতিপূর্বে চিত্রশিল্পীরূপে আমাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। পরিচালকরূপে এই সর্বপ্রথম তাঁকে আমরা দেখতে পাবো। তপোভঙ্গ তাই নানা দিক দিয়ে আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে। ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্‌ট্রিবিউটর্স পরিবেশনায় চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

ভারতী মহাবিদ্যালয়: আগামী ২৩শে নভেম্বর রংমহলে ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রী কর্তৃক দিলীপ দাশগুপ্ত রচিত সুর সংযোজিত ও পরিচালিত 'ভারত তীর্থ' নামক একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নাটক অভিনীত হবে। আলোক-তীর্থের পক্ষ থেকে শ্রীমৃণাল ব্রহ্ম নাটক খানির পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এজন্য একটী পরামর্শ সমিতি গঠিত হ'য়েছে। টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ বাংলার দাঙ্গা বিধ্বস্ত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে দান করা হবে। আমরা এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা হবে—সাহায্য করার পর তাও জানাতে অনুরোধ করি।

রূপ-ছায়া লিঃ (কলিকাতা): রূপছায়া লিঃ এর প্রচার সচিব নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, রূপ ছায়ার ফাউণ্ডার ডিরেক্টর তারকনাথ বাগচী মহাশয়ের সংগে দেশীয় চিত্রশিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'য়েছে এবং দেশীয় চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত বাগচীর বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। কথা প্রসংগে শ্রীযুক্ত বাগচী বলেন, "আমাদের দেশে কেবল পৌরাণিক আর সামাজিক ছবিই নির্মিত হয়েছে প্রচুর এবং সে সবের বিষয়বস্তু ও টেকনিকও একই প্রকার। জীবনী, আরণ্যক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি শিক্ষামূলক শ্রেণীর কোন চিত্রই নির্মিত হয়নি আজ অবধি। চলচ্চিত্র যে নিছক বিলাসের উপকরণ নয়, এর আদর্শ যে মহান এবং এর দ্বারা যে মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে তা দেশীয় শিল্পপতিগণ যে কেন অনুধাবন করতে পারেন না, তা চিন্তা করে যথার্থই আমি বিস্মিত হই। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রাম ও সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনা উদ্রেক বা দেশের লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা, আর্থিক উন্নতির পন্থা, ব্যাধি নিবারণ ও প্রতিরোধের উপায়, কুটীর শিল্প, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ প্রভৃতি শিক্ষা-মূলক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সময়োপযোগী বাণীচিত্র প্রস্তুত করলে যথার্থই দেশের ও দশের সুকার্য ও উন্নতি সাধন করা যায়। কিশোরোপযোগী কথাছবি নির্মাণ করাও বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু এইসব বিষয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামান না। আমরা চলচ্চিত্রের গতানুগতিকতা সম্পূর্ণ পরিহার করে নূতনতর ভাবধারার পরিচয় দেব প্রথমেই একখানা পূর্ণাংগ শিক্ষামূলক বাণীচিত্র নির্মাণ করে।" যেসব পরিকল্পনার কথা শ্রীযুক্ত বাগচী বলেছেন,

রূপছায়া যদি তার শতাংশের একাংশ আন্তরিকতা নিয়েও কাজে নেমে থাকেন, রূপ-মঞ্চ তথা বাংলার দর্শকসমাজের কাছ থেকে যে তাঁরা সহযোগীতা পাবেন, এটুকু তাঁদের বলতে পারি। তবে তাঁদের প্রথম চিত্র 'জ্ঞানের আলোক' যতক্ষণ না আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার পূর্বে তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে উপসংহারে পৌছতে আমরা অপারক।

রূপ ছায়ার চীফ-টেকনিক্যাল ডিরেক্টর নির্বাচিত হ'য়েছেন অশোক নাথ বাগচী। ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ শ্রীযুক্ত শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং 'জ্ঞানের আলোক' চিত্রখানির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত অশোক নাথ বাগচী। গত ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে 'জ্ঞানের আলোক' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। চিত্র প্রযোজনা ছাড়া প্রেক্ষাগৃহ এবং নিজস্ব প্রয়োগশালা নির্মাণের পরিকল্পনাও এঁদের আছে। বাগবাজার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট অঞ্চলে এঁদের প্রেক্ষাগৃহ এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রয়োগশালা নির্মাণের কাজও ইতিমধ্যে আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা রূপ-ছায়ার সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

শুভা প্রডাকসন্স : শ্রীযুক্ত শশধর দত্তের 'যুগের দাবী' উপন্যাস অবলম্বনে 'যুগের দাবী' কথাছবির চিত্রনাট্য রচিত হ'য়েছে। সভ্যতার অন্তরাল থেকে অভিশপ্ত শ্রমিক শ্রেণী দিনের পর দিন নিজেদের শরীরের রক্তবিন্দু তিল তিল করে দিয়ে সভ্যজাতির অন্ন আর অর্থ জোগায় এবং এর বিনিময়ে তারা ধনিক সম্প্রদায়ের নিপীড়নে ও শোষণে জর্জড়িত হয়। এই পরিচয় হারা জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ে অসহায়, অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের চিত্ররূপই যুগের দাবী। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন দত্ত। শ্রীযুক্ত ধীরেন দে এবং শচীন চক্রবর্তী যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ এবং শব্দ গ্রহণের কাজ করছেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, অমিতা, আরতি, পারুল প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত শৈলেশ দত্তগুপ্ত। চিত্রখানির পরিবেশনা স্বত্ব লাভ করেছেন ভারতী ফিল্মস একচেঞ্জ লিঃ। ভারতীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার দাশ জানিয়েছেন, 'যুগের দাবীর' কাজ একরকম শেষ হ'য়ে গেছে—দু'একটী শট্ এবং টুকিটাকি কিছু বাকী আছে। বড়দিনে এর মুক্তির খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। শুভা প্রডাকসন্সের একমাত্র স্বত্বাধিকারী নবীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত অমল কুমার দাশ 'যুগের দাবী' যাতে দর্শকসাধারণের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয় সেজন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করছেন।

এ, আর, প্রোডাকসন্স : শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের প্রথম চিত্র 'আমার দেশ' গৃহীত হবে। 'আমার দেশ' এর কাহিনী লিখেছেন 'কবি রমেন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বর্তমান রাধা ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের সংগে প্রথম থেকেই জড়িত আছেন। বেতারের শ্রোতারা তাঁর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত। ছায়াচিত্রে সম্ভবতঃ এই প্রথম শ্রীযুক্ত চৌধুরীর কাহিনী নির্বাচিত হ'লো—আশা করি শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে পারবেন। 'আমার দেশে' বহু নবাগতকে দেখা যাবে বলে প্রচারসচিব নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন।

ইউনিভারস্যাল ফিল্ম করপোরেশন (ইণ্ডিয়া লিঃ): এঁদের আওতায় ভারতী চিত্রণের প্রথম বাংলা ছবি 'বার্মার পথে'র দৃশ্য গ্রহণের কাজ পরিচালক হিরণ্ময় সেন ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন। বর্তমানে 'বার্মার পথে' সম্পাদকের কাঁচির খোঁচা খাচ্ছে। এই চিত্রে কয়েকজন নূতনের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং শ্রীযুক্ত সেন তাঁদের খুব সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়েছেন বলে প্রচার সচিব আমাদের জানিয়েছেন। এই নূতনদের ভিতর শ্রীমতী পারুল কর, ভাড়ু, সমর, প্রদীপ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া অভিজ্ঞদের ভিতর রয়েছেন অহীন্দ্র, শৈলেন, ছায়া, জ্যোৎস্না, রেবা প্রভৃতি। চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে।

ক্যালকাটা টকীজ লিঃ : ক্যালকাটা টকীজের প্রথম বাংলা ছবি 'মুক্তির বন্ধন'-এর চিত্র গ্রহণের কাজ সমাপ্তির পথে অগ্রসর হ'য়েছে। সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসে

চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। 'মুক্তির বন্ধন' কাহিনীও শ্রীযুক্ত নিয়োগীর রচনা। এবং কিছুদিন পূর্বে এই কাহিনীটী রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়েছিল। মুক্তির বন্ধনের চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রশিল্পী মণ্টু পাল শব্দযন্ত্রী রূপেও একজন অভিজ্ঞ শিল্পীকেই দেখতে পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর এই চিত্রে কয়েকজন নূতনকে গ্রহণ করবেন। তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এবং তাঁর নূতনেরা আশানুরূপ কাজ করছেন বলেই সংবাদ পেয়েছি। এর বিভিন্নাংশে দেখা যাবে রতন গুপ্ত, নীলু রায় (এঃ), আশু বোস, প্রফুল্ল দাস, নীতীশ মুখো, অশোক কুমার, মাষ্টার অনু, মাষ্টার শম্ভু, রাজলক্ষ্মী (বড ও ছোট), গীতাশ্রী, উমা, রেবা, যমুনা প্রভৃতি। সম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় চিত্রের কাহিনী রচিত। এবং এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে যেয়ে পরিচালক কথায় কথায় সেদিন বল্লেন, আমার ছবিতে বিজলী বাতি, এককাপ চা সিগারেটের ধুয়ো কিছুই দেখতে পাবেন না। তার পরিবর্তে দেখবেন—মাটির প্রদীপ—নারকেলের হুকো—গাঁয়ের মোড়ল—পুকুর ঘাট চাষির দল আর ধানের ক্ষেত।

ইউ, সি, এ ফিল্মস: পরিচালক প্রমোদ দাশগুপ্ত কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে ইউ, সি, এ ফিল্মস এর প্রথম বাংলা চিত্র "যা হয় না"-র কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বছর খানেক পূর্বে ইউ, সি, এ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের জানানো হ'য়েছিল যে, নূতনদের ভিতর থেকে রুচিসম্পন্ন আদর্শবাদী ও উদারচেতা কয়েক জনকে নিজের সহকারী ও শিল্পীরূপে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত গ্রহণ করবেন। তিনি তা' গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের এই সহকারীদের ভিতর কয়েকজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পীও আছেন। তাছাড়া দেবী মুখার্জি, মিহির ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন পাল এবং রেখা-নাট্যের খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা ও সাহিত্যিক মণি দাশগুপ্তও আছেন। নবীন সাংবাদিক শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত মিত্র ইউ, সি, এর প্রযোজনা বিভাগের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। তাছাড়া প্রচার বিভাগের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। আমরা 'যা হয়না' তার যা হবে তার জন্য উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় দিন গুনছি।

কথাচিত্র লিঃ: কথাচিত্র লিঃ এর প্রথম বাংলা চিত্র সংগ্রাম খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব-রাগের বিভিন্নাংশে দেখা যাবে দীপক মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, আহুতি মুখোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী বি, এ, প্রমীলা ত্রিবেদী শকুন্তলা রায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, শম্ভু, কমল মিত্র, জীবেন বসু প্রভৃতি আরো অনেককে। জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শ্রীযুক্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা সর্বপ্রথম সুরশিল্পীরূপে পূর্বরাগে দেখতে পাবো। 'দীপালী' সাপ্তাহিকের অন্যতম সম্পাদক সাংবাদিক বন্ধু শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় পূর্বরাগেও শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহযোগীতা করছেন। আশা করি সংগ্রামের ভুল ত্রুটি পূর্বরাগে ফুল হ'য়ে দেখা দেবে।

ক্লাসিক ফিল্মস লিঃ: কয়েকজন উৎসাহী যুবক সম্মিলিতভাবে ক্লাসিক ফিল্মস নামে একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এদের ভিতর আছেন অধ্যাপক জিতেশ গুহের ছেলে মিঃ গুহ, হিমাদ্রী রায়, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, সংগীত শিল্পী জগন্ময় মিত্র, সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ শিশিরকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি আরো অনেকে। এদের প্রথম চিত্র তোমারই হউক জয়'—এর মহরৎ উৎসব কিছু-দিন পূর্বে রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য 'তোমারই হউক জয়' এর কাহিনী রচনা করেছেন—চিত্রখানিও তিনিই পরিচালনা করবেন। সংগীত পরিচালকরূপে দেখা যাবে জনপ্রিয় শিল্পী জগন্ময় মিত্রকে। চিত্রজগতে এই আদর্শবাদী যুবকদিগের আগমনে কিছুটা আশার ভাব মনে জাগাটা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি চিত্রজগতের পঙ্কিল ভেদ করে বীর অভিযাত্রীর মত এরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

মুক্তি-সঙ্ঘ: (আলগী, ফরিদপুর) ছোট ছোট

ছেলেদের ভবিষ্যতের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক করে তোলবার জন্য এই সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। এতে শুধু তারাই সভ্য হতে পারবে. যারা এখনও কর্মজীবনে প্রবেশ করেনি। সঙ্ঘের বর্তমান সভ্য সংখ্যা ২০ জন। দেশের উন্নতি কি করে করতে হবে, কিভাবে ছেলেদের নৈতিক এবং শারীরিক উন্নতি হয় এসব শিক্ষা দেবার জন্য এদের উপরে রয়েছেন যারা তাদের নাম নীচে দেওয়া গেল।

পরিচালক মণ্ডলী ঃ উপদেষ্টা—শ্রীযুক্ত যতীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠপোষক—শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মাখন চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা, সংস্কৃতিমূলক গবেষণা এবং আমোদ প্রমোদ—শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, দেবেশ মুখোপাধ্যায়। ব্যায়াম, খেলাধূলা—ননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ মুখোপাধ্যায়।

এ বৎসর পূজার সময় এই সমিতি গঠিত হয়েছে। ৬ হতে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেরা এর সভ্য। ঘর থেকে যদি এরা সংশিক্ষা পেয়ে তৈরী হয়, তাহলে ভাবীকালে এরাই হবে প্রকৃত সৈনিক। গ্রামের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জঙ্গলপালা পরিস্কার, হিন্দু মুসলমান মিলন প্রভৃতি এদের বর্তমান উদ্দেশ্য। এইসব ছেলেরাই পাড়ায় পাড়ায় অন্যান্য ছেলেদের শিক্ষা দেবে।

সঙ্ঘের সম্পাদক—শ্রীমান রণজিৎ মুখোপাধ্যায় সভাপতি—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

ভ্যারাইটি পিকচার্স লিঃ ঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের হিন্দি চিত্র প্রেমকী দুনিয়া' শেষ হ'য়ে গেছে। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী অলকনন্দাকে 'প্রেমকী দুনিয়ায়' দেখা যাবে। তাছাড়া আছেন ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, আমীনা, বসির, ট্যাণ্ডন প্রভৃতি। দর্শক সাধারণের স্মরণ থাকতে পারে—'প্রেমকী দুনিয়া শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ-খ্যাত নাটক পি, ডব্লিউডি'র হিন্দি চিত্ররূপ। প্রেমকী দুনিয়ার সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুবল দাশগুপ্ত।

এদের অপর আর একখানি বাংলা চিত্র রবীন মাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচাপনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হ'চ্ছে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের রবীন মাষ্টারকে কেন্দ্র করেই রবীন মাষ্টার চিত্র রূপায়িত হ'চ্ছে। রবীন মাষ্টার রূপে দেখা যাবে উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়কে। তাছাড়া আছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, ইন্দিরা রায়, রাজলক্ষী (ছোট), দীপালী গোস্বামী, অজন্তা কর এবং আরো অনেকে। কুমারী অজন্তা করের সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারা ইতিপূর্বেই পরিচিত হ'য়েছেন—আমরা শ্রীমতী করের সাফল্য কামনা করি। রবীন মাষ্টারের সংগীত পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা শিল্পী দক্ষিণা মোহন ঠাকুর। ভ্যারাইটী পিকচার্সের প্রচারসচিব মিঃ কে, আর, দাস আমাদের জানিয়েছেন—ভ্যারাইটীর প্রযোজক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু বর্তমানে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনার কাজ সুষ্ঠুরূপেত হচ্ছেই—তাছাড়া চিত্র প্রদর্শনার দিকেও বর্তমানে নলিনীবাবু দৃষ্টি দিয়েছেন। এবং শ্যামবাজার অঞ্চলে এদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ 'অরুণ' শীঘ্রই দর্শক সাধারণকে আহ্বান জানাতে পারবে বলে বিশ্বাস। সম্প্রতি আমরা রবীন মাষ্টারের এক দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলাম। বিপিন মুখোপাধ্যায়, দীপালী গোস্বামী প্রভৃতিকে নিয়ে কয়েকটী দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। পরিচালক জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচার সচিব কে, আর, দাস এবং ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ভারপ্রাপ্ত সদস্য বন্ধুবর অজিত সেন আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন।

প্রভাতী ফিল্মস প্রডাকসন্স ঃ শ্রীযুক্ত সঞ্জয় কুণ্ডু ও বীরেশ্বর নাগ প্রযোজিত প্রভাতী ফিল্মের 'হবে জয়' চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন হলিউড প্রত্যাগত অসিত কুমার ঘোষ। সংগীত পরিচালকরূপে দেখা যাবে সুবল দাশগুপ্তকে। এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হ'য়েছেন রাধামোহন, জয়ন্তী দেবী, সুলেখা দেবী, বিভা মৌলিক, বাসন্তী লাহিড়ী, জহর রায়, প্রশান্ত বোস, ধীরেশ মজুমদার, সৌম্যেন গুপ্ত, রবি প্রকাশ বোস, অহীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে। সম্প্রতি কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এদের প্রাপ্টইটস্থিত

কার্যালয়ের বহু ক্ষতি হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন—এ ক্ষতিতে আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এভারেষ্ট ফিল্মঃ এভারেষ্ট ফিল্মের প্রথম বাংলা চিত্র 'ঝড়ের পর' এর কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। মন্মথ রায়ের কাহিনী, অপূর্ব মিত্রের পরিচালনা এবং অনিল বাগচীর সুর সংযোজনায় চিত্রখানি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এর অভিনয়াংশে দেখা যাবে জহর, ছায়া, জ্যোৎস্না, সন্তোষ সিংহ, আশু বোস, রবি রায়, অজন্তা কর প্রভৃতিকে এদের প্রযোজনায় 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা', 'মগসন্ধ্যা' এবং 'ব্যথার ব্যথী' নামক আরো তিনখানি চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। 'সিনেমা টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক বন্ধু সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত আছেন—আমাদের পক্ষে এও একটা খুশীর খবর।

বাসন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানঃ শ্রীযুক্ত সুনীল মজুমদারের পরিচালনায় 'বাসন্তিকার' প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র 'অভিযোগ' মুক্তির অপেক্ষায় আছে। বম্বে থেকে আসার পর শ্রীযুক্ত মজুমদারের এই প্রথম চিত্র। অভিযোগের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শৈলেশ দত্ত গুপ্তের ওপর। চিত্রশিল্পী এবং শব্দযন্ত্রীরূপে কাজ করছেন শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহা ও যতীন দত্ত। অভিযোগের বিভিন্নাংশে দেখা যাবে সুমিত্রা, বনানী, দেবী মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, রবি রায়, মনোরঞ্জন, কেষ্টধন, কানু, বেচু, নৃপতি, রঞ্জিৎ তুলসী, বিপিন, আশু, অহি, বলীন, সুনীল মজুমদার প্রভৃতিকে।

রূপাঞ্জলি পিকচার্সঃ শ্রীযুক্ত সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত রূপাঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র

'তুমি আর আমি'র একটী দৃশ্যে কানন, কমল, পরেশ, সন্ধ্যা প্রভৃতি।

অলকমন্দার কাজ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। অলকনন্দার কাহিনী লিখেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়—সম্ভবতঃ দেবকী বাবুর সহকারীরূপে ইনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ধীরেন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু), অলকনন্দার বিভিন্নাংশে দেখা যাবে প্রমীলা ত্রিবেদী, পরেশ ব্যানার্জি, পূর্ণিমা, ইন্দু, রবি রায়, তুলসী, অজিত, আশু প্রভৃতি আরো অনেককে। ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়কে অলকনন্দার একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় অনেকদিন বাদে দেখতে পাওয়া যাবে।

এসোসিয়েটেড ওরিয়েন্টাল ফিল্ম প্রোডিউসার্স: এদের সর্বপ্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দেশের দাবী' কোয়ালিটী ফিল্ম এর পরিবেশনায় মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী সমর ঘোষ। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবি রায় চৌধুরী। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে জ্যোৎস্না, ভানু, সাবিত্রী, বিপিন, সন্তোষ, সাধন, শৈলেন, প্রভা, নবদ্বীপ, প্রভাত, বাদল, হরিদাস প্রভৃতিকে। খ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল বর্তমানে এদের প্রচারকার্যের ভার নিয়ে আছেন। শ্রীযুক্ত সান্যাল তাছাড়া বর্তমানে ইংরেজী দৈনিক 'ন্যাশন্যালিষ্ট' পত্রিকার সিনেমা বিভাগটী পরিচালনা করেছেন এবং ক কটী সাপ্তাহিকের সংগেও তিনি জড়িত আছেন।

পার্ল প্রোডাকসন লিঃ: নব নির্মিত পার্ল প্রোডাকসন্সের প্রথম কথাচি 'বিপ্লবী'র রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অভিনেতা ও নাট্যকার উৎপল সেন। অভিনেতারূপে শ্রীযুক্ত সেনের সংগে ইতিপূর্বেই দর্শকেরা পরিচিত হয়েছেন। নাট্যকার হিসাবেও তিনি কম খ্যাতিলাভ করেন নি। তাঁর সিন্ধু গৌরব প্রভৃতি নাটক এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। সব্যসাচী নামে অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকাখানিরও তিনি সম্পাদনা করতেন। তাই তাঁকে চিত্র পরিচালকরূপে দেখতে পাবো—এতে আমরা খুশীই হ'য়েছি। 'বিপ্লবী'তে অভিনয়াংশে দেখা যাবে সরয়ূ, প্রভা, সাবিত্রী, প্রতুল, মিনতি, নীলিমা, মিহির, সন্তোষ, শৈলেন, মণি শ্রীমানি, কালী সরকার, পুরু মল্লিক প্রভৃতিকে। সুর-সংযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন গোপেন মল্লিক। চিত্রখানি বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে।

এ, এল, প্রোডাকসন্স: ওমেগা পাবলিসিটির সত্বাধিকারী মিঃ দত্ত এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুর প্রচেষ্টায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটী গড়ে উঠেছে। এদের প্রথম চিত্রের পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হ'য়েছে শ্রীযুক্ত মণি ঘোষের ওপর। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারীরূপে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন—তাছাড়া পরিচালকরূপেও ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত ঘোষের সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছে—এই প্রসংগে অরোরার সন্ধ্যা চিত্রখানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালের একটী কাহিনীকে ভিত্তি করে এদের প্রথম চিত্ররূপ লাভ করবে।

বেঙ্গল ফিল্মস: এদের প্রথম বাণীচিত্র 'সাধক রামপ্রসাদে'র মহরৎ উৎসব ইতিপূর্বে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন কৃষ্ণ হালদার। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত 'সাধক রামপ্রসাদের' চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। নাম ভূমিকায় একজন নবাগতকে এঁরা সুযোগ দিয়েছেন। এই নবাগতটীকে নিয়ে রূপ মঞ্চ থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হ'য়েছিল। কারণ, অভিনেতার সর্বপ্রকার সম্ভাবনা তার ভিতর আছে। তাই যে নূতনকে সম্ভাব্যের দাবী নিয়ে এদের কাছে উপস্থিত করা হ'য়েছিল, তাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষকে রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই নবাগত তরুনের নাম শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী।

ইষ্টবেঙ্গল ফিল্ম করপোরেশন লিঃ: শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রযোজিত এদের 'খেলা ভাঙ্গার খেলা' বাংলা চিত্রখানি রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। সীতা দেবীর 'পরভৃতিকা' উপন্যাস অবলম্বনে 'খেলা ভাঙ্গার খেলার' কাহিনী গড়ে উঠেছে।

নির্মলা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ : শ্রীযুক্ত কালীজীবন রায় চৌধুরীর প্রযত্নে ও পরিচালনায় সম্প্রতি নির্মলা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ নামক একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 'চাওয়া পাওয়া' নামক একখানি বাংলা চিত্র এঁরা নির্মাণ করবার মনস্থ করেছেন। 'চাওয়া পাওয়া'র কাহিনী ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়াস´: গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত ছন্দপতন নাটক ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়াসে´র সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হচ্ছে। নাটক পরিচালনা করছেন জীবন গোস্বামী। সুর সংযোজনা করবেন কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটস´ লিঃ: এদের পরিবেশনায় দু'খানি বাংলা চিত্রের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। এসোসিয়েটেড-এর নিজস্ব প্রযোজনায় গৃহীত 'মন্দির' চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রণব রায়ের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত ফণী বর্মা। সুর সংযোজনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অমর মল্লিক, অহীন্দ্র, জহর, মায়া, বুদ্ধদেব, রবি রায়, কানু, অনিল বসু, বেচু, প্রভাত সিংহ, নৃপতি, কৃষ্ণধন প্রভৃতিকে। অপর চিত্রখানি 'প্রতিমা' মুভি টেকনিকের প্রযোজনায় গৃহীত হচ্ছে। 'প্রতিমা'র পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন রায়। ইতিপূর্বে শৈলজানন্দের সহকারীরূপে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পৃথকভাবে এই প্রথম শ্রীযুক্ত রায়কে আমরা চিত্র পরিচালকরূপে দেখতে পাবো। 'প্রতিমা'র কাহিনী রচনা করেছেন জনপ্রিয় পরিচালক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে শিপ্রা দেবী, অজিত ব্যানার্জি, ফণী রায়, হরিধন, তুলসী, অহি, আর.ত, রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রভৃতিকে। এসোসিয়েটেড-এর নিজস্ব প্রযোজনায় আর একখানি চিত্র এ, ডি, থী, গঠন পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই চিত্রখানির কাহিনী এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে খ্যাতনামা গীতিকার প্রণব রায়। শ্রীযুক্ত রায় সম্ভবতঃ এই প্রথম স্বাধীনভাবে চিত্র পরিচালনা করবার সুযোগ পেলেন—আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি। চিত্রখানির সুর সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কমল দাশগুপ্ত।

সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটস´ লিঃ নব গঠিত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটসে´র পরিবেশনায় সর্বপ্রথম চিত্র 'বন্দেমাতরম' মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হ'য়েছে। 'বন্দেমাতরম' চিত্রখানি নবগঠিত চলন্তিকা চিত্র প্রডাকসন্সের সর্বপ্রথম বাংলা বাণীচিত্র। সেণ্ট্রাল ফিল্ম-এর পরিবেশনায় বাসন্তী পিকচাসে´র আগতপ্রায় বাংলা চিত্র সি, আই, ডি প্রদর্শিত হবে বলে সংবাদ পেয়েছি। সি' আই, ডি'র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সরকার। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন অমর দত্ত। সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন গোপেন মল্লিক এবং অভিনয়াংশের জন্য নির্বাচিত হ'য়েছেন শিপ্রা দেবী, রাধামোহন, জহর, অজিত ব্যানার্জি, নীলিমা, তুলসী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ মুভিজ লিঃ (গৌহাটি) : সম্প্রতি আসাম চিত্রশিল্পের প্রতি আবার নজর দিয়েছে বলে এক সংবাদে প্রকাশ। সংবাদটী আমাদের মত রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজকেও খুশী করবে সন্দেহ নেই। গত মহাষ্টমীর দিন কামাখ্যা মন্দিরে গৌহাটীর ইষ্টার্ণ মুভিজ লিঃ তাঁদের ঐতিহাসিক চিত্র 'বদন বরফুকান'-এর মহরৎ উৎসব সম্পন্ন করেছেন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের একজন খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। 'বদন বরফুকান' এর বিভিন্নাংশে দেখা যাবে কামাখ্যানাথ ঠাকুর, এস, সি, বড়ুয়া, সর্বেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি আরো অনেককে।

আসামে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদোলীর অধিনায়কত্বে কংগ্রেস মন্ত্রি সভার হাতে প্রদেশের শাসন ভার রয়েছে—চিরদিন আসামের অধিবাসীগণকে কৃষ্টির ও কলার সাধক রূপে আমরা দেখে এসেছি—চিত্রশিল্পে আসাম পেছিয়ে থাকবে—আসামের অধিবাসীদের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা রয়েছে

তারা তা মোটেই সমর্থন করতে পারেন না। তাই, এ বিষয়ে মন্ত্রী সভার সতীক্ষ দৃষ্টি দেওয়া আমরা কর্তব্য বলেই মনে করি।

ইণ্ডিয়া পিকচার্স (বম্বে): বম্বের ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিখিত 'নীচা নগর' ছবিখানি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হ'যে বিশেষ সম্মান লাভ করেছে জেনে আমরা খুব খুশী হয়েছি। ২৯টী দেশ হতে ৪৭টী ছবির ভিতর 'নীচা নগর' একাদশ স্থান অধিকার করেছে। 'নীচা নগর' পরিচালনা করেছেন চেতান আনন্দ। কাহিনী রচনা করেছেন হিযাতুল্লা আনসারী এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীশঙ্কর। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন উমা আনন্দ, রফিক আনওয়ার, কামিনী কৌশল, রফী পীর, হামিদ ভাট, মোহন সাযগল, জোহরা, এম্ ভাস, প্রভৃতি। একখানি ভারতীয় চিত্রের এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভে আমরা প্রযোজক রসিদ আনোযারকে বাংলার চিত্রামোদীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসংগে বলা যেতে পারে খ্যাতনামা প্রযোজক ভী, শান্তারাম প্রযোজিত রাজ কমল কলামন্দিরের শকুন্তলা, পর্বত পারে আপনা ডেরা ও ডাঃ কুটনীস আমেরিকায় প্রদর্শিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

স্বপ্ন ফিল্ম করপোরেশন (কলিকাতা): গত ১৩ই নভেম্বর রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'সত্যাগ্রহী'র মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষাল। এই নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অজয় কুমার দাশগুপ্ত।

ছায়ানট পিকচার্স: ছাযানট পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করে যেত। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তার মুক্তিদিবস সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হ'য়েছে। ছায়ানট পিকচার্সের প্রযোজক মিঃ আতায়ুল হক—একজন বাঙ্গালী শিক্ষিত উদারপন্থী মুসলমান। চিত্রজগতে একজন মুসলমান প্রযোজকের আগমনকে আশা করি বাঙ্গালী দর্শকসমাজ সাদরে গ্রহণ করবেন।

শ্রীমতী সুকৃতি সান্যাল

সুচরিতাসু,

১৬ই আগষ্টের আগেই আপনি গৌহাটি গিয়ে নিশ্চিন্ত-জীবন যাপন করছেন জেনে খুশী হ'লাম। পূর্বজন্মের কোন সুকৃতির জোরেই আপনি ১৬ই আগষ্টের পূর্বে গৌহাটি পৌঁছেচেন একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আপনার ২০শে আগষ্টের উৎকণ্ঠাপূর্ণ পত্রখানি দুর্ভাবনা কাটার পর আমার হাতে পৌঁছেচে। ইতিমধ্যে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কাগজ কলম নিয়ে বসবার ধৈর্য ছিল না।

ভগবান নারীজাতিকে নানারকমে অদ্ভুত করে সৃষ্টি করেছেন তা কোন পুরুষের কাছে আর প্রমাণ সাপেক্ষ আছে বলে মনে হয় না। মানুষের বেঁচে থাকাটাই যখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আপনার জানবার কৌতূহল হ'ল, সিনেমাজগতের মানুষগুলি দাঙ্গাবিপর্যস্ত সহরে কিভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে!

আপনি আর একটি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা নিয়ে সত্যই চিন্তা করবার কারণ আছে। আপনি লিখেছেন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আজ অবিশ্বাস ও সন্দেহের চাপা অভিযোগ ধ্বনিত হয়ে উঠছে, রাজনীতি ও সমাজনীতির শিরায় শিরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ-প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে—অবিশ্বাস, সন্দেহ, আতঙ্ক, কাপুরুষতা ও ভয়ের কাছে অন্তরের দাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মম প্রত্যাখান লাভ করছে। আমাদের সকলকে ঘিরে চলছে একটা জটিল চক্রান্ত। এমনি দিনে হাল্‌কা প্রেমের কাহিনী, ঘরোয়া অশান্তির কাহিনী অথবা জাতীয়তাবাদের ফাঁকা বুকনি দিয়ে দর্শকদের কাছে জমানো যাবে না। আপনি লিখেছেন, সাহিত্যে এই সমসাময়িক সমস্যা যেমন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সিনেমাতেও তেমনি তাকে দূরে সরিয়ে রাখবার উপায় নেই। বিপদের কথা এই যে, সিনেমার ব্যাপকতা ও প্রভাব সাহিত্যের চেয়ে সাধারণের মধ্যে অনেক বেশী।
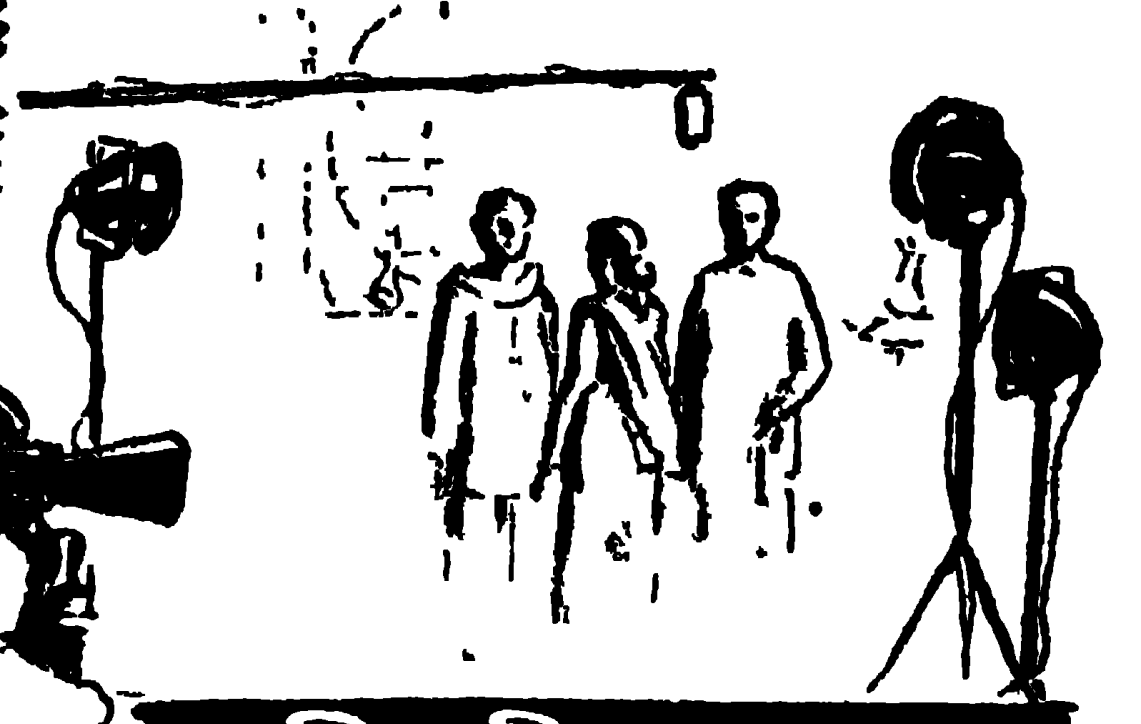
যদি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এখানে দিতে হয় তাহলে আমার এই রচনাটি রাজনৈতিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং 'রূপ মঞ্চের' অনেকগুলি পৃষ্ঠা অধিকার করবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং শুধু আপনার প্রথম প্রশ্নেরই উত্তর দেব। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত একটা জবাব না দিলে আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমাদের দেশের স্টুডিওর মানুষগুলির দেশাত্মবোধের অভাব আছে।

দু'শ বছরের বৃটিশ শাসন যে দেশের সংস্কৃতি বোধশক্তি ও বিশ্বশান্তির স্বপ্নকে বন্ধ করে দিতে পারেনি, সেখানে কয়েক হাজার লোকের প্রাণ হরণের গভীর কালিমা নবজাগত একটা বিরাট চেতনাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। যদি স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে আমরা দাঁড়াতাম, তাহলে এর চেয়ে অনেক বেশী নিরপরাধ জনসমষ্টিকে মৃত্যু বরণ করে নিতে হ'ত এবং সেক্ষেত্রে আমাদের শক্তি হ্রাস ও পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল বেশী। হয়তো, বোমা পড়ে ভারতবর্ষের কয়েকটা গ্রাম কয়েকটা সহরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। কিন্তু পরীক্ষা হ'ল আমাদের মানসিক দৃঢ়তা ও ধারবুদ্ধির পরীক্ষা। এই দাঙ্গা আমাদের জয়ের জিদকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের অন্তরের দুর্বলতাকে আমরা বিনাশ করতে শিখছি। বিরাট কিছু পরিবর্তনের জন্যে এমনি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির হয়তো প্রয়োজন ছিল। আর একথা বহুদিন হ'তেই তো শুনে আসছি যে, ধ্বংসের স্তূপের ওপর সৃষ্টি হয় নূতন স্বর্গ। অনেক মন্দের মধ্য দিয়ে আসে কল্যাণ।

বিষয়বস্তু থেকে বাইরে অনেক কথা হয়ে গেল এইবার আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক।

দাঙ্গার সময় কোন ষ্টুডিওই নিয়মিত ভাবে চলেনি। জনপ্রিয়-সাহিত্যিক পরিচালক শৈলজানন্দ তাঁর বাড়ীর নীচের তলাটি ফার্ষ্ট-এইড্ সেণ্টার করবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জনপ্রিয় নট জহর গাঙ্গুলী তাঁর কোন বন্ধুর জিপ্ গাড়ী করে রেস্কিউ-পার্টির সংগে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দাঙ্গাকারীরা সিনেমার সম্মান রাখতে ভোলেনি। সর্বসম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী আপ্যায়িত করেছিল। . . যার দৈন্য ও কদর্যতা সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করবার কারণ থাকলেও তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন বলে জানলাম। সন্ধ্যারাণী একটি মুসলমান পরিবারের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। শ্রীমতী মলিনার বাড়ী থেকে বন্দুকের কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। বিপদে পড়েছিলেন ছবি বিশ্বাস। তিনি থাকতেন পার্ক সার্কাসে দিলখুসা রোডে। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট আতঙ্কে কাটাবার পর ১৭ই আগষ্ট তাঁকে সপরিবারে কোন রকমে পালিয়ে আসতে হয়। কয়েকটি মুসলমান যুবক এই দু'দিন তাঁকে রক্ষা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে আসবার পর তাঁর আসবাবপত্রের ওপর দিয়ে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ঝড় বয়ে গেছে বলে জানা গেল। তাঁর পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীতে রেখে আসতে গিয়ে বাড়ীর প্রয়োজনে তাঁকে এক লরী শিক্ অর্ডার দিতে হয় কিন্তু আশপাশের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই এক লরী লোহার শিক্—একলরী শিখ্ আনা হচ্ছে বলে প্রচারিত হয়।

জীবেন বসু হাফ্-প্যাণ্ট ও ও বুশ-সার্ট পরে শাঁক হাতে কয়েক রাত ভবানীপুরের নিছক হিন্দুমহল্লার ধন-প্রাণ রক্ষায় জেগে কাটিয়েছিলেন। দাঙ্গার কয়েকদিন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর টালার বাড়ীর তেতালায় আঁশ-বঁটি মাথার কাছে রেখে ঘুমোতেন। একদিন 'জয়-হিন্দের' প্রবল চীৎকারে জেগে উঠে অন্ধকারে বঁটিটাকে আয়ত্বে আনতে গিয়ে নিজের আঙুলই কেটে ফেলেন।

শ্যামবাজারের শক্তি হ্রাস করে কমল মিত্র ভবানী-পুরে বাসা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও ভরাট কণ্ঠস্বরে অনেক গুণ্ডার প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার হয়। শুনলাম ভবানীপুরে তাঁর পল্লীতে তিনি কমাণ্ডার ইন্ চীফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে সুখের বিষয় তাঁকে আক্রমণ ও প্রতিরোধ কোন ব্যাপারেই জড়িত হ'তে হয়নি। অমর মল্লিকের বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। মির্জাপুর অঞ্চলে থাকেন কিনা! প্রথমে তিনি কিছুই ভাঙতে চান নি। পরে জানা গেল, তাঁর আতঙ্কগ্রস্ত কোন আত্মীয়কে সাম্‌লাতে গিয়ে তিনি আহত হয়েছেন।

শ্যাম লাহা ওরফে হুয়া প্রথম দাঙ্গায় বোম্বাই ও দ্বিতীয় দাঙ্গায় কলকাতায় কাটিয়েছেন। শুনলাম কর্মহীন দিনগুলি তিনি 'রাত্রি'র রচয়িতা পাঁচুগোপালকে পার্টনার করে বৌবাজার অঞ্চলের সকলকে ব্রিজ-খেলায় পরাজিত করেছেন।

শ্রীযুক্ত সতু সেনের নাম থিয়েটার ও সিনেমা জগতের নিকট সুপরিচিত। তারিখে বেলা তিনটার সময় তিনি মোটরে বেলগাছিয়ার দিক থেকে শ্যামবাজারে আসছিলেন। এমন সময় একদল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামী' তাঁর গাড়ীর পিছনের টায়ারের ওপর ছোরা চালায়। এই নিতান্ত নাটকীয় সিচুয়েশনে সতু সেন বুদ্ধি হারান নি। তিনি গাড়ীটি রাস্তার ধারে রেখে সংগ্রামীদের জনতায় যোগদান করেন। সতু সেনকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, তাঁকে যে কোন জাতির লোক বলে মনে করা যেতে পারে। ইটালীয়ন, নরওয়েজিয়ান, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, য়্যামেরিকান অথবা মোহামেডান বলে তাঁকে ধরা যেতে পারে—একটি চেহারার মধ্যে সর্বজাতির চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উন্মত্ত জনতা তখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল। সতু সেন পাকিস্থান কথাটি বাদ দিয়ে 'লড়কে লেঙ্গে' 'লড়কে লেঙ্গে' বলতে বলতে শ্যামবাজারে নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছিলেন। পরে একদিন গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীট ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে তিনি যখন বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন

তখন কোন অজ্ঞাত আততায়ীর লোহার রডের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হ'ন। মাথার পিছন দিকে তিনি আহত হ'ন ও তাঁর পাঁজরার গোটা দুই হাড় আঘাতের ফলে ভেঙ্গে গেছে বলে জানা গেল। উপস্থিত তিনি সুস্থ হয়েছেন।

দাঙ্গা কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের জীবন শোকাবহ করে তুলেছে। বেলেঘাটায় দুই সম্প্রদায়ের বিরোধকালে মিলিটারীর গুলীবর্ষণে কৃষ্ণধনের তেইশ বছরের পুত্র প্রাণ হারিয়েছে। ছেলেটি একপক্ষের জনতার পুরোভাগে ছিল। আমরা শোকাচ্ছন্ন পিতার মর্মবেদনায় সান্ত্বনা জানাচ্ছি।

'রাত্রি'র পরিচালক মানু সেন ও স্বনামখ্যাত প্রণব রায় মোটর বিকল হয়ে যাওয়ার দরুণ রাজাবাজারের মোড়ে আটকে গিয়েছিলেন। কারফিউ টাইমের বেশী দেরী ছিল না। কোনরকমে বিপজ্জনক এলাকা হ'তে সরে এসে তাঁরা একরাত্রি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন। এঁরা দুজনে অবশ্য এখনও গেরুয়া ধারণ করেন নি কিন্তু মতিগতি দেখে মনে হয় দুজনেরই বৈরাগ্যের আমেজ লেগেছে। মানু সেনের গল্‌ফ্‌ক্লাব রোডের বাসভবনে অনেক আশ্রয়হারা স্থান পেয়েছে—তাদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন 'রাত্রি' চিত্রের সুরশিল্পী কালীপদ সেন। মানু সেনের বিশেষ অনুরোধে তিনি রোজ রাত্রে রামপ্রসাদী গাইতে সুরু করেছেন। প্রণব রায় ধর্মবিষয়ক গানের গভীরতা নিয়ে অনেকের সংগে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেল।

ভ্যান্‌গার্ডের কর্ণধার পরিচালক নীরেন লাহিড়ী দাঙ্গার পর দার্জ্জিলিং গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন কিন্তু বাঙলা সিনেমাজগতের অনেকেরই তিনি উপদেষ্টারূপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। সেই দায়িত্বগুলি আর কারও মাথায় চাপাবার মত শক্ত মাথা খুঁজে পান নি বলে নানা নিদারুণ সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসছে—ভেবে দেখুন একবার, কলকাতা সহরে রাত্রি দশটায় মনে হচ্ছে যেন এখন অনেক রাত্রি। অকস্মাৎ একটা দমকল প্রচণ্ডভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে শূন্য পথ দিয়ে ঝড়ের মত চলে গেল। রাস্তার ধারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দমকলের আওয়াজ যেন পিছনে আতঙ্কের একটি সুর ছড়িয়ে রেখে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। বহুদূরে আকাশের এক কোণ আগুণের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। ভয়ে নির্বাক তারাগুলি যেন ভাল করে চোখ খুলে চাইতে পারছেনা—তাদের মধ্যে অনেকেই যেন বিপজ্জনক এলাকার মাথার ওপর থেকে পালিয়ে এসেছে আমাদের পাড়ার আকাশে। ক্রমশঃ একটা আর্তনাদের একটানা সুর দূর হ'তে ভেসে এসে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। ভীতকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' অসহায় ভীরু কণ্ঠের 'জয় হিন্দ' 'বন্দেমাতরম'।

জানি, এইবার সুরু হ'ল ভয়ার্ত মনের সারারাত্রিব্যাপী অকারণ কোলাহল। বলতে পারেন, এই পরিস্থিতির মধ্যে বসে সিনেমার ভাবনায় মনকে ডুবিয়ে দিই কি করে? তবু ফিরে এলাম—আপনার পত্রের উত্তর আজ লিখতেই হবে। লিখতে বসে মনে হ'ল, ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন থাকতে অধিকাংশ সংঘবদ্ধ আক্রমণ রাত্রে ঘটে কেন! দিনের আলো সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেয়, রাত্রির অন্ধকার আড়াল করে রাখে এই জন্যেই বোধ হয়। অকস্মাৎ 'রাত্রি' ছবিখানির কথা মনে এল, চিত্রবাণীর ছবি 'রাত্রি'। 'রাত্রি'-র নায়ক 'কালো কোর্তা'র রহস্যময় গতিবিধি রাত্রির অন্ধকারেই সুরু ও শেষ হয়। দিনের বেলা সে বিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনী-লেখক সূর্য রায়, নিজেরই কীর্তি কাহিনীর রচয়িতা। কালো পোষাক ও রাত্রির অন্ধকার ছাড়া তার দুঃসাহসিক কার্যাবলীর সহায়তা করবার জন্যে বিশেষ কোন সহকারী বা অস্ত্রশস্ত্র থাকেনা। কিন্তু এই 'কালো কোর্তাও' একদিন সংগীন্ অবস্থায় পড়েছিল।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ সখ থাকে, ধনীদের সখ অনেক সময়ে আবার অদ্ভুত রকমের হয়। 'রাত্রি' ছবিতে এমনি একটি অদ্ভুত চরিত্রের ধনীর সাক্ষাৎ আপনারা পাবেন যাঁর সখ ছিল বহুমূল্য হীরক ও পাথর সংগ্রহের। পান্নালাল নামে এক জহুরী তাঁকে

এইসব বহুমূল্য পাথর সংগ্রহ করে এনে দিত। 'কালো-কোর্তা'-র সংগে এই পান্নালালের ছিল অন্য সম্বন্ধ। 'কালো কোর্তা' যে সব দামী জড়োয়া অলঙ্কার চুরি করে আনত, পান্নালাল ছিল সেগুলির ক্রেতা। পান্নালালকে চোখ বেঁধে 'কালো-কোর্তার' ডেরায় আনা হ'ত। পান্নালালের কাছ হ'তে হীরক ও বহুমূল্য পাথরের অধিকারীদের সন্ধান পাওয়া কষ্টকর ছিল না।

এই পান্নালালের মারফৎ 'কালো কোর্তা' এই বহুমূল্য রত্নাদির সন্ধান পায়। 'কালো কোর্তা' সেই রত্ন অপহরণ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। খেয়ালী ধনীটি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, আমার ধনরত্ন থাকে 'ষ্ট্রং-রুমে' কড়া পাহারার মধ্যে। যদি এই 'ষ্ট্রং-রুম' থেকে 'কালো কোর্তা' আমার সখের রত্নগুলি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেগুলি সম্বন্ধে আমি কোন দাবী উত্থাপন করবনা এবং অপহরণকারীকে পরে কোন ভাবে বিব্রত করবনা। 'কালো-কোর্তা' ইলেকট্রিকের মেন্ কেটে দিয়ে অন্ধকারে তার কাজ সারবার মতলবে ছিল কিন্তু তার জানা ছিল না যে ধনীটির বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিকের দুটি মেন্ আছে। তব 'কালো কোর্তা' কি ভাবে সেই সংগৃহীত ঐশ্বর্য অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেকথা এখানে জানিয়ে কাহিনীর রহস্য উদ্ঘাটন করে দিতে চাই না।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেয়ালী ধনীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। এবং জহুরী পান্নালালের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তাকে দূর থেকে চেনা কষ্টকর। পান্নালাল রূপে দেখতে পাবেন শ্যাম লাহা ওরফে ভ্যাকে।

আপনার চিঠির মধ্যে ষ্টুডিওর সংবাদ জানবার যে প্রচ্ছন্ন অভিলাষ ছিল। আমি উত্তরের সেই পথটি এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। আপনি হয়তো অনুমান করেছেন দাঙ্গার দরুণ আমরা সবাই দম আটকে ঘরের মধ্যে বসে আছি। সেকথা যে সত্য নয় তার আরও প্রমাণ আপনাকে আমি দিতে পারি।

ইতিমধ্যে দিনকয়েক ষ্টুডিও-এ ক্যামেরাম্যানরা সকালে এসে উঠতে পারেন নি। 'রাত্রি' ছবির ক্যামেরাম্যান সুরেশ দা বাড়ী গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ী ঢাকায়। ঢাকার খবর তো প্রত্যহই সংবাদপত্রে পেয়েছেন। সুতরাং সুরেশদাশের অনুপস্থিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে 'রাত্রির' প্রযোজনা-তত্বাবধায়ক নীরেন লাহিড়ী নিজেই ক্যামেরার কাজ চালিয়ে দিলেন। 'রাত্রি'-র পরিচালক মানু সেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর অন্যতম যোগ্য শিষ্য। গুরু ধরলেন ক্যামেরার হাতল, শিষ্য পরিচালক। প্রত্যেকটি শট্ arrange করবার সময়ে গুরু-শিষ্যে চোখাচোখি হ'তে লাগল। তাঁরই ধারায় শিক্ষিত শিষ্যের কৃতিত্বে গুরুর মুখে বহুবার মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম।

কিন্তু এছাড়াও আমাদের সক্রিয়তার আরও বড় প্রমাণ হ'চ্ছে গত ১লা নভেম্বর চিত্রবাণী আর এক-খানি ছবির শুভ মহরৎ সম্পন্ন করেছেন। ছবিটির নাম 'মহাকাল'—ভিক্টর হিউগোর অমর কাহিনী 'হাঞ্চব্যাক্ অব্ নট্‌র্ ডাম্' অবলম্বনে 'কঙ্কণ' ও 'বন্ধন' চিত্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর বাঙলা চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। নীরেন লাহিড়ী এই ছবি-টিরও প্রযোজনা-তত্বাবধায়ক রূপে কাজ করবেন। পরি-চালনা করবেন ধীরেশ ঘোষ। সুরসংযোজনা করবেন গোপেন মল্লিক। 'হাঞ্চব্যাকের' চরিত্রে অভিনয় করবেন কমল মিত্র। অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেবী মুখার্জী, জীবেন বসু ও শ্রীমতী অমিতাকে দেখা যাবে।

নীরেন লাহিড়ীর নিজের প্রতিষ্ঠান ও নিজের পরি-চালনায় ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের 'জয়যাত্রা-'র যাত্রা অব্যাহত ভাবে চলেছে।

সেদিন ইন্দ্রপুরীর পাঁচ নম্বর ফ্লোরে অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ করে প্রথমে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন পাঁচটা বেজে গেছে, ফ্লোর ফাঁকাই ছিল। প্রবেশ করেই মনে হ'ল, এ কোথায় এসেছি! সম্মুখেই বিরাট সিংহদ্বার—সিংহদ্বারের সম্মুখের চত্বরে একটি কামান এবং ভিতরের প্রাঙ্গণেও আর একটি ছোট কামান। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে দুর্গের মত বিরাট এক প্রাসাদ। ঐতিহাসিক যুগের কোন স্বাধীন রাজার বাসভবনে

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছি বলে মনে হ'ল। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। ভ্যানগার্ডের ঘরে গিয়ে দেখলাম 'জয়যাত্রা'র কাহিনী-রচয়িতা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে দিয়ে কলম চালিয়ে চলেছেন এবং আপনার মনে অস্পষ্ট গুঞ্জনে সদ্যরচিত লাইনগুলি আউড়ে চলেছেন। তাঁর এক পাশে ক্লান্ত হলেও বিশেষ উদ্‌গ্রীব ভাবে বসে আছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। আর এক পাশে বসে আছেন হিন্দী সংলাপ রচয়িতা তুলিজী। এঁরা সকলে সবেমাত্র আজকের শ্যুটিং শেষ করে এসে বসেছেন বলে বোঝা যায়। ওধারের টেবিলে শ্যাম লাহা হিসেবের খাতা, ভাউচার, ট্যাক্সি-স্লিপ, কল্‌-কার্ড, অনেকগুলি পাইক-বরকন্দাজ বেশে সজ্জিত হোমরা-চোমরা চেহারা ও extraদের ছোটো খাটো একটি ভীড় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মামা অর্থাৎ সন্তোষ গাঙ্গুলী তথাকে সাহায্য করছেন। প্রায় সকলকেই বলা হ'চ্ছে, কাল আরও সকাল সকাল আসবেন।

পরদিন আমিও সকাল সকাল ষ্টুডিও-এ এসে পৌঁছেছিলাম। 'জয়যাত্রা'র বিরাট সেট্‌টি দেখবার পর হতেই চরিত্রগুলিকেও দেখবার প্রচণ্ড বাসনা জেগেছিল।

সিংহদ্বারের মুখে বন্দুকধারী পাইক বরকন্দাজের সারি যেন কার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় জহর গাঙ্গুলী সেখানে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, হুজুর কোথা, আমাদের হুজুর। ওঃ এই যে হুজুর!

হুজুরটি তখন একধারে হান্টার হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত চেহারায় ও সাজ-পোষাকে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যা দেখলে চমকে উঠতে হয়। অত্যন্ত উদ্ধত গর্বিত দাঁড়াবার ভংগী। এলো মেলো বিপর্যস্ত কেশে দুর্বিনীতের পরিচয়। কপালের রেখায় কুটিলতা, দৃষ্টি হিংস্র, মুখের গঠনে কাঠিন্যের নির্মম ছায়া। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী শাসকের রূপ ধরে ইনি যেন পৃথিবীতে বিরাজ করে আসছেন। জারের মত বা দেশীয় কোন স্বাধীন নৃশংস নৃপতির মত এই হুজুরটির হৃদয়ে দয়া মায়া নেই, আত্মসর্বস্ব স্বয়ং-স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি রাজাবাহাদুর বলে এ অঞ্চলে পরিচিত। বিরাট প্রাসাদ ও সম্পত্তির মালিক এই রাজাবাহাদুরটির সাজ-পোষাকও অসাধারণ। মধ্যযুগের লর্ডেরা যে রকম পোষাকে অশ্বারোহণে যেতেন, অনেকটা সেই ধরণের সাজসজ্জা। নিজের শক্তি সম্বন্ধে ইনি এতখানি আত্ম-বিশ্বাসী যে, তার কোন ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। তাঁর মাথার ওপরে যে আর কেউ থাকতে পারে একথা স্বীকার করেন না। ভগবান বা পুলিশ কারও সাহায্যের তিনি প্রত্যাশী ন'ন। এই রাজাবাহাদুরের ভূমিকাটি অভিনয় করেছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

জহর গাঙ্গুলী যে চরিত্রটি অভিনয় করেছেন সে চরিত্রটিকে গ্রামের হিতকামী ও বিদ্রোহী জনগণের মধ্যে [illegible] এ[illegible]টি [illegible] মানুষ রূপেই পরিচয় পেয়েছিলাম কিন্তু তার কথাবার্তার ধরণ শুনে তাকে প্রথমে বোঝা যায় না।

যেমন, সে রাজাবাহাদুরের কাছে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, এ আর কি করবেন হুজুর! আপনার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম আ[illegible]ন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া। হতভাগারা থাকে সামান্য [illegible] ঘরে—একটি দেশলাই-য়ের কাঠি—হুজুর এক[illegible] দেশলাইয়ের কাঠি। আপনি যদি সহায় থাকেন হুজুর তাহলে আমিই সব পারি।

কথাগু[illegible] শুনলেই মনে হবে লোকটা খোসামুদে এবং সুবিধাবাদী। কিন্তু যখন সে কথা বলে তখন তার চোখের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা জানিয়ে দেয় যে, সে যা বলছে, সে চায় তার বিপরীত। উল্টো করে, বাঁকাভাবে কথা বলা তার স্বভাব। তার সমগ্র প্রাণ-শক্তি দিয়ে সে মৃতপ্রায় মানুষগুলির মনে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে। আঘাত করে মানুষের মধ্যে জাগাতে চায় আত্মচেতনা ও অধিকারবোধ।

ভ্যানগার্ড পতাকাসঙ্ঘের প্রথম নিবেদন 'জয়যাত্রা'র কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্রে এমন একটি বিশেষত্ব ফুটে উঠতে দেখবেন যা, আপনাদের শুধু চমকিত করে তুল-

বেনা, আপনাদের হৃদয়ানুভূতির স্রোত উদ্বেল করে তুলবে। 'জয়যাত্রা' একটি দু'টি মানুষের ঘরোয়া কাহিনী নয়, একটি গ্রামের জীবনের কাহিনী নয়, একটি সহরের পাড়ার কাহিনী নয়। 'জয়যাত্রা' একটি জাতির আদর্শবাদের কাহিনী—পুঞ্জীভূত অত্যাচারের প্রতিবাদ এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আসছে জনগণের যে কল্যাণ, স্বাধীনতা ও মুক্তি তারই সংগ্রামের কাহিনী 'জয়যাত্রা'। দেশ ও জাতির স্বাধীনতা স্বপ্ন নির্ভীক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছে—'জয়যাত্রা' য তারই দৃপ্ত পদধ্বনি শুনতে পাবেন।

পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী এই গোলযোগের বাজারেও 'শৃঙ্খল' ছবি শেষ করে আর একখানি বাঙলা ছবির কাজ সুরু করে দিয়েছেন। ডি, জি, পিকচার্সের দ্বিতীয় এই ছবিটি নাম 'শেষ-নিবেদন'। বাংলার অপরাজেয় দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'আলো-ছায়া' কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত এর চিত্ররূপ রচনা করেছেন।

স্বামী ও সংসারের প্রতি নিষ্ঠা এবং দেবতার প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস নারীজীবনের মাঝখানে দুইটি বিরুদ্ধগামী স্রোতরূপে দেখা দিয়েছিল—শরৎচন্দ্রের মায়াবী লেখনীর যাদুস্পর্শে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির আলোড়ন কাহিনীটিকে চিত্তস্পর্শী করে তুলেছে। 'শেষ-নিবেদন' চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন শ্রীমতী মলিনা, শ্রীমতী সরযূবালা ও ছবি বিশ্বাস।

আপনিই বোধ করি ইতিপূর্বে জানতে চেয়েছিলেন, শৈলজানন্দের 'রায়-চৌধুরী' ছবি শেষ হ'তে এত দেরী হ'চ্ছে কেন? যাঁরা শৈলজানন্দের 'রায়-চৌধুরী' গল্পটি পড়েছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন এই রকম একটি চরিত্র ও ঘটনাবহুল কাহিনীর চিত্ররূপ গঠন করা অল্পদিনের ব্যাপার নয়। বংশপরম্পরায় রায় চৌধুরী-দের বিরোধ সমানভাবে চলে আসছে। রায় ও চৌধুরী দুই তরফই সাধারণ গৃহস্থ নয়, তাঁরা প্রতাপশালী জমিদার। সুতরাং তাঁরা যা কিছু করেন তার মধ্যে

আড়ম্বরের অভাব [illegible] দুই পক্ষের দু'টি দল আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে যারা এই বিরোধের মধ্যে মাথা গলিয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিতে চায়। তার ওপর আছেন অশ্বিনী রায়। দুর্দান্ত লোক। তিনি বিরোধটাকে এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলছেন যে, সহজে মেটবার নয়। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রায়েদের মেয়ে ও চৌধুরীদের ছেলের প্রণয়-ব্যাপারটাও বিশেষ জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাদের পরিণয়-সংঘটন হওয়া-টাও নিতান্তই বিস্ময়ের ঘটনা। তাব ফলে, ঘবেব মধ্যে অশান্তি এসে প্রবেশ করেছে এবং বিজয় চৌধুরীকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে।

বিজয় চৌধুরী কলকাতায় সুলভ বোর্ডিং ও পাইস্ হোটেলে আসার সংগে সংগে হোটেলের বাসিন্দাদের জীবন-কাহিনীর রূপ-পরিবর্তন-জাত হয়েছিল। শুধু এই হোটেলটিকে নিয়েই সম্পূর্ণ একটি চিত্রকাহিনী দর্শকসাধারণের কাছে উপস্থিত করলে তাঁরা পরিতৃপ্ত হতেন বলে আমার বিশ্বাস। হোটেলে থাকেন পটু-পটিবাবু, তাঁর ভাইঝি কুমারী তরুণী শতদল, বংশলোচন বাবু। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশু বোস। শতদল ছাড়া প্রত্যেকজনই এমন এক একটি অদ্ভুত টাইপ যে, তাদের সংগে একবার পবিচয় ঘটলে তাঁদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। আর শতদল যদি বিজয় চৌধুরীর জীবনে না আসত তাহলে বিজয়ের চবিত্র অপরিস্ফুট থেকে যেত বলে আমার মনে হয়। শৈলজানন্দ তাঁর চরিত্র সৃষ্টির মাধুর্যে ও স্বাভাবিকতায় লোককে যেমন সহজে হাসাতে পারেন, তেমনি সহজে

কাঁদাতেও পারেন। তাঁর মত দরদী কথাশিল্পী বেশী জন্মগ্রহণ করেননা। তবু 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', 'ভঙ্গুর' প্রভৃতি গল্পে মানুষকে কাঁদাতে গিয়ে এতখানি নিষ্ঠুর হয়েছেন, যা' অসাধারণ শিল্প-মন না হলে তা' সম্ভব হত না।

'রায় চৌধুরী' কাহিনীর শতদল চরিত্র রচনায় তিনি তেমনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন। শতদলকে শুধু 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র দলে ফেলতে পারলে হয়তো খুশীই হতাম। হাস্যমুখী একটি মেয়ের হৃদয় নিয়ে খেলা করায় কাহিনীকারের উদ্দেশ্য হয়তো সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু যে হতভাগিনীর মুখের হাসি তিনি কেড়ে নিলেন, ব্যর্থ-প্রণয়ের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন কুমারী মনের আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্ন, তাকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিতে কে থাকল, কি থাকল? শুধু দর্শকদের ক্ষণিক অশ্রুসিক্ত নয়নপল্লব আর কাহিনী রচয়িতার একটি গোপন দীর্ঘনিশ্বাসই কি তার সারাজীবনের পক্ষে যথেষ্ট!

শতদল শৈলজানন্দের সৃষ্টি—তাঁর মনের মুকুরে শতদলের যে ছায়া পড়েছিল, তাকে দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাকে দেখেছি শ্রীমতী পূর্ণিমার হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ের রূপান্তরে। যেটুকু দেখেছি তারই জন্য আমার লেখনী দিয়ে এই উচ্ছ্বাস স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

শৈলজানন্দের 'রায়-চৌধুরী' নামাঙ্কিত পরিবারের জীবনের বিরাট একটি কাহিনী যা সংক্ষেপে ও সহজে সিনেমা ছবিতে রূপ দেওয়া যায় না এবং সেইজন্যেই ছবিটি তুলতে এত দেরী হচ্ছে।

দাঙ্গার পরে একদিন কালী ফিল্মস ষ্টুডিও-এ গিয়েছিলাম। 'স্বপ্ন ও সাধনার' চারজন পরিচালককেই ব্যস্ত থাকতে দেখলাম। জহর গাঙ্গুলী এই চিত্রে সন্ধ্যারাণীর পিতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ভীষণ রকমের ব্লাড্ প্রেসারের রুগী। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার বিধি-নিষেধের কড়া ফিরিস্তি দিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ কে শোনে। নিজের অফিসের প্রাইভেট চেম্বারে তিনি জল কচুরী (ফুল্‌কা), হিংয়ের কচুরী, ঝাল আলুরদম, সন্দেশ প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য লুকিয়ে খেয়ে থাকেন। সব কয়েকটিই খাবার ব্লাড্ প্রেসারের রুগীর পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু একদিন তিনি মেয়ে ও তাঁর এক এটর্ণী বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ার সময় জহর গাঙ্গুলীর মুখের অবস্থাটা ঘুমের মধ্যেও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও ঘুমের মধ্যেও আমি না হেসে থাকতে পারি না।

এখানকার আর নতুন খবরের মধ্যে একটি খবর হচ্ছে আগামী মাসের প্রথমভাগে সিনে প্রোডিউসার্সের 'মাতৃহারা' রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। 'রিক্তা'র পর সন্তানস্নেহব্যাকুলা নারী হৃদয়ের এমন একটি মর্মস্পর্শী ছবি আমরা বাঙলা ছায়াচিত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

পুরুষ তার স্বার্থ ও সম্ভোগের জন্য কলঙ্ক, অপমান, দুঃখ ও নির্যাতন দিয়ে নারীজীবন অভিশপ্ত করে তোলে। মানুষের ভাল-মন্দের আলো-ছায়ায় 'মাতৃহারা' কাহিনীর চরিত্রগুলি বৈচিত্র্য লাভ করেছে। হৃদয়ের কথা যখন সহৃদয়তার সংগে বলা যায় তখন তার আবেদন অস্বীকার করা যায় না। 'মাতৃহারা' ছবির এই বিশেষ গুণটি আছে বলে মনে হয় চিত্রখানি এই অশান্তির দিনেও জনসমাদর লাভ করবে।

আমার পত্র আজ এইখানেই শেষ করলাম। আশা করি আপনাকে খুশী করতে পেরেছি।

চৈত্র ঃ ঃ ৭ম বর্ষ ঃ ঃ ১ম সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা

আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন!

রূপ-মঞ্চ সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করলো। একটি পত্রিকার পক্ষে ছয়টী বৎসর উতরিয়ে আসা এমন কিছুই নয় যে, ঢাক ঢোলে পিটিয়ে জাহির করতে হবে। সে কথা আমরা জানি। তবু এই শৈশবের ছেলে মানুষী নিয়ে দু'চার কথা বলতে চাই—এতে সুধীজন আশা করি ব্যাঙের হাসি হাসবেন না। আমরা যে কয়েকটি কথা বলবো—তা আমাদের কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতাকে নিয়ে। যা আমরা করবো বলে বলেছিলাম অথচ করতে পারিনি, সেই পারা এবং না-পারার কথা। এতে নিজেদের জাহির করবার মনোবৃত্তি আদৌ নেই। নিজেদের নিয়ে যে কথাগুলি বলতে চাইছি, তা বলবার পূর্বে—আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—যাঁদের অকৃপণ সাহায্য এবং সহানুভূতি পেয়ে এই কয়টি বছর হামাগুড়ী দিয়ে দিয়ে আমরা হাটতে শিখেছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় পৃষ্ঠপোষকবর্গ—লেখক গোষ্ঠী—গ্রাহক ও অনুগ্রাহক—বিজ্ঞাপনদাতা—বাংলার চিত্র ও নাট্য-জগতের সকল শিল্পী ও কর্মীদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ তাঁদেরও জানচ্ছি—যাঁদের সহযোগীতা ও সহানুভূতি আমরা লাভ করতে পারিনি—আমাদের আন্তরিক আবেদন যাঁদের কাছ থেকে বার বার আঘাত খেয়ে ফিরে এসেছে।

রূপ-মঞ্চের আবির্ভাব—

রূপ-মঞ্চের আবির্ভাবের মূলে নিছক ব্যবসায়ী দৃষ্টিভংগী বা ছেলেমনুষীই নেই। চিত্র ও নাট্য জগতের প্রয়োজনের তাগিদেই রূপ মঞ্চের আবির্ভাব। বাংলার অনাদৃত চিত্র ও নাট্য-শিল্পের কথা নিয়ে একখানি নির্ভীক সহানুভূতিশীল জাতীয়তাবাদী পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা রূপ-মঞ্চের কর্মীদের মত চিত্র ও নাট্য জগতের বহু শুভানুধ্যায়ী সুধীজনেরাই অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়েই রূপ-মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করে। রাজনীতি ও সাহিত্য সংক্রান্ত বাংলা ভাষায় যে সব পত্র-পত্রিকা রয়েছে, মঞ্চ ও পর্দা সম্বলিত পত্র-পত্রিকার চেয়ে তাদের সংখ্যাও যেমনি বেশী, তাদের মানও অনেক উঁচু। চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত পত্রিকা যে না আছে তা নয়—কিন্তু এ কথা শুধু আমরাই নই—সকলেই স্বীকার করবেন, সেগুলিও নিছক চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের কথা নিয়ে গড়ে ওঠেনি বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাঁরা যতখানি তৎপরতার পরিচয় দেন—চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে তাঁদের ততখানি উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় না।

রূপ-মঞ্চের জন্ম আন্তর্জাতিক ঝড় মাথায় করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণহুংকারের মাঝে কেবল মাত্র হামাগুড়ী দিয়ে

সে অগ্রসর হতে শিখেছে। বোমা আতংকিত জনশূন্য সহরের স্টলে—অন্যান্য পত্রিকার ভিড়ের মাঝে সঙ্কুচিত হ'য়ে সে চাতকের দৃষ্টি নিয়ে আগ্রহশীল পাঠকের অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছে। বিয়াল্লিশের গণবিক্ষোভে শাসকের হিংস্র দাম্ভিক রোষাগ্নির মাঝেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে সে পিছু হটেনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে লোলুপ মানুষের সর্বগ্রাসী জঠরে ক্ষুধিতের মর্ম পীড়ায় সে শুধু বিচলিতই হ'য়ে ওঠেনি—তাদের ব্যথার ভার কমাতে নিজের শক্তি ও সামর্থ নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার আর মুনাফাখোর কালো-বাজারীদের শোষণের দংশনে রূপ-মঞ্চ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়েও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য অন্যান্য পত্র-পত্রিকার পাশে দাঁড়িয়ে কম লড়াই করেনি—হা অন্ন হা-অন্ন, বুভুক্ষিতের আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস হাহুতাশ করে উঠেছে—নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য পত্র-পত্রিকার 'হা কাগজ—হা কাগজ' করে কাগজের জন্য ব্যাকুলতার কথা আশা করি আজও কেউ ভুলে যাননি। অন্ততঃ পুরোন ফাইল ঘাটলেই সে ছবি স্বচ্ছ হ'য়ে ধরা দেবে। কিন্তু তবু, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে যেয়ে কোনদিন স্তব্ধ হ'য়ে যায়নি।

চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের মারফৎ চল্লিশ কোটী ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার মন্ত্রেই রূপ-মঞ্চ দীক্ষিত। রূপ মঞ্চ তার ছেলে-মানুষীর মাঝেও কোনদিন তার সে মহতী দীক্ষার মর্যাদা হানি করেনি। যুদ্ধ থেমে গেলো। বিয়াল্লিশের গণ-বিক্ষোভের মুক্ত সেনানীরা আমাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। 'ভারত ত্যাগকর' প্রস্তাবের স্রষ্টারা—আমাদের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃবৃন্দ - আশা ও আকাঙ্খার মর্ত প্রতীকরূপে পুরোভাগে এসে অভিবাদন জানালেন—ভবিষ্যৎ জয়ের আভাষে তাঁরা দীপ্তিভাত। শুধু তাই নয়। আমাদের মাঝে পেলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়ক ও সৈনিকদের। এশিয়ার পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে ভারতের মুক্তির জন্য তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রামের বীরত্ব কাহিনী একদিকে যেমনি আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে তুললো—তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চারে আমাদের উদ্দীপিত করে তুললো। তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব, নিষ্ঠা ও ত্যাগ নূতন আদর্শ স্থাপন করে আমাদের মুগ্ধ করলো। এই আশা আকাঙ্খার মাঝে আমাদের চোখের পাতা প্রথমে তাঁদেরই জন্য সজল হ'য়ে উঠলো—বিয়াল্লিশের গণ-আন্দোলনে আমাদের যে মুক্তিকামী ভাই বোনেরা বৈদেশিক সরকারের ব্যায়নেটের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে—কারা প্রাচীরের অন্তরালে দেশের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর থেকে যাঁদের জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছে—ফাঁসির মঞ্চকে তুচ্ছ করে যাঁরা গলা এগিয়ে দিয়েছে—দেশের বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনের সকল শহিদের কথা স্মরণ করেই আমাদের চোখ সজল হ'য়ে এলো—গর্বে বুক ফুলে উঠলো। আমরা তাঁদের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে বল্লাম, তোমাদের অসমাপ্ত কাজের ভার নিলাম আমরা। তোমাদের অতৃপ্ত আত্মার মুক্তির জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারকেই আমরা বড় করে মনে করবো না। দুর্ভিক্ষে, অনাহারে ও শোষণের করাল গ্রাস থেকে আমরা যাঁদের বাঁচাতে পারিনি—তাঁদের বিয়োগ-ব্যথায় আমাদের মন ভরপুর রইলো। সমস্ত অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে দেশ এবং জাতির মুক্তির জন্য—আমাদের নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে রইলাম। আমাদের দৃঢ়তা ও সংঘবদ্ধ শক্তির দিকে তাকিয়ে বৈদেশিক সরকারের টনক নড়ে উঠলো। তারা বুঝলো—আর এই বর্বর দেশকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তারা বুঝলো—শক্তি এবং সাহসে—ত্যাগ এবং বুদ্ধিতে তাদের সমস্ত চাতুরীর জাল কাটিয়ে আজ আমরা জাগ্রত হ'য়ে উঠেছি—তাই এই বিরাট দেশের বিপুল জনসংখ্যার মিতালী কামনায় তারা আগ্রহ প্রকাশ করলো। আমরা মুক্তির দিন গুনছি—প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস গুণে গুণে ত্যাগ করছি—আর—ক'টা—তারপর—তারপর মুক্ত দেশে মুক্ত মানুষের দাবীতে আমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবো। মুক্তির আনন্দে আমাদের শিরা উপশিরা স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো—মুক্তির স্বপ্নে আমরা বিভোর হ'য়ে রইলাম। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য—আমাদের স্বপ্ন গেল টুটে—স্পন্দন এলো থেমে। দীর্ঘদিনের পরবশতা আমাদের কী

যে শোচনীয় অবস্থায় করে তুলেছে—এবার তা যেন আরো বেশী করে হৃদয়ংগম করলাম। সাম্প্রদায়িকতার উগ্রবিষ আমাদের মাঝে দেখা দিয়ে সমস্ত আবহাওয়া বিষিয়ে তুললো। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ধূম্রজালে আমরা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লাম। আমাদের এই হীনতা হত্যার তাণ্ডব লীলায় রূপান্তরীত হ'লো। কত ভ্রাতা ও ভগ্নী, মাতা ও পিতার তপ্তরক্তে আমাদের হস্ত কলঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। কলকাতা—নোয়াখালী—বিহার—পাঞ্জাব—পেশোয়ার এবং দিল্লীই শুধু নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষাগ্নি জ্বলে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে এই অগ্নি নির্বাপিত করতে হবে। যে বিশ্বাস ও সুস্থতা আমরা হারিয়েছি—তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। নইলে আমাদের সকল আয়োজন—সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

যে ছয়টী বছর আমরা অতিক্রম করে এসেছি—দেশের বুকে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগ যেন এক সংগে ভেংগে পড়েছে। এজন্য কারোর কাছে আমরা নালিশ জানাতে যাইনি—যাবোওনা। দেশের চল্লিশ কোটী অধিবাসীর হাসি কান্নার সংগে আমরা জড়িত। দেশের বুকে যে বাঁধা বিপত্তিই দেখা দিক না কেন—দেশবাসীর সংগে সমান ভাবে তাকে বুক পেতে নেবার মত সবলতা কোনদিন আমাদের মাঝ থেকে অভাব হয়নি, হবেও না। দেশের সম্পদের দিনে যেমনি আমরা তার বুকের মধু আহরণ করবো—তার দুর্যোগের দিনে তেমনি প্রবল ঝ্যাত্যার সামনে প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে দাঁড়াবো। দেশের আর সকলের মতই অতীতের বাধা বিপত্তি আমরা ডিঙ্গিয়ে এসেছি—বর্তমানের কুহেলী আবরণ ভেদ করে ছুটে চলবার দৃঢ়তার অভাব কোন দিনই আমাদের হবেনা। অতিক্রান্ত পথে সুচতুর যাত্রীর দক্ষতার পরিচয় আমরা দিতে পারিনি—যে চঞ্চল ছন্দে আমাদের গতি ছন্দিত হ'য়ে ওঠা উচিত ছিল—সে ক্ষিপ্রতার পরিচয় আমরা দিতে পারিনি—কিন্তু আমাদের সেই ব্যর্থতা বা অক্ষমতায় বিদ্রুপের হাসি হাসবার পূর্বে—দেশের রাজ-নৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং সমাজনৈতিক দুর্যোগের কথা মনে রাখতে বলি।

আমরা যা পারিনি—

রূপ মঞ্চের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী যে অভিযোগ স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠেছে—তা হ'চ্ছে রূপ-মঞ্চের অনিয়মানুবর্তিতা। প্রতি বাংলা মাসের শেষের তারিখে রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার কথা অথচ কোন দিনই আমরা এই দিনটীতে রূপ-মঞ্চ প্রকাশ করতে পারিনি। এই অনিয়মানুবর্তিতার মূলে রূপ-মঞ্চ কর্মীদের গাফিলতি বিন্দুমাত্রও নেই। চাহিদা এবং প্রয়োজন মত কাগজ সংগ্রহে নানান বাধা বিপত্তি দেখা দিয়েছে যেমনি—তেমনি মুদ্রণ সমস্যাও আমাদের কম বিচলিত করে তোলেনি। তবু প্রেস কর্তৃপক্ষ যে স্নেহ এবং অনুকম্পনার পরিচয় দিয়ে থাকেন রূপ-মঞ্চের প্রতি—তার অভাব ঘটলে রূপ-মঞ্চ প্রকাশে আরো হয়ত নানান বাধা বিপত্তি দেখা যেত। ছাপার পর বাঁধাই সমস্যা। হাঙ্গামার জন্য যেমনি জমাদার এবং অন্যান্য কর্মীরা আসতে পারেন না—বাঁধাইর বেলায় বুড়ো দপ্তরী বা কোন ভরসায় ফর্মা নিতে আসবে। তবু আমরা নিজেরাই ফর্মা পৌছে দিয়ে এসেছি এবং এই ফর্মা পৌছোতে দিতে যেয়ে স্বয়ং রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে গুণ্ডার ছুরিকার সম্মুখীনও হ'তে হয়। সাহস এবং তৎপরতার জন্যই রক্ষা পেয়ে যাই—তবু আমাদের কর্মীবৃন্দের কর্মতৎপরতা কোন সময়ের জন্য শিথিল হ'য়ে আসেনি। আমরা যা পারিনি—আমাদের শৈথিল্যের জন্য নয়, আমাদের সাধ্যাতীত বলেই পারিনি। অনেকে অন্যান্য পত্র পত্রিকার নজির দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের চেয়ে তাঁদের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং সংগতির কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

রূপ-মঞ্চের মান কেন আরো উন্নত হয় না?

অনেক সময় অনেক পাঠক বম্বে প্রভৃতি স্থানের পত্র পত্রিকার সংগে রূপ-মঞ্চ এবং এখানকার চিত্র ও মঞ্চ-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলির তুলনামূলক বিচারে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন, আমাদের মান কেন ওদের মত উন্নত হয় না? মান বলতে যদি আংগিক শোভার কথা কেউ মনে করেন—এ বিষয়ে আমি তাঁদের সংগে একমত. কিন্তু মান বলতে যদি আত্মিক অর্থাৎ রচনা সম্ভারের কথা কেউ বলতে চান, তার শ্রেষ্ঠত্ব

স্বীকার করে নিতে আমি নারাজ। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আমার বলবার কোন অধিকার নেই, তাই তাঁদের কথা থাক। রূপ-মঞ্চে চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে সে সব রচনা প্রকাশিত হয়—ভারতের বিভিন্ন স্থানের চিত্র ও নাট্য মঞ্চ সম্বলিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সংগে—নিরপেক্ষ সুধী বিচারকের তুলনামূলক রায়ে রূপ-মঞ্চের সুনিশ্চিত জয়ের দৃঢ়তার কথা আমি বলতে পারি। এবং আমার এই দৃঢ়তাকে আত্ম-প্রচারের হীন মনোবৃত্তি মনে না করে—যে কোন পাঠক যারা ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহাচ্ছন্ন নন—দুইকে নিয়ে বিচার করতে বসলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন! ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকা গুলি এবং বহু বৈদেশিক পত্র পত্রিকা সব সময় সামনে রেখেই আমরা রূপ-মঞ্চের রূপ বিন্যাস করে থাকি। সেগুলির কাছে আমাদের দীনতাকে শুধরে নিতে সব সময় সচেষ্ট থাকি। আমাদের আংশিক মানের দীনতা মুক্ত কণ্ঠে আমরা স্বীকার করবো।

রূপ-মঞ্চ বা বাংলার অন্যান্য চিত্র ও নাট্যমঞ্চ সম্বলিত পত্র পত্রিকার আংগিক মান কেন উন্নত হয় না—তার মূল কারণ ঘাটতে যেয়ে যদি বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে দোষ দি—আশা করি তাঁরা আমার অপ্রীতিকর সত্য কথায় কষ্ট হবেন না। বাংলার পত্র-পত্রিকার মান উন্নত না হবার মূলে আমাদের শিল্পপতিদের অসহযোগ মনোবৃত্তিই সবচেয়ে বেশী দায়ী। যতক্ষণ তাঁদের এই অসহযোগ মনোবৃত্তি দূর না হবে—বাংলার চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত পত্র পত্রিকার আংগিক মান কোন মতেই উন্নত হবে না। আমাদের ইতিপূর্বে অনেকেই অনেক পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের গতি বহুদিন পূর্বে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে—যাঁরা আছেন, তাঁদের পূর্বেকার সে জৌলুষ আর নেই। প্রথম প্রথম এঁদের কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগতো—কিন্তু আজ কয়েক বছর রূপ মঞ্চের পরিচালনার সংগে জড়িত থেকে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি, এ বিষয়ে আমাদের পূর্বগামী বন্ধুরা সম্পূর্ণ নিরুপায় ছিলেন! যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এই শ্রেণীর পত্র পত্রিকাগুলিকে চলতে হয়, তার আমূল পরিবর্তন না হ'লে কোন পত্র পত্রিকাই সুষ্ঠু রূপলাভ করতে পারবে না। এমন কী আজ রূপ মঞ্চেরও যে চাকচিক্য আছে তাও যদি একদিন বিলীন হ'য়ে যায়—তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

প্রথম কথা, অবাঙ্গালী পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতা বাঙ্গালী পাঠকদের চেয়ে বেশী। যে কাগজ অবাঙ্গালী অথবা ইংরেজী ভাষা ভাষী পাঠকরা দু'টাকা দিয়ে কিনতে পারেন—বাংলা কাগজের পাঠকরা সেস্থানে একটাকার বেশী ব্যয় করতে পারেন না! প্রতিমাসে এই একটাকা ব্যয় করে বিশেষ শ্রেণীর কাগজ কিনবার ক্ষমতা বহু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পাঠকেরই নেই। ইচ্ছা থাকলেও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করে তাঁদের আর্থিক সংগতি সমর্থন করে না। তাই, কাগজ প্রকাশের সময় তার মূল্য নির্ধারণ পাঠকদের আর্থিক সংগতির ওপর নির্ভর করে করতে হয়। অথচ কাগজ প্রকাশের মালমসলার খরচ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় মোটেই কম নয়—অনেক ক্ষেত্রে বেশীও। তবে কাগজের মূল্য কম রেখেও মান উন্নত করা যেতে পারে যদি কাগজ গুলিতে স্বাভাবিক অনুপাতেও বিজ্ঞাপন থাকে। কিন্তু যে পরিমাণের বিজ্ঞাপন থাকলে কাগজের মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে—শুধু রূপ-মঞ্চ কেন, বাংলার কোন পত্র পত্রিকায় (অবশ্য চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কিত) সে পরিমাণ ত দূরের কথা, তার অর্ধেকও বিজ্ঞাপন থাকে না। থাকেনা কারণ, অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে তাদের মানের গোড়ায় আঘাত পড়ে বলে মনে করেন। তাই ঐই শ্রেণীর পত্র-পত্রিকাগুলিকে মুখ্যতঃ চিত্র ও নাট্য-জগতের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়। বাংলা দেশের পাঁচটি রঙ্গ-মঞ্চের কোনটাই সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন না—দু' একটা পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে তাঁদের যে বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়—তা কাগজের মান এবং প্রচার সংখ্যা বিচার করে দেন না—অন্তর্নিহিত স্বার্থের খাতিরেই

দিয়ে থাকেন। অথচ এঁদের অভিমান আছে সাড়ে ষোল আনা। যদি কোন সময় তাঁদের সংবাদ বা সমালোচনা প্রকাশিত না হয়—গর্জে ওঠেন। এবং নিজেদের সপক্ষে তাঁরা বলেন, বিজ্ঞাপন দেবার মত তাঁদের সামর্থ নেই। বাকী রইল চিত্র জগত। এই চিত্র জগতের ওপরই সম্পূর্ণরূপে আমাদের নির্ভর করতে হয়। কাগজের স্বাভাবিক বিজ্ঞাপন বলতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বোঝায়। এই এক তৃতীয়াংশ বিজ্ঞাপন চিত্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়েও কোন পত্রিকায় থাকেনা। রূপ-মঞ্চের কথা রূপ-মঞ্চ পাঠক সাধারণকে নতুন করে আর কী বলবো। এখন কথা হচ্ছে এই বিজ্ঞাপন বেশী সংগৃহীত হয় না কেন? শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধব অনেকেই মনে করতে পারেন, নিশ্চয়ই রূপ-মঞ্চ কর্মীদের গাফিলতিই এজন্য দায়ী। তাঁরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহে অপটু অথবা ততটা যত্নশীল নন। একথা ঠিকই, আমাদের মর্যাদায় আঘাত পড়তে পারে—এমন বিজ্ঞাপন কোন দিনই আমরা সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিনি বা করবোনা—কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারে হানা দিতে কোন সময়ই অলসতার পরিচয় দেন না। বিজ্ঞাপন না-হবার মূলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মনোবৃত্তিই যে দায়ী একথা পূর্বেও বলেছি—এখনও বলছি। তাঁরা চিত্র প্রযোজনায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন—কিন্তু চিত্রের প্রচার কার্যের জন্য সব সময়ই হাত গুটিয়ে থাকবেন। বিনে পয়সায় বাজীমাৎ করে দেবার ফাঁক খোঁজেন সর্বদা। আমার এই অভিযোগ আদৌ মিথ্যা নয়। এবং আমার অভিযোগের সপক্ষে যে যুক্তি রয়েছে তা' বলছি। কোন প্রযোজক যখন চিত্র নির্মাণের মনস্থ করলেন—তখন থেকে পত্র-পত্রিকাগুলি মাসের পর মাস তাঁদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে প্রচার কার্য চালিয়ে যান সংবাদ ছেপে—ব্লক ছেপে। সাত আট মাস বাদে কোন কোন ক্ষেত্রে একবছর বাদে তাঁদের চিত্রের মুক্তি দিবস ঘনিয়ে আসে। তাঁরা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির প্রতি এবার একটু কৃপা দৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কোন কোন কাগজে—(তাও তাঁদের মর্জির উপর নির্ভর করে) একচতুর্থাংশ থেকে—এক পাতা করে বিজ্ঞাপন দেবার মনস্থ করেন। কোন কোন কাগজে দুবার হয়ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, মাসিকের বেলায় একবার হলেই যথেষ্ট। বিজ্ঞাপন ছাপার দু'তিন মাস বাদে যদি নেহাৎ কর্তৃপক্ষ সৎ হন, বিজ্ঞাপনের টাকা মিটিয়ে দিলেন। অন্যথায় এক বছর এবং ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপনের টাকাটা যদি গাফ করেও দেন, তাতেও কিছু করবার নাই। এর ভিতরও কথা আছে। বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত হারের ওপর তাঁদের প্রচার সচিবের কলম চললেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং এমন প্রচার সচিবও আছেন—আড়ালে আবডালে তাঁদের পকেটে কিছু না তুলে দিলে বিজ্ঞাপন পাবার আর কোন আশা থাকে না। তারপর আজকাল একধরণের ফড়ে জুটেছেন—ভদ্র কথায় তাঁদের গালভরা নাম রয়েছে 'পাবলিসিটি ফারম'—তাঁরা কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচয় এবং আত্মীয়তার সুযোগে বিজ্ঞাপনের চুক্তি গ্রহণ করে মাঝখান থেকে এক ভাগ বসান। কাগজের মান এবং প্রচার সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখেই যে প্রচার কার্য করা হয়—তার কোন মানে নেই। কাগজের এমন কেউ একজনের প্রতিষ্ঠানের সংগে পরিচিত থাকা চাই—যাঁর অদৃশ্য হস্ত অনেক সময় সাহায্য করতে পারে। অবশ্য একথা স্বীকার করবো—আমার এই অভিযোগ থেকে বহু মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রচার সচিবরাই মুক্ত। কিন্তু বিজ্ঞাপন বা প্রচার কার্যের বেলায় ও তার পরিমাণ নির্ধারণে কোন প্রতিষ্ঠানই এড়িয়ে যেতে পারবেননা। এই যেখানে অবস্থা, কাগজগুলি সেখানে টিকে থাকবে কী করে? অথচ বম্বে প্রভৃতি স্থানের কথা ধরুন, চিত্রারম্ভের সংগে সংগেই সেসব স্থানে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে এবং আমাদের এখানে যেখানে সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ষাট টাকার বেশী নয়—অথচ তাই কর্তৃপক্ষদের ভাবিয়ে তোলে, সেখানে সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠার জন্য চার শত টাকাও বম্বের চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলী বেশী মনে করেন না। তারপর চিত্রের যদি বিরুদ্ধ সমালোচনা কোন কাগজে প্রকাশিত হয়—সে পত্রিকাখানি কর্তৃপক্ষের কোপ থেকে কোন দিনই হয়ত রেহাই পাবেনা। অবশ্য এ বিষয়ে কতকগুলি চিত্র প্রতিষ্ঠানের নির্ভীক এবং সত্য ভাষণ সহ্য করবার ক্ষমতার আমরা যে পরিচয় পেয়েছি, সেজন্য

তাঁদের অভিনন্দনই জানাবো। কিন্তু সংগে সংগে এমন প্রতিষ্ঠান মালিকদের হীন মনোবৃত্তির পরিচয়ে বেদনা অনুভবও করছি, যারা তাঁদের তথাকথিত চিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে রূপ-মঞ্চের সংগে সমস্ত ব্যবসায় সম্পর্ক ছেদ করছেন এবং রূপ-মঞ্চ বলে যে একটা পত্রিকা চিত্র ও নাট্যমঞ্চের কথা নিয়ে প্রকাশিত হয়—তাও তাঁরা তাঁদের অর্থের গরিমায় অস্বীকার করতে চান। পত্র পত্রিকার প্রতি আমাদের শিল্পপতিদের মনোভাবের আংশিক মনোবৃত্তির পরিচয়ের কথা এখানে বললাম। এর বাইরেও যে সব গোপন তথ্য আছে—তা প্রকাশ করে আমি যেমনি ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে রুষ্ট করতে চাই না, তেমনি সাধারণের কাছে কাউকে হীন প্রতিপন্ন করবার হীন মনোবৃত্তিও আমার নেই। যে কথাগুলি বললাম সে সম্পর্কে আমাদের কর্তৃপক্ষদের একটু চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। পত্র পত্রিকার আংগিক মানের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে—যেসব পত্র-পত্রিকা তাঁদেরই ব্যথায় ব্যথিত—তাঁরা যদি তাঁদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে—তারা বাঁচবে কি করে—তাঁদের কথা বলতে বলতে—তাঁদের অসহযোগ মনোবৃত্তির জন্য এদের কণ্ঠস্বর একদিন কী রুদ্ধ হয়ে আসবে না?

প্রতিকার কী নেই?

আছে। এবং প্রতিকারের জন্য প্রথম সমগ্রভাবে চিত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলির সংঘ বি, এম, পি, পি, এ-র কাছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি—তাঁরা যেন তাঁদের সহযোগীতার হাত প্রসারণ থেকে পত্র-পত্রিকাগুলিকে বঞ্চিত না করেন। চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের কথা নিয়ে যে সব পত্র পত্রিকা গড়ে উঠেছে—তাঁদের তাঁরা যেন পরম মিত্র বলেই মনে করেন। তাই বিরুদ্ধ সমালোচনাকে সহ্য করবার উদারতা যাতে তাঁদের মাঝ থেকে অন্তর্হিত না হয় এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে। রূপ-মঞ্চের কথাই বলছি, রূপ-মঞ্চের তিনটী রূপ রয়েছে। একটি লালন, একটি তাড়ন আর একটি সংগঠন। লালনের রূপটি তখনই বিকশিত হ'য়ে ওঠে—যখন আমাদের চিত্রজগত বাইরের কোন আঘাতের সম্মুখীন হয়। বাইরের যে কোন আঘাতের সম্মুখে রূপ মঞ্চ সব সময়ই তার শক্তি ও সামর্থ নিয়ে প্রতিরোধ করে দাঁড়াবে। এবং যে কোন সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্য রূপ-মঞ্চ নিজের কর্তব্যবোধেই সুষ্ঠভাবে করবার জন্য সবসময়ই তার সাহায্য হস্ত বাড়িয়ে থাকে। রূপ-মঞ্চের তাড়নের দিকটা হচ্ছে—চিত্রজগতের সর্ব প্রকার দুর্বলতার বিরুদ্ধে চাবুক মেরে তাকে সুস্থ ও সবল করে তোলা। আভ্যন্তরীণ গলদ অপসারণ করবার দায়িত্ব যেমনি রয়েছে, তেমনি চিত্রমুক্তির পর তার আংগিক দুর্বলতার নির্মম সমালোচনা করে পরবর্তী প্রচেষ্টায় সে সব দুর্বলতা শুধরে নিতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা। চিত্র শিল্পটী যাতে নিখুঁত রূপ নিয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ সেবায় নিয়োজিত হ'তে পারে, রূপ মঞ্চের তাই সবচেয়ে বড় কামনা। রূপ-মঞ্চের সংগঠনের দিকটী হচ্ছে, যে সব সমস্যা আমাদের কর্তৃপক্ষের তথা চিত্র শিল্পের সামনে দেখা দেয়—সেই সব সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হওয়া। শিল্পীগঠনে—নূতন শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি এই সংগঠন রূপের গণ্ডির মাঝেই পড়ে। তাছাড়া এ বিষয়ে আমাদের আরো যে প্রধান কর্তব্য রয়েছে তা হ'চ্ছে—দর্শক সাধারণের রুচীকে উন্নত পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। চিত্র শিল্পের মান কেন উন্নত হয় না—এজন্য প্রযোজকদের শৈথিল্যকেই গালিগালাজ করলে যে এই সমস্যার সমাধান হবে না—আমরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। তাই দর্শক সাধারণের চাহিদা এবং রুচীকে উন্নত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমাদের সমালোচনায় একদিকে যেমনি কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়, অপর দিকে তেমনি দর্শকদের সামনে পরিষ্কার করে বলতে চাই, কেন এই ছবি তাঁরা দেখবেন না—কেন এই ছবি ক্ষতিকর। কী আমাদের চাওয়া উচিত। কী আমাদের দেখা উচিত। এবং এই ভাল-মন্দর বিচার শক্তিকে তাঁদের মাঝে জাগিয়ে তোলাই রূপ-মঞ্চের সমালোচকদের অন্যতম দায়িত্ব।

এতখানি আন্তরিকতা নিয়ে যে পত্রিকাখানি চিত্র ও নাট্য-জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে—তার এই আন্তরিকতায় যদি কোনও ফাঁক না থাকে—আমরা জানি—আমরা সকলের মন জয় করে একদিন আমাদের সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে পারবোই—তবে আমাদের চলার পথে যেমনি দর্শক সাধারণের সহযোগীতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছি,তেমনি যদি কর্তৃপক্ষের সহযোগীতা ও সহানুভূতি অর্জন করতে পারি, আমাদের সংগ্রামের পথ অনেকটা সুগম হ'য়ে উঠবে।

শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব—

শিল্পী ও চিত্রশিল্পের সংগে জড়িত বিশেষজ্ঞরাও পত্র-পত্রিকা গুলিকে তাঁদের সহযোগীতা দিয়ে নানান ভাবে সাহায্য করতে পারেন। শিল্পীদের খ্যাতির পিছনে তাঁদের প্রতিভার দাবীকে আমরা সবসময়েই মেনে নি কিন্তু তাঁদের এই খ্যাতির ব্যাপ্তির জন্য পত্রিকাগুলির আন্তরিকতাকে আশা করি তাঁরা অস্বীকার করবেন না। তাঁদের প্রতিভার কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পত্র-পত্রিকা গুলিরই এবং সে দায়িত্ব পালনে তারা কোন সময়ই পিছপাও হয় না। এ ব্যাপারে রূপ-মঞ্চ কী ভাবে শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রচারকার্যে আত্মনিযোগ করে থাকে—তা নূতন করে কাউকে বলে দিতে হবে না। এপর্যন্ত যাদের প্রচার কার্য আমরা করেছি—কোন স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে করিনি—বরং তাঁদের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে যে ব্যয়ভার রূপ-মঞ্চের গ্রহণ করতে হয় —তা যে কোন ভুক্তভোগী মাত্রই অবহিত আছেন। দর্শক-সধারণের কাছে আমাদের শিল্পী এবং বিশেষজ্ঞদের নূতন দৃষ্টিভংগী থেকে পরিচয় করিয়ে দেবার পরিকল্পনা কোন বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে গৃহীত হয়নি, চিত্র জগতের ব্যবসায়ী —সাংবাদিক—বিশেষজ্ঞ এবং প্রত্যেক শিল্পী ও কর্মীদের পরিচিতির পরিকল্পনাই আমরা গ্রহণ করেছি। সুযোগ সুবিধানুযায়ী যাঁদের সংস্পর্শে আসবার আমাদের সৌভাগ্য হ'য়েছে—তাঁদেরই আগে স্থান করে দিয়েছি। এ জন্য এখন পর্যন্তও যাঁদের পরিচিতি প্রকাশ করতে আমরা পারিনি —তাঁদের অনেকের মনে এই সন্দেহ জেগেছে এবং অনেকে চিত্র-মহলে আমাদের বিরুদ্ধে এরূপ হীন প্রচার কার্যও করে বেড়াচ্ছেন যে, এই জন্য নাকী আমরা বেশ মোটা রকমের কিছু খেয়ে থাকি। এইরূপ মন্তব্যের পেছনে কোন সত্য নেই— এবং তাদের এই হীন প্রচার কার্য থেকে পরশ্রীকাতরতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সপক্ষে যাদের পরিচিত প্রকাশিত হয়েছে—তাঁদেরই আমরা সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে পারি। যাঁদের সংগে এখন পর্যন্তও আমরা সাক্ষাৎ করে উঠতে পারিনি—তাঁদের এই আশ্বাসই দিচ্ছি—তাঁদের সবাকার কথাই আমাদের প্রতিনিধিদের মনে আছে। শিল্পী গোষ্ঠীর সবাইকে আমরা আমাদেরই নিজেদের গোষ্ঠীর বলেই মনে করি। কারোর বিষয়েই আমাদের কোন পক্ষপাতিত্বের পরিচয় কোন দিন তাঁরা পাবেন না। অর্থাৎ তাঁদের প্রতিভার সমালোচনার সময় তাঁদের যোগ্যতার মাপকাঠিকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হবে। এখন এই প্রচারকার্য সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যে সব শিল্পী সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা যদি প্রচার কার্যের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করেন—তাতে নিজেদের জনপ্রিয়তার পরমায়ুও যেমনি বৃদ্ধি পায়, পত্র-পত্রিকা গুলিকেও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। নানান বিলাসের উপকরণে তাঁদের অর্জিত অর্থের অংশ ব্যয়িত হ'তে দেখি—অথচ প্রচার কার্যের বেলায় এক কপর্দকও তাঁরা ব্যয় করতে নারাজ। হলিউড প্রভৃতি স্থানের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কী আমাদের বম্বের শিল্পীরাও এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহশীল। এই প্রচার কার্য শিল্পীদের প্রতিভা-সমালোচনার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না একথা শিল্পীদের মনে রাখতে হবে। কী ভাবে প্রচার কার্য করা যেতে পারে—তা সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকার কর্তৃ-পক্ষরাই সে পরিকল্পনার কথা বলতে পারেন। আশা করি আমাদের শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন।

পত্র-পত্রিকাগুলির দায়িত্ব—

আমাদের সহযোগী অন্যান্যদেরও আমরা অনুরোধ জানাবো—যাতে প্রত্যেকে নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন

হ'য়ে ওঠেন। এবিষয়ে অবশ্য দায়িত্ব রয়েছে আমাদের 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের'। কিন্তু বছরে একবার করে মিলিত হওয়া ছাড়া দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠানের আর কোন দিকেই তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এজন্য প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করবো না, কারণ আমাদের নিয়েই প্রতিষ্ঠান। তাই ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যদি আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকি—সমষ্টির কর্তব্য তাতেই সম্পাদিত হবে। পরস্পরকে মিত্র ভেবেই আমাদের পথ চলতে হবে এবং সর্বপ্রকার অবৈধ প্রতিযোগীতা থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে পরস্পরের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতেই আত্মনিয়োগ করবো। নূতন বছরে পা দিয়ে আমরা আমাদের সহযোগীদেরও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি।

পাঠক সাধারণ

সর্বশেষে যাঁদের সম্বোধন করে কয়েকটা কথা বলবো, তাঁরাই হচ্ছেন রূপ-মঞ্চের প্রাণকেন্দ্র। তাঁদেরই অনুরাগ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আজ রূপ-মঞ্চ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রথম দিককার আলোচনায় আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠক সাধারণ যেন মনে না করেন, হতাশার ভারে আমরা নুইয়ে পড়েছি। রূপ-মঞ্চের এবং তার পাঠক সাধারণের মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—তা দিন দিনই নিবিড় থেকে নিবিড়তম হ'য়ে উঠছে। রূপ-মঞ্চ পরিচালনায় তাঁদের সক্রীয় সহযোগীতাই আমাদের কাম্য। তাই আমরা যারা রূপ-মঞ্চ পরিচালনার পুরোভাগে রয়েছি—রূপ-মঞ্চের প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কে পাঠক সাধারণকে অবহিত করে তুলতে চাই। নিবিড় নিকশ আঁধারের বুক চিরে যে পথ বেয়ে গেছে—সেই পথ বেয়েই আমাদের ছুটে চলতে হবে। আমাদের পাঠক সাধারণের নির্দেশ এবং নৈতিক সমর্থনই আমাদের চলার পথে আলোক বর্তিকা। রূপ-মঞ্চের অতীত—সংগ্রামের ইতিহাসের সংগে জড়িত—রূপ মঞ্চ কর্মীদের সংগ্রামশীল মনের দৃঢ়তা কোন দিন স্তিমিত হবে না—যে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে আমাদের যাত্রারম্ভ, আয়াসের বুকে সে যাত্রা কোন দিন থেমে যাবে না। প্রতি মুহূর্তে নূতন সংগ্রামের জন্য আমরা প্রস্তুত হ'য়ে আছি। আমাদের শিল্পপতিরা যদি একজোটেও আমাদের প্রতি অসহযোগ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন—রূপ-মঞ্চের প্রকাশ কোন দিন বন্ধ হবে না। সমস্ত বিপর্যয়ের বোঝা এক সংগে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াক—আমরা আমাদের আদর্শের ধ্বজা ধরে সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে অগ্রসর হবো। আমাদের একমাত্র পাথেয় পাঠক সাধারণের সজাগ দৃষ্টি ও সহানুভূতি। আশা করি যতদিন রূপ-মঞ্চ তার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে—তার পাঠক সাধারণের নৈতিক সমর্থন থেকে কোন দিনই বঞ্চিত হবে না। আমাদের এই দৃঢ়তার কথা জানিয়ে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, চিত্র ও নাট্য জগতের শিল্পী ও কর্মী, প্রযোজক ও বিশেষজ্ঞ—দর্শক ও প্রদর্শক, পরিবেশক ও স্টুডিও মালিক, সকলের কাছে আমাদের এই আকুল আহ্বান—আসুন, সকলের সাহায্য হস্ত বাড়িয়ে দিয়ে রূপ-মঞ্চকে আমরা এমন একটি পত্রিকায় রূপান্তরিত করি—বাংলার অনাদৃত চিত্র ও নাট্য-শিল্পের সকল দৈন্যতা দূর করে যে পত্রিকা তাকে শিল্প-প্রতীমার সুউচ্চ বেদীমূলে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারবো।

আমাদের মনের সমস্ত আবিলতা দূর হ'য়ে যাক—সমস্ত অবিশ্বাস ও ঘৃণার ধূম্রজাল ভেদ করে আমরা রাহুমুক্ত সূর্যের বিজয় বন্দনার সমস্ত আয়োজনে মেতে পড়ি। জয়হিন্দ।—

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

জাপানের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

★

সভ্যযুগের ইতিহাসে মাত্র নয়—মানবের সকল যুগের ইতিহাসেই সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যসাধনা মানুষের জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে। তথাকথিত অসভ্য জাতি বা জীবন এখনও ইতিহাস হ'তে অন্তর্হিত হয় নি। তাদের সংসারযাত্রা এখনও প্রমাণ করে তাদের রূপরসের প্রতি আকর্ষণ। প্রতিটি নরনারীর বেশভূষা ও অঙ্গালঙ্করণ হ'তে প্রমাণিত হয়, সৌন্দর্যের প্রতি অটুট অনুরাগ মানুষের বক্তের সহিত জড়িত। এজন্য মানুষ ভগবানকেও রসস্বরূপ বলতে দ্বিধা করেনি। বিস্ময়ের বিষয়, এক সময় ইউরোপীয় সভ্যতা নিজেদের সৌন্দর্য বিচারে একমাত্র পাশ্চাত্য আদর্শকেই শিরোধার্য করে অপর সকল সৃষ্টিকেই অসম্পূর্ণ, কুৎসিত বা বর্বর বলতে ইতস্ততঃ করেনি। গ্রীক ও রোমক সৌন্দর্যের নমুনাকে জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলবার পশ্চাতে ছিল মিশর, ভারত, পারস্য ও চৈনিক সৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞার ভাব। ইদানিং নানাকারণে গ্রীক আদর্শকে একটা উচ্চ ব্যাপার বলতে রসিকরা আর প্রলুব্ধ হচ্ছে না। Roger Fry প্রমুখ রসার্থীরা গ্রীক আবহাওয়ায় পুষ্ট সৌন্দর্য-সংস্কারকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার ও ভ্রান্তিমূলক বলতেও ইতস্ততঃ করছেন না। এই আলোচনার সংগে একথাও বল' হয়েছে, বর্বর নিগ্রো ভাস্কর্যের পরিপূর্ণ শ্রীর নিকট গ্রীক রচনাকে সহজেই পরাজয় মানতে হয়। এ রকমের অভূত-পূর্ব দৃষ্টিভংগী সমগ্র রসসৃষ্টির বিচারে এক নূতন প্রলয় উপস্থিত করেছে।

ফলে প্রাচ্য রূপসৃষ্টির মূল্যও অনেকটা বেড়েছে। এতকাল গ্রীক রচনাকে বাহবা দেওয়া হ'ত বাস্তববাদীতার দিক হতে; ইদানীং বাস্তববাদীতাকে (realism) নকল-কাণ্ড (illusionist) বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, সৌন্দর্যের দিক হ'তে এরকম রচনার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। যা' অপ্রাকৃত বা অসম্ভব—সৌন্দর্যের অফুরন্ত শ্রী হয়ত বিচিত্র ও বহুমুখীভাবে তার ভিতরই অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এরকম প্রতীতি ক্রমশঃ গভীর ও ব্যাপক হয়েছে বলে কিছুকাল হ'তে প্রাচ্য কলা এবং যে কলায় অভিষিক্ত সমগ্র আয়োজনের দিকে বিশ্বের দৃষ্টি ফিরেছে।

শুধু তা' নয়। প্রাচ্য আদর্শ ইউরোপের বহু সৌন্দর্য-বিধিকে রূপান্তরিত করেছে। নাট্যমঞ্চ ক্ষেত্রে এ মতের একটি বহুমুখী প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈনিক ও জাপানী নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চ হ তে ইউরোপ বহু উপাদান সংগ্রহ করেছে।

রঙ্গমঞ্চ সমগ্র সৌন্দর্যসমারোহের মিলনক্ষেত্র। এর ভিতর সংগীতকলার দান অসামান্য। পৃষ্ঠপট, অঙ্গসজ্জা ও পরিচ্ছদ রচনায় চিত্রকলার প্রধান উপাদান, বর্ণ ও তুলিকা প্রয়োগের ঐশ্বর্যে সমগ্র গমক এতে ফলিত করতে হয়। নটনটীদের অংগহিল্লোলে ভাস্কর্যের সমগ্র রূপবিধির অনুসরণ করা প্রয়োজন। মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় স্থাপত্যের সমগ্র কৌশল ও কারুতাকে অবলম্বন অনিবার্য হয়। তা' ছাড়া আবৃত্তি ও বাক্যবিন্যাসে কাব্যের সমগ্র রস পুষ্ট ও নাট্যকলায় যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হয়। কালিদাস ও সেক্সপীয়রের কাব্যগৌরব নাটক রচনায় সূর্যমুখীর ন্যায় উন্মুখ হয়েছে—একথা অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই সকল কলার মিলন হয়েছে রঙ্গমঞ্চে—এজন্য প্রাচ্যমঞ্চেও প্রাচ্যকলার সৌন্দর্য ময়ূরকণ্ঠের মত উদ্‌গ্রীব হয়েছে। জাপানী মঞ্চের আলোচনার সূত্রপাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মঞ্চের প্রকৃতিগত পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা চাই—না হয় সব কিছুই খাপছাড়া ও অস্বাভাবিক মনে হবে।

ইউরোপীয় মঞ্চের গোড়াকার মূর্তির ভংগী দেখা যায় Early Italian Stage-এ। এ স্টেজ একটা বাক্সের মত—শুধু বাক্সের সামনের ঢাকাটি (cover) যেন খুলে ফেলা হ'য়েছে মাত্র। এই প্রকাণ্ড বাক্সের ভিতর নটনটীরা এসে অভিনয় করে—দর্শকেরা থাকে অনেকটা দূরে—সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্রভাবে যেন আর একটা জগতে। এই বাক্সের ভিতরকার সাজ-সজ্জা, আলো ও অলঙ্করণ সমগ্র ব্যাপারটিকে এক ঐন্দ্রজালিক অবাস্তবপুরীর মত করে তোলে। দর্শকরা দূর হ'তে যেন এই স্বপ্নের মত জগতের ব্যাপারগুলিকে দেখে।

এরকম মঞ্চ একেবারে কৃত্রিম সৃষ্টি একটা বিশিষ্টযুগের। ইউরোপে Reinhardt, Gordon Craig প্রভৃতি নাট্য-মঞ্চকারেরা এরকম মঞ্চকে একেবারে বর্জন করেছেন। কারণ, এতে দর্শক ও নটনটীদের ভিতর একটা আত্মীয়তার (intimacy) ভাব জন্মায় না, এজন্য রসসৃষ্টি ও রসচর্চা ব্যাহত হয় পদে পদে। প্রাচীন গ্রীকেরা এরকম কৃত্রিম ও আত্মবিরোধী ব্যাপার সৃষ্টি করেনি। এমনকী সেক্সপীয়রের যুগেও দর্শকেরা মঞ্চকে ঘিরে চারিদিকে বসত—তাকে অতিদূরে রেখে দুর্লভ ও দুরধিগম্য করেনি।

কিন্তু ইউরোপ বহুপূর্বে Early Italian Stage ত্যাগ করেছে প্রাচ্যমঞ্চের প্রভাবে। অথচ ইউরোপের অনুকরণে রচিত এই অদ্ভুতমঞ্চ বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে—এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের যাত্রাগানের আসর দর্শকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে—তা'তে করে নাট্যরস ঘনীভূত ও উৎকৃষ্টতায় মণ্ডিত হয়—সমগ্র অনুষ্ঠানে একটা পরম হৃদ্যতা ও রসমত্তা শরীরী হয়ে উঠে।

ইউরোপের সংস্কারক শিল্পীরা দেখলে যে চৈনিক রঙ্গমঞ্চে কোন বাস্তবতাকে কৃত্রিম ইন্দ্রজাল বা ভেলকির সাহায্যে কখনও উপস্থিত করা হয়না—তা মোটেই "illusionist" নয়। অর্থাৎ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অশ্বারোহীকে রণমত্ত অবস্থায় দেখাতে হয়, তবে সেজন্য একটা আস্ত ঘোড়া মঞ্চে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনা। অশ্বারোহী একটা যষ্টিকে নিজের পদদ্বয়ের মাঝে রেখে তার উপর চড়েই ঘোড়ায় চড়ার কাজ শেষ করে। আবার প্রধান অভিনেতারা অনেক সময় দর্শকদের মাঝখানটায় রচিত একটা দীর্ঘপথের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গিয়ে দুপাশে তৈরী পথ দিয়ে ঘুরে আবার মঞ্চের উপর উপস্থিত হয়। এই মধ্যপথকে "flower path" বলা হয়। এমনি করে দর্শকদের সংগে অভিনেতাদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়, যা' নাট্যরস উদ্ঘাটনের সহায়ক হয়। ইউরোপীয় রসশিল্পীরা এরকমের ব্যবস্থা
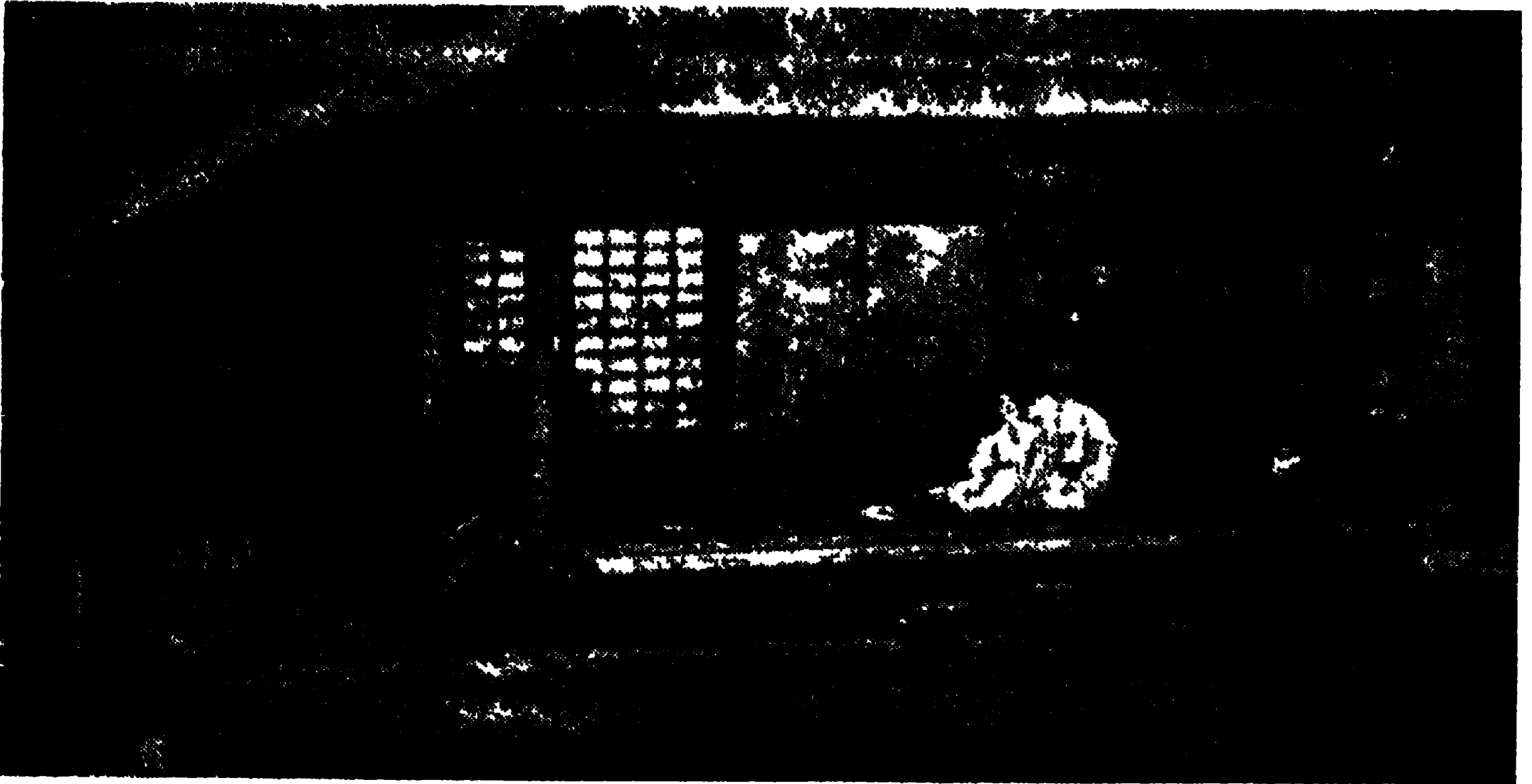
জাপানী 'কাবুকী' নাটকের একটা দৃশ্য।

রূপ-মঞ্চ

জাপানী অপেরা। নর্তকীদের হাতে পাখা ও ঘোড়ার মাথার মূর্তি।

দেখেই তাঁদের সমগ্রবঙ্গমঞ্চের স্বরূপকে একেবারে পরিবর্তিত করেছে।

জাপানীমঞ্চ আলোচনায় মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য প্রাচ্য জাতির মত জাপানীরাও নিজেদের মঞ্চকে একটা বঞ্চনার যন্ত্ররূপে কখনও ব্যবহার করেনি। তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবুদ্ধি সমগ্র অনুষ্ঠানকে একটা রূপের গৌরবে মণ্ডিত করেছে, যা স্বতঃই অভিনব লালিত্যে লীলায়িত। দুনিয়াকে বা দুনিয়ার কোন অবস্থাকে হুবহুভাবে করলেই যে অনুকরণ করা যায় না, তা' ইউরোপ ইদানীং বুঝতে পেয়েছে। এজন্য মঞ্চকে ওরা একটা যাদুঘরে বা প্রত্নতাত্ত্বিক গুদামঘরে পরিণত করতে চায় না। ষ্টেজের লক্ষ্য একটা প্রাচীন পুরী সৃষ্টি নয় —বস্তুতঃ একটা বিশিষ্ট রসের বা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সাহায্যে অভিনব উত্তেজনা সৃষ্টিই নট্যকলার উদ্দেশ্য। শিল্পী Whistler, 'Ten o' clock' গ্রন্থে পশ্চিমের দিক হতে কিছু বিচার করেছে।

এজন্য জাপানী মঞ্চে দেখতে হবে একটা সহজ সমীকরণের চেষ্টা—সমগ্র কলা সংগ্রহকে। বর্ণ, ধ্বনি, আবৃত্তি, গতি প্রভৃতিকে একই তালে ও ছন্দে গাথা অতি কঠিন। ইউরোপে আধুনিক যুগে Wagner এরকম Aesthetic synthesis এর দিকে সকলের মন আকৃষ্ট করেছে। (শ্রীযামিনীকান্ত সেন, আর্ট ও আহিতাগ্নি ৩৫ পৃঃ) প্রাচ্যদেশে এরকম সুখ্যাতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্জরিত হয়েছে।

জাপানী মঞ্চের ইতিহাস বহু প্রাচীন। নারা যুগের Kagura ও Saibara নৃত্যে গীত ও বাদ্য ব্যবহৃত হ'ত আলঙ্কারিকভাবে—তা'তে করেই নাট্যকলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তী যুগে দু'রকমের নৃত্য প্রচলিত হয় Surugaku ও Dengaku। এর সংগে যে অভিনয় চলে তাকে 'No' বলা হয় এবং যে কাহিনী উপস্থাপিত করা হয় সংগীতের আকারে, তাকে বলা হয় Yokyoku। প্রায় তিনশত Yokyoku সৃষ্ট হয়েছিল Ashikaga যুগে। এগুলি গ্রীক বা রোম্যান প্রহসনের (Comedy) মত সুদীর্ঘ মোটেই নয়। এ সমস্ত যে হুবহুভাবে কোন ব্যাপারকে উপস্থিত করতো না তার প্রমাণ হচ্ছে যে, অভিনেতারা মঞ্চে এসে নিজে পরিচয় দিয়ে বলত যে, সে কে, কেন সে সেখানে এসেছে এবং কোথায় সে যাবে। এরকম উক্তিকে অবান্তর বা অস্বাভাবিক কেউ ও'দেশে ভাবেনি। শুধু যে কথপোকথন মাত্র ষ্টেজে হ'ত তা নয়, এরকম বিবরণও দেওয়া হ'ত এসব নাটকে। এসমস্ত 'Yokyoku ও No' কে উচ্চশ্রেণীর 'Classical নাটক বলা চলে, কারণ উচ্চ শ্রেণীরা এসব নাটক পছন্দ করেছে। 'Yokyoku ও No' অভিনীত হওয়ার পরে এদেশের ক্ষুদ্র প্রহসনের মত জাপানীরা

"Kyogeu" বা ছোট প্রহসন অভিনয় করত—তা'তে করে সকলের মন প্রফুল্ল হ'ত। এসময় আর এক রকমের নৃত্যনাট্যও প্রচলিত হয়, তার নাম হচ্ছে 'Kowaka।'

নাট্যকলা ও মঞ্চের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয় 'Ashikaga' যুগের পরে। এসব থিয়েটারের নাম হচ্ছে 'Kabuki'। আরও এক শ্রেণীর নৃত্যনাট্য জাপানে খুব জনপ্রিয়—এর নাম হচ্চে Avatsuri shibai"। এ রকম নাটকে পুতুল ব্যবহৃত হয় Kiotoতে Shijor নদীতীরে—Kuni নামক একজন স্ত্রীলোক 'Kabuki' শ্রেণীর নাটকের সূচনা করে। এর ভিতর 'No' ও "Kyogeu" এর গান ও নৃত্য গ্রহণ করা হয়।

নিম্নস্তরে উৎপন্ন বলে 'কাবুকী' নাটকেরও অভিনেতাদের মর্যাদা "No" অপেক্ষা কম। Kabuki নাট্যের অভিনেতাদের 'Kawarawous' বা নদীতীরের লোক বলা হয়। 'কাবুকী' নাটকে বহু পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। গোড়াতে কাবুকী নাটকে মেয়েরাই শুধু অভিনয় করত। পরে ছেলেদেরও নিযুক্ত করা হয়। বয়স্ক লোকদেরও ধীরে ধীরে গ্রহণ করা হয়। বিস্ময়ের বিষয় মেয়েদের পুরুষের ভূমিকা নেওয়া এবং পুরুষদের স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ এক্ষেত্রে জাপানে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ এতে নানা দুর্নীতি উপস্থিত হ'লো এবং গভর্ণমেণ্ট আইন করে এ প্রথা বন্ধ করে দেয়।

এর পরে ছেলেদের (Wakashu) দ্বারা অভিনীত কাবুকী নাট্যের প্রচলন হয়। আবার দুর্নীতির জন্য এপ্রথাও গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে। এরপর শুধু বয়স্ক পুরুষদের দ্বারা অভিনীত নাটক অনুমোদিত হয়। এর পর আবার স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ঘটে এবং ক্রমশঃ তারা পুরুষদের বর্জন করে নাটকের অভিনয় আরম্ভ করে।

জাপানে নাটকগুলি ছাপান হয় না—শুধু অভিনেতাদের ব্যবহারের জন্য রচিত হয়। অনেক সময় অভিনেতারা নিজেই বক্তব্য রচনা করে নাটককে রসঘন করে তোলে।

পুতুল নাট্যে বিচিত্র রসসৃষ্টি আরও গভীর হয় এবং এ শ্রেণীর সৃষ্টির সহিত ইউরোপীয় ব্যবস্থা অনেকটা মেলে। এজন্য কোন পাশ্চাত্য লেখক বলেছেন, 'It is the marionette theatre, one finds the equivalent of European drama. This originated at the same time as Kabuki."। এর প্রযোক্তা ছিল Takemoto। এর ভিতর দুরকমের আবৃত্তি প্রচলিত হয়। এক রকম আবৃত্তির নাম "Joruri"—অন্যের নাম "Gidayu"। Gidayu অভিনয় প্রসংগে কথাবার্তা ও অংগ ভংগীকে অত্যুক্তি ও বাড়াবাড়ি প্রয়োজন হয়। কারণ, পুতুলকে দিয়ে সব সময় সাধারণ ভাবে কোন ভাব প্রকাশ সম্ভব হয় না।

নবীন যুগে তিনটি মঞ্চে কাবুকী নাট্য অভিনীত হয় টোকিওতে—Imperial theatre, Kabuai-za ও Ichisvaura za। নটনটীদের অভিনয় অতুলনীয়। কোন সমালোচক বলেন, "Heedless of the critics they carry on performing the old ceremonies preserving the ancient traditions and conventions with fidelity."

জাপানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'No' থিয়েটার হচ্ছে ওসাকায় —এর নাম হচ্ছে Onighi Ryotars। এ মঞ্চের দুদিকেই দর্শকেরা বসতে পারে—একেবারে অসংলগ্ন ভাবে Early Italian মঞ্চের মত সুদূরে তা রক্ষিত নয়। এর ভিতর কোন রকম 'illusion' তৈরি করবার চেষ্টা নেই—অতি সহজ আবেষ্টন, সজ্জা ও ফার্ণিচার মঞ্চটিকে নিখুঁত করেছে।

প্রাচীন জাপানী মঞ্চ দর্শকদের মধ্যেই স্থাপিত হত। মঞ্চের তিনদিকেই দর্শকদের স্থান এবং খানিকটা মঞ্চ দীর্ঘভাবে একেবারে audienceদের ভিতর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকত। এমনি করেই "intimacy" অর্থাৎ দর্শক ও অভিনেতাদের ভিতর সহানুভূতি সঞ্চারিত হ'ত। Nakamurazi নামক বিখ্যাত জাপানী মঞ্চ এরকমভাবেই নির্মিত হয়েছিল।

এসব দেখেই ইউরোপের মঞ্চে নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়। বস্তুতঃ প্রাচ্য মঞ্চে কোথাও বা আসবাব ও উপকরণ মোটেই নেই, অতি সামান্য মালমশলার সাহায্যেও বিস্ময়জনক রসসৃষ্টি করবার যাদু এদেশের অভিনেতারা জানে। তা ছাড়া একটা হুবহু বাস্তবতাপূর্ণ আবেষ্টন প্রাচ্য দেশে কেউ চায় না। ঘোড়া না থাকলেও একটা লাঠির উপর চড়ে'ও ঘোড়ায় চড়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

কাবুকি মঞ্চের রচনার সরলতা হৃদয়গ্রাহী। অতি সহজ ও সুস্থ আবেষ্টনেই অভিনয়কে পূর্ণতা দান করা যায়। কারণ, চারিদিক্কার গৌণ সম্ভার কারও দৃষ্টিকে ব্যাহত করেনা।

জাপানের পুত্তলিকা অভিনয় একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এদেশের পুতুলনাচেও কতকটা এ শ্রেণীর রসসমাবেশের ব্যবস্থা আছে। নাট্যকলার বিশেষ একটা দিক্ হচ্ছে গতির ছন্দের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি। চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে গতিবেগের লীলা দেখান সম্ভব নয়। শুধু নাট্যাভিনয়েই গতির বহুমুখী ভংগীর সাহায্যে রসসৃষ্টি সম্ভব করা যায়। অনেক সময় অভিনেতারা অনাবশ্যক বাক্যাড়ম্বর ও মুখভংগীদ্বারা এরকম সৃষ্টির রসভংগ করে। এরূপ বিবাদ পুতুল নাট্যে সম্ভব হয় না। ইউরোপেও Gordon Craig প্রমুখ ভাবুকগণ marionette বা puppet playকে উচ্চস্থান দিয়েছেন অভিনয়গত রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে। জাপানের পুতুলমঞ্চ একটা বিশিষ্ট অংগ অভিনয়কলার। সম্প্রতি Bunraku-za থিয়েটারে এ রকমের পুতুল অভিনয় হয়। বহু কৃতী লোক এ শ্রেণীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে এরকমের নাট্যাভিনয়ের মূল্য কেউ বুঝতে পারছেনা। জাপান ও চীনের রচনা ইউরোপীয় মঞ্চ কল্পনায় এক বিপ্লব উপস্থিত করেছে একেবারে নূতন দিক হ'তে।

জাপানীদের সহজ সৌন্দর্য বুদ্ধি কখনও নাট্যমঞ্চকে দুর্বহ জটিলতায় মণ্ডিত করেনি। ইউরোপকে অনুকরণ করে কতকগুলি বাজে আবর্জনা সৃষ্টি নাট্যরস উৎপাদনের পক্ষে মোটেই প্রয়োজন হয়না।

জাপানে Bunraku-za মঞ্চে পুতুল অভিনয়।

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

(৪)

★

মেজকর্তা বাড়ীর দিকে রওনা হন। কিশোর রাইর নিটোল গাল দু'টো টিপে দিয়েছেন—মনটা তাঁর আমেজে মশগুল। এই আমেজটুকু পাবার জন্য মেজকর্তার যৌন ক্ষুধা তাঁকে নানান ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। দিন দিন সেই ক্ষুধার জ্বালা বেড়েই চলে—তার যেন শেষ নেই। ক্ষুধারও যেমনি শেষ নেই—স্থান কাল আধারেরও তেমনি বাদ-বিচার নেই। এই ক্ষুধার মহা জ্বালায় মেজকর্তার পূর্বপুরুষেরাও যে জ্বলে পুড়ে না মরতেন তা নয়—কিন্তু মেজকর্তার ভিতর এ জ্বালা যতখানি ব্যাপক এবং বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, ইতিপূর্বে তাঁদের বংশধরদের আর কারো ভিতর সে-রূপ দেখা যায়নি। তাঁদের ক্ষুধার দৃষ্টি যাদের ওপর যেয়ে নিবদ্ধ হ'য়েছে—তাদের পুড়িয়ে না মেরে ছাড়েনি। তাদের আত্মসাৎ না করে পিছু হটেননি। এবং আজীবন হয়ত তাদের নিয়েই তৃপ্ত রয়েছেন। দু'চার খানা জমি-জমাও হয়ত লিখে দিয়েছেন—গ্রামের বাইরে ভদ্র ভাবেই থাকবার জন্য বাড়ী ঘর তুলে দিয়ে তাদের আজীবনের সংস্থানও করে দিয়ে গেছেন। নিজেদের তাঁরা কোন দিনই সকলের মাঝে সহজ করে দেননি। জমি-জমার দখলি-স্বত্ব এবং ভোগ-স্বত্ব নিয়ে যেমনি আজীবন তাঁরা মামলা মোকদ্দমা করে গেছেন—লেঠেল এবং পালোয়ান যোগাড় করে যেমনি 'মারা-মারি' 'কাইজ্যা কাজি' দ্বারা নিজেদের পৌরুষের দাপটে প্রতিপক্ষকে ভটস্থ করে তুলেছেন—তাঁদের আশ্রিতাদেরও ঘিরে ছোট খাটো 'ট্রোজান-ওয়ার ও অনেক সময় যে বেধে না উঠেছে তা নয়। কিন্তু তার ভিতর তাঁদের তথাকথিত জমিদারীয়ানার যেন একটা আভিজাত্যের বেশ পাওয়া যেত। কিন্তু মেজকর্তার কথা আলাদা। হ্যাবলক এলিস, কী ফ্রয়েডের মত যৌন-তত্ত্ব বিদ মনীষীরা মেজকর্তার চরিত্রটা হয়ত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে পারতেন। স্কোপ-টোফিলিয়া, একসজিভিসনিজম, হেটোরা সেক্সুয়াল পার ভারসনস, ইনফ্যান্টো সেকসুয়ালিটী—বিকৃত যৌনক্ষুধার কোন রূপ মেজকর্তার ভিতর রূপলাভ করেছে তা আমাদের বলা কঠিন। তবে সকলে যে ভাবে মেজকর্তাকে দেখেছেন, তাতে তাঁর ক্ষুধার তৃপ্তি নেই। দিকে দিকে ব্যাপ্ত। বর্ষার দিনে হাটে চলেছেন—ঝালডাঙ্গার মাঝ পথের স্বচ্ছ শান্ত জলের পথ দিয়ে অন্যান্য সকলের ডিঙ্গি নৌকা তরতর করে ছুটে চলেছে—কিন্তু মেজকর্তার নৌকাখানি কচুরী পানা ভেদ করে তীরকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। মেজকর্তা আগা-গলইতে (নৌকার পূর্ব ভাগ) বসে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি প্রতিটি বাড়ীর আনাচী-কানাচী ভেদ করে অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে বেড়ায়। কোন বাড়ীর বৌ হয়ত বিলের ঘাটে বাসন মাজতে এসেছে—কোন যায়গায় হয়ত পাশাপাশি দু'তিন বাড়ীর মেয়েরা বিলের অনতিদূরবর্তী তাদের অন্দর মহলে বসে গল্প গুজব করছে—কোন ঘাটে হয়ত ছোট ছোট দু'তিনটে ছেলে বড়শী ফেলেছে—তাদের সামাল দেবার জন্য বিধবা কী অনূঢ়া তাদের দিদি স্থানীয় কেউ হয়ত পাশে মাছের ঘটিটার কাছে বসে আছে। কোন কৃষক বাড়ীর মেয়েরা সমস্তদিন কাজের পর গোছল করবার জন্য জলে যেয়ে নেমেছে—ঝালডাঙ্গার স্বচ্ছ জলে গলা অবধি ডুবিয়ে তারা বুকের কাপড় খুলে দিয়েছে—মেজকর্তার নৌকটা একটু দূর দিয়েই যাচ্ছিল—দূর থেকেই মেজকর্তা দৃষ্টি-বাণ ছাড়েন—বাহকটীও উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে—নইলে আট দশ বছর মেজকর্তাদের বাড়ীতে টিকতে পারতো না। নৌকার গতিটা একটু বা দিকে বেকিয়ে নিয়ে যায়। বৌটী আপন মনে গা ডলছে—জলে কুলকুচি করছে। মেজকর্তার দৃষ্টি জল ভেদ করে ছুটতে থাকে—নৌকাটী প্রায় গায়ের কাছে—বৌটী হচ-কচিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি কাপড় সামলায়। অগত্যা জলেই ডুব দিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। নৌকাটী পাশ ঘেসে চলে যায়। হাটের সময় বেশীক্ষণ জলে থাকা উচিত নয়

মনে করে বৌটা উঠে পড়ে। আরও হয়ত কত নৌকা এমনি ভাবে আজ যাতায়াত করবে!

মেজকর্ত্তাদের বাড়ীতে একটা পৌঢ়া নমঃশূদ্রের বিধবা বৌ কাজ করে। নাম তার দিগম্বরী। দিগম্বরীর স্বামী নৌকা বেয়ে রোজগার করতো। স্বামী মারা যাবার পর দু'তিনটে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে। এবাড়ী ওবাড়ী কাজ করে কোন রকমে দিন চালায়। বড় ছেলেটা তার মুগি হ'য়ে উঠেছে—দিগম্বরীর কিছুটা আয়াস হ'য়েছে বটে কিন্তু নিজে কাজ না করলে এখনও সংসার ঠিক চলে না। দিগম্বরীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন কথা বলতে পারেনি। পেটের দায়ে অনেক বাড়ীতেই তার কাজ করতে হয়—মেজকর্ত্তাদের বাড়ীতেও সে ডোয়া লেপে—ধান বানে—বাসন মাজে। দিগম্বরীর চেহারা এমন কিছু লোভনীয় নয়—তার পর দারিদ্র, অনাহার তাকে আরো বয়স্কা করে তুলেছে। সেই দিগম্বরীও যখন মেজকর্ত্তাদের বাড়ীতে কাজে আসে—মেজকর্ত্তার চোখের সামনে পড়লে তাঁর দৃষ্টিবাণ থেকে রেহাই পাবার দিগম্বরীরও কোন উপায় থাকে না। তবে দিগম্বরী খুব শক্ত জাতের মেয়ে। তাই মেজকর্ত্তা আর বেশী এগোতে পারেন নি। যখনই চোখে পড়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। অথবা এমন একটা জায়গা নিয়ে তিনি বসে থাকেন, যেখান থেকে কাজে-রত দিগম্বরীকে হামেসাই দেখতে পান।

পুকুর ঘাটে যদি কোন বৌ বা মেয়ে কাজ করতে থাকে আর মেজকর্ত্তা যদি পথ দিয়ে চলতে থাকেন—বৌ বা মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বিড় বিড় করে মেজকর্ত্তা বলবেনই, যাতে বৌটির কানে যায়। মাখন বাড়ুয্যের বৌ কোনদিন মেজকর্ত্তার সামনে বেরোয়না—কথা বলা বা আলাপ থাকাত দূরের কথা। মেজকর্ত্তা হয়ত তাকে একলা ঘাটে কাজ করতে দেখলেন—যেতে যেতে মেজকর্ত্তা বলে গেলেন—

"আজ যে একলা বৌ ঠাকরোন।" এই কথাটুকু বলতেও যেন মেজকর্ত্তার কত তৃপ্তি। শুধু মাখনের বৌ নয়, এমনি অবস্থায় যেকোন বৌ বা মেয়েকে একলা পেলে দু'টো

তরুণ অভিনেতা সত্য পাঠক, স্টার বঙ্গমঞ্চের সংগে জড়িত।

উদ্দেশ্যহীন কথা বলবার জন্যও মেজকর্ত্তার জীব লকলকিয়ে ওঠে। এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে মধুর বচনও তাঁকে শুনতে হয়। কেউ হয়ত বলে বসেন, 'শিয়ালের মত পালাও ক্যান—আইসো, ঝামা ঘইস্যা দেবানে।" কেউ হয়ত বলেন, "হারামজাদা তোর মা-বোন নাই। চোখে বাউলী ছ্যাক দিয়া দেবো—"এমনি আরো কত মধুর বচনে মেজকর্ত্তাকে তাঁরা সম্ভাষণ জানান। কিন্তু মেজকর্ত্তার স্বভাবের কোন পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয়না। তাই অনেকের কাছেই মেজকর্ত্তার ঐ স্বভাব সহ্য হ'য়ে গেছে—অনেকের এরূপ মধুর বচনগুলি মেজকর্ত্তার হজম করে নিতে বেগ পেতে হয় না।

পাড়ায় কোন বাড়ীতে যেতে হ'লে মাঠের সদর রাস্তা দিয়ে মেজকর্ত্তা বড় একটা যাতায়াত করেন না। যারা মেজকর্ত্তার প্রজা ও বাধ্যবাধকতায় আছে—তাদের কাছ থেকে প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ ওঠেনা সত্য—কিন্তু কারো উঠোনের পর দিয়ে যদি মেজকর্ত্তার পায়ের-পারা পড়ে,

তাদের অন্তরে অন্তরে নির্বাক প্রতিবাদের সুর গুঞ্জরিয়ে ওঠে। যারা মেজকর্তার প্রজা নয় বা কোন বাধ্যবাধকতার তোয়াক্কা রাখেনা—তাদের প্রতিবাদ শুধু মনের মাঝেই গুঞ্জরিয়ে ফেরে না—তার বহিঃপ্রকাশের ঝাঁজ মেজকর্তাকে ছেড়ে কথা কয় না—এরূপ কোন মুসলমান কী নমঃশূদ্র কৃষকের বাড়ীর উঠোনের পর দিয়ে হয়ত মেজকর্তা চলেছেন—ছোট একটী কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে ঝাঁঝাল স্বরে একটী বর্ষীয়সী নারীর গলা ক্যানক্যানিয়ে উঠলো, "বাড়ীর নামো দিয়া চলতি পারোনা? আইচ্ছা বামুনের ব্যাটা—ফের দেখতি পাইলি পাও কাইট্যা ফ্যালাবো।"

মেজকর্তা মাথা নীচু করে দ্রুত পদে চলে যান। আর সহসা সেদিক-মুখো হন না।

হলধরের বাড়ী থেকে ফিরবার সময় রায়দের পুকুর পাড় দিয়ে, বাড়ুয্যে বাড়ীর কাছারীর ছোট রাস্তাটী বেয়ে, গাঙ্গুলী বাড়ীর পুকুর পাড়ে এসে মেজকর্তা দাঁড়িয়ে পড়েন। ফেলামাঝির বৌ জল নিয়ে ফিরছে। মেজকর্তাকে সামনে দেখে এক পাশে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোমটা টেনে দেয়। সংগে তার ছোট বোন, সম্প্রতি দু' একদিন হ'লো বেড়াতে এসেছে বোনাই-বাড়ী। বেশ ডাগর-ডোগর মেয়েটী। বিবাহিতা।

"একে যে নতুন দেখছি" মেজকর্তা জিজ্ঞাসা করেন।

ফেলার বৌ ঘোমটার ভিতর থেকে ফিস ফিস করে উত্তর দেয়, "আমার বুন—বিয়্যা অইছে পর আমার লগে দেকা নাং—কাইল বিয়ানে সোয়ামীরে নিয়া বেড়াইতে আইছে।"

"আছে ত ক'দিন!"

"হ্যা—"

"আচ্ছা বেড়াতে-টেড়াতে যেও।" মেজকর্তা আর কথা বলেন না—রাস্তার মাঝে কারোর সামনে কথা তিনি কোনদিনই বলেন না। এবিষয়ে তাঁর ভীরু মনকে তারিফই করতে হবে। তাই পালানের দিকে পা বাড়ান। কিন্তু মেয়েটী যেন ক্ষণিকের দর্শনেই মেজকর্তাকে ভাল করে চিনে নিতে পারে। দিদিকে তাই জিজ্ঞাসা করে, "ও ক্যাডারে! ওর চাউনীত ভাল্ না।"

ফেলার বৌ ঘোমটা তুলে বলে, "চুপ যা। হইনা ফ্যালাবে। আমাগো মনিব বাড়ীর মাইজ কত্তা।"

মেজকর্তাকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওরা বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

গাঙ্গুলীবাড়ীর পুকুর পাড়ের লাগাই মেজকর্তাদের পালান। এখান থেকেই মেজকর্তাদের বাড়ীর সীমানা আরম্ভ হ'য়েছে। পালানের মাঝ পথ দিয়ে মেজকর্তাদের বাড়ীতে যাবার রাস্তা। একপাশে রাজ গ্যাঁন্দার গাছ—ডাঁটা—দু চারটে কপি আর লঙ্কার চারা—আর একপার্শ্বে চটান জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ওখানে খেলাধূলা করে। পালানের পশ্চিমদিকে কয়েকটী জেলেবাড়ী। এরা সকলেই মেজকর্তাদের ভিটে-বাড়ীর প্রজা। এই জেলে বাড়ীর মেয়েরা গাঙ্গুলীদের পুকুরেই জল নিতে আসে। মেজকর্তা শিষ দিতে দিতে পালানের মাঝ পথ দিয়ে নিজের ঘরে যেয়ে ওঠেন। ঘরে উঠবার আগে একবার কাছারী ঘরটা উঁকি মেরে দেখে নেন—কাছারী ঘরের সামনের চটান যায়গা থেকে তখনও রোদ যায়নি—লোকজনও বড় একটা বেশী আসেনি।

মেজকর্তা তাঁর নিজের ঘরেই আসেন। স্ত্রী গোলাপসুন্দরী গুটিয়ে রাখা বিছানাটায় গা এলিয়ে দিয়ে সাত আট বছরের ছেলে বিভুকে পড়াতে বসেছিল। মেজকর্তা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসে মাথার কাপড় টেনে দেয়। বিভু বাবাকে দেখে আদরের সুরে বলে ওঠে, "তুমি আমার শ্লেট আইন্যা দিলা না বাবা। দ্যাখোত, এই ভাঙ্গা শ্লেটে বুঝি আর ল্যাখা যায়"—

বিভু তার শ্লেটখানা তুলে দেখায়। সত্যি, বিভুর শ্লেটখানা অনেকদিন ভেঙ্গে গেছে। মেজকর্তার ঐ একটি মাত্র ছেলে বিভু। গোলাপসুন্দরী ওরই মুখের দিক চেয়ে স্বামীর সমস্ত অন্যায় মাথা পেতে সহ্য করে। গায়ের স্কুলটী যখন মাইনর-মান অবধি ছিল, মেজকর্তা আটটী বছরেও ছটী শ্রেণী উতরিয়ে যেতে পারেননি। পড়াশুনায় সেখানেই

তাঁর ইস্তাফা। গোলাপসুন্দরী ছাত্র বৃত্তিতে জলপানি পেয়ে পাশ করে। ছেলের পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে। চাটুজ্জে বাড়ীর অশিক্ষা যাতে ছেলেকে ছোঁয়াচে করে না তোলে, সেজন্য গোলাপসুন্দরী খুবই সতর্ক। মেজকর্তা গম্ভীর স্বরেই দূর থেকে ছেলেকে বলেন, "হাটের সময় মনে করো, দেওয়ানজীকে বলে দেবো।"

বিভু খুশী হ'য়ে বই পত্র গোছাতে থাকে। বিকেল বেলা বাবা যখন ঘরে আসে—বিভুও ছুটি পায়। বইপত্র রেখে সে খেলার সাথীদের সংগে যেয়ে ভীড় করে। বিভুকে পাড়ার সকলেই ভালবাসে। মায়ের সারা জীবনের অবলম্বন বলেও বটে—তাছাড়া ছেলেটি সত্যিই যেন এ বংশের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। বিভু চলে গেলে গোলাপসুন্দরী উঠে পড়ে। এই সময়টা মেজকর্তা একটু মোদক খান। মাসে দু'বার করে কলকাতা থেকে পার্সেলে মোদক আসে। গোলাপসুন্দরী নিজেই স্বামীকে পরিমাণ মত বের করে দেয়। এক গ্লাস জল আর একটা প্লেটে মোদক রেখে গোলাপসুন্দরী রান্না ঘরে যায়। মোদক সেবনের পর একটু দুধ না হলে মেজকর্তার চলেনা। দুধে সরে ঘনকরে জ্বাল দেওয়া একবাটী দুধ গোলাপসুন্দরী স্বামীর কাছে এনে হাজির করে। দুজনের কথাবার্তা বেশী হয় না। এমনিভাবে এই স্বামীকে নিয়ে গোলাপসুন্দরী দশ বারো বছর ঘর করছে।

শুধু গোলাপ সুন্দরীই নয়, বাংলা দেশের কত মেয়েরাই এমনিভাবে নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নেয়, তার খবর বা কজন রাখে। কোন প্রতিবাদ নেই, নালিশ নেই কারো বিরুদ্ধে—বাংলার কত ঘরে ঘরে এমনি করে সহনশীলতার প্রতিমূর্তিরূপে কত অসহায় নারীর তপ্ত অশ্রু যে জমাট বেঁধে রয়েছে, ক'জনকেই বা তা উতলা করে তোলে! বিভুর পূর্বে গোলাপসুন্দরীর একটী মেয়ে

পরভৃতিকায় শ্রীমতী সরযূবালা

হয়ে মারা যায়। বিভুর পর আর কোন ছেলেমেয়ে হয়নি—হবার সম্ভাবনাও নাকি নেই। মেজকর্তা দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে এধার ওধার কি যেন খুঁজতে থাকেন। অন্যদিন হাতের সামনে যদি পান ভরতি পানের ডিবেটা না থাকে—লাফিয়ে ঝাপিয়ে চীৎকার করে বাড়ী ফাটিয়ে ফেলেন। স্ত্রীর মুণ্ডপাত করে বলতে থাকেন, "খোদার খাসীর মত খাব খাব গিলবে—অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—দূর করে দেবো বাড়ী থেকে।"

আজ চীৎকার না করে স্বাভাবিক গম্ভীর গলায়ই মেজকর্তা বল্লেন, "পান, পান কৈ? পান রাখোনি?" গোলাপসুন্দরী তাড়াতাড়ি দু'টো পান বানিয়ে বোটায় করে চুন নিয়ে স্বামীর সামনে রাখতে যায়—মেজকর্তা গোলাপসুন্দরীর হাত থেকেই পান দু'টো নিয়ে নেন। গোলাপসুন্দরী স্বামীর আজকের ব্যবহারে তাজ্জবই বনে যায়। কোনদিনই গোলাপসুন্দরীর হাত থেকে মেজকর্তা পান নেন না। যদি ভুলক্রমে কোনদিন গোলাপসুন্দরী হাতে করে পান নিয়ে মেজকর্তার সামনে ধরেছে—মেজকর্তা তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠেছেন, "রাখবার কী জায়গা নেই।" গোলাপসুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে উঠেছে। তাই, আজকে স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারে

গোলাপসুন্দরীর কিছুটা আশ্চর্য হবার কারণ আছে বৈ কী!

জমিদারের কাছারী বলতে যা বোঝায়—মেজকর্তাদের কাছারীটা সে জাতের নয়। একখানি চারচালা ছোনের ঘর খালডাঙ্গার বিলের পূবপার ঘেসে উঠেছে। তিন দিক তার হোগলার বেরায় ঘেরা। পূব দিক খোলা। ভিত্তিটা সামনের চটান যায়গার সাথে মিশ খেয়ে গেছে। মেঝেটা এবড়ো খেবড়ো। একপাশে ছোট একটা খাটে মাদুর পাতা—দু'টো তাকিয়া। পৌঢ় বয়সের এক দেওয়ান ওরই পর বসে সব সময়ই প্রায় খাতালেখায় ব্যস্ত থাকে। কাছে ছোট একটা হাত বাক্স। দেওয়ানের নাম বড় কেউ জানেনা। সকলেই দেওয়ানজী বলে ডাকে। জনদুই তহশীলদারও আছে। তাছাড়া দেওয়ানজীকেও খাজানা আদায় করবার জন্য বেরোতে হয়। খাটের পাশে খুটীতে ঠ্যাস দেওয়া হাতল শূন্য একখানি চেয়ার। মেজকর্তা যখন ঘরে বসেন—এই চেয়ারেই বসেন। অবশ্য কাছারী ঘরে বড় কেউ বসে না। সামনের চটান জায়গাটা ছোট ছোট দুর্বায় ঢাকা। যখন ছায়া পড়ে এই চটান যায়গাতেই দরবার বসে। ছোট ছোট টুল—কী পিড়ি—এর চেয়ে অন্য কোন আসন নেই—মাটির আসনেও কারো কারো চলে যায়। মেজকর্তারও এসব বিষয়ে কোন বালাই নেই। এ ব্যাপারে তিনি একজন পুরোদস্তুর সাম্যবাদী। টুলটাই টেনে বসে যান সকলের মাঝে। অবশ্য মেজকর্তাদের
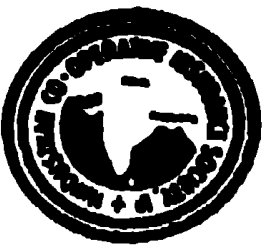
বাড়ীটার সংগে কাছারী ঘরের বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। বাড়ীতে তিন পোতায় বড় বড় তিনখানা ছোনের ঘর। প্রত্যেক খান্যরই ভিত্তি দুহাত করে উচু। পুব পোতায় সবে মাত্র বড় দেখে একখানি টিনের ঘর উঠেছে। ঘর খানির ভিতর তিনটি খোপ। একটায় মেজকত্তা থাকেন—আর একটায় থাকেন তার বিধবা মা। মায়ের ঘরেই লোহার সিন্দুকটা—টাকাকড়ি এবং দলিল পত্র এই সিন্দুকেই থাকে। আর একটা খোপ বাইরের দিকে। সাধারণতঃ এই ঘরে মেজকত্তার মজলিস জমে।

মেজকত্তা কাছারীতে আসতেই অখিলদ্দি শেখ—গগন মিঞা, ছকু, মদন এক সংগে 'আদাপ' করে। রবি মণ্ডল, জীবন কপালিক গড় হয়ে প্রণাম করে পদধূলি জীবে দেয়। এরা কেউ এসেছে খাজানা দিতে—কেউ বা কোন জমিতে পাট বা ধান বুনেছে তারই ফিরিস্তি দিতে।

এদের সংগে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হ'যে যায়। মশার গুণগুণানি আরম্ভ হয়—ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জলে ওঠে। পুরোন চাকর নকুলচন্দ্র দেওয়ানজীর কাছে কাছারী ঘরে একটা পুরোন হারিকেন রেখে যায়। মেজকত্তা সকলে যাবার পর উঠোনেই বসে থাকেন। মোহন মাঝি আসে। অবনী সমাদ্দার এসে হাজির হয়—মেজকত্তার আরও দু'চারজন সাকরেত আসে। এবার মেজকত্তা উঠে পড়েন। অবনী সমাদ্দার, মোহন মাঝি প্রভৃতিও তার পিছু নেয়। বড় টিনের ঘর খানিতে মেজকত্তার আড্ডা খানায় যেয়ে হাজির হয় সব। দু'খানা খাট এক সংগে জোড়া দিয়ে ফরাস পাতা হ'য়েছে। ফরাসের ওপর কয়েকটা তাকিয়া। এক ধারে হারমোনিয়ামের বাক্স—রজনীকান্ত সেনের একখানি গানের বই—করতাল একজোড়া—বায়া তবলা—কাঠের খুঁটিতে খোলও একখানা ঝুলানো রয়েছে। মেজকত্তা, অবনী সমাদ্দার এরা ফরাসে বসলেন। কারো মুখে বড় একটা কথা নেই। দৈনন্দিন কাজের তালিকা সকলেরই জানা আছে। সকলেই তালিকানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। মোহন মাঝি এক পাশ থেকে একটা থলে বের করে তার কাজ নিয়ে মেতে পরে যায়। লম্বা ধরণের একটা কলকে বের করে তামাক সাজতে সাজতে বলে, "মাইজাকত্তা কাইলই তাজা যাইতে অবে।"—

কেন, কী জন্য তার জবাবদিহি না করে মেজকত্তা উত্তর দেন, "ভোর থাকতে উঠে চলে যাবি। টাকা আজ নিয়ে রাখিস—"

কিছুক্ষণ চুপ চাপ কাটে। মেজকত্তা আর বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন না। মোহনকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন, "কৈ রে, তাড়তাড়ি কর।"

মোহন উত্তর দেয়, "ধরবে ত!"

কলকে সাজা হ'য়ে গেলে অবনী ঠাকুরের হাতে দেয়। অবনী ঠাকুর মেজকত্তাব চেয়ে জোয়ান। তাছাড়া তার মত দম আর কেউ দিতে পারে না। এক দমে এক কলকে শেষ করে অবনী ঠাকুর রেকর্ড করেছে। অবনী ঠাকুর বেশ ধুঁয়ো ছেড়ে চোখ মুখ লাল করে মেজকত্তার দিকে কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও ভাইপো, খাও, মোনছা আজ সাজছে ভাল। সাবাস ব্যাটা।"

মেজকত্তা এবার কলকে ধরেন। প্রথমে একটু একটু করে ধুঁয়ো ছাড়েন ফক ফক করে—তারপর দম দিয়ে টান মারেন। দু'তিনবার দম কশবার পর কলকেটা অন্যের হাতে এগিয়ে দিয়ে তয়কা ঠ্যাস দিয়ে চুপ করে ভোম ভোলানাথের মত কিছুক্ষণ বসে থাকেন।

মোহন পেসাদ গ্রহণ করে খোল নামিয়ে কীর্ত্তন আসরের যোগাড় করে। সারাদিনের পর একটু হরিনাম না করলে পাপক্ষয় কী করে হবে! মেজকত্তার গলাটা একটু ভাঙা। গলার দিক দিয়ে অবশ্য অবনী ঠাকুরের তুলনা হয় না। অবনী ঠাকুরের চেহারাটাও সুন্দর। টানা টানা ভাবালু চোখ নিয়ে যখন সে নিমাই সন্ন্যাসে নিমাই সাজে—সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। মেজকত্তা দলকর্তা, তাই বৈঠকী আসরে তিনিই মূল গায়ক। মেজকত্তা খোলে দুটো চাটী মেরে পদ ধরেন—"সখী কী কহব তোরে"।

অবনী ঠাকুর ও মোহন মাঝি দোহার গাইতে থাকে। খোল করতালের আওয়াজের সংগে সংগে এদের গলা নিস্তব্ধ পল্লীর বুক কাঁপিয়ে ভেসে ছুটে চলে। (চলবে)

কথা কাণ্ড

(চিত্র কাহিনী)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

★

নটবর মুখুয্যে দাঁতমুখ খিচিয়ে ওঠে, "ভাত লিবিত এত ঠসক কেন ?"

সরাইএর আড়ালে দাঁড়িয়ে কামিন পটল কানাউচু গয়েশ্বরীটা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! মেজবৌ ভাত দিয়ে চলেছে! পটল বলে ওঠে: "দুজনকারই ভাত দিও বৌ, 'উ' শুদ্ধ আজ আমার ওখানেই খাবেক বি!"

"উ কে রে?"

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেজ বৌ! পটল লজ্জায় কেমন যেন একটু রাঙ্গা হয়ে যায়। বলে ওঠে—"জানিনা, তুমাদের বাগাল গো—"

হেসে ফেলে মেজ বৌ। —কিছুদিন হতেই লক্ষ্য করেছে মেজবৌ, ছোড়াটা প্রায়ই পটলের ওখানে ভাত খায়, তাছাড়া বাড়ীতেও তাদের মধ্যে কেমন যেন একটু বিশেষ ভাব ফুটে ওঠে! মেয়েদের নজর এড়ায় না সেটা! এনিয়ে বাড়ীর মেয়েরা যে পটলকে কিছু বলেনি তানয়! হাসে পটল সলজ্জ মলিন হাসি।

আজ তিনবছর হ'ল পটলের দিন কেটেছে একা! আগেকার স্বামীকে মনে পড়ে! কিন্তু বিশেষ কোন ছায়াপাত করতে সে পারেনি তার জীবনে! প্রৌঢ় রামচরণের দেন কেটেছিল জুতোর সেলাই আর ভাগাড় জমা নিয়েই! সামনে উন্নত যৌবনা পটলের স্বপ্ন রঙ্গীন দিনের কোন অসতর্ক মুহূর্তও তার মনের সম্পদে ভরে ওঠেনি!

বুড়োর মৃত্যুর পর হতেই পটল একা বাড়ীতে বাস করছে! গতর খাটিয়ে খায় আর ভিটি আগলে রয়েছে! সারা দেহের কিনারে কিনারে যৌবনের জোয়ার। কারা এল—গেল, কিনারায় জলের ধারায় তাদের দাগ সব মুছে গেল! লোকে হাসে, সারা মুচি পাড়ায় তার কাহিনীর অতিরঞ্জন! কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে কোন সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনায়, সাজায় কড়িবাঁধা বামুনের হুকো—হুকোও আলাদা করে রাখা হত! সারা শরীরের নিভৃত স্বপ্নপুরীর প্রাঙ্গনে কত পরিচিত অপরিচিতের আনা-গোনায় পদচিহ্ন! সবনিয়েও আজ পটল কেমন যেন বদলে গেছে। লোকে হাসে! অতিথিরা ফিরে যায়! যাক—তবুও বেশ ভাল লাগে এজীবন! পটল যেন স্বপ্ন দেখে!

ভাতের থালা আগলে বসে থাকবে কতক্ষণ! বাইরের বাঁশবনের মাথায় রোদ হলদে হয়ে যায়! দুপুর গড়িয়ে গেছে, ঘরের আগুড়টা টেনে দিয়ে বার হয়ে আসে পটল! একা আগে খেয়ে নিতে ও পারে না—কেমন যেন বাধে!

মাঠের গরুর পাল ঘুরে আসছে গাঁয়ের পানে! সকাল বেলায় গাঁয়ের বাইরের ডাঙ্গা হতে সুরু হয় তাদের পরিক্রমা, —দূর দূরান্তরের মাঠ, বনের ধার—রঙ্গিলা ঘোড়ের ঘন ছায়াচ্ছন্ন অর্জুন বনের মধ্যদিয়ে! পড়ন্ত বেলায় ক্রমোন্নত চড়াই—শুকনো বন্ধুর মাঠের প্রহরা ভেঙে ক্লান্ত পদবিক্ষেপে আবার তারা ফিরে আসে! দিনান্তের চিহ্ন পায়ে পায়ে এঁকে এল মাঠের বুকে! পাল ছেড়ে কোন রকমে বার হয়ে আসে গায়ের দিকে।

স্নান করে উঠবার আগেই পটল হাজির হয়েছে পুকুর ঘাটে। ব্যাং স্নান করে আসছে! চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলে ব্যাং: "তুই খেয়ে নিলেই পারতিস ?"

"চ' তাই" এগিয়ে চলে ব্যাং পটলের সংগে।

পাতের পানে চেয়েই অবাক হয়ে যায় :—"ইকিরে ?"

সমস্ত ভাত তরকারী এক জায়গায় চাপান! পটল বলে ওঠে, "তুমিই খেয়ে নাও, বাকী আমি খাব!" ব্যাং একটু আশ্চর্যই হয়ে যায়!

ওদিকে ব্যাং এর মা ছেলের পথ চেয়ে বসে থাকে!... বেলা পড়ে যায়। ব্যাঙ এর ছোট ভাই গিয়েছিল পাল হতে দাদাকে ডাকতে! মাথার গোবরের ঝুড়িটা নামিয়ে বলে ওঠে: "দাদার পেট দুখুছে গো, তু খেয়ে ফেলা 'উ' খাবেক নাই।"

মায়ের মন মানেনা! কে জানে হয়ত বা সত্যেই শরীর খারাপ ছেলের!

মুচি পাড়ার লোকদের কৃষাণ জনমজুরী ছাড়া চামড়ার কাজ আরও একটা ব্যবসা আছে! গৌরমুচীর অবস্থা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু ভাল! আর

সাতাশখান গাঁয়ের মুচীসমাজের সমাজপতি। চলতি কথায় বলে সাতাশী! এহেন গৌরের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে ব্যাপারটা!

সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে গ্রামপ্রান্তকে! প্রদীপের আলোয় বসেছে তাদের মহড়া। নোতুন ব্যাগপাইপের দল! এ অঞ্চলের মধ্যে বেশ নাম কিনেছে! গৌর নিজে পাখোয়াজ যা বাজায় সত্যিই শোনবার মত! কতবার বিষ্টুপুরে বাজাতে গিয়ে বড় বড় অনেক ওস্তাদের প্রশংসা তাকে ছেয়ে ফেলেছে, মাথা নামিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফিরেছে গৌর!

ভীমপলশ্রীর নোতুন একটা গৎ তুলছে! বার কয়েক দেখাতেই অনেকে পেরেছে, সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় সকলে ব্যাং এর হাত দেখে! এমনি প্রথম থেকেই বাশের বাঁশীতে তার হাত ছিল এঅঞ্চলের মধ্যে মিষ্টি! কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লারিয়োনেট যা বাজায় সত্যিই যেন কান্নার সুর উপচে পড়ে ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে! গৌর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে!

রাত্রি কত হয়ে গেছে জানেনা! কেউই থামতে চায়না। সকলকেই যেন কি এক নেশায় পেয়ে বসেছে! ম্লান জোৎস্নার আলোয় ছেয়ে গেছে পাড়ার মাঠটা! বেনু বনসীমায় ঘোলাটে আকাশ হতে ঠিকরে পড়ে তারার ম্লানজ্যোতি!

পটলের ঘুম আসে না! এমনি করে কত বিনিদ্র রজনী আসবে যাবে তার জীবনে, কে জানে! বাইরে কিসের শব্দ! দু'একজন আজও মায়াকাটাতে পারেনি! হয়ত আসবার চেষ্টা করে। এগিয়ে আসে শব্দটা! সারা মন বিষিয়ে ওঠে পটলের—ওদের কথা মনে করলে! নিঃশেষে তোমাকে পাপের পথে টেনে নাবাবে, কিন্তু সামান্য সহানুভূতির প্রত্যাশা করাও তোমার পাপ! এতদিন সে অন্ধ হয়ে ওই নর পশুদের পাশব প্রবৃত্তিতে সায় দিয়ে এসেছিল কিসের মোহে?

নিজের উপরই নিজের ঘৃণা আসে! আজ কি তাদেরই কেউ আবার আসছে তার দেহযমুনায় বিলাসের তরী ভাসাতে! না—না, কিছুতেই না! এর প্রতিকার সে করবেই। নিজের কুঁড়োতেও কি তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে না! সমস্ত শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, গাছ কোমর করে হাতে 'দা' খানা নিয়ে তৈরী হয়ে নেয়! দেখিয়ে দেবে পটল ওই পশু দিকে সেও প্রতিবাদ করতে জানে!

নিঃশব্দে পদসঞ্চারে আগুড়টার কাছে এগিয়ে এসে খুলে ফেলতেই অবাক হয়ে যায় ব্যাং! এক লাফে পিছনে সরে দাঁড়ায়—"ইকি? শ্যাষ করেই ফেলাবি নাকি?"

পটলও অপ্রস্তুত হয়ে যায়—এভাবে ধরাপড়ে গিয়ে হাতের দা খানা ছুড়ে ফেলে দেয় ঘরের মধ্যে! হাসতে থাকে—"কে জানে রাত বিরেতে চোর ছ্যাঁচড়ওত হতে পারে" হাসে ব্যাঙ।

শেষ পর্যন্ত ঘরের আগুড়টা বার হতে টেনে দিয়ে দুজনে এগিয়ে যায় পাড়ার বাইরের মাঠ পানে। নিস্তব্ধ ধুসর তারাকিনী আকাশ কোলে ভেসে আসে বন হতে মহুয়া ফুলের মাতাল হাওয়া! বসন্তের আবেশমাখা রাতের কুহেলীর মাঝে যেন মিলিয়ে গেল ওরা দুজনে! রাতের অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে ওদের গানের একটা সুর।

গৌরের মনে সত্যই কেমনে যেন একটু সন্দেহের ছায়া পড়ে ব্যাংএর বিষয়ে। কে জানে হয়ত সত্যই হবে! রাত্রেও তাকে বাড়ীতে দেখতে পায় না! আখড়া হতে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন সে বার হয়ে গেছে কেউ জানে না!

ক্রমশঃ পাড়াতে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে, পটলের সম্বন্ধে বদনাম নিত্য নৈমত্তিক! কিন্তু এটা আরও একজনকে জড়িয়ে সে ব্যাঙ! তাদেরই সাতাশী মোড়লের ছেলেকে নিয়ে! হাবু একমনে একটা আস্ত খালের উপর র‍্যাঁদা বুলিয়ে লোমচুলো তুলছিল বহুদিন হতে। বার বারই চেষ্টা করেছিল পটলের পিছনে, কিন্তু নাজেহালই হয়েছে! আজও তাই আক্রোশ যায় নি! বলে ওঠে "কই দেখি বাবা, সাতাশী কি করে! আগুনটি লাগবিত লাগ, একেবারে চালের মড়কচায়, দেখে লুব এইবার!"

পাড়ার মেয়েদের মধ্যেও চলেছে এই জটলা, ছিনেলী মাগীকে সাতাশী মোড়ল কি করে!

এগিয়ে আসছে পূজার দিন গুলো! বর্ষার ফাঁকে

ফাঁকে কেবল পটল এই কথাটাই অনুভব করেছে জীবনের শেষ সমাপ্তির পথেও কামনার পরিসমাপ্তি হয় না।

কালো মেঘের আকাশ ছোঁওয়া মাতাল হাওয়ার স্পর্শের উন্মাদনায় সারামন যেন হাহাকার করে ওঠে! তালবনের কালো চিরলতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে হাতছানি দেওয়া আকাশ হামাগুড়ি মেরে নেমে গেছে পুরুলিয়ার মহুয়াবনের সজল পত্রপুটের করতাল! গ্রামসীমার ওদিক থেকে গরু পালগুলো বর্ষার জলে নধর দেহনিয়ে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চলেছে! একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পটল! কানে আসে সজল আবহাওয়ায় ভেকদম্পতীর ডাক ভেদ করে করে বাঁশীর সুর। গরুগুলো সবুজ হারাহারা ঘাসে মুখ লাগিয়ে চলেছে তৃপ্তি ভরে।

তাগাদ দেয় মুখুয্যে! ছাতি মাথায় ভিজে আলের উপর বসে লক্ষ্য করছিল পটলের উসখুস ভাব! বীজ টানতে টানতে থেমে যায়, সকলেই বার দুয়েক বীজ টেনেছে,—আরও মাত্র গণ্ডাকয়েক।

তাগাদা দেয় মুখুয্যে—"মর মাগী, কাঁড়া গতরই আছে, কাজের বেলায় লবডঙ্কা!"

দেখতে দেখতে জলখাবার বেলা হয়ে যায়, গরুপালও ঘুরে গেছে বোড়ের দিকে। সজল আকাশের জলধারা নবাঙ্কুর ইক্ষুবনশীর্ষে ঝরে পড়ে। গৌর আরও সকলেই অবাক হয়ে যায়! মুখুয্যেও বলে ওঠে—"মুড়ি লিয়ে যেছিশ কোথা?"

পেছন ফিরে লাস্যভরে জবাব দেয় পটল—"এতগুলো-মরদের চোখের উপর ঢব ঢব করে গেরাস তুলতে আমি লারব!"

এগিয়ে চলে নদীর দিকে!

পটলকে আসতে দেখে ব্যাং একটু আশ্চর্যই হয়ে যায়! "ওকি!"

"বারে! একাই খাব নাকি?" বাধ্য হয়ে ব্যাংকেও বসতে হয় মুড়ির জামবাটির পাশে! গরুগুলো চলেছে নামোসোলের প্রান্তরের দিকে! বোড়ের জলের ধারে নলখাগড়ার ধানের মাঝে গরুগুলো নেমে পড়েছে।

রাত্রি নেমে এসেছে! সারাদিন খাটুনির পর সারাদেহ লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। হঠাৎ কাদের চীৎকারে সারা-পাড়াটা মুখরিত হয়ে যায়! সকলেই প্রায় উঠে পড়েছে!

এমন ব্যাপার প্রায়ই হয় এদের পাড়ায়! তবুও আজ পটল কেন যে এমন ব্যাপারটা করে বসল কেউ ঠাওর করতে পাবে না! হাবুকে নিজের ঘরের মধ্যে পুরে রেখে বাইরে হতে শিকল তুলে দিয়েছে! দা দিয়ে কেটেই ফেলত, কিন্তু নেহাৎ দয়া করেই তা করেনি! অনেকে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়, এ জীবনে ত পটল অভ্যস্ত, তার আজ এ প্রহসন কেন?

হাবুও রাগে ফুলতে থাকে। পাড়ার সমবেত জনতার সামনে নেহাত অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে! এ অন্যায়ের শাস্তি হওয়া দরকার।

হাবু বাধা দেয়—"আমার দণ্ড হবার আগে, তাহলে ব্যাংএর দণ্ড হোক, সাতাশীর ছেলে বলে নাকি ও রেহাই পাবেক?"

সমবেত জনতার মাঝে ওঠে একটা চাপা গুঞ্জন! হাবুও তাকবুঝে বার বার সদর্পে এই কথাটাই জানাতে থাকে! গৌরও কেমন যেন বদলে যায়।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে আরও আশে পাশের গাঁয়ে! হাবু যেন একটা পথ পেয়ে গেছে। তার দণ্ড নেবার আগ্রহটা বেশী, অবশ্য সেই সংগে ব্যাংএর বিচারও হওয়া দরকার।

এতদিন পর গৌর নিজের ভুল বুঝতে পারে। যেদিনই শুনেছিল ব্যাংএর সম্বন্ধে এই সব কথা, তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল! আজ অনেকদূরে এগিয়ে গেছে তাছাড়া ব্যাংও নেহাৎ ছেলে মানুষ নয়! তবুও বোঝাবার চেষ্টা করে! মাও বলে চলে, আসছে অগ্রহায়ণে ধান উঠলেই তার বিয়ে দোব! ও পটলীর সংগে মিশে কি হবে! তাছাড়া মেয়ে হিসাবে পটল এমন আর কি?

কতক শোনে ব্যাং, কতকবা অবচেতন মনের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যায় কোন শূন্য পথে!

রাত্রি কত জানে না! পটলের চোখে ঘুম নাই! সে জানে আজকের এই গোলমালের পরিণাম কি হবে!

বিচারে সে সমাজে ঠাঁই পাবে না! হয়ত বা ব্যাংকেও হারাতে হবে তাকে।

রাতের চাঁদ ঢলে পড়েছে আকাশ প্রান্তে! ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস পটলের মাথায় দপদপানি থামাতে পারে না। এত দিন সে দুহাতে কুড়িয়ে ছড়িয়ে এসেছিল! নিজের দিকে চাইতেও কেমন যেন শূন্য বোধ হয়। জীবনের শেষ রিক্ততার সম্বল মনের সমস্ত ঐশ্বর্যকে সে হারাতে পারে না! সেও বাঁচতে চায়, সেও নীড় বাঁধতে চায়। তার ছোট্ট সংসারও ফুলে ফলে ভরে তুলতে চায়।

এখানে না হোক, অন্য কোথাও সে নীড় বাঁধবে, যেখানে সমাজ নেই, সংসার নেই! পোড়ামাটির মায়া সে কাটাবেই। মাদার ফুলের তীব্র সুবাস ভারি করে তোলে আবহাওয়াকে। ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে।

দাওয়ায় একখানা মলিন চাটাইএর উপর এপাশ ওপাশ করে চলেছে ব্যাং।

তার মনেও চিন্তার ওঠানামা। হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে ফিরে চাইল, একি! পটল।

আজ পটল যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বার বার এই কথাটাই বোঝাতে চায়, এখান হতে তারা চলে যাবে দূরে। বহুদূরে! তারা ঘর বাঁধবে, ব্যাংকে হারাতে পারবে না। ব্যাংও কঠিনভাবে জানিয়ে দেয় তার মতবাদ! সেও তাই করবে, তবে আজই গাঁ ছেড়ে যাবে না! যদি দবকাব হয় নিশ্চয়ই যাবে তারা। গনগনে রাতে সে বলছে—সত্যি কথাই বলছে। পটল চেয়ে থাকে তার দিকে, তার মৌনমুখ আঁখিতারায় ফুটে যেন হয় অন্তরের নিস্বতার মিনতি!

পাঁচখানা গায়ের মুচি আর নমঃশূদ্ররা সমবেত হয়েছে গ্রামের আটচালায়! গ্রামের ব্রাহ্মণ-শূদ্র অনেক মাতব্বরই জমা হয়েছে, তাদের সামনে চলেছে বিচার, পটল ওপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে! হাবু উত্তেজিত ভাবে বলে চলেছে,— গৌর ব্যাংকে কাছেই রেখেছে, তবুও কেমন যেন আন্মনা হয়ে ওঠে সে!

গৌর সমাজে পাঁচ টাকার মদ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার ছেলের! আর হাবুর দণ্ড হল তিরিশ টাকা! সেই সংগে গৌর ও স্বীকার করে—ভবিষ্যতে ব্যাংকে মিশতে দেবেনা ওই পটলের সংগে! পটলী আজ হতে সমাজের বাইরে।

কথাগুলো সবই শোনে পটল। সারা মনটা হাহাকার করে ওঠে। সে কি মানুষ নয়? মানুষের সমাজে কী তার কোন দাবীই নাই! না থাক! চায়না সে এদের সমাজ, এদের মাঝে বাঁচতে। দুচোখ ফেটে জল বার হয়ে আসে! আচল দিয়ে মুছতে মুছতে বার হয়ে যায় সে নির্বাসিতার মত, ব্যাং এতক্ষণ নীরবে বসে ছিল, হঠাৎ সেও উঠে পড়ে। গৌর হাত ধরে টেনে বসাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সভার মধ্যেই জানিয়ে দেয় ব্যাং—

"পটলকে সাঙ্গা করতে রাজী আছে।"

হাসির শব্দে ভরে ওঠে জায়গাটা। এক লাদ গোবর কে যেন গৌর সাতাশীর মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। সে সামলাতে পারেনা নিজেকে, সজোরে ছেলের গালেই বসিয়ে দেয় পাঁচ আঙুলের একটা চড়! হতভাগা কোথাকার, আজ পাঁচখানা গায়ের সামনে তার উঁচু মাথা নীচু করে দিলে!

চীৎকার করে ওঠে গৌর—"ভগবানেব দিব্যি! ও ছেলে আজ হতে আমাব কেউ নয়, শত্তুর, শত্তুর, উব সংগে আমাব কুন সোম্বন্ধ নাই। ভগবানের দিব্যি করে বলছি— উ আমার ঘরের বাব!"

সকলেই অবাক হয়ে যায়, গৌরের চোখ ফুটে ওঠে অশ্রুরেখা। আজ একি করে বসল সে। তবু—তবুও তার সম্মান সে রেখেছে। নিজের জাতের কাজে—তার উঁচু মাথা নীচু করেনি! হোক পর ওই ব্যাং—তবু তার কোন দুঃখ নাই।

ব্যাংকে বার করে দিয়েছে সমাজ হতে! পাড়ার বাইরে মুখুয্যেদের পুকুর পাড়ে বাঁশ ঘড় দিয়ে কোনরকমে তারা একখানা ঘর তুলে বাসা বেঁধেছে দুজনে। আজ ব্যাং অনুভব করে মনের নিঃস্বতা যেন কোন কিছুতেই সে ঢাকতে পারে না।

কয়েকদিন হতে শরতের আমেজ আসবার সাথে সাথেই মনটা যেন হাহাকার করে ওঠে! কাজল কালো জলের

রূপ-মঞ্চ
সপ্তম বর্ষ :: প্রথম সংখ্যা
১৩৫৪

অ নি তা ম জু ম দা র

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বোসার্ট প্রডাকসন্সের আগামী বাংলা চিত্র 'প্রিয়তমায়' এঁকে দেখা যাবে। ইনি চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের স্ত্রী।

বাঁ দিকে ঃ নবাগত গৌর রায় চৌধুরী ঃ পূর্ববঙ্গের একটী বিশিষ্ট জমিদার পরিবার থেকে আগত এই নবাগত অভিনেতাটীর সংগে ইতিপূর্বেই চিত্রে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে, আগামী বহু চিত্রে এঁকে দেখা যাবে। ইনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ডান দিকে উপরে ঃ নার্স সিসি চিত্রে জনপ্রিয় ছবি বিশ্বাস। নীচে ঃ বলাই মুখোপাধ্যায়। দুঃখীর ইমান নাটকে পুলিশের ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইনি ই, আই, রেলওয়ের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের পরিচালক এবং ই, আই, রেলওয়ের একজন কর্মী।

ঘুকে হেলা ঘাঁটিশালুকের অমলিন হাসি:। সন্ধ্যার অন্ধকারে সারা পৃথিবী মিলিয়ে গেল আবছা অন্ধকারে ! নীরবে বসে থাকে ব্যাং ! দূর মাঠের ওপারে। অস্পষ্ট অন্ধকার জলে উঠে—কোন দূরদূরান্তরের গ্রামের ভীরু সন্ধ্যাদীপশিখা ! নিজেদের পাড়া হ'তে ভেসে আসছে ব্যাগপাইরের শব্দ, বোধ হয় জৌনপুরী রাগিনীই আলাপ করছে ! সারাটা মন যেন হাহাকার করে ওঠে, এমনি দিন তারও ছিল—প্রতিটি সন্ধ্যা ভরে উঠত সাফল্যের সুরে সুরে !

আপনাহতেই কিসের টানে উঠে পড়ে চলতে সুরু করেছিল জানেনা। হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে নিজেকে মুচিপাড়ার কাছে এসে ! সুরটা তখনও কানে আসছে—এগিয়ে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মত।

আখড়াঘরেব সামনে তাকে আসতে দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যায়। বাজনাটা থেমে গেছে। বাবা বাজাচ্ছিল ক্লারিয়োনেট ! সকলেই থেমে যায়। উঠতে যাবে দাওয়ায় ব্যাং, —সশব্দে গৌর দরজাটা তার মুখের উপর বন্ধ করে দেয়।

ব্যাং এর স্বপ্ন যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ! ধীরে ধীরে পাড়া হতে বার হয়ে আসতে থাকে ! প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সে !

পটল সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিবে অবাক হ'য়ে যায়। ব্যাং নাই ! আপনমনে রান্নার যোগাড় করতে থাকে, ব্যাংকে ফিরতে দেখে উঠে আসে— "কুথা গিইছিলা !"

কথা কয়না ব্যাং। স্বপ্নাবিষ্টের মত বাঁশীটা পেড়ে নিয়েই বাব হয়ে যায় অন্ধকারে। পটল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে !

রাত্রি কত হয়েছে জানেনা ! আকাশের স্তব্ধ তারার মিনতি গুমরে ফেরে। অজানা শিহরণে বেণুবন ওঠে শিউরে, সারা মনের দুঃখ আবিলতা ব্যর্থতা আজ সুর পায় কান্নার ভাষায়।

পাড়ার অনেকেই কান পেতে শোনে ! হ্যা—বাঁশীর সুর বটে ! ব্যাং বাজিয়ে চলেছে ! নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে মায়াজাল বিস্তার করে কোন সুরের যাদুকরী ! পটল নীরবে এগিয়ে যায়, তার ধ্যান ভাঙ্গার সাহস হয় না, কোন রকমে কাছে গিয়ে পিঠে হাত দিতেই চমকে ওঠে ব্যাং !

একি ! আশ্চর্য হয়ে যায় পটল, ব্যাংএর দুচোখে জলের ধারা ! সে কাঁদছে !

মুখুয্যেমশায় সদর্পে চীৎকার করে চলেছেন, এমন অপদার্থ দিয়ে আর কাজ চলে না, তাছাড়া বয়সে বড় একটা মেয়েকে ঘর থেকে বার হয়ে এসে সাজা করেছে, এমন লোককে ঘরে রাখা ঠিক নয়, আর কাজ ! কাজ করে ঘোড়ার ডিম ! গরু ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে, না হয় আপন মনে কি ভাববে, নয়ত বা বাঁশী বাজাবে ! তারপর গরু গিয়ে লাগবিত লাগ কারুর ক্ষেতের ফসলে ! খোঁয়াড়ে রোজই যাবে গরু ! এমন করে কি রাখাল পোষা চলে ! এতদিন সহ্য করেছেন—আর নয়।

মুখুয্যেব সমস্ত কথাগুলোই নীরবে শুনে যায় ব্যাং। প্রতিবাদ করে না। চাকরী ছাড়িয়ে দিলে চলবে কি করে—তাও ভাবতে চায়না। সে যেন এ জগতে নাই ! বলে ওঠে পটল।

"একা লারে—আমিও দেখব ঠাকুর ! রাখাল তুমি ছাড়িয়োনা।"

বাধা দেয় মুখুয্যে—"থাম লষ্টা মাগী কোথাকার, আবার ছিনালীপনা।"

কোন কিছুতেই কাজ হয় না। শেষ অবধি চাকরীটা গেল ব্যাংএর। নীরবে বাড়ীর পথ ধরে সে ! পটল চেয়ে থাকে—একা সংসার চালাবে কি করে !

শরতের সংগে সংগে সারা আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে কোন অজানা দেশের আলোর রেশ ! মুচিপাড়ার ওরা বায়না ধরেছে বিষ্ণুপুরে গোঁসাইদের বাড়ীতে। পুজোর বায়না ! মালপত্র-যন্ত্রপাতি নিয়ে রওনা হচ্ছে তারা ! ব্যাং এব মায়ের মনটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে ! ছেলেটা যেতে চাইত কোন দিন হতে। কত আশাইনা করেছিল ! বড় বড় গুণীলোকের আসরে বাজাবে সে,...হয়ত জীবনে কোন অন্য পথেরই সন্ধান আসবে, কিন্তু ! বৌএর কথায় গৌর চটে ওঠে—"না না ! বলেছিলাম না, কিছুতেই হবেক না। উকে লিয়ে যাব নাই ! উ আমার কেউ লয়,—কেউ লয় !"

গ্রাম থেকে যাচ্ছে ওরা! সকলেরই মনে কত আশা-কত আনন্দ। বিষ্ণুপুরের মত জায়গায় তারা বজাতে চলেছে! উঁচু পুকুর পাড় হতে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ব্যাং! সেও যেত ওদের সংগে,—কিন্তু আজ! কল্পনা করতে পারেনা সে! ওর জীবন কি এমনি করেই ব্যর্থ হয়ে যাবে!

পটলের মন বিষিয়ে ওঠে, কেন মুখুয্যের কথায় প্রতিবাদ করলনা ব্যাং। কেন সে মেনে নিল সব অভিযোগ! রাত্রি হয়ে গেছে—তখনও ফেরেনি ব্যাং! না ফিরুক! কে জানে কোথায় গেছে! হাড়িটা নামিয়েই অবাক হয়ে যায় পটল, এক কণাও চাল নাই! উনুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, কোন কিছুই নাই! হাড়িতে জল চাপিয়ে বার হয়ে যায় শিকল তুলে।

হাবু নোতুন একটা পাখোয়াজ ছেয়ে চলেছে একমনে! হঠাৎ সামনে পটলকে দেখেই একটু আশ্চর্য হয়ে যায়! পটলের পাড়ার আর কারুর কাছে যাবার মুখ নাই। কেউ কিছু দেখেও না—কথাও কয়না! হাবু তাড়াতাড়ি করে উঠে যায় তার কাছে—"ওই মিতেন যি গো—!"

পটল কথাটা বলতে পারেনা পরিষ্কার করে, আমতা আমতা করে! হেসে ওঠে হাবু—"তা বেশ তো, চাল ধার লিবা, ই আর এমন কথা কি রইছে! চল। যিদিন হবেক দিয়ে দেবা—! ইতে লাজ কি রইছে!"

চালের ধামাটা পটলকে তুলতে দেয না। হাবুই এগিয়ে দিয়ে যায় ওদের ঘর অবধি! ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায় তারা দুজনে! ও পাশে উনুনের ধারে চুপ করে বসে রয়েছে ব্যাং! ওদের দিকে একবার মুখ তুলে চায় মাত্র!

ধামাটা নামিয়ে দিয়ে বার হয়ে যায় সে!

রাতে পটল অবাক হযে যায় ব্যাংএর কথায়। সে আজ খাবে না! শরীর ভাল নাই! কারণ বুঝতে পারে পটলও! হাড়িতে জল ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে পটল! তারও নাকি খিদে নাই! নীরবে শুয়ে থাকে দুজনে! রাত বেড়ে যায়!

পুজো এসে গেছে। মহাধুমধাম! গাঁয়ে চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে থিয়েটার! কলকাতা হতে আমদানী হয়েছে ড্রেস—সিন আর নানাকিছু! তোড়জোড় করে চলেছে ফাইনাল রিহার্সেল।

সন্ধ্যার সংগে সারা গ্রামখানা ভরে ওঠে লোকজনের কোলাহলে! বাবুদের বাড়ীর চত্বরটা ছেয়ে গেছে লোকে! কিন্তু থিয়েটার সুরু আর হয় না! সমবেত জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে!

বাবুরা ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন! সবই ঠিক—মায় কলকাতা হতে বাইজীও এসে গেছে! কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল ব্যাপার—ফ্লুট বাজাবার জন্য লোক যার আসবার কথা ছিল সে আর আসেনি! বাইজীও নাচতে নারাজ! কনসার্ট ঝিমিয়ে আসে, এত আয়োজন সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? কিন্তু হয় না,—কে যেন আবিষ্কার করে বসে ব্যাংকে! যেমন করে হোক ধরে আনতেই হবে তাকে!

ব্যাংও তাড়াতাড়ি বসে যায় গানের সুর গুলো তুলতে! সারামনে তার উত্তেজনার আবেগ, শিরায় শিরায় বইছে চঞ্চল রক্তস্রোত! কেমন যেন নেশায় পেয়ে গেছে তাকে!

সিন উঠেছে, অনেকদিনের সঞ্চিত আবেগ যেন ফুটে বের হয় বাঁশীর সুরে! কনসার্ট আবার যেন জমে যায়! সারা বই খানায় প্রাণ ঢেলে বাজায় ব্যাং। বাইজীও আশ্চর্য হয়ে যায়!

সত্যিই এমন প্রাণ ঢালা রাগিনী আলাপ করতে বড় একটা কাউকে দেখেনি!

মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করে বাইজী, লজ্জায় রাঙা হয়ে আসে ব্যাং! কলকাতার কোন গুণী তাকে প্রশংসা করে চলেছে অযাচিতভাবে, সে কল্পনাই করতে পারে না! সে যেন স্বপ্ন দেখছে। অভিনয়ের শেষে চৌধুরীদের মেজবাবু স্বয়ং ব্যাংকে ষ্টেজের উপর এনে পরিয়ে দেন একটা মেডেল! উপস্থিত জনতা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে! ব্যাং—মুচীদের বাংগা কিনা মেডেল পেয়ে গেল, এতবড় এলাহি কারবার হতে!

সকলের চেয়ে খুশী হয় আর একজন, সে পটল! বার বার মেডেলটার দিকে চেয়ে আশা মেটে না! হাঁ—যে

সে লোক নয় ব্যাং তা আজ সে বুঝেছে। ব্যাংও যেন খুসিতে ভেংগে পড়ে—"দেখলি পটল, বলে কিনা এমন বাজনা শিখলি কবে? আবার যেতে হবে পরশুই জগন্নাথপুরের দলে বায়না হয়ে গেছে আমার ওখানকার মেলায় গান হবে, এইবার দেখবি পটল, ভগমান মুখ তুলে চাইলে হয়।"

পটলের হাতে তুলে দেয় কড়কড়ে দুটো টাকা!

হাবু বাড়ী ফিরেই অবাক হয়ে যায়। বাইরে গিয়েছিল কি একটা কাজে, ফিরে দেখে কে যেন ধামাতে করে চাল নামিয়ে রেখে দিয়ে গেছে, বুঝতে দেরী হয় না, এ ঠিক পটলেরই কাজ। ধীরে ধীরে ধামাটা তুলে নিয়ে বার হয়ে গেল।

পটলও একটু হকচকিয়ে যায় হাবুকে এ সময়ে দেখে! চালের ধামাটা নামিয়ে রেখে বলে ওঠে হাবু—"উগুলো কি আবার ফেরৎ দিতে বুলেছিলাম নাকি তুকে!"

—"বারে, ধার নিলে শুধতে হয় না?"

"না, ধার তুকে দিই নি!" চালের ধামাটা নামিয়ে রেখে বার হয়ে যাচ্ছে হাবু।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাবে ব্যাং—ভিতরে হাবুর কণ্ঠস্বর শুনে একটু থমকে দাঁড়ায়। সারা শরীরে দেখা দেয় একটা চাঞ্চল্য! শিরা গুলো যেন দপ দপ করছে উত্তেজনার আবেশে! পাশ কেটে দাঁড়াল ব্যাং! হাবু বার হয়ে গেল!

ঘরের ভিতর ঢুকেই ব্যাং লাথি মেরে চালের ধামাটা ছিটিয়ে দেয় মাটিতে! বাধা দিতে আসে পটল! চীৎকার করে ওঠে ব্যাং!

"—খপরদার, নষ্টামি করতে লাজ লাগেনা, পীড়িত করে আবার চাল দিতে আসা হইচে, ফের যদি কুনদিন উকে ইধারে দেখি, তুর হাড়মাস ফারাক করে দুব, আর ওকেও দেখিয়ে দুব!"

বাধা দেয় পটল! "কি সব বুলছ বুঝতে লারছি?"

"—বুঝতে লারছি? নেকি মাগী কুথাকার, মনে অং ধরেছে! লাজ লাগেনা?"
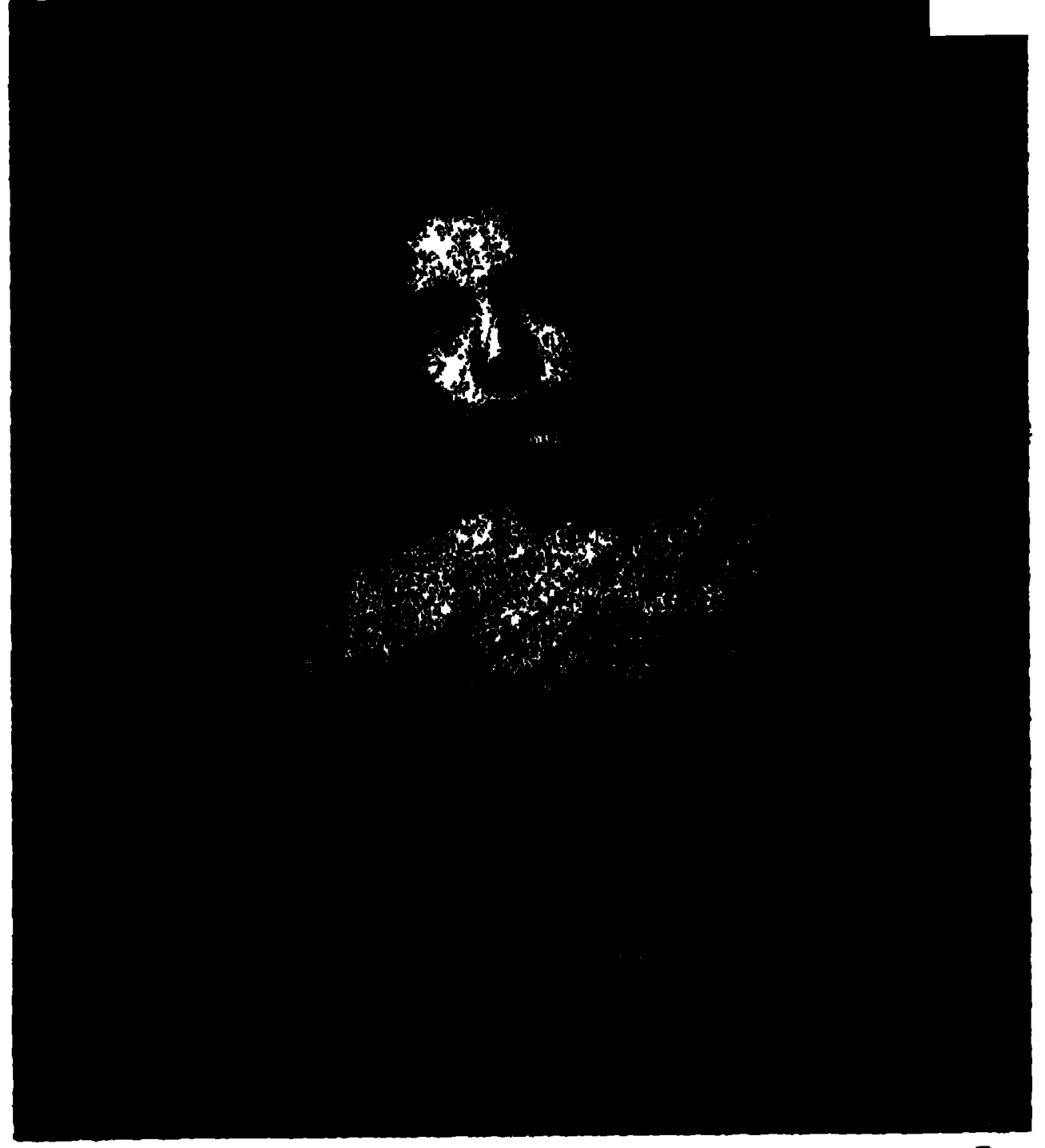
অলকানন্দায় এই নবাগত তরুণ অভিনেতাকে দেখা যাবে।

সামনেই একটা খেজুর লগড়া পড়েছিল তাই তুলে নিয়েই পটলের অনাবৃত পিঠের উপর বসিয়ে দেয় ঘা কতক! অবাক হয়ে যায় পটল, আর্তনাদও করেনা—প্রতিবাদও না!

দেখতে দেখতে কটা দিন কেটে গেল, সংক্রান্তিতে জগন্নাথপুরের পীঠস্থানে সুরু হয় মহামেলার আয়োজন! আশেপাশের গ্রাম হতে—এমন কি বাঁকুড়া—সোনামুখী—বিষ্ণুপুর হতে আসে নানা দোকানপসার! ছোটখাট সার্কাস দলও! সাতে পাঁচে মেলাটা বেশ জমেই ওঠে! শরতের নির্ধুম নীল আকাশতলে কাশবনে বালিহাসের জটলা, বীরবাঁধের সুগভীর বারিরাশি উপছে পড়ে আগামী শীতের কুহেলী স্পর্শে, সবুজ লকলকে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে আসে গ্রাম গ্রামান্তরের নরনারী!

রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকার দূর হয়ে গেছে কয়েকটা ডেলাইটের আলোয়।

যাত্রার দলের আসর ভরপুর জমে উঠেছে। ঢোলের

সংগে একা ব্যাঙএর বাঁশীই যেন আসর মাতিয়ে রেখেছে। তাছাড়া এক্টোও মন্দ নয়। রাত্রির হিম তুচ্ছ করে সমবেত জনতা প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে চলেছে।

মুগ্ধজনতার একপাশে রয়েছে পটলও, অবাক হয়ে দেখে যায় সারা জনতার মুগ্ধ অভিনন্দন! তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে যাত্রা হ'ল শেষ। কিন্তু লোকের ভিড়ে খুঁজে পেল না ব্যাঙকে, তাছাড়া দলের লোক তাকে ঘিরে ধরেছে।

একাই আসছে পটল মেলাফেরৎ লোকজনের পিছু পিছু! সকলের মুখে ওই এককথা! চাঁদের আলো বাঁর বাঁধের জলে ঝিলিক মারে—,পিছলে পড়ে চাঁদের আলোর হাসি কুচলে গাছের মাথা হতে!—"ওই মিতেন কি গো, মেলা দেখতে আইছিলা পারা?"

পিছু ফিরেই অবাক হয়ে যায় পটল, হাবু! গাঁয়ের দিকে চলেছে তারা, পথে লোকজন আর নেই, হাবুর সারামনে কেমন যেন সুরের রেশ, গান শুনে অবধি সারা মনটায় এসেছে একটা ভাবান্তর, পটল চমকে ওঠে!

—"মিতেন!" হাবুর একখানা হাত অজ্ঞাতেই তার হাতদুটোকে ধরেছে! কণ্ঠস্বর তার কাঁপছে! পটলের বুভুক্ষু মন যেন কেমন হয়ে আসে, সত্যিই ব্যাঙ কে সে তার সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারে নি। মুচির ছেলে—ক্ষেতের কাজও সে করে না, জনমুজুরও খাটে না। তাদের সমাজের জীব নয় সে! কি যেন মোহের বশেই পটল ছুটেছে কোন আলেয়ার পিছনে। কবে তার ধরা পাবে জানে না!

আজ হাবুর বহু প্রতীক্ষিত অন্তরের দাবী সে অগ্রাহ্য করতে পারে না! নিজেকে সামলাতে পারে না! সারা শরীরে কি যেন বাঁধন ছেঁড়ার চাঞ্চল্য, নিঃশেষে এলিয়ে দেয় নিজেকে! নির্জন বাগানের গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলোর কানাকানি! আকাশের মাথায় শুকতারা জ্বলজ্বল করছে!

যাত্রার দলের অধিকারী আজ যেন কোন মাণিকের সন্ধান পেয়েছে। এমন লাগসই যাত্রা গান জমেনি বহুদিন। এক একখানা ফ্লুটের গৎ যেন মাতিয়ে তুলেছে! অনুরোধ করে—

—"লেগে পড় বাবা, দলে লেগে পড়! বেটোরে এমন হাত রাখিস না, পিঁপড়ে লাগবে।" হাসে ব্যাঙ:—"সী যা হয় হবে দাঠাউর, দাও টুকচেন ছাচরণের ধুলো দাও" শশব্যস্ত অধিকারী মশায় ফাটা ছাচরণ যুগল এগিয়ে দেয় "—এই যে বাবা!"

সারা মনটা খুসীর আভায় ঝলমল। একরাশ খাবার হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরছে ব্যাঙ। আজ যেন মনের প্রসারতা বেড়ে গেছে অনেক খানি! আজকের অযাচিত প্রশংসা তাকে টেনে নিয়ে গেছে বাইরের জগতে! অনেক, অনেকদূরে। গুণ গুণ করে রাগিনীটা ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে বাড়ীর দিকে! পটলকে ঘুম থেকে টেনেতুলে খাওয়াবে আজ। চমক লাগিয়ে দেবে!

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, পটল বাড়ীতে নাই। সারাটা মন যেন কালো হয়ে যায় চকিতের মাঝে। কে জানে কোথায় গেছে!

ভোর হতে আর দেরী নাই। বাগানের মাঝে দুটী প্রাণী। চাঁদ ঢলে পড়েছে আকাশ কোণে। দূরে গ্রামসীমায় মহুয়াগাছের মাথায়। শশব্যস্তে উঠে পড়ে পটল!

"—উকি গো,—আচ্ছা লোকত তুমি, চোপ্পরাত এই রোই কাটাবা নাকি? 'উ' এসে পড়বে যি—"

কোন রকমে নেশার ঘোর কাটিয়ে হাবু পটলকে ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে! পা টলছে। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে সে—"ধ্যাৎ তেরি, 'উ'—'উর' গুষ্টিকে বিচি—"

কোন রকমে টলতে টলতে যখন গাঁয়ে ঢুকল তারা, কাক কোকিল ডাকতে সুরু করেছে!

ব্যাঙ ঘুমুতে পারেনি! সারারাত ধরে বসে রয়েছে দাওয়ায়। ভোরের বাতাসে কখন যে ক্লান্তির স্পর্শ দূর করে সারাদেহে এনেছিল ঘুমের পরশ জানে না ব্যাঙ!

সকালের আলো মুখে লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসে। দরজা টেনে ভিতরে ঢুকে দেখে পটল ঘুমিয়ে চলেছে অঘোরে! অসংযত কাপড় চোপড়—মুখের উপর দু-এক গাছি চুলের স্পর্শ দূর হতে দাঁড়িয়ে আজ পটলকে দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগছে!

পটল সকাল হতেই কেমন যেন দূরে দূরে থাকতে চায়! কালকের রাত্রির নেশার আমেজ এখনও কাটেনি! সারামনে তখনও ক্ষণিকের শিহরণ, মদ অনেকদিন খায়নি, পেটে কেমন সহ্য ও হয়নি! গা টা পাক দিয়ে ওঠে।

বমি করতে দেখে ব্যাঙ এসে হাজির হয়। কোন রকমে খানিকটা বমি করে একটু হালকা হয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে সরে আসে পটল। ব্যাঙএর চোখে মুখে একটা পরিবর্তন!—সে জিজ্ঞাসা করে—"ব্যাকাব করছিলি কেনে? কি হইছে?"

"জানিনা" সারা মুখে চোখে পটলের কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা। জানবার আগ্রহ তত বেশী বেড়ে যায় ব্যাঙএর! জেদা জেদীতে বলে বসে পটল, "ব্যাটা ছেলে, মেয়েদের ইসব খপরে দরকার কি তুমার? কিছু বুঝতে লার যেনে?"

তবে কি সত্যি! সত্যিই তাদের সংসার ফুলে ফলে ভরে উঠে চলেছে। ব্যাঙ আজ যেন কি হাতে পায়। হোক সে সমাজের বার, তবুও তার নাম আছে, যশ আছে। পাঁচখানা গায়ের লোক তাকে খাতির করে, তারও ঘর সংসার আছে! পটল অবাক হয়ে যায়। কোন রকমে ব্যাঙএর দৃঢ় সবল আলিঙ্গন হতে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে—"ইকি আদর সাত সুকাল বিলায়!"

সংগে সংগে ব্যাঙও বসে যায়, কি কি করতে হবে তাদিকে। আরও একখানা ঘর তুলবে, আর পটলকে ঝিগিরি করতে যেতে হবে না। রোজকার সেই করবে একা। কোন ভাবনা নাই!

বৈকাল বেলাতেই জগন্নাথপুরের অধিকারী মশায় ব্যাংকে তার বাড়ী আসতে দেখে একটু অবাকই হয়ে যায়! —"ওই ওস্তাদ যে—"

"—হ্যা এই এলাম!" দাওয়াতে বসে পড়ে ব্যাং। অধিকারী মশায় যেন কিস্তীই মেরেছেন আর কি! গোফে পাক দিতে থাকেন! ব্যাং যাত্রার দলে বাধা মাইনেতে থাকতে চায়। ব্যাংকে এইবার রোজকার করতে হবে, তার সংসারে পোষ্য বাড়ছেত! অধিকারী মশায় সানন্দেই রাজী হয়ে যান! ধান উঠছে, এইবার দল নিয়ে বার হবেন দেশ দেশান্তরে, এইত মরসুম! পাকাপাকি সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। ব্যাং যাবে।

যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। সত্যিই এইবার যেন জীবনে অনাস্বাদিত কোন আনন্দ সারা মন তার ছেয়ে ফেলে! তাদের সব দুঃখের মাঝেও আসবে কোন নোতুন অতিথি, পটল কেমন যেন সংযত হয়ে চলে আজকাল!

খান কয়েক কাপড়, পিরাণ, আর ফ্লুট বাঁশী ইত্যাদি নিয়ে একটা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে ব্যাং তৈরী হয়ে পড়ে! গ্রাম ছেড়ে যেতে মন সরে না, তবুও যেতে হয়। আজ তার জীবনে এসেছে বাইরের হাতছানি!

কয়েকটা দিন কেটেছে স্বপ্নের মত। সোনামুখী হামিরহাটী—রামপুর কত গ্রাম গ্রামান্তরে কেটে গেল বিনিদ্র রজনী, ব্যাংএর অপূর্ব বাঁশীর সুরে সারা আসর বসে থাকে মন্ত্র মুগ্ধের মত! এত নাম—যশ,—সারা মনের বুভুক্ষা তবুও মেটেনা! সারা দেশের লোক জানবে তাকে—ওস্তাদ বলে শ্রদ্ধা করবে, তাদেরই মৌন অন্তরের অভিনন্দন ভরিয়ে তুলবে তার নিঃস্বঅন্তর। হোক সে সমাজ তাড়িত, তবুও তার সংসারে শান্তি আসবে, এগিয়ে চলে বিষ্ণুপুরের দিকে তারা!

পাথর হাটির মধ্য দিয়ে লাল ধূলি ধূসর সড়কটা শাল বনের বুক চিরে চলে গেছে! চলেছে তারাও!

গুণী শিল্পীর মহাতীর্থ এই বিষ্ণুপুর! মনের মাঝে কেমন যেন দুরুদুরু করে! কত শতাব্দীর অতলে আজও উঠে আসে কোন সর্বত্যাগিনী লালাবাঈএর অমর আত্মার সাথী দেবদূত দল! মল্লরাজাদের প্রাচীন কীর্তি কাহিনী কত শিল্পীর তানপুরা স্বরোদের করুণ মীড় গুমরে ফেরে ওই ধ্বংসপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে! বেঁচে থাক—বেঁচে থাক ওরা সব ওদিকে। দূর হতে প্রণতি জানায় ব্যাং!

তার ছোট বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন ফুটে বের হয় মন্ত্রমুগ্ধ অন্তরের প্রণতি, কত রাত্রি খেয়াল নাই। বেহাগের সুরে সুরে বিস্তার করে রাত্রির মায়াজাল! দিগন্ত ছোঁয়া লাল বাঁধের পদ্মবনে জাগে শিহরণ!

সারা বিষ্ণুপুরে আসর পর পর সাতদিন চলছে! ব্যাংএর বাঁশীই তাদের একটা মস্ত আকর্ষণ!

রাত্রি বেলায় ব্যাং কেমন যেন চমকে ওঠে। কানে আসছে পটলের আর্তনাদ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে! ডাকছে তাকে! ধড় মড় করে উঠে বসে চোখ কচলাতে থাকে! একি—! সে স্বপ্ন দেখছিল! তবুও মনটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে! এক মুহূর্তও আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না! কে জানে হয়ত সত্যিই পটলের শরীর খারাপ, তারপর ওই অবস্থা—!

অধিকারী মশায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন, এমন জমাট মরসুম ছেড়ে দিতে কি পারা যায়! তবুও ব্যাং থাকবেনা! অন্ততঃ দিন দুয়েকের জন্যও একবার বাড়ী দেখে আবার ফিরে আসবে! বাধ্য হয়েই মত দিতে হয় অধিকারী কে!

ব্যাং একাই বাড়ী রওনা হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপুরের বাজার হতে নোতুন ফুলকপি—কমলালেবু—পটলের জন্য তাঁতের রংগিন সাড়ী আর কাউকে না জানিয়ে কিনেছে খান দুয়েক ছোট্ট রংগিন জামা—! হাসে দলের মেডন—"দাদা—ইখি পেল্লয় বাজার করলা, একেবারে কি ছেলের ভুজন সেরে ফেলাবা!"

ব্যাং হাসি চাপতে পারে না!

বৃন্দাবনপুর ষ্টেশনে নেমে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়! আমঠের মধ্য দিয়ে সরু লাল ধুলোমাখা রাস্তাটা ছোট নদী পার হয়ে বেলুটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! বেগে এগিয়ে আসে ব্যাং।

বুকটা কেমন যেন করে! কত আশা নিয়ে বাড়ীর পথ ধরে! পটল অবাক হয়ে যাবে, কত জিনিষ এনেছে সে। রীতিমত সংসার গড়ে তুলবে তারা! গ্রামের পথে এগিয়ে চলে ব্যাং!

একি। সামনে সাপ দেখলেও এতখানি বিস্মিত হত না ব্যাং! কত আশা, কত কল্পনা তার ঘর বাঁধবার প্রবল বাসনা কোন দিকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! ঘরখানা শূন্য, কপাটখানা খোলা, হাহা করছে! চালে খড়ও নাই! ঘরের মেজেতে ছাই গাদা করা, একটা কুকুর তার পায়ের শব্দ পেয়ে বার হয়ে আসে।

তবে কি? ভাবতে পারে না ব্যাং! সারা গা ঝিম ঝিম করে, পা দুটো কাঁপছে,—বসে পড়ে সেইখানেই।

ব্যাং এর আসার খবরটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে, তার মা বাবা পাড়ার আরও সকলেই আসে! ভালই হয়েছে, আপদ গিয়েছে! ছুঁড়ির বরাতে এত সুখ সইবে কেন—মরতে মরণ হাবুর সংগে পালিয়ে গিয়েছে! আজ গৌর চেষ্টা করে ছেলেকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য! আবার সমাজে তুলবে, বিয়ে থা দেবে! এমন গুণী ছেলে এ চাকলায় আর নাই!

কতক কথা কাণে ঢোকে ব্যাংএর, স্থাণুর মত বসে থাকে। বুঝিয়ে চলে তাকে পাড়ার লোক।

সারা সংসারের উপর কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে ব্যাংএর! ওদের উপর ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে সারামন! কেবল নিজের নিজের স্বার্থ নিয়েই মত্ত! আন্তরিকতার দাম আশা করা নেহাৎ বোকামি। সে এদের হাত হতে দূরে সরে যেতে পারলে যেন বাঁচে! ধীরে ধীরে উঠে যায় সেখান হতে, আজ আর সে বিশ্বাস করে না, কাউকে না!

পাড়ার লোক গভীর রাত্রে কোলাহলে সকলেই জেগে ওঠে! রাতের অন্ধকারে জলছে কুঁড়েটা! ব্যাং নাই! শেষ চিহ্ন তাদের ঘরখানাকে আগুন লাগিয়ে সে বার হয়ে গেছে কোথায় কেউ জানে না! গৌরের চোখদুটো অশ্রু-সজল হয়ে আসে!

হাবু প্রথমে যতটা সহজ ভেবেছিলো বাইরে গিয়ে ঘর বাঁধা নাকি ততখানি সোজা নয়! এরোড্রোমে চাকরী করতে এসে প্রথমে কোন পাত্তাই পায় না। চারিদিকে চলেছে কর্মব্যস্ত জনতা, কেউ কারুর দিকে চায় না! দু' দিন কোন রকমে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের ধারে অর্জুন গাছের নীচে রান্না করে খায় আর পড়ে থাকে। কিছুই হয় না।

সেদিন হাবু বার হয়েছে কাজের সন্ধানে। সারাদিন খাবার জোটেনি, পেয়েছিল মুঠোখানেক বিরীকলাই, তাই ভিজিয়ে খেয়ে বার হয়েছে। রাস্তার ধারে বসে রয়েছে একা পটল! হঠাৎ একটা জিপ কাছাকাছি আসতেই সে একটু অবাক হয়ে যায়। দুজন সাহেব বার হয়ে আসে। পিছু পিছু হাবুও।

প্রথমটা একটু আশ্চর্য হয়ে যায় পটল। শেষ অবধি হাবুর কথাতেই গাড়ীতে ওঠে। সত্যিই তাহলে তাদের চাকরী হয়েছে! হাবুর মুখচোখে খুসীর আভা। বেগে ছুট চলেছে গাড়ীখানা মাঠের মধ্য দিয়ে। সাহেব দুটোর দিকে চাইতে ভয় হয় পটলের।

অনেকক্ষণ চলার পর গাড়ী শ্যামল মাঠের শেষে দামোদর নদীর ধারে। চারিদিকে নির্জন মাঠ আর বালুচরের বুকে ঘন বিন্না ঘাসের বন। গাড়ী থামতেই হাবু নেমে কোনদিকে চলে গেল, একা রইল পটল।

একি! চীৎকার করে ওঠে সে। দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। দুজন নরপশুর মদোন্মত্ত পাশবিকতার কাছে সামান্য নারীর ক্ষমতা কতটুকু! ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে তার চীৎকার।

জ্ঞান ফিরে আসে, নিজেকে বিন্নাঘাসের বনে পড়ে থাকতে দেখে ক্রমশঃ অনুভব করে সবকিছু। এত বড় সর্বনাশ তার হয়ে গেল। সারামন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে,

নির্মল কুমার ঘোষ

চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চান। বয়স—২৩, উচ্চতা ৫ ফিট, ৫ ইঞ্চি, রং—উজ্বল শ্যামবর্ণ। এ্যামেচার হিসাবে থিয়েটারের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। শিক্ষা—মাট্রিক পর্যন্ত। ঠিকানা ৪।১, জয়নারায়ণ ঘোষ লেন, সালিখা, হাওড়া। আগ্রহশীল কর্তৃপক্ষ পত্রালাপ করতে পারেন।

হঠাৎ দূর বনের আড়ালে দেখে হাবু কতকগুলো নোট গুণে পকেটে পুরছে।

এ জীবন তার সহ্য হয় না। আজ অনুভব করে পটল প্রত্যহের স্পর্শে কি জীবন সে ফেলে এসেছে। দুচোখ বেয়ে নেমে আসে জলধারা। আজ সেখানে তার ফিরবার পথ নাই।

কে জানে কোথায় রয়েছে ব্যাং। দুচোখ জলে ছেয়ে আসে। রাত্রি গভীর হয়ে আসে। মূক দেহাবতির অভিনয়েই কি তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটবে? কানে আসে হাবুর মদা জড়িত কণ্ঠস্বর।

দূর দূরান্তের অজানা অচেনা গামের বাইরে এক ঝাকড়া বটতলায় ছেঁড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে রয়েছে ব্যাং। দেখলে আর চেনা যায় না। গুজে ধুঁকছে। বুকের কাছে তীব্র একটা বেদনা। কঙ্কালসার দেহখানা জ্বরের বেগে কাঁপছে।

কাশতে কাশতে দুমড়ে ওঠে দেহটা! হঠাৎ কার ডাকে ফিরে চায়। একজন লোক চাট্টি ভাত নিয়ে এসেছে—"ভাত খাবি?"

বলে ব্যাঙ—"না, ভিক্ষে নিইনা! বাঁশী বাজাতে পারি—বাজনা শোন, ভাল লাগে পেতে দিও।"

বাঁশী বাজাবার চেষ্টা করে, লোকটাও অবাক হয়ে যায় এমন নিখুঁত রাগিনী আলাপ করতে শিখল এ পাগল কোথা থেকে। কিন্তু শেষ হয় না, কাশির আবেগে থেমে যায়! প্রবল কাশির বেগে বার হয়ে আসে এক চাপ রক্ত মাখা গয়ের। একি! মলিন হাসি ফুটে ওঠে ব্যাঙএর মুখে! সরে যায় লোকটা!

সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া লালচে ঘা। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে! হাতগুলো ফোলা ফোলা। কুৎসিত রোগ মলিন কাঁথাখানায় পড়ে পড়ে কাতরায় পটল। কাছে কেউ নাই! রোগটা প্রকাশ হবার পরদিনই হাবু পালিয়েছে। নোটের তাড়াটা কোমরে বাঁধতে ভোলেনি সে!

আর্তনাদ করে ওঠে, দুচোখ ফেটে বার হয়ে আসে অশ্রু! কি জীবন ফেলে কোন পথে নেমেছে সে। এ পাপ কি মুছবার নয়। কোন দিনই আর আসবে না জীবন! পথে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করতে ইচ্ছা করে!

হঠাৎ কানে কিসের একটা সুর আসতেই উৎকর্ণ হয়ে যায়: খুব চেনা! চেনা! হ্যাঁ—,এযে বহুবার শুনেছে! সারা শরীর চঞ্চল হয়ে ওঠে! ম্লান জোৎস্নায় বার হয়ে আসে ঘর হতে। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায়।

বাঁশীটা বাজাতে গিয়ে বুকখানা ফেটে আসবার উপক্রম। সারা শরীরে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তবুও বিরাম নাই! শতছিন্ন কাপড়খানা কোন রকমে গাটা মুড়ি দিবার চেষ্টা করে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে, সে যেন আবার ফিরে গেছে সেই হারাণ জগতে। গাঁয়ের বাইরে মহুয়াবনে এমনি রাতে বাজাত সে। পাশে থাকত আর একজন! হারিয়ে গেল কোথায় সেসব, তবুও মনের জগতে আজও তারা সবাই আছে!

আঃ—সোনালী চাঁদের আলোয় করে হাতছানি! যাবে—যাবে সে। চোখের সামনে আলোর ঝিলিমিলি।

একি! চোখ খুলে সামনেই কাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। পটল—না? পটলও ব্যাঙকে এমনি অবস্থায় দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কান্নায় ফেটে পড়ে তার দুচোখ। আর্তনাদ করে ওঠে—"ওগো—।"

বাঁশী থামেনি। মলিন মধুর হাসি ছেয়ে ফেলে ব্যাঙএর সারামুখ। আলোর সাগর পারে কার হাতছানি। বাঁশীর সুরে আজ সফলতার স্বপ্ন। সে যাবে।

মুখ হতে বাঁশীটা সরে যায় আপনাহতেই, পটল আর্তনাদ করে ওঠে। চোয়ালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে এক চাপ তাজা রক্ত। নিশ্চুপ হয়ে যায় ব্যাঙএর দেহ। ডুকরে কেঁদে ওঠে পটল।

তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও হয় নি। বাকী রয়ে গেছে। অচেতন দেহটাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

রাতের স্বপ্নমাখা চাঁদ সরে গেছে পত্রাঙ্কলেরও পাশে।

সম্পাদকের দপ্তর
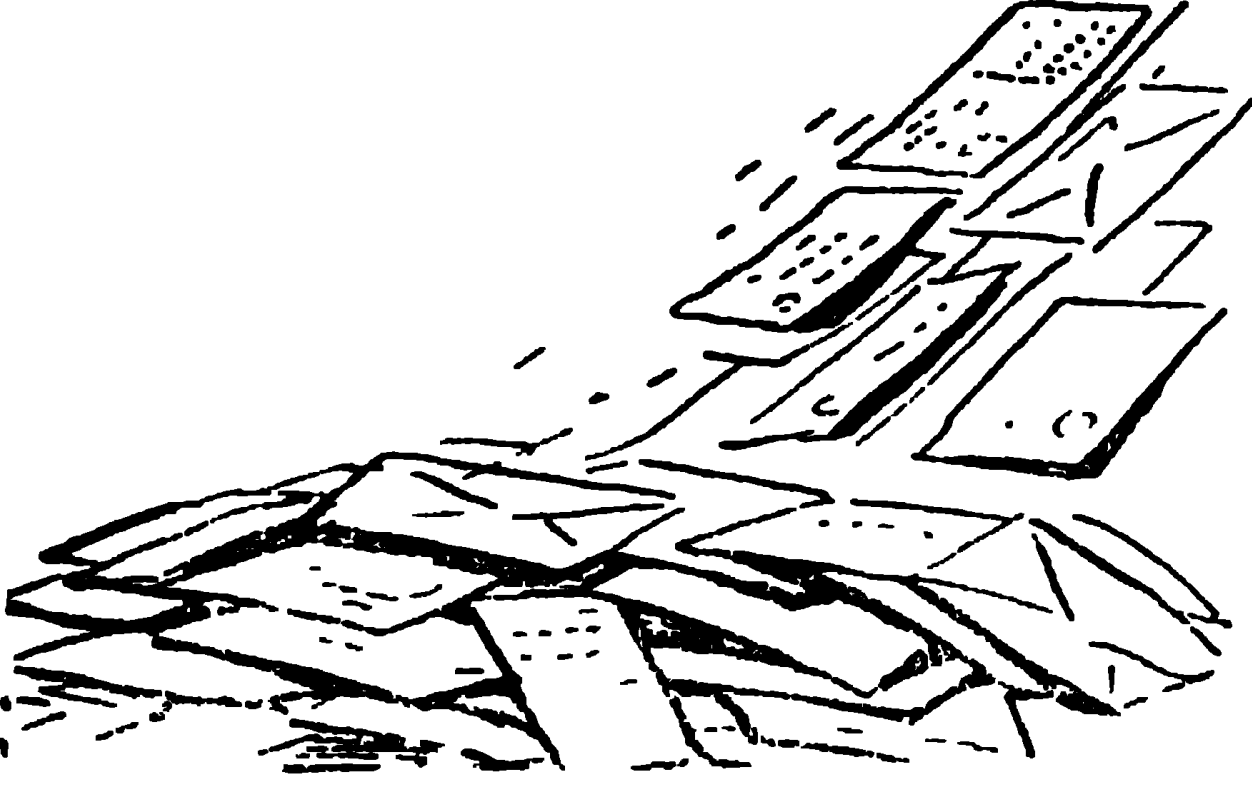
ভগবতী শীল (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা) জনপ্রিয় অভিনেতা কুন্দনলাল সায়গলের মৃত্যুতে চিত্র জগতের প্রভূত ক্ষতি হলো সন্দেহ নেই। সংবাদটীতে খুবই মর্মাহত হলুম। তাঁর গানে সকলেই মুগ্ধ। তাঁর গান শুনে আমরা সত্যিকারের আনন্দ লাভ করতুম। আমি আমাদের প্রিয় শিল্পীর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

●● গত সংখ্যায় সায়গলের প্রতিভার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আপনার শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। সায়গল কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন—তার প্রমাণ আপনারা—আপনাদের মাঝেই তিনি অমর হ'য়ে থাকবেন।

অসীম কুমার (নতুন পাড়া, জলপাইগুড়ী) বর্তমানে চিত্র জগতের প্রত্যেক পরিচালককেই বলতে শুনেছি যে, তাঁদের নূতন মুখের প্রয়োজন। অথচ বহু নূতন উপযুক্ততা নিয়ে তাঁদের কাছে হাজির হলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শুনতে পাই পরিচালকদের চেনা-শুনা কেউ হলে অতি সহজেই স্থান পেয়ে যান। এর কারণ কী?

●● যতদিন কোন নাট্যবিদ্যালয় গড়ে না ওঠে, ততদিন এ সমস্যার আর কোন সমাধান হবে না। নূতন মুখের যে প্রয়োজন আছে একথা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করেন। অথচ নূতন সংগ্রহ করবার জন্য যে ঝুঁকি সহ্য করা দরকার, তাও যেমনি তাঁদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় না—তেমনি এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃত ব্যাপারটা খুলে বলি, তাহলে সব বুঝতে পারবেন। যেমন মনে করুন, কোন প্রযোজক বা পরিচালক অথবা কর্তৃস্থানীয় কেউ খুব বল্লেন, 'কৈ মশায় একটী ছেলে বা মেয়ে দিনত আমাদের আগামী ছবিতে নামিয়ে দিচ্ছি। আপনারা নূতন নূতন বলেন—দিচ্ছি নূতনকে সুযোগ।' আমরা আমাদের কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের কাউকে হয়ত পাঠিয়ে দিলাম। ঐ পাঠিয়ে দেওয়া অবধি—তাঁর বা তাঁদের সংগে কথা বলবারও কর্তৃপক্ষদের অনেক সময় সময় হয় না। অথচ এটা যে তাঁদের একটা প্রয়োজনীয় কাজ, তা তাঁরা ভুলেই যান। আমাদের বা এই ধরণের যাঁরা নূতনদের পথটা একটু পরিষ্কার করে দিতে আগ্রহ, তাঁদের লিখিত চিঠিখানা বা পরিচয় পত্র অনেক সময় হয়ত পড়েন অনেকে। পড়ে বলে দেন, 'আচ্ছা পরে আসবেন।' যাঁরা যান, অমনি অবহেলার ভিতর দু'তিন দিন ঘুরে শেষকালে ধৈর্য হারিয়ে চলে আসেন। পরে হয়ত যখন প্রকৃতই লোকের দরকার, তখন হাতের কাছে পুরোন যা থাকে তাই তাঁরা হাতড়িয়ে বেড়ান। আমাদের সংগে কথা প্রসংগে উঠলে অভিযোগ আনেন, 'না মশায় যা পাঠান, একবারে ওছা। অচল। ভালদেখে কাউকে পাঠাতে পারেন না।' অথচ আমরা জানি, এঁদেরই ভিতর যদি কেউ কোন রকমে একবার একটু সুযোগ পেয়ে যান—তখন তাঁকে নিয়েই টান টানির অন্ত থাকে না। তাহলে কর্তৃপক্ষ যে উপযুক্ততা বিচার করবার জন্য মোটেই সময় ব্যয় করেন না—একথা নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ের সমাধান কোথায়? সামাধান আছে। প্রত্যেক প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের উচিত একটী শিল্পী-সংগ্রাহক বিভাগ রাখা। অবশ্য বর্তমানে যেরূপ আছে সেরূপ নয়। অন্ততঃ এমন একজন লোককে দায়িত্ব ভার দিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে—যিনি বা যাঁরা যাবেন, তাঁদের সংগে কথা বলবেন। তাঁদের নাম, ঠিকানা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বিস্তারীত লিখে—সংগ্রহ করে রেখে দেবেন। তারপর উপযুক্ততা বিচার করে 'হ্যাঁ কী না' বলে দিবেন। অথবা এরূপ একটী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা প্রয়োজন, হলিউড প্রভৃতি স্থানের মত—যাঁরা কেবল শিল্পী সংগ্রহ নিয়েই মেতে

থাকবেন। যেমন মনে করুন, আপনি শিল্পী হতে চান —উক্ত প্রতিষ্ঠান আপনার কাছ থেকে একটা দর্শনী নিয়ে আপনাকে কোথাও ঢুকিয়ে দেবার জন্য আপনার সম্পর্কে বিস্তারীত লিখে রাখলেন। প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গুলির যখন ঠিক প্রয়োজন হল, তখন এঁদের কাছে অনুসন্ধান করলেন এবং প্রয়োজন মত শিল্পীর চাহিদা মিটিয়ে এরা প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গুলির কাছ থেকেও একটা দর্শনী নিলেন। এমনি ভাবে পরস্পরের আন্তরিকতায়ই এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। পরিচালক বা কর্তৃপক্ষদের সংগে চেনা শুনা থাকলে সময় সময় সুযোগ পাওয়া যায় একথা সত্য। অবশ্য একথা বলতে এই বোঝায় না, চেনা শোনা না থাকলে সুযোগ তাঁরা দেনই না। চেনা শুনা থাকলে এইটুকু সুবিধা হয়—প্রয়োজনমত তাঁরা সব সময়ই হাজির থাকতে পারেন। যা অচেনাদের পক্ষে খুবই কষ্ট সাধ্য।

সুধীর বসু (অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা) (১) আমাদের বাংলাদেশে চিত্র পরিচালনা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? (২) আমি এবার B. Com দিচ্ছি। কোন পরিচালকের সহকারী হিসাবে পরিচালনা বিদ্যা শিখিতে চাই। এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারেন?

●● (১) না। পরিচালনার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হলে কোন পরিচালকের সহকারী রূপে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। (২) এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত নেই।

পাপু রাহা (ইডেন হসপিটাল লেন, বউবাজার, কলিকাতা) আপনাদের পত্রিকায় প্রায়ই দেখতে পাই, আপনারা নতুনকে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দেন অর্থাৎ অভিনয়েচ্ছুক ব্যক্তিদের মনে আশার আলো জাগিয়ে দিতে কুন্ঠিত হন না। আমিও নতুনের মধ্যে একজন। বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা অভিনয় করা। জীবনে অনেক নাটকে আমি নেমেছি—অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু আছে। কিন্তু সুযোগের নিতান্তই অভাবে আমার আশা সমূলে নষ্ট হবার উপক্রম হ'য়েছে। কয়েকবার নিজে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। অনেকে বলেন, নিজের চেষ্টায় সিনেমাতে ঢোকা খুব কঠিন ব্যাপার, কাউকে অবলম্বন করে আসতে পারলে এ রাস্তায় চলা কঠিন হবে না। তাই আপনার কাছে জানতে চাই, আমায় এমন একজন লোকের নাম বলে দিন, যাঁর সাহায্যে আমি যেতে পারি। কেবল নাম দিয়ে দিলেই হবেনা—তাঁর কাছে পরিচয় পত্রও দিয়ে দিতে হবে।

●● জনৈক পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে এই বিভাগের প্রারম্ভে যেকথা বলেছি, আশাকরি তা থেকে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা হৃদয়ংগম করতে পারবেন। এ বিষয়ে সত্যি আমাদের কোন হাত নেই। তবু আমরা নূতন এবং কর্তৃপক্ষদের মাঝে একটা 'পুল' হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে সেরূপ সাড়া না পাবার জন্য সে ইচ্ছাও আমরা পরিত্যাগ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছি। আমাদের কাজ হচ্ছে পত্রিকা চালানো। চিত্র জগতের পত্রিকা বলে তার সমস্যা-সমাধানেও তাই যত্নপর হ'য়ে ওঠা কর্তব্য বলেই মনে করি। কিন্তু চারিদিকের বাধা বিঘ্নে সে কর্তব্য সম্পাদন করতে যদি না পারি—তার প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের বিরত থাকা উচিত নয় কী? তবু ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় এবং পত্রিকা মারফৎ নূতনদের দাবী যে আমরা জানিয়ে যাবো এ নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নিয়ে উমেদারী করতে পারবোনা। আশাকরি এ অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনি শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ, প্রডাকসন ম্যানেজার, এম, পি, প্রডাকসন্স, কালী ফিল্ম ষ্টুডিও, টালীগঞ্জ—এই ঠিকানায় রূপ মঞ্চের কথা উল্লেখ করে পত্রালাপ অথবা সাক্ষাৎ করে দেখতে পারেন।

অরুণ বসু (চক্রবেড়ে রোড, সাউথ, কলিকাতা) (১) ভ্যারাইটী পিকচার্সের পি, ডবলিও, ডি-র খবর কি? (২) কিছুদিন আগে অঞ্জলী পিকচার্সের 'ঝরাফুল' সম্পর্কে গুজব শুনেছিলাম যে, চিত্রটীর কাজ হ'তে হ'তে বন্ধ হ'য়ে যায়, এ কথা কি সত্য? এবং তা'হলে কেন বন্ধ হ'লো?

●● ভ্যারাইটী পিকচার্স প্রযোজিত পি, ডবলিউ,

ডি'র হিন্দি চিত্র গ্রহণের কাজ বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। চিত্রখানির নাম হ'য়েছে 'প্রেম কী দুনিয়া'। মুক্তির পথ পেলেই 'প্রেম-কী-দুনিয়া' আপনাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। (২) 'ঝরাফুল' সম্পর্কে যে গুজব শুনেছেন তা সত্যিই। পূর্ণ বিকাশ লাভের পূর্বেই বুঝি 'ঝরাফুল' ঝরে গেল। 'কেন'-র সঠিক উত্তর বলতে পারি না। তবে কর্তৃপক্ষের অসৎ মনোবৃত্তি যে এর অন্যতম কারণ একথা হলফ করে বলতে পারি। কারণ, আমাদের মত দীন পত্রিকার অর্থও যেখানে কর্তৃপক্ষ দেবার মত সততার পরিচয় দেন নি, সেখানে আর সকলের সংগে কীরূপ ব্যবহার করেছেন—তা আর সকলেই বলতে পারেন।

মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় (হাওড়া) চিত্র-বাণীর নূতন ছবি 'রাত্রি'তে নায়ক কালোকোর্ত'র ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন ?

●● কমল মিত্র।

সুনীলকুমার মণ্ডল (চুঁচুড়া) আমার কোন বন্ধুর কাছ থেকে শুনলাম যে 'ত্রিবেণীতে' সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র চিত্র গ্রহণের জন্য অনেকেই এসেছিলেন। একথা কী সত্য ? এবং চন্দ্রশেখরে কে কে অভিনয় করেছেন জানাবেন কী ?

●● হ্যাঁ একথা সত্য। 'ত্রিবেণী' থেকে চন্দ্রশেখরের জন্য কয়েকটী বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হ'য়েছে। চন্দ্রশেখরে শ্রীমতী কানন, অশোককুমার, ভারতী, অমর মল্লিক, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গীতাশ্রী (ছোট রাজলক্ষীর মেয়ে) প্রভৃতি আরো অনেকে অভিনয় করেছেন।

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (বর্ধমান) বহুদিন যাবৎ সুশীল মজুমদারকে পরিচালক হিসাবে কোন ছবিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কি পরিচালকের কার্য ছেড়ে দিয়েছেন ?

●● না। 'অভিযোগ' নামে বাসন্তিকার প্রথম বাংলা বাণীচিত্রের পরিচালনা করছেন। ভবিষ্যতে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন।

হেমা বন্দোপাধ্যায় (শিলচর, আসাম) Fade-in ও Fade-out বলতে কী বুঝায় ?

●● ফেড ইন—(Fade-in) বিষয়বস্তুর ওপরে যখন একটু একটু করে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়। যেমন মনে করুণ, একটী দৃশ্য আরম্ভ হচ্ছে—অন্ধকারের মাঝ থেকে যখন ঐ দৃশ্যটী ধীরে ধীরে আলোকিত হ'য়ে আপনাদের সামনে ধরা দেয়।—To increase the light on the frame gradually from darkness to full illumination ফেড-আউট—(Fade-out) ঠিক তার বিপরীত। আলোক সমন্বিত দৃশ্যটী শেষ হবার সময় যখন ধীরে ধীরে অন্ধকারের বুকে লীন হ'য়ে যায়। To decrease the light gradually until the subject is in darkness.

নিত্যগোপাল দাস (ভোগদিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা)

●● আপনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন—তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করিনা। তাই উত্তর দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত। এসব অবাঞ্ছিত কৌতূহল দমিয়ে রাখাই উচিত নয় কি ?

রক্তকুমার ঘোষ (পার গোপালনগর, হুগলী) আমি ছায়াছিত্রে অভিনয় করিতে চাই। সৌখীন অভিনয়ে বহুদিন অভিনয় করিয়াছি। আপনারা কী এ বিষয়ে আমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারেন ? আপনাদের পত্রিকায় ফটো প্রকাশ করিতে হইলে কি কি করিতে হয় ? লোকচিত্র প্রডাকসন্স তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' বইখানি পর্দায় রূপায়িত করিতেছেন—তার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ? ইহাদের ঠিকানাটা জানাবেন কী ?

●● আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম—যদিও জানবেন, সব সময়ই আপনাদের জন্য সহানুভূতি রয়েছে। আপনি লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের প্রচার সচিব ডাঃ নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ৬, হেস্টিংসষ্ট্রিটে এ বিষয়ে পত্রালাপ করে দেখতে পারেন। ওদের অনেকগুলি ছবি উঠছে। রূপ-মঞ্চে ছবি প্রকাশ করতে হ'লে—আপনার নাম, ঠিকানা, উচ্চতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা প্রভৃতির সংগে এক কপি ফটো পাঠিয়ে ত্রিশ টাকা মনিঅর্ডার করতে হবে। রূপ-মঞ্চের একচতুর্থাংশ পাতার

ভিতর ও গুলি ছাপানো হবে। ব্লক থাকলে কুড়ি টাকা খরচা পড়বে। এবং আর্টপ্লেটে ছাপতে গেলে ব্লকের খরচা বাদে একশত টাকা পড়বে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় 'ধাত্রী দেবতা'র কাজ প্রায় শেষ হ'তে চললো। লোকচিত্র প্রডাকসন্স মিঃ জাভেরী C/O ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ ৩২।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ওদের বিষয়ে বিস্তারীত জানতে পারবেন।

বিজয় ভূষণ দত্ত (টোকো বাড়ী রোড, গৌহাটী আসাম) আমি একজন প্রিয়দর্শন তরুণ। ছায়া জগতে প্রবেশ করতে চাই। অভিনয় সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। প্রমথেশ বরুয়া বর্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করিতেছেন—অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

●● এ বিষয়ে কোন প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থই আপনাকে হ'তে হবে। প্রমথেশ বাবুর যে সব ছবি গড়ে উঠছিল—তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন কিনা বলতে পারি না—তবে বরুয়ার পরিচালনায় যে কয়খানির চিত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছিল সবই কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ ছিল সম্প্রতি আবার শুরু হ'য়েছে।

মণি দাস (সৈদাবাদ বহরমপুর) (১) শ্রদ্ধেয় শ্রম মন্ত্রী জগজীবনরাম কী বাংলা জানেন? যদি তিনি বাংলা জানেন তবে গতবার তিনি যখন রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধির সাথে নানান বিষয়ে আলাপ করেন তখন তাঁকে কোন বাংলা ছবি দেখালে কী ভাল হতো না? (২) শুনেছিলাম সু-অভিনেত্রী দেবী মুখার্জি ও সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সুমিত্রা দেবী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। তাদের বিবাহের কতদূর কি হ লো? (৩) উদয় শঙ্করের 'কল্পনা' কি আমরা পর্দায় দেখবার আশা করতে পারি?

●● (১) হ্যাঁ। ছবির প্রতি যখন তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে—তখন বাংলা ছবির ভিতর যদি আকর্ষণী শক্তি থাকে—সুযোগ মত শুধু শ্রমমন্ত্রী কেন—অনেক মন্ত্রী-কেই টানবে। অবশ্য ছবি দেখবার মত শ্রমমন্ত্রীর হাতে তখন সময়ও ছিলনা। তিনি ১১টায় আসেন—আবার ২ টায়ই দিল্লী রওনা হ'য়ে যান। (২) শুনেছি তাঁদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। (৩) কল্পনাকে দেখবার সুযোগ আপনারাও পাবেন বৈকী?

পি, ব্যানার্জি (হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা) বাংলা দেশে কোন ফিল্ম এসোসিয়েশন আছে কি। বর্তমানে এর প্রযোজনীয়তা খুবই বেশী। থাকলে উহার ঠিকানা দয়া করিয়া জানাবেন।

●● ফিল্ম এসোসিয়েশন বলতে আপনি কি বুঝেছেন বলতে পারি না। যদি প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গুলির কথা মনে করে থাকেন তাহলে তার নাম 'বেঙ্গল মোশন পিকচার্স প্রডিউসার্স এসোসিয়েশন।' এই সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান তবে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার, নিউথিয়েটার্স লিঃ ১৭১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট অথবা শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে পত্রালাপ করতে পারেন।

পুষ্প গুপ্তা, শান্তি মুখার্জি, সিতাংশু সরকার ও রতন সেন (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ( ) কয়েক জন বন্ধুদের মধ্যে মতের গরমিল হচ্ছে এই নিয়ে যে তাঁদের মতে 'অভিযাত্রী' ছায়াচিত্রে পরেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রেডিও খ্যাত বিকাশ রায়, সম্পাদকের ভূমিকায় নরেশ বসু ও জয়ার ছোড়দার ভূমিকায় শম্ভু মিত্র। কিন্তু আমাদের মতে পরেশের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র (ধাত্রী কা লাল), সম্পাদকের ভূমিকায় নরেশ বসু, ছোড়দার ভূমিকায় বিকাশ রায়। বলতে পারেন কাদের ঠিক হ'য়েছে? (২) মহাকাল নামে যে চিত্রটী উঠছে আচ্ছা এটা কী 'হাঞ্চব্যাক অব নট্রেডম' গল্পের বাংলা অনুবাদ? ছবিটী পরিচালনা করছেন কে?

●● (১) আপনাদের মতই ঠিক। (২) হ্যাঁ হাঞ্চব্যাক অব নট্রেডেম-এর ঠিক অনুবাদ না হ'লেও ওরই ছায়াবলম্বনে গড়ে উঠছে মহাকাল। হাঞ্চ-ব্যাকের ভূমিকায় শেষ পর্যন্ত শ্যামলাহা নির্বাচিত হয়েছেন। চিত্রখানি অভিজ্ঞ চিত্রপরিচালক নীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করছেন ধীরেশ ঘোষ।

কমলাকান্ত দত্ত (খুলনা) বর্ত্তমান বাংলার ছায়াচিত্র মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাগণ সমর্থন করেন কি ?

●● ব্যক্তিগত ভাবে ছায়াচিত্র নিয়ে এঁদের কারোর সংগেই আলাপ আলোচনা করবাব সৌভাগ্য আমাব হয়নি। তবে কয়েকটী ক্ষেত্রে জওহরলাল এবং শরৎচন্দ্রবসুর উপস্থিতিতে কয়েকটী বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবার সুযোগ হ'য়েছে—তা' থেকে বলতে পারি, এঁরা ছায়াচিত্রের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন। মহাত্মা গান্ধী নাকি কোন ছবি দেখেন নি। তবে কিছুদিন পূর্বে শুনেছিলাম, কোন একখানি বৈদেশিক ছবি তাঁ'ক দেখানো হ'য়েছিল। ছায়াচিত্র সম্পর্কে গান্ধীর পবিষ্কার অভিমতের সংগে আমি পবিচিত নই। তবে একথা ঠিকই, বাংলা ছায়াছবি যদি সত্যই তার সত্যিকারেব সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তবে মহাত্মা গান্ধীব আশীর্বাদ পেতেও তার বেগ পেতে হবে না। অবশ্য বর্ত্তমানের রূপে যে এঁরা কেউই খুশী হবেন না—এইটেই স্বাভাবিক। এবং এঁরা যদি বর্ত্তমান ছায়াছবি দেখেই খুসী হন, তাহ'লে ছায়াচিত্রের কাছে এঁদেব আশা যে আমাদের চেযে বড় নয়, এইটেই ধরে নিতে হবে এবং তাতে বেদনাই অনুভব করবো।

ননীগোপাল পাল (কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা) (১) অশোক কুমার ও কানন দেবী অভিনীত চন্দ্রশেখর চিত্রখানি হিন্দি না বাংলা ? (২) স্বপ্ন ও সাধানা চিত্রে কে কে অভিনয় করছেন।

●● (১) চন্দ্রশেখরের হিন্দি এবং বাংলা উভয় সংস্করণই গৃহীত হচ্ছে। (২) সন্ধ্যা, জহর, নরেশ মিত্র, পরেশ ব্যানার্জি, রেবা ও জীবেন বসু প্রভৃতিকে দেখতে পাবেন। চিত্রখানি শেষ হ'য়ে গেছে।

নৃপেন্দ্রনাথ দে (জামসেদপুর) (১) আমরা অর্থাৎ দর্শকেরা কি বাংলা চিত্রের একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাবো না। উদয়ের পথে—ভাবীকাল প্রভৃতি চিত্রের পর থেকে জাতীয়তাবাদের নামে তার বিকৃত রূপ বাংলা ছবিকে যেন পেয়ে বসেছে। এজন্য কাহিনীকার এবং পরিচালকরাই মূলতঃ দায়ী। তাঁরা মনে করেন নায়ক—নায়িকার মুখে দু'একটা জাতীয়তাবাদের তথাকথিত বুলি জুড়ে দিলেই চিত্রটী সর্বজনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তাঁরা একথাটা কী বোঝেন না যে, বারবার একই কথা দিয়ে দর্শকদের ভোলানো যায় না। এবং এতে দর্শকদের মনে বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি করা হয়। (২) চন্দ্রশেখব ছাড়া অশোক কুমাব কা অন্য কোন বাংলা চিত্রে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ?

●● (১) বর্ত্তমান বাংলা ছবিব বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন আমিও তাব সংগে একমত। জাতীয়তাবাদেব মূল অর্থটী আজও কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রকাশিত—তাই তারা জাতীয়তাবাদের বিকৃত অর্থ নিয়ে মাতামাতি কবে আপনাদের মন জয় করতে চান। আমাদেব পরিচালক বা চিত্রজগতেব তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদ' পরিবেশনকারা কাহিনীকারেরা যে দিন এর সত্যিকারের অর্থ হৃদ্‌গম করতে পারবেন—নিজেদের বর্ত্তমানের দুর্বলতায় তাঁরা লজ্জিত হ'য়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। এবং তখনই হয়ত সত্যিকারের জাতীয়তাবাদের কথা নিয়ে চিত্র গড়ে উঠবে। আজ এঁরা এর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারছেন না বলে অন্ধকারে হাতরিয়ে বেড়াচ্ছেন। তবে এঁদের ভিতর সত্যি যদি সেরূপ কোন আন্তরিক কর্মী থাকেন—এই ভুল ঘাটতে ঘাটতে প্রকৃত সত্যকে একদিন তিনি আবিষ্কার করতে পারবেনই। (২) অশোক কুমার দেবকী বাবুর বিষ্ণুপ্রিয়া চিত্রে নিমাইর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলে শুনেছি।

এইচ, এস. খাসনবীশ (নিউ ওয়াগন স্টোর্স, খড়গপুর) (১) ছবি বিশ্বাস ও জহর গাঙ্গুলির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, (২) অশোককুমার, মতিলাল, সুরেন্দ্র ও ঈশ্বরলালের ভিতর কে শ্রেষ্ঠ পর পব সাজিয়ে দিন।

●● (১) ছবি বিশ্বাস। তবে এমন কতগুলি চরিত্র আছে যেখান ছবি বাবু জহরেব কাছে ম্লান হয়ে পড়বেন। (২) যে ভাবে আপনি সাজিয়েছেন তার রদবদল করতে চাই না।

সাজেদ আলী মীর (দিলখুশা ষ্ট্রীট, পার্কসার্কাস)

●● আপনি ডিমল্যাণ্ড পিকচার্সের পরিচালক মিঃ

উদয়নের সংগে ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে অথবা ৪১, ধর্মতলা ষ্ট্রীটে দেখা করতে পারেন।

বিজয় কুমার পাল (চন্দন নগর) বাংলা প্রদেশের মঞ্চ ও চিত্রের বিভিন্ন বিভাগীয় কলা কুশলীদের শিক্ষিত করবার জন্য জাতীয় নাট্য ও চিত্রকলার শিক্ষা মন্দিরের কল্পনা কি শুধু কল্পনায়ই থেকে যাবে? তথাকথিত পট ও চিত্রের হিতৈষীরা কি বলেন?

●● রূপ মঞ্চের সাংবাদিক বন্ধুরা চিত্র জগতে যাঁদের সংস্পর্শেই এসেছেন, তাঁদেরই এবিষয়ে অবহিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এর প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে অগণী হবে কে? আলাপ-আলোচনা প্রসংগে জনৈক প্রযোজক যাদের ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁদের বলেছিলাম—'আপনাদের স্টুডিও গড়ে উঠলে তার ভিতর একটা চালা-ঘর তুলে দেবেন অন্ততঃ, নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় আমরাই মেতে পড়বো।' উক্ত প্রযোজকের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে—কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন তাঁদের ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত আছে। যদি আর কোন একরূপ উদার মনোভাব সম্পন্ন প্রযোজককে পেতাম—আমরা রূপ-মঞ্চের তরফ থেকেই অগ্রণী হ'য়ে পড়তাম। কিন্তু সেরূপ লোকের সন্ধান কোথায় পাই। এমন কি যদি উত্তর কলিকাতা কোন সহৃদয় ধনী তাঁর একখানি হলঘর আমাদের এই উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে পারতেন, তবু নয় চেষ্টা করে দেখতাম। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ সুধীবৃন্দ এবিষয়ে আমাকে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। নাট্যকার শিশির কুমারের সংগে দেখা করে এবিষয়ে অবহিত করে তুলতেও চেয়েছি—তাঁর পূর্ণ সম্মতি এবং উৎসাহ রয়েছে। তিনি যে পরিকল্পনার আভাষ দিয়েছে তাকে কাযকরী করে তুলতে অন্ততঃ একলক্ষ টাকা চাই। এবিষয়ে আমাদের অন্যতম বন্ধু নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ও নিজেকে সমর্পণ করতে রাজি আছেন। কিন্তু টাকা কোথায়? যদি কোন আদর্শবাদী ধনী এবিষয়ে এগিয়ে আসেন—আমাদের পরিশ্রম দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারি। যাঁদের টাকা আছে—তাঁরা এবিষয়ে মাথা ঘামাবেন না—যাঁদের টাকা নেই, তাঁদের বুকচাপড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। টাকা এবং পরিশ্রমের মিলন হলেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে। এবং এবিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও টেনে আনতে পারতাম। কিন্তু অর্থের জন্য সবই হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তবু ক্ষীণ আশার আলোক আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি। সম্প্রতি একটা সংবাদ শুনে হয়ত খুসি হয়েছেন যে, দেশের কৃষ্টি ও কলার বিভিন্ন গবেষণার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার থেকে দিল্লীতে একটি বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন জাতীয় সরকারের ক্ষমতা অর্জন করলে মনে হয় আমাদের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠবে। তাছাড়া চিত্রজগতের বড় বড় চাঁই'দের দ্বারা যে কিছু হবে, তা আশা-করা বৃথা। তাই অযথা তাঁদের আর টানাটানি করে লাভ কী।

পরেশ চন্দ্র দেব (পিপলাগুল চা বাগান, চান্দখীরা, শ্রীহট্ট) ধরুন একটা Landscape এর পটভূমিকাতে অভিনয়, এই 'Landscape' টাকে কী ভাবে Studio র ভিতরে সংযোজিত করা সম্ভবপর হলো? দৃশ্যপট কী আগেই তৈরী হয়ে থাকে? আর থাকলেও তাতে অভিনেতৃদের সংস্থান কী করে সম্ভবপর? শুধু Land scape এর কথাই নয়, Studio র বাইরেকার সব রকমের দৃশ্যাবলীকেই কী ভাবে আসল ভূমিকাভিনয়ের সংগে Adjust করা হয় এবং সেইটেই বা 'Sound-record'-এর সংগে কী করে খাপ খায়? Studio-তে অভিনেতাদের মাথার উপর Mike থাকে। তাকে চিত্রে দেখিনা কেন? (২) Set এ চিত্র গ্রহণ কী ভাবে নিষ্পন্ন হয়? অবশ্য প্রশ্নটা বোধহয় প্রথম প্রশ্নের সংগেই জড়িত।

●● আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। তবু চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে খানিকটা আভাষ দিয়ে যাচ্ছি—এর ভিতর হয়ত আপনার প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে। প্রথমে ধরুণ, চিত্রগ্রহণ সাধারণতঃ দুই প্রকারের। Outdoor-Shooting-বহির্দৃশ্য গ্রহণ। ষ্টুডিওর বাইরে যে সব দৃশ্য গৃহীত

হয়। আর Indoor-Shooting অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ। স্টুডিওর ভিতরে যেসব দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। ষ্টুডিওর ভিতরই এজন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট তৈরী করা হয় এবং তারই ভিতর দাঁড়িয়ে শিল্পীরা অভিনয় করেন। মাইক যন্ত্রটি তাঁদের মাথার ওপরে ঝুলতে থাকে—তাঁদের কথোপকথন—চুম্বকটী গ্রহণ করে দৃশ্যপটের বাইরে 'সাউণ্ড-ভ্যানে' পোঁছে দেয়—শব্দযন্ত্রী তার ভিতরে বসে থেকে শব্দ গ্রহণ করেন। ঠিক ঐ একই সময়ে চিত্রশিল্পী শিল্পীদের সামনে প্রয়োজনানুরূপ স্থানে তাঁর ক্যামেরাটীকে রেখে চিত্রগ্রহণ করতে থাকেন। পড়ে process-work-এ শব্দ এবং চিত্রকে এক সংগে মুদ্রণ করা হয়। এ বিষয়ে বিশদভাবে জানতে হ'লে ১৩৫১ সালের শারদীয়া রূপ-মঞ্চে শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায় ও যতীন দত্ত লিখিত শব্দ গ্রহণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ দু'টী পড়ে দেখতে পারেন। মাইকটী আপনারা দেখতে পান না এই জন্য যে, ক্যামেরাটী এমন স্থানে রেখে চিত্রগ্রহণ করা হয়, যাতে মাথার উপরে থাকলেও ক্যামেরার আয়ত্তে তা ধরা পড়ে না। আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন 'Lands Cape' কী ভাবে ষ্টুডিওর ভিতর সংযোজিত করা সম্ভবপর হ'লো। Lands Cape-বলতে আপনি কী বুঝেছেন বলতে পারি না। তবে যেমন মনে করুন কোন চা বাগান, কী কোন পাহাড়ের, কী নদীর কূল যদি আমাদের চিত্রগ্রহণের স্থান হ'য়ে পড়ে। তাহলে অনেক সময় সেই সব স্থানে যেয়েও চিত্রগ্রহণ করা হয়—শিল্পী এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে। আবার শুধু ঐ স্থানগুলির চিত্রগ্রহণ করে ষ্টুডিওতে শিল্পীদের চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ করে—'Back-projection' দ্বারা দু'টিকে সংযোজিত করা যেতে পারে। এই প্রসংগে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের মাঝে 'Matte-Shots'এর প্রচলন খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মনে করুন—একটী জাহাজের পটভূমিকায় কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করতে হবে! সব সময় জাহাজের ভিতর যেয়ে চিত্রগ্রহণ করা হয়ত সম্ভবপর হ'লো না—ভাসমান জাহাজের পুরো ফটোটা তুলে নিয়ে এলেন—এখন কেবলমাত্র ডেকের পরিবেশটী ষ্টুডিওতে ফুটিয়ে দৃশ্যপট তৈরী করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে শিল্পীরা অভিনয় করে যেতে পারবেন। তারপর শেষোক্ত চিত্রগ্রহণ পূর্বোক্ত চিত্রগ্রহণের সংগে এমনি ভাবে বসিয়ে দিলেন যে, আপনাদের বুঝবার শক্তি থাকবে না -সত্যিই ঐ দৃশ্যটী জাহাজে বসেই তোলা না ষ্টুডিওতে গৃহীত!

মেঘ বা ঐ ধরণের চিত্র কীভাবে পৃথকভাবে গ্রহণ করে কোন ছবির পশ্চাদপটে জুড়ে দেওয়া হয় সে সম্পর্কে কতকগুলি ছবি ১৩৫১ সালের শারদীয়া রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হ'য়েছিল। এখানে সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা করছি। সাধারণ চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে একটু যাঁদের জ্ঞান আছে, তাঁরাও নিজেদের চিত্রকে সুন্দর রূপ দেবার জন্য এরূপ পদ্ধতি হামেসাই গ্রহণ করে থাকেন: যেমন মনে করুন, আপনি কোন মেঘ ঘনায়িত আকাশের পটভূমিকায় কোন দৃশ্য গ্রহণ করতে চান। অথচ যখন আপনি আপনার নির্দিষ্ট ছবিটীর ফটো তুললেন, তখন আকাশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। আবার যখন আকাশটী মেঘায়িত তখন আপনার নির্দিষ্ট বস্তুটীর চিত্রগ্রহণ আশানুরূপ হ'লো না। তখন দু'টোর পৃথক পৃথক ভাবে চিত্রগ্রহণ করে—এক সংগে জুড়ে দিলে আশানুরূপ ফল পেতে পারেন।

কুমারী লিলি গুপ্তা (দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

●● রূপ-মঞ্চ মারফৎ জনৈকা শিল্পীকে লিখিত আপনার চিঠিখানা প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। বর্তমানে এই ধরণের কোন নূতন বিভাগ আমাদের পক্ষে খোলা সম্ভব নয়—তাই আপনার চিঠি খানা প্রকাশ করতেও যেমনি পারলুম না—তেমনি উক্ত পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাদের এই অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন।

অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ব্যারাকপুর)
শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্র পরিচালক হিসাবে ভাল কি না?

●● শ্রীযুক্ত মিত্র মাত্র দু'খানি চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। যদিও এই দু'খানি চিত্র দিয়ে কারোর প্রতিভার বিচার করা চলে না—তবু তাঁর কোন সম্ভাবনার পরিচয় পাইনি।

সুশীল বসু (বোসকো, লোয়ার সার্কুলার রোড)
(১) বাংলার ঐতিহাসিক বই তুলবার আগ্রহ পরিচালকদের

নেই কেন? যখন পাইকারী রেটে বাংলা ছবি উঠতে আরম্ভ করেছে তখন ঐতিহাসিক বই তোলার সাহস পরিচালকদের হয় না কেন? আমাদের দেশে যখন সব বই ই অপরিণত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের দেখবার আছে তখন নিছক কতকগুলো প্রেম, ন্যাকামী ও ছ্যাবলামীর বই দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের মাথা চিবিয়ে না খেয়ে যদি শিক্ষামূলক এবং ঐতিহাসিক ছবি কিছু কিছু দেখবার চেষ্টা করা যায় তবে কি দেশের উপকার করা হয় না? (২) শুনলাম জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীফণী রায় নাকি একখানা বাংলা বই পরিচালনা করবেন, বইটির নাম কি এবং কোথায় ছবিখানি তোলা হবে? (৩) সত্যেন দত্তের পরিচালিত 'যুগের দাবী' কোথায় এবং কবে আত্মপ্রকাশ করবে?

●● ( ) পরিচালক বা প্রযোজকেরা বলেন, ঐতিহাসিক ছবি তুলতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার অথচ ও টাকা নাকি বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক চিত্র প্রযোজনা ব্যয়-বহুল সন্দেহ নেই—কিন্তু সামাজিক চিত্র থেকে তা প্রযোজক বা কর্তৃপক্ষদের বেশী অর্থ দেবে না একথা আমি স্বীকার করি না। ঐতিহাসিক চিত্র গঠনে যদি ইতিহাসের মর্যাদা না থাকে তাহ'লে অবশ্য কর্তৃপক্ষ কোন মতেই অর্থ আশা করতে পারেন না—একটু এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষা নেই। তাই এই ভয়টাই হয়ত তাঁদের পথে বেশী অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। অর্থব্যয়ের কথা একটা বাজে অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়। দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া নিকৃষ্ট ধরণের সামাজিক ছবি তুলতেও অনেক সময় যে অর্থ ব্যয় করেন—অনেক ঐতিহাসিক ছবি তুলতেও অত অর্থের প্রয়োজন হয় না তারপর শিল্পীদের নামের পেছনে যে টাকা তাঁরা ব্যয় করেন, তার কথাই বা ভুলে যাবো কেমন করে। এই যেমন মনে করুন, চন্দ্রশেখর চিত্রখানির পেছনে যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে (প্রচার বিভাগ থেকে যে ঢাক পেটানো হয় তা থেকেই শুনতে পাচ্ছি) এই অর্থে অতি স্বচ্ছন্দে একখানা ঐতিহাসিক চিত্র গড়ে উঠতে পারতো। এবং আমারত মনে হয় 'চন্দ্রশেখর' কোন সার্থকতা নিয়েই দর্শকদের অভিবাদন জানাতে পারবে না। অবশ্য যদি পারে, আমরা প্রথমেই তাকে অভিনন্দন জানাবো। ছোটদের ছবির বেলায়ও কর্তৃপক্ষ অর্থের অজুহাত দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সে ছবি পয়সা দেবে না। অবশ্য ব্যক্তিগত সাক্ষাতে কয়েকজন প্রযোজককে ছোটদের ছবির অর্থের দিকটা বোঝাতে আমি সমর্থও হ'য়েছি। এবং এই বলে অনেককে অনুরোধও জানিয়েছি—যদি অর্থের সমাগম নাও হয়, তবু অন্ততঃ দু'একখানা করে ছোটদের উপযোগী করে ছবি তোলা উচিত। নিউথিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নাম এই প্রসংগে বর্তমান প্রযোজক গোষ্ঠীর ভিতর সর্বাগ্রে উল্লেখ করলে অপ্রাসংগিক হবে না। রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাৎকার প্রসংগে ছোটদের ছবি তুলবার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এবং 'রামের সুমতির' চিত্রগ্রহণে হস্তক্ষেপ করে তিনি তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে উদ্যোগী হ'য়েছেন, এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'রামের সুমতির' পরিচালনা ভার শ্রীযুক্ত কার্তিক চট্টোপাধ্যায় নামে একজন নবীনের ওপর ন্যস্ত করা হ'য়েছে। আশাকরি ছোটদের কথা চিন্তা করেই ছোটদের উপযোগী করে চিত্রখানিকে তিনি রূপায়িত করে তুলবেন। ( ) হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত ফণী রায় 'উনিশ-বিশ' নামে একখানি বাংলা চিত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। চিত্রখানি রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। (৩) সত্যেন বাবু 'যুগের দাবী' জানাতে যেয়ে তাঁর কাছে আমাদের মত আরো অনেকের ন্যায্য দাবী এমনি ভাবে যেয়ে আঘাত করছে যে, সে দাবী না মেটানো পর্যন্ত 'যুগের দাবী' আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। অনেক সময় আশ্চর্য হ'য়ে যাই—এই সব প্রযোজকদের মনোবৃত্তির পরিচয়ে!

শৈলেন্দ্রনাথ শীল (বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা) (১) তপোভঙ্গের নায়িকা বনানী চৌধুরীর আসল নাম কি? তিনি হিন্দু না মুসলমান। এই নিয়ে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক হ'য়েছে। সে বলছে হিন্দু, আমি বলেছি মুসলমান। (২) শরৎবাবুর চরিত্রহীন কি সিনেমায় রূপায়িত হ'য়েছে।

●● (১) মূলতঃ তিনি মুসলমান ছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় খৃষ্টান। (২) নির্বাক যুগে চরিত্রহীন পর্দায় রূপায়িত হ'য়েছিল।

অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় (রিসড়া, হুগলী)

●● রবিবার বাদে যে কোন দিন ১০—১২টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন রূপ মঞ্চ কার্যালয়ে।

শচীন নন্দী (রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) উদয়ের পথে, অভিযাত্রী, ভাবীকালের মধ্যে কোন বইখানি আপনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন? এদের পর পর সাজিয়ে দিন। (২) সুনন্দা দেবী ও সুমিত্রা দেবীর মধ্যে অভিনয়ে কে শ্রেষ্ঠা। (৩) অভিযাত্রী চিত্রটীকে আপনি কোন শ্রেণীতে ফেলবেন। গানগুলি বিনতা বসু নিজেই গেয়েছেন না অন্য কেউ গেয়েছেন?

●● (১) 'উদয়ের পথে' চিত্রখানি তার পরিচালনার সাবলিল ও সংযত গতির জন্য আমায় মুগ্ধ করেছে। ভাবীকালের কাহিনীর ভিতর সত্যিকারের কাজের যে নির্দেশ ছিল—তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না। কাহিনীর দিক থেকে তাকেই আমি শ্রেষ্ঠ আসন দেবো। তবে সবদিক মিলিয়ে যদি বিচার করতে হয়—উদয়ের পথে, ভাবীকাল, অভিযাত্রীকে এই মান অনুসারে সাজাতে চাই। (২) সুনন্দা দেবী। (৩) সাধারণ ছবি থেকে অভিযাত্রীর বাস্তবিকতাকে আমি অভিনন্দন জানাবো। হ্যাঁ, গানগুলি বিনতা রায়ই গেয়েছেন।

শোভনা বোস (সৈয়দপুর, রংপুর)

●● আপনার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমার পক্ষে তার উত্তর দেওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ, সব ছবি আমি দেখিনি। অথচ না দেখে কারো সম্পর্কে কোন রায় দেওয়াও যুক্তি সংগত হবে না। তাই আমার এই অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন।

অশোক কুমার মৈত্র ও জ্যোৎস্না মৈত্র (মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া) রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার আছে। অবশ্য যাকে ভালবাসি তার সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আছে। রূপ-মঞ্চের গুণমুগ্ধ আমরা। রূপ-মঞ্চকে আমরা সর্বাংগ সুন্দরই দেখতে চাই। রূপ-মঞ্চে একই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ছবি যে অনুপাতে দেখা যায়, ঠিক সেই অনুপাতে নবাগত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ছবি দেখা যায় না। বলা বাহুল্য আমরা একক ছবির কথাই বলছি। নতুন মুখ দেখবার আগ্রহ আমাদের যে বেশী রয়েছে আশাকরি একথা স্বীকার করবেন।

●● আপনারা যাঁরা রূপ-মঞ্চের গুণগ্রাহী এবং শুভাকাঙ্খী আপনাদের অধিকার কোন সময়েই রূপ-মঞ্চ অস্বীকার করবে না। আপনাদের রুচিসম্মত চাহিদা রূপ-মঞ্চে রূপায়িত করবার জন্য আমরা সব সময়ই সচেষ্ট থাকি। আমাদের অক্ষমতায় আপনাদের সমালোচনা এবং উপদেশ বাণী সব সময়ই সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করবো। নূতন শিল্পীদের মুখ রূপ-মঞ্চের পাতায় বেশী দেখতে পান না—তার জন্য দায়ী কতকাংশে আমাদের প্রযোজক প্রতিষ্ঠানগুলি আবার কতকাংশে আমাদের নতুন শিল্পীরাও। প্রযোজক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় কোন নতুনের প্রচার কার্য করতে চান না এই জন্য যে, প্রচার কার্য দ্বারা আজ যেই তাঁরা শিল্পীকে জনপ্রিয় করে তুলবেন—অমনি আগামীকাল তাঁদের ছেড়ে অন্যত্র যেয়ে হাজির হবেন। অথবা এমনই মোড় দিয়ে বসবেন যে, প্রযোজকের কাছ থেকে মোটা অঙ্ক আদায় না করে ছাড়বেন না। নতুন শিল্পীদের এই কৃতঘ্নতার পরিচয় একাধিকবার পাওয়া গেছে বলেই প্রযোজকেরা এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাছাড়া প্রচার কার্যে জনপ্রিয় শিল্পীদেরই আগে স্থান দেওয়া হয়। আর সেটা অন্যায়ও নয়। তবে অন্যায়ভাবে যদি কোন নতুনকে দাবিয়ে রাখবার কথা আমাদের কানে আসে আমরা নিজেরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে সে শিল্পীর প্রচার কার্য করে থাকি। এবং এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট আগ্রহও রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন উমেদারী বা পরিচয়ের দরকার হয় না—যে কোন শিল্পী চিত্র বা নাট্যজগতে পা বাড়িয়ে থাকেন সকলকেই সমানভাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি। এবং

এজন্য তাঁদের কেবল মাত্র ব্লকের খরচাটা বহন করতে হয়। অথচ এই নূতনদের ভিতর এমন অনেকের পরিচয় পাচ্ছি—যাঁদের সততায় আমরা সন্দিহান হ'য়ে উঠছি। সব সময়ই মনে রাখবেন, যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের আর্থিক সংস্থান রূপ-মঞ্চের চেয়েও ভাল। সম্প্রতি জনৈক জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীর এক শ্যালক এসে অভিযোগ করলেন—তিনি কয়েকটী চিত্রে নামছেন, অথচ প্রচার বিভাগ থেকে তাঁর সম্পর্কে কোন প্রচার কার্য করা হচ্ছে না। ভদ্রলোকটীর রেকর্ড জগতেও সুনাম রয়েছে। সদালাপী ভদ্রলোকের বাহ্যিক আবরণও আছে। আমরা তাঁকে যথাযথ সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। তিনি ব্লকের খরচাটী দিয়ে যাবেন বল্লেন—যার পরিমাণ দশটাকার বেশী নয়। নির্দিষ্ট তারিখে ছবিটি দিয়ে গেলেন, ব্লক হ'লো—ছবি রূপ মঞ্চে প্রকাশিত হ'লো—তিনদিনের কথায় তিন চার মাস কেটে গেল—ভদ্রলোকের আর টিকিটিও দেখা গেল না। তাহলে বলুন, সামান্য এই দশটী টাকার জন্য নবাগতদের ভিতর এই তথাকথিত ভদ্রলোকেরা আমাদের সংগেই যে ব্যবহার করেন, প্রযোজকদের সংগে নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরো বেশী মধুর ব্যবহার করেন। তা'হ'লে এদের উপযুক্ত দাওয়াই দেওয়াই কী উচিত নয়? এই ভদ্রবেশী অভদ্রদের জন্যই অন্যের প্রতি আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। তাই, নতুন মুখ কেন সবসময় আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারি না, আশা করি সে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিচ্ছি, যাঁরা সৎ এবং যাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় আমরা পাই, সব সময়ই আপনাদের কাছে তাঁদের উপস্থিত করবো। তাঁরা যদি সৎ হন, সামান্য ব্লকের খরচা বহন করতেও অসমর্থ হন—তাঁদের আর্থিক দৈন্যতার কথা চিন্তা করে তাঁদের আন্তরিকতা ও সততার জন্য রূপ মঞ্চ সে ব্যয় ভার গ্রহণ করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে করেও থাকে

আনোয়ার হোসেন (পানাগড়)

●● আপনার চিঠি খানি আপনার যে উদার এবং প্রগতিশীল দৃষ্টি ভংগীর পরিচয় নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেজন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার সত্যকে মেনে নেবার মত উদারতা এবং সাহস—অন্যের ভিতর না থাকতে পারে ভেবেই চিঠিখানা প্রকাশ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনাদের মত এরূপ উদার মনোভাব নিয়ে সকলেই যদি সমস্ত জিনিষকে বিচার করতে পারতেন, আজ এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কোন ছোঁয়াচই আমাদের স্পর্শ করতে পারতো না। শুধু রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই নয়—একজন খাঁটি হিন্দু হিসাবে আপনার মত মুসলমান ভাইকে আমি আমার আন্তরিক আলিঙ্গন জানাচ্ছি।

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

(মকাইবাড়ী টীস্টেট' কার্শিয়াং)

●● সাংবাদিকের প্রতিভার প্রতি আপনি যে সম্মান জানিয়েছেন পৃথকভাবে রূপ মঞ্চের পাতায় তার স্থান করে না দিতে পারলেও আপনাদের সবাকার প্রতিনিধি হিসাবে রূপ মঞ্চের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে—তা থেকে আপনারাও বাদ যেতে পারেন না। তবু ব্যক্তিগত ভাবে আপনার মত আরো যাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলির স্থান করে দিতে পারিনি, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। সব সময় সবাকার চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এজন্য আমরা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করছি—যাতে বছরে কোন নির্দিষ্ট পাঠক বা পাঠিকার প্রশ্নের উত্তর তিন বারের বেশী দেওয়া হবে না। এবং প্রথম সংখ্যায় যাঁদের উত্তর দেওয়া হবে, পরবর্তী সংখ্যায় আবার সম্পূর্ণ নূতন প্রশ্নকারীর প্রশ্নকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হবে। আপনাদের সবাকার সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থা পরীক্ষা মূলক ভাবে আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি, আশা করি তাতে আপনাদের সকলেরই সহযোগীতা পাবো।

বাংলা সবাক ছায়াছবির প্রথম প্রকাশ

(২)

সংগ্রাহক ঃ শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্ট্)

★

১৯৩৬ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হ'ল।

৬১। **অন্নপূর্ণার মন্দির** * * * কালীফিল্মস্
প্রথম আরম্ভ—১৩-৬ ৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু : সুর-শিল্পী—শ্রীনীরেন লাহিড়ী। ভূমিকায়—ছবি, ফণী, মৃত্যুঞ্জয়, জীবেন, প্রভা, মনোরমা, মায়া, সাবিত্রী ও প্রকাশমণি।

৬২। **আবর্ত্তন** * * * পপুলার পিক্চার্স
প্রথম আরম্ভ—৯-৫-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী--শ্রীনিশিকান্ত বসু রায় : পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী—মিঃ ভি, ভি, দাতে : শব্দ-যন্ত্রী মিঃ এ, গফুর। ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, জীবন, শরৎ, লীলা, মীরা, শেফালিকা।

৬৩। **একটী কথা** ★ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্চার্স
প্রথম আরম্ভ—৮-২-৩৬ : চিত্র-গৃহ—ছায়া : কাহিনী ও পরিচালনা -শ্রীতুলসী লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস। ভূমিকায়- তুলসী লাহিড়ী, আব্বাসউদ্দিন, কমলা ঝরিয়া।

৬৪। **কালপরিণয়** * * * কালীফিল্মস্
প্রথম আরম্ভ -৪-৪-৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্র-নাট্য—শ্রীআশুতোষ সান্যাল : আলোক-শিল্পী—শ্রীননীগোপাল সান্যাল : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধুশীল। ভূমিকায়—তিনকড়ি, জীবন, জহর, শীতল, মনোরঞ্জন, শৈলেন, রাণীবালা, মায়া, হরিসুন্দরী, চুনিয়াবালা, বীণা।

৬৫। **কৃষ্ণসুদামা** * * * রাধাফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২৯-২-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণধন দে : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্ম্মা : আলোক-শিল্পী—শ্রীবীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল : সংগীত—শ্রীঅনাথ বসু ও শ্রীমৃণাল ঘোষ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, মৃণাল, তুলসী, কানন দেবী, রাধারাণী, শান্তি, পূর্ণিমা, বীণা।

৬৬। **কীর্ত্তিমান** ★ রাধাফিল্ম
প্রথম আরম্ভ— ৫-১২-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীঅখিল নিয়োগী : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায় ভূমিকায়—তুলসী, সন্তোষ, অজিত, রেবা, চপলা।

৬৭। **গৃহদাহ** * * * নিউথিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১০-১০-৩৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : আলোকশিল্পী -শ্রীবিমল রায় : শব্দযন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ভূমিকায়—বড়ুয়া, বিশ্বনাথ, অমর, কৃষ্ণচন্দ্র, যমুনা, মলিনা।

৬৮। **জোয়ার ভাঁটা** ★ কোয়ালিটি পিক্চার্স
প্রথম আরম্ভ—১০-·-৩৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য : আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস, মিঃ ভি, ভি, দাতে : শব্দযন্ত্রী—মিঃ এ, গফুর : সংগীত—শ্রীবিনোদ গাঙ্গুলী : ভূমিকায়—লীনা, বিনয়, নির্ম্মল, জিতেন, নবদ্বীপ।

৬৯। **ঝিন ঝিনিয়ার জের** ★ রাধাফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২৯-২-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীফণী বর্ম্মা। ভূমিকায়—কুমার, অনাথ, তারক, জানকী।

৭০। **তরুবালা** * * * রীডেন কোম্পানি
প্রথম আরম্ভ—১-২-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীঅমৃতলাল বসু : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার আলোক শিল্পী—মিঃ পল ব্রিকে ও মিঃ মংলু : শব্দযন্ত্রী—মিঃ এ ব্র্যাডবার্ণ ও মিঃ বালকৃষ্ণ : সংগীত—শ্রীনীরেন লাহিড়ী।

ভূমিকায় অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, জহর, শৈলেন, প্রভা, জ্যোৎস্না, বীণা, পদ্মা, কমলা ঝরিয়া।

৭১। **দ্বীপান্তর** * * * ডি, জি, টকীজ
প্রথম আরম্ভ—১৮-৭-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : পরিচালনা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোকশিল্পী—শ্রীননীগোপাল সান্যাল : শব্দযন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—মোহন, ডি, জি, বিভূতি, হরেন, ঊষা, নালিমা, অমিতা, করুণা, মাষ্টার রূপলাল।

৭২। **প্রফুল্ল** * * * কালীফিল্মস্
প্রথম আরম্ভ—১৪-১-৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ : পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীননীগোপাল সান্যাল : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রী মধুসূদন শীল। ভূমিকায়-তিনকড়ি, অহীন্দ্র, শৈলেন, জহর, নরেশ, জীবন, যোগেশ, বিনয়, শেফালিকা, প্রভা, রাণীবালা।

৭৩। **পথের শেষে** * * * ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস
প্রথম আরম্ভ—১৪-৩-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীনিশিকান্ত বসু : চিত্রনাট্য ও পবিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজ্যোতিষ সিংহ : সংগীত—শ্রীসত্যানন্দ দাস। ভূমিকায়—রতীন, জহর, নরেশ, ভূমেন, সন্তোষ, জ্যোৎস্না, মনোরমা, ছায়া, পদ্মা।

৭৪। **পণ্ডিত মশাই** * * * পপুলার পিক্‌চার্স
প্রথম আরম্ভ—২৮-১১-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চিত্র নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীমধুসূদন শীল : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত। ভূমিকায় - রতীন, রবি, তিনকড়ি, যোগেশ, মনোরঞ্জন, শান্তি, প্রভা, রেণুকা, রাণীবালা।

৭৫। **পরপারে** * * * চন্দ্র ফিল্মস্
প্রথম আরম্ভ—৪-৭-৩৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় : পরিচালনা—শ্রীযতীন দাস : আলোক শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজ্যোতিষ সিংহ। সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, নির্মলেন্দু, মনোরঞ্জন, ভূমেন, শৈলেন, সন্তোষ, জ্যোৎস্না, বীণা, নিভাননী।

৭৬। **বেজায় রগড়** * * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ ১০-৮ ৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী। আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ এ, গফুর। ভূমিকায়—তুলসী, কৃষ্ণধন, সত্য, ঊষাবতী, গিরি, রেণু।

৭৭। **বাঙ্গালী** * * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স
প্রথম আরম্ভ—১০ ৮-৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায : পবিচালক- শ্রীচারু রায়। আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ যন্ত্রী—মিঃ এ, গফুর সংগীত—শ্রীতুলসী লাহিড়ী। ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, নির্মলেন্দু, তুলসী, ধীরাজ, শরৎ, হরিদাস, ভানু, কার্তিক, মনোরমা, পদ্মা, মীরা, কমলা ঝরিয়া।

৭৮। **বিষবৃক্ষ** * * * রাধা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—১৫-১২ ৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পবিচালনা—শ্রীফণী বর্মা। আলোক শিল্পী—শ্রীবারেন দে : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল ও শ্রীভূপেন ঘোষ : সংগীত—শ্রীপৃথ্বিরাজ ভাদুড়ী ও শ্রীকুমার মিত্র। ভূমিকায়—জহর, ভূমেন, কুমার, তুলসী, তারক, কানন দেবী, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, রেনুকা রায়।

৭৯ **বিজয়া** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২২-১০-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পবিচালনা - শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস : আলোক-শিল্পী—শ্রীপঙ্কু চৌধুরী : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীতিমির বরণ। ভূমিকায়—পাহাড়ী, অমর, শ্যাম, ইন্দু, পরেশ, কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রাবতী, আরতি, হেমনলিনী।

৮০। **ব্যথার দান** * * * কোয়ালিটি পিক্‌চার্স
প্রথম আরম্ভ ১০-৪-৩৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীহেম গুপ্ত : আলোক-শিল্পী—মিঃ ভি ভি দাতে : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ এ গফুর : সংগীত—শ্রীবিনোদ গাঙ্গুলী। ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, হেম, প্রীতি, শিশুবালা, ইলা।

৮১। **ভোটভণ্ডুল** ★ **কালী ফিল্ম**
প্রথম আরম্ভ—১৩-৬-৩৬ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী-শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু ভূমিকায়—সন্তোষ, শৈলেন, নীবদাসুন্দরী, কোহিনুর।

৮২। **মায়া** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২৩-১০-৩৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : আলোক শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দযন্ত্রী -বাণী দত্ত : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল ও শ্রীপঙ্কজ মল্লিক ভূমিকায় পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র, যমুনা, সিতারা।

৮৩। **মহানিশা** * * * মহানিশা ফিল্ম
প্রযোজক—শ্রীশিশির মল্লিক : কাহিনী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী : প্রথম আরম্ভ—২-৫-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : পরিচালনা ও চিত্র নাট্য—শ্রীনরেশ মিত্র : আলোক শিল্পী—শ্রীঅশোক সেন : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ এস এন সিং : সংগীত—শ্রীঅমর বসু। ভূমিকায়—রবি, জহর, যোগেশ, নরেশ, ইন্দু, পারুল, চারুবালা, রাজলক্ষ্মী, পদ্মাবতী

৮৪। **মন্দাকা** ★
প্রথম আরম্ভ—২২-১০-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী :

৮৫। **রজনী** * * * দেবদত্ত ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—৮-৮-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীগীতা ঘোষ ও মিঃ বি ঘোষ : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসমর ঘোষ : সংগীত—শ্রীরামচন্দ্র পাল। ভূমিকায়-অহীন্দ্র, রবি, মৃণাল, চারুবালা, রেনুকা রায়।

৮৬। **শ্যামসুন্দর** ★ ডি জি টকীজ
প্রথম আরম্ভ—১৮-৭-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : পরিচালনা শ্রীহেম গুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস।

৮৭। **শিবরাত্রি** ★ বড়ুয়া পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৯৩৬ : চিত্রগৃহ—১৯৩৬ সালের শিবরাত্রির দিন কলকাতার বাঙ্গালী পরিচালিত প্রায় সব কয়টি চিত্রগৃহে দেখান হয়। প্রযোজনা—অরোরা ফিল্মস্ পরিচালনা শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মিত্র : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : ভূমিকায় বাণী, মণি, কৃষ্ণ, শেফালিকা।

৮৮ **সোনার সংসার** * * * ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ ২১-১০-৩৬ : চিত্রগৃহ উত্তরা : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীদেবকীকুমার বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ যন্ত্রী—মিঃ সি, এস, নিগাম : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ভূমিকায় অহীন্দ্র, জীবন, ধীরাজ, তুলসী, যতীন নির্মল, সত্য নবদ্বীপ, ভূপেন, বিজয় কার্তিক, ছায়া, মেনকা, কমলা, জাহ্নবী।

৮৯ **সরলা** * * * ফার্ষ্ট ন্যাশানাল
প্রথম আরম্ভ—২-৮-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীতারকনাথ গাঙ্গুলী : পরিচালনা—শ্রীচারু রায় : আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ গফুর : সংগীত—শ্রীনিতাই মতিলাল। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, কৃষ্ণধন, তারাকুমার, পদ্মা, সরলা, মনোরমা, সুশীলা, রাধারাণী।

৯০ **হরিশ্চন্দ্র** * * *
প্রথম আরম্ভ—২৪-১১-৩৬ : চিত্রগৃহ—বিজলী ও ছবিঘর : পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ : আলোক শিল্পী—পল ব্রিকে,টি, মার্কনি, ডি জি গুনে, ও মংলু : শব্দ-যন্ত্রী মিঃ এ আর ব্যাডবর্ণ ভূমিকায় ভাস্কর, বিনয়, ভানু, শান্তি, লীলা।

৯১। **হ্যাপিক্লাব** ★ পপুলার পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—৪-৩-৩৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী ও পূর্ণ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : আলোক শিল্পী ও শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবিভূতি দাস। ভূমিকায়—তুলসী, প্রভাত, চৈতন্য, গিরিবালা।

১৯৩৭ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল।

৯২। **আলিবাবা** * * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৩-২-৩৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ : পরিচালক—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী

—শ্রীবিভূতি দাস ও শ্রীগীতা ঘোষ : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ এ গফুর : সংগীত—মিঃ ফ্র্যাঙ্গোপোলো ও মিঃ নাগর : নৃত্য—শ্রীমতী সাধনা বসু : ভূমিকায়—বিভূতি, কমল মধু, মেহবা, প্রীতি, কালী, সাধনা, সুপ্রভা, ইন্দির।

৯৩। আধুনিক রোগ ★

৯৪। ইন্দিরা * * * ডি জি টকীজ

প্রথম আরম্ভ ১০-৭-৩৭ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীতড়িৎ বসু : আলোক-শিল্পী—মিঃ যশোবন্ত ওয়াশীকার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসমর ঘোষ : সংগীত—শ্রীবামচন্দ্র পাল। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, বিনয়, হরিচরণ, বেচু, ললিত, ফণী, জ্যোৎস্না, শেফালিকা, মনোরমা, ইন্দুবালা।

৯৫। ইম্পস্টার * * * নিউ পপুলার

প্রথম আরম্ভ—১৮-৯-৩৭ : চিত্রগৃহ—শ্রী : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—যতীন, মনোরঞ্জন, রবি, হরেন, রঞ্জিত, শান্তি, নিভাননী, লতিকা, অরুণা, সুহাসিনী।

৯৬। কচি সংসদ ★ কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—২০-১-৩৭ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীপরশুরাম : পরিচালক—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : সংগীত—শ্রীহরি প্রসন্ন দাস। ভূমিকায়—ললিত, তারা, বিজয়, সন্তোষ, নরেশ, গগন, প্রফুল্ল উষা, চিত্রা, পদ্মা, গাত্রেয়ী।

৯৭। কেমন জব্দ ★

৯৮। গ্রহেরফের * * * দেবদত্ত ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—৫/৮-৩৭ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীনরেশ সেনগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীচারু রায় : আলোক-শিল্পী—যশোবন্ত ওয়াশিকার, মণিগুহ ও গৌরহরি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—সমর ঘোষ, সত্যেন দাশগুপ্ত ও চুণিলাল দাস : সংগীত—কাজী নজরুল ইসলাম। ভূমিকায়—রাধিকানন্দ, রবি, সুবোধ, ভোলা, সতীশ, শীলা, রমলা, দেববালা, মনোরমা।

৯৯। ছিন্নহার * * * রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—২৫-৯-৩৭ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীঅপরেশ মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীহরি ভঞ্জ : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল ও শ্রীভূপেন ঘোষ : সংগীত আবহ—শ্রীকুমার মিত্র, শ্রীযুগল গোস্বামী : সংগীত শ্রীমৃণাল ঘোষ, শ্রীপৃথ্বীশ ভাদুড়ী। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, মন্মথ, রবি, মৃণাল, শৈলেন, মায়া, নিভাননী, রেণুকা, শান্তি, ছায়া।

১০০। দস্তুরমত টকী * * * কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১৪-১-৩৭ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীশিশির ভাদুড়ী ও শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু। ভূমিকায়—শিশির, অহীন্দ্র, শৈলেন, বিশ্বনাথ, কঙ্কা, রাণীবালা।

১০১ দিদি * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—৩-৪-৩৭ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : চিত্র-নাট্য, পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীনিতীন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু : সংগীত শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, শ্রীপঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, সায়গল, অমর, ভানু, ইন্দু, চন্দ্রাবতী, লীলা দেশাই, দেববালা।

১০২। প্রভাস মিলন * * * রাধা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—৯-১০-৩৭ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণধন দে : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীভূপেন ঘোষ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রবি, তুলসী, মৃণাল, কুমার, সুশীল, শান্তি, মায়া, রেণুকা, ছায়া, পূর্ণিমা।

১০৩। বড়বাবু ★ কালী ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১-৫-৩৭ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী ও সংগীত—শ্রীরঞ্জিত রায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : শব্দযন্ত্রী—

শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—প্রফুল্ল, রঞ্জিৎ, আশু, ঊষা, অর্পণা।

১০৪। **মুক্তিস্নান** * * * কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২৪-৭-৩৭ : চিত্রগৃহ উত্তরা : কাহিনী—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : সংগীত—শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। —ভূমিকায় জীবন, কৃষ্ণধন, নৃপতি, সত্য, হবেন, সন্তোষ, বাণীবালা, চিত্রা, হরসুন্দরী, সুরবালা, ফুল্লনলিনী।

১০৫। **মায়াকাজল** ★ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৩-২-৩৭ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : ভূমিকায় তুলসী, গণেশ বিজয়, ঊষাবতী।

১০৬। **মুক্তি** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১৮-৯-৩৭ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : পরিচালক—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। ভূমিকায়—বড়ুয়া, পঙ্কজ, অমর, ইন্দু, শৈলেন, কানন দেবী, মেনকা দেবী।

১০৭। **মালা বদল** ★ কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২০-১১-৩৭ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীসুবোধ রায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—অর্ধেন্দু, নরেশ, প্রফুল্ল, চিত্রা, সবিত্রী, দেববালা।

১০৮। **রাঙাবৌ** * * * মতিমহল থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২২-৫-৩৭ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী, কাহিনী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ সি, এম, নিগাম : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। ভূমিকায়—জীবন, রতীন, মনোরঞ্জন, নির্মলেন্দু, অমল, ছায়া, মেনকা, রাধারাণী, মীরা।

১০৯। **রাজগী** * * * কমলা টকীজ
প্রথম আরম্ভ—১৮-২-৩৭ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীনরেশ সেনগুপ্ত : চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—ধীরাজ, শৈলেন, মণি, সত্য, কানু, মেনকা, অরুণা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, দেবীকা।

১১০। **শম্ভীনাথ** * * * চিত্র মন্দির
প্রথম আরম্ভ—১৭-৮-৩৭ : চিত্রগৃহ রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকর্মযোগী রায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ ভি ভি দাতে : শব্দ যন্ত্রী—মিঃ এ গফুর : সংগীত—শ্রীঅনাথ বসু। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রতীন, ফণী, মোহন, মীরা, জ্যোৎস্না, দেববালা মনোরমা।

১১১। **সরকারি জামাই** ★

১১২। **হারানিধি** * * কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—১ ৫ ৩৭ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ : পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, তিনকড়ি, হবেন, ছবি, সত্য, প্রভা, রাণীবালা, মায়া, ঊষা, সাবিত্রী।

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে রূপ-মঞ্চ অভিনন্দিত

নূতন বছরে পাঠক সাধারণকে প্রণতি জানিয়ে প্রথমেই যে সংবাদটী দিচ্ছি—আমাদের মত সে সংবাদটী তাঁদেরও যে খুশী করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে আন্তঃ এশিয়া সংবাদ-পত্র সম্মেলনীতে রূপ-মঞ্চের বিশেষ আমন্ত্রণের কথা গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে তিন হাজারেরও বেশী পত্র-পত্রিকা 'এশিয়ান নিউজ ফেয়ারে' যোগদান করেন। ইরাক, ইরাণ, আজার বৈজান, চীন, ইন্দোচীন—ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাগত সুধীবৃন্দ, ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং দর্শক সাধারণের জন্য এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হয়। এই তিন হাজার পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে বেছে বেছে একটা এ্যালবামে সাজিয়ে রাখা হয়। রূপ মঞ্চ এশিয়ার বিশিষ্ট পত্র পত্রিকাগুলির মাঝে এই বিশিষ্ট সম্মান লাভে সমর্থ হয়। এ্যালবামে সজ্জিত থেকে রূপ-মঞ্চ অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে শ্রদ্ধেয় দিগদেশাগত প্রতিনিধিদের রূপ-মঞ্চ উপহার দেবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত সংখ্যা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে অনুরোধ করা হ'য়েছিল। উদ্যোক্তারা সে অনুরোধ রক্ষা করে রূপ-মঞ্চকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। এবং সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ, এ্যালবামে সজ্জিত রূপ-মঞ্চ দেখে ভাষাগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিধিরা—তাঁদের নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। এশিয়ান নিউজ ফেয়ারের কর্তৃপক্ষ—এই সংবাদটীর সংগে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে যথাসময়ে তার করেন—তাঁরা লেখেন—**Thanks telegram. Papers displayed circulated news follows……News fair grand success. Papers displayed prominently. Receiving alround appreciation.** রূপ-মঞ্চের এই যে গৌরব, এই গৌরবের পেছনে রয়েছেন রূপ-মঞ্চের অগণিত পাঠক সাধারণ—তাই আমরা রূপ-মঞ্চের কর্মীরা তাঁদের সর্বাগ্রে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত বিরাট চন্দ্র মণ্ডল আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে এবং এশিয়ান নিউজ ফেয়ারে প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংস্কৃতি পরিষদ (শিলচর, আসাম)

সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে বর্ষ আহ্বান উৎসব খুব জাক জমকের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল—খেলাধুলা, গল্প, শিল্প-প্রদর্শনী, নাচ-গান, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রতিযোগিতার কিশোরদের অংশ গ্রহণ। উৎসবের তিনদিন পূর্বেই ইণ্ডিয়া ক্লাবের মাঠে ছেলেদের দৌড়-ঝাঁপ, হাডু ডু ডু, ফুটবল জমে উঠে আর শিলংপট্টি মাঠ কেঁপে উঠে মেয়েদের সোরগোলে। নর্মাল স্কুল হ'লে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত। উৎসব দিবসে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বিচিত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সুধীর ভট্টাচার্য। 'এসো হে বৈশাখ, এই উদ্বোধন সংগীতটী দিয়ে সভার কায আরম্ভ করা হয়। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী 'সবপেয়েছির আসর' সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আসরের পক্ষ থেকে রেবা ও পূর্ণিমা, রেণু ও রেখা এবং দশ বছরের একটী ছোট্ট মেয়ে যথাক্রমে নৃত্য-গীত ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে। এর পর কিশোর পরিষদের শিল্পীরা 'ডাক ঘর' অভিনয় করে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য 'সংস্কৃতি পরিষদে'র সভ্যরা 'নবারুণ' নামে একটী সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। নবারুণ সম্পাদনা করছেন শ্রীশান্তি রঞ্জন চন্দ্র। নবারুণের প্রথম সংখ্যাটি আমরা পেয়েছি, এতে লিখেছেন—বিপ্রদাস রায়, যোগমায়া মুখোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, শোভন সোম, 'শ্রী', রণজিৎ দত্ত, বিভূতি দত্ত, নিখিলেশ দত্ত, হেনা বন্দোপাধ্যায়, সবিতা চক্রবর্তী, শ্রীপাচু এবং বিনয়েন্দ্র সান্যাল। নবারুণে নবীনেরা যে ডালি সাজিয়েছেন—তাতে তাঁদের সম্ভাব্যকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ছায়াচিত্রে 'বিবেকানন্দ'

জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমর মল্লিকের প্রযোজনায় 'বিবেকানন্দ' পর্দায় রূপায়িত হ'য়ে উঠছে। গত ১লা বৈশাখ, ১২ প্রিন্স আনোয়ারসা রোডস্থিত নিউথিয়েটার্স স্টুডিওতে 'বিবেকানন্দের' শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। আমরা শ্রীযুক্ত মল্লিকের প্রযোজক-জীবনের সাফল্য কামনা করি।

এস, বি, প্রডাকসন

শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত নবগঠিত এস, বি, প্রডাকসনের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দৃষ্টিদান' এর শুভ মহরৎ উৎসব গত ১১ই বৈশাখ নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীদাস। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত নীতিন বসু। শ্রীমতী সুনন্দা দেবীও এই প্রযোজক প্রতিষ্ঠানটীর সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত রয়েছেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করছি।

বাগচী পিকচার্স

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী প্রযোজিত এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটী একখানি নৃত্য-গীত বহুল হিন্দি চিত্র প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী। আচার্য রাম কৃষণ মিশ্র চিত্রখানির সুরশিল্পী নির্বাচিত হ'য়েছেন। এবং প্রধান কর্মসচিবরূপে কাজ করছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গাঙ্গুলী ও লীলা দেবীকে বিশিষ্টাংশে দেখা যাবে। আমরা বাগচী পিকচার্সের সাফল্য কামনা করছি।

কিশোর নাট্যাভিনয়

আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, দক্ষিণ কলিকাতার 'কালিকা' রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ শিশু নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা গল্পচ্ছলে ছোটদের শিক্ষাদানের যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন—তাঁকেই অবলম্বন করে যুগান্তরের স্বপনবুড়ো নাটকটী রচনা করেছেন। 'কালিকা'র

অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী মহাশয় আমাদের সংগে আলোচনা প্রসংগে ছোটদের উপযোগী নাটক মঞ্চস্থ করবার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বিষ্ণুশর্মার উপদেশাবলী নিয়ে নাটক রচনার কথা বহুদিন পূর্বে ব্যক্ত করেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাঁর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তুলছেন এবং আমাদের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে কার্যকরী করে তুলছেন জেনে—আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিশুদের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রূপ-মঞ্চ তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের অবহিত করে আসছে। শুধু তাই নয়, এবিষয়ে রূপ-মঞ্চের তরফ থেকেই সর্বপ্রথম পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চে শিশু নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রূপ-মঞ্চের এই আন্দোলন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছোটদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। আজ আমাদের সকলের আন্দোলন সার্থক হ'তে চলেছে—তাই এই প্রসংগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদেরই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র দাস শিশুদের উপযোগী দৃশ্যসজ্জার ভার নিয়েছেন। সংগীত পরিচালনার জন্য যশস্বী শিল্পী রণজিৎ রায় যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন। আমাদের জনপ্রিয় শিশু অভিনেতা মাস্টার মিন্টুকে বিশেষ অংশে দেখা যাবে।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটার্স লিঃ

শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের জয় যাত্রার কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সুনন্দা, সুমিত্রা, দেবী, জহর, ধীরাজ, অহীন্দ্র, কৃষ্ণধন প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত।

জনপ্রিয় গীতিকার শ্রীযুক্ত প্রণব রায় 'রাঙ্গামাটী' চিত্রখানির পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। শ্রীযুক্ত রায়কে এই সর্বপ্রথম চিত্রপরিচালকরূপে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে একটী বহির্দৃশ্যের জন্য শ্রীযুক্ত রায় তাঁর দলবল নিয়ে ঠাকুর-পুকুর গ্রামে গিয়েছিলেন—জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিপ্রা দেবীও এদের মাঝে ছিলেন। 'রাঙ্গামাটী' একটী ছেলে এবং মেয়ের দেশ এবং দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগের কথা নিয়ে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। জনপ্রিয় গায়ক সত্য চৌধুরী এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে এই সর্বপ্রথম একসংগে দেখা যাবে। 'রাঙ্গামটী'র কাহিনীটী শ্রীযুক্ত রায়েরই রচনা। সংগীত পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত ও অজয় কর।

রূপাঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'অলকানন্দা' (অলক নন্দা নহে) র পরিবেশনা স্বত্তও এঁরা লাভ করেছেন। নাট্য-কার মন্মথ রায়ের এই কাহিনীটীকে চিত্রে রূপায়িত করে তুলেছেন শ্রীযুক্ত রতন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র 'অলকানন্দার' সুর সংযোজনা করেছেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন—পূর্ণিমা, প্রমিলা, পরেশ, নবাগত প্রদীপকুমার, (২৭ পৃষ্ঠায় যাঁর ছবি প্রকাশিত হ'য়েছে।) অহীন্দ্র, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রবি রায়, আশু বোস, ডাঃ হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্র-সম্পাদক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'ভ্যারাইটী ষ্টোর্স' চিত্রখানিও এঁদের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানি রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। তাছাড়া এ, এল প্রোডাকসন্সের 'ঘরোয়া' এবং লক্ষীনারায়ণ পিকচার্সের 'আমার দেশ'-এর পরিবেশনা সত্তও এঁরা লাভ করেছেন। চিত্র দু'খানি যথাক্রমে পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মণি ঘোষ ও অনাথ মুখোপাধ্যায়। 'ঘরোয়া'র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল।

মহাজাতি ফিল্ম করপোরেশন

এই নামে সম্প্রতি একটী নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'তরুণের স্বপ্ন' উপন্যাসখানিকে এঁরা চিত্ররূপায়িত করে তুলতে মনস্থ করেছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন অনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা ও সুর সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সত্য ঘোষ। শ্রীনির্মল গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের প্রধান ব্যবস্থাপক নির্বাচিত হয়েছেন এবং কর্ম সচিব রূপে কাজ করছেন সত্যেন মিত্র।

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিঃ

শ্রীযুক্ত সুনীল মজুমদারের পরিচালনায় এঁদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'সাহারা'র কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। শত শত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাসি-কান্নার কথা নিয়ে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাহিনী রচনা করেছেন বলে প্রকাশ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা উপন্যাসিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহারা'র সংলাপ লিখেছেন। শ্রীযুক্ত খগেন দাশগুপ্ত চিত্রজগতে যদিও এই প্রথম তাঁর সংগে সংগীত শিল্পীরূপে আমাদের সংগে সাক্ষাৎ হবে—আলোচ্য চিত্রের সংগীত পরিচালনায় দর্শকদের মন জয় করবার দৃঢ়তা নিয়েই তিনি চিত্রজগতে পা বাড়িয়েছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার অনুভা রায় নামে একজন নবাগতাকেও দর্শকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, প্রভা, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীপ্রিয়া, অহীন্দ্র চৌধুরী, বিপিন মুখোপাধ্যায়, সাধন সরকার, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, মণিশ্রীমানী, শরৎদাস, লক্ষ্মী এবং আরো অনেককে।

নূতন প্রেক্ষাগৃহ

গত ১৬ই মার্চ পানিহাটীতে 'মীনা' চিত্রগৃহটীর উদ্বোধন করেন নাট্য-গুরু শিশির কুমার ভাদুড়ী। অধ্যাপক হরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বস্তিবচন পাঠ করেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র নাথ পুরী, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, অখিল নিয়োগী, রূপ মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এম, জি, এম-এর কতগুলি খণ্ডচিত্র দেখানোর পর উপস্থিত অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মিঃ দাশগুপ্ত, মীনার প্রেক্ষাগৃহের স্বত্বাধিকারী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং-এর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তাঁদের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়—অতিথিদের প্রতি সর্বদা যত্নপর

ছিলেন। 'মীনা' শুধু তার দেহ সৌষ্ঠবেই নয়—আত্মিক মাধুর্যে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণার চিত্র প্রদর্শন করে স্থানীয় দর্শক সাধারণের সহানুভূতি লাভ করুক—তাই আমরা চাই।

আগ্রা বাঙ্গালী সমিতি

আগ্রা বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। স্থানীয় ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন গ্রাউণ্ড এবং ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউটে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সভ্যবৃন্দ কর্তৃক বিধায়কের 'তাইতো' এবং জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'হাউস ফুল' নাটক অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধীর বন্দ্যো পাধ্যায়, হিমাংশু রায়চৌধুরী প্রভৃতি সমিতির তরফ থেকে উদ্যোগ আয়োজন করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুরেন্দ্র নাথ দত্ত ও ভূজঙ্গ ভূষণ ঘোষ।

বেঙ্গল ফিল্মস

এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র 'সাধক রামপ্রসাদের' কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। 'রামপ্রসাদের' সংলাপ ও কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ গুপ্ত। সাধক রামপ্রসাদের কাহিনী এবং পরিচালনা নিয়ে নানান পরিবর্তনের পর যা দাঁড়িয়েছে, আমাদের বর্তমান সংবাদ পরিবেশন তারই পর নির্ভর করে পরিবেশিত হচ্ছে। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন। শ্রীযুক্ত সেন খ্যাতনামা বৈদেশিক পরিচালক ও প্রযোজক মিঃ আলেক-জাণ্ডার কোর্ডার সহকারী রূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সাধক রামপ্রসাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগত সুজিত চক্রবর্তী। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় এই নবাগতের ভিতর সম্ভাবনার পরিচয় দেখতে পেয়েই তাঁকে নিয়ে অনেক চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাছে উমেদারী করে-ছিলেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল ফিল্মের কর্তৃপক্ষ সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি নতুনের ভবিষ্যৎ শিল্প-জীবন সার্থকতায় ভরপুর হ'য়ে উঠবে। অন্যান্যাংশে অভিনয় করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, প্রভাত সিংহ, বেচুসিংহ, তুলসী লাহিড়ী, শিশুবালা, সাবিত্রী, মনিশ্রীমানী রোকেন চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে সর্ব প্রথম পরিচালক রূপে আমরা দেখতে পাবো—চিত্রজগতে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুর এই আগমনকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইষ্টার্ণ মুভিজ লিঃ (গৌহাটী)

এঁদের প্রযোজিত অসমিয়া চিত্র 'বদন বরফুকন' শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 'আলেয়া' প্রেক্ষাগৃহে চিত্র খানির এক বিশেষ প্রদর্শনী হ'য়ে গেছে। উক্ত প্রদর্শনীতে আমাদের আমন্ত্রণ আসলেও রক্ষা করতে পারিনি বলে দুঃখিত। এবং চিত্রখানি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারলুম না। শুধু ইষ্টার্ণ মুভিজ লিঃ-এর কর্তৃপক্ষকেই নয়—চিত্রজগতের অন্যান্য কর্তৃপক্ষকেও আমরা অনুরোধ করছি—যখনই তাঁরা তাঁদের চিত্র প্রদর্শনীতে আমাদের আমন্ত্রণ করতে চান, অন্ততঃ তিন দিন পূর্বে সে আমন্ত্রণ লিপি পাঠাবার যেন ব্যবস্থা করেন। নইলে আমাদের পক্ষে কোন অনুষ্ঠানেই যোগদান করা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। প্রথমত. আমাদের প্রতিনিধিরা নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন —উপযুক্ত সময় হাতে না পেলে কে কোথায় প্রতিনিধিত্ব করবেন—আমাদের পক্ষে তা স্থির করা খুবই অসুবিধাজনক হ'য়ে ওঠে। তারপর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণ লিপির সংগে সংগে আমন্ত্রণ রক্ষা করা যে সম্ভব নয়— আশা করি তাঁরা তা বুঝবেন। যদি আমন্ত্রণে আমাদের উপস্থিতি তাঁরা কামনা না করে নিছক ভদ্রতার মনোবৃত্তি নিয়েই আমন্ত্রণ জানান, আমাদের বলবার কিছু নেই। এবং আমন্ত্রণ না করলেও আমরা যে মোটেই দুঃখিত হবো না—সে আশ্বাস তাঁদের দিচ্ছি। সমালোচনার জন্য ছবি বা নাটক আমাদের দেখতেই হয় এবং সেজন্য কাগজের পক্ষ থেকেই আমাদের সমালোচকদের জন্য প্রবেশ পত্র ক্রয় করা হয়—আমাদের সুযোগ এবং সুবিধামত। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় কোনদিনই আমাদের সমালোচকেরা কর্তব্যের অবহেলা করেন না। আমরা যেসব আমন্ত্রণে

যোগদান করি, তা শুধু ভদ্রতার খাতিরেই—প্রয়োজনের তাগিদে নয়। তবে সে আমন্ত্রণে আন্তরিকতার পরিচয় না পেলে আমাদের পক্ষে সাড়া দেওয়া কোন সময়ই সম্ভবপর হবে না।

ফিল্ম আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ

সাংবাদিক বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন রায় তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'উমার প্রেমের' কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছেন। একটী বঞ্চিতা মেয়েব জীবনেব কথা নিয়ে 'উমাব প্রেম' গড়ে উঠেছে। কাহিনীটি শ্রীযুক্ত বায়েবই লেখা। 'উমার প্রেমের' বিভিন্নাংশে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপ্রা দেবী, আরতি দাস, অহী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর প্রভৃতি।

সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত চিত্র

বর্তমানে সহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে কয়েকখানি নূতন বাংলাচিত্র মুক্তি লাভ কবেছে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ পরিচালিত নিউ সেঞ্চুরী প্রডাকসন্সেব বায়চৌধুবী, মানু সেন পরিচালিত চিত্রবাণী লিমিটেডের রাত্রি, তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত স্বপনপুরী প্রডাকসন্সের চোরাবালী। এই তিনখানি ছবির সমালোচনাই আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী

মঞ্চ শিল্পীদের অভিনব পরিকল্পনা

সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জয়ন্তীর অবগানাইজাব ব্রহ্মচাবী ভোলানাথ 'ঈশ্বরীপুরে' প্রতাপাদিত্য নাট্যাভিনযেব পবিকল্পনা নিয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছে উপস্থিত হযেছিলেন। সময়ের অল্পতা ও নানান অসুবিধাব কথা চিন্তা করে বর্তমান বছবে এরূপ নাট্যাভিনয়েব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে শিল্পীবা পেরে ওঠেননি। আগামী বৎসরে ঈশ্বরীপুরে উপস্থিত হয়ে প্রতাপাদিত্য অভিনয় কববাব জন্য তাঁবা মনস্থ কবেছেন এবং এজন্য নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যে পবিকল্পনাব কথা উপস্থিত

করেছেন তা নানাদিক দিয়েই প্রণিধানযোগ্য। সে পরিকল্পনানুযায়ী উদ্যোক্তারা আগামী বৎসরের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। অহীন্দ্র বাবুর পরিকল্পনানুযায়ী আগামী বৎসর সুন্দরবন সম্মেলনে ঈশ্বরীপুরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করা হবে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন নাট্যকার, শিল্পী এবং সমালোচকদের নিয়ে একটী কমিটি গঠিত হ'য়েছে। কমিটির সভ্যদের সকলেই আশা করেন, নটসূর্য নিজে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ের প্রযোজনা ভার গ্রহণ করবেন এবং উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় করবার উপযোগী করে নূতন ভাবে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক লিখবার দায়িত্বভার নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেই দিয়েছেন। ইতি মধ্যে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে ব্রহ্মচারী ভোলানন্দকে সংগে নিয়ে ঈশ্বরীপুর পরিদর্শনের মনস্থ করেছেন।

এই অভিনয়ের জন্য বহু শিল্পীর প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে দেশবাসীর প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাংলার এই দুর্দিনে অতীত বাংলার এক স্বাধীনতাকামী মুক্ত বীরের আদর্শ নূতন করে বাঙ্গালীদের সামনে উপস্থিত করাই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য। আশা করি এই মহতী প্রচেষ্টায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর সহযোগীতা এবং সাহায্য তাঁরা পাবেন। আমাদের পেশাদার শিল্পী গোষ্ঠী ছাড়াও জনসাধারণের ভিতর থেকে অভিনয়েচ্ছুকদের গ্রহণ করা হবে—শিক্ষিত, রুচীবান এবং আদর্শবাদী মেয়ে এবং পুরুষ যাঁরা উক্ত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে চান—যত সত্বর সম্ভব নিজেদের অভিজ্ঞতা, বয়স, শিক্ষা, নাম, ঠিকানা ও ফটোসহ শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক রূপ-মঞ্চ, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট—এই ঠিকানায় তাঁদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রসরাজ অমৃতলালের ৯৫তম জন্মোৎসব

অমৃতচক্রের উদ্যোগে—গত ১৬ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে ষ্টার রংগমঞ্চে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর ৯৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে একটী সভার অনুষ্ঠান হয়। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী সভায় পৌরহিত্য করেন। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু সভাপতি বরণ করেন। তৎপরে অমৃতচক্রের সচিব শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯শ বৎসরের কার্য বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীহারিৎ কৃষ্ণ দেব, শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি অমৃতলালের নাট্য-সাহিত্য ও রংগমঞ্চে অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস ও রায় সাহেব মনোমোহন ঘোষ অমৃতলালের দুইটি ছড়া আবৃত্তি করেন এবং শ্রীমতী রাধারাণী একটি কীর্তনের দ্বারা এবং শ্রীসারদা গুপ্ত একটি কৌতুক সংগীতের দ্বারা সভাস্থ সকলকে তৃপ্ত করেন। সভাপতি শিশির কুমার তাঁর অভিভাষণে বলেন "অমৃতলালের জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর এইরূপ একটি সভার আয়োজন করিলেই অমৃতলালের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না। আমি দেখিতেছি—এইরূপ সভায় বৎসরের পর বৎর একই বক্তা একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় একটি নাট্য সমালোচক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। যাঁহারা এই সমস্ত নাট্যকারের সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা করিতে পারেন। সাহিত্যে একটি Continuity আছে। অমৃতলালের উপর ঈশ্বর গুপ্তের, দাশু রায়ের প্রভাব বিদ্যমান—সমালোচককে এই সমস্ত সাহিত্যিক প্রভাব দেখাইতে হইবে। সমাজ ও রংগমঞ্চ যে অংগাংগি ভাবে জড়িত—একথাটি অমৃতলাল যতটা বুঝিতেন, আর কেহ ততটা বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই জন্যই তাঁর নাটকে সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক চিত্র এতটা স্থান পাইয়াছে। এবং তিনি সার্থকভাবে সেই সমস্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন। অমৃতলালই সর্বপ্রথমে বাংলার থিয়েটারকে dignified করিয়াছেন। তাঁহার থিয়েটারে কোন রকম অশোভন আচরণ তিনি সহ্য করিতেন না। আমার বয়স যখন ১৫।১৬ তখন আমি একজন বন্ধু সহ ষ্টার-থিয়েটারে একদিন অভিনয় দেখিতে আসি—সেদিন আট আনা বা এক টাকার টিকিট ফুরাইয়া গিয়াছিল—আমরা দুই টাকার টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিব কিনা পরামর্শ করিতেছি—পিছনে অমৃতলাল চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। তিনি আমাদের কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,

'বাবা—কলেজের ছেলে তোমরা, আজ দু'টাকা খরচ করে থিয়েটার না-ই বা দেখলে। পরের দিন এসে এক টাকার টিকিট কিনে দেখো—আমি ব্যবস্থা করে দেব।' দর্শকের সংগে অমৃতলালের এমনি সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া, একটি নাটককে সমগ্রভাবে produce করা কি—অমৃতলালই তাহা প্রথম দেখান। আগেকার দিনে কোন একটি নাটকে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা নামিলে দর্শকেরা শুধু তাঁহার অভিনয় কালেই প্রেক্ষাগৃহে থাকিতেন, বাকী সময় বাহিরে থাকিতেন। কারণ নাটক খানিকে সমগ্রভাবে উপভোগ্য করায় কি প্রয়োজন অমৃতলালের পুর্বে কোন Producer তাহা উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং অমৃতলালই সর্বপ্রথম Producer। আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখন জগতের অন্যান্য দেশের রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে। আমাদের দেশের থিয়েটার যাত্রা হইতে স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। কয়েকজন ধনীর সন্তান বিলাতী আদর্শে আমাদের দেশে থিয়েটার স্থাপন করেন এবং সেক্সপীয়রের অনুকরণে নাটক লেখান। পাশ্চাত্য দেশের কোন লোক যদি আজ আমাদের থিয়েটার দেখিতে চান, আমরা কি দেখাইব? আমাদের জাতীয় নাটক, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ কোথায়? এখন 'গণনাট্য' বলিয়া একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। কিন্তু এই সমস্ত নাটক যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, 'গণে'র সহিত তাঁহাদের কতটা সম্বন্ধ? 'গণের' সহিত বাস করা চাই, তাহাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করা চাই, চরিত্র সৃষ্টির জন্য অন্তর্দৃষ্টি চাই তবে 'গণনাট্যে'র সৃষ্টি হইবে। তাই এখন যাহা 'গণনাট্য' নামে প্রচলিত, তাহা 'গণেও' দেখেনা—দেখে সহরের সাধারণ নাট্যামোদী। আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে কত দুঃখ, কষ্ট, ব্যর্থতা, চাষী মজুরের কত অভাব বেদনা রহিয়াছে আমাদের নাটকে, আমাদের রঙ্গমঞ্চে আমরা কি তাহা দেখিতে পাই? দেশের মধ্যে যাঁরা অর্থশালী, তাঁরা অগ্রসর হইয়া এমন একটি মন্দির তৈরী করুন, যেখানে রঙ্গ সরস্বতী বাস করিতে পারেন। তাহাই

উপরে: (বাঁদিক থেকে) গোপাল চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার) অমূল্য বসু।
মধ্যে: ,, নন্দ মাম্মা, সনৎ চট্টোপাধ্যায়।
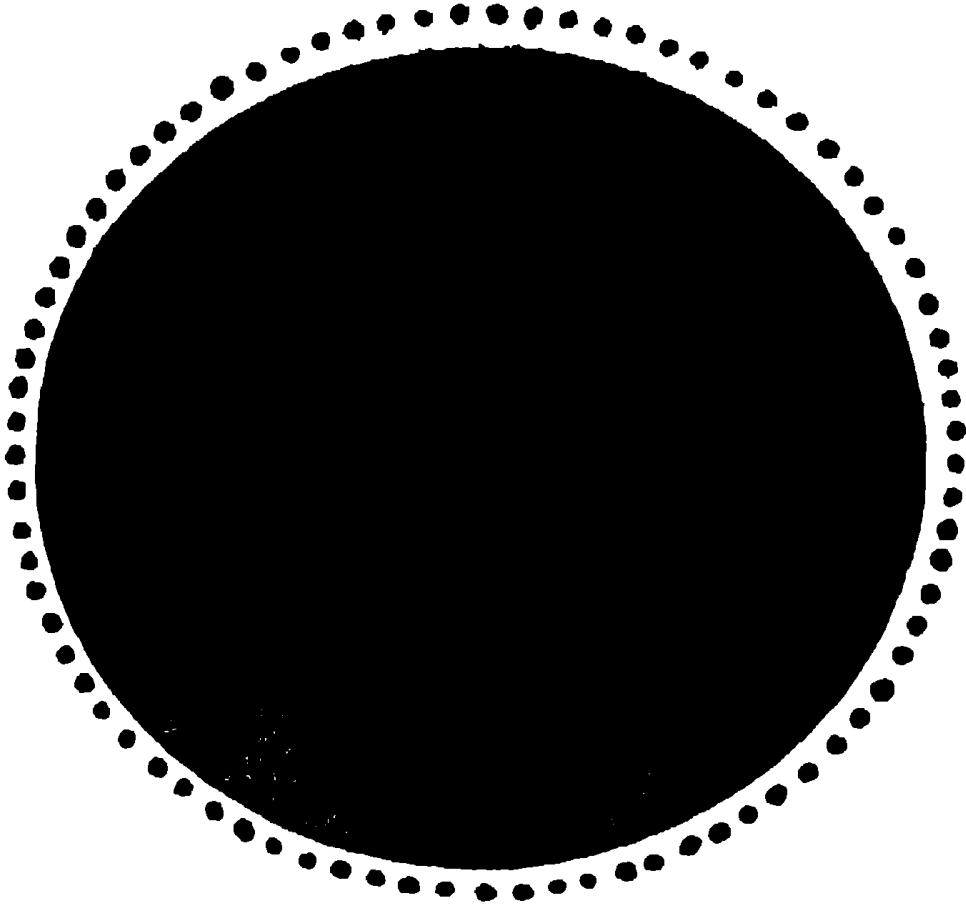
শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ধর

স্বর্গতঃ দানবীর বাংলার বিখ্যাত টিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'ধর টিন ফ্যাক্টরীর' স্বত্বাধিকারী শরৎ চন্দ্র ধর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র ধর। পিতার মৃত্যুর পর এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই পরিচালনা - নৈপুণ্যের পবিচয দিতে সক্ষম হযেছেন। গত ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৩, শুক্রবার, দোল পূর্ণিমা দিবসে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমা বাণীব সংগে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হ'যেছেন।

বড়বাজার ৮, শিবঠাকুর গলি নিবাসী ৺আশুতোষ নন্দী মহাশযের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সনাতন নন্দী মহাশযের প্রথমা কন্যা কল্যাণীযা প্রতিমা রাণীর সংগে ৺শরৎ চন্দ্র ধর মহাশযের প্রথম পুত্র শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র ধরের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে ৺শরৎ চন্দ্র ধর মহাশয়ের ৪৯।১, আহিরীটোলাস্থিত 'কর্মালয়' ভবনে শুভ - কার্যাদি উপলক্ষে বহু দরিদ্র-নারায়ণকে দান ও ভুরি ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।
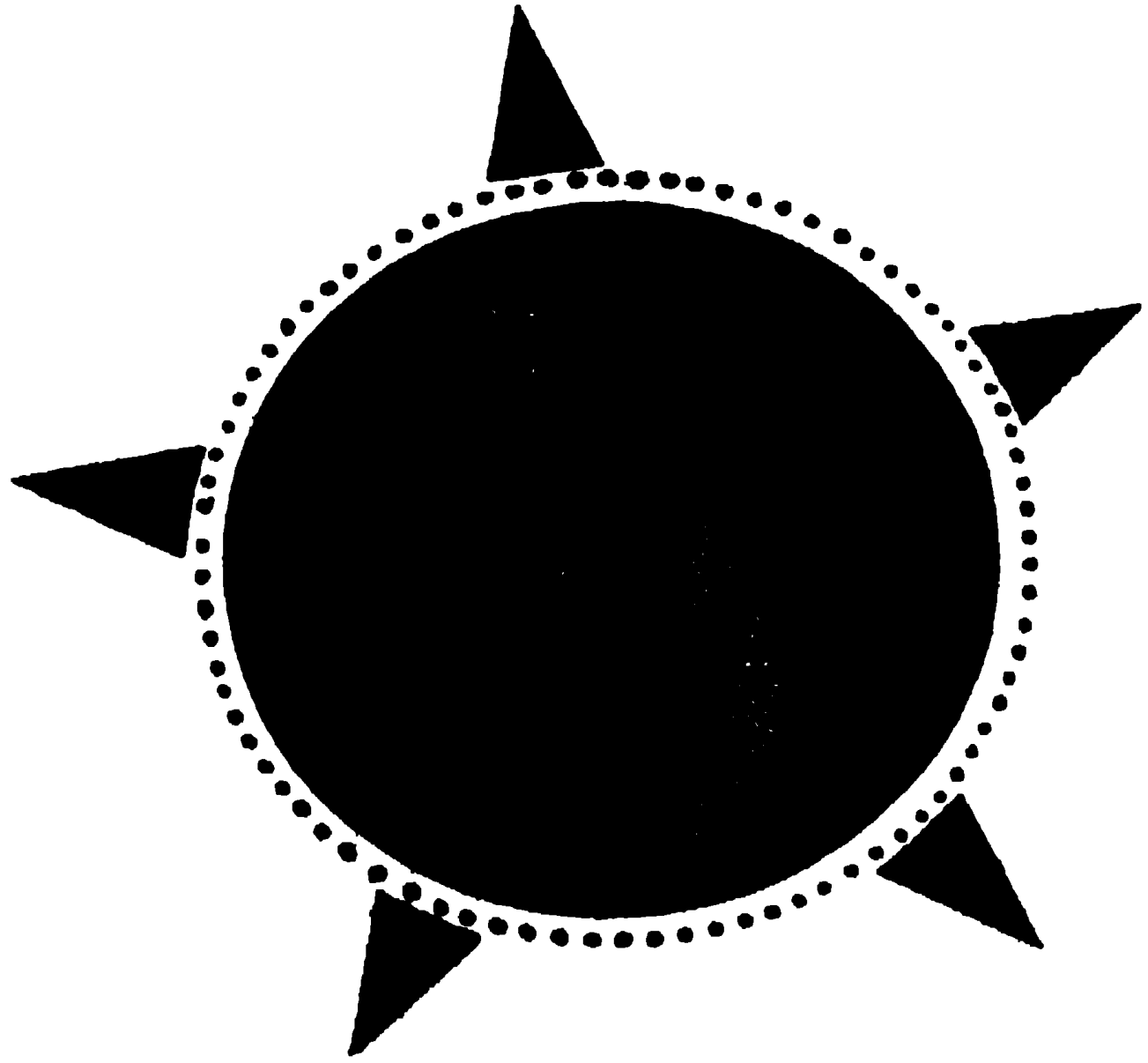
শ্রীমতী প্রতিমারাণী

হইবে আমাদের জাতীয় রঙ্গালয়, সেখানে অভিনয় হইবে আমাদের জাতীয় নাটক।'

সভায় অমৃতলালের নামে একটি রাস্তা ও একটি নাট্যবিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রগতি-শিল্পী সংঘের সম্পাদক এই প্রস্তাব করেন।

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব উত্তর কলিকাতা কেন্দ্রে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত

গত শুভ পয়লা বৈশাখ সকাল সাড়ে সাত ঘটিকার সময় 'নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব' উত্তর কলিকাতা কেন্দ্রের চারিটি স্থানে মহা সমারোহের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন অনুমতি না পাওয়াতে পরিচালক মণ্ডলীকে বাধ্য হ'য়ে চারিটি কেন্দ্রে বিভক্ত করে উক্ত উৎসবের আয়োজন করতে হয়। প্রতি কেন্দ্রেই ৬।৭ শত বালক বালিকা যোগদান করেছিল। উক্ত কেন্দ্রের অধীনে সর্বসমেত ৬৫টী বিদ্যালয়, সংঘ, সমিতি, লাইব্রেরীর যোগদানে সুকল্পিত পরিচালনাধীনে সমষ্টি ব্যায়াম, ব্রতচারী, সংকল্প পাঠ, সংগীত ও ঐক্যতান বাদ্য অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির' প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন ও পতাকা উত্তোলন করেন খ্যাতনামা লাঠিয়াল শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস মহাশয়। সভাপতি মহাশয়ের ওজস্বীনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর অভিভাষণে বলেন, "পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে প্রথিত করে আমরা প্রথমেই নূতনকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিগত বছরের সমস্ত মালিন্য ও অবসাদ দূর হ'য়ে নূতন বর্ষে বাঙ্গালার জীবন সাফল্যের সতেজতায় সঞ্জীবীত হ'য়ে উঠুক। আমরা আজ নূতনকে সাদর অভিনন্দন জানাবার জন্য এখানে সমবেত হ'য়েছি। নূতন শাখা ও পল্লবে যখন গাছগুলি মঞ্জরীত হ'য়ে ওঠে, তার সমস্ত দেহ সজীবতায় স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে—কিন্তু আজ আমরা যখন নূতনকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি—আমাদের দেহেও কী এই স্পন্দন অনুভব করছি? না। আমাদের মন হতাশা ও হাহাকার—ব্যথা ও বেদনায় ভরপুর। সামাজিক জীবনে বাঙ্গালীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে হৃদ্যতা ছিল—আজ সাম্প্রদায়িক বীভৎসতায় তা বিষিয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক জীবনে যে মুক্তি আমরা অর্জন করতে যাচ্ছি, সামাজিক জীবনের বিষ-বাষ্প আমাদের সে মুক্তির পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের নিরুৎসাহীত হ'লে চলবে না—বিগত বছরে যে অবিশ্বাস ও ঘৃণার ধূম্রজাল আমাদের চলার পথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—আজ নূতন বছরে নূতন সূর্যোদয়ে আশা ও আকাঙ্খা—প্রীতি ও ক্ষমার বাণীতে সেই ধূম্রজাল কাটিয়ে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে। আমাদের নববর্ষের উৎসব তবেই সার্থকমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে।"

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। ব্যায়াম চর্চা ও শরীর গঠনের উপকারীতা সম্পর্কে বক্তৃতাপ্রসংগে শ্রীযুক্ত পুলিন দাস এবং অন্যান্যদের প্রতি সভাপতি মহাশয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উৎসবের পরিচালকমণ্ডলী, সমবেত জনমণ্ডলী ও উৎসবে যোগদানকারী বালক বালিকা এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহাশয় তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। শ্রীযুক্ত পুলিন দাসও সভাপতির অনুরোধে বক্তৃতা করেন। 'আয়রণম্যান' নীলমণি দাস সম্পাদকের পক্ষ থেকে সংঘের বিবরণী পাঠ করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুল প্রাঙ্গণে যে বিরাট উৎসব হয়, তাতে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং মিঃ পি, সি, মিত্র মহাশয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অধিনায়কের কাজ করেন। এবং উৎসবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল মণ্ডল তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বলেন, "উৎসবের দিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আজ যে ভাবে একমন এক প্রাণ হ'তে পেরেছে, বিপদের দিনেও যেন তেমনিভাবে আমরা মিলিত হতে পারি।"

শ্যামপুকুর এলাকার কেন্দ্রে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

সভাপতিত্ব করেন এবং পতাকা উত্তোলন করেন ডাঃ ভূপেন মজুমদার। সমিষ্টি ব্যায়াম পরিচালনা করেন অনুজ দাশগুপ্ত। অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে কেবল মাত্র মেয়েদের যোগদানের ব্যবস্থাই করা হ'য়েছিল। কুমারী অণিমা রক্ষিত সমষ্টি ব্যায়াম পরিচালনা করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবধুত দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ, ডাঃ বঙ্কিম শেঠ, গোষ্ঠ বিহারী শেঠ, ও হরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হ'তে বিভিন্ন কেন্দ্র পরিচালনা করেন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য জিবানীতোষ ঘটক, গোপাল সাহা, রবীন ব্যানার্জি, সুরেশ মিত্র, শৈলেন ব্যানার্জি, কুমারী গৌরী ঘোষ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। চারিটি কেন্দ্রের সম্পাদকের কাজ করেন শ্রীযুক্ত মতিলাল মণ্ডল।

রজনী ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

"রজনী ফিল্ম কর্পোরেশন" প্রথম চিত্রার্ঘ "চলার পথে" বি, কে, দালালের পরিচালনায় "ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে" গৃহীত হ'চ্চে। বিগত দিনের দুর্ভিক্ষ ক্লান্ত বাংলাদেশের ছায়াচ্ছন্ন পট ভূমিকায় এক সংস্কৃতিবান পরিবারের বেদনার ছবি "চলার পথে"। রচয়িতা নবীন লেখক শ্রীসরোজেন্দু কুমার রায়।

চলার পথের সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন খ্যাতনামা গীতশিল্পী সমরেশ চৌধুরী। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন রবীন মজুমদার। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, দেবী মুখার্জী, বনানী চৌধুরী, সমর রায়, অনিল মুখার্জী, ডাঃ সুকুমার চ্যাটার্জি, এম-বি এবং আরও কয়েকজন নূতন শিল্পী।

'রূপচক্রে'র উদ্যোগে সপ্তাশীতম রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৭শে বৈশাখ রবিবার সকাল সাড়ে আটটার সময় ১৫ নম্বর রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে ৺শ্রীকান্তি চরণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে "রূপচক্রে"র সভ্যদের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৭তম জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন 'চক্রে'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 'রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়।

'রূপচক্রে'র সভ্য সভ্যা এবং বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীযুত বীরেশ্বর দত্ত কর্তৃক উদ্বোধন সংগীত গীত হবার পর 'চক্রে'র সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সান্যাল মহাশয় 'চক্রে'র পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—উৎসবের আয়োজন আমাদের যতই ক্ষুদ্র হোক্—তা' ভেবে আজ আমরা সঙ্কুচিত হবো না, যে প্রাণ নিয়ে আর যাঁর জন্য আজ আমরা উৎসব করছি—তাই ভেবে আমরা আজ গর্বিত।' শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় এই উৎসবের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন বলে তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুত সান্যাল মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীকালোবরণ দাস, শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল মল্লিক, শ্রীলিলি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন বসু, শ্রীবেণুকা চক্রবর্তী, শ্রীচিত্ত দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেশ্বর দত্ত, প্রভৃতি কণ্ঠ সংগীতে এবং শ্রীঅমল দত্ত, শ্রীঅনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে আবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভায় উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ বিশ্বকবির বিভিন্ন-মুখীন প্রতিভার উল্লেখ করে তাঁর প্রতি স্মৃতি তর্পণ করেন। সভাপতি শ্রীযুত কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রবীন্দ্র প্রতিভা সম্পর্কে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

উৎসবটিকে সর্বাংগ-সুন্দর এবং সর্বদিক দিয়ে সাফল্য-মণ্ডিত ও সার্থক করে তুলতে 'চক্রে'র শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত, শ্রীসুশীল দাস, শ্রীদুর্গা নিয়োগী ও শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

যাঁরা উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল, শ্রীহরিদাস ঘোষ, ডাঃ জে, এল্, নাথ, কবিরাজ হেরম্বনাথ শাস্ত্রী, শ্রীসুধাংশু মোহন দত্ত, শ্রীমাণিক মোহন রায়, শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ, শ্রীহরেন্দ্র কাবাসি, শ্রীসন্তোষ ঘোষ, শ্রীমুরারী মোহন দে,

শ্রীসুবোধ সুর, শ্রীরবীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দ অন্যতম।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়াস'

গত ১২ই মে এঁদের উদ্যোগে রঙমহল রংগমঞ্চে গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ ঘোষ রচিত 'ছন্দ পতন' নাটক অভিনীত হয়। নাট্যকার শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হওয়াতে সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক আচার্য মন্মথ মোহন বসুর সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি রূপ মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অভিনয় প্রারম্ভে আনুষ্ঠানিক কার্য সমাপ্ত হয়। আচার্য বসু উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন ও আশীর্বাণী জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। বাংলা নাট্য-জগতে বাংলার সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের অবদানের কথা উল্লেখ করে কালীশবাবু বক্তৃতা করেন। অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরেই মূল সভাপতি উপস্থিত হন। এবং নাটকের একটি অংক অভিনীত হবার পর তিনি নাটকখানিকে প্রশংসা করে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন ও বাংলা নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। 'ছন্দ পতনে'র অন্যতম নাট্যকার গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে কয়েকজন নাট্যামোদী কয়েকটা পদক উপহার দেন। তারপর পুনরায় অভিনয় আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত ভাবে 'ছন্দ পতনের' কৃষ্ণ ঘোষ ও গোপাল চট্টোপাধ্যায় নবীন নাট্যকার দ্বয়ের সম্ভাবনাকে প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত বিমল বসু, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি আরো অনেকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

অভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় সমিতির সম্পাদক অরুণ রক্ষিত যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অরুণের ভূমিকায় গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়েও সকলে চমৎকৃত হন। বৃদ্ধ ধরণীবাবুর চরিত্রটিকে নন্দ মান্না নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। পরিচালক জীবন গোস্বামী কুটিল প্রকাশের ভূমিকাভিনয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তিনিই নাটকখানি পরিচালনা করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অমূল্য বসু, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, রাধা মল্লিক, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রভৃতি সকলেই অভিনয়ের রসসৃষ্টিতে সাহায্য করেন। সমিতির অন্যতম সদস্য উমাপদ দত্ত এবং অন্যান্য কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে সক্ষম হ'য়েছেন।

হেনরী বোর্ণ

ভারতীয় শিল্পে কলাবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ হেনরী বোর্ণকে (Mr. Henry Born) কলিকাতা আর্টিস্ট্রী (Artistry) সদনে আন্তরিক বিদায়বাণী জানিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটিকে বর্তমান আকারে পরিণত করতে মিঃ বোর্ণ যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়।

আজ মিঃ বোর্ণ সারাদেশে শিল্পে কলাবিদ্যা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পরিচিত এবং এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজের ভিতরে তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এর ভিত্তি হতে তিনি প্রধান সচিব হন এবং প্রতিষ্ঠানটী গঠিত হলে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

মিঃ বোর্ণ ১৯২৪ খৃঃ কর্মাসেলে কর্মভার নিয়ে ভারতে আসেন এবং বোম্বাইতে ১১ বৎসর থাকার পর ১৯৩৯ খৃঃ কোম্পানীর প্রচার বিভাগের কর্তা হয়ে কলিকাতায় আসেন। মিঃ বোর্ণ ১৯৪৩-৪৬ খৃঃ ভারতীয় রেডক্রশ আবেদন প্রচারক সমিতির সভাপতির কাজ করেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের রেডিওতে তিনি সুপরিচিত।

তিনিই ভারতবর্ষের দলিল সংঘটিত ফিল্মের অন্যতম পথ-প্রদর্শক এবং পরেও অনেকগুলি দলিত চিত্র প্রস্তুত করেন। তাঁর ফটোগ্রাফিতে বিশেষ আগ্রহ আছে এবং কলকাতায় পূর্ব-ভারতীয় যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করে একাই একটী প্রদর্শনী করেন।

তিনি লণ্ডনে সেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর এক কার্য-ভার গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষ হতে লণ্ডনে ফিরে গেছেন। রূপ-মঞ্চ পত্রিকার প্রথম থেকেই তিনি পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে কাগজ পরিচালনায় নানানভাবে সক্রীয় সহযোগীতা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সমালোচনা

নার্স সিসি

প্রযোজনা : নিউ থিয়েটার্স লি কাহিনী : বিনয় চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা ও সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র। সুরশিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক। গীতকার : শৈলেন রায়। চিত্রশিল্পী : সুধীন মজুমদার। শব্দযন্ত্রী : বণজিৎ দত্ত। রসায়নিক : পঞ্চানন নন্দন। শিল্প পরিচালক : সৌরেন সেন। সেট নির্মাতা : পুলিন ঘোষ। কর্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্তী। বিভিন্নাংশে : ছবি বিশ্বাস, অসিত বরণ, ভারতী, সুনন্দা দত্তিক, ফাল্গুনী, ভানু, বোকেন, আদিত্য (এঃ) নরেশ বোস, খগেন পাঠক প্রভৃতি। পরিবেশনা : অরোরা ফিল্ম করপোরেশন। নিউ থিয়েটার্সের সদ্যমুক্ত বাংলা ছবি 'নার্স সিসি' একযোগে চিত্রা ও রূপালীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। যুদ্ধ কালীন সময়ে প্রচার চিত্র নির্মাণের জন্য প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকার থেকে যে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছিল— 'নার্স সিসি' তাদেরই অন্যতম। যুদ্ধ থেমে যাবার দীর্ঘদিন পরে 'নার্স সিসি'কে দেখতে পেলাম। যুদ্ধ থেমে গেছে বলে প্রচার চিত্রের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করবো না—বিশেষ করে 'নার্স সিসি'কে যে ধরণের প্রচার কার্য নিয়ে গড়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তার প্রচার কার্যের নমুনা দেখে তার সার্থকতাকে কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারবো না। বর্তমান চিত্রটী যে রূপ নিয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে— প্রচারের এই রূপের সম্ভাব্যতাকে কাহিনীর ভিতর প্রচ্ছন্ন দেখেই যদি সরকারী কর্তৃপক্ষ 'নার্স সিসি'কে অনুমোদন করে থাকেন—তাহ'লে তাঁদের সেই অনুমোদনকে কোন মতেই আমরা প্রশংসা করতে পারবো না। কারণ, 'নার্স সিসি' সেবাধর্মের কোন প্রচার কার্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং নার্স সিসির মাঝে সেবা ধর্মের আদর্শই ক্ষুন্ন হ'য়েছে। প্রচার বিভাগ থেকে ইতিপূর্বে যেভাবে 'নার্স সিসি' সম্পর্কে জয় ঢাক পেটানো হ'চ্ছিল তাতে আমরা মনে করেছিলাম, হয়তবা 'নাইটেঙ্গল' কী ভগ্নী 'নিবেদিতার' মতই আর কেউ একজন আসছেন সেবা ধর্মের আদর্শের বাণী বহন করে। কিন্তু আমাদের সে ধারণার বিরুদ্ধ রূপ নিয়েই 'নার্স সিসি' আত্ম প্রকাশ করেছে। তাই তার সার্থকতাকে মেনে নিতে পারবো না। 'নার্স সিসি' সেবা ধর্মের কোন কথা নিয়ে দেখা দেয়নি—একটী মেয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাই তার বিশেষত্ব কিছু আছে বলে আমরা মনে করিনা।

পুরাণের পাতা ওলটালে আমরা দেখতে পাই, তখনকার রাজ-রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বহু মহীয়সী নারী শত্রু মিত্র ভেদে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। অভিমন্যু-মাতা শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার কাহিনী শুনে আমরা কম মুগ্ধ হয়নি। ক্রিমিয় যুদ্ধের নাইটেঙ্গল, ভগ্নী নিবেদিতার সেবাধর্মের কথাও আমাদের কম আপ্লুত করে তোলেনি। সেবাধর্মের মহত্ব সেখানেই, যেখানে সে সেবা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ ও স্বার্থপরতাকে কাটিয়ে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিকই, আধুনিক কালে যে নার্সিং বা সেবাকার্যের সংগে আমরা পরিচিত তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বার্থহীন বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়—জীবিকার্জনের পন্থা বলেই অনেকে নার্সিংএর কার্য গ্রহণ করেন! এতে সেবার মূল ধর্ম নষ্ট হ'তে চলেছে। তাই নার্সিংএর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকেরই আছে। প্রচার চিত্রের মূল কর্তব্য এই পেশার মায়াজাল কাটিয়ে সেবার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। নার্স সিসি যদি তা পারতো, তার প্রচার সার্থকতায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠতো। তাই পারেনি বলেই তাঁকে আর দশখানা প্রাণ-দেওয়া নেওয়া নিয়ে গড়ে ওঠা ছবি থেকে একটুও বেশী মর্যাদা দিতে আমরা নারাজ। কাহিনীর ভিতরও নূতনত্বের কোন পরিচয় পাইনি। চিত্রজগতের সেই রক্ষনশীল পুরোন পিতা এবং বিদ্রোহী পুত্রকেই দেখতে পেয়েছি। যে বিদ্রোহীর আন্তরিকতা নেই—বাইরের ঝাজ টুকু মাত্রই আছে। এবং তা নিজেকে ঘিরেই। নায়ক ইন্দ্রনাথ চিত্রজগতে আমাদের অপরিচিত নয়—সুষমাকে পাবার জন্য বিদ্রোহ করলো—বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো—

এবং যেন জানতো, আবার সে ফিরে আসবে। এলোও। পিতা গ্রহণও করলেন। মিলনের পরিসমাপ্তিতে রূপালী পর্দা ঝিলিক খেয়ে গেলো।

চিত্রখানি পরিচালনা করে ছেন শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র। কাহিনীর কথা বাদ দিলেও তিনি স্থানে স্থানে যে সব ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়েছেন তাকেই বা ভুলবো কেমন করে? সিসি প্রথমবার যখন যুদ্ধ প্রান্তে গেল না—তখন তার সেবার চেয়ে প্রণয়টাই কী বড় হ'য়ে দেখা দেয়নি—দ্বিতীয়বার যখন গেল, তখন সে সেবার আদর্শে প্রণোদিত হ'য়ে যায়নি, প্রেমের ব্যর্থতা এবং প্রেমাস্পদের পিতার কাছে তার প্রণয়ের মহত্বের পরিচয় দিতেই গেল। যতীন্দ্রনাথের সেবার ভার নিয়ে যখন সে এলো—আমরা যদি বলি, সে যতীন্দ্রনাথকে বশ করবার জন্যই এসেছিল, তাহলে কী ভুল বলা হবে? নায়ক বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল এবং ঠিক সিসিরই কাছে যেয়ে হাজির হ'লো—এরকম সংঘটন চিত্রেই সাজে—বাস্তবে নয়। অর্থাৎ যখন যেটা প্রয়োজন চিত্রজগতের পরিচালকদের কাছে সে ঘটনা মনে করা মাত্রই ঘটে যায়। যতীন্দ্রনাথ যখন 'সে-কৈ সে-কৈ' বলে সকলের মাঝে সুষমাকে খুঁজছিলেন—এই খোঁজার ভিতরও কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পায়নি। যতীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হ'য়েছিল, তিনি আর যেন এজগতে নেই—তিনি যেন কোন আধ্যাত্মিক মার্গে উঠে গিয়েছেন! ভগবানে

'নার্স সি সি' চিত্রে সুনন্দা

যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরাও বোধ হয় এমন নাটকীয় ভাবে ভগবানকে খোঁজেন না! যুদ্ধ প্রান্তের হাঁস পাতালের পরিবেশকেও তারিফ করতে পারবো না—আমাদের মত অনেকের যাঁদের যুদ্ধ প্রান্তের তদানীন্তন অস্থায়ী হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শনের সুযোগ হ'য়েছে—তাঁরা এই পরিবেশে খুশী হবেন না। বাঙ্গালী বধূর "সে কোথায়—তার কাছে যাবো—" মিলিটারী হাঁস-পাতালে বাঙ্গালী বধূ-রুগীর এই উপস্থিতি অনেকেরই বিষদৃশ্য লাগবে।

অভিনয়ে কারো বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। সিসির ভূমিকায় ভারতী এবং ইন্দ্রনাথের

পরলোকে হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

৺হবিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮৬ সালে কলিকাতায় আহিরীটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সংগীতাচার্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর শিক্ষালাভ হয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে (অধুনা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক) সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর চাকুরী করেন। পিতার স্মৃতিকে বজায় রাখিবার জন্য তিনি প্রায় ২০ বৎসর তাঁর স্মৃতি-সভা করেন। এই সভায় ভারতের বহুগুণী ও বিখ্যাত শিল্পীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগদান করিতেন। কালীপ্রসন্নের নাম অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম ও আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা আহিরীটোলায় কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী রোড মৃত্যুর পূর্বে স্থাপন করিয়া যান। আহিরীটোলার নিজ বাসভবনে বিগত ২৩ বৎসর ধরিয়া তিনি ৺জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা করেন, ও মৃত্যুর পূর্বে এমন ব্যবস্থা করিয়া যান যাহাতে চিরদিন নির্বিঘ্নে পূজা চলিবে। হরিপ্রসন্নবাবু 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র পায় প্রথম হইতেই সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং শেষ বয়সে পল্লীর 'ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্সে'র' সহ-সভাপতি ছিলেন।

প্রত্যহ গঙ্গা স্নান ও পূজাহ্নিক না করিয়া তিনি জলস্পর্শ করিতেন না। দেব-দ্বিজে তাঁর অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার পর হইতেই তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। শেষ-জীবনে তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও 'ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়াসে'র' অভিনয় ও অন্যান্য কাজে বহু সহায়তা করেন।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারের কথা ভুলিবার নয়। প্রকাশ্য ও গোপন দান তাঁর অনেক ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন দানবীর ছিলেন। ৬১ বৎসর বয়সে তাঁর কর্মজীবনের অবসান হয়। মৃত্যুর পূর্বে দুই কন্যা ও নাতী নাতনী রাখিয়া যান।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভূমিকায় অসিতবরণের প্রশংসা করবো। যতীন্দ্র নাথের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর চরিত্রের অসংগতির জন্য তিনি দায়ী নন—দায়ী যিনি চরিত্রের স্রষ্টা। ইন্দ্রনাথের বোনের ভূমিকায় বেচারী সুনন্দা কোন সুযোগই পাননি। দুই পুরুষের সিনামেটিক-লতিকা বর্তমান চিত্রে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছেন দেখে খুশী হ'য়েছি। ডাক্তারের ভূমিকায় আদিত্য ঘোষকে প্রশংসা করবো। ভানুও নিন্দনীয় নয়।

দু'খানি সংগীত—একখানি রেখার মুখে আর একখানি সিসির মুখে বেজে উঠেছে। অন্তরাল থেকে যাঁর কণ্ঠে গান দু'খানি ধ্বনিত হয়েছে, তিনি বাঙ্গালী সংগীতপ্রিয়দের কাছে অপরিচিতা নন। নিউ থিয়েটার্সের মত প্রতিষ্ঠান দর্শক সাধারণকে এতটা 'বুদ্ধ' মনে করবেন তা ভাবতেও পারিনি—নইলে ইলা ঘোষের পরিচিত কণ্ঠ—রেখা এবং সিসির মুখে দেবেন কেন? দুই গলায় এক কণ্ঠকে চালিয়ে আমাদের তাঁরা 'বুদ্ধু' ভাবতে পারেন—কিন্তু আমরা যে তাঁদের মত বুদ্ধু নই—একথাটা তাঁরা মনে রাখলেই খুশী হ'বো। সংগীত নিন্দনীয় নয়। নার্স সিসির সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে তার দৃশ্যরচনা—শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ। চিত্রের এই আংগিক দিক বিন্যাসে নিউ থিয়েটার্স তার গৌরব অম্লান রেখেছে। —শীলভদ্র

শৃঙ্খল

ডি, জি পিকচার্সের শৃঙ্খল কিছুদিন পূর্বে সহরের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল। আমাদের সমালোচনা প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। শুধু শৃঙ্খলই নয়—আজকাল বহু চিত্রকেই অকালে বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে। সহরের হাঙ্গামার কথা বাদ দিলেও চিত্রগুলির এই ক্ষণস্থায়ী পরমায়ুর জন্য তার অন্তসার-শূন্যতাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা অস্বীকার করতে পারবেন না। তবু তাঁরা কেন এ বিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠছেন না? আমরা সমালোচক এবং দর্শকেরা কর্তৃপক্ষদের আর্থিক প্রতিষ্ঠাও কামনা করি। কারণ, আমরা জানি তাঁরা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠতে পারেন—চিত্র শিল্পের উন্নত রূপও যেমনি আমরা দেখতে পাবো, তেমনি চিত্রশিল্পের উন্নতিতে পরীক্ষামূলক ভাবে যে কোন পরিকল্পনা তাঁদের দ্বারা গ্রহণ করা সহজ হ'য়ে উঠবে। তাঁরা যদি ছবির ভিতর এমন কিছু দিতে পারেন যা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে—তার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে কোনদিনই বাঙ্গালী চিত্রা-মোদীরা বিরত হবেন না। কিন্তু বর্তমান চিত্রগুলির ক্ষণস্থায়িতা দেখে এইটেই মনে হয়, বর্তমান ছবিগুলির ভিতর এমন একটা অংশও থাকে না, যা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও দর্শক শ্রেণীর অংশ বিশেষের কাছেও সমাদর পেতে পারে। তবু কর্তৃপক্ষ দর্শকদের চাহিদা সম্পর্কে কেন অবহিত হ'য়ে ওঠেন না! শৃঙ্খলও ঠিক এমনি অন্তসারশূন্য একটা চিত্র। তাই অকালেই তাকেও বিদায় নিতে হ'য়েছে। শৃঙ্খলের কাহিনী লিখেছেন পরিচালক সাহিত্যিক-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর ভিতর শৈলজানন্দের প্রতিভার কিছুমাত্রও পরিচয় ফুটে ওঠেনি। শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির লালসা এবং সে লালসা থেকে শ্যালিকার মুক্তির চেষ্টা—সমাজের এই ধরণের সমস্যা এমন কিছু জটিল নয়। তাছাড়া যে উদ্দেশ্য প্রচারে কাহিনীকার গল্পটী গড়ে তুলেছেন—চিত্রে এমন কতগুলি দৃশ্যের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে যা সমাজের ভালর চেয়ে খারাপই করবে।

পরিচালনায় ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ লোকের যে কাঁচা হাতের পরিচয় পেয়েছি—তাতে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার মূলে বেশ খানিকটা যেয়ে আঘাত পড়েছে। অনেক দৃশ্যই ছাড়া ছাড়া। পরস্পরের সংগে যোগশূন্য। কাহিনীর গতিকে যে রহস্য দিয়ে তিনি আবৃত করে রাখতে চেয়েছেন, তা আর রহস্য হ'য়ে দেখা দেয়নি—হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

অভিনয়ে শিল্পীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা বৃথা। চরিত্র যেখানে দাঁড়ায়নি, সেখানে তাঁরা নিরুপায়। তবু দেবী, জহর, মলিনা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে হয়। নায়কের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর ভূমিকায় নবাগত কমল

চট্টোপাধ্যায়কে দেখতে পেয়েছি। এই নবাগতটী রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের আবিষ্কার। প্রথম দর্শনে তিনি আমাদের খুশী করেছেন, তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি কামনা করি। তার স্ত্রীর ভূমিকায় নবাগতা শ্রীযুক্তা ঘোষকেও প্রশংসা করবো।

চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে নিন্দনীয়। সংগীত চলন সই। —শান্তভদ্র

পরভৃতিকা

প্রযোজক—প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনী : সীতা দেবী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিনায়ক ভট্টাচার্য।

শ্রী, পূরবী, উজ্জলা প্রভৃতি চিত্রগৃহে ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করেছিল।

সীতা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'পরভৃতিকা' নাট্যকার বিধায়কের পরিচালনায় চিত্রে রূপায়িত হয়েছে জেনে আমরা খুবই আশা করেছিলুম যে, শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবার একখানা সার্থক চিত্র নাট্যামোদীদের উপহার দিতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ চিত্রে আমরা উপন্যাসের যথাযথ রূপ দেখতে পাইনা।

মূল উপন্যাসের যে সম্পদ পাঠক মনে রেখাপাত করে আলোচ্য চিত্রে তারই বিকৃত রূপ দর্শক মনকে ব্যথা দেয়। চিত্রের গতি সময় সময় অত্যন্ত মন্থর হয়েছে আবার কখনও এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে যে, একে ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে হবে। অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরোধী দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকমনে বিরক্তি জাগা অস্বাভাবিক নয়। 'পরভৃতিকার' কাহিনীটি যদি যথাযথভাবে চিত্রে রূপায়িত হত তাহ'লে দর্শকেরা তৃপ্তিই পেতেন।

অভিনয়ে সরযবালার অভিনয়ই সর্বাগে উল্লেখ করব। সীতা দেবীর সার্থক সৃষ্টি 'ভবানী' সরযূর অভিনয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দর্শকমন ভবানীকে শ্রদ্ধা জানায়, তার আদর্শকে প্রশংসা করে। এখানেই অভিনেত্রীর কৃতিত্ব। আমরা এজন্য সরযূকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নীলিমা দাস নবাগতা। তাকে পরিচালক একটা জড়ের ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছেন বলে মনে হয়। স্ত্রী চরিত্রগুলির ভিতর সবচেয়ে ব্যর্থ হয়েছে মায়ের চরিত্রটী। এর জন্য দায়ী অভিনেত্রী নিজে। এই চরিত্রটী উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা তার নেই। সব দৃশ্যেই তিনি প্রাণহীণ অভিনয় করেছেন।

শিবশঙ্কর নূতন হলেও কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। উপযুক্ত পরিচালকের কাছে শিক্ষা পেলে ভবিষ্যতে তিনি একজন সত্যিকারের অভিনেতা হতে পারবেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি যেন জোর করে চালানো হয়েছে।

পরিচালনায় বিধায়ককে আমরা প্রসংসা করতে পারবো না। কয়েকটি চরিত্র এমন ভাবে রূপ পেয়েছে, যাতে তারা দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেছে। দার্জিলিং এর দৃশ্যগুলি ষ্টুডিওতে বসে তোলা হয়েছে বলেই মনে হয়। পরিত্যক্তা কন্যার সাথে মায়ের মিলন দৃশ্যটি মোটেই স্বাভাবিক হয় নি।

রেডিওতে 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'-এর দৃশ্য শ্রবণরত সুধীর, কৃষ্ণা এবং তার মায়ের যে মনোবিকারের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সে জন্য পরিচালককে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করছি।

আলোচ্য চিত্রে শুধু এই দৃশ্যটিই উপভোগ্য।

সুর এবং আলোক চিত্র প্রসংশনীয়।

—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

এ, এল, প্রডাকসন্স

এদের প্রথম বাংলা চিত্রের নাম হ'য়েছে 'ঘরোয়া'। নবাগত শিশির মিত্রকে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। শ্রীমতী মলিনা তার বিপরীত ভূমিকায় দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মনি ঘোষ।
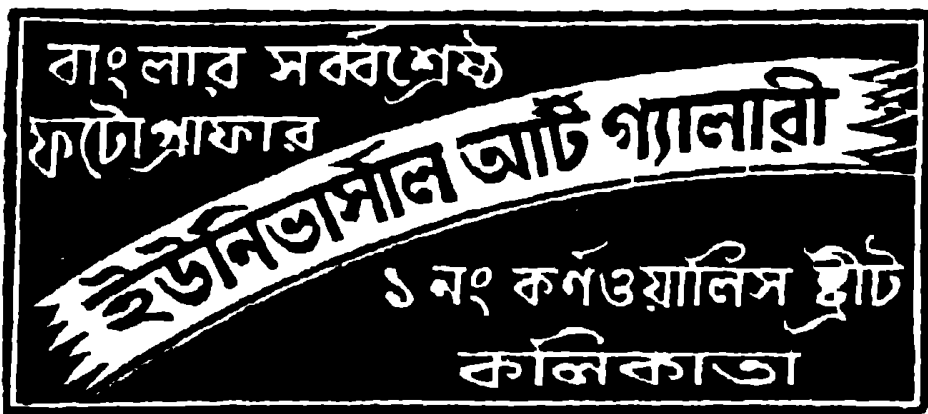
বাংলার রাজ জ্যোতিষী, জ্যোতিষ - শিরোমণি যোগবিদ্যাভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিক রত্ন, এম্, আর, এ-স (লণ্ডন) সম্প্রতি 'জ্যোতিষ-সম্রাট', উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে উপাধি দান উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সমাগত পণ্ডিত ও সুধীজন সকলের মাঝে জ্যোতিষ-সম্রাটকে দেখা যাচ্ছে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব : বাঙ্গালী জ্যোতিষী 'জ্যোতিষ সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত !

বারাণসী পণ্ডিত সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিনন্দিত

বাংলার জ্যোতিষ প্রবর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিখ্যাত হস্ত রেখাবিদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী রাজ জ্যোতিষী জ্যোতিষ শিরোমণি যোগবিদ্যাভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিক রত্ন, এম, আর, এ, এস (লণ্ডন); বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি "জ্যোতিষ-সম্রাট" উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছেন।

মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গণনা করে বাংলার এই জ্যোতিষী আজ সবাকার সম্মান ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। এঁর তান্ত্রিক ক্রিয়', হাত ও কপালের রেখা-বিচার, প্রশ্নগণনা ও অন্যান্য অলৌকিক জ্যোতিষিক ক্ষমতায় ভারত এবং ভারতের বাইরে অনেকেই মুগ্ধ হ'য়েছেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মণীষীবৃন্দের কাছ থেকে ইনি যে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন—তা অন্য কোন জ্যোতিষীর পক্ষেই সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। ভারতের স্বাধীন নরপতি, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং নেতৃবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে দেশের বিভিন্ন জনসাধারণ এঁর জ্যোতিষিক গণনায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়েছেন।

ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ যিনি বিগত মহাযুদ্ধের ঘোষণার সংগে সংগেই মাত্র চার ঘণ্টার ভিতর বৃটেন ও সম্রাটের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত জয়ের দৃঢ়তার কথা প্রকাশ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষের অসহায় ও শোচনীয় পরাজয়ের কথা আশা করি এখনও কেউ ভুলে যাননি—ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। সেই শোচনীয় এবং অনিশ্চয়তার মাঝে মিত্রপক্ষের সুনিশ্চিত জয়ের ঘোষণাকে অনেকেই তখন বাতুলতা বলে মনে করেছিলেন! কিন্তু জ্যোতিষ প্রবর স্বীয় দিব্যদৃষ্টি ও গণনা নৈপুণ্যে যে সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, দৃঢ়তার সংগে সে সত্যকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্যের পরিচয় দেননি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, **"বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করবে।"** ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার এই বাণী সমস্ত সন্দেহের মায়াজাল কাটিয়ে যখন সত্যের রূপ নিয়ে প্রকট হ'য়ে উঠলো—বিরুদ্ধবাদীরাও তখন নত মস্তকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন জ্যোতিষীর প্রতিভাকে সাদর অভিনন্দন না জানিয়ে পারলেন না।

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারত সম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের বড়লাট ও গভর্ণর মহোদয়গণকে তখন জানানো হ'য়েছিল। তাঁরা যথাক্রমে ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮......এ২৪নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি—ও ৩৯ চিঠি নং দ্বারা প্রাপ্তি স্বীকার ও জ্যোতিষার্ণবকে অভিনন্দিত করেন।

জাতীয় কংগ্রেসের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে এঁর সাম্প্রতিক ভবিষ্যদ্বাণী বহু নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। জাতির দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবার দৃঢ়তার কথা প্রকাশ করে ইনি দেশবাসীকে বর্তমানের হানাহানি ও হতাশার মাঝেও নূতন আশায় ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। পণ্ডিত প্রবরের এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই ঘোষিত হয়। পণ্ডিত প্রবর ভারতের ভাগ্যাকাশ গণনা করে এই বাণী প্রচার করেন, "সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও আত্মকলহের অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রিয় নেহেরু সরকার সম্পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন জাতীয় সরকারের মর্যাদা অর্জন করে দেশ এবং জাতিকে সব প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।" পণ্ডিত প্রবরের এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে নেতৃবৃন্দের গোচরীভূত করা হয় এবং এই বাণীর সত্যতা যে প্রমাণিত হ'তে চলেছে—দেশবাসীর এখনও সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে অচিরেই প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপক মণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র এঁকেই 'জ্যোতিষ শিরোমণি' উপাধি দানে ইতিপূর্বে ভূষিত করেছেন।

'জ্যোতিষ শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য যেদিন 'জ্যোতিষ শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত হন—সেদিনটি যে কোন জ্যোতিষীর পক্ষেই একান্ত কাম্য। স্বীয় অধ্যবসায়, জ্ঞানার্জন ও আধ্যাত্মিক সাধনার বলেই তিনি এই সম্মান লাভে সমর্থ হ'য়েছেন। জ্যোতিষ জগতে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করে আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর সু-উচ্চ সম্মান লাভে সমর্থ হ'য়েছেন। সেদিনকার ছবি আজও স্বতঃই মনে ভেসে ওঠে যেদিন মহাবোধি সোসাইটি হলে মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের এক সাধারণ অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব এম, আর, এ, এস (লণ্ডন), মহাশয়কে "জ্যোতিষ শিরোমণি" উপাধি দানে সম্মানিত করা হয়।

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

উপাধি দান প্রসংগে সভাপতি মহাশয় বলেন, "পণ্ডিত রমেশচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। সামুদ্রিক শাস্ত্র অতি কঠিন, ইহার গণনা ফল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য অনেকেই সামুদ্রিক বা প্রশ্ন গণনায় অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। কিন্তু রমেশচন্দ্র যে অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়া হস্ত রেখাদির বিচার বা প্রশ্ন গণনা করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন স্থলেই তাঁহার গণনা ভুল বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। গণিতাংশেও তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া রমেশচন্দ্র ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অদ্য আমরা তাঁহাকে "জ্যোতিষ শিরোমণি" উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃত যোগ্য পাত্রেই এই মহামূল্য উপাধি ন্যস্ত হইল।"

গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় বলেন, "শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় যে প্রবীণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার যোগ্য পুরস্কার দানে ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল প্রকৃতই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। রমেশচন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী ৺বসন্তকুমার জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের পুত্র। তিনি তদীয় পিতার নিকট জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুযোগ্য পিতার সকল প্রকার গুণ গুণানুসন্ধিৎসু পুত্রে সংক্রামিত হইয়াছে। অতএব আমরা তাঁহার এই সম্মান লাভে প্রীত হইয়াছি।"

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় রমেশচন্দ্রের বহু সদগুণের পরিচয়-প্রসংগে বলেন, "তিনি একাধারে একজন প্রতিভাবান জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকাচার্য। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা তিনি বহু অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ শাস্ত্রী (বিহার), শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (ইউ, পি), শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম, এ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রভৃতি বহু পণ্ডিত রমেশচন্দ্রের যোগ্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাতে বঙ্গদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রো-নমিকেল সোসাইটীর সভাপতি, তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা হতে অনেক সভ্য সমবেত হয়েছিলেন। যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি তাঁরা তার করে তাঁদের সোসাইটীর প্রেসিডেন্টের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য যে, এই সোসাইটির শাখা প্রশাখা সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছে।

পরিষদ্ ভবনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল। এতদ্ভিন্ন বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন।

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীবরদাকুমার বেদশাস্ত্রী, শ্রীরাম শাস্ত্রী, শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীপুরাণদাস সপ্ততীর্থ, মহামহোপদেশক কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, শ্রীশশিশেখর বিদ্যাসাগর, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম, এ, শ্রীহেমন্তলাল তর্কতীর্থ, শ্রীহরিমোহন কাব্যতীর্থ বি, এ, শ্রীকালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীনীলমণি শাস্ত্রসাগর, পণ্ডিত শ্রীভবানীভূষণ সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত স্মৃতিতীর্থ জ্যোতিঃশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীসারদাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি জ্যোতিস্তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র জ্যোতিস্তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ কাব্যতীর্থ জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীধর কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীসরলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত হেরম্বচন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীঅম্বিকাচরণ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী (ইউ, পি), পণ্ডিত শ্রী সারদাপ্রসাদ শাস্ত্রী (বিহার) প্রভৃতি শতাধিক বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

বারাণসী পণ্ডিত সভার বার্ষিক অধিবেশনে বাঙ্গালার সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রাজজ্যোতিষী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব

মহাশয়কে "জ্যোতিষসম্রাট" উপাধি দ্বারা সম্মানিত

বিগত ২৬শে মাঘ রবিবার (ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭) বারাণসীর পণ্ডিতসভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের অদ্বিতীয় প্রাচীনতম পণ্ডিতপ্রবর সর্বশাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিহর কৃপালু দ্বিবেদী শাস্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার উদ্বোধনেই কলকাতা ১০৫নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ অল্ ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্বনামধন্য বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জ্যোতিষশিরোমণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব এম্, আর্, এ, এস (লণ্ডন) মহাশয়কে বৈদিক পণ্ডিতগণ সামগান দ্বারা শুভাশীর্বচন জ্ঞাপন করলে ভারতের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কাশীধামস্থ বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অলৌকিক ক্ষমতা, অতুলনীয় প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অন্যান্য সদগুণাবলীর বিশদরূপে আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে মাল্যদানান্তে "জ্যোতিষ সম্রাট" এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে সম্মানিত করেন।

জ্যোতিষ শিরোমণি মহাশয় উপাধি প্রাপ্তির পর সমবেত সভ্যবৃন্দের সম্মুখে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত ও সর্বসাধারণের নিকট এর প্রয়োজনীয়তার সমালোচনা করেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উপাধিদান প্রসংগে মাননীয় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত কৃপালু মহাশয় বলেন :—

"শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় ফলিত গণিত,

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সামুদ্রিক হস্তরেখাদি বিচার এবং তান্ত্রিক কার্যাদিতে প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন দ্বারা প্রত্যেককেই চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলার গৌরব নহেন, সমগ্র ভারতের গৌরব। আমরা তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি। সম্রাট্ শব্দের সম্যক্ ভাবার্থ যাহা বুঝা যায় তাহা সম্যক্ তাঁহার সুদর্শন ঈশ্বরদত্ত চেহারার প্রতি দৃষ্টি করিলেই উপলব্ধি হয়, ইহার বেশী কিছু আমার বলিবার নাই। তাঁহাকে ভগবান শতায়ু করুন—ইহাই প্রার্থনা।"

বারাণসী পণ্ডিত সভার সম্পাদক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়দর্শনের প্রধানাধ্যাপক মহামহাধ্যাপক পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য তর্কতীর্থ বলেন :—

"শ্রীমান রমেশচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বকীয় বুদ্ধি ও বিদ্যাকৌশলে বহু জটিলতত্ত্ব এবং গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটনপূর্বক জ্যোতিষশাস্ত্রের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। বহু উচ্চপদস্থ দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁহার গণনাবলীর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা উপলব্ধিপূর্বক ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বয়সে নবীন হইলেও সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা তাঁহার এই সম্মান লাভে বিশেষ প্রীত হইলাম।'

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মীমাংসা দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী খনঙ্গ বক্তৃতা প্রসংগে বলেন :—

"পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্রের জ্যোতিষশাস্ত্রে বহু অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা শুনিতে পাই। তিনি তাঁহার পিতার নিকট মাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেন নাই, উপরন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। বর্তমান সময়ে ভারতে ইঁহার অপেক্ষা জ্যোতিষ ও তন্ত্রে এইরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দুর্লভ। ইঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে অধিক কিছু এই সভায় বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।"

কাশী ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের উপদেশক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী দর্শন কেশরী বলেন : –

"পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র কেবলমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নিশ্চিত হন নাই। পরন্তু বিশ্ববাসীকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও ইহা যে সর্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্র তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তিনি একাধারে জ্যোতিষী ও বহু অলৌকিক শক্তিরাশির দ্বারা বিভূষিত। আমরা উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইনি ভারতের গৌরবস্বরূপ।"

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়দর্শনের সহকারী অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ শুক্ল ন্যায়বেদান্তাচার্য এম-এ বলেন :—

"জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি কঠিন। অনেকে ক্রমশঃ প্রতারিত হইয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক বিদ্যাবত্তাতে এই শাস্ত্রের মহিমা বর্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছেন। আমার পূর্ববর্তী শ্রদ্ধেয় বক্তাগণ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন,

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমি তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। ইনি একাধারে তান্ত্রিক ও অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ। তাঁহাকে এই উপাধিদান করিয়া সত্যই বারাণসী পণ্ডিত সভা যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করি।"

কাশী ধর্মসঙ্ঘ মহাবিদ্যালয়ের ন্যায়দর্শনের প্রধানাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত মিশ্র তর্কতীর্থ ন্যায়াচার্য বলেন ঃ—

"বর্তমান সময়ে ভারতে শ্রীমান রমেশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার স্বর্গগত পিতার সর্বপ্রকার গুণ গুণানুসন্ধিৎসু পুত্রে সংক্রামিত হইয়াছে। আমরা সকলেই তাঁহার এই গৌরবত্বে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। এত অল্প বয়সে এই সম্মান প্রাপ্তি ভারতে এই প্রথম। অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ইহা সম্ভবপর নহে।"

কাশী গোয়েঙ্কা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মিশ্র ব্যাকরণ বেদান্তাচার্য বলেন ঃ—

"ইহা আমি স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি, পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্রের উপাধি প্রাপ্তি ভারতের সর্বোত্তম যোগ্য ব্যক্তির উপরই অর্পিত হইয়াছে। অস্তকার এই উপাধিদান সময়োপযোগী প্রবৃত্তির গতিতেই হইয়াছে। তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিরই এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি প্রাপ্য।"

সংস্কৃত বাণীভবনের সম্পাদক ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দান প্রসংগে উপসংহারে জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ ও জয়পুর রাজপণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ জ্যোতিষশাস্ত্রী জ্যোতির্বিনোদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অশেষ গুণকীর্তন করে সভাভংগ করেন।

সভাতে প্রায় আড়াই শতাধিক বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দেশীয় এইরূপ বিরাট বিদ্বৎ সম্মেলন সহসা কাশীতে দৃষ্ট হয়নি। এতদ্ব্যতীত বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হল ঃ—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী (মাদ্রাজ)।

কাশী গবর্ণমেণ্ট কলেজের লাইব্রেরীয়ান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে (মহারাষ্ট্র)।

ভারতের অদ্বিতীয় স্মার্ত পঞ্চকোট রাজসভাপণ্ডিত বারাণসী পণ্ডিত সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় দর্শনের প্রধান অধ্যাপক বারাণসী পণ্ডিত সভার সম্পাদক মহামহাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য তর্কতীর্থ।

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ শুক্ল ন্যায়াচার্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাগেশ্বর পাঠক জ্যোতিষ বারিধি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার কাব্যতীর্থ জ্যোতির্ভূষণ।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সাংখ্যতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রী।

প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব মীমাংসাদর্শনেব প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র থমঙ্গ্ মীমাংসাচার্য।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর শাস্ত্রী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণামোহন স্মৃতিতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র কাব্যতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমাধব কাব্যতীর্থ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাণিকলাল ন্যায়মীমাংসাচার্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্যাকরণ-ন্যায়াচার্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোটীশ্বর কাব্যস্মৃতিতীর্থ বি এ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ কাব্যতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ভাগবদ্‌ভূষণ। পণ্ডিত শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র কথক চূড়ামণি।

কাশীরাজ সভাপণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন। বিড়লা রাজসভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সভাপতি উপাধ্যায়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাব্যাস।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাণ্ডে জ্যোতিষাচার্য।

পণ্ডিত কেদাব দত্ত শাস্ত্রী জ্যোতিষাচার্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দাউজী শাস্ত্রী জ্যোতিষ রত্নাকব।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র কাব্যব্যাকবণতীর্থ জ্যোতিষশাস্ত্রী।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব মীমাংসা দশনের সহকাবী অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মীমাংসা বেদান্তাচার্য।

কাশী এ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অহিভূষণ সাহিত্যশাস্ত্রী এম, এ।

কাশী শরৎকুমারী বিদ্যাশ্রমেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ ব্যাকরণাচার্য।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যেব প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাদেব শাস্ত্রী।

জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত জ্যোতিঃশিরোমণি। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচ্য বিভাগীয় অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মিশ্র।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ কাব্য ব্যাকবণ স্মৃতিতীর্থ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মানদারঞ্জন জ্যোতিষ আচার্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকনাথ স্মৃতিতীর্থ ধর্মাচার্য।

কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ন্যায় দর্শনের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবদত্ত মিশ্র গৌড় ন্যায়াচার্য।

কাশী গোয়েন্‌কা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মিশ্র ন্যায় বেদান্তাচার্য।

'জ্যোতিষ সম্রাট' পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র তন্ত্রভূষণ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বিদ্যারত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন বিদ্যারত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ স্মৃতিরত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র তন্ত্ররত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর স্মৃতিরত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনী বিদ্যারত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিব্রহ্ম স্মৃতিরত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকানাই সার্বভৌম।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর কাব্যতীর্থ।

জ্যোতিষ সম্রাট মহাশয় বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, বুধবার বেনারস এক্সপ্রেসে যখন কলকাতাভিমুখে রওনা হন, ষ্টেশনে তাঁকে বারাণসী পণ্ডিত সভার পক্ষ হতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর শাস্ত্রী, জয়পুররাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার কাব্যব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র শাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও সভার সম্পাদক মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।
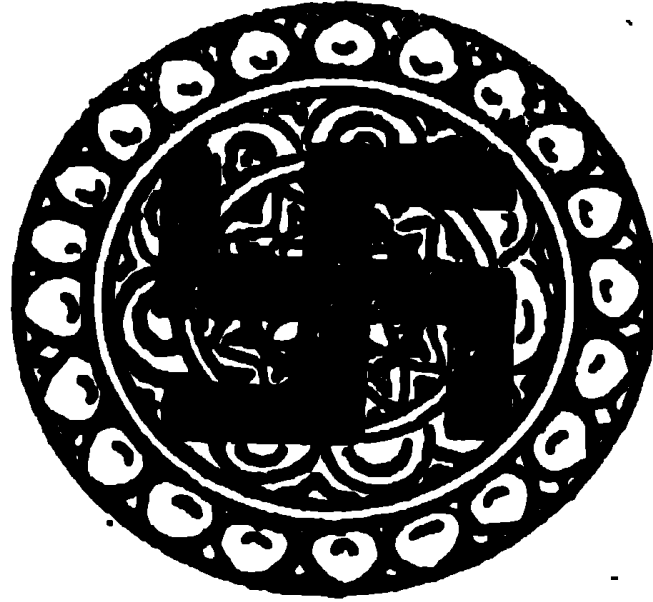
আষাঢ়-শ্রাবন ঃ ঃ ৭ম বর্ষ ঃ ঃ ৪র্থ সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা—

গত সংখ্যায় ছোটদের আমোদ প্রমোদ সম্পর্কে আমরা ইংগিত করেছি। বর্তমান সংখ্যায় সাধারণ ভাবে চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলবো। দীর্ঘ দিনের পরবশতার শিকল ছিড়ে আমরা মুক্ত হ'তে চলেছি। বৈদেশিক শক্তির বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামে আর আমাদের লিপ্ত থাকতে হবে না। এখন আমাদের লিপ্ত থাকতে হবে দেশগঠনের সংগ্রামে। দীর্ঘ দিন বৈদেশিক শাসনের অধীনে থেকে আমাদের মনে এসেছিল পঙ্গুতা—দেহের অংগপ্রত্যংগ বিকল হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের নিজেদের কত সম্পদ—কত ঐতিহ্যই না অপহৃত ও নিষ্পেষিত হ'য়েছে। এতদিন আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি—মুখ খুললে বুটের আঘাতে কম জর্জরিত হইনি। আঘাতের পর আঘাত হানতে হানতে বুটের শক্তি এসেছে কমে—তার তলি গেছে খেয়ে—সরু পিনগুলো নড়নড়ে হ'য়ে উঠেছে। আর ফিরে আঘাত দেবার শক্তি তার নেই। আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে নয়—আঘাত সহ্য করেই নৈতিক আদর্শের বলে আমরা জয়ী হ'য়েছি। কিন্তু দেশের মুক্ত প্রাংগনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কত দুর্বলতাই না চোখে পড়ছে। কোনটার খুঁটি নড়নড়ে হ'য়ে উঠেছে—কোন ঘরের চালের ছোন নেই—কোনটার বেড়া গেছে খসে। তালিতাপ্পি দিয়ে এগুলিকে খাড়া করলে চলবে না। এগুলিকে ধুলিসাৎ করে নূতন ভাবে গৃহ নির্মাণ করতে হবে। আমাদের মনের ও দেহের সমস্ত জড়তা ও অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে নিতে হবে। পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে প্রোথিত করে আমাদের নূতনের জন্ম দিতে হবে। কত জীর্ণ মতবাদ আমাদের সমাজ জীবনকে ক্লীব করে রেখেছে—কত শোষণের বীভৎস রূপ দেখতে পাচ্ছি আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর আড়ালে আবডালে—আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কত ভেজালইনা ঢুকে পড়েছে। সব দিক সকলের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যাঁরা যে ক্ষেত্রে রয়েছেন—তাঁদেরই সেই সেই ক্ষেত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জমি থেকে সমস্ত আবর্জনা ও অসার পদার্থ দূর করে জল ও সার বিছিয়ে তাকে উর্বর করে বীজ বপন করতে হবে।

আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতের প্রভুরা যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন—অন্যে কী করছেন না করছেন সেদিকে তাকিয়ে না থেকে তাঁদের পায়ের তলার জমির দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। অতীতের নানান অছিলায় অনেক ফাঁকিই দেওয়া গেছে—এখন আর ফাঁকি দিলে চলবে না। যিনি ফাঁকির মতলব নিয়ে এসে দাঁড়াবেন, তিনিই ফাঁকে পড়বেন। পায়ের তলা থেকে তাঁর অদৃশ্যে জমিখানি সুর সুর করে সরে যাবে। এতদিন জনসাধারণের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বেনিয়া শাসকদের আওতায় যারা তাদের ব্যবসায়ের শকট নির্বিবাদে খটাখট শব্দে চালিয়ে এসেছেন—তাঁদের প্রথমেই সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—তাঁদের গাড়ীর চাকা ওভাবে আর গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারবে না। আজ জাগ্রত মুক্ত জাতির প্রয়োজন বুঝতে

হবে—চাহিদা জানতে হবে—সেই প্রযোজন এবং চাহিদা-নুযাযী মাল সববরাহ কবতে পাবলেই চাকা ঘুববে—নইলে বিকল হ'যে যাবে—বিকল কবে দেবে। দীর্ঘ দিন উপবাসেব পব অতি দীর্ঘ দিন বদ্ধ পিঞ্জবে থাকবার পব—শার্দুল-শাবক রক্তেব আস্বাদ পেয়েছে আবাব—তার শিবায় উপশিবায় বক্তেব নাচন আবম্ভ হ'য়েছে। কে তাকে বাধা দেবে। কাব এমন শক্তি আছে! যেসব ছবি বা নাটক প্রযোজনায ইতিপূর্বেই আমাদেব চিত্র ও নাট্যজগতেব কর্তৃপক্ষেবা হস্তক্ষেপ করেছেন—সেসব সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু বর্তমানে নূতন কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ কববাব পূর্বে তাঁদেব ভেবে দেখতে বলি। এখন তাঁদেব কী কর্তব্য সে সম্পর্কে অবহিত হ'তে বলি। নইলে নিজেদেব অদূরদর্শিতাব জন্য যথেষ্ট তাঁদেব ভুগতে হবে। সাদা চামডাকে দু'টো গালাগাল দিযে ফাঁকা বুলি ঝাড়লে চলবে না। কুলি-মজুবদেব ভিতব নোটেব তাড়া বিলানোব মহানুভবতাযও কেউ মুগ্ধ হবে না। বুভুক্ষিত দেব জন্য পৃথ্বী ভোজেব আযোজনকে হাস্যাস্পদ বলেই জনসাধাবণ গ্রহণ কববেন। গবীব নাযকেব গলায় ধনী কন্যাব ববমাল্যে কেউ আজ আব হাততালি দেবেন না। চটুল প্রেমেব চাটুল্যও কাব মনে স্পন্দন জাগাবে না।

যে ছবি ও নাটক প্রযোজনায তাঁবা হস্তক্ষেপ কববেন—পূর্বেই তাঁদেব চিন্তা কবে দেখতে হবে—বিনিযে বিনিয়ে দেখতে হবে যা তাঁবা উপস্থিত কবতে যাচ্ছেন, দেশ ও জাতিব তা কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে পাববে—জনসাধাবণের চাহিদা মেটাতে কী কী মালমসলা তাঁবা এব ভিতব দিযে সববরাহ কবতে পাববেন। তাঁদেব এই চিত্র ও নাটকে কোন সমস্যাব কথা স্থান পেয়েছে এবং তাতে সমাধানেব কতটুকুই বা ইংগিত দিযেছেন! তাই প্রথমেই আসে বিষয়বস্তু নির্বাচনের কথা। যে কাঠামোতে ভব করে চিত্র ও নাটক গড়ে উঠবে। আমি আধুনিক যান্ত্রিক উন্নততর ব্যবস্থার পূর্বে এই বিষয়বস্তুর প্রতিই জোর দিয়ে বলবো। কোন ছবিতে ক্যামেবার চাতুরী কম হ'লো—কোন নাটকে কোন দৃশ্য বচনায় একটু খুঁত থেকে গেল সেইটেই বড কথা নয। অবশ্য একথা ঠিকই, আমাদেব সামর্থ ও পবিস্থিতি বিবেচনায় যতটুকু কবা যেতে পাবে—তাতে যদি কোন ফাঁক থাকে, তাহ'লে ক্ষমা কবতে পাববো না। প্রথমে প্রযোজকদের ভেবে দেখতে হবে তাঁবা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ধরণেব ছবি তুলবেন। শিক্ষনীয না নিছক আনন্দ পবিবেশনেব উদ্দেশ্য থাকবে—তাও ভেবে দেখতে হবে—কৌতুক বা ব্যংগ বসেব ভিতব দিযে না গাম্ভীর্য বসেব ভিতব দিয়ে পবিবেশন কববেন—তাও ভেবে দেখতে হবে বৈকী! তাবপব যে প্রশ্ন আসে। মনে করুন, কোন প্রযোজক পৌবাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্র বা নাটক প্রযোজনাব মনস্থ কবলেন। এই পৌবাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী প্রযোজনায় দু'টী বিষযে লক্ষ্য বাখতে হবে। প্রথম পুবাণ বা ইতিহাসেব মর্যাদা পুবোপুবি বজায বাখতে হবে। যখনকাব ঘটনা নিযে চিত্র বা নাটক গডে তুলতে হবে তাব পরিবেশকে সুষ্ঠু ভাবে ফুটিযে তোলা চাই। অর্থাৎ এই ধবণেব চিত্র বা নাটকগুলিব ভিতব দিযে ভাবতেব ঐতিহ্য পুবোপুবি রূপ লাভ কববে। তখনকাব সমাজ ব্যবস্থা—বাজনৈতিক মতবাদ—ধর্মীয জীবন প্রভৃতিকে আবনার ফলকেব মত পর্দায রূপাবোপ করে তুলতে হবে। এবং তখনকাব যে আদর্শ আজও আমাদের জীবনে নূতন আলোকপাত কবতে পাবে চিত্র বা নাটকেব তাই হবে বক্তব্য। দ্বিতীযতঃ এই ঘটনা গুলিকে ব্যংগ রূপেও চিত্রিত বা নাট্যরূপাযিত কবে তোলা যেতে পাবে। প্রমথ বিশীব 'মৌচাকে ঢিল'—এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাংগের কষাঘাতে সেই সব চরিত্রই ফুটিযে তুলতে হবে—যারা তাদের ভুয়ো মতবাদ ও ক্ষমতাব জোবে জনসাধারণের উপর অতীতে প্রভুত্ব করে এসেছে। ঐতিহাসিক চিত্র বা নাটক প্রযোজনায় নানান বাধা আছে। এবং সেগুলি সম্পর্কে পূর্বে থেকে সতর্ক হ'য়ে নিতে হবে।

ভাবতে বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছেন। এবং প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় ইতিহাস হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। মুসলমানেরা যখন প্রথম এদেশ আক্রমণ করেন—তাঁবা বাইবে থেকে এসেছিলেন, এদেশের কেউ ছিলেন না। পববর্তীকালে তাঁবা এদেশ অধিকাব করবাব পর এদেশেই থেকে যান এবং তাঁদেব মধ্য দিয়ে মুসলমান ধর্ম এদেশে বিস্তাব লাভ কবে। বর্তমানে দেশ যে ভাবে সাম্প্রদায়িক উষ্ণতায় উগ্র হ'যে আছে—প্রযোজকেবাও যেমনি তাকে অবহেলা কবতে পাবেন না—আবাব জনসাধাবণকেও প্রত্যেকটা বিষযকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি থেকে বিচাব না কবতে আমবা অনুবোধ জানাবো। আমাদেব সব সময়ই মনে বাখতে হবে—মুসলমান শাসকবর্গ আব মুসলমান ধর্ম এক নয। মুসলমান আক্রমণকাবীবা বা শাসক সম্প্রদায যদি কোন অন্যায কিছু কবে থাকেন—তাতে ইসলামেব পবিত্রতার প্রতি সন্দেহ জাগবাব কোন কাবণ থাকতে পাবে না; তেমনি হিন্দু ধর্মেব বেলাযও। ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটি বিচ্যুতিব সংগে আমবা যেন সমষ্টিকে জডিযে না ফেলি।

এবিষয়ে মুসলমান ভাইদেব প্রতি বিশেষ কযটা কথা বলবাব আছে। যেমন মনে করুন, অনেক মুসলমান ভাই আছেন, যাঁবা বঙ্কিমকে সহ্য কবতে পাবেননা। একথা ঠিকই, বঙ্কিমেব উপন্যাস গুলিতে মুসলমানদেব প্রতি প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমেব ইংগিত তখনকাব মুসলমান শাসক সম্প্রদায়কেই কেন্দ্র কবে—আজকেব মুসলমানেব প্রতি সে কটাক্ষ নয়। তখন মুসলমানেরা অর্থাৎ যাঁবা এদেশ অধিকাব করেছিলেন—তখন অবধিও এদেশেব অধিবাসীদেব সংগে আত্মীয়তা স্থাপন কবতে পাবেন নি—। তাঁবাও ভাবতেন, তাঁরা দূব দেশ থেকে এসেছেন—এদেশেব জনসাধাবণও তাঁদের বিদেশী বলেই মনে করতেন। বঙ্কিমের বেশীর ভাগ উপন্যাস মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসের পট-ভূমিকায় গড়ে উঠেছে বলেই মুসলমান শাসকদের ন্যায় অন্যায়ের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন—সে কটাক্ষ তাঁর নিজস্ব নয়—তখনকার এদেশের জনসাধারণের মনেরই অভিব্যক্তি। হিন্দুরাও যদি তখন অমনি ভাবে বিদেশ থেকে ভারত জয় করে রাজত্ব করতেন, এদেশেব শাসিত জনসাধারণেব অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হ'লে ঐ একই পন্থা গ্রহণ করতে হ'তো। বর্তমান বাজনৈতিক পবিপ্রেক্ষিতে উদাহবণ দিলে আমাদের বক্তব্য আবো পবিষ্কাব হ'য়ে উঠবে। ইংরেজরা প্রথম যখন ভারতে আসেন—সেদিন থেকে এই দু'শ বৎসর ভাবতবর্ষ তাঁদেব যে অত্যাচাব ও শোষণ সহ্য করেছে—ভাবতেব নিজস্ব ইতিহাস বা সাহিত্যে তা মোটেই মহানুভবতাব কথা নিযে লিপিবদ্ধ থাকবে না। ইংবেজদেব আগমনেব সংগে সংগে খৃষ্ট-ধর্ম এদেশে প্রসাব লাভ কবেছে। আজ ইংবেজদের বিদায় নিতে হচ্ছে—এদেব এক অংশ যে এদেশে থেকে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই এবং সংগে সংগে ধর্মও। ইতিমধ্যেই এদেশেব বহু হিন্দু এবং মুসলমান খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ কবেছেন—এতদিন খৃষ্ট ধর্ম এদেশের ধর্মের ভিতব ততটা আমল পাযনি—কিন্তু আজ আমাদেব যাঁবা বা ওদেশেব যাঁবা এদেশেব জনসাধারণেবই একাংশ হ'যে থেকে গেলেন—পববর্তী যুগে ইংরেজদের এই দু'শবছবেব শাসনেব বিরুদ্ধে আমাদেব ইতিহাস যে কথা লিপিবদ্ধ করে রাখবে—তাঁবা যদি তাব বিরুদ্ধে রুখে দাঁডায—সেটা কী সমীচীন হবে! তবে ইতিহাসকে লক্ষ্য রাখতে হবে, শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচাবিতাব কথা বলতে যেয়ে ধর্মের প্রতি যেন কোন কটাক্ষ কবা না হয়। এবং কিছুদিন পূর্বেও যেমন এদেশেব খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদেব আমরা আপনাব কবে দেখতে পাবতাম না—আজকাল আমাদের সে বিরূপ মনোভাব ধীবে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে এবং কিছুদিন বাদে মোটেই থাকবে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমার পাঠক হিন্দুই হউন—খৃষ্টান—মুসলমান ব যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন—ভারতের ইতিহাসের কোন অধ্যায় যদি আজ চিত্রে বা নাটকে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—তাকে তাঁবা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচার করতে যেন না যান—তাকে
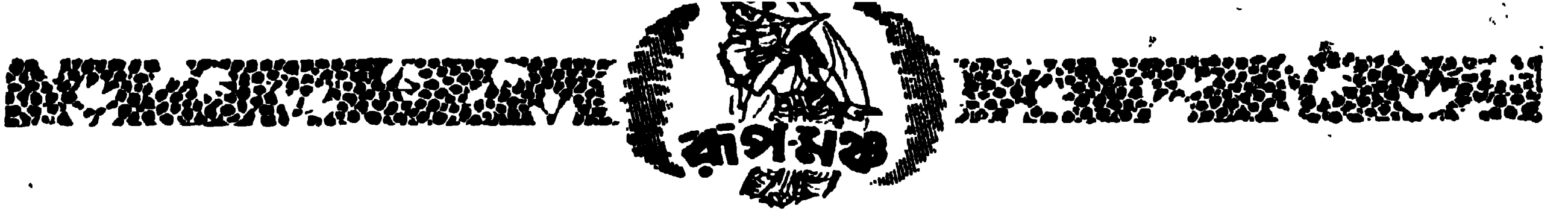
তখনকার সম-সাময়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। এবং সে চরিত্র যে ধর্মের হবে। ইতিহাস যদি সে চরিত্রের অ-কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে—তিনি হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন—হিন্দু বা মুসলমান দর্শকেরা যেন তাতে উষ্ণ হ'য়ে না ওঠেন। তবে প্রযোজকদের সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে—এই ধরণের কোন চরিত্রকে রূপায়িত করতে যেয়ে তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের হীন স্বার্থের খাতিরে ইতিহাসকে যেন বিকৃতভাবে তুলে না ধরেন এবং কোন ধর্মের ওপর বা সমষ্টির ওপর কোন কটাক্ষ না হানেন। তাছাড়া আজকে আমাদের যা বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে যেসব ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেক জনসাধারণের সামনে সার্বজনীন আদর্শ উপস্থাপিত করতে পারবে—সেই কাহিনীকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া।

এরপর রাজনৈতিক চিত্র বা নাটকের কথা বলতে চাই। রাজনৈতিক চিত্র বা নাটক বলতে—যে চিত্র বা নাটকের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখতে পাবো। হয়ত একখানা চিত্র বা নাটকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির বিশ্লেষণ করা হ'লো। আবার আর একখানায় কায়েদী আজম জিন্নার মতবাদ স্থান পেলো। ফরওয়ার্ড ব্লক—আই, এন, এ—র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি—সোস্যালিষ্ট পার্টি—কম্যুনিষ্ট পার্টি—মুসলীম লীগ—হিন্দু মহাসভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় বিভিন্ন দলের আদর্শ ও বক্তব্য নিয়েও ছবি বা নাটক-এর প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারি না। এবং পরস্পরের বিভেদ ও বিতৃষ্ণার অবসান ঘটিয়ে কোন রাজনৈতিক মতবাদ পরস্পরকে একত্র করতে সমর্থ হবে—প্রযোজককে রাজনৈতিক দুরদৃষ্টিতে তা বিচার করে চিত্র ও নাটক মারফৎ তার ইংগিত দিতে হবে। ইদানীংকালের হাস্তকর মজদুর-প্রীতি বা সমাজতন্ত্রবাদের যে বিকৃতরূপ আমাদের চিত্র ও নাটকে দেখতে পেয়েছি—বর্তমানে সেই অজ্ঞতা দিয়ে সীকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। যে মতবাদই তাঁরা চিত্র বা নাটকের মারফৎ ফুটিয়ে তুলতে যান না কেন, সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরই তাকে রূপায়িত করে তুলতে হবে।

সামাজিক চিত্র ও নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, এখনও যে জীর্ণ মতবাদ আমাদের সমাজ জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করা—অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, —ধর্মীয় কুসংস্কার—প্রত্যেকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এবং এই সমাজ চিত্র বা নাটকে প্রকৃত সমাজের ছবিই যেন মূর্ত হ'য়ে ওঠে। নগরের জীবন নিয়েই চিত্র বা নাটক গড়ে উঠুক—কী পল্লী জীবন নিয়েই গড়ে উঠুক—নাগরিক জীবনের বা পল্লী জীবনের সুস্পষ্ট ছবি যদি তাতে না থাকে তাহ'লে সে ছবি বা নাটকের সার্থকতা কোথায়? গ্রাম্য ছবিতে যে চরিত্র স্থান পাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন পদ্ধতি—কথিত ভাষা—প্রচলিত রীতিনীতি সব কিছুকেই হুবহু রূপায়িত করে তুলতে হবে। অশিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে পল্লীবাসীদের জন্য ছবির প্রয়োজন যে কতখানি রয়েছে আশা করি কেউই তা অস্বীকার করবেন না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই সব ছবি গ্রহণে হস্তক্ষেপ করতে হবে। কৌতুক চিত্রের অভাব আমরা সকলেই অনুভব করে থাকি। কৌতুকচিত্র, ব্যংগচিত্র নেই বল্লেই চলে। অথচ কৌতুক অভিনেতার ত আমাদের দেশে অভাব নেই। রাজনৈতিক ব্যংগচিত্রের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন মনে করুন, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে কোন নাটক বা চিত্র গড়ে তুলতে হবে। জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে ব্যাংগের ভিতর দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। নিছক আনন্দদানের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ণাংগ চিত্র বা নাটক আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। আমরা একটার ভিতর দিয়েই সব রস পরিবেশন করে এসেছি। আজ আর তা করলে চলবে না। যে কোন ছবি বা নাটককে তার একক ধর্ম নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ আমি

যদি চাই কৌতুকের ভিতর দিয়ে কোন কিছু উপস্থিত করতে—আগাগোড়া কৌতুক রসের ভিতর দিয়েই আমার বিষয়কে নিয়ে যেতে হবে।

যে বিষয় গুলির কথা উল্লেখ করলাম, প্রযোজকদের উদ্দেশ্য করে বল্লেও মূলতঃ কাহিনীকারদের এবিষয়ে অবহিত হ'তে হবে এবং কাহিনীকে যাঁরা চিত্র বা নাট্য রূপায়িত করে তুলবেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব, দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমস্ত কিছুই নির্ভর করে কাহিনীর ওপর। কিন্তু এই কাহিনী নির্বাচনে এতদিন কোন ধারাই অনুসৃত হয়নি। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের খ্যাত এবং অখ্যাত কাহিনী চিত্র এবং নাট্য রূপায়িত হ'য়েছে। এই রূপদানের পেছনে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। কোন বিশেষ সাহিত্যিকের বিশেষ উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করলো—অমনি চিত্র বা নাট্যরূপ দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা মেতে পড়লেন। কেন এই কাহিনীটী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং তার সে মর্যাদা কতখানি তারা বজায় রাখতে পারবেন একথা আর কেউ ভেবে দেখেন না। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঐ জনপ্রিয় কাহিনীগুলি ব্যর্থ রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছে—তার আদর্শ কোন অতলে তলিয়ে গেছে। এজন্য আমাদের সংশ্লিষ্ট কাহিনীকারেরাও কম দায়ী নন। তাঁরা কাহিনী দেবার সময় প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার কথা মনে রাখেন না—তাঁদের কাহিনীটী যথাযথ রূপায়িত হ'লো কিনা—তার মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হ'লো তা নিয়ে বড় মাথা ঘামান না—নিজেদের টাকাটা পকেটে এসে গেলেই হ'লো। এছাড়া অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেবলমাত্র চিত্র বা নাটকের প্রযোজনেও নতুন কাহিনী রচনা করে থাকেন। কিন্তু তার পেছনেও কোন উদ্দেশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁরা প্রযোজকদের অর্ডার মাফিক অথবা চিত্র বা নাটক রচনা করার সময় কাহিনীর কথা ভুলে যেয়ে চিত্র বা নাটকের জন্যই যে তাঁদের কাহিনী লিখতে হচ্ছে এইটেই সব সময় মনে স্থান দেন। এতে কাহিনীর সাহিত্য-ধর্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বজায় থাকে না—কোন আদর্শের বা মতবাদের কথাও যে এর ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে তাও তাঁরা ভুলে যান—আর দশখানা ছবি বা নাটকের ছাঁচ সামনে রেখে নায়ক নায়িকার ছক এঁকে—কী অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ঘটনার পরিসমাপ্তি করেন। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক টাকার জন্য নিজের নাম ধার দিয়েও থাকেন—এ উদাহরণও একাধিক আমরা উল্লেখ করতে পারি। আমাদের আদর্শবাদী সাহিত্যিকদেরই যেখানে এই মনোবৃত্তি, সেখানে ব্যবসায়ীদের কেবল গালাগালি দিয়ে কোন লাভ নেই। তাই প্রথমেই আবেদন জানাচ্ছি আমাদের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছে—এবিষয়ে তাঁদের যে গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে সেকথা যেন তাঁরা না ভুলে যান। আজ তাঁদেরও নতুন দৃষ্টিভংগীতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে—দেশের সংগঠনে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব অনেক—তা তাঁরা নিজেরাই জানেন এবং বোঝেন। স্বাধীন জাতিকে আজ তাদের নূতন বাণী শোনাতে হবে—নবতর আদর্শে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। জাতির দুর্দিনেও আমাদের সাহিত্যিক গোষ্ঠী শত নির্যাতন সহ্য করেও জাতির মংগল চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—নিজেদের শক্তিশালী লেখনী কোন দিনই জাতির স্বার্থ বিরোধী কার্যে তাঁরা নিয়োগ করেন নি। তাই তাঁদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা অসীম—আশা অনন্ত। আজ চিত্র ও নাট্য মঞ্চকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে হ'লে তাঁদেরই সর্বাগ্রে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের গলদ অপসারণে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে হবে। প্রযোজকদের হাতের ক্রীড়নক হ'লে তাঁদের চলবে না—তাঁদের নির্দেশানুযায়ী প্রযোজকদের চালাতে হবে।

—শ্রীকাঃ

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি ?

অতুল দাশগুপ্ত

●

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বয়স অধিক নয়। কিন্তু এই শিশু প্রতিষ্ঠান অতি অল্প দিনেব মধ্যে যা প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা আশাতীত না হইলেও মন্দ নহে। ভাবতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি অন্ততঃ শিক্ষিত মহলে ইহা সমাদর লাভ করিয়াছে বা করিতেছে। সহরেব বড় বড রাস্তা হইতে শুরু কবিয়া, অলিতে গলিতেও নিত্য নতুন নতুন চিত্র গৃহ নির্মিত হইতেছে। আজ সুদূব গ্রাম অঞ্চলেও ইহা একেবাবে বিবল নহে। এই কলিকাতা সহরেই কত যে চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়িযা উঠিয়াছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া সাধ্যাতীত। ছোট বড় বাস্তাব রাস্তাব পাশে প্রায়ই নতুন প্রতিষ্ঠানেব বোর্ড চোখে পড়ে। টালিগঞ্জেব ষ্টুডিওর সংগে যাবা পবিচিত, তারা বিশেষ করিয়াই জানেন, সেখানে ছবি নির্মাতাগণ চুক্তির জন্য প্রত্যহ কিরকম ভিড় করিতেছেন। বোম্বাইতে শুনিতেছি, ইহা হইতেও মাবাত্মক অবস্থা। চলচ্চিত্র শিল্প যে খুবই লাভবান ব্যবসা জনসাধারণ তাহা আজ বুঝিতে পাবিয়াছে। তাই ব্যবসা হিসাবে শিল্পের যে উন্নতি কতকটা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কিন্তু আর একটা দিক—সেটা হইতেছে, চলচ্চিত্রের উন্নতি, তার কতদূর কি উন্নতি হইয়াছে, একবার পর্যালোচনা করা যাক। চলচ্চিত্র শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছে, সুক্ষ Art ও Scienceর সমন্বয়ে। ইহার ঠিক সেই দিনই চরম উন্নতি হইবে, যে দিন ছবি দেখিতে দেখিতে আমরা ভুলিয়া যাইব, কথা শুনিতেছি ও ছবি দেখিতেছি যন্ত্রের ভিতর দিয়া—অমুক গাঙ্গুলি অমুক সরকার বা অমুক Roleএ অভিনয় করিতেছেন। ভারতীয় চিত্রাকাশে বা জগতেই এরূপ দিন কবে আসিবে, বা আদৌ আসিবে কিনা বলা যায় না। সে কথা উল্লেখ করাও বর্তমানে অনাবশ্যক। ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই বিচার করা যাক। ভাবতে সবাক চিত্রের যুগ প্রায় ওদেশের সংগে সংগেই শুরু হয়। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। এই বিশ বছরে ওদেশের যা উন্নতি হইয়াছে, তার পরিচয় আমরা ওদেশের ছবিগুতেই পাই। তাই বলিয়া ওদেশের সংগে আমাদের তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, ছবি প্রস্তুত করিতে যাহা কিছু মাল মশলাব প্রয়োজন সবই আমরা উহাদের কৃপার ভিখারী। আজ ভারতীয় চিত্রের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে আমাদের অতীত চিত্রগুলির সংগে বর্তমানের তুলনা কবিয়া দেখিতে হইবে।

গত ১০ বৎসরের ভাবতীয় চিত্রেব ইতিহাস লইয়া দেখিলে আমবা কি দেখি—তখনকার যুগের সেই সাফল্যমণ্ডিত ছবিগুলির আজও প্রদর্শনী হইলে দর্শকের ভিড়ের অন্ত থাকে না। তুলনা কবিয়া দেখিলে আজকালকার যে কোন ছবির চেয়ে দর্শকের কাছে তার আদর অধিক। ইহার কারণ কি ?—হয় দশবৎসর আগেকার জনপ্রিয় ছবিগুলি দর্শকের মনকে এমনভাবে মুগ্ধ কবিয়াছে যে, তারা ছবির নাম শুনিয়াই নির্বিচাবে দেখিতে যায়। নয়তো বর্তমান ছবিগুলি আগেকার চেয়ে উন্নত নয়। আমার এই শেষের কথাটা হয়ত একটু কেমন শোনা যাইছেছে,—কারণ রব উঠিয়াছে ভারতীয় চিত্র শিল্প সব দিক দিয়াই নাকি ক্রমশঃ দিনের পর দিন উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই—? তখনকার দিনের পরিচালিত যে কোন একখানি জনপ্রিয় ছবির সংগে, সেই একই পরিচালকের বর্তমানের একখানি ছবি, কি গল্প, কি গল্প-গঠন পদ্ধতি, দৃশ্যপট, অভিনয় যে কোন দিক দিয়াই যদি বিচার করা যায়—তুলনায় উন্নততর কিছু চোখে পড়ে কি ? বরং বর্তমান ছবিগুলি দেখিয়া পরিচালকের উপরে আমাদের সহানুভূতিই হয়। এখানে আমি কোন ব্যক্তিগত পরিচালক বা তাহাদের ছবির নাম উল্লেখ করিতে চাহি না। তথাকথিত প্রধান পরিচালকবৃন্দকে তাঁহাদের অতীত এবং
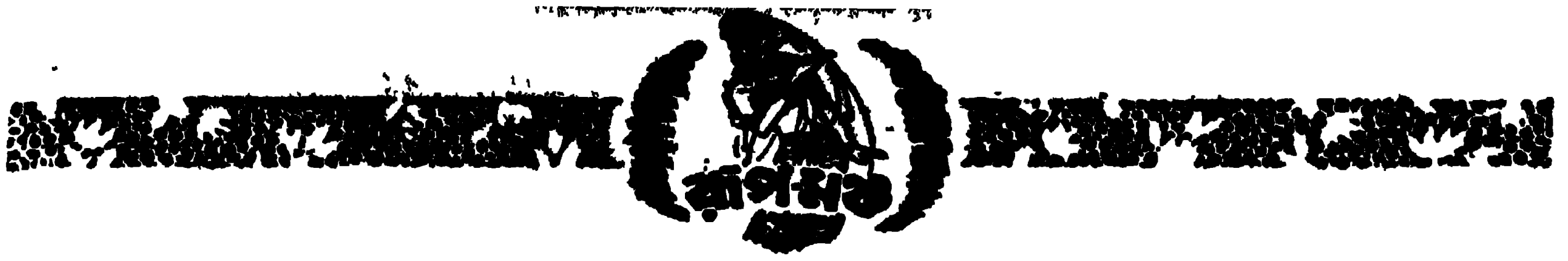
বর্তমান সৃষ্টিকে নিজেদেরই তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যুদ্ধের পর এদেশে Film Control উঠিয়া যাবার পর এক সংগে অনেকগুলি নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে বহু নতুন পরিচালকেরও উদ্ভব হইয়াছে। ইহা এক দিক দিয়া খুবই প্রশংসার কথা। ইহাদের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয় ইহা সবারই কাম্য। ইহারা ছবির মধ্যে নতুন কিছু দিবেন এই আশাই আমরা পোষণ করি। কিন্তু ইহাদের দু'একখানি ছবি (যাহা বাজারে বাহির হইয়াছে) দেখিয়া আমাদের সেই আশার পরিবর্তে আশঙ্কারই সৃষ্টি করিতেছে অধিক। তাহাদের শ্রম লব্ধ সৃষ্টির ভিতরে নতুনত্বের তো কোন সন্ধান পাওয়া গেলই না। বরং পুরাতন ছবিগুলির অনুকরণেও নৈপুণ্যের অভাবে ছবির ভিতরে এমনই একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তারা যে কি বলিতে চাহিয়াছেন, কি তাহাদের উদ্দেশ্য সব কিছু অস্পষ্ট অবোধ্য হইয়া সব কিছুর গোল পাকাইয়া খিচুরি হইয়া গিয়াছে। এই অনুকরণবৃত্তি যে কতবড় মারাত্মক ব্যাধি—বর্তমান শিল্পের উন্নতির পথে ইহা যে কতখানি অন্তরায়, বোধ করি এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার সময় আজও আসে নাই। কারণ, ছবির মালিকগণ তাহাদের লাভের অনেক টাকা আশাতীতরূপেই ঘরে তুলিতে সমর্থ হইতেছেন কিন্তু ইহা যে তাহাদের কতবড় ভুল তাহা অনুভব করার দিন শীঘ্রই আগাইয়া আসিতেছে। পর্দার গায়ে ছবি পড়িলেই দর্শকের প্রশংসার যুগ চলিয়া গিয়াছে।

আমাদের ছবির কর্ণধারগণ কোন উদ্দেশ্যে বা আদর্শ নিয়া ছবি প্রস্তুত করেন না। গতানুগতিক পথেই তাহাদের ঝোকটা অধিক। অথচ ছবির ভিতর দিয়া সমাজের তথা দেশের যে কি মহান উপকার সাধিত হইতে পারে, বোধ-করি ছবির মালিকগণ সে কথা কল্পনায়ও একবার ভাবিয়া দেখেন না। সাহিত্যে লেখার ভিতর দিয়া—দেশের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দিয়া যুগ যুগ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যে কথা বলাইতে অক্ষম হন, ছবির ভিতর দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি অশিক্ষিত জনসাধারণকেও বোঝান যায়। স্বীকার করি পরাধীনতার গ্লানি আমাদের মনের উচ্ছ্বাস, কঠিন সত্য প্রকাশের পথে বাধা ছিল। কিন্তু আমাদের সমাজের আনাচে কানাচে কত দিক দিয়া কত সমস্যা যে ভাবিবার ছিল তার বাস্তবকে রূপ দিতে পরাধীনতার গ্লানিকেও উপেক্ষা করিয়াও করা যেত। আবহমান ধরিয়া প্রেমকে গল্পের পটভূমিকা করিয়া আজ ঘটনা বৈচিত্রের ভিতর দিয়া ছবির জন্য যে গল্প রচিত হইতেছে, তাহা প্রেমের অবাস্তব রূপ। এতে সমাজের হিতের পরিবর্তে বোধ করি অহিতই হইতেছে বেশী। আমাদের দেশের দর্শকেরও রুচির পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাই না। প্রসংগটা বোধ করি একটু অবান্তর হইয়া পড়িতেছে, তবুও উল্লেখ করার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই কলিকাতা সহরেই আজ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া একখানি ছবি একই চিত্র গৃহকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ছবিখানি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। উল্লিখিত ছবিখানির নায়ক একটি পাঁকা চোর। সে চুরির পর চুরি করিয়া চলিয়াছে। পুলিশ তাহাকে ধরিতেছে। এই চোরের প্রেমে পড়িল একটি আভিজাত্য ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। পারিপার্শ্বিক ঘটনার ভিতর দিয়া শেষ অবধি একটা করুণ রসের সৃষ্টি করিয়া ছবিখানি উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছবিখানি দেখিয়া দর্শকের মনে যে ছাপ রাখিয়া যায় তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলের না তার বিপরীত সেটাই জানিবার বিষয়। অথচ ছবিখানি সারা জগতের প্রদর্শনীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।

ইদানীং জাতি গঠন, ধনী দরিদ্রের দ্বন্দ্ব কতকগুলি সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া ছবির জন্য গল্প রচনার প্রতি পরিচালক ও প্রযোজকদের খুব ঝোক দেখা যাইতেছে। ইহা আশার কথা। এই শ্রেণীর কয়েকখানি ছবি বাজারে আত্মপ্রকাশও করিয়াছে। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি ছবিগুলি দর্শকের মনে রেশ অংকিত করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, ছবির ভিতরে শুধু বড় বড় কথার বৃষ্টিই করা হইয়াছে কার্যতঃ দেখান কিছুই হয় নাই। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের ছবির মধ্যে বর্তমানে কথার অংশ যেন প্রাধান্য লাভ করিতেছে। কিন্তু এখানে মনে প্রশ্ন জাগে—কথা ও চিত্রের সমন্বয়ে

সবাক চিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কথা ও চিত্র :—এই দুটোর মধ্যে কোনটা প্রধান এটাই প্রশ্ন—আমার মনে হয়, চলচ্চিত্রের প্রধান অংগ ক্যামেরা লেন্স। ইহার একটা নিজস্ব সত্বা আছে। মানুষের ভাবধারা পরিবেষ্টনী পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশেই ইহার আভিজাত্য অক্ষুন্ন থাকে। এবং সেখানেই তার চরম সফলতা প্রমাণিত হয়। নির্বাক যুগের পর যখন ওদেশের শিল্পিগণ কথাকে চলচ্চিত্রের অংগ হিসাবে গ্রহণ করিল, তখন তারা ছবির ভিতরে কথাই কোনদিন প্রধান্য লাভ করিবে, একথা কল্পনায়ও কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু কথাকে চলচ্চিত্রের অংগ হিসাবে যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন সেইভাবেই ওরা ক্যামেরা লেন্সের ন্যায্য দাবীকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই ছবি প্রস্তুত করিতেছেন। ওপাড়ের ছবিগুলি দেখিয়া একথা বিশেষভাবেই প্রণিধান করা যায়।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশের ছবিগুলি দিনের পর দিন যে পথে চলিতেছে, সন্দেহ হয়, চিত্র শিল্পের কর্মিসংঘ হয়ত ক্যামেরার আসল সত্বা ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা তারা এই আইন মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নন। ছবির ভিতরে চরিত্রের মুখে কথার পৃষ্ঠে কথা বরদাস্ত করা চলে, কিন্তু কথার ভিতর দিয়া বিষয় বস্তুই যদি প্রকাশ করিতে হয়, তবে আর আমাদের ঘটা করিয়া চিত্র গৃহের সম্মুখে গিয়া ভিড় করার লাভ কি? ছবির ভিতরে কথার প্রভাবও দৃশ্যপট পরিকল্পন-পরিপাট্য-সংযোগে আজকাল ছবিতে যে পরিবেশের সৃষ্টি করিতেছে, ভয় হয় আমরা যেন ক্রমশঃ মঞ্চের পথে আগাইয়া চলিয়াছি। ইহা চিত্র জগতের দৈন্য না সমৃদ্ধি ভাবিবার বিষয়।

এতক্ষণ সব দিক দিয়া শুধু ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছি এবার একবার চিত্রের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। গত ১০ বৎসরে যন্ত্রের আবির্ভাব আমাদের দেশে আশাতীত না হইলেও কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু যান্ত্রিক শিল্পোন্নতি বিশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। ছবির অবিভাজ্য প্রধান অংগ হইতেছে ক্যামেরা। পর্দার গায়ে ইহার কার্যকলাপ দেখিয়া মোটামুটি Standard হিসাবে পূর্বের চেয়ে ইতর বিশেষ কিছুই বিচার করা যায় না। আজও ছবির মধ্যে সেই একই দোষ ত্রুটি চোখে পড়ে। বর্ষার রাতে অথবা মেঘাবৃত অম্বর পথে সেই উজ্জল আলোর সমারহ। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্যালোকের দৃশ্যে সন্ধ্যার ঘনীভূত ছায়া। দৃশ্যের বিভিন্ন অংশ গ্রহণে আলোকের পরিবর্তন (Variation of lights in continuous spots) সব চেয়ে চোখকে পীড়া দেয় তখনই হঠাৎ যখন চোখের সম্মুখে ভূমিকম্প বিঘাতের মত ছবির দৃশ্যপট কাঁপিয়া ওঠে (Shaking of the camera in taking trolly shots)। তারপরে কথা (Sound) আজও কথা বলিতে বলিতে দূর হইতে আগাইয়া আসার কথা গ্রহণ করিতে হইলে Recordist কে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়। আজও স্বাভাবিক মানুষের বিকৃত আওয়াজই আমরা মাইকের সাহায্যে শুনিতে পাইতেছি। একখানি কাগজ নড়িলে বা ছোট একটি বস্তু হাত হইতে পড়িয়া গেলে তার শব্দ যতটা হওয়া উচিত নয় তার চতুর্গুণ, বা ততোধিক। নয়তো একেবারে একটুখানি ক্ষীণ আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়।

দৃশ্যপট পরিকল্পনা নৈপুণ্য বোম্বাইর ছবিতে কতকটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ছবিগুলি দেখিয়া এ সম্বন্ধে ইহার দীনতাই চোখে পড়ে। দৃশ্যের প্রচ্ছদপটে অংকিত কোন বাড়ী, গ্রামের দৃশ্য, গাছপালা যখন Camera Lencer মধ্যে আসে বুঝিতে একটু বেগ পাইতে হয়না যে, পর্দার গায়ের শিল্পীর নিপুণ হস্তের নিস্ফল প্রয়াস। কিন্তু সব চেয়ে বিষদৃশ অনুমিত হয়' যখন কোন মোগল যুগের ছবির দৃশ্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ভাস্কর্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

তারপরে অভিনয়—ভারতীয় চিত্র জগতে অভিনয়ের দৈন্য খুবই অধিক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিনেতা বর্তমান শিল্পকে সমৃদ্ধ করিয়া আছেন। ফলে সব চিত্রের মধ্যেই আমরা ইহাদের একই রূপে দেখিতে পাই। আজকাল অনেকেই পরিচালককে পরামর্শ দিতেছেন নতুন অভিনেতার আমদানী করিতে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে পরিচালকের সপক্ষে এক্ষেত্রে একটা

(শেষাংশ ৫৮পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঁদিকে : রূপাঞ্জলি পিকচার্সের 'অলকানন্দা' চিত্রে সুপ্রভা মুখার্জি। ডানদিকে উপরে : খ্যাতনামা অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, পূরবী চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন। ডানদিকে নীচে : রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের 'সাহারায়' সাধন সরকার।

এম, পি, প্রডাকসন্সের 'অনির্বাণ' চিত্রে জহর, কানন দেবী, ছায়া দেবী ও ছবি বিশ্বাসকে কয়েকটী দৃশ্যে দেখুন।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক

মনোরঞ্জন বড়াল

★

প্রতিদিন কল্‌কাতাতে পাঁচ সাতটা রঙ্গমঞ্চে দু'তিনবার করে অভিনয় ত হয়েই থাকে—সারা বাংলাদেশে ছোট বড় সহরে কিংবা গ্রামেও রোজ গড়ে হয়ত কয়েক শ অভিনয় হয়ে থাকে। মফঃস্বলে অভিনীত এই সব নাটক মোটামুটি ভাবে কল্‌কাতাতে অভিনীত নাটকেরই অনুকরণ। অনেক সময় অভিনয়ের ধরণ পর্যন্ত। এথেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সারা বাংলা দেশে নাটক অভিনয় মারফৎ আনন্দ পরিবেশন, অভিনয় জগতের সাংস্কৃতিক উন্নতি কল্‌কাতায় অভিনীত নাটকগুলির মাপকাঠীতেই বিচার করা যায়।

রঙ্গমঞ্চগুলি আজকাল আর সেদিনের মত বিলাসপ্রিয় ধনী ও নট নটীর অসংযত জীবনের আড্ডাখানা বলে নিন্দিত নয়—বরং রঙ্গমঞ্চের মারফৎ আজকাল দেশবাসী দাবী করে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের একটা প্রশস্ত দিক।

প্রথম দিকে রঙ্গমঞ্চের সাফল্য এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পৌরাণিক কাহিনীর নাট্য-রূপ। গিরীশচন্দ্রের সময়কার এবং তৎপূর্বে অভিনীত নাটকগুলি পৌরাণিক কাহিনীতেই বোঝাই—ধর্মানুসরণের মহাফল, ঈশ্বর ভক্তির পুরস্কার, অহিংসার যাদুমন্ত্র প্রভৃতির পটভূমিকায় রাজরাজাদের অলৌকিক জীবনালেখ্য। অবশ্য গিরীশচন্দ্রের সময় কয়েকখানি সামাজিক নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে, স্বয়ং গিরীশচন্দ্রই কয়েকখানার লেখক ছিলেন। তবে অদৃষ্টবাদ, সত্যের জয় প্রভৃতি অতিরিন্দ্রিয় আদর্শবাদিতা তৎকালীন নাটকের চরিত্রগুলিকেও ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু এ সকল নাটক তখন আসর জমাতে পারেনি। পৌরাণিক কাহিনীযুক্ত নাটকগুলিই 'হৈ হৈ রৈ রৈ' কাণ্ডের সহিত অভিনীত হ'য়েছে। শিশির ভাদুড়ী মহাশয় আমেরিকাতেও সীতা নাটক অভিনয় করে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের সাথে সাথে ঐতিহাসিক চরিত্র যুক্ত কিছু কিছু নাটকের অভিনয় সুরু হল এবং অভিনয় মোটামুটি জনপ্রিয়তাও অর্জন করল। আলমগীর, সাজাহান প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে—অবশ্য ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিকতা কতখানি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রচুর। ঐতিহাসিক নাটকেও রাজরাজা প্রতাপশালী মন্ত্রী সেনা-পতিদের কাহিনী প্রধান এবং অলৌকিকতাও এ সকল নাটক থেকে একদম বাদ যায়নি। বিদেশী ঐতিহাসিক নাটকও এদেশে সাফল্যমণ্ডিত ভাবে অভিনীত হয়েছে—যেমন মিসরকুমারী। এই সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের কতকগুলির অভিনয় দর্শকচিত্তে বেশ দীর্ঘস্থায়ী আসন অধিকার করেছে। আজকালও বিশেষ অভিনয় রজনীতে ঐ সকল নামকরা নাটকের অভিনয় হলে প্রচুর দর্শকের ভিড় হয়। অবশ্য তাই বলে ঐ সব সাফল্য-মণ্ডিত নাটকগুলিও গলদশূন্য নয়।

ক্রমে ক্রমে সুরু হল সামাজিক চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা। পূর্বেই বলেছি, সামাজিক চরিত্র নিয়ে আগেও কয়েকখানা নাটক লেখা হয়েছিল তবে তেমন সাফল্যলাভ করেনি; এমন কি নীলদর্পণের মত বিখ্যাত নাটকও আসর জমাতে পারেনি। ঐ সকল নাটকের আংগিক দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে এবং ছিলও কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত না হবার প্রধান কারণ ঐ আংগিক দোষত্রুটি নয়, আসল কারণ রঙ্গমঞ্চের সক্রিয় প্রগতিশীলতার অভাব। গতানুগতিকতার আশ্রয় নিয়ে, সাংস্কৃতিক কর্তব্যবোধ ভুলে গড্ডালিকা প্রবাহে চল্‌তে গিয়ে মঞ্চ-জগৎ কোন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরী করতে পারেনি। ধনি জমিদার ও বড়লোকদের শোভন অশোভন আনন্দদানের পর্যায় অতিক্রম করলেও মঞ্চগুলি আজ একটা অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

দৈনিক আমোদ-প্রমোদের বিজ্ঞাপন দেখলেই সহজেই বোঝা যায় কি ধরণের নাটক আজকাল মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও সামাজিক নাটকাভিনয় বেশ খানিকটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ঐসব সামাজিক নাটকে সমাজের আসল রূপ কতটা ফুটত তা আলোচনা সাপেক্ষ। এই সকল সামাজিক নাটক রঙ্গমঞ্চে স্থান
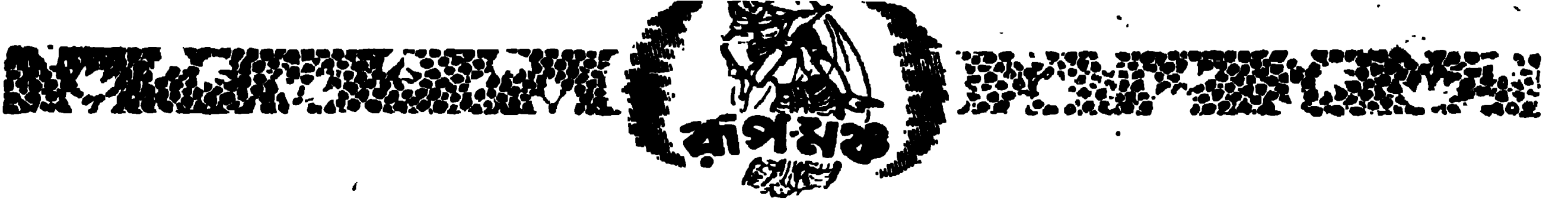
পাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল, বাংলা সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি। গল্প, উপন্যাস, নাটকে প্রাচীন অতিরিন্দ্রিয়বাদ অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা হল। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের অনবদ্য গল্প, উপন্যাস সমাজকে সাহিত্যের মধ্যে অনেকখানি টেনে আনল। দর্শক কিংবা শ্রোতারাও আর প্রাচীন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজরাজাদের কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাক্‌তে চাইল না। আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন সমাজ চেতনাযুক্ত একদল শিল্পীও তৈরী হয়ে উঠ্‌ল। সব কিছু মিলে রঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটকের বেশ খানিকটা কদর বেড়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু সামাজিক নাটকের যতখানি স্থান যুগানুপাতে পাওয়া উচিত ছিল ততখানি স্থান সামাজিক নাটক পায়নি। তাই যদিও পৌরাণিক নাটকের প্রতি তত মমতা নেই তবু আজকাল রঙ্গমঞ্চ জুড়ে রয়েছে। 'ঐতিহাসিক' নাটকের সাফল্য, সামাজিক নাটকের এই ব্যর্থতার কারণ—সামাজিক নাটক আখ্যাধারী নাটকগুলিতে সত্যিকার সমাজ চিত্রণের অভাব। সামাজিক নাটক অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে দর্শক সমাজ গিয়ে দেখেন—সমাজের নাম দিয়ে অসম্ভব ঘটনাবলীকেই চালান হচ্ছে। সামাজিক সুখ দুঃখের আসল রূপ সেখানে নেই; ক্রমে ক্রমে দর্শক সমাজের ভিড় কমে গেল। যৌনবিলাসের আধিক্য, স্বপ্নপুরীর সাজগোজ, নায়ক নায়িকার ক্লীব ন্যাকামি, আজগুবি কাহিনী এই সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ী করে সামাজিক নাটকের লেবেল দিয়ে দর্শক সমাজকে আর ফাঁকি দিতে পারা গেল না।

ঐতিহাসিক নামের নাটকগুলি আজকাল যে খানিকটা আসর জমিয়ে বসেছে তার অনেক কারণ আছে। ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য বীর বা ঘটনার প্রতি লোকের স্বাভাবিক গৌরববোধ একটী প্রধান কারণ। দর্শক চিত্তের এই অনুভূতির সুযোগ নিয়ে ঐতিহাসিক বহু নাটক অভিনীত হচ্ছে যার মধ্যে সত্যিকারের ইতিহাসের অপমানই করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে এমন যা কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে যা শুনে ন্যূনতম ইতিহাস-জ্ঞান সম্পন্ন লোকও দুঃখ করেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের 'ইতিহাস' যতটুকু রূপ না পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আজকালকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে গালভরা বড় বড় বুলি দেখতে পেয়েছি। বিংশ শতাব্দী ধরণের প্রেমের কাহিনী আর আধুনিক গানে সিরাজদ্দৌল্লা নাটককে জর্জরিত করা হয়েছে। পরাধীন ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী এখনও সত্যিকারের স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী হয়নি। পরাজয় মনোবৃত্তির আসল রূপটাকে বাহ্যিকভাবে অলঙ্কৃত করার জন্য অতীত গৌরবের জিগীর টানার একটা প্রকৃতি আছে—এই প্রকৃতির উপরই ভিত্তি করে ঘুরে ফিরে রঙ্গমঞ্চে মৌরসী পাট্টা গেড়েছে প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, কেদার রায়, শাহজাহান, আলমগীর প্রভৃতি 'ঐতিহাসিক' নাটকগুলি। দর্শক সাধারণ যা চাইছে তার সত্যিকারের কোন রূপ নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষ দিতে পারছেন না, তাই মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক নাটকে আধুনিক সমস্যা ও ঘটনা গুজে দেওয়া হয়।

সাহিত্যে স্বার্থক উপন্যাসের যে সমাদর রয়েছে তার উপর ভরসা রেখে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে আর একটা ব্যাধির মত হয়েছে। শরৎচন্দ্র প্রভৃতির উপন্যাসগুলি যার যেরূপ খুসী নাট্যরূপ দিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। এর ফলে রঙ্গমঞ্চে চাহিদানুপাতে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার অর্থনৈতিক দিকটার প্রতি দৃষ্টি রেখে উপন্যাসগুলির ব্যর্থ নাট্যরূপ দিচ্ছেন।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া, বর্তমানে নানা রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণ বিশেষ প্রভাবান্বিত। রঙ্গমঞ্চের মালিকেরাও এ সুযোগ নিতে ছাড়েননি। কাহিনী যাই হোক না কেন, অভিনয়ে তার কোন স্বার্থকতা থাক্ বা না থাক—জাতীয় আন্দোলন বিশেষ স্মরণীয় দিন ২৬শে জানুয়ারীকে সস্তা প্যাঁচ দিয়ে '২৬শে জানুয়ারী' নামক নাটক রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যশাখা দুর্বল—রংগমঞ্চ ও অভিনয় কলার যথোচিত উন্নতির অভাব এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। নাট্যকলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে যদি নাট্য-আন্দোলন গড়ে ওঠে তবে নাট্যজগতের এই একঘেয়েমি ভরা গড্ডালিকা প্রবাহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত বাস্তব ঘটনাবলী নিয়ে রচিত নাটকের এবং অভিনয়ের নিশ্চয়ই সময় এসেছে। এইসব নাটক অভিনয়ের জন্য নূতন দৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পন্ন নাট্যসম্প্রদায় গড়ে তোলা একান্ত দরকার। ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক অভিনীত 'নবান্ন' নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার নাট্যামোদীরা অপূর্বভাবে এই নতুন ধরণের নাটক ও অভিনয়কে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে দিল।

শ্রীরঙ্গমে অভিনীত 'দুঃখীর ইমানকে'ও এই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের ঐতিহ্যবাদী এই নাটক গণনাট্য সংঘও সাহস করে মঞ্চস্থ করার প্রয়াস পায় নি; অবশ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নানান বাধাও ছিল। শিশিরবাবু তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা দিয়ে 'দুঃখীর ইমানে'র ইমান সফলতার সহিত রক্ষা করেছেন। এর জন্য দর্শকসাধারণের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠভাবে তাঁকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংগে সংগে নূতন ধরণের নাটক লেখার প্রচেষ্টার জন্য সু-অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী মশায়ও অভিনন্দনের পাত্র।

নীলদর্পণের অভিনয় নিয়ে টানা হেঁচড়া কম হয় নি। একবার গণনাট্য সংঘ নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করছিল তা জানি। কিন্তু পরে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। কিছুদিন পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম একটি অ্যামেচার পার্টি নীলদর্পণ অভিনয় করবেন বলে। ইদানীং নতুন করে গণনাট্য সংঘ নীলদর্পণে হাত দিচ্ছেন শুনলাম। কিন্তু কারা করবেন সেটা তেমন বড় কথা নয়—আমরা চাই নীলদর্পণ সুষ্ঠু ভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রেখে অনতিবিলম্বে অভিনীত হোক। নীলদর্পণের যা ঐতিহাসিক মূল্য তার অধুনিক. সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠছে। এ সময়ে 'নীলদর্পণের' স্বার্থক রূপ রঙ্গালায়ে ফুটে উঠে এই আন্দোলনকে উত্তরোত্তর সাহায্য করে চির নিপীড়িত কৃষকদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করতে এক শক্ত হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। আর নীলদর্পণ, নবান্ন কিংবা 'দুঃখীর ইমানে'ই বা সংস্কৃতিগর্বী বাঙালী থামবে কেন?

আধুনিক ছায়াছবি ও তার দর্শক

শ্রীউৎপল রায়

★

বর্তমান যুগে সিনেমা ও থিয়েটার আমাদের সামাজিক জীবনের সংগে অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে। এখন আমারা সিনেমা ও থিয়েটার না দেখে যেন পারিনা। সেজন্য সিনেমা ও থিয়েটারের প্রভাব কতকটা আমাদের উপর আপনি থেকেই এসে পড়েছে এবং সংগে সংগে এদের দায়িত্বও অনেকটা বেড়ে গেছে। কিন্তু থিয়েটারের চেয়ে সিনেমার দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ, নিয়মিত মঞ্চাভিনয় মাত্র কলকাতাতেই হয়ে থাকে। অথচ সিনেমার প্রসার প্রায় সর্বত্রই। চিত্রশিল্পের প্রসাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজকাল অনেকগুলি নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা চিত্র-প্রযোজনা ও তাঁদের নিজস্ব চিত্রগৃহে চিত্র পরিবেশনা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। অনেকের আবার নিজস্ব ষ্টুডিও নির্মাণ করবার পরিকল্পনাও ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে ক'জন টিকে থাকবেন তা বলা কঠিন। কারণ, এই কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকে হাত পা গুটিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁদের কাজের তুলনায় বেশী বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছেন।

আধুনিক যুগে সিনেমার সাহায্যে কোন কিছুর প্রচার করা যত সহজ ও সুবিধাজনক, বেতার ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দ্বারাই তা সম্ভব নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সিনেমা এতদিন ধরে আমাদের কি দিয়ে এসেছে? কোন নতুন কিছু দিয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। সেই নায়ক নায়িকার নিরর্থক ন্যাকা প্রেমালাপ, ফুলের বাগানে অথবা বাড়ীর ড্রইং রুমে ঘুরে ফিরে গান গেয়ে বেড়ানো (কিবা আনন্দে আর কিবা দুঃখে, যেন স্থির হয়ে গান গাওয়া যায় না)। জোর করে হাসানো, জাতীয়তাবাদের দু' একটা ফাঁকা বুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই মধ্য থেকে দু' একটি ছবি যদি কিছুটা উৎরিয়ে গিয়ে থাকে। এদের মধ্যে হয়ত কিছুটা ভাল থাকতে পারে কিন্তু তার পরিমাণ এতই কম যে, সেটা যা' ভাল নয় এমন কিছু অথবা একঘেঁয়েমীর তলায় চাপা পড়ে গেছে। এইসব নতুন প্রযোজকেরাও যে সেই গতানুগতিকতার পথ বেয়ে চলতে থাকবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা ব্যবসায় হিসাবেই এদিকে পা বাড়িয়েছেন। যুদ্ধের বাজারে অনেকেই অনেক উপায়ে টাকা রোজগার করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর যুগে সেই সব টাকা চিত্র ব্যবসায়ে খাটিয়ে লাভ করতে চান। এখন এই দু'তিন বছরের মধ্যে যাঁদের ছবি বাজারে বেরুবে তাঁরা লাভও যে করবেন তা' নিশ্চিত (অন্ততঃ লোকসান্ হবে না) সে ছবি ভাল বা মন্দ যা'ই হোক্ না কেন। কারণ যুদ্ধের দরুণ অর্থস্ফীতি কমে গেলেও সম্পূর্ণ কমেনি।

দর্শকদের ছবির ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীনতা এর প্রধান কারণ। দর্শকদের একটা বড় অংশ নিছক সময় কাটানো অথবা ক্ষণিক আনন্দের (?) (চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তিলাভ) জন্য সিনেমা দেখেন। কতকগুলো গান শুনে, কোনো ছবিতে নাচ দেখে এবং তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের মুখ ও বিশেষ অংগ ভংগী দেখে তৃপ্ত হ'ন। কারো ছবির কোনো অংশটী বিশেষ ভাবে ভাল লাগে এবং তিনি সেই অংশটী দেখবার জন্য একাধিকবার ছবিটী দেখেন। এমনি নানাকারণে বুকিং অফিসে ভিড় বেশ জমেই উঠে। সুতরাং প্রযোজকদের ও সিনেমাগৃহ মালিকদের অর্থাগমে বিশেষ বাধা থাকে না। দর্শকরা নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীন তাই প্রযোজক ও চিত্রগৃহের মালিকরা তাঁদের সম্বন্ধে তত দায়িত্ব বোধ করেন না। চিরাচরিত ব্যবহার। কোন ত্রুটি নেই, এক ভাবেই চলে আসছে। নতুন ছবিতেও যেমন সেই পুরানো ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে, নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণেও তাই দেখা গিয়েছে।

সেই ঘেঁসাঘেঁসি বসবার আসন, চলবার অপরিসর রাস্তা। কিসে পয়সা বেশী আসবে, তা'তে দর্শকদের সুবিধা বা অসুবিধা যাই হোক্ না কেন। শুন্‌ছিলাম বছরের মধ্যেই নাকি আরো কয়েকটী নতুন সিনেমা গৃহ তৈরী হবে। কয়েকটীর জন্য বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে।

আমার মনে হয় এসব বিষয়ে দর্শকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, কোন বিষয় নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন না করলে তা সার্থক হতে পারে না। যদিও 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' স্থাপিত হয়েছে তবুও তাঁদের চেষ্টা যে সফল হয়েছে মানে তাঁরা যে বাংলা ছবির মান উন্নত করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা শুনতে পাই যে, বাংলা ছবির মান ভারতীয় অন্যান্য ছবির চেয়ে উন্নত। কিন্তু এ যেন সেই দুই কানে কালার চেয়ে এক কানে কালার শ্রবণশক্তি বেশী এই ভাবের কতকটা। এক কানে কালাকে যেমন পূর্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন বলা যায় না তেমন হিন্দি ছবির চেয়ে উন্নত হলেই বাংলা ছবি সর্বাংগ সুন্দর হতে পারে না। এখানে কালার উপমা দিলাম এইজন্য যে, চিত্র নির্মাতারা আমাদের মত লোকের কথায় কান দিতে চান না। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে যে কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোক প্রযোজকদের ভেড়াতে পারেন তাঁরাই ছবির পরিচালনা বা অন্য কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে থাকেন। এজন্য কোন Preliminary শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা থাকুক বা নাই থাকুক। যিনি জীবনে হয়ত কোনদিন গল্প লেখেন নি, ষ্টুডিওর দরজায় বার কয়েক উঁকি ঝুকি মেরেছেন হঠাৎ একদিন ছবির পর্দায় দেখা গেল কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা 'অমুক'। আবার কেউ যদি বরাতগুণে কোন একটী ছবিতে নাম করে ফেলেন তবে তাঁকে আর পায় কে? বাড়ীতে বসেই মোটা টাকার কমে কাজ করবেন না বলে ঘোষণা করে থাকেন এবং প্রযোজকেরা নামের গুণে ছবির কাটতি হবে ভেবে তাতেই রাজী হয়ে যান। আমাদের দেশে খুব কম প্রযোজকদেরই চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা ও শিল্পদৃষ্টি আছে সুতরাং তাঁরা পরের মুখে ঝাল খান।

বাংলা ছবি যদি দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যায় তবে এই বৎসরের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির আলোচনা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—সামাজিক ছবি হিসাবে 'শান্তি', 'এই তো জীবন', 'নিবেদিতা', 'মাতৃহারা', ও 'বিরাজ-বৌ' ধরা যেতে পারে। কিন্তু একটী ছবিতেও কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান অথবা কোন নতুন পথ বা চিন্তাধারার সংগে আমাদের পরিচয় হয় নি। ছবিগুলি জগাখিচুড়ী ও 'মাতৃহারা' ছবিটী বিশেষ কুরুচিপূর্ণ। '৭নং বাড়ী' ও 'তুমি আর আমি'তে কাহিনীর দিক নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তার মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। 'নতুন-বৌ' 'বন্দে মাতরম' ও 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'তে দেশের সমস্যার সম্বন্ধে ফাঁকা ফাঁকা কয়েকটী কথা ও দৃশ্য দেখতে পেয়েছি। একটী ছবিও সার্থক ও আবেদন মূলক হয় নি। বন্দেমাতরম্ ছবিটী তো বিশেষ খারাপ। কারণ, এতে অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতীয়তা-বাদকে exploit করা হয়েছে। 'নতুন-বৌ'তে যে কি দেখাবেন পরিচালক তা' ঠিক করতে না পেরে সব কিছুই দেখাতে গিয়ে তাল ঠিক রাখতে পারেন নি। 'পথের সাথী' একটী সাধারণ গল্প, কিন্তু পরিচালক এর মধ্যেও দেশের সমস্যা ঢুকিয়ে দেশহিতৈষী মনের পরিচয় দিতে গিয়ে একুল ওকুল দু'কূলই নষ্ট করে ফেলেছেন। 'মন্দির' ও 'প্রতিমা' এক একটী ছেলেমানুষী বল্লেই হয়। 'পরভৃতিকা' ও 'তপোভঙ্গ'র কথা বাহুল্য। 'পথের দাবী' ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

আজকাল আবার এক ঢং হয়েছে যে, ছবির নায়ককে দেশকর্মী হিসাবে দেখান চাই, যদিও ছবিতে তাঁর সেরকম কিছু কাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটী অসংলগ্ন কথা, হয়ত একটী গান, তা'তেই সব শেষ হয়ে গেল। কি সহর, কি পাড়াগাঁ, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই under-wear পরে বেড়াচ্ছে।

নেহাৎ খুব গরীব না হলে মেয়েরা সর্বদাই জর্জেট ও সিল্কে ভূষিত হয়ে রয়েছেন। জহর গাঙ্গুলীকে যে আর কলেজের ছাত্র হিসাবে মানায় না তা যে কোন লোকই স্বীকার করবেন। অথচ এই বছরেই তিনটী ছবিতে ছাত্রের ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পেয়েছি। এই রকম তুচ্ছ অথচ উপেক্ষনীয় নয় এরকম বহু ত্রুটি আজকালকার ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একখানি ছবিও সর্বাংগ সুন্দর হয় নি বা আগের ছবির চেয়ে উন্নত হয় নি। সেই এক ভাবের পুনরাবৃত্তি চল্‌ছে। অথচ ছবি দেখতে লোকের ভিড়ের কমতি নেই।

১৩৫২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'গৃহলক্ষ্মী'র সমালোলোচনার শেষে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র 'রূপ-মঞ্চে' বলা হয়েছিল, "বাঙালী দর্শক দিন দিন যে সুরুচি সম্পন্ন হয়ে উঠছেন। এই চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত হয়ে আশা করি কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট উত্তর দেবেন। চিত্রখানি দেখে আমরা যে প্রবঞ্চিত হয়েছি······চিত্রখানি সম্পর্কে সেই কথাই বলে দর্শক সাধারণকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই।' তা' সত্বেও ছবিখানি ২৫ সপ্তাহ অতিক্রম করে গিয়েছিল। সুতরাং দর্শকদের রুচি যে উন্নত হয়নি তা বললে বোধহয় মিথ্যা বলা হবে না। পেটুকরা যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার না করেই খেয়ে যান, বেশীর ভাগ দর্শকরাও তেমনি ছবির ভালমন্দ বিচার না করেই ছবি বারবার দেখতে যান। ছবিতে শিল্পীদের জনপ্রিয়তাকে এই উদ্দেশ্যেই exploit করা হয়ে থাকে।

আমরা দর্শকরা যদি সংঘবদ্ধ ভাবে ভালমন্দ বিচার করে ছবি দেখি, তা'হলে প্রযোজক ও পরিচালকরা আমাদের এতটা ফাঁকি দিতে পারবেন না। ফাঁকি কথাটা ব্যবহার করলাম এইজন্য যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলা দেশের লোকেদের অনেক পয়সা ও সময় ছবি দেখতে নষ্ট হয়। ছবি যদি ভাল না হল, কোন নতুন আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরতে না পারল, মনকে সুরুচি সংগত আনন্দ দান করে উন্নত করে তুলতে সাহায্য না করল তবে সে ছবির জন্য যে সময় ও পয়সা খরচ করা করা হয়েছে তা' নষ্ট হয়েছে বলেই মনে করতে হবে।

সিনেমা হলের ভেতরের আবহাওয়া পরিষ্কার রাখা অনেকটা আমাদের হাতে। কত কিছুর খোসা, কাগজ বা অন্য কিছু ফেলা আমরা ইচ্ছে করলেই বন্ধ করতে পারি। প্রেক্ষাগৃহে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। এর উপর ধূমপান করে সেটাকে আরও ভারাক্রান্ত না করাই কি উচিত নয়? জনস্বাস্থ্য ও স্বার্থের খাতিরে ধূমপায়ীরা এটুকু কষ্ট করে দেখতে পারেন। ছবি দেখতে কথা বলা, গানের সংগে জুতার শব্দ বা তুড়ি দিয়ে তাল দেওয়া, চীৎকার করে হাসা, উচ্ছ্বসিত ভাবে হাততালি দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। এতে ছবির রসগ্রহণে বাধা উপস্থিত হয়।

আজকাল গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকিট কেনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি বলি যে, সিনেমা দেখাটা চাল, তেলের মত জীবনের অপরিহার্য বস্তু নয় যে বেশী অন্যায় দাম দিয়েও তা' দেখতে হবে। এ বিষয়ে দর্শকরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তবে গুণ্ডারা আপনিই ভেগে পড়বে।

আমার চোখে আজকালকার ছায়াছবি ও তার দর্শকদের যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি পড়েছে—তারই কয়েকটী আপনাদের জানালাম। এসব বিষয় ভেবে দেখবার ও বিচার করবার সময় এসেছে। —জয়হিন্দ

বাংলা সবাক ছায়াছবির প্রথম প্রকাশ

(৫)

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

●

১৯৪২ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল

১৯৬। **অপরাধ** * * মুভী টেকনিক সোসাইটী। প্রথম আরম্ভ—১১-৪-৪২ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীমণীন্দ্রকুমার দত্ত : পরিচালনা শ্রীফণী মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশ বসু : ভূমিকায়—রতীন, ধ্রুব, ইন্দু, শঙ্কর, মণিকা, রেবা, মায়া।

১৯৭। **অভয়ের বিয়ে** * * ডি লুক্স পিকচার্স'। প্রথম আরম্ভ—৩ ৪-৪২ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূরবী ও পূর্ণ : কাহিনী—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীসুশীল মজুমদার : সুর—কুমার শচীন দেববর্মণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, ছবি, কানু, জিতেন, ছায়া, রেখা, মায়া।

১৯৮। **অশোক** * * মডার্ণ টকীজ। প্রথম আরম্ভ—৩১-১০-৪২ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : আলোক-শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীশচীন দেববর্মণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, নরেশ, ইন্দু, প্রমোদ, রবীন, উৎপল, মলিনা, পদ্মা, পূর্ণিমা, শুক্তিধারা।

১৯৯। **গরমিল** * * * চিত্রবাণী। প্রথম আরম্ভ—২২-৫-৪২ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : সংলাপ—শ্রীযোগেশ চৌধুরী, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীনীরেন লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : ভূমিকায়—ছবি, যোগেশ, রতীন, রবীন, জহর, কানু, শ্রীলেখা, শীলা হালদার।

২০০। **জীবন সঙ্গিনী** * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স। প্রথম আরম্ভ—১৫-৮-৪২ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ চার্লস ক্রীড : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, রতীন, পান্না, প্রতিমা, পদ্মা।

২০১। **নারী** * * * নিউ টকীজ। প্রথম আরম্ভ—২-৫-৪২ : চিত্রগৃহ—মিনার : কাহিনী—শ্রীজ্যোতি সেন : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীপ্রফুল্ল রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীন মজুমদার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল : ভূমিকায়—ছবি, মিহির, শ্যাম, কৃষ্ণচন্দ্র, ইন্দু, জহর, শ্রীলেখা, পদ্মা, সাবিত্রী, মণিকা।

২০১। **পাষাণ দেবতা** * এস, ডি, প্রোডাকসন্স। প্রথম আরম্ভ—৩০-১ ৪২ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী : কাহিনী - শ্রী শ্রীকান্ত সেন : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীঅনুপম ঘটক : ভূমিকায়—জহর, ধীরাজ, ইন্দু, যোগেশ, রবীন, কানু, শ্রীলেখা, অরুণা, মণিকা।

২০৩। **পতিব্রতা** * * অরোরা ফিল্ম। প্রথম আরম্ভ—১৯-১২-৪২ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী, বিজলী : কাহিনী—কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীজগদীশ চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীশম্ভু সিং : সংগীত—শ্রীরঞ্জিৎ রায় : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, ছবি, রবি, ইন্দু, নীতীশ, মিহির, অঞ্জলি, চিত্রা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, বেলারাণী।

২০৪। **পরিণীতা** * * পি, আর, প্রোডাকসন্স। প্রথম আরম্ভ—X-১২-৪২ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু : সংগীত—শ্রীরবীন

চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—ছবি, প্রমোদ, জীবেন, নৃপতি, কালী, প্রভা, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা, রেবা, মীরা, মায়া।

২০৫। **বন্দী** * * চিত্ররূপা।
প্রথম আরম্ভ—১১-১২-৪১ : চিত্রগৃহ—মিনার, ছবিঘর : পরিচালনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীগিরীণ চক্রবর্তী : ভূমিকায়—ছবি, জহর, ফণি, ইন্দু, পশুপতি, নরেশ, রবি, বিপিন, সন্ধ্যা, শান্তি।

২০৭। **ভীষ্ম** * * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—৩-১-৪২ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : পরিচালনা, কাহিনী—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—মিঃ এ, হামিদ : শব্দ যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীদুর্গা সেন : ভূমিকায়—জহর, সন্তোষ, অমল, সুশীল, জয়নারায়ণ, বিজয়কার্তিক, সত্য, চন্দ্রাবতী, শিশুবালা, রেখা।

২০৮। **মীনাক্ষী** * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১২-৬-৪২ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবাণী দত্ত : সংগীত—পঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, জ্যোতিপ্রকাশ, প্রীতি, কৃষ্ণচন্দ্র, সধনা, দেববালা সন্ধ্যা, রেনুকা।

২০৮। **মহাকবি কালিদাস** * মতিমহল থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২১-৩-৪২ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : পরিচালনা—শ্রীনীরেন লাহিড়ী : আলোক শিল্পী—প্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ সি, এস, নিগম : ভূমিকায়—নৃপেন্দ্র, ছবি, বিপিন, ইন্দু, জীবেন, সত্য, কানু, নৃপতি, মেনকা, পদ্মা, সুপ্রভা।

২০৯। **মিলন** * * * ইন্দ্রপুরী
প্রথম আরম্ভ—১৬-১০-৪২ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—কুমার শচীনদেব বর্মণ : ভূমিকায়—যোগেশ, রতীন, ছবি, ধীরাজ, জহর, চিত্রা, রেণুকা, অরুণা, শীলা, নমিতা।

২১০। **শেষ উত্তর** * * এম, পি, প্রোডাকসন্স
প্রথম আরম্ভ—২৫-৭-৪২ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূরবী, পূর্ণ : কহিনী—শ্রীশশধর দত্ত : প্রযোজক, পরিচালক ও আলোক শিল্পী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, বড়ুয়া, রতীন, যোগেশ, কানন, যমুনা, কৃষ্ণা, দেববালা।

২১১। **শোধবোধ** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২৮-৩-৪২ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীসৌম্যেন মুখোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীসুধীন মজুমদার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীঅনাদি দস্তিদার : ভূমিকায়—ভানু, রতীন, শৈলেন, ছবি, ইন্দু, শ্রীলেখা, মলিনা সুপ্রভা, রেবা, শীলা।

১৯৪৩ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল :

২১২। **অভিসার** * * * নিউ টকীজ
প্রথম আরম্ভ—২৬-২-৪৩ : চিত্র গৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীহেমন্ত গুপ্ত : আলোক শিল্পী—শ্রীশচীন দাশগুপ্ত : শ্রীদিবেন্দু ঘোষ : শব্দযন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া, শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, জীবন, জীবেন, ইন্দু, ফণী, অর্ধেন্দু, পদ্মা, জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী।

২১৩। **কাশীনাথ** * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২-২-৪৩ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য, পরিচালনা, আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতীন বসু : শব্দ যন্ত্রী শ্রীমুকুল বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—অসিত, অমর, শৈলেন, উৎপল দিলীপ, সুনন্দা, ভারতী, লতিকা, রাধারাণী।

২১৪। **জজ সাহেবের নাতনী** * রজনী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৪-৮-৪৩ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূর্ণ : সংলাপ চিত্রনাট্য, পরিচালনা—শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষ : আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া : সংগীত—শ্রীশচীন দেব বর্মণ : ভূমিকায়—জহর, মনোরঞ্জন, বিভূতি, প্রমোদ, রমলা, পূর্ণিমা, রেবা, সুমিত্রা

২১৫। **জননী** * * কে, বি, পিকচার্স।
প্রথম আরম্ভ—২৫-৩-৪৩: চিত্রগৃহ—রূপবাণী: কাহিনী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীধীরেশ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীধীরেন দে: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত: সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত: ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ভানু, রতীন, ফণী, বেচু, নৃপতি, মলিনা, পদ্মা, জ্যোৎস্না, প্রমীলা, নিভাননী।

২১৬। **দ্বন্দ্ব** * * * আর্ট ফিল্ম।
প্রথম আরম্ভ—৪-৬-৪৩: চিত্রগৃহ—রূপবাণী: কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা—শ্রীহেমেন গুপ্ত: আলোক-শিল্প—শ্রীঅজয় কর: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস: সংগীত—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত: ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, ধীরাজ, জহর, ইন্দু, আশু, অমিতা, স্মৃতি, দেবলালা, কল্পনা, সন্ধ্যা, বেলারাণী।

২১৭। **দাবী** * * নিউ টকীজ।
প্রথম আরম্ভ—১৪-৮-৪৩: চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর: কাহিনী—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র: পরিচালনা—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়: আলোক-শিল্পী—
সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল: ভূমিকায়—ছবি, ধীরাজ, অর্ধেন্দু, ডি-জি, ফণী, জীবেন, পদ্মা, পূর্ণিমা, মণিকা, রাধারাণী।

২১৮। **দিকশূল** * * নিউথিয়েটার্স।
প্রথম আরম্ভ—১২-৬-৪৩: চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর: কাহিনী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী: আলোক-শিল্পী—শ্রীরবি ধর: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ: সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক: ভূমিকায়—ছবি, শৈলেন, হরিমোহন, নরেশ, মিহির, অঞ্জলি, রেণুকা, রাধারাণী, মনোরমা।

২১৯। **দেবর** * * ইন্দ্রপুরী।
প্রথম আরম্ভ—৬-১১-৪৩: চিত্রগৃহ—চিত্রা: কাহিনী—ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীঅমল সেনগুপ্ত: শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী: সংগীত—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত: ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি,

২২০। **দম্পতি** * * রূপশ্রী।
আরম্ভ—১-১০-৪৩: চিত্রগৃহ—শ্রী, আলেয়া, পূরবী, রূপালী: কাহিনী—শ্রীপ্রবোধ সান্যাল: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীনীরেন লাহিড়ী: আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস: সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত: ভূমিকায়—ছবি, জহর, রবীন, শ্যাম, রবি, বেচু, কানু, সুনন্দা, সাবিত্রী, চিত্রা, গীতা।

২২১। **নীলাঙ্গুরীয়** * * ইষ্টার্ণ টকীজ।
প্রথম আরম্ভ—৩০-৭-৪৩: চিত্রগৃহ—রূপবাণী: কাহিনী—শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস: সংগীত—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত: ভূমিকায়—ছবি, জহর, ধীরাজ, ইন্দু, কানু, দেববালা, যমুনা, মলিনা, রেণুকা।

২২২। **প্রিয়বান্ধবী** * * নিউথিয়েটার্স।
প্রথম আরম্ভ—২৩-১-৪৩: চিত্রগৃহ—চিত্রা: কাহিনী—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসৌম্যেন মুখোপাধ্যায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীন মজুমদার: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায়: সংগীত—শ্রীপ্রণব দে: ভূমিকায়—দুর্গাদাস, জহর, শৈলেন, সত্য, শ্যাম, চন্দ্রাবতী, চিত্রা, রাধারাণী, কৃষ্ণা।

২২৩। **পাপের পথে** * ফিল্ম করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া।
প্রথম আরম্ভ—২৪-৯-৪৩: চিত্রগৃহ—রূপবাণী: কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল রায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত, শ্রীবিদ্যাপতি ঘোষ: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু, শ্রীযতীন দত্ত: সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত: ভূমিকায়—জীবন, জ্যোতিপ্রকাশ, জহর, হরেন, ফণী, পদ্মা, সাবিত্রী, অরুণা।

২২৪। **পোষ্যপুত্র** * * ভ্যারাইটী পিকচার্স।
প্রথম আরম্ভ—২৫-১২-৪৩: চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর: কাহিনী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত: আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর: শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস: সংগীত—শ্রীদুর্গা সেন:

ভূমিকায়—শিশির, শৈলেন, প্রমোদ, বিমান, জহর, রেণুকা, সাবিত্রী, প্রভা, চিত্রা, দেববালা।

২২৫। **বিচার** * * শ্রী ফিল্ম।
প্রথম আরম্ভ—৫-১০-৪৩ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতীন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু : সংগীত—শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ভূমিকায়—দিলীপ, রতীন, দেবল, প্রীতি, আগাশী, দেবী, লীলা, রাধারাণী, মায়া।

২২৬। **যোগাযোগ** * * এম, পি, প্রোডাকসন্স।
প্রথম আরম্ভ—১৭-৪-৪৩ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজিত সেন : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী, সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, রবি, রবীন, ভানু, কানু, কানন, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, ইন্দিরা।

২২৭। **শহর থেকে দূরে** * * ইষ্টার্ণ টকীজ।
প্রথম আরম্ভ—২৭-১২-৪৩ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—জহর, ধীরাজ, নরেশ, ফণী, পশুপতি, কানু, আশু, বটু, মলিনা, রেণুকা, প্রভা, রেবা, চিত্রা।

২২৮।* **সহধর্মিণী** * * রূপশ্রী।
প্রথম আরম্ভ—২-৩-৪৩ : চিত্রগৃহ—মিনার, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীযোগেশ চৌধুরী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীনীরেন লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—শৈলেন, ধীরাজ, জহর, মনোরঞ্জন, রবি, কানু, মলিনা, শান্তি, সন্ধ্যা, কৃষ্ণা।

২২৯। **সমাধান** * * এস, ডি, প্রোডাকসন্স।
প্রথম আরম্ভ—৫-৬-৪৩ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—ছবি, রবীন, [illegible], রবি,

অপরাধী

(রহস্য-নাট্য)

অধ্যাপক শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

●

কোন' বড় হোটেলের দরদালান

(দুইজন লোক চুপি চুপি কথা কহিতেছে—)

১ম জন। পিস্তল ?

২য় জন। না।

১ম জন। তবে !

২য় জন। ছোরা।

১ম জন। ক' নম্বর ঘর ?

২য় জন। ২১নং। শোন'—আমি বাইরে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছি। ঘরে দু'জন লোক আছে—। বাঁ-দিকের জানলার দিকে যিনি থাকেন - আমাদের তিনি—

১ম জন। চুপ্ কে যেন এই দিকে আস্‌ছে। লুকিয়ে পড়।

(জুতার খট খট শব্দ শোনা গেল। শব্দ ক্রমে —বিলীন হইয়া গেল)

২য় জন। আর দেরী কর'না। কেউ যদি বাধা দেয় —পিস্তল তার জন্য রেখে দিও। আমি চল্লুম।

১ম জন। আচ্ছা।

(দূরে গির্জায়—রাত্রি ৩টা বাজিল। একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল—পাহারাদার চীৎকার করিয়া উঠিল—আবার নিস্তব্ধ—যেন একটা গোঙানী শোনা গেল—আবার সব নীরব।)

২য় জন। Finished ?

১ম জন। Yes.

২য় জন। আরাকজন ?

১ম জন। ক্লোরোফরম কাজ করেছে—ঘুমে অচেতন।

২য় জন। [illegible] শেষ হলো—টাকা !

(আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল—হোটেলের ম্যানেজার বেয়ারাকে ডাকলেন।)

ম্যানেজার। বেয়ারা, বেয়ারা,

ম্যানেজার। ওরে ২১নং ঘরের ডান দিকের ছিটে বেহালা-বাদক হীরালালবাবু শুয়ে আছেন, ওকে ডেকে দে। উনি ভোর ৪টার গাড়ীতে বাড়ী যাবেন। আর একখানা taxi ডেকে দে, শিয়ালদা ষ্টেশনে নিয়ে যাবে।

বেয়ারা। আচ্ছা হুজুর।

ম্যানেজার। হ্যাঁ দেখিস্ রাজা সাহেব আছেন পাশের ছিটে তাঁর যেন ঘুম ভেংগে না যায়।

হীরালাল। (প্রবেশ) তাঁর ঘুম আর ভাংগবে না।

ম্যানেজার। কে হীরালালবাবু ? কি বল্‌ছেন আপনি ?

হীরালাল। কিছুই বলছি না। আসুন ২১নং ঘরে।

ম্যানেজার। চলুন—

(উহারা একুশ নং ঘরে গেল)

ম্যানেজার। সে কি ? এ যে রক্ত ?

হীরালাল। হ্যাঁ, রাজা সাহেবের রক্ত।

ম্যানেজার। খুন ? কে করলে খুন ?

হীরালাল। হঠাৎ আপনার কথা যেন কানে এল।

ম্যানেজার। কোথায় ? এই ঘরে ? আপনি বল্‌ছেন কি ?

হীরালাল। না বাইরে। ঘড়ীতে দেখ্‌লাম ৩।০ বাজে বুঝ্‌লাম আপনি চাকরকে আমার যাবার কথাই বল্‌ছেন। রাজা সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ব' মনে করে এগিয়ে গেছি—দেখি—রক্ত।

ম্যানেজার। আপনার বেহালার বাক্‌সে রক্ত লেগেছে।

হীরালাল। অ্যাঁ—তাই নাকি ? কই ?

(বেহালার বাক্স' হাত থেকে পড়িয়া খুলিয়া গেল)

ম্যানেজার। এ কি মশাই, আপনার বেহালার বাক্‌সে ছোরা—রক্ত মাখান ছোরা—

হীরালাল। "রক্ত মাখান ছোরা"—কি করে' না, না, ম্যানেজারবাবু। আমিত কিছুই জানি না। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।

ম্যানেজার। একজনকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দিতে [illegible]
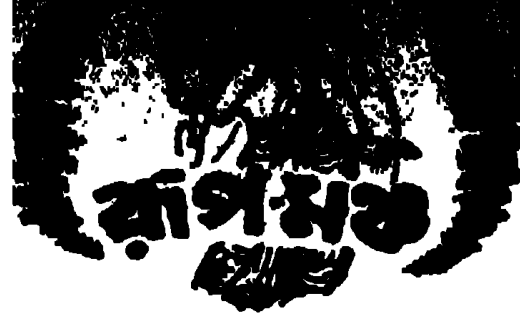
আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। পুলিসকে ফোন করি—তারাই যা হোক করুক।

হীরালাল। কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে। বাড়ীতে আমার স্ত্রী, আর ছোট একটা ছেলে তাদের কেউ নেই দেখবার। আপনাব নিমন্ত্রণেই আমি আপনার হোটেলে এসেছিলাম বাজাতে।

ম্যানেজার। কিন্তু বেহালা বাদক যে বেহালার তলে ছোরা রেখে বাজিয়ে বেড়ান এ ধারণা আমার ত' ছিল না।

হীরালাল। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন।

ম্যানেজার। অবিশ্বাস আপনার কথা আমি কচ্ছি না—তবে পুলিস আসুক তারা যা ভাল বোঝে করুক—এ সব ঝামেলার মধ্যে আমি পড়ি কেন মশাই। আপনারা দু'জনে এক ঘরে রয়েছেন—অথচ রাজা সাহেব খুন হয়ে গেলেন -- আপনি রইলেন বেঁচে। কোন' একটা শব্দ কেউ শুনতে পেল' না।

হীরালাল। আমি সত্যি কিছু শুনতে পাইনি।

ম্যানেজার। কেমন ক'রে শুনতে পাবেন আপনি। আপনি যে তার চেয়েও মহৎ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। শুনতে ত' পেলেন না। এ ছোরা কেমন ক'রে গেল' আপনার বেহালার বাক্‌সে? আমি রেখেছি?

হীরালাল। আপনি কেন রাখবেন? কিন্তু আমি যে রেখেছি তাই ব আপনি কি করে জান্‌লেন? আর রাজা সাহেবকে মেরে আমার লাভ!

ম্যানেজার। অত কথা আমি জানিনে মশাই—আমি পুলিসে খবর দেব। আসুন আপনি আমার ঘরে।

হীরালাল। আমার ট্রেন যে এখনি, বাড়ীতে না গেলে স্ত্রী পুত্র না খেয়ে থাকবে।

ম্যানেজার। পুলিস না এলে আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়তে পারব' না।

হীরালাল। ছাড়বেন না মানে।

ম্যানেজার। ছাড়ব' না মানে—ছাড়ব না। আপনি চুপ করুন। এখন এই পুলিস হাঙ্গামায় মারা যাই আর [illegible] B. B. 2698 Yes, Please. Is it Police [illegible] Inspector [illegible]

একবার। Good morning Sir 7, Middle Street-এর Hotel থেকে বলছি। এক্ষুনি আপনাকে আস্‌তে হবে। Murdercase. হ্যাঁ, খুন। আপনি এলেই সব বুঝ্‌তে পারবেন। হ্যাঁ, দেরী করবেন না।

(ট্রেন ছাড়ার শব্দ শোনা গে'ল)

হীরালাল। ট্রেন ছেড়ে দিল'—ম্যানেজার বাবু—আমার ট্রেন ছেড়ে দিল'।

ম্যানেজার। দিল না কি? হাঃ হাঃ হাঃ—অন্য ট্রেনে যাবেন—হ্যাঁ যাবেন বৈকি—অন্য ট্রেনে যাবেন।

—দৃশ্যান্তর—

(হীরালালের গৃহ—দূরে ট্রেন ছাড়ার শব্দ)

স্ত্রী। ট্রেণ চলে গেল'। কই আসেনিত' এই গাড়ীতে। ভোর বেলা থেকেই মনটা এত খারাপ কেন লাগ্‌ছে। কি সে অদ্ভুত স্বপ্ন—না, না, আমি যে তা মনে করতেই পারি না।

ছেলে। মা—ট্রেন ছেড়ে দিল'—কই বাবা এল' না ত'।

স্ত্রী। হয়তো পরের গাড়ীতে আস্‌বে।

ছেলে। আমার জন্যে কি কি আন্‌বে জান' মা? একটা বল, ভাল ভাল লজেন্স, বিস্কুট—

স্ত্রী। হ্যাঁ, আন্‌বে বৈকি? শুনেছি ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়—না কি? ওঃ সে কত বড় নদী, ও যেন ওপারে, আমি এ পারে। কত বড় বড় ঢেউ। পরের ট্রেনে এসে পড়ে—তাহ'লে ত' বাঁচি।

ছেলে। আচ্ছা মা আমি বড় হলে বাবার মত বেহালা বাজাতে পারব' না? কত লোকে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে।

স্ত্রী। বার বার বলে গেল'—সকালের গাড়ীতে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

ছেলে। ৬ টার গাড়ীতে নিশ্চয়ই আস্‌বে বাবা।

স্ত্রী। এলে ত' হয়।

ছেলে। গাড়ীতে না এসে মোটরেও আস্‌তে পারে।

স্ত্রী। হ্যাঁ তাও পারে। আচ্ছা তুই এখানে খেলা কর [illegible]

(মোটরের হর্ণ শোনা গেল)

ছেলে। মা, ঐ দেখ' একখানা মোটর আমাদের বাড়ীর দিকে আস্‌ছে, নিশ্চয়ই বাবা এসে গেছে। তুমি চা তৈরী কর গে।

(একটি লোকের প্রবেশ)

লোক। এইটে হীরালাল বাবুর বাসা।

ছেলে। হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা। বাবা কই, বাবা আসেনিত।

লোক। হীরালালদা আমাকে তার ছোট ভাই বলেই মনে করেন।

স্ত্রী। আপনি—

লোক। আমি বাগবাজারের সতীশ মুখার্জীর বড় ছেলে।

স্ত্রী। ও—তোমার কথা অনেক শুনেছি ভাই—বসো। কি খবর বলতো? উনি ত' বাড়ী নেই।

লোক। বাড়ী হীরালালদা শীঘ্র আস্‌তে পারবে বলেও ভরসা নেই।

স্ত্রী। তার মানে?

লোক। মানে আর কি বলব বৌদি! তাঁর খুবই বিপদ।

স্ত্রী। কোন' অসুখ বিসুখ করেনিত'?

লোক। না।

স্ত্রী। তবে?

লোক। আমি ত' সব কথা বলতে পারব' না। Telephone পেয়ে আমি তার কাছে যাই। এই চিঠি লিখে দিয়েছেন। Taxi করে আমি চলে এসেছি।

স্ত্রী। দেখি চিঠি।

—চিঠি—

অরুণা,

গতকাল হোটেলে এক খুনের অপরাধে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। খুনের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না—অথচ আমার বেহালার বাকসে রক্তমাখা একখানা ছোরা পাওয়া গেল।—

স্ত্রী। অ্যাঁ, সে কি? খুন? ওগো—না, না, তাত'—

[illegible]

প্রমাণ করতে হবে ত'। হয়তো ২।৩ দিনের মধ্যে হীরালাল দা এসে পড়বে। আপনি অসীমকে নিয়ে খুব সাবধানে থাকবেন। দেখি যদি বেলের কোন ব্যবস্থা করতে পারি।

—দৃশ্যান্তর—

[নিভৃত আড্ডা বাড়ী]

১ম জন। হাঃ হাঃ হাঃ 302 I. P. C. unbailable section একবার ধরা পড়লে আর কি কথা ছিল। তোমার কিন্তু ভাই arrangement ছিল বেশ।

২য় জন। জেকে বসে আছি সেজন্যে। আর সারা জগৎটাই একটা হত্যাশালা। হত্যা করায় কি কোন পাপ থাকতে পারে।

১ম জন। না, না, তাই কি পারে? হত্যা করায় পাপ! হোঃ হোঃ হোঃ আখ' না কেমন ছোরা গুলো—মানুষের বুকের মধ্যে বসিয়ে দেই। তা তুমিও ত' কম যাও না। হোটেলে?

২য় জন। চুপ, ও কথা এখানে নয়। flash-এর আড্ডায় লোক আসছে কেমন?

১ম জন। ভাল।

২য় জন। কার কেমন পকেট খবর নিয়েছ?

১ম জন। বিশেষ কিছু নেই আজ।

২য় জন। তাড়াতাড়ি ভেংগে দাও খেলা।

১ম জন। কোন খেলা?

২য় জন। কোন খেলা? তাসের খেলা! হাঃ হাঃ হাঃ—। এই জীবনটাই একটা তাসের খেলা—flash, flash—

১ম জন। খুব খেয়েছ বুঝি আজ।

২য় জন। দেখ মদ খাওয়া—এ একটা নেশাই না। মানুষ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারলে আমার নেশা জমে না। রক্তের নেশা লেগেছে আমার প্রতিটি শিরায়। খুব ভাল লাগে—খুব ভাল লাগে—হাঃ হাঃ হাঃ।

১ম জন। থাম, থাম,—আড্ডায় যেন গোলমাল শোনা যাচ্ছে—

২য় জন। গোলমাল'—!

(গোলমাল শোনা গেল—হৈ, হৈ শব্দ, চোর চোর

১ম জন। চল আমরা সরে পড়ি—

২য় জন। চল'—হ্যাঁ হে—হীরালালের মামলার রায় বেরুবে কবে?

১ম জন। Court বোধ হয় আগামী কাল verdict দেবে।

২য় জন। Court verdict দেবে, কি verdict দেবে? হয় ফাঁসি না হয় দীপান্তর।

১ম জন। হ্যাঁ, মানুষ খুন করে ধরা পড়লে যা হয়।

২য় জন। হয় ফাঁসি না হয় দীপান্তর—, তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি? যে খুন করেছে সে ধরা পড়েছে। যে ধরা পড়েছে—তার ফাঁসি হবে—না হ'লে হবে দীপান্তর—কি বলো?

১ম জন। তাত' বটেই।

২য় জন। হ্যাঁ, তাত' বটেই, পুলিস Enquiry, Investigation, Court-এর judgement, verdict, কথাগুলো বেশ—না,—হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম জন। পৃথিবীতে সব মানুষগুলোই যেন পঙ্গ পাল'—যাদের একটু বুদ্ধি আছে তারাই, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেংগে ঠিক চলে যায়—। বিচার - absolutely meaningless—Vague, false হাঃ হাঃ হাঃ

—দৃশ্যান্তর—

(Court)

গোলমাল :—"Court verdict দিয়েছে হে—দীপান্তর" "বেহালা বাজিয়ে বেড়াত—শেষে মানুষ খুন" "টাকার জন্যে মানুষে কি না ক'রে।" "লোকটীর স্ত্রী আর একটি ছেলে আছে" "স্ত্রীটা খুব কাঁদছে—" ইত্যাদি—

[ক্রমে শব্দ বিলীন হইয়া আসিল—অরুণার কথা শোনা গেল]

অরুণা। তুমিত' খুন কর'নি তবু তোমার দীপান্তর? কেন কেন এই অবিচার। ভগবান—? এই ছোট ছেলে নিয়ে আমি কার ভরসায় এই কুড়ি বছর কাটাব—ওহো, হো, হো।

হীরালাল। অরুণা, কেঁদনা। আমার কুড়ি বছর দীপান্তর এদের কথা মিথ্যা নয়—এরা সত্যের প্রতীক—এরা বিচারক। আরত' আমাদের বলবার কিছু নেই। কারো কাছে কোন অভিযোগ নেই। আমাদের কথা রইলো তাঁর কাছে—তাঁর কাছে রইল আমার নালিশ—যিনি বিচারকের বিচারক—সেই সর্বদ্রষ্টা ভগবান।

অরুণা। ওগো—আমি যে—একা,—আমাদের যে কেউ নেই।

হীরালাল। নীচেয় রইল মানুষের পৃথিবী, উপরে রইল স্বর্গের দেবতা, আমি রইলাম দীপান্তরে—রইলে তুমি, রইল—আমার নয়নমণি অসীম—আর রইল আমার বেহালা—, অসীমের হাতে তুলে দিও তার পিতার সম্পদ—সবই আমার রইল অরুণা—সবই আমার রইল।

অসীম। তুমি কোথায় যাবে বাবা?

হীরালাল। ঐ কাল সাগর—ওরই—অসীম—বাবা—(ক্রন্দন)

(জাহাজের হুইসেল শোনাগেল—খালাসীদের গানের সুর ভাসিয়া আসিল)

(গান) বন্দর ছাড়, বন্দর ছাড়, বন্দর ছাড়রে।
ঢেউ এর পরে ঢেউ নাচে ওই কালসাগরে।

(ক্রমে শব্দ বিলীন হইল)

[১৮ বছর পরে]

(Police Suptd এর বাড়ী—তাঁহার কন্যা গীতা চাকর বনমালীকে ডাকিতেছে)

গীতা। বনমালী, বনমালী।

বনমালী। যাই দিদিমনি—(প্রবেশ)

গীতা। হ্যারে শোন, মাষ্টার মশাই এলে আমকে একটু খবর দিস্।

বনমালী। অচ্ছা। শোন দিদিমনি, তোমার মাষ্টার যিনি তোমাকে বেহালা শেখান—ওর নাম জান?

গীতা। না ত? কেন?

বনমালী। ওর ওই বেহালার বাক্সটি—

গীতা। কি বনমালী?

বার ।হাতে ছিল ঠিক অমনি একটা বেহালার বাক্স—আর কেউ না জানুক—আমিত জানি ।

গীতা। তুমি কি বলছ বনমালী।

বনমালী। বলব আর কি দিদিমনি। বলিনা কিছুই, শুধু দেখছি।

গীতা। কি দেখছো ?

বনমালী। দেখলাম অনেক কিছু, দেখছি কত কি ? এমনি হয়—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। মানুষ বলে সত্যের বিচার করে—এইকি বিচার ? কিন্তু জান দিদিমনি, বিচার যে করে সে ঠিকই করে—তার বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে—আমি জানি কিনা—বিচার আরম্ভ হয়ে গেছ।

(বাবা ডাকিলেন—"গীতা")

গীতা। বাবা ডাকছেন। আমি যাই বনমালী।

বনমালী। বনমালী, বনমালী—হুঁ—এরা কেউ আমাকে জানে না, কেউ আমাকে বোঝে না। ১৮বছর আগের কথা—হ্যাঁ আঠার বছরই ত ? তবু মনে হয় যেন গত কালের ঘটনা। কার বিচার কে করে ? কোথায় বিচার ? এত বড় একটা খুনের মামলা—পুলিস ইন্‌সপেক্টার—এর পদোন্নতি হল—তিনি হলেন পুলিস সাহেব। যিনি বিচার করলেন—বিচারের বাহাদুরীতে তিনি হলেন Chief Justic—চমৎকার দুনিয়া। কিন্তু বিচার যে আরম্ভ হয়েছে—রাত্রে আমার ঘুম আসে না চোখে—মনে হয় যেন, রক্তে রাঙ্গা ছোরাগুলো জোনাকীর মত ঘুরে বেড়ায় আমার চোখের সামনে। তাসের খেলা—সব যেন তাসের খেলা—হাঃ হাঃ—না—Hush—চুপ—

(কড়ানাড়ার শব্দ)

কে ?

অসীম। আমি।

বনমালী। আসুন, মাষ্টার মশাই, বসুন,। আমি গীতা দিদিমনিকে ডেকে দিচ্ছি। আচ্ছা মাষ্টারবাবু, একটা কথা বলতে পারেন ?

অসীম। কি ? কি বনমালী।

বনমালী। বলতে পারেন মানুষ বাঁচলে বাঁচে না মরলে

অসীম। সে কি বনমালী !

বনমালী। না, না, সে কিছু নয়। আমি যাই, ওই দিদিমনি এসে পড়েছেন।

অসীম। এস গীতা !

গীতা। কতক্ষণ এসেছেন ?

অসীম। এই একটু আগে।

গীতা। বসুন। বাবা বলছিলেন, ১৮ বছর আগে এক খুনীকে ধরে ওর পদোন্নতি হয়। সেই লোকটির দীপান্তর হয়েছিল—২০ বছর। যুদ্ধের হিড়িকে এবারই নাকি সে লোকটি খালাস পেয়েছে। কাগজে দেখছিলেন।

অসীম। তাত হলো এখন কাজ সুরু করো, কই তোমার বেহালা আন।

গীতা। বেহালা ত আছেই, তার জন্য অত তাড়াতাড়ি কেন ? বসুন না। অত বাড়ী বাড়ী মন কেন ?

অসীম। বাড়ীই নেই, তার বাড়ী বাড়ী মন। কি যে বল গীতা।

গীতা। বাড়ী নেই, কোথায় থাকেন ?

অসীম। Messএ।

গীতা। কেন, আপনার আর কে আছেন ?

অসীম। আমার সবাই আছেন অর্থাৎ কেউ নেই।

গীতা। কেউ নেই ?

অসীম। হ্যাঁ—আছে বাবার হাতের এই বেহালা।

গীতা। বাবা, মা।

অসীম। না, কেউ আর এখন নেই। ও সব কথা থাক।

গীতা। আচ্ছা, এমন বেহালা বাজনা আপনি শিখলেন কেমন ক'রে ?

অসীম। আমার বাবা খুব ভাল বেহালা বাজাতেন। শুনেছি মার কাছে। মা বলতো বাবা বিলেত গেছে—সে ছোট কালের কথা। তারপরে দুর্ভিক্ষের জোয়ারে কে কোথায় ভেসে গেল। যাক্‌গে—বেহালা আনবে না বসে বসে গল্প করবে।

গীতা। হিঃ হিঃ হিঃ—বেহালা বাজাতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না।

অসীম। তবে কি গল্প করতে ইচ্ছে ক'চ্ছে ?

গীতা। বা বলেছেন—আপনি দেখছি মনের কথা বলে
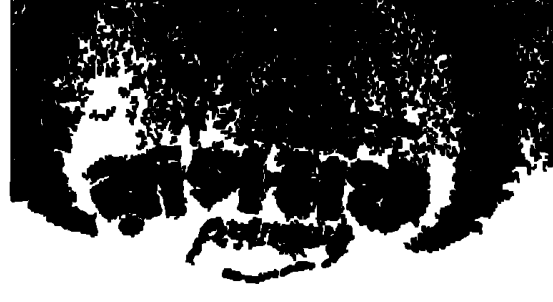
দিতে পারেন। হাত দেখতে পারেন। দেখুনত' আমার হাতখানা—।

অসীম। আঃ কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ। দেখ'—আমি তোমার গল্প বলার মাষ্টার নই, গণকও নই—

গীতা। তবে আপনি কি?

অসীম। গীতা!

গীতা। কি রাগ করলেন? বাবা! কি রাগী আপনি। আমি কি বলেছি আপনি গণক। কোনটা heart line আর কোনটা fate line সে সব ছেলেরাই বলতে পারে।

অসীম। দেখ তোমার বাবা আমাকে মাইনে দেন।

গীতা। কেন, আপনি কি বিনা মাইনেই কাজ করতে চান নাকি?

অসীম। কি যে বল গীতা। না না, ও সব বাজে কথা থাক।

গীতা। বেশ ত' কাজ হোক—আপনি কাল যে গৎটা বাজিয়েছিলেন, সেইটে একবার বাজান শুনি।

অসীম। ভুলে বসে আছ বুঝি।

গীতা। মনে থাকেনা কি কবি বলুন?

অসীম। কেন মন কোথায় যায়?

গীতা। কথাটা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।

অসীম। তুমি অতিশয় ফাজিল হয়েছ?

গীতা। সত্যি?

অসীম। হয়েছে—শোন'—

[অসীম বেহালা বাজাইল]

পুলিশ সাহেব। গীতা তোমরা পাশের ঘরে যাও। রায় বাহাদুর আসছেন—তাবপর তোমার ছাত্রী কেমন বেহালা শিখছে মাষ্টার?

অসীম। বলব নাকি?

গীতা। যান, চিমটি কাটব কিন্তু।

অসীম। গীতার বেহালা বাজনা একদিন শুনুন।

পুঃ সাহেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনব' বৈকি—শুনব' বৈকি—যাও তোমরা পাশের ঘরে—আসুন—জজসাহেব –, জানালা দিয়ে বাইরে নজর পড়তেই দেখি আপনি আসছেন।

(জজসাহেব [illegible])

পুঃ সাহেব। কেমন আছেন জজ্ সাহেব? অনেকদিন পরে এলেন। তারপর কি মনে করে।

জজ্ সাহেব। মনে করে কিছুই নয়। এসেছিলাম আমার শালীর বাড়ীতে। ভাবলাম, আছেন ত আপনি এখানেই—দেখা করে যাই।

পুঃ সাহেব। So kind of you.

(বেহালার শব্দ শোনা গেল)

জজ্ সাহেব। বেহলা বাজায় কে?

পুঃ সাহেব। আমার মেয়ে বেহালা বাজনা শেখে কি না।

জজ্ সাহেব। কে শেখায়?

পুঃ সাহেব। একটি ছেলে—সেই বাজাচ্ছে—

জজসাহেব। ও—বেশ বাজায়ত' ছেলেটি। বেহালা কথাটা মনে হলে—সেই বেহালাবাদকের কথা মনে পড়ে।

পুঃ সাহেব। হ্যাঁ,—সেই কি নাম ছিল। তার জন্যেইত' —আমার আর আপনার ভাগ্য। কি শুভক্ষণে Caseটা আমি investigate করেছিলাম—আর আপনি করেছিলেন বিচার। সেই যে promotion আরম্ভ হলো।

জজসাহেব। হ্যাঁ, হে লোকটা নাকি খালাস পেয়েছে—কাগজে দেখ্ছিলাম, কিছুদিন হলো।

পুঃ সাহেব। হ্যাঁ, দেখেছি আমিও। যুদ্ধের জন্যে ২ বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছে। আরে, কথায় কথায় একেবারেই ভুলে গেছি। বনমালী বনমালী—

বনমালী। যাই বাবু।

জজসাহেব। বনমালী আবার কে?

পুঃ সাহেব। আমার চাকর। খুব ভাল চাকর, মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই। সংসারের যাবতীয় কাজ ওর নখ-দর্পণে। এই রেশনের যুগে বনমালী না থাকলে কি যে হতো?

জজসাহেব। আমার চাকরটি একেবারে নিরেট।

বনমালী। বাবু ডাক্ছিলেন।

পুঃ সাহেব। অনেকদিন পরে জজ সাহেব এলেন,—দু' কাপ চা নিয়ে এস।

হীরালাল। (প্রবেশ) দু' কাপ নয় তিন কাপ। [illegible]

হীরালাল। তুমি নয়—বলুন আপনি। নমস্কার জজ্ সাহেব, নমস্কার পুলিস্ সাহেব। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?

পুঃ সাহেব। কে আপনি ?

হীরালাল। এত ভুল ? তাত' বটেই, ভুল হবে না কেন ? যার জন্যে পুঁটি মাছ থেকে কই কাতলার দলে ভিড়তে পেরেছেন—তাঁকে ভুলে যাওয়া—হ'য়েছে একেবারে বেমালুম—আমিত ভেবেছিলাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

জজসাহেব। স্পষ্ট করে বলুন কে আপনি ?

হীরালাল। চুল পেকে গিয়েছে, বুড়ো বুড়ো চেহারা হয়েছে—তবু ভাল করে দেখুন দেখি তু'জনে। কেন, ঘটা করে বিচার করে ২০বছর দীপান্তর দিয়েছিলেন মনে নেই ?

জজ্ সাহেব। ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আপনি কবে ফিরলেন।

হীরালাল। ফিরেছি অল্প দিনই হল।

পুঃ সাহেব। তা হটাৎ এখানে কি মনে করে ?

হীরালাল। শুনতে পেলাম আপনারা বড় বড় officer হয়েছেন তাই একটু অলাপ পরিচয় করে যেতে এলাম। ভালই হলো আপনদের তু'জনের সংগেই দেখা হয়ে গেল। আর তাছাড়া আপনারা উপকারী বন্ধুরা—আপনাদের সংগে দেখা না করে পারি বলুন—হাঃ হাঃ হাঃ।

পুঃ সাহেব। আস্তে কথা বলুন, আপনি খুব উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।

হীরালাল। খুবই উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে কি ?

জজসাহেব। আপনি বসুন, অনেকদিনের কথা। প্রথমে আপনাকে আমরা চিন্‌তে পরিনি মিঃ ঘোষ—

হীরালাল। চিনতে আপনারা কোনদিনই পারেন না, অথচ কেমন মজা, কেমন মিথ্যার উপরে গড়ে ওঠল আপনাদের চাকরীর সৌধ, ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেন আপনারা।

পুঃ সাহেব। শুনুন, আমাদের একটা জরুরী কাজ আছে। আপনি অন্যদিন আস্‌বেন—এখন আপনি যেতে পারেন।

হীরালাল। চলে যেতে আসিনি, আসব' বলেই এসেছি। জজসাহেব। যখন এখানে তখন বিচার হবে বৈ কি ? হাঃ হাঃ হাঃ।

পুঃ সাহেব। পাগলামি করার জায়গা এটা নয়, রাস্তা আছে—রাস্তায় যান।

হীরালাল। কিন্তু আদালত ? সেটাও কি পাগলামির জায়গা ?

পুঃ সাহেব। আমি বলছি চলে যান এখান থেকে।

হীরালাল। কেন, চলে যাব কেন ? Inspector থেকে পুলিস সাহেব হয়েছেন—একটু 'চা' খাওয়াবেন না তাকে, যার জন্য এমনটি হলেন। আপনি পুলিস সাহেব, জজ্ সাহেব আর ঐ যে আপনার বনমালী চা নিয়ে এসেছে—এই তিন জনে মিলে কেন আমাকে হত্যা করলেন ?

[বনমালীর হাত হইতে চা'এর কাপ পড়িয়া গেল]

পুঃ সাহেব। ভাল উৎপাত।

হীরালাল। উৎপাত, না ? এমনি হয় পুলিস্ সাহেব। জীবনে যা কোন'দিন করিনি—যা কোন'দিন কল্পনাও করিনি তার জন্যে ঘটা করে—বিচার করে—জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর গুলো আমার কলে পেশা আঁকের ছোবড়ার মত অর্থহীন ক'রে দিয়েছেন আপনারা—তিলে তিলে আমাকে আপনারা হত্যা ক'রেছেন। আমার সোনার সংসার ভেঙ্গে তচনচ্ হয়ে গেল আর গড়ে উঠল' আপনাদের স্বর্ণসৌধ—চমৎকার—চমৎকার বিচার ?

পুঃ সাহেব। তুমি কি বলছ হীরালাল।

হীরালাল। যে কথা এতদিন বল্‌তে পারিনি। কোথায় আমার স্ত্রী, কোথায় আমার পুত্র—দিন, এনে দিন তাদের। কে তাদের গৃহহারা করেছে। যে হত্যা করলে সে বেশ বেঁচে রইল—, যিনি ধরলেন—যিনি বিচার করলেন—তাঁদের হলো promotion-এর উপরে promotion—বল্‌তে পারেন এ কোন বিচার ?

পুঃ সাহেব। পাগলের প্রলাপ না শুনে বনমালী যাও 'চা' নিয়ে এস।

হীরালাল। না ও যাবে না। ভাবছেন চুল পেকেছে, বুড়ো হয়েছি—কিন্তু বিচারকের বিচার ত' শেষ হয় নি। ও কেমন করে যাবে ? জজসাহেব আছেন, পুলিস সাহেব

আছেন—শুনুন—Middle Street হোটেলের খুনের অপরাধে আমাকে দিলেন ২০ বছর দ্বীপান্তর—কিন্তু সে দিনের অপরাধী ছিল কে? আমি?

জজসাহেব। নিশ্চয়ই তুমি।

হীরালাল। No, Never—সেদিনও বলেছিলাম আজও বল্‌ছি—অপরাধী কে জানেন? হোটেলের ম্যানেজার, বনোয়ারী বাবু?

পুঃ সাহেব। মিথ্যা কথা।

হীরালাল। মিথ্যা কথা—? দেখ্‌তে চান তাকে—ঐ—ঐ—আপনার বনমালী—

পুঃ সাহেব। আঁ্যা সেকি?

হীরালাল। রাজাসাহেবের খুনের পরে, Prince Street এ আর একটা খুন হয়, ওর সহকর্মী বংশীলাল ধরা পড়ে—। হোটেল ছিল বংশীলালের,—ম্যানেজারও ধরা পড়তেন। absconder হয়ে লুকিয়ে বেঁচে আছেন। বলুক না আপনার বনমালী—রাজাসাহেবকে কে খুন করেছিল—আমি—না ওরা?

বনমালী। না, না, আমি খুন করিনি।

হীরালাল। এই পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে বল যে তুমি খুন করনি। তোমার বন্ধু বংশীলাল তারও দ্বীপান্তর হয়—আমি তার মুখে সব শুনেছি—। বেশত' বল তুমি খুন করোনি-বল? কেন মুখে কথা নেই বনমালী? কেন মুখ তোমার মরার মুখের মত শাদা পাংশুল হয়ে গেল? বল কে রেখেছিল রক্তাক্ত ছোরা আমার বেহালার বাকসে।

বনমালী। আ-মি—আ-মি—পুলিস্ সাহেব আমায় রক্ষ করুন।

হীরালাল। রক্ষা আজ তোমাকে কেউ করতে পারবে না। (পিস্তল ছুড়িল) হাঃ হাঃ হাঃ—

বনমালী। ও—ও—হো- (মৃত্যু)

হীরালাল। হাঃ হাঃ হাঃ—যে অপরাধ করেছিলাম না—তার জন্যে শাস্তি দিয়েছিলেন জজ্‌সাহেব ২০ বছর দ্বীপান্তর—সেই অপরাধ আমি আজ করলাম—বিচার কিন্তু আমার আগেই হয়ে গেছে জজ্‌সাহেব—হয় নি বিচার—হাঃ হাঃ হাঃ।

গীতা। পিস্তলের শব্দ—কি হয়েছে বাবা?

অসীম। কি হয়েছে Sir?

হীরালাল। কে তুমি, তোমার হাতে ও বেহালা কি করে এল?

অসীম। কেন—এ আমার বাবার বেহালা।

হীরালাল—তোমার বাবার বেহালা, তোমার বাবার বেহালা—বেশ—বেশ—ভাল—তোমার বাবার বেহালা!—না—তোমার বাবার বেহালা—Good bye পুলিস সাহেব—Good bye জজ্‌সাহেব—আচ্ছা—তোমার বাবার বেহালা—বাবার বেহালা—Good bye—।

(উপন্যাস)

৭

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

●

কীর্তন শেষ হবার পর যথারীতি মেজকর্ত্তাদের আনুষ্ঠানিক কার্য চলে। এই আনুষ্ঠানিক কার্য শেষ হ'তে হ'তে দশটা এগারোটা—কোন কোন দিন রাত বারোটাও বেজে যায়। সমস্ত পল্লী নিঝুম হ'য়ে আসে। হলধরেরা সবদিন জেগে থাকতেও পারে না। তবে বাদল কোনদিনই 'পেসাদ' না পেয়ে ওঠে না। এবং পেসাদের জন্য শেষ অবধি তাকে অপেক্ষা করতেই হয়। পেসাদ সেবনে বাদল অনেক সময় মোহন মাঝিকেও ছাড়িয়ে যায়। মোহনের আগে যদি বাদলের হাতে কলকে আসে—কলকেটায় বড় বেশী কিছু থাকে না। মোহন বাদলকে সম্বোধন করে বলে, "ব্যাটা গুরু মারা বিইদ্দে শিকছো—কিছুই নাথো নাই।"

মেজকর্ত্তা ও অবনী ঠাকুর ওদের প্রসাদ-গ্রহণের সময় একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন। মোহন ও বাদল অনতিদূরে বসে পসাদ গ্রহণ করলেও—মেজকর্ত্তা ও অবনী ঠাকুরের মর্যাদা বজায় রেখেই চলে। কোন কোন দিন অবনীঠাকুর ও দলের আর সকলে আগেই চলে যায়। মেজকর্ত্তা হরি-ঘরের বারান্দায় কীর্তন-আসরের ফরাসেই তাকিয়া ঠ্যাস দিয়ে একটু বিশ্রাম করেন। কীর্তন গানের সময় সকলেই এক ফরাসে বসে। তখন জাতিভেদও থাকে না—জেলে বামুনের পার্থক্যও বোঝা যায় না। এইখানটায় হরিনামের মাহাত্ম্য বলতে হবে। আসর ভাংগার পর ফরাসটা একটু গুটিয়ে রেখে মোহন ওরা চাটাই পেতে বসে। মোহন মেজকর্ত্তাকে পৌছে দিয়ে বাড়ী যায়। বাদল ওরা না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে।

ওদিন মেজকর্ত্তার প্রসাদের পরিমাণটা বোধ হয় একটু বেশীই হ'য়েছিল, তাছাড়া একটু দেরী করে যাবার অন্য কারণও হয়ত ছিল। তিনি তাকিয়া ঠ্যাস দিয়ে শুয়ে ছিলেন। মোহন ও বাদল বারান্দার একপাশে বসে শলা-পরামর্শে ব্যস্ত ছিল। গ্রাম্য সম্পর্কে বাদল মোহনকে কাকা বলে ডাকে। তাছাড়া এই কীর্তন আসরের ভিতর দিয়ে মোহন বাদলের একজন পরম হিতাকাঙ্খী ও অভি-ভাবক হ'য়ে উঠেছে। মোহন গম্ভীর ভাবে বাদলকে উপদেশ দেয়, "ভাইপো, একন তাইকাই এট্টু আটডু সইমজ্যা না চললে সাংসার চালাইতি পারবা না। ডাগর বৌ—পোলাপান হইতি দেরী অবে না। বৌ-ছাইলাগো খাওয়াইবা কী?"

বাদল বলে, "হবিত বুঝি কাগা, বলতি গ্যালে বউডারে দোষে। বাবা মা হগলেই বলে, বউডাই ছাইলারে নাষ করলো। আইচ্ছা কাগা, তুমিই কওতো—বউর কোন বাকিড়া আমি হুনি!"

"আরে রাম রাম—তোর বউর মত বউ এ গেরামে ক্যাডার আছি রে? মা যেন সাক্ষাৎ ভগোবোতী। তোর বাবার বুড়াকালে মাথার ঠিক নাই।"

"মাইয়্যার কোন দুষ দ্যাখফে না—কেবল বউডারে দুষফে।" বাদল অভিমানের সুরে বলে।

মোহন বাদলের কথা টেনে নিয়ে উত্তর দেয়, "এই এ্যাদ্দিন ধইর‍্যা দ্যাখতেছিতো—আমরাতো পর নোক—কই বউডার ত' কোন দুষই চোকে নাগে নাই। বইললাম না, তোর বাবার মাথা খারাপ অইয়া গ্যাছে।" মোহন একটু থেমে আবার বলে, "নক্ষীমা বইলাইত নিজের ভালমন্দ আহে—একন খাইকাই যদি না আহে—চইলবে ক্যান! তোর নাগাল ত কাছা ছাড়া লয় বে। তাই মারে কেউ দেখতি পারে না। আর বুনও বলি বুন! খাইস ত ভাইর ভাত। ভাইর দিক যদি না টানিস চইলবে ক্যান! আর ড্যামাকি বা কত! জাইলার ঘরের মাইয়াগো অত ড্যামাক ভাল লয়। সে তুমি ভাইপো, বুনের নিন্দা করতেছি—তাতে রাগো আর যাই করো এ কিন্তু সাচ্চা কতা।"

বাদল রাগে না বরং খুশী হয়। মোহন যেন বাদলের মনের কথাগুলি বলে ফেলেছে। এই জন্যইত মোহনকে বাদলের আরো বেশী ভাল লাগে। বাদল তাড়াতাড়ি

বলে, "তুমিই কওত কাহা, জাইলার ঘরে অত সাজ পোষাক কি সাজে। আর কি ছানসিক্কা! বউ পয়পইশকার লয়। আরে তার যে কাম কইরা খাইতি অয়—তুইত ফু দিয়া ব্যাড়াস।"

"লিজ্জাস কথা। তা ক্যাডা বোঝেরে! আরে ভাইপো—এ ছুনিয়ায় কেউ কারো লয়রে— কেউ কারো লয়।" মোহন তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, "ভাইর খাইস ভাইর দেকপিতো! এই যে বাতাসী—প্রসন্ন জ্যাঠার মাইয়া। কত জনা কত কতা কয়। কিন্তু ছ্যাখো যাইয়া—তার ক্যামনধারা ভাইগত পরাণ।" মোহন একটু গলা খাটো করে বলে, "মজুমদার বাড়ীব ছোটকত্তাত আসে—কাপড়টা-আড্ডা—টাহাটা—পয়সাডা ঠ্যাহায় ঝোহায় ছ্যায়—তা সব ও ভাইগো হাতে তুইল্যা দেয়। আর তোব বুন? বাপত বিয়াডাও দিলো না। বিয়া দিলি ঘাড়ের বোঝাও কমত্তো, ওরকম ডাগর ডোগর মাইয়া বিয়া দিয়া টাহাওত আসতো ধরে কয়েক কুড়ি।"

বাদল বিরক্তির স্বরে বলে, "ওকথা আর কইওনা কাহা! জন্মাইছি আমরা জাইলার ঘরে আর আধিক্যাতা বামুনের—আমাব ত ভালই নাগে না। মাঝি মধ্যি মনে লয় বৌডারে লইয়া তুলালী যাইয়াই থাহি।"—তুলালী বল্লভপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। বাদলের শ্বশুর বাড়ী তুলালী। মোহন বাধা দিয়ে বলে, "না ভাইপো, ও কামডা কইরো না। তুমি পুরুষ পোলা। শউর বাড়ী যাইয়া থাইকবা ক্যান? খপরদার, অমন বাকিটা মুহেও আইনো না।"

বাদল উত্তর দেয়, "না যাইয়া কি হরবো? এ্যাত্তগুলিরে পুইষবো ক্যামন ধারা। এ্যাইত ধর কাইল হাটবার। জালে ভাল মাছ ধরবার পারি নাই। কাইলের দিনটা আতে। কী পাবো ভগা জানে। চাইলের টাহাটাওত আমার আতে নাই। এতগুলি নোক খাইবো কী?"

মোহন অভয়ের স্বরে বলে, "তা অত শত ভাবছিস ক্যান। সে ব্যাপস্থা কইরা দেবো—আমারে আগে কইতে অয়।" গলার স্বরটা একটু নামিয়ে মোহন বলে, "শোন এটডা কথা কই। তোর ভালোর লাইগাই কই—আমার কথা হুনিস" —বাদল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় মোহনের দিকে। উদগ্রীব হ'য়ে ওঠে তার কথা শুনতে। মোহন গলাটা আরো একটু নামিয়ে বলে, "রাইবে মাইজাকত্তার মনে ধরছে· তুই ব্যাপস্থা করলিই আমি সব ঠিক কইরা ফেলতি পারি। আব জাল বাইয়া কষ্ট করতি অবে না। চাইলের টাহার জন্যি ভাবতিও অবি না।" বাদলের মনে কথাটা কীরকম গেঁথেছে মোহন তা পরীক্ষা করবার জন্য একটু চুপ করে। বাদল কোন উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে থাকে। মোহনের মনে সন্দেহ জাগে। তবে কী সে চালে ভুল করলো! দরদ মাখানস্বরে বাদলকে জিজ্ঞাসা করে, "কী চুপ গেলি ক্যান—আমার কতায় নাগ করলি লাকি। মাইজাকত্তা কিছু কয় লাই। একতা আমি আন্দাজে কইছি। আর তোর মত না থাকলি—" তারপর একটু থেমে বলে, "এতে নজ্জারই বা কী! বামুন কায়েতের ঘরে কত নুটোপুটি অয়রে। আর আমাদের জাইল্যার ঘরেই যত দুষ!" বাদল এবার বলে, "আরে না কাহা, আমি তা বইলছি না, তুমি জানলা ক্যামনতায়? ওর রূপ দেইখ্যা আবার মাইজাকত্তা ভুলবি! তোমার ও যেমনি কতা! বাতাসীর কতা কও· তার মত ছুন্দর মাইয়া বামুনের ঘরেও কয়ডা আছে বলোত?"

মোহন এবার সাহস পায। এবার আর তার কোন সন্দেহ থাকে না—সে নিশ্চিত করে বুঝতে পারে তার ওষুধে ধরেছে। উৎসাহিত হ'য়ে বলে, "এ আর কেউ লয়, তোর মোনহা কাহা! এ্যাদ্দিন মাইজাকত্তারে ছ্যাখছি আর তার মন বুইঝলাম না। শোন তাইলে।" মোহন একটু গা ঝারা দিয়ে নেয়—তারপর বলে, "আরে ছ্যাদিন মাইজাকত্তা বইলছিলেন, 'মোনহা রাধিকার যে রূপ ছ্যাখলাম ঠিক যেন আমাদের রাইর মোতোন।' আরে তুই যদি একটু রাজী থাহিস সে আমি ছ্যাগবানী।"

বাদলের গা ঝাকি দিয়ে মোহন বলে, "কীরে চুপ কইরা আছিস ক্যান।"

বাদল আমতা আমতা করে উত্তর দেয়, "না কাহা, বাবার জন্যি ডর লাইগছে।"

মোহন সাহস দিয়ে বলে, "থো নিয়া ও বুড়াডার কতা। সব ভার আমার পর থাহুক - তুই মানক্ষীরে এডটু টিপা দিবি।"
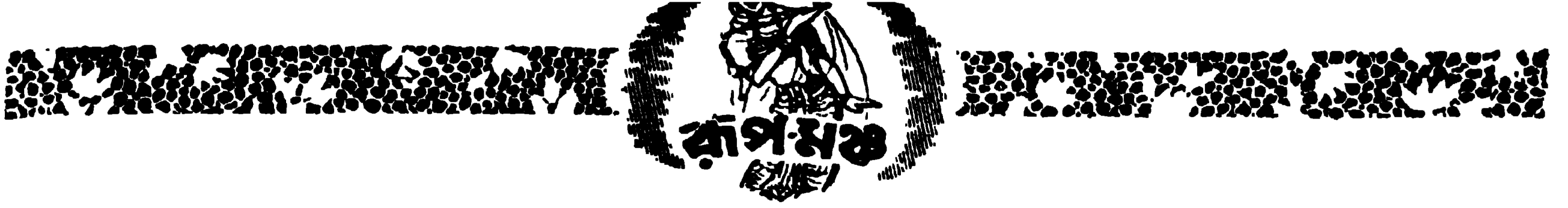
ইতিমধ্যে মেজকর্ত্তা কেশে ওঠেন। যেন এতক্ষণ তিনি বিভোর হ'য়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ওদের কথায় বাধা পড়ে। মেজকর্ত্তা উঠে বসে মোহনকে বলেন, "কত রাত হ'লোরে? চল, বাড়ী চল। ডাকতে পরিসনি!"

মোহন উত্তর দেয়, "আইজ্ঞা আমি ভাবছি আপনি ধ্যানে রইছেন। শ্যাষে ডাইহা পাপের ভাগী হমু।"

মেজকর্ত্তা তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেন, "নারে আজ একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। চল বাড়ী চল।" মেজকর্ত্তা বাইরে এসে গা'টায় একটু মোড়ামুড়ি দিয়ে নেন। বাদল ও মোহন ফরাসটা তুলে ঘরে রেখে দোর বন্ধ করে। মোহন মাথা চুলকাতে চুলকাতে মেজকর্ত্তার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাদল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কী, কীরে?" মেজকর্ত্তা মোহনকে জিজ্ঞাসা করেন। মোহন গদগদ ভাবে বলে, "বাদলা বইলছিলো, ওর আতে চাইল কেনবার টাহা নাই- যদি—"

"তা ও বলতে পারে না—এতে আর লজ্জা কী—যখন ঠ্যাকায় পড়বি নিবি—" এই বলে বাদলের হাতে ট্যাক থেকে বের করে একখানা পাঁচ টাকার নোট দেন। বাদল নোটখানা নিয়েই মেজকর্ত্তার পায়ের ধূলি নেয়। কিছুদূর ওদের এগিয়ে দিয়ে বাড়ী আসে।

বাড়ীতে কেউ জেগে নেই। জেগে থাকবার কথাও নয়। আজ রাত একটু বেশীই হ'য়েছে। হলধর ও জেলেবৌ অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে চারচালা ছোনের ঘরে শোয়। টিনের ছাপরাটায় বাদলের বিয়ের পর হোগলার বেড়া দিয়ে দুটো খোপ করা হ'য়েছে। একটায় রাই থাকে হলধরের মেঝো বোনের ছোট ছেলেটাকে নিয়ে। মেঝো বোন বছর খানেক হ'লো মারা গেছে। তার ছোট ছেলেটা হলধরের বাড়ীতেই থাকে। তার সমস্ত দেখাশোনার ভার রাই'ই নিয়েছে। রাত্রেও রাইর কাছেই সে থাকে। আর এক কামরায় থাকে বাদল ও তার বৌ। দুই খোপেই সুপারীর চটা দিয়ে মাচাঙ্গের মত করা হ'য়েছে। এর ওপরে এরা শোয়। নীচে জিনিষ পত্র থাকে। দু'টো খোপেরই পৃথক দুটী দরজা। বাদল তার খোপের কাছে এসে আস্তে আস্তে ডাকতে থাকে, "বৌ—ও বৌ ঘুমাইছিস নাকি—দরজা খোল।"

বৌ'র সাড়া নেই। দরজা ধরেও জোরে ধাক্কা দিতে পারে না বাদল। জোড়াতালি দেওয়া দরজা খসে গেলে আবার মেরামত করতে হবে। বাদল ডেকেই চলে। কিছুক্ষণ বাদে ভিতর থেকে উত্তর আসে—"সবুর কর খুইলছি"—দরজা খুলে বাদলের বৌ চোখ ডলতে ডলতে বলে, "ক্যাবল ঘুমডা আইছিলো—তোমাগো জ্বালায় কিছুতেই ছান্তি নাই। একন মরতি পারলি বাঁচি।"

বাদল অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। দরজা খুলে বৌ বলে "খাড়াও আগেই আইসোনা। বাতি জ্বালাইয়া নই।" অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে মাচাঙ্গের নীচ থেকে গন্ধক লাগানো পাটখড়ির শলা দিয়ে কেরোসিনের কুপিটা জ্বালিয়ে নেয়। বাদল ঘরের ভিতর যায়। বৌ ইতিমধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। বাদল জিজ্ঞাসা করে, "শুলি যে? খাতি দিবি না"—

বৌ উত্তর দেয়, "ভাত আইনা রাকছি। মাচাঙ্গের নীচায় আছে। বাইরা খাও।" বাদল খেতে না বসে মাচাঙ্গের উপর বসে পড়ে বৌকে বলে, "ওঠ ঘুমাইসনা—খপর আছে। এই দ্যাখ কী?" বৌ পাশ ফিরে দেখে বাদলের হাতে পাঁচ টাকার নোট একখানা। নোটখানা ছিনিয়ে নেয় বাদলের হাত থেকে। আর কোন কথা কয় না। বাদল ঠ্যালা দিয়ে বলে, "উট, কথা আছে। ভাতদি।" একটু থেমে আবার বলে, "রাই ঘুমোইছিনি।"

"না, তোমার লাইগ্যা জাইগ্যা থাকপি। ভাইর জন্যি কী দরদগো—আইজ আবার তায় শরীল খারাপ নাগছে—সবই এ্যাকা এ্যাকা সারতি অইছে।" বলে আরো একটু আরাম করে বৌ শুয়ে পড়লো। তার উঠবার কোন মতলবই নেই। বাদল এক ঝাকুনী দিয়ে বলে, "আরে দেখফার পারবি, ওরকম কত পাঁচ টাহা আসফে। তয় তোর একটু বুইঝ্যা চলতি হবি। উট বুদ্ধি বিবেচনা কইরা দেখতি অবে সব। এবার তোর নাকছাবি গইড়া না দেইত কী কইছি।" বৌ'র চোখ থেকে এবার ঘুম একেবারেই চলে

যায়। তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দেয় বাদলকে। বাদল ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দিতে বলে, "টাহা দিল মাইজাকত্তা। মোনহা কাহা ঠিকই ধরছে—নইলে চাওয়া মাত্তির টাহা বাইর কইর‍্যা দ্যায়!"

বাদলের বৌ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—কিছু বুঝে উঠতে পারেনা। বাদল বলে, "রাইরে মাইজাকত্তার মনে ধরছে। দেইহা নিস কত টাহা আদায় করি। তয় খপদ্দার বুইড়া বুড়ি যেন না জানতি পারে—আর তরও সাহায্যি নাগবি।" বাদল মুখে গ্রাস তুলে দিয়ে চিবিয়ে নিয়ে বলে, "আমি ভাবছি অরে মনে ধরলো ক্যামন তারা। কীরূপ আছিরে?" এবার বাদলের বৌ উত্তর দেয়, "রূপ না থাউক, ঢলানী আছে তো!" নিজের সতীত্বের জাহির করে আবার বলে, "আমরা কী জানিনা পয়পইশকার থাকতি—তয় থাকিনা ক্যান! হব হময় পুরুষের সামনে বাইরাতে অয় তাই। ছাপছাপাই থাকলি পুরুষের নজরে পড়ে। একন থাইকা বুঝলাত ক্যানে বারবার কওনেও ছাপছাপাই রইনা!" বাদল মনে মনে বউর পর খুশী হয়। বাদলের বৌ একটু অসম্ভব রকমের নোংরা। এজন্য প্রথম প্রথম শ্বাশুড়ী ননদের কাছে তাকে কম কথা শুনতে হয় নি। জেলে বৌ এতদিন সব কাজ নিজে হাতে করেছে—এতগুল ছেলে মেয়েকে মানুষ করেছে কিন্তু তার বাড়ীখানাও যেমনি ধপ ধপ করেছে—ছেলেমেয়েদেরও কাউকে কোনদিন অপরিষ্কার রাখেনি। বাদলের বৌ হয়ত ছড়া দিয়ে ছড়ার হাড়িটাকেই উঠোনের কাছে রেখে দিল। কাপড় কাচবার ভয়ে ময়লা কাপড়ই পরে রইলো। বাদলও এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য বউকে কম বকুনি দিত না প্রথম প্রথম। কিন্তু এখন বৌকে মনে মনে তারিফ না করে পারে না। খেয়ে বারান্দার এক কোনে যেয়েই বাদল হাত মুখ ধুয়ে আসে। দরজাটা বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে দেয়। শুয়ে শুয়ে ওদের শলাপরামর্শ আরো কিছুক্ষণ চলে।

বাদল বলে, "তুই রাইরে একটু খাতির কইরা কতা কবি। ওর মনের ভাবটা জানবি। আর জাইলার ঘরে এত হামেসাই অয়, এতে আর দুষটা কী?"

বৌ বাদলকে অভয় দিয়ে বলে, "তুমি জাইনো, তোমার বুনেরও সায় আছে। একন বুঝতে পারছি মাইজ্যাকত্তার কাপড় পিনলো না ক্যান। আমারেও যে দেছো সেই জ্বালায় পিনলোনা। নেখাপড়া জানা বুন কিনা—। পেটে পেটে সব। আমরা স্যাদা-সিদা। অত প্যাচ-ঘোচ কী জাইনবার পারি।"—

ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। সমস্ত বল্লভপুর গা'ই ঘুমের ঘোরে বিভোর। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঝালডাঙ্গার বিলের ওপার থেকে থেক শেয়ালগুলোর চীৎকার ভেসে আসছে। তার প্রত্যোত্তরে এপার থেকে জেগে থাকা দু'একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে শব্দ করে উঠছে। কোন বাড়ীর কোন শিশুর ক্রন্দন ওদের সংগে মিশে বেশ সুর রচনা করে চলেছে। হলধরের বাড়ীর টিনের ছাপরার এক খোপে শুয়ে থেকে তার মেয়ে রাই বল্লভপুর গায়ের রাতের রূপটা যেন একা একাই অনুভব করছে। কোথায় গায়ের সেই দিনের বেলাকার চাঞ্চল্য! পাখীর কলকাকলি—কর্মব্যস্ত গ্রামবাসীর তৎপরতা—প্রতিবেশী-প্রতিবেশীনীদের বাকবিতণ্ডা—ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ! সবই রাত্রির রহস্যজালে আবৃত হয়ে এক নিস্তব্ধ রহস্যের সৃষ্টি করে। বল্লভপুরের রাতের এই নিস্তব্ধতার সংগে রাই যেন ওর মনেরও অনেক মিল দেখতে পায়। কোন উচ্ছ্বাস নেই—কোন আশা নেই। ওর মূক মনের স্তব্ধতায় নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যায়। বল্লভপুরের রাতের অন্ধকারের চেয়েও যেন ওর মনের অন্ধকার আরো গাঢ়। উন্মুক্ত আকাশ বল্লভপুরের তমিস্রাকে ছড়িয়ে দিয়েছে—কিন্তু ওর মনের অন্ধকার সমস্ত জানালা কপাট বন্ধ করে মাটির নীচেকার কক্ষে বন্ধ অন্ধকারের মতই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে। ওকে যেন শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করতে উদ্যত। বল্লভপুরের রাতের অন্ধকার চিরদিনের জন্য নয়—কাল প্রভাতে সূর্যোদয়ের সংগে সংগে সমস্ত গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়বে—সমস্ত গ্রাম আবার কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর মনের অন্ধকার! কে সেই ভাস্বর পুরুষ যে সপ্তাশ্ব চালিত রথে ছুটে আসবে ওর মনের অন্ধকার দুর করতে—কে ওর সমস্ত গ্লানি ও জ্বালা দুর করে আলো জ্বালাবে! সে পুরুষের আবির্ভাবের

সৌভাগ্য থেকে কী ও চিরদিনই বঞ্চিতা থাকবে! কেন? মেজকর্ত্তা! কিন্তু সেত ওর আকাঙ্খিত পুরুষ নয়। সেত পারবে না বিচ্ছুরিত আলোক বিকিরণে ওর মনের তমিস্রা নাশ করতে। ওর জীবনে সেত ধূমকেতু। শুধু ওর জীবনেই নয়—আরো সে সব মেয়ের জীবনে মেজকর্ত্তার আবির্ভাব ঘটেছে—তাদের মনের অন্ধকার দূরীভূত হয় নি—অন্ধকার আরো গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। অন্ধকারের জ্বালা সইতে না পেরেই ব্রজ কাপালির বোনটা আত্মহত্যা করেছে। ওর জীবনেও কী সেই ধূমকেতুকেই মেনে নিতে হবে! বাদল ও তার বৌ'র সব কথাই ওর কানে গেছে। এই চক্রান্তের মায়াজাল থেকে কে ওকে রক্ষা করবে! ওর জীবনের পরিণামও কী আত্মহত্যা—! না-না-সে কখনও হোতে দেবে না। কিছুতেই দেবে না। ভয়ে রাইর বুকটা দুর দুর করে কেঁপে ওঠে—ওর পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাইটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আজ এই শিশু ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরেও যেন ও কিছুটা সাহস পায়।

সুনন্দা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। রান্নাঘরের দরজাটা খুলে পিছন ফিরেই দেখে রাই দাঁড়িয়ে। বলে ওঠে, "এ কী রাই তুই! এত সকালে! আর এ কী চেহারা হয়েছে!" সত্যি, রাইর চেহারায় একরাত্রে যেন অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কেন ঘটেছে সে রাই ছাড়া আর কে বুঝতে পারবে? সারারাত ওর চোখে পলক পড়েনি—শুয়ে শুয়ে কেবল ভেবেছে—কিন্তু কোন কূল কিনারাই ও দেখতে পায় নি। ও ওর বিড়ম্বিত জীবনের জন্য ভাগ্যবিধাতাকে বার বার অনুযোগ-অভিযোগ দিয়েছে—কিন্তু সামান্য মানুষই যেখানে ওর ব্যথায় ব্যথী নয় সেখানে কোন অদৃশ্য দেবতা অদৃশ্যে থেকে ওর সমস্ত ব্যথার ভার কমিয়ে দেবে—সে বিশ্বাস ওর নেই। ও তাই ভোর হবার সংগে সংগে ছুটে এসেছে সুনন্দার কাছে। যদি কোন পথের সন্ধান থাকেত সুনন্দাই দিতে পারে। সুনন্দার প্রশ্নের তখনও কোন উত্তর দিতে পারে না—কিছু বলতেও পারে না। চুপ করে থাকে মাটির দিক চেয়ে।

সুনন্দা আবার জিজ্ঞাসা করে, "কথা বলছিস না কেন, কী হয়েছে—"

রাই অভিমানের সুরে বলে ওঠে, "অবে আবার কী—কিছু জান না! রাইত আমার ক্যামনে, ক্যাটে—তা কি কইর‍্যা বোঝাবো তোমারে।" একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, "না বৌদি, তুমি এ্যাকটা বিহিত করো। শেষে আমারে দুষতে পারবা না। দেবুদারে আইজই একখানা চিঠি নিখা দাও। কী বিপত যে আমার আইসতাছে আমি ছাড়া আর কেউ বুইঝবা না।"

সুনন্দা বুঝতে পারে। তারই বা কী করবার আছে। নারী হয়ে একটা নারীর মর্মপীড়ায় ব্যথিত হওয়া ছাড়া সে নিজেও কোন পথ খুঁজে পায় না। দেবুকে বার বার বলেছে—কলকাতায় যেয়ে রাইর জন্য কোন একটা কাজ ঠাজ যোগাড় করে দিতে। আর সেও ত আজ বেশীদিন যায় নি। ছেলে হলে নয় ওর মেসেই পাঠিয়ে দিত। তবু রাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্ল, "আচ্ছা তুই ঘাবরাসনে আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি আবার। নিজে সাবধান মত থাকবি। কেউ কিছু করতে পারবে না।" রাই সুনন্দার কাছ থেকে অনেকটা হালকা মন নিয়ে ফেরে। ঐ সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া সুনন্দার যে আর কিছু করবার নেই, রাই তা বোঝে। তবু সুনন্দার সান্ত্বনা তাকে যেন অনেকখানি শক্তি যোগায়। তাই যখনই নিজে ভেবে ভেবে আর কিছু ভাবতে পারেনা তখনই ছুটে যায় সুনন্দার কাছে।

বাড়ীতে এসে দেখে – ওর মা ছড়া দিয়ে গোবরের হাড়িটা নিয়ে ঘাটে ধুতে যাচ্ছে। ভাই বৌ উঠে ডোয়া লেপতে শুরু করেছে। রাইকে দেখেই বাদলের বৌ বলে ওঠে, "কোথায় গেছিল্যা ননদাই, বিয়ান বেলা উইটাই।"

রাই নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয়, "সু-বৌদি মাছ চাইছিলো—তাই বইল্যা আইলাম—মাছত কাইল পায় নায়—আইজ যদি আসে ত বিকালে দিয়া যাবো।"

"ও" বলে বাদলের বৌ ঢোক গেলে। সোহাগের সুরে বলে, "কাইল চুলটাও বাঁধো নাই। তা তোমারে খোলা মাথায় নক্ষী পিতিমার মত দেকাইছে।" রাই ভাইবৌর সোহাগে বিস্মিত হয় না। তাই নিজেও একটু রসিকতা করে বলে, "তুমিও কী রূপ দেইখ্যা ভুলতি শিখলা নাকি?"

বাদলের বৌ উত্তর দেয়, "না ভুইল্যা কী করি—কত বড় বড় নোকই ভোলে আমিত কোন ছাই—তোমার মত রূপ পাইলি দেখতা পুরষাগুলারে নাকে কানে দড়ি দিয়া ঘুরাইতাম।"—

"ক্যান একজনারে ঘুরাইয়া স্বাদ যায় না—!" রাই মুচকী হেসে জিজ্ঞাসা করে।

"ক্যাত আমার কতা হোনি—যদি মাইনষির মত মানুষ পাইতাম ঘুরাইতাম বৈ কী?" বাদলের বৌ আর এক প্যাঁচ লেপে বলে, "কাপড় দিবি, টাহা দিবি। গয়না দিবি।"—

রাই আর সহ্য করতে পারে না—নিজকে সংযত করেই বলে, "হ্যা, নাও তাড়াতাড়ি সাইরা নেও। আমি ওঘরটা লেইপ্যা ফেলি। ত্যামন সাধির মানুষ পাওত ঘুরাইও—"

বাদলের বৌ উত্তর দেয়, "মানুষ পাইলিত ঘুরাবো! তাইলে আর পোড়া কপাল কই ক্যান। আমাদের যে কাউর নজরে পড়ে না!"

বাদলের বৌর ছাপরার ডোয়া লেপা প্রায় শেষ হয়ে আসে। রাই কোন উত্তর না দিয়ে হাড়িটা নিতে যায়। সে বাধা দিয়ে বলে, "থাউক। রোজইত করো। কাইল শরীল খারাপ ছিল। আইজ আমিই ল্যাপবানি সব!" রাইকে লেপতে না দিয়েই সে হাড়িটা নিয়ে অন্য ঘরের দিকে যায়। ততক্ষণ পুরুষেরা সবাই উঠে গেছে।

দেবু কলকাতা যেয়ে রাইর কথা যে না ভেবেছে তা নয়। কয়েকজন পরিচিত ডাক্তারদের ও বলে রেখেছে রাইর কথা। তাদের বলেছে যে, ওদের গায়ের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নার্সিং শিখবার জন্য ঢুকিয়ে দিতে হবে। অনেকে আশ্বাসও দিয়েছে। কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য ওর পরিচিত একজন কাউনসিলারকেও অনুরোধ করেছে। কিন্তু সব কিছুই সময় সাপেক্ষ। আর এছাড়া কী কাজই বা রাই করতে পারে? সেলাইর কাজ একটু আধটু অবশ্য জানে। কিন্তু সহরে সে জানা কোন অর্থকরী কাজেই আসবে না। এক যদি পৃথকভাবে বাসা করে থাকা যেত—বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করে নয় ঘরে বসে সেলাই করতে পারতো। কিন্তু তা সুনন্দা কলকাতা থাকলেই সম্ভব হতো। নইলে দেবু অতটা ঝুকির ভিতর যেতে রাজী নয়। সে যেতে পারে না। সাধারণ মানুষের চেয়ে সে পৃথক নয়। মানুষের মনের বিভিন্ন দুর্বলতাও যে তার ভিতর না আছে তা নয়। তবে সে দুর্বলতা সম্পর্কে দেবু সচেতন। নিজের দুর্বলতা নিজের কাছে গোপন নেই বলেই দেবু সতর্ক হয়ে চলে। যেখানে তার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেকাজ সে কোন সময়েই করতে যায় না। বন্ধু বান্ধবও ওকে এ নিয়ে ভীরু বলে ঠাট্টা তামাসা করে। অনেক মহৎ কাজ—যা করবার জন্য তারা ঝাপিয়ে পড়ে—নিন্দা বা গ্লানির দিকে ফিরে চায় না। কাজটাকেই বড় করে দেখে। দেবু সে সব কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিতে পারে না। ছোট বেলা যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ও ছুটে চলতো, বড় হবার সংগে সংগে তা যে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে! আগে পূর্বাপর কিছু চিন্তা না করেই ছুটে চলতো—এখন এক পা বাড়াতে গিয়ে আগে ভেবে দেখে—কী কী বাধা ওর পথে ওত পেতে আছে। নিজের বিচারে যদি মনে করে সে বাধা ডিঙ্গিয়ে যাবার ওর শক্তি আছে তবেই পা বাড়ায়। নইলে পিছু হাটতে একটুও লজ্জা বোধ করে না। তাই ওর গতি হয়ত মন্থর কিন্তু জয় সুনিশ্চিত।

বাড়ী থেকে কলকাতা ফিরেই দেবু প্রথমেই সরকারের অনুমতি নিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পুণ্য ঠাকুরের মেজভাই ওর অপুদা অপূর্ব ভট্টাচার্যের সংগে দেখা করেছে। শিবশঙ্করই বলে দিয়েছিলেন গার্লস স্কুলের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অপূর্ব বাবুর পরামর্শ নিতে। গায়ের যাঁরা কলকাতায় রয়েছেন অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁদের সংগেও দেখা করতে হয়েছে। নিজের লেখা—টিউশনী তারপর চাকরীত আছেই। বৌদির কাছে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু রাইর বিষয় কিছু উল্লেখ করেনি—উল্লেখ করবার মত কিছু করে উঠতে পারেনি তাই। আজ

ডিউটি ছিল বিকেলে ফিরতে রাত দশটা হ'য়ে যায়। মেসের ঠিকাদার ভূপেন কতগুলি চিঠি এনে দিল। চিঠিগুলি বাছতে বাছতে সুনন্দার চিঠিটাই আগে খুলে পড়তে থাকে। পারিবারিক নানা সংবাদের ভিতর—রাইর কথাটা সুনন্দা বার বার লিখেছে। লিখেছে, "গা থেকে দূরে না গেলে মেজকর্ত্তা শান্ত হবেন না। এভাবে দিনের পর দিন মেয়েটা কী করে বাঁচবে। তারপর বাদলাও যোগ দিয়েছে তার সাথে। বাদলাকে সাহায্যও করে মাঝে মাঝে। তোমার দাদাকেও বলেছি। তিনি তোমাকে লিখতে বল্লেন। হলধর নিরুপায়। ও বুড়োটারই হয়েছে সবচেয়ে বেশী জ্বালা। বলতেও পারে না— সইতেও পারে না। সোজা মানুষ।"

আভাষে যতটুকু বোঝা গেল তাতেই দেবু চিন্তিত হ'য়ে উঠলো। মেজকর্ত্তা কীভাবে জাল পেতেছেন তাত সে নিজের চোখেই দেখে এসেছে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বৌদিকে চিঠি লিখে রাখলো—। ও লিখলো, "রাইর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছি। আশা করি শীঘ্রই কিছু ব্যাবস্থা করা যাবে।" এবং যে ভাবে যাকে ধরেছে বিস্তারিত ভাবে তাও জানিয়ে দিল।

দেবুর স্বভাবের মস্ত বড় দোষ, কোন সমস্যা দেখা দিলে যেমনি তখুনি খুব অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তা সমাধানের জন্য যেমনি উপায় খুঁজে বেড়ায় আবার যদি কেউ সে সমস্যার কথা সবসময় তুলে ধরে ওকে তাতিয়ে না রাখে তাহলে আবার সহজেই শৈথিল্য এসে দেখা দেয়। রাইর ব্যাপারেও তাই। বৌদির চিঠি পেয়ে খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল। তার পরদিনই আবার কয়েকজনের কাছে যেয়ে ধরাধরি করলো। তারপর কয়েকদিন আবার চুপ। টিউশনী করছে—চাকরী কচ্ছে—লিখে যাচ্ছে—আড্ডা দিচ্ছে—আর গার্লস্কুলের টাকা তুলছে। গার্লস্কুলে তাত বসালে কেমন হয় এসব পরিকল্পনা নিয়েও অনেকের সংগে পরামর্শ কচ্ছে। বাকী সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে পড়াশুনায়।

ওদিকে অবস্থা যেন দিন দিনই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে। মেজকর্ত্তার অযাচিত করুণায় হলধরের যে সন্দেহ না জেগেছে তা নয়—লোকেও মাঝে মাঝে কাণা ঘুষা কচ্ছে। অথচ হলধর নিরুপায়—ছেলেকে কোন কথা বলতে গেলে পৃথক হবার ভয় দেখায়। পুত্রবধূ টিপ্পনী কেটে বলে, "অন্যের দুষটাই ছাখলা। মাইয়ার দুষ কী আর চোখে নাগে। এক কাঠিতে তালি বাজে না।" হলধর দমে যায়। তবে কী রাইও! আর কীইবা করবে—তার নিজের জন্যইত ওর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে ভাবে মেয়েকেই সতর্ক করিয়ে দেবে। কিন্তু ওর চোখে রাইরও কোন দোষ পড়ে না। বাপ হ'য়ে মেয়েকে অন্যায় সন্দেহই বা সে কী করে করবে—না-একথা সে রাইকে বলবে না—বলতে পারে না। কীর্ত্তনের আসরই কী তাহলে বন্ধ করে দেবে? তাই বা হয় কী করে—ঠাকুর দেবতার ব্যাপার! শেষকালে কিসে কী হবে। তাছাড়া মেজকর্ত্তা রেগে গেলে হলধরকেত ভিটে বাড়ী থেকে উচ্ছন্ন করে ছাড়বেন! শিবশঙ্করকেই একদিন গোপনে বলে। বলে, "আমিত ভাইবা কিছু ঠাহর করতে পারি না। মাইজাকর্ত্তার ভাবগতিক যেন ক্যামন ধারা নাগে। বয়স্থা মাইয়াডারে নিয়াই বিপতে পড়ছি।"

শিবশঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলেন, "নিজেই প্রথম থেকে ভুল করেছো--এখন আপশোষ করলে কী হবে। সেরকম বাড়াবাড়ি কিছু দেখলে আমায় আগে থেকে জানিও।" একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করেন, "ওকে কলকাতায় পাঠাতে ত তোমার আপত্তি নেই? দেবুকে বড়বৌ সব জানিয়েছে, তোমার অমত না থাকলে সেই ব্যবস্থা করবে।"

হলধর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। সোল্লাসে বলে, "আমার অমত থাকবি ক্যান? আপনারা যা ভাল বুইঝবেন তাই কইরবন, তবে আমার, টাহা পয়সা —"বলেই হলধর থেমে যায়।

শিবশঙ্কর বাধা দিয়ে বলেন, "সে তোমার ভাবতে হবে না যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।" হলধর অনেকটা আশ্বস্ত হয়। যতক্ষণ কীর্ত্তনের আসর চলতে থাকে রাই বড় ঘরেই থাকে। আসর ভেংগে যাবার পর ছাপরায় যেয়ে শোয়। কোনদিন বাপ-মায়ের সংগে বসে রাই জাল বোনে—কোনদিন কেরোসিনের কুপির কাছে ঝুঁকে পড়ে সুনন্দার
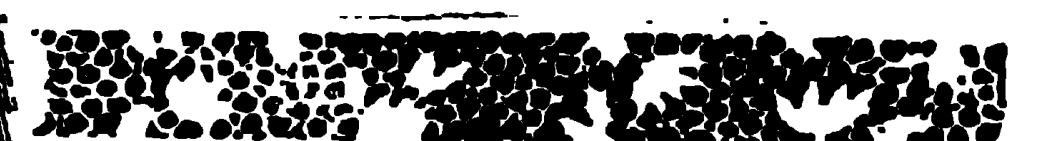
কাছ থেকে নিয়ে আসা বই পড়ে। কোন কোনদিন আবার সেলাই নিয়েও কাটায়।

মেজকত্তা এর আগে মাঝে মাঝে থানা সহর ভাঙ্গাতে যেয়ে একটা বারবনিতার কাছে রাত কাটিয়ে আসতেন। বল্লভপুরের পাশের গা কুবোরদিয়াতেও একটা বিধবা বৌ অনেকদিন থেকেই মেজকত্তার আশ্রিতা ছিল। কীর্ত্তন আসর বসবার পর মেজকত্তার যেন সেদিকে একটু ভাটা পড়েছে। রাই-কীর্ত্তন করতে করতে সত্যি সত্যিই তিনি একনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছেন! কিন্তু তার এই নিষ্ঠাকে আর যেন বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না। দিন দিন যেমনি হতাশও হ'য়ে পড়ছেন—ধৈর্যের বাঁধটাও শিথিল হয়ে আসছে। কীর্ত্তনের আসরও নিয়মিত বসছে না। সহজ ভাবে রাইকে লাভ করা যাবে না এটা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সাধারণ জেলের মেয়েদের চেয়ে রাই অন্য ধাঁচে গড়া—উপঢৌকন দিয়ে তাকে ফুসলিয়ে কাজ হাসিল করা যাবে না এটা মেজকত্তা বেশ বুঝতে পেরেছেন। অযথা অনেকগুলি টাকাও যেমনি জলের মত খরচ হ'লো—সময়ও গেল কয়েক মাস। রাগ হয় মোহনের ওপর। ওব্যাটাইত এই ফিকির এঁটেছিল। ওইত কাপড়ের টুকরো আগের দিন রাত্রে রেখে এসেছিল হলধরের তমাল গাছে। কাছারীর লোকজন অনেকক্ষণ চলে গেছে। মেজকত্তা গুম হ'য়ে বসে আছেন কাছারীতে। হ্যারিকেনের আলোটা টিপ টিপ করে জলছে। অবনী ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী গেছে। কীর্ত্তনের আসর আজ আর বসবে না। মোহন তাই একটু দেরী করে এসেছে। মেজকত্তাকে নিয়ে কেবল একবার আড্ডাটা ঘুরে আসবে। দরজার কাছ থেকে "যাবেন না—চলেন।"—বলেই ঘরে ঢুকে মেজকত্তার মূর্তি দেখে মোহনের আত্মারাম খাচা হবার যোগাড়! একটু দূরে দাঁড়িয়ে গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "মাইজাকত্তা শরীল খারাপ নাকি?"

মেজকত্তা এক দাবড়ি দিয়ে ওঠেন, "নে আর জ্যাঠামি করতে হবে না। বয়।" মোহন দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, "আমি কি বইল্লাম।"

"তোর জন্যইত সব। তোর বুদ্ধি শুনেইত এই অবস্থা! বেটা কুষ্মাণ্ড!"

মোহন এবার বুঝতে পারে। টুলটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। বলে, "থাকেন মাইজাকত্তা, অত তাড়াতাড়ি আইল ছাড়বেন না। আমার নাম মোনা, আপনার শীরিচরনের দোয়ায় না পারি কী! এই বাস্তভিটার পর বইস্যা কইতেছি—ওই পুঁইচক্যা ছেড়িরে যদি না বাগাইতে পারি—আপনার পায়ের দশ জুতা খাবো।" মোহন বেশ উত্তেজিত হ'য়েই ওঠে। মনে হয় মেজকত্তা ওর এই উত্তেজনায় একটু খুশীই হ'য়েছেন। একটু মোলায়েম সুরে বলেন, "আচ্ছা আচ্ছা বোঝা যাবে। নে ঠাণ্ডা হয়ে বোস। কথা আছে। অত লাফাসনে।" মোহন জড়সড় হ'য়ে বসে। মেজকত্তা বলেন, "কাল সকালে তুই আসফরদি যাবি। নাসিরুদ্দিনকে খবর দিবি। দু'এক দিনের ভিতরই যেন আমার সংগে দেখা করে।" নাসিরুদ্দিনকে তলব করবার কথায় সমস্ত বিষয়টা মোহন অনুমান করে নিতে পেরেছে। নাসিরুদ্দিনকে চাটুজ্যে বাড়ীতে তলপ পড়ে তখনই, যখন কোন জমি জমা নিয়ে কারো সংগে বিবাদ দেখা দেয়। শক্তি প্রয়োগে যেখানে প্রতিপক্ষকে বশে আনতে হয় তখনই নাসিরুদ্দিনের ডাক পড়ে। চাটুজ্যেবাড়ীর দৌলতে দু'তিন বার তাকে শ্রীঘরও ঘুরে আসতে হয়েছে—তখন অবশ্য তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্ব চাটুজ্যেরাই গ্রহণ করেছে। মেয়ে ঘটিত ব্যাপারেও নাসিরুদ্দিন দু'একবার হাত ছাপাইর পরিচয় দিয়ে চাটুজ্যে বাড়ীর কত্তাদের কাছে নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। নাসিরুদ্দিনের বাবাও মেজকত্তাদের তাবেদারের লোক ছিল। দু'হাতে সড়কী ছুড়তো সে। মেজকত্তাদের পক্ষ হ'য়ে এক কাইজ্যা লড়তে যেয়ে সে হত হয়। সেই থেকে মেজকত্তারাই বল্লভপুর থেকে কিছুটা দূরে আসফরদি গাঁয়ে ওদের ভিটেয় নাসিরুদ্দিনকে ঘরবাড়ী তুলে দিয়েছেন—কয়েক বিঘে চাষের জমি স্বত্বত্যাগ করে লিখেও দিয়েছেন। নাসিরুদ্দিনও তাই বাপের মতই মেজকত্তাদের অনুগত। নাসিরুদ্দিনের বয়স বছর পয়ত্রিশ। নাসিরুদ্দিনের কালো
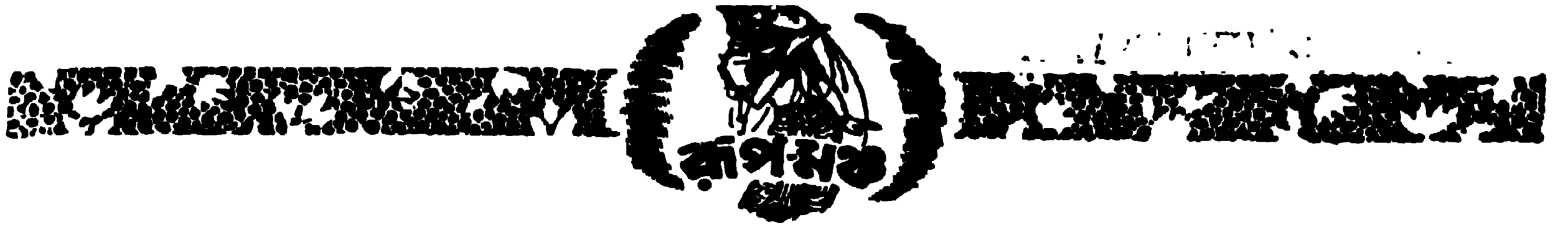
নিটোল দেহের কোন স্থানে কোন খুঁত নেই। ও যখন হেটে চলে—ওর গায়ের পেশীগুলি যেন চলার গতির সংগে নাচতে থাকে। মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমতা আমতা করে বলে, "একবার ভাইবা দেখলি পারতেন না—কাজটা কী ভাল অবে শেষে··· ··"

মেজকর্ত্তা ধমকে ওঠেন, "তুই থাম। যা বল্লাম তাই করবি। তোর বুদ্ধিত শুনলাম এতদিন—এবার আমার বুদ্ধিতে কাজ কর। আর খবদ্দার ঘুণাক্ষরে যেন কিছু প্রকাশ না পায়।" মোহন বিনীতভাবে বলে, "সে আপনি যা করবেন তারপর কথা কী। কী যে বলেন কেউ জানতি পারবি না। মাইজ্যা কর্ত্তা—" কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে, "মাইজ্যা-কর্ত্তা—" মেজকর্ত্তা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করেন "কী?" মোহন বলে, "কাইল হাটবার। ঘরের চাল দিয়া জল পইড়া ভাইস্যা যাইতেছে। কিছু ছোন কিনতে অবে! কয়টা –"

মেজকর্ত্তা আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা—কাল ঘুরে আয়ত। হাটের সময় নিয়ে নিবি।" মোহন নিশ্চিন্ত হ'য়ে অন্য কথা পাড়ে, "এক কলকী সাজবো নাকি।"

"সাজ। শরীরটাও একটু ম্যাজম্যাজ করছে। এখানেই নিয়ে আয়—" মেজকর্ত্তা তয়কাটা মাথায় ঠেকিয়ে শুয়ে পড়েন। মোহন কলকে সাজতে যায়।

মেজকর্ত্তা তার রূপ সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছেন। কয়েক-দিনের ভিতরই মেজকর্ত্তার আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। সব সময় ভাবালু। যেন কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা! এর মাঝেই অনেকে বলাবলি করছে—ঐ কীর্তনের ভিতর দিয়েই ওর পশু প্রবৃত্তিগুলি হয়ত নষ্ট হ'য়ে যাবে। হলধরও লক্ষ্য করেছে। আজকাল আর কীর্তন আসর ভাঙ্গার পর মেজকর্ত্তা অপেক্ষা করেন না বা তাদের পেসাদ সেবনের আড্ডাও বসে না হলধরের বাড়ীতে। বাদলা মাঝে মাঝে হলধর ও রাইর সামনে বলে, "মাইজাকর্ত্তার ভাবান্তর অইছে। বড় তামুকও খাওয়া ছাড়ছে।" হলধর মনে মনে স্বীকার করে নেয়। কারোর দিক মুখ তুলে মেজকর্ত্তা কথা কন না। রাইর দিকেও কটাক্ষ হানার কোন দৃশ্য কারো চোখে পড়েনি কয়েকদিন। মেজকর্ত্তার সাম্প্রতিক চালচলনে হলধরেরও ভয় অনেকটা কমেছে। মনে মনে আশ্বস্ত হয়, "না—ও লোকগুলো হিংসায় অকথা কুকথা উঠাইছিলো।" মেজকর্ত্তার এই পরিবর্ত্তন রাইর চোখেও পড়ে। আগে রাইকে দেখবার জন্য তার চোখ হলধরের আনাচি কানাচি ঘুরে বেড়াতো—আজকাল রাই যদি সামনেও পড়ে মেজকর্ত্তা চোখ নামিয়ে নেন। তার চোখের দৃষ্টি পালটে গেছে। পুরুষের চোখের দৃষ্টি বিচার করবার ক্ষমতা মেয়েদের অদ্ভুত এবং স্বভাবজাত। রাইও সে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিতা নয়। মেজ-কর্ত্তার পরিবর্তনে ওরও কিছুটা ভয় কমেছে। সুনন্দাকে বলে, "না বৌদি, মাইজাকর্ত্তার ভাব সাব আইজকাল যেন ভালই ঠ্যাহে।"

সুনন্দা মুচকী হেসে বলে, "মজে গেলি নাকিরে! তাহলেত মেজকর্ত্তার রাই সাধনা সার্থক হয়েছে।"

"যাও কী যে বলো।" রাই উত্তর দেয়।

মেজকর্ত্তা সেদিন একজোড়া কাপড় এনে হলধরের হাতে তুলে দিয়ে বলেন,"নাও, মেয়ে বৌকে দিও। মান খোয়া যাবে না!" হলধর বলে ওঠে, "কী যে বলেন, তার ঠিক নাই। আপনাগো খাইয়াই তো আছি।" মেজকর্ত্তা আর দাঁড়ান না। চলে যান। যাবার সময় বলে যান, "তোমার ছেলে আসরের বেশ জুরিদার হ'য়েছে। বলছিলো বোন আর বৌকে কাপড় কিনে দিতে পারেনি—তাই আমাদের বাড়ীর কাপড়ও এলো—সেই সংগে ওদের জন্যও আনলাম।"

রাই ঘরের ভিতর থেকে সব শোনে। মেজকর্ত্তা চলে গেলে হলধর মেয়েকে ডেকে বলে, "ও রাই, নিয়া যা কাপড়গুলা—ভাল মনেই দেছে। তোরা লোকটারে শুধাশুধি দুষিস।" রাই কোন জবাব না দিয়ে কাপড় দু'খানা ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন রাই নতুন কাপড় খানাই পরে। কাপড় একদম ছিলই না। আর এবার আর ওর তেমন অমত হয়নি কাপড় পরতে। সুনন্দা দেখেই জিজ্ঞাসা করে, "কীরে রাই, তা'হলে বাদল কাপড় কিনে দিয়েছে।"

রাই কাপড়ের খোটটা হাতাতে হাতাতে উত্তর দেয়, "না, মাইজাকর্ত্তাদের দলের কাছে দাদার যে টাহা পাওনা ছিল—টাহা না দিয়া মাইজাকর্ত্তা কাপড় দিয়া গেছে।"

"তাহলে অনুমান ঠিক বল?"
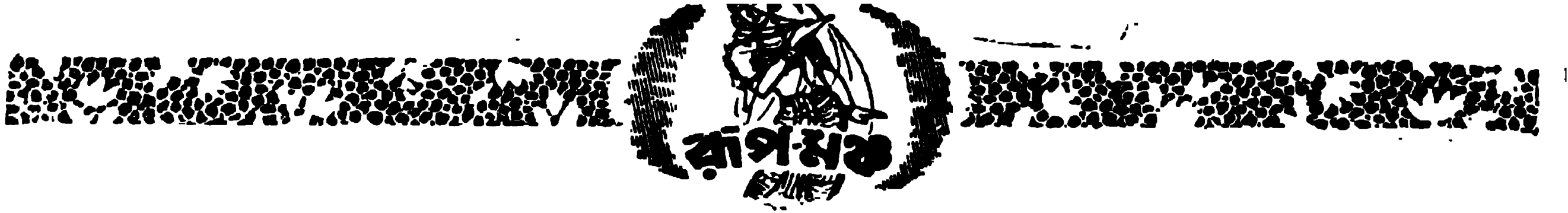
"কী" রাই জিজ্ঞাসা করে।

"মেজকর্ত্তারই শেষ অবধি জয় হ'লো?" সুনন্দা থেমে যায়। রাই যেন ছিটকে পড়ে অভিমানে, "বৌদি, শেষকালে তুমিও আমারে কথা শুনাইবা। তুমিত জান কাপড় একখানাও ছিলনা। নইলে ন্যাংটা অইয়া থাকতি হইত।" সুনন্দা আবার সান্ত্বনার সুরে বলে, "আরে না না, একটু ক্ষ্যাপালুম। তবে দুষ্টুলোকের কখন কী মনের ভাব বোঝা দায়—তাই সাবধানে থাকাই ভাল।"

রাই বাড়ী চলে আসে। মেজকর্ত্তার দেওয়া কাপড় পরাতে সুনন্দা যে খুশী হয়নি তা ও বেশ বুঝতে পাবে। কিন্তু ও করবেই বা কি। ভাইও কাপড় এনে দেবেনা—আর ইদানীং মেজকর্ত্তার কোন কুভাবেরও ও পরিচয় পায় নি।

কার্তিকপুজার রাত। প্রত্যেক হিন্দুবাড়ীতেই এ অঞ্চলে কার্তিক পুজো হয়। জেলেরা দেবসেনাপতির ভয়ানক ভক্ত। প্রত্যেক জেলে বাড়ীতে কার্তিক পুজা হয়—জেলেদের বাড়ী পুজা করবার জন্য ভিন্ন পুরোহিত আসে। পুজোর দুদিন আগেই পুরুত ঠাকুর এসে গেছেন। এ অঞ্চলে সব জেলেরাই তার যজমান। প্রতি বছর কার্তিক পুজোর রাত্রে জেলেরা মিলে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী মুখোস পরে সং দিয়ে বেড়ায়। এই সং-এ কালীর মুখোস—রাজার মুখোস—রাণীর মুখোস—বাঘের মুখোস প্রভৃতি খুব আকর্ষণীয় হয়। বাঘ-মহিষের যুদ্ধ—নয়ান ভানু সং প্রভৃতি দৃশ্যগুলি খুবই প্রশংসা পায়। কালীর মুখোস পরে যাকে কালী সাজতে হয় এর ভেতর তাকেই কষ্ট স্বীকার করতে হয় বেশী। কারণ কালীর মুখোসটা এমনি ভাবে গড়া যে, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযুক্ত ছেদা থাকে না। আর কালীর মুখোস ছেলে ছোকরাকে দেওয়া হয়না। বরাবর হলধরকেই কালী সাজতে হয়। কার্তিকপুজো হ'য়ে যাবার পর এরা যেয়ে প্রসন্ন মাঝির বাড়ীতে জড়ো হ'য়েছে—সেখান থেকেই প্রতি বছর দল বেরোয়। মোহন কোন কিছু না সাজলেও দলের সংগে সংগে থাকে। প্রত্যেক জেলেকেই থাকতে হয়। বাদল ও তার অন্যান্য ভাইয়েরা সবাই যেয়ে হাজির হয়েছে। হলধরও গেছে। রায় বাড়ীতে প্রথম সং দেখিয়ে পাড়ার অন্যান্য বাড়ীতে তবে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। রায়দের বাড়ী সং দেখাবার সময় হলধরের বাড়ীর সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে। কেবল জেলে বৌ বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। হলধর কালীর মুখোস পরে যখন এলো - সকলেইত খুব হাততালি কেউ কাপড়—কেউ জামা ছুড়ে ফেলে দিল। এই নিয়ম। কালীমা ভিক্ষা করতে বেড়িয়েছে তাই পেলা কালীর সাজের সময়ই দিতে হয়। চিরাচরিতভাবে এই বিশ্বাস অনুযায়ী পেলা দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্যবার হলধর যতক্ষণ খাড়া নিয়ে কেরামতি দেখায় এবার আর ততক্ষণ পারলো না। দু'একবার কালীর নাচ দেখিয়েই হাপিয়ে পড়লো—অস্থির হ'য়ে বসে পড়লো। তাড়াতাড়ি সকলে ধরে নিয়ে যায়। উদ্বিগ্ন হ'য়ে শিবশঙ্করও ছুটে যান ওদের ঘরের আড়ালে। সেখান থেকেই মুখোস পরে ওরা সব আসছিল। যেয়ে বলেন, "কেন ও বুড়ো মানুষটাকে কালী সাজতে দাও।" হলধর তখন একটু সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। শিবশঙ্করকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আপনি আবার আইছেন ক্যান। ও মুখোসটা বাধা ঠিক হইছিল না - রগের পর পড়ছিল—তাই মাথা ঘুইর‍্যা গেল।"

শিবশঙ্কর বলেন, "থাকনা আর কেউ কালীর মুখা নেবেখন। তুমি সংগে সংগে নয় থাকো।"

হলধর তা শুনলো না। বল্ল, "ঠিক অইয়া গ্যাছে—আমিই পারবানি।" একটু জিরিয়ে হলধর আবার কালী হ'য়ে ঘুরে গেল। কারণ তার দর্শকেরা পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি। রায়বাড়ী থেকে সং চলে যাবার পর রাই ও বাদলের বৌয়েরা ওদের বাড়ী ফিরে আসে। বাদলের বৌ তার ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়লো। রাইও ঘরে ঢুকে অন্ধকারের ভিতরই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ওর যেন আজ বড় ভয় ভয় করছে। মাচাঙের নীচটা দেখেও নেয়নি ভাল করে। একবার ভাবল মার কাছে যেয়েই শোবে। কারণ ওর পিসতাত ভাইটাও সং-এর সংগে সংগে গেছে। কিছুতেই থাকতে চাইল না। আবার ভাবল, সারাদিন উপোসের পর মা ঘুমিয়েছে আবার ডাকাডাকি করবে! আস্তে আস্তে ভয়জড়িত কণ্ঠে ডাক দিল, "বৌ, বৌ—

ও বৌ।" কিন্তু বৌ'রও কোন সাড়া নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে। ততক্ষণ গায়ের লোম ওর খাড়া হ'য়ে উঠেছে। যেন মনে হচ্ছে ঘরের ভিতর চোর ঠোর কিছু ঢুকেছে। কিন্তু মাচাঙ্গের পর থেকে ওর এক পা নামতেও ভয় করছে। ও দুর্গা নাম জপতে লাগলো। খুট করে একটা শব্দ হয় বাইরে—ওর বুকের ভিতরটা দুম করে ওঠে। অনেক সময় নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও যেন ওকে চমকিয়ে তোলে। ও খুব দ্রুত দুর্গানাম জপে চলেছে। একটুকুও থামে না। সারাদিন কাজকর্মের ভিতর দিয়ে কেটেছে। রাতও হ'য়েছে অনেক, দুর্গানাম জপতে জপতেই ঘুমিয়ে পড়লো। বিভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে রাই। ওঘর থেকে বাদলের বৌ—এঘর থেকে রাইর নাকডাকার শব্দে বেশ বোঝা যাচ্ছে কত আরামে—কত নিশ্চিন্তে ওরা ঘুমোচ্ছে। ঘুম না জানি সত্যিই কী যাদু জানে! ঘুমের কোলে ভয় থাকেনা—দুঃখ থাকেনা—অভাব অভিযোগ কোন কিছুই পীড়া দেয় না। বরং সামান্য ভিখারীকেও ক্ষণিকের জন্য স্বপ্নের জাল বুনে ঘুম রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। একটু আগেও যে রাইর ভয়ে দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল—এখন কোথায় গেল তার সে ভয়—সে শঙ্কা—কেমন নিভযে, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে!

কিছুক্ষণ বাদে রাই যে ঘরে শুয়েছে তার পিছন দিককার বেড়ায় টুক করে একটা শব্দ হ'লো। একটু থেমে আবার একটা—আবার একটা। ভিতর থেকে খুট করে একটা প্রতিশব্দ উত্তর দিয়ে দরজাটা খুলে দিলে। বাইরের লোকটা ভিতরে প্রবেশ করলো। কয়েকমিনিটের মধ্যেই কাজ হাসিল করে দরজাটা তেমনিভাবে ভেজিয়ে—বিলের ঘাটে বাধা হলধরদের ছোট ডিঙ্গিটায় যেয়ে উঠলো। রাই যখন জাগলো—কিছু দেখতেও পারলো না—বলতেও পারলো না। তার চোখ বাঁধা—মুখ বাঁধা। বুঝলো, দুজন লোক তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে নৌকোয় তুলছে—তাদেরই ডিঙ্গি নৌকোটায়। একজন তাকে ধরে বসেছে আর একজন ঝালাডাঙ্গার বিলের ভিতর দিয়ে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে ছুটছে। ওরাও নির্বাক। কিছুটা দুরে বিলের ওপারে—বগিপাটের জমির ধারে আর একখানি নৌকো অপেক্ষা করছিল—ওরা রাইকে নিয়ে তাতে তুললো।

রাইর কানে ভেসে এলো—ওরা বলছে, "নৌহাটারে ঠ্যালা মাইরা বাড়াইয়া দে: ও গরীব দুঃখীর নৌহাটারে নিয়া লাভ কী।" এদের কণ্ঠস্বরও রাইর চেনা বলে মনে হ'লো না।

ঘণ্টা খানেক বাদে রাইর চোখের ও মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'লো। দুটী লোক দুই গলইতে নৌকো বাইছে। একজন শক্ত করে ওকে ধরে বসেছে। এত শক্ত করে ওকে ধরেছে, ওর হাতের হাড়গুলো গুড়িয়ে যাবার উপক্রম। নিস্তব্ধ রাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় শুধু জিজ্ঞাসা করলো, "আমারে কোথায় নিতেছো?—কী ক্ষতি করছি তোমাগো।" লোকটী উত্তর দিল, "কতা কইও না। চেঁচাইও না। চেঁচাইলেও কিছু অবে না—দ্যাখতেছোতো মাঠ আর বিল। যেখানে নিয়া যাবো কেবল সেখানে যাবা। সব জানতি পারবা।"

রাই নৌকোর ছইয়ের ফাঁকা দিয়ে আধো জ্যোৎস্না আধো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো—ধু ধু করে বিল আর মাঠ। কাঁদবার মত চোখে জলও ওর আসছে না। স্তব্ধ মূঢ়ের মত ভবিতব্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। রাতের অন্ধকারের চেয়েও ওর ভবিষ্যত গাঢ় তমসার রূপ নিয়ে ভেসে ওঠলো। কাল সকাল হবার সংগে সংগে সারা গ্রামে রটে যাবে ওর কথা। প্রকৃত ঘটনা কেউ জানবে না—কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেনা। চিরদিনের জন্য কলঙ্কের ছাপ দিয়ে বল্লভপুর গায়ে ওর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে রাখবে। দুই হাটুর ভিতর মুখ গুজে রইলো—যত ভাবে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে—শুধু উষ্ণ চোখের জল। বাঁ দিকে একটা বাঁকের কাছে এসে নৌকো থামলো। যে লোকটী ওকে ধরেছিল বলে উঠলো, "আইসো—নামতি অবে।" রাই ওকে অনুসরণ করে পাড়ে নামলো। ওর একখানি হাত লোকটী ধরে রেখেছে। লোকটী এক হাত দিয়ে ট্যাক থেকে কয়েকখানা নোট বের

করে নৌকোর একজনকে দিয়ে বল্লো, "নে রাতারাতি নাও বাইয়া কুসুমপুরের ঘাটে চলি যা।"

কুসুমপুরের নাম রাই জানে। কুসুমপুর একটী বন্দর। বল্লভপুর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। ওদের নৌকো ছাড়া অবধি অপেক্ষা না করেই লোকটা রাইর হাতে এক ঝাকুনি দিয়ে বল্ল, "আইসো ঠাইরেণ, কাপড় উঠাইয়া চইলো। জলকাদার রাস্তা।" হেমন্তের কর্দমাক্ত রাস্তা ভেঙ্গে রাই লোকটার সংগে সংগে চলতে লাগলো। একবারও যদি ছুট পায় খালের জলেই ঝাপ দিয়ে ওর বীভৎস পরিণামের পরিসমাপ্তি করে দেবে। কিন্তু লোকটী তখনও বজ্রমুষ্টিতে ওর ছোট কোমল হাতখানি ধরে। সেখান থেকে ছুটে যাবার শক্তি কী ও পাবে না! (চলবে)

ভারতীয় চলচ্চিত্রে শিল্পের উন্নতি ?

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

কথা না বলিয়া পারিলাম না। জন সাধারণের মধ্যে অনেককে নতুন অভিনেতার আবির্ভাবের জন্য অনেক সময় অনুযোগও করিতে শোনা যায়। কিন্তু পরিচালকের ব্যক্তিগত মতের যদি কেহ খবর রাখেন' কোন পরিচালকের পুরাতনের প্রতি মোহ নাই। যখনই তারা নতুনের অনুসন্ধান করিতেছেন --কিন্তু পাইতেছেন না। কথাটায় হয়ত জন সাধারণের পক্ষ হইতে আপত্তি আসিতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি, কোন ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মহিলা, এ লাইনকে এখনও মর্যদার চোখে দেখিতে পারিতেছেন না। কচিৎ দু'একজন যদি বা আবির্ভূ'তা হন, Camera Lence ও Mike র অপ্রতিহত ক্ষমতাকে পরাভূত করিয়া Set অবধি যাইতে সমর্থ হন না।

অপর দিক দিয়া যুবকদের মধ্যে খুবই সাড়া পাওয়া যাইতেছে সত্য। পর্দার গায়ে ছবি দিতে ইহাদের আগ্রহ বেশ দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চাক্ষুষ দর্শক হিসাবে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়া ইহাদের শতকরা নিরানব্বই জনেরই যে পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই কঠিন সত্যকে উল্লেখ করিয়া বিপদের মধ্যে পড়িতে ইচ্ছুক নহি। আমাদের দেশের পরিচালকদের দুর্ভাগ্য। ইহারা শুধু সব দিক দিয়া প্রত্যেকের অনুযোগ ভাজনই হন। জনসাধারণ হয়ত ভুলিয়া যাইতেছেন অভিনয় একটি শ্রেষ্ঠ আর্ট। প্রকৃত অভিনেতার ভগবান প্রদত্ত কিছু অনুগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া যাহার ভিতর শিল্প-কৌশল জ্ঞান নাই সে কোনদিন শ্রেষ্ঠাংগের কোন শ্রেণীর অভিনেতা হইতে পারিবে না।

পরিচালক পাখী পড়া করিয়া তার নিজের কাজ চলন-সই ভাবে করিয়া নিতে পারেন কিন্তু তাহাতে ফল কোন পক্ষেরই বিশেষ কিছু হয় না।

আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতাগণও অভিনয়ের দিক থেকে ক্রমশঃ অবনতির পথে যেন নামিয়া যাইতেছেন। পুরাতন অভিনেতাগণ যে উচ্চাংগের অভিনয় করিতে পরেন না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবুও ইহাদের অবনতির মূলে ইহাদের একসংগে অনেকগুলি চিত্রে কাজ করার লিপ্সা। একদিনে পর্যায়ক্রমে ৩ খানি চিত্রে কাজ করিয়া করিয়া কোনরূপ ভাল বস্তু তাহাদের কাছে প্রত্যাশা করাও বাতুলতা। কলা হিসাবে অভিনয়ের মূল্য যথেষ্ট। তাই তার বাস্তবরূপ দিতে হইলে শিল্পীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হইবে। চিত্রের অন্যান্য কর্মিসংঘের বিরুদ্ধেও আমাদের ঐ একই অভিযোগ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কতকাংশে আমাদের দেশের প্রযোজকবৃন্দই দায়ী। চিত্রের অভিনেতা ও বিভিন্ন কর্মিসংঘের প্রতি যদি তারা একটুখানি উদার মতাবলম্বী হইয়া তাহাদের অবসর দেন, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

মোটামুটি বলিতে গেলে আমাদের দেশের চিত্রের উন্নতি কোন দিক দিয়াই চোখে পড়ে না। ইহার কারণ বা বাধা হইতেছে, আমাদের চলচ্চিত্রের কর্মিসংঘ একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছেন। তাহাদের গতিবিধি কার্যকলাপের তারা যেন একটা সীমারেখা টানিয়া নিয়াছেন। যতদিন ইহারা সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বাহিরে না আসিবেন—চিত্রের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

সম্পাদকের দপ্তর
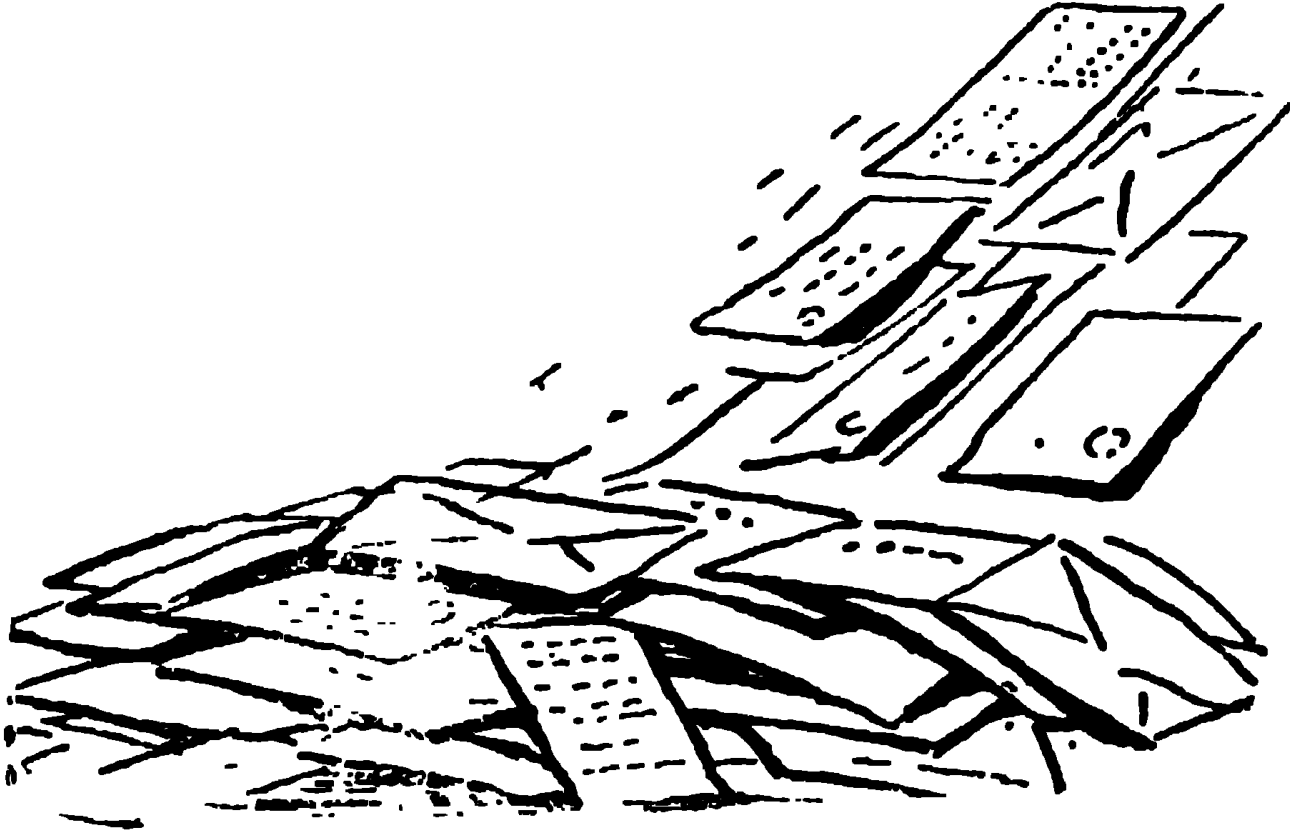
অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (হিন্দুস্থান পার্ক কলিকাতা)

রূপ-মঞ্চে ধারাবাহিক ভাব প্রকাশিত আপনার 'রাই' আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের বাড়ী পূর্ববঙ্গের দিকে। সহরে থেকে থেকে গ্রামকে ভুলে যেতে বসেছি। আপনার 'রাই' গ্রামের যে ছবি তুলে ধরেছে, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা 'রাই'কে কি পর্দায় রূপায়িত করে তোলা যায় না? আমাদের ত মনে হয় এথেকে একখানি নিখুঁত গ্রাম্য ছবি হতে পারে।

●● রাই আপনাদের ভাল লাগছে—এজন্য আপনাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে 'রাই' সমাদর পেলেই আমার পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করবো। পূর্ববঙ্গের পটভূমিকাতেই রাইকে আমি রূপায়িত করে তুলছি। গ্রাম্য তথাকথিত জমিদারদের অত্যাচারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জীবন কী ভাবে বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে আমি তারই ছবি আঁকতে চেয়েছি এবং কী ভাবে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে তারও নির্দেশ দিতে চেষ্টা করবো। পূর্ণাংগ উপন্যাস লিখতে এই সবেমাত্র আমার হাতে খড়ি। ইতিপূর্বে রূপমঞ্চেই 'দ্বিধারা' নাম দিয়ে আমার প্রথম উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি কিন্তু কিছুদূর লিখে আমার নিজেরই মনে হলো—লেখাটা যেন ভাল হচ্ছে না—তাই বন্ধ করে দিলাম। বর্তমান উপন্যাস লিখতে আপনাদের মত আরো যাঁরা ভাল লেগেছে বলে জানিয়েছেন—তাঁদেরই প্রেরণায় আমি উৎসাহিত হয়েছি। ইতিমধ্যে রাই' দু'একজন পরিচালকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে বলেছিলেন, যাতে কাহিনীটী তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ না বুঝবো 'রাই' সকলের কাছে সমাদর পেয়েছে, ততক্ষণ অবধি চলচ্চিত্রের জন্য আমি তাকে অনুমোদন করতে পারবো না। তাই 'রাই'র ভিতর চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা থাকবে কিনা—রাই শেষ হলে আপনারাই বলতে পারবেন, আমি নই। আপনারা রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠী, রূপ-মঞ্চ মারফৎ যে গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে দিয়েছেন—নিজের স্বার্থের জন্যও কোন দিন তার মর্যাদা যাতে নষ্ট না করি সেইটেই আমার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য।

শ্যামাচরণ সাহা, অরুণকুমার সেন, বিমল কান্তি হাজরা ও রবীন্দ্রনাথ সুর (হুগলী)

সুনন্দা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, সুমিত্রা ও রেণুকা এদের পর পর সাজিয়ে দিন। ইহাদের মধ্যে কে কে নিজস্ব কণ্ঠে গেয়ে থাকেন জানাবেন।

●● সুনন্দা, সন্ধ্যা, সুমিত্রা, রেণুকা. সাবিত্রী। এদের কেউই নিজেরা গেয়ে থাকেন না।

সুখময় নাথ (শ্রীরামপুর, হুগলী)

সম্পাদকীয় আসরে শুধু কী গ্রাহকদেরই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না বাইরের প্রশ্নেরও উত্তর দেন ?

●●রূপ-মঞ্চের সমস্ত পাঠকগোষ্ঠীর প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়। গ্রাহক বা সাধারণ পাঠক বলে আমাদের পৃথক গোষ্ঠী নেই। রূপ-মঞ্চের প্রতি সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে।

সুশীলকুমার দে (শিবতলা লেন, ট্যাংরা)

●● যে সব ঠিকানা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয় বা যে সব বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান, তাদের কাছে আবেদন করবেন। এবিষয়ে আমাদের কিছু করবার নেই।

কালীপদ দাস (সুভাষচন্দ্র রোড, বাঁকুড়া)

শিল্পী হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছবি বিশ্বাসের ভিতর কে বড়—অহীন্দ্র বাবুকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন ?

●● দু'জনেই প্রতিভাবান শিল্পী। দু'জনের যুগ ঠিক এক নয়। অহীন্দ্র বাবু দীর্ঘদিন বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতে নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। আজ তাঁর বিদায় নেবার সময়। ছবি বিশ্বাস তাঁর বিদায়ক্ষণে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন—তাঁর ভবিষ্যত অহীন্দ্রবাবু চেয়ে প্রসস্ত। আজ তাঁকে জনপ্রিয় দেখেই অহীন্দ্র বাবুর সংগে তুলনা করা ঠিক হবে না। অহীন্দ্র বাবুকে এই সেদিনও ত রায় চৌধুরী চিত্রে দেখতে পেয়েছেন। আগামী অনেক চিত্রেই তাঁকে দেখতে পাবেন।

আবদুল খালেক (মণ্ডলগাতী, যশোহর)

(১) প্রতিমা, পরভৃতিকা, পথের দাবী কোনটাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন? (২) বড়ুয়া বর্তমান কোথায়?

●● (১) নিঃসন্দেহে 'পথের দাবী'কে। (২) বড়ুয়া বিলেত রওনা হয়ে গেছেন। আশা করি দৈনিক সংবাদপত্রে সে সংবাদ দেখেছেন।

সারদা প্রসাদ দাস (বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জি লেন, হাওড়া)

(১) মাতৃহারায় যে গোঁফওয়ালা লোকটিকে দেখেছিলাম তাঁকে আবার দেখলাম 'ঝড়ের পর'-এ। লোকটির নামকী? (২) 'বিবেকানন্দ' কে পরিচালনা করবেন?

●● (১) অমর চৌধুরী। (২) অমর মল্লিক।

অমর নাথ দত্ত (পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া)

বাংলা ছায়া ছবির কোন অভিনেতা অভিনেত্রী রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত আছেন কী?

●● কী ভাবে দু'টো কনট্রাক্ট বেশী পাওয়া যাবে সেই কার্যকলাপ এবং চিত্র জাগতিক রাজনীতি ছাড়া আর কোন কিছুর সংগেই তাঁরা যুক্ত নন।

সুনীলকুমার চৌধুরী (টেলিগ্রাফ ওয়ার্কসপ, জব্বলপুর)

কয়েকজন বন্ধুদের মধ্যে মতের গলমিল হচ্ছে এই নিয়ে যে, তাদের মতে 'সংগ্রাম' ছায়াচিত্রে সুব্রতের ভূমিকায় কমল মিত্র অভিনয় করেছেন। আমার মত—সুব্রতের ভূমিকায় বিপিন মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। কোনটা ঠিক।

●● আপনার মতই ঠিক।

রমা বসু (কাঁথি, মেদিনীপুর)

(১) চন্দ্রশেখরের মুক্তিলাভে দেরী কত? (২) বিজয়া দাসকে কোন ছবিতে দেখা যাবে?

●● (১) চন্দ্রশেখরের চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। মুক্তির দিন এখনও জানতে পারিনি। (২) 'জনতা' বলে একখানি হিন্দি ছবিতে বিজয়া দাসকে দেখতে পাবেন।

নারায়ণচন্দ্র দে (ভৈরব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা)

বিমল রায়ের অঞ্জনগড়ের নায়ক ও নায়িকা কে?

●● অসিতবরণ ও সুনন্দা।

অসীম কুমার সেনগুপ্ত (বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা)

দৃষ্টিদান কথাচিত্রে কে কে অভিনয় করিবেন।

●● সুনন্দা ও অসিতবরণ থাকবেন। অন্যান্যদের নাম সময়মত জানাবো।

সুধা মিঞা (বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা) (১) 'পৌষালী' সংখ্যা রূপ-মঞ্চের সম্পাদকীয়র জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সম্পাদকীয় সত্যি খুব সুন্দর হ'য়েছিল। বাংলায় অ-বাংগালীদের আমদানী সম্বন্ধে আপনি যে রাণী ভবানীর উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ আছে বটে কিন্তু অবাঙ্গালী আমদানী কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের সমস্যা আমরাই মিটিয়ে নেব। বাইরে থেকে লোক আমদানী শুধু জল ঘোলা করা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। বাঙ্গালী মুসলমান আর বিহারী মুসলমানে কোন মিল নেই একধর্ম ছাড়া। পোষাক, ভাষা, রীতি নীতি, খাদ্য সবই আলাদা। এদের বাঙ্গালী মুসলমান কোন দিনই আপনার করে নিতে পারবে না। এটা মুসলমান হিসাবেই আমি বলছি। এবং অভিজ্ঞতা থেকে।

এই প্রসংগে আমি ত্রিরংগা পতাকা সম্বন্ধে আপনার উক্তি স্মরণ করছি। এই পতাকা আমাদের হিন্দু ভাইরা এমন ভাবে ব্যবহার করেন যেন এটা তাদেরই একমাত্র সম্পত্তি।
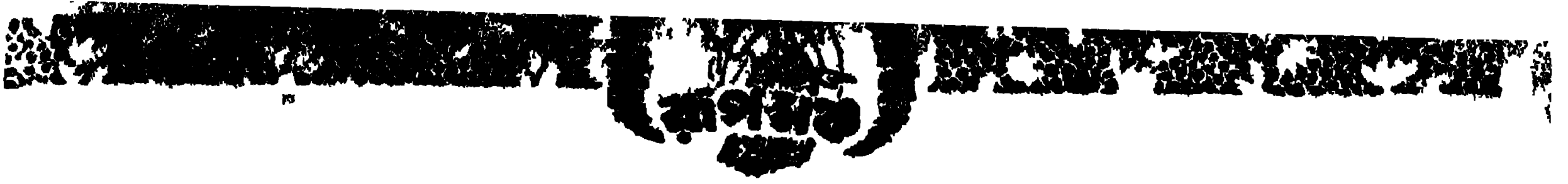
হ'তে মিলনের পথ সুগম করে না। দাঙ্গার সময় বা প্রতিমা বিসর্জনের সময় পতাকা এমনভাবে ব্যবহার করবেন (যেমন প্রতিমার হাতেও অনেক সময় পতাকা দেখা যায়) তাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে, এই পতাকার নীচে যারা সমবেত হয়েছেন তারা বোধ হয় চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর জন্য কাজ করবেন না করেন শুধু হিন্দুদের জন্য। পতাকা বা বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ প্রভৃতি ধ্বনি কোন ধর্ম উপলক্ষে ব্যবহার না করতে আমি অনুরোধ করবো। এগুলো আমাদের রাজনীতির অংগিভূত হয়ে থাকে কিন্তু বলেই রাখুন। অন্যথায় আমাদের মিলন ব্যাহত হ'তে পারে। (৮) আপনি মুসলমানদের হিন্দু নাম গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করেছেন। এসম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। আমি এক্ষণে পূর্ব বাংলার কথা বলছি পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কম। আপনার বাড়ীও খুব সম্ভব পূর্ব বাংলায় (বাই গল্পে যে ভাষা কথাবার্তার সময় ব্যবহার কচ্ছেন সেই হিসাবে বলছি) তাহা হ'লে আপনি নিশ্চয় জানেন যে, বাংগালী মুসলমানদের সাধারণতঃ দুইটা নাম থাকে। একটা আটপৌরে আর একটা পোষাকী। পোষাকী নামের ব্যবহার কালে ভদ্রে হয়। দৈনন্দিন জীবনে আটপৌরেটাই চলে। এই ডাক নামটা তথাকথিত হিন্দুয়ানি নামই বটে। আমাদের নিজেদের বাড়ীর এবং আমাদের গ্রামের কয়েকটী ছেলে মেয়ের নাম বলছি মাখন, আলোক, লালু, মদন, গগন ইত্যাদি .....প্রতাপ খাঁ নামে একজন আমাদের গ্রামে পেন্সন প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী আছেন। আর কয়েকজন সরকারী কাজ কচ্ছেন তাঁদের নাম মোহন মিঞা, ভোলা মিঞা। এদের এই একটাই নাম। কাজেই যখন এদের কেউ সিনেমায় নামছে, তখন আলোক বা মোহন এই নাম দিলে আপনারা বলবেন, মুসলমান অথচ হিন্দু নাম কেন? অথচ এইটেই যে এদের আদি এবং অকৃত্রিম নাম তা কি করে বোঝাবো? . ....।

●● আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে সম্প্রতি আমার ব্যক্তিগত নামে যে চিঠি দিয়েছেন সে সম্পর্কে দু'একটী কথা বলতে চাই। আপনাকে সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে পত্র লিখে জানানো হয়েছিল যে, আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসময়ে রূপ-মঞ্চে যাবে। আপনি এক সংগে পনেরোটী প্রশ্ন করেছেন এবং একজন আপনার দশ পাতা পুরোপুরি লেগেছে। সবগুলি যদি উদ্ধৃত করে আমায় উত্তর দিতে হয়, তাহলে এক সংখ্যায় আপনার উত্তর ছাড়া আর কারোর উত্তর দেওয়া চলে না। অথচ আপনার কয়েকটী প্রশ্নের ভিতর এমন ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে যে, তার গুরুত্বের কথা মনে করেই উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল। আপনি উতলা হ'য়ে উঠবেন এইজন্যই চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে বলে-ছিলাম আমার অন্যতম সহকর্মীকে যা অপরাপর পাঠক-পাঠিকাদের বেলায় মোটেই করা হয় না। সে অবসরও আমাদের নেই। চিঠি লিখে জানানো সত্ত্বেও কেন এপর্যন্ত আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি—সে সম্পর্কে আপনি যে কটাক্ষ করেছেন—তা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত এবং আপনার নিজের দুর্বলতার কথাই তাতে প্রকাশ পেয়েছে। আপনি লিখেছেন যে, আমরা প্রতিমাসে যাতে আপনি একখানা করে রূপ মঞ্চ কেনেন এইজন্যই আপনাকে উত্তর দেওয়া হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছি। এবং প্রতি মাসে আপনি রূপ মঞ্চ কিনছেন অথচ উত্তর পাচ্ছেন না—এজন্য আমাদের প্রবঞ্চক বলেই স্থির করে নিয়েছেন। এসম্পর্কে প্রথমেই আপনাকে বলে রাখছি প্রতিমাসে বারো থেকে পনেরো হাজার অবধি রূপ-মঞ্চ মুদ্রিত হয়ে থাকে—রূপ-মঞ্চ যাতে তাড়াতাড়ি বাজারে বেরোতে পারে, এজন্য চারটী দপ্তরী খানায় রূপ মঞ্চ বাঁধাই হয়। তাছাড়া সম্প্রতি আমরা নিজেরাও কিছু কিছু বাঁধছি। নানান গলদ থাকা সত্ত্বেও—প্রকাশে প্রতি মাসে অনিয়মানুবর্তিতার জন্য পাঠক সাধারণ অধৈর্য ও বিরক্ত হয়ে উঠলেও—কোন মাসের রূপ মঞ্চ যেই বাজারে দেখা দিল—এই বারো থেকে পনেরো হাজার কাগজ শেষ হতে বারো থেকে পনেরো দিনও লাগে না। এমনকী আমাদের কার্যালয়ে একখানা কাগজও পড়ে থাকে না—আমাদের প্রয়োজন হলে নগদ দামে বাজারে যে দোকানে কাগজ থাকে সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসি। কাগজের অভাবের জন্য এই চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারা যাচ্ছে না। তা

রূপ-মঞ্চ কাটতির জন্য আমাদের যে কোন ছল চাতুরী গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই, আশা করি সে কথা বুঝবেন। রূপ-মঞ্চ তার পাঠক সাধারণকে নিজের রূপ ও আত্মিক মাধুর্যেই ভোলাতে চায়, ছল চাতুরীতে নয়। তারপর আপনি আপনার নাম প্রকাশিত হবার জন্যই রূপ-মঞ্চ কেনেন একথা আপনার চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম। সম্পাদকীয় বিভাগে নাম প্রকাশের লোভের জন্য যেসব পাঠক রূপ-মঞ্চ কেনেন, তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো, রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে। কারণ, রূপ-মঞ্চের পাঠকগোষ্ঠীর ওপর আমাদের যে শ্রদ্ধা রয়েছে তাকে ক্ষুন্ন করতে চাই না। রূপ-মঞ্চের আত্মিক ও দৈহিক মান যাঁদের মুগ্ধ করে তাঁদেরই রূপ-মঞ্চের পাঠক হ'তে অনুরোধ জানাবো। নিজের প্রশ্নের উত্তরটী পাবার জন্য অথবা নামটী মুদ্রিত হবার জন্য যে পাঠক বা পাঠিকা রূপ-মঞ্চ কেনেন—সেরূপ সস্তা শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের প্রয়োজন নেই—একথা আপনার উত্তর প্রসংগে জানিয়ে দিতে চাই। এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক।

(১) আপনার এক নম্বর প্রশ্নে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তাতে আপনার উদার মনোভাবের প্রতিই আমার শ্রদ্ধা জেগেছে। পূর্বেও আমি একাধিকবার বলেছি কোন ধর্মানুষ্ঠানে রাজনৈতিক ধ্বনি বা পতাকা ব্যবহার করা মোটেই সমীচীন নয়। ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মীয় পতাকা এবং ধ্বনিই ব্যবহার করা উচিত। এ বিষয়ে আপনার সংগে আমি একমত।

(২) শুধু আপনিই নন, এই ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যাপারে পাঠকদের অনেকেই আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার আপত্তি, ছদ্মনাম গ্রহণে নয়; হিন্দু বা মুসলমান মুসলমানী বা হিন্দুয়ানী নাম নিন তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি, সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যাঁরা এই ছদ্মনাম গ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু দর্শক এবং প্রয়োজকদের ভয়ে মুসলমানী নাম পরিত্যাগ করে হিন্দুয়ানী নাম গ্রহণ করতে চান—আমাদের প্রতিবাদ তাদেরই ভীরুতার বিরুদ্ধে। এই দুর্বলতাকে কী আপনিও সমর্থন করবেন? আপনি মুসলমান—আপনি আমার সহানুভূতি পাবার জন্য যদি ছদ্মবেশে আসেন—কী আমি হিন্দু, আপনার সহানুভূতি পাবার জন্য যদি ছদ্মবেশে হাজির হই—তাকে কী সমর্থন করবেন? হিন্দু প্রযোজকদের খুশী করার জন্য যেসব মুসলমান বন্ধুরা নাম পরিবর্তন করেন—আপনাদেরই প্রথম প্রতিবাদ করা উচিৎ সেক্ষেত্রে। যদি তাঁরা মুসলমান বলে হিন্দু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিরুদ্ধ ব্যবহার পেয়ে থাকেন, আমাদের জানালে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করবো এবং এরকম যে করেছি ভুক্তভোগী কয়েকজন মুসলমান বন্ধু তার সাক্ষ্যই দেবেন। যেমন আজকাল সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেককে স্ব স্ব বেশ পরিবর্তন করে স্যুট পরতে দেখা যায়—একে কাপুরুষতা ছাড়া আর কী বলবেন? আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমানে বংশ পরম্পরাগতভাবে বসবাস করে আসছি—আমরা জানি, আমাদের ভিতর কী মধুর সম্পর্ক—আমি 'রাইর' ভিতরও তার আভাষ দিতে চেয়েছি। তাই হিন্দু বা মুসলমান বলে আমাদের পরস্পরের কোন বিভেদকে আমি মেনে নিতে রাজী নই। পরস্পরের ধর্ম ও কৃষ্টিকে পরস্পরে শ্রদ্ধা করেই পরস্পরকে অতি আপনার করে কাছে পেয়েছি। পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নয়। আসুন, এই বীভৎসতার মাঝে আমরা যদি আমাদের প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বজায় রাখতে পারি তাও কম গৌরবের নয়। আমাদের সকলেরই বর্তমানে ঐ একলক্ষ্য হওয়া উচিত।

যোগেন্দ্র মোহন সেন (নৈহাটী, ২৪ পরগণা)

(১) বর্তমানে বাংলার [illegible]

তাদের যে সব গান শুনতে পাই তা কি তাদের নিজেদের গাওয়া ?

●● (১) চিত্রে চন্দ্রাবতী। মঞ্চে সরযূবালা। দুই মিলিয়ে মলিনার নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

(২) পূর্ণিমা নিজে গাইতে জানেন। সন্ধ্যা সম্পর্কে সঠিক বলতে পারবো না। তবে পর্দায় এরা কেউই গেয়ে থাকেন না।

উমা বন্দ্যোপাধ্যায় (পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা)

শিপ্রাদেবী, পূর্ণিমা এবং প্রমীলা এদের ভিতর কে ভাল অভিনয় করেন ?

●● তিনজনের মধ্যে পূর্ণিমার অভিনয়ই আমায় বেশী মুগ্ধ করে। শিপ্রা সম্পর্কে আমি আশাবাদী। প্রমীলার —অতীত—বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একই মাপকাঠিতে মাপা যাবে।

মনোরঞ্জন দাস (ক্যানিং হোস্টেল, কলিকাতা)

(১) ছবি বিশ্বাসের জীবনী প্রকাশ করলে বাধিত হবো। ভারতবর্ষে কতগুলি প্রেক্ষাগৃহ আছে ?

●● (১) আগামী শারদীয়া সংখ্যায় ছবি বিশ্বাস ও কমল মিত্রের জীবনী প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো। (২) ১৯৪১ সালে ১,৫৩৫ টীর ও বেশী প্রেক্ষাগৃহ ছিল।

অরুণিমা বসাক (শিবপুর রোড, হাওড়া)

●● যেসব গায়কদের আপনি ঠিকানা চেয়েছেন, তাঁদের ঠিকানা আমাদের জানা নেই।

অজিত বসু (বসু-কুঠির, বাবুগঞ্জ, হুগলী)

চন্দ্রশেখরের পর কানন দেবীর পরবর্তী চিত্র কি ?

●● সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অনির্বাণ' চিত্রে বর্তমানে কানন দেবী অভিনয় করছেন।

নরেন্দ্রনাথ হাজরা (কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস ও কমল মিত্র এদের ভিতর সবচেয়ে কে ভাল অভিনয় করেন।

●● এঁরা তিনজনই প্রতিভাবান শিল্পী। তবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ছবি বিশ্বাসই করতে পারেন।

[illegible] ([illegible], কলিকাতা)

নবাগত পাহাড়ী ঘটক আগামী বহু চিত্রে এঁকে দেখা যাবে।

ও জগন্ময় মিত্রের ভিতর কার কণ্ঠস্বর ভাল ?

●● শান্তা আপ্তে ও খুরশীদের কোন তারতম্য করতে চাই না। হেমন্ত ও জগন্ময়ের ভিতর হেমন্তের কণ্ঠস্বরই বেশী মিষ্টি।

গুরুপদ ঘোষ (কাঁথি, মেদিনীপুর)

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'ইরাণ-কি-একরাত' হিন্দি না বাংলা ?

●● হিন্দি।

নির্মল কুমার ঘোষ (মহেশ্বর পাশা, খুলনা)

মণিকা গাঙ্গুলী কি শাবেন গাঙ্গুলীর মেয়ে ?

●● হ্যাঁ। বর্তমানে বিবাহিত জীবনে তিনি গুহ ঠাকুরতা হ'য়েছেন।

হারাধন শর্মা (বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বসু, দেবকী বসু ও শৈলজানন্দ এই চারজনের মধ্যে পরিচালক হিসেবে কে শ্রেষ্ঠ।

ফেলতে চাই। জনপ্রিয়তার দিক থেকে শৈলজানন্দের জুড়ি নেই। প্রচার কার্যের জোড়ে দেবকী বসু ফেঁপে উঠেছেন।

অমল কুমার দাশগুপ্ত (স্টেশন রোড, দমদম)
ভারতবর্ষে মোট কয়টি চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান আছে —এবং তার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বিখ্যাত।

●● বর্তমানে বহু প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এবিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারবো না। খ্যাতির দিক দিয়ে নিউ থিয়েটার্স এখনও সকলের ওপর টেক্কা মারেন। তবে শুধু এদের নাম করলে অপরাপরদের প্রতি অবিচার করা হবে তাই এই প্রসংগে আর যাদের নামোল্লেখ করতে চাই—(.) বম্বে টকীজ, ফিল্মিস্তান, কারদার প্রডাকসন্স, রণজিৎ মুভিটোন, প্রকাশ পিকচার্স, রাজকমল কলা মন্দির, মিনার্ভা মুভিটোন, নিউ সেঞ্চুরী, এম. পি, প্রডাকসন্স, অরোরা. কালী ফিল্মস, পাঞ্চোলী পিকচার্স প্রভৃতি।

রমা দত্ত (কুষ্টিয়া, নদীয়া)
(১) এখানকার 'কল্যাণী' সিনেমায় বাংলার চেয়ে হিন্দি বইই বেশী আসছে তাও অচল হিন্দি। এর কী করা যায়। (২) কোন ষ্টুডিও দেখতে হ'লে আপনারা কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি?

●● (১) আপনারা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানান। অন্যথায় প্রেক্ষাগৃহের মালিকের নাম, ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দিন। আমরা এবিষয়ে তাঁদের অবহিত করে তুলতে চেষ্টা করবো। (২) চার পাঁচ দিন পূর্বে আমাদের জানালে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে এক সংগে দু'তিন জনের যেন বেশী না হন।

ছবি ঘোষ (মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
ফণীরায় পরিচালিত উনিশ বিশের খবর কী?

●● আপাততঃ বন্ধ আছে।

কাশীনাথ পালিত (নৈহাটী, ২৪ পরগণা)
পর পর সাজিয়ে দিন ইলা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার ও উৎপলা সেন।

●● ইলা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার ও উৎপলা সেনকে] একই পর্যায় ফেলতে চাই।

কঙ্কর কুমার রায় (খুলনা)
শ্রীফণীন্দ্র পালের ঠিকানা কি?

●● শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, প্রচার সচিব, প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ, রূপবাণী বিল্ডিংস, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

জিতেন, নীলিমা ও বিজলী মৈত্র (এম, সি ঘোষ লেন, হাওড়া)
আমরা বুঝতে পারিনা যে, আমাদের দেশের সিনেমা কর্তৃপক্ষরা কি চোখ কান বুজে বই নির্মাণ করেন? তাঁরা কি বোঝেন না আজকের দর্শক সমাজ কি চায়? শৃঙ্খল, চোরাবালি, তপোভঙ্গ প্রভৃতি অধুনা মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি থেকে দর্শকসাধারণের দূরে থাকার কথা চিন্তা করেও কি তাঁদের চৈতন্য হয়না? শিল্পোন্নতির আড়ালে তাঁদের এই বিকৃত রুচি আর স্বেচ্ছাচারিতা এটা কি কোন দিনই বন্ধ হবেনা? আপনারা যাঁরা শিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে যে আদর্শ প্রচার করছেন, তাঁরা এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কি করছেন? অনতিবিলম্বে যদি কর্তৃপক্ষের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ না হয়, চিত্রশিল্পের উন্নতি কোথায়?

●● বাংলা ছবির মোড় ঘোরাবার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাহ'লে যে-মোড়ে তাঁরা ঘোরাবেন—সেই মোড়ে চিত্র শিল্প ঘুরতে থাকবে—সংগে সংগে আমরাও। তাই আমাদের অর্থাৎ দর্শক সমাজকে এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে। শৃঙ্খল, চোরাবালি, তপোভঙ্গ প্রভৃতি চিত্রগুলিকে যে ভাবে আমরা বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছি—এমনি ভাবে

হ'য়ে তাঁদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করবেন। এখন থেকেই তাঁদের একটু টনক নড়তে সুরু হ'য়েছে। প্রেক্ষা-গৃহে চিত্রগুলির ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে। আমরা রূপ-মঞ্চ মারফৎ এবিষয়ে যেমনি দর্শকসাধারণকে অবহিত করে তুলছি—তেমনি চিত্র প্রযোজকদেরও সতর্ক করে তুলতে বিন্দুমাত্রও গাফলতির পরিচয় দেই না--আশা করি রূপ-মঞ্চ মারফতই আমাদের প্রচেষ্টার কথা আপনারা জেনে থাকেন।

গোলাম রসুল বিশ্বাস (রাজীবপুর, ২৭ পরগণা)

(১) যখন কোন প্রেক্ষাগৃহে কোন নূতন ছবি মুক্তি লাভ করে—প্রেক্ষাগৃহ মালিককে কত টাকা দিতে হয়? (২) আগামী কোন চিত্রে রেণুকা রায়কে দেখা যাবে?

●● (১) বিক্রী অনুযায়ী অংশ হিসেবে এবিষয়ে চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রীর শতকরা তিরিশ ভাগ থেকে পঞ্চাশ ভাগ অবধি প্রেক্ষাগৃহ মালিক পেয়ে থাকেন। আজকাল আবার ছবির মুক্তির জন্য পিছনের দরজা দিয়েও প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের সেলামী দিতে হয়। (২) শ্রীমতী রেণুকা রায় ইষ্টার্ণ টকীজের সংগে চুক্তিবদ্ধা। তাঁদের আগামী চিত্রে হয়ত শ্রীমতী রেণুকাকে দেখা যাবে। রূপ-মঞ্চ বলে যে একটি পত্রিকা আছে, ইষ্টার্ণ টকীজের কর্তৃপক্ষ তা স্বীকার করতে চান না (যদিও রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই বাজার থেকে ইষ্টার্ণ টকীজের প্রধান কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার রূপ-মঞ্চ কিনে থাকেন এবং রীতিমত পড়েন সে সংবাদ আমরা পাই) তাই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কোন সংবাদ জানানো অপমান বলেই মনে করেন। আমাদের অবশ্য এরূপ কোন মানের বালাই নেই—রেণুকা বা তাঁদের সম্পর্কে যখনই কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবো—আপনাদের জানাবো।

শ্রীমদন রায়চৌধুরী (বৈষ্ণবাটী ফ্রেণ্ডস এসো-সিয়েশন, বৈষ্ণবাটী)

●● ... ... একখানি চিত্র ... হ'য়ে

প্রাচ্য সংগীত প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে যে আন্তঃকলেজীয় প্রাচ্য সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আশুতোষ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী কুমারী গৌরী চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক বাংলা গান আর বাউলে প্রথম এবং গজল ও রাম-প্রসাদীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া ইনি ছাত্রীদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন। এই বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ইনি একটি স্বর্ণ পদক ও দুটি ট্রফি পুরস্কার পেয়েছেন। ইনি খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ সুগায়ক হুটু বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্রী।

উঠবার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে পারিনি। ১৬, ভবানন্দ রোডের আর্ট টকীজ লিঃ সম্পর্কেও আমরা কিছু জানিনা। আপনি যদি এদের শেয়ার কিনে থাকেন এবং নিজেকে প্রবঞ্চিত বলে মনে করেন, প্রথমে নিজেই ভাল ভাবে খোঁজ নিন—পরে আমাদের জানাবেন। আমরা এবিষয়ে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের শেয়ার
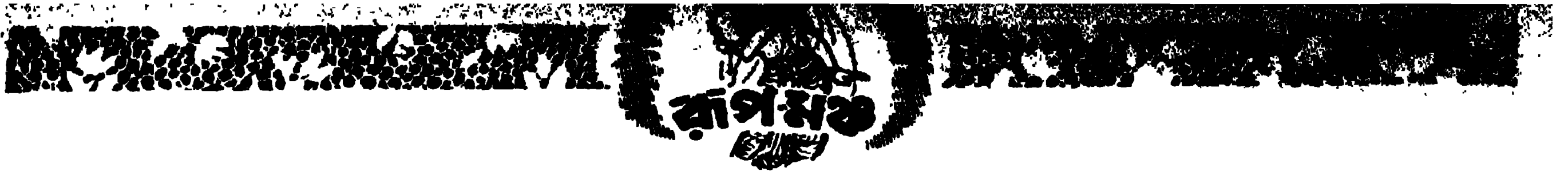
কিনবার পূর্বে আমাদের জানালে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সত্তা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানাতে পারি। শেয়ার কিনে বসলে আমাদের ক, করবার আছে বলুন ?

হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী (বেঙ্গল পট্টি, নওগঞ্জ, আসাম)

●● বর্তমানে কোন স্বরলিপি ছাপবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো না। অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন।

ভৈরব চন্দ্র ঘোষ (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অশোক কুমার ও অসিতবরণ এদের পর পর সাজিয়ে দিন।

●● দেখুন, এই পর পর সাজিয়ে দিয়ে কোন শিল্পীর মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিল্পীরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন একখানি চিত্রে হয়ত কোন শিল্পী আশাতীত নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন-- আবার আর একখানি চিত্রে নিরাশ করলেন। কোন একজন অভিনেতা কৌতুক অভিনয়ে পটু—আর একজনের আবার গুরুগম্ভীর ভূমিকায় জুড়ি মেলে না! এখন এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করি কি করে বলুনত! অথচ এই ধরণের প্রশ্ন বহু পাঠকই করে থাকেন এবং অমাদের উত্তর দিতে হয়। অথচ এই উত্তর দিতে যেয়ে দেখেছি, আমরা অনেক সময় অনেকের ওপর অবিচারও করে থাকি। অহীন্দ্র চৌধুরীর সংগে এঁদের আর কারোর তুলনা করা চলে না। জহর গঙ্গোপাধ্যায় কোন বিশেষ ধরনের চরিত্রে ছবি বাবুর চেয়েও যে আমাদের বেশী আনন্দ দিয়ে থাকেন একথা অস্বীকার করা চলে না। অথচ ছবি বাবুও আবার কয়েকটী বিশেষ চরিত্রে এমনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন যে, জহর বাবু ঐ ধরণের চরিত্রে তাঁর কাছও ঘেসতে পারেন না। আপনারা যদি এই ধরণের প্রশ্নগুলি ওভাবে না করে কোন বিশেষ ধরণের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করেন, এই ধরণের চরিত্রে এঁদের ভিতর কে শ্রেষ্ঠ—তাহলে আমার মনে হয় খানিকটা ন্যায় সংগত বিচার করা চলে। যেমন অশোককুমার তিনি প্রধানতঃ হিন্দি চিত্রে প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। তিনিও একজন প্রতিভাবান শিল্পী—আমি এঁদের সংগে তাঁকে টেনে এনে কী করে তুলনা করি বলুন ত ? এই বিভাগেই অন্যত্র এই ধরণের উত্তর আমায় দিতে হয়েছে। কিন্তু একে ঠিক প্রকৃত উত্তর বলা যেতে পারে না।

বেবী বসু (চুঁচুঁড়া, গোরস্থান)

●● আপনার প্রশ্নের একাধিকবার রূপ-মঞ্চে অন্যের মারফৎ উত্তর দেওয়া হয়েছে। যে প্রশ্ন অন্য কোন পাঠক বা পাঠিকা মারফৎ জানতে পারেন সে প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করবার কী কোন প্রয়োজন থাকে ? আশা করি প্রশ্ন করবার সময় এগুলির প্রতি আপনারা দৃষ্টি রাখবেন।

এস, আর, বন্দ্যোপাধ্যায় (চ্যাথাম-কেণ্ট, ইংল্যাণ্ড)

●● আপনার প্রেরিত "20 years of British

Film" পুস্তকখানি পরম শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছি। বইখানি পাবার সংগে সংগেই পড়ে শেষ করে ফেলেছি। ব্রিটীশ ফিল্ম সম্পর্কে বহু তথ্য এই বইখানি থেকে জানতে পেরেছি এবং যথাসময়ে রূপ মঞ্চ পাঠকগোষ্ঠীকে জানাতে চেষ্টা করবো। বইখানির জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কমল গঙ্গোপাধ্যায় (চৌমাথা, চুঁচুঁড়া)

●● আপনার প্রশ্ন নিয়েও ইতিপূর্বে রূপ-মঞ্চে আলোচিত হয়েছে।

সতীশ চন্দ্র পাল (বাবুর বাজার, হুগলী)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'রাজপথ' চিত্রে রূপায়িত হবার কথা শুনছিলাম তার কী হলো ?

●● 'রাজপথের' চিত্র-স্বত্ব শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের স্বত্তাধিকারী বাবুলাল চোখানী বহুপূর্বেই কিনে রেখেছেন বলে শুনেছি। বর্তমানে তিনি কোন চিত্রই প্রযোজনা করছেন না। তার সংগে 'রাজপথে'র ভাগ্য জড়িত বলেই 'রাজপথ'কে এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

শোভা ভট্টাচার্য (মার্কেট রোড, নিউ দিল্লী)

(১) বাংলার পরিচালক অথবা প্রযোজকেরা আমাদের অর্থাৎ দর্শক সাধারণকে একঘেয়েমীর (হিয়া মরমর প্রেম জরজর) হাত থেকে কি মুক্তি দেবেন না ? দর্শকসাধারণকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য ছবির নাম দেওয়া হয় সংগ্রাম, বন্দেমাতরম, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, দেশের দাবী প্রভৃতি কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে বসে দেখতে পাই সেই চাঁদ, বাগান, জল। নায়িকা গাছের ডাল ধরে গান ধরেছেন—নায়ক হয়তবা লুকিয়ে শুনছেন অথবা সামনা সামনি নয়ত দূর থেকে ডুয়েট জুড়ে দিলেন। প্রথমে নায়ক হয়ত খুব দেশ ভক্ত কর্মী রূপে দেখা দিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিলেন তারপরই নায়িকার হাতধরে সুর সুর করে তাদের জীবন গড়ার কাজ আরম্ভ হ'লো অন্দর মহলে। এই ছবিগুলির অনেকখানিতে অনেকদৃশ্য এক সংগে মা-বাপ—ভাই বোনদের সংগে বসে দেখা চলে না। আচ্ছা, যাঁরা ছবি তোলেন তাঁরা কী এ বিষয় ভেবে দেখেন না ? তাঁরা কী পরিবারবর্গের সংগে

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্য গুরু শিশির কুমারের শিষ্য বলে গৌরব বোধ করেন। বহু নাটকে ইনি আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন। বর্তমানে ষ্টার রঙ্গমঞ্চের সংগে জড়িত। পর্দায় দর্শক সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে মনোনিবেশ করেছেন। শীঘ্রই নায়কের ভূমিকায় আত্ম প্রকাশ করবেন।

না কেন ? বলতে পারেন, আমরা কী করতে পারি ? কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা কী না করতে পারেন ? আপনারা হ'লেন সমালোচক। আপনারা ইচ্ছা করলেই এই একঘেয়েমীর হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারেন। এখন এসেছে জাগরণের দিন—এখন কী আর এই ন্যাকামী ভাল লাগে ? হিন্দি প্রযোজক পরিচালকদের কথা ছেড়ে দিন - তাঁরা এ একঘেয়েমীর মশগুলে ডুবিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তবু তাঁদের একটা গুণ আছে এই যে, একঘেয়েমীর সংগে সংগে তাঁরা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ছবিও তোলেন। কিন্তু আমাদের পোড়া বাংলা দেশে সামাজিক ছবির একঘেয়েমীর যেন গড্ডালিকা প্রবাহ চলছে। এর কী কোন প্রতিকার নেই ?

(২) ভারতবর্ষে 'চিত্রগ্রহণ' শিখবার কোন ব্যবস্থা আছে কী ? আমার এক দাদা চিত্রগ্রহণ শিখতে চান। এজন্য তিনি হলিউড প্রভৃতি স্থানেও যেতে রাজী আছেন।

এক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়ের প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন, কিসমতের গানগুলি সম্ভবতঃ পারুল ঘোষের গাওয়া। কিন্তু আমি আপনার এই উত্তরের প্রতিবাদ করবো। (কিসমতের 'পাপিয়া মেরে পিয়াসে কহিও যায়)—গানখানিই শ্রীমতী ঘোষ গেয়েছেন। মমতাজ শান্তির সবগানগুলিই আমীর বাঈ কর্ণাটকী গেয়েছেন।

●● (১) এতদিন যখন সহ্য করে এসেছেন—আরো কিছুদিন সহ্য করুন। দেশের শাসন ভার যাঁদের হাতে এসেছে—তাঁরা গৃহযুদ্ধের বীভৎসতা অপসারণেই ব্যস্ত—তাঁদের একটু স্থির হয়ে বসতে দিন। তাঁরাই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'য়ে যা করণীয় তা করবেন। তবে এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ দর্শকসাধারণের দায়িত্বও কম নয়। পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি—আমরা দর্শক সাধারণ নিজেদের যদি উপযুক্ত করে তুলতে পারি এবং সংঘবদ্ধ ভাবে আমাদের দাবী উপস্থিত করতে পারতাম, ঐ ন্যাকামি দিয়ে কর্তৃপক্ষ আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারতেন না। আমরা রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষদেরও অবহিত করে তুলতে চেষ্টা যে না করেছি তা নয়। এবং রূপ-মঞ্চের যে কোন পাঠক তা স্বীকার করবেন। আমাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি—একঘেয়েমীর হাত থেকে কর্তৃপক্ষ আমাদের রেহাই দেননি—তাই এ বিষয়ে দর্শকেরা যদি অবহিত হয়ে ওঠেন, তবেই তাঁদের টনক নড়বে। রূপ-মঞ্চের সমালোচনার প্রতি যদি রূপ-মঞ্চ পাঠক তথা দর্শক সমাজের শ্রদ্ধা থাকে, তবে সেই অনুযায়ীই যে কোন ছবি বা নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। সুখের বিষয় বহু দর্শকই আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন—তাই ইদানীং কালের ছবিগুলি কর্তৃপক্ষের প্রচার বিভাগের ঢক্কা নিনাদ শুনে আর তাঁরা দেখতে যান না। রূপ-মঞ্চের সমালোচনার জন্য অপেক্ষা করেন। এবং তার ফলে প্রাণহীন ছবিগুলিকে অকালেই বিদায় নিতে হয় অনেকক্ষেত্রে। এতে কর্তৃপক্ষের টনক কিছুটা যে নড়েছে, সে সংবাদ আমরা পাচ্ছি। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা জীবনীমূলক ছবি কর্তৃপক্ষ কেন তোলেন না—সে কৈফিয়ৎও তাঁদের কাছে আমরা চেয়েছি। তার উত্তরে অনেকক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন, বাংলা ছবির ব্যবসায় ক্ষেত্র হিন্দি ছবির মত বিস্তৃত নয়—একটা হিন্দি ছবির বেলায় যে অর্থ ব্যয় করা চলে বাংলা ছবির বেলায় তা' চলে না। এর উত্তরে আমরা বাংলার বাইরে বাংলা ছবি প্রদর্শনের কথাও উল্লেখ করেছি। হিন্দি ছবি যেখানে বাংলার বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে—বাংলা ছবিকে বাংলার বাইরে কেন সে সুযোগ দেওয়া হবে না! কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ী মহল তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। আমাদের কর্তব্যে কোন দিনই আমরা কোন বিচ্যুতি ঘটতে দেই নি এবং ভবিষ্যতে দেবোও না। আমাদের প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হ'য়ে থাকে—সেজন্য দায়ী আমরা নই। প্রযোজকদের বিরাট শক্তির সংগে আমাদের যদি লড়তে হয়—আরো বেশী সংখ্যক পাঠ বা দর্শকদের এগিয়ে এসে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা এখন সেই দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি। আপনারা প্রকৃত দর্শকের শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন—আমাদের সংঘ শক্তির কাছে—আমাদের নির্মম সত্যের সামনে প্রযোজকেরা কোন মতেই তাঁদের অসত্য নিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না। (২) বম্বের ফজলভাই ইন্সটিটিউট এবং শান্তারামের রাজকমল কলা মন্দির-এ—পূর্বে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে আছে কিনা আমি সঠিক বলতে পারি না। এখানে যদি 'চিত্রগ্রহণ' শিখতে চান, কোন চিত্র শিল্পীর সহকারীরূপে কোন ষ্টুডিওর সংগে জড়িত থাকতে হবে। তবে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। হলিউড বা বিদেশে যদি যেতে চান ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগে এবিষয়ে খোঁজ নিতে বলবেন। সম্প্রতি ডাঃ বিধান রায় ...

'স্বপ্ন 'ও সাধনা' চিত্রে পরেশ ব্যানার্জী ও জীবেন বসু

বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে যান এবং বিশেষ করে যারা ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে যান, বিদেশে তাদের সুবিধা অসুবিধা জানবার জন্যই ডাঃ রায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে গেছেন। কিছুদিন পূর্বে বি, বি, সি থেকে তিনি বেতার যোগে এ সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন—তাতে বলেন, 'যেসব ছাত্র বিদেশে আসতে চান তারা ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সংগে পূর্বে থেকে আলাপ আলোচনা করে যেন আসেন—নইলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে।' তাছাড়া যদি ইউরোপের কোথাও আপনার দাদা যেতে চান, আপনি বি, বি, সি, বিচিত্রা পোষ্ট বক্স, নিউ দিল্লী ১০৯ এই ঠিকানায় রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে পত্রালাপ করতে [illegible] বিস্তৃত কার্যকরী উপদেশ দিতে পারবেন। (৩) এবিষয়ে আমার নিজেরও সন্দেহ ছিল বলে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারিনি। আমার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

পত্রলেখকের সংগে সুর মিলিয়ে বাঙ্গালী দর্শক সমাজ তীব্র প্রতিবাদ করুন!

রূপ-মঞ্চ সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের কুখ্যাত ছবি 'আন্না এণ্ড দি কিং অব সিয়াম' ছবিটি ক'লকাতায় ফিরে এসেছে। বোম্বাই সরকার এই ছবিটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করেছেন সেখানকার প্রখর চেতনা সম্পন্ন চিত্রামোদীদের প্রতিবাদে।

ছবিটির কাহিনী লিখেছেন মিস মার্গারেট ল্যানডেন নাম্নী জনৈকা মহিলা। এতে দেখান হয়েছে শ্যামের মূর্খ রাজার

নৃশংসতা, বীভৎসতা, চরিত্রহীনতা ; দেখান হয়েছে শ্যামের নির্বোধ জনসাধারণকে ; বিদেশী শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞানের আলোক বিতরণই ছবিটির সর্বশেষ ফলশ্রুতি।

যদি রাজার অপকীর্তি ঘোষণাই ছবিটির বক্তব্য বিষয় হত তাহলেও সহ্য করা যেত। কারণ, কোন দেশের রাজা কোন দিনই জনসাধারণের রুচি ও নীতিজ্ঞানের প্রতিনিধি নয়! কিন্তু রাজাকে উপলক্ষ্য করে দেশের জনসাধারণের আচার ব্যবহার,নীতিজ্ঞানের কুৎসা প্রচার সহ্য করা কাপুরুষোচিত—সে দেশ শ্যামই হোক আর ভারতবর্ষ হোক।

একদা মিস মেয়ো ভারতবর্ষকে অপমান করেছিলেন তাঁর কুৎসিৎ রচনার মারফতে। আমরা তার উপযুক্ত জবাবও দিয়েছিলাম। সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে লেখক কিপলিংএর 'গঙ্গাদীন'কে আমরা ভারতবর্ষ থেকে বহিস্কৃত করেছিলাম। শুধু তাই নয়, এবারকার মহাযুদ্ধের কোন এক রণাঙ্গনে 'গঙ্গাদীন' ছবিটির প্রদর্শনীতে বাধা দিয়ে কতিপয় ভারতীয় সৈন্য সাম্রাজ্যবাদের আন্দোলনের বিচারে প্রাণ দিতেও পিছপা হয়নি। একথা শুধু আমরাই জানি তা নয়, বিদেশীরাও জানে। তাই প্রকাশ্যে ভারতবর্ষকে উপহাস করবার স্পর্ধা তাদের আজ নেই, কুৎসা প্রচারত দূরের কথা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত চতুর—বিশেষ করে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের চতুরতার তুলনা নেই। তাই ভারতবর্ষকে এড়িয়ে এশিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কুৎসা প্রচার আমেরিকার হলিউডের আজকাল লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

জাপান আর যাই করুক, চাবুকের ঘায়ে সাদাদের জাপানী জাতের নিন্দে করা বন্ধ ক'রেছিল।

আমরা কখনোই ভুলতে পারিনা যে, শ্যাম ভারতবর্ষের প্রতিবেশী। এশিয়ার যে কোন দেশের অসম্মান আমাদের জাতীয় অসম্মানের সামিল। নইলে আমাদের স্বাধীনতা লাভই যে বৃথা। বৃথাই তাহলে ভিয়েটনামের জন্যে পরদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা ক'রতে গিয়ে আমাদের ছেলেরা গুলির সামনে বুক পেতে দেয়।

শ্যামকে অসম্মান করবার মত স্পর্ধা আজ আমেরিকা পায় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এশিয়াবাসীর মানসিক দুর্বলতা। যে দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রোকে আজো পশুর পর্যায়ে নামিয়ে রাখা হয়েছে, সামান্যতম অপরাধেও যে দেশে তাদের লিঞ্চিং করা হয়। সে দেশ যে কোন মুখে গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে অন্যদেশকে বিদ্রুপ করে তা ভাবলেও হাসি পায়। এই আমেরিকাই শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রাভিনেতা চার্লিকে বহিস্কারের হুমকি দিয়েছে। চার্লির অপরাধ, তিনি ধনতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করেছেন, সাধারণ মানুষকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

আপনার পত্রিকা মারফৎ বাংলাদেশের চিত্রামোদীদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা এই ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করুন। বোম্বাইএর চিত্রামোদীদের কাছে নিজেদের আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখুন। বিদেশীর বহু উপেক্ষা, অপমান, লাঞ্ছনা আমরা সহ্য করেছি। আজ আমরা নিজেদের সম্মান যেমন অক্ষুন্ন রাখব,তেমনি প্রতিবেশীর সম্মানও ক্ষুন্ন হতে দেবোনা। আশা করি চিত্রামোদীরা একবাক্যে আমাদের সমর্থন ক'রবেন। নমস্কার। ইতি—অবন্তী সান্যাল। ১৮-এ বাদুড় বাগান লেন। কলিকাতা।

[শ্রীযুক্ত অবন্তী সান্যালের পত্রখানির প্রতি আমরা "রূপ-মঞ্চ" পাঠক সমাজ তথা বাঙ্গালী দর্শক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখকের সংগে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আসুন, আমরা সকলে মিলে বৈদেশিক চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির হীন প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা দিই।

সমালোচনা, সংবাদ ও নানাকথা

পূর্বরাগ

প্রযোজনা: গোবিন্দ ভূষণ রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়। **কাহিনী:** সুনীল মজুমদার, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। **সংলাপ:** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। **সুরসৃষ্টি:** হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। **চিত্র গ্রহণ:** রমানন্দ সেনগুপ্ত। **শব্দ গ্রহণ:** ভূপেন ঘোষ, অমর হাজরা। **চিত্রনাট্য ও পরিচালনা:** অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। **রূপায়ণে:** কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার শম্ভু, নরেশ বসু, সমর মিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, আশু বসু, সন্তোষ সিংহ, বনানী চৌধুরী, প্রমীলা ত্রিবেদী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, শকুন্তলা রায়, রাজলক্ষ্মী, আহুতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। **পরিবেশক:** প্রাইমা ফিল্মস লিঃ।

কথাচিত্র লিঃ এর প্রথম বাংলা বাণীচিত্র পূর্বরাগ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। সংগ্রাম-খ্যাত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ছবি 'পূর্বরাগ'। সংগ্রামের পর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কোন শান্তির বাণী প্রচার করেন, এজন্য আমাদের মত অনেক দর্শকই যে কান পেতে চোখ মেলে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এই কান আর চোখ অর্ধেন্দু বাবুর পূর্বরাগ কতখানি তৃপ্ত করে মনে অনুরাগ সঞ্চার করতে পেরেছে তাই বিচার করে দেখতে হবে।

সংগ্রামের কৃতকার্যতায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় নিজেকে সম্ভবতঃ খুব বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন—সংগ্রামের কৃতকার্যতার মূলে তার কাহিনীর অবদান যে অনেকখানি ছিল—একথা হয়ত তিনি স্বীকার করতে চান নি—সংগ্রামের কৃতকার্যতার মূলে তার পরিচালন-দক্ষতাই দ্বিতীয় চিত্রের বেলায় কোন পাকা হাতের কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না—কাহিনীকে গৌণ-বলে মনে করলেন। পূর্বরাগের কাহিনী রচনার ভার যাঁদের ওপর দিলেন—তাঁরা নিজেদের একক ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান ছিলেন নিশ্চয়ই। দুজনে এক সংগে কলম ধরলেন। তাঁরা কেউই গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেন নি ইতিপূর্বে—মুষ্টিমেয় যাদের কাছে এঁদের রচনা পরিচিত, এঁদের সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্যে তাদেরও চোখ ঝলসে যায়নি কোনদিন। সংলাপ রচনার জন্য ভার দিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওপর। কাহিনী রচয়িতাদের দুর্বলতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের খ্যাতি দিয়ে ঢেকে দেবারই হয়ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাকের গায়ে ময়ূরের পাখা গুজে দিলেই কাক ময়ূর হয় না—কাকই থেকে যায়। সংলাপের চাকচিক্য তেমনি কাহিনীর দুর্বলতাকে ঢাকতে পারেনি বরং আরো প্রকট করে তুলেছে। নারায়ণ বাবুকে দোষ দেব না—কারণ সমপর্যায়ের সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে ইচ্ছামত কলমের ফলকে—সংলাপের মুখে তুলে ধরা যায় সুষ্ঠু ভাবে। অনিপুণ হাতের ছবিতে তুলি ধরতে হলে পাকা হাতকে সম্পূর্ণ রংএর পোচ দিয়ে আগে বুলিয়ে নিতে হয়। তবু তাঁরও যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তার কথা পরে বলছি।

পরিচালক হিসাবে অর্ধেন্দু বাবুকে এখনও যদি আমরা নবীন বলি আশা করি তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। নবীন যে দ্যুতি নিয়ে সংগ্রামে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—তাতে আমরা তাঁর প্রতি আশান্বিতই হয়ে উঠেছিলাম। পুরোন গোষ্ঠীর ভিতর যদি তাঁকে ফেলে দিতে পারতাম—তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতাম না—তিনি একটার পর একটা যাই দিতেন না কেন, কুইনিনের পিলের মত আমরা গলধকরণ করতাম। কিন্তু তিনি নবীন—তাঁর ভবিষ্যত আশার আলোকে দীপ্তিভাত মনে করেছিলাম বলেই তাঁকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। চিত্র পরিচালনা করতে হলে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা চিত্র পরিচালকের যে সব গুণাবলীর সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন আমি এখানে তার উল্লেখ করতে চাইছি না।

জগতে দু'একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। চিত্র জগতের যে কোন বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই—তাদের হাতে পরিচালনার ভার তুলে দিতে আমরা প্রতিবন্ধক হই না। এরই ভিতর যারা একটু সতর্ক হয়ে চলতে পারেন তাঁরাই আমাদের খুশী করতে সক্ষম হন। এই সতর্কতার জন্য প্রথমে তাঁদের শিল্পদৃষ্টি থাকার প্রয়োজন—যান্ত্রিক কারসাজিতে হাতে খড়ি না থাকলেও উপযুক্ত যন্ত্রবিদের প্রতি বিশ্বাস ও যন্ত্র সম্পর্কিত তাঁর উপদেশ এবং সহযোগিতা গ্রহণ—অভিনয় দক্ষতা—চরিত্রোপলব্ধি ও চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য জ্ঞান থাকলেই যে কোন পরিচালক যদি নিষ্ঠাবান হন আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অন্য গুণাবলীর কথা আমি উল্লেখ করিতে চাইনা—তার দু'খানি চিত্রে বিশেষ করে আলোচ্য চিত্রে তাঁর অভিনয় কুশলতা ও সাহিত্য জ্ঞান বা কাহিনী উপলব্ধি

সম্পর্কে বেশ দুর্বলতার পরিচয় পেয়েছি। অর্ধেন্দুবাবু ইতিপূর্বে অভিনেতারূপেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিচালিত চিত্রে অভিনয়ের ত্রুটি মোটেই বরদাস্ত করতে পারবো না। তিনি অনেক নূতনকে সুযোগ দিয়েছেন এজন্য আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য। কিন্তু সে নূতনদের অভিনয়ের প্রতি কী তাঁর দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল না? দ্বিতীয়তঃ কোন চরিত্র কী বলতে চেয়েছে—তার ধর্ম কী—তাকে কী ভাবে চিত্রে রূপায়িত করে তুলতে হবে—কীসে তার ধর্ম নষ্ট হবে না এগুলি সম্পর্কে যদি এখন থেকেই তিনি সতর্ক না হন তাহ'লে পূর্বরাগের মতই ভবিষ্যতে আমাদের নিরাশ করবেন। আশা করি এবিষয়ে তিনি অবহিত হ'য়ে উঠবেন।

অনেকে বলছেন 'পূর্বরাগ' সংগ্রামেরই আর এক সংস্করণ। কিন্তু 'পূর্বরাগকে' তাতে সম্মানিত করা হবে বলেই আমি মনে করি। সংগ্রাম শুধু আদর্শের ফাঁকা বুলি উপস্থিত করেনি—কার্যকরী নির্দেশও তার ছিল। 'পূর্বরাগ' কোন কার্যকরী বিষয়ের সমাধান করতে পারেনি—আধুনিককালের অন্যান্য দশখানা ছবির মত আদর্শের বুলি কপচিয়েছে। সংগ্রাম অর্ধেন্দুবাবুর যে জয়ের সূচনা করেছিল—'পূর্বরাগ' তাকে সুনিশ্চিত করতে পারেনি—বরং সাহসের সংগে পশ্চাদাপসারণের কথাই ঘোষণা করেছে।

মূল চরিত্রগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ কচ্ছি অভিনয়, কাহিনী এবং পরিচালনার দুর্বলতা এতেই ধরা পড়বে। চিত্রের প্রথমেই আমাদের সাক্ষাৎ হয় যতীশ্বর চাটুজ্যের সংগে। যতীশ্বর চাটুজ্যে স্কুলের মাষ্টার। এই যতীশ্বর চাটুজ্যে চরিত্রটীর জন্য কাহিনীকারদ্বয়কে প্রশংসা করবো—এই চরিত্রটীর প্রচুর সম্ভাবনা ছিল—তার ভিতর দিয়ে অনেক কিছুই দেওয়া যেত। কিন্তু তাকে ব্যর্থতার আঘাতেই মেরে ফেলা হ'য়েছে। যতীশ্বরকে ব্যর্থতার আঘাতে চুরমার না করে যদি নানান বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়েও তাকে সার্থকতার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তো—অনেক
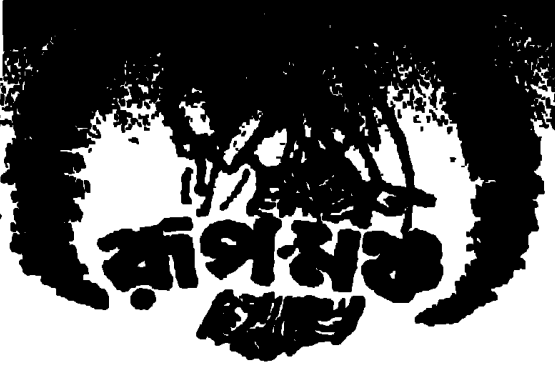
যতীশ্বর মাষ্টার ও তার স্ত্রী যে সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল কাহিনীকারদ্বয় বা পরিচালক যদি সে সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহ'লে তাদের অযথা ইন্দ্রনাথকে কলকাতায় রমাপতিদের ওখানে হাজির করাতে হ'তো না—মিলিকেও তার জীবনে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাণীকে দিয়েই এ উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারতো। এবং যতীশ্বরের অসবর্ণ বিয়ের ব্যাপার নিয়ে সোমনাথের সংগে বিরোধই ছিল সমীচীন। যতীশ্বরের কার্য-কলাপে সোমনাথের জমিদারী ভেংগে পড়ার মত কোন আশঙ্কারই পরিচয় পাওয়া যায়নি। যতীশ্বরের রাজনৈতিক মতবাদ যাই থাক না কেন, স্কুলের কচি কচি ছেলেদের ভিতর দিয়ে তাকে বিকাশ করতে তার চরিত্র সায় দেয় না। যতীশ্বর মানব ধর্মের যে সমতার কথা বলতে চেয়েছেন তার রূপ অপরিণত বালকদের মাঝে এক প্রকার এবং পরিণত বয়স্কদের মাঝে অন্য প্রকার। সমাজের কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও কোন শিক্ষকই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের আর্থিক সংগতি অনুসারে পক্ষপাতিত্ব করেন না। এবং সোমনাথের মত লোকও স্কুলে তার ছেলের জন্য বিশেষ আপ্যায়ণ আশা করতে পারেন না। পূর্বরাগে সোমনাথও যতীশ্বরের যে বিরোধ দেখানো হ'য়েছে তা কোন বিরোধই নয়। বরং প্রাপ্তবয়স্ক ইন্দ্রনাথকে দিয়ে সোম-নাথের ভয় করবার কারণ ছিল। এজন্য ইন্দ্রনাথকে অপরিণত বয়স অবধি যতীশ্বরের শিক্ষাধীন রাখা পরিণত বয়সেও যতীশ্বরের প্রভাব থেকে তাকে ছিনিয়ে না নেওয়াই ছিল সমীচীন। এবং সম্বন্ধটা এই পরিণত বয়স থেকেই সুরু করা উচিত ছিল। এই সময় গ্রামকে কেন্দ্র করে সোমনাথের জমীদারীকে কেন্দ্র করে যতীশ্বরের কার্যকলাপের পরিচয় দিতেও পারা যেত—যতীশ্বরের আশা সম্পর্কেও আমরা কিছু জানতে পারতাম। যতীশ্বরের স্ত্রী অপর্ণাকেও তাড়াতাড়ি মেরে ফেলবার কোন যুক্তি নেই। যে মহিলা যতীশ্বরের মত স্বামীর শিক্ষকতায় ত্রুটি ধরিয়ে দিলেন—তার কাছে অনেক আশাই আমরা করেছিলাম।

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা করবো। পূর্বরাগে তিনি তার পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যতীশ্বরের স্ত্রীর ভূমিকায় একজন নবাগতাকে পেয়েছি—তার বাচন-ভংগীর সম্ভাবনা আছে। চেহারাই প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াবে তার ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনে। তাছাড়া মনে হয়েছে এই সবেমাত্র তিনি ম্যালেরিয়া থেকে উঠে এসেছেন।

জমিদার সোমনাথের চরিত্রটীর কাঠামো বেশ শক্ত করেই গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে এমনিভাবে তাকে নরম করা হ'য়েছে যে তার চরিত্রের মর্যাদা তাতে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সামান্য একটা ঢিল লাগাতে ছেলে বাঁচবে কিনা তার পক্ষে এ চাঞ্চল্য মোটেই শোভা পায় না। তারপর লেঠেল দিয়ে যতীশ্বরের গৃহ আক্রমণ তার চরিত্র মোটেই সায় দেয় না। সোমনাথের চরিত্রটী ফুটিয়ে তুলতে কমল মিত্রের অভিনয়ের দৃঢ়তা অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

নায়ক ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছি নবাগত দীপক মুখোপাধ্যায়কে। দীপকের বাল্য বয়সে অভিনয় করেছে মাষ্টার শম্ভু। এই শিশু অভিনেতাটী বাংলা ছায়াজগতের সম্পদ বলেও অত্যুক্তি করা হ'বে না। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি কামনা করি। নায়ক ইন্দ্রনাথের চরিত্র নিয়ন্ত্রণে—কাহিনীকার-দ্বয় ও পরিচালক যথেষ্ট ছেলে-মানুষীর পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতায় যে অবস্থায় যে আবহাওয়ার ভিতর সে গড়ে উঠেছিল—সে আবহাওয়া যে তার সয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামে ফিরে গিয়ে যতীশ্বরের সংগে সাক্ষাতের সংগে সংগেই তার পরিবর্তন একটু বিশদৃশ্যই লাগে। যতীশ্বর বা তার স্ত্রীর সংস্পর্শে তাকে এমন বেশীদিন দেখিনি যাতে তার মনে তাদের প্রতি তখনও অগাধ শ্রদ্ধা জমে থাকতে পারে। বরং সেদিক দিয়ে মিলির মায়ের প্রভাব এবং স্থানই তার জীবনে বেশী থাকা উচিত। মিলিদের বাড়ী থেকে চলে যাবার সময় মিলির মার সংগে তার কথোপকথনকে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না। তারপর যতীশ্বর ও বাণীর উদ্দেশ্যে না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা বাতুলতারই পরিচায়ক। দশবছর পূর্বেকার চলচ্চিত্রে

এই ধরণের ভেলকীবাজী চলতো—এখন যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে—সে বিষয় কর্তৃপক্ষের জানা উচিত ছিল। আর ঐ কী তার আদর্শের প্রতি অনুরাগ! আদর্শ কখনও ব্যক্তির মাঝে আবদ্ধ থাকেনা—সে মুক্ত। তার ভয় নেই, মৃত্যু নেই। নায়কের ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায়—তার বাচন-ভংগী প্রথম চিত্রেই আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা তাঁর ভবিষ্যত অভিনেতা জীবন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। মিলির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বনানী চৌধুরী। 'তপোভঙ্গ' চিত্রে ইতিপূর্বে তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল—আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করিনি তখন। তাঁর মত শিক্ষিতা মেয়েকে চিত্র জগতে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছি। এজন্য আমাদের পাঠকদের কাছ থেকে বহু পত্রাঘাত সহ্য করতে হ'য়েছে—বনানী চৌধুরীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছি বলে। অবশ্য একথা ঠিকই, নূতন, শিক্ষিতা এবং বিশেষ সম্প্রদায় থেকে আগত—(যে সম্প্রদায়ের খুব বেশীজন বাংলা ছায়া জগতে পা বাড়ান নি) বলেই আমরা প্রথম চিত্রে তাঁকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে সমালোচনা করেছি—কিন্তু বর্তমান চিত্রের অভিনয় দেখে শ্রীমতী বনানী আমাদের সেই সহানুভূতি আশা করতে পারেন না। মিলির চরিত্রে যে তিনি একদম ব্যর্থ হ'য়েছেন একথা এখানে উল্লেখ করবো। তবু তাঁকে নিরুৎসাহিত করবো না—অধ্যবসায় দ্বারা তাঁর ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনকে তিনি উন্নত করে তুলুন —সেই আবেদনই জানাবো। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী বনানীর একটী প্রবন্ধ কোন ইংরেজী দৈনিকে পড়ছিলাম। আগ্রহশীল যুবক যুবতীরা অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে পারেন না বা পরিচালকেরাও সেভাবে এঁদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন না—এই ধরণেরই যেন ইংগিত প্রচ্ছন্ন ছিল লেখাটীতে। একথা ঠিকই, শুধু বর্তমান চিত্রেই নয়—বহু চিত্রে নূতনদের সুযোগ দিয়েও পরিচালকেরা নূতনদের গড়ে তুলতে কোন পরিশ্রমই করেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অভিনয়ে অজ্ঞতা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের গাফিলতি এবিষয়ে দায়ী। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ত একজন অভিনেতা ছিলেন—অভিনয় সম্পর্কে তাঁর অন্ততঃ প্রথম পাঠের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেই নেবো—তাঁর চিত্রে নায়ক নায়িকাদের অভিনয়ের ত্রুটি কেন চোখে পড়ে? এবিষয়ে কী তিনি কোন যত্নই নেন নি? তারপর শ্রীযুক্তা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে কয়েকটী কথা বলবো। যদি তিনি অভিনেত্রী জীবনে বহাল থেকে উন্নতি করতে চান, তবে কী নেই তার জন্য আফসোস করলে যেমনি চলবে না—তেমনি পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে কোন দিনই উন্নতি করতে পারবেন না। অভিনয়-শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই। কর্তৃপক্ষও কোন দৃষ্টি দেন না—কিন্তু এই বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে আজকে যাঁরা অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—তাঁদেরও এগিয়ে আসতে হ'য়েছে। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রথম দিককার জীবনের পাতা উলটালে এই প্রচেষ্টার কথাই দেখতে পাওয়া যাবে। যা নেই তার জন্য হাহুতাশ করলে চলবে না—তার আশায় বসে থাকলেও চলবে না। তবে এ অভাব যাতে অপসারিত হ'তে পারে সেজন্য চিত্র বা নাট্য-জগতের প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে। এবং এবিষয়ে প্রত্যেকেরই যে দায়িত্ব রয়েছে তাও ভুলে গেলে চলবে না। যতদিন এই অভাব দূরীভূত না হয় ততদিন কী হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?—নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেকে শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব অধ্যবসায় দ্বারা নিজের দুর্বলতা শুধরে নিতে হবে। এবিষয়ে বাড়ীতে বসে তাঁদের তৈরী হ'য়ে নিতে হবে—সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ —নজরুল—সত্যেন দত্ত প্রভৃতি ও অন্যান্য কবিদের কবিতা

আর সকলকে বাদ দিতে বলছি না। কবিতার ভাবকে অভিব্যক্তির দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে। যেসব নাটক খ্যাতি অর্জন করেছে—এসব নাটক সংগ্রহ করে অভিনয়ের মত নিজেকে পড়ে যেতে হবে। তার ভিতর যে চরিত্রটী শিক্ষানবীশীর ভাল লাগবে সেটিকে মূল ধরে—রিহার্সেল দিতে হবে। চিত্রে বা নাটকে যখনই তাঁরা কোন ভূমিকা পেলেন আগ্রহ করে ভূমিকাটী নিজেদের জেনে নিতে হবে—দৃশ্যপটে বসে না আওড়িয়ে ভূমিকাটী লিখে এনে বাড়ীতে মুখস্ত করে নিয়ে—রিহার্সেল দিতে হবে। এভাবে কয়েকটী ভূমিকার পিছনে পরিশ্রম করলেই যে কোন নবাগত বা নবাগতা যদি নিজের কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে নিজের দুর্বলতা শুধরে নিতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। শ্রীমতী বনানীর পাশাপাশি বাণীর ভূমিকায় প্রমীলার কথাই ধরা যাক না কেন। কোন শিক্ষা নেই তাঁর—তাঁর অশুদ্ধ উচ্চারণ অনেক সময় কর্ণ পীড়ার সৃষ্টি করে—কিন্তু একটার পর একটা অভিনয় করতে করতে অভিনয় অন্ততঃ কিছুটা যে তাঁর ধাতস্থ হ'য়েছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। এবং আলোচ্য চিত্রে তাঁকে যদি বেশী প্রশংসা করি আশা করি, তাতে শ্রীমতী বনানীর ক্ষুণ্ণ হবার কোন যুক্তি থাকতে পারেনা। আলোচ্য প্রসংগে শ্রীমতী বনানীকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলি বল্লাম প্রত্যেক নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষেই তা প্রযোজ্য।

রমাপতি চাটুজ্যের বাড়ীতে যেসব চরিত্রের আমদানী করা হ'য়েছে এবং তাদের ভিতর দিয়ে কাহিনীকারদ্বয় বা পরিচালক যা বলতে চেয়েছেন আজকের দিনে তার মোটেই দাম নেই—এরা যে দশবছর পূর্বেকার জিনিষ নিয়ে এই দৃশ্যগুলিতে কপচিয়েছেন একথা যে কোন দর্শকই স্বীকার করবেন। এই সব চরিত্রগুলির ভিতর শকুন্তলা রায়—বার বার নাম পালটে যিনি সার্থক হ'তে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, এবারও ব্যর্থ হ'য়েছেন। নরেশ বসু—আশু বোস প্রভৃতি পুরোন প্যাঁচের ব্যর্থতায় মন বিষিয়ে তুলেছেন। ইন্দু মুখার্জি ও সুপ্রভা নিজেদের

যতীশ্বরের ভাইপোকে একটী টাইপরূপে দাঁড় করানো হ'য়েছে—যার কোনই সার্থকতা ছিল না। এতে ঝামেলা বেড়েছে মাত্র। জীবেন বসুর অভিনয় ও চরিত্রটী ও প্রশংসা করবো—তবে সোমনাথের সামনে বা পার্টিতে তার বক্তৃতা এসব চরিত্রের সপক্ষে সায় দেয় না। সন্তোষ সিংহও নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন।

চিত্রের পরিণতিতে কোন মাধুর্য নেই। 'জাগো জাগো' বলে বাণীর কাকুতি যেন সেই মরা স্বামীকে নিয়ে সাবিত্রীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপর পরের দৃশ্যেই ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব তিরিং করে লাফিয়ে চমকে দেবার মত হ'য়েছে।

সংগীতে মাদকতার পরিচয় পাইনি। বিমল চন্দ্র ঘোষের 'জেগেছে এবার জেগেছে' গানখানির কথার জন্ত প্রশংসা করবো। চিত্রশিল্পীর কোন বাহাদুরী পাইনি—বনানী বা প্রমীলাকে দু'এক স্থানে খুবই খারাপ লেগেছে। আলোক নিয়ন্ত্রণেও ত্রুটি চোখে পড়ে। শব্দগ্রহণ চলনসই।

সমস্ত বইটাতে একটা কিছু দেবার প্রয়াস ছিল—কিন্তু সে প্রয়াস সার্থক হয়নি। অর্থাৎ ভাব আছে ভাষা নেই। প্রথম প্রথম যারা লিখতে আরম্ভ করেন, ভাবেন অনেক কিছু কিন্তু ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না—অথবা প্রথম যাঁরা প্রেমে পড়েন—দয়িতাকে সামনে পেয়ে অনেক কিছুই বলতে চান—মনের মধ্যে কথাগুলি ঘুরপাক খেতে থাকে অথচ ভাষায় গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারেন না—পূর্বরাগে পরিচালক ও কাহিনীকারদ্বয়কে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে দেখেছি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংলাপ মাঝে মাঝে খরতর হ'য়েছে—কিন্তু তা যেন কথা বলার ভাষা হয়নি—হ'য়েছে লিখবার ভাষা—তাই মাঝে মাঝে অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও তা কম বাধা সৃষ্টি করেনি। যতীশ্বর ও তার স্ত্রী যে সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন—শুধু সেই জন্যই চিত্রখানিকে প্রশংসা করতে পারি। —শ্রীপার্থিব

দেশের দাবী

আশুতোষ দাসের প্রযোজনায়, এসোসিয়েটেড ওরিয়েন্টাল

ফিল্ম প্রডিউসার্সের প্রথম চিত্র। কাহিনী ও পরিচালনা—সময় ঘোষ। অভিনয় ক'রেছেন, জ্যোৎস্না, সাবিত্রী, প্রভা নিভাননী, ভানু, বিপিন, সন্তোষ নবদ্বীপ, সাধন, কৃষ্টধন প্রভৃতি আরও অনেকে।

দেশের দাবীর পরিচালক অভিজ্ঞ কিন্তু তিনি নতুন কিছু দিতে সক্ষম হয়েছেন এমন কথা বলা চলে না ছবিখানি দেখে। নতুন অভিযানকে অভিনন্দিত করার আগ্রহ নিয়েই আমরা ছবি দেখতে যাই কিন্তু যখনই দেখি নতুন সামনের দিকে না তাকিয়ে পেছনের পথ বেছে নিয়েছেন তখনই হতাশায় মনটা ব্যথিত হয়। আলোচ্য ছবিতেও তাই হয়েছে। সেই বড় বড় বক্তৃতা, সেই বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে—ছবিকে স্বাদেশিকতার ব্যর্থ রূপ দিতে যাওয়া। অথচ প্রকৃত কাজ কতটুকু হ'চ্ছে তার প্রতি উদাসীন থেকে একটা অর্থহীন প্রেম ঘটিত ব্যাপারের অবতাড়না এ যেন সাম্প্রতিক স্বদেশী মার্কা ছবিগুলির পরিচালকদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'দেশের দাবী' চিত্রেও এই নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন কিছু আমাদের দিতে পারেন নি এই ছবির পরিচালক। নাটকীয় পরিস্থিতির অভাবে দুর্বল কাহিনীর পরিবেশন দুর্বলতর হয়েছে। গ্রামের পরিবেশ নিয়ে ছবির আরম্ভ, ইউসুফ ও জয়ন্ত গ্রামের ছেলে, মাঠে কাজ করে। জয়ন্ত, গ্রামের মেয়ে মালতীকে ভালবাসে। মালতী ইউসুফের স্ত্রী মমতাজের সখী। প্রথমদিকেই জয়ন্ত ও মালতীর প্রেমের প্রকাশ যেমন করে পরিচালক দেখিয়েছেন—ঐ ভাবে প্রকাশ্য জায়গায় বসিয়ে মুখে ঠোনা মারার কথা অমাদের কল্পনায় আসে না। তারপর হিন্দু মুসলমানের মিলনের যে ধারা অন্দর মহল পর্যন্ত বইয়ে দিয়েছেন পরিচালক—কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীর বিধবা তা সহ্য করে না। লাঙ্গল কাঁধে ইউসুফ গান গাইতে গাইতে এল মাঠের দিকে—সংগে হেসে হেসে চলে জয়ন্ত—এমন ভাবে মাঠে যাবার রীতি কোন গায়ে আছে কিনা জানি না। মাঠের বটগাছের তলায় মুসলমান রমণীকে স্বামীর বন্ধুর সংগে অমন করে রসিকতা করানও বাস্তবতার বাইরে। সারা ছবিতেই অসংগতির প্রাদুর্ভাব। অতুলদার চরিত্র দেশ সেবকের, কিন্তু তার আদর্শ কি? তার আদর্শের কোন সুস্পষ্ট ইংগিত মেলে না। সমগ্র ছবি দেখে মনে হয়, কাহনীকার বলতে চেয়েছেন মুখরোচক অনেক কিছু কিন্তু পরিচালক তাকে পরিবেশন করতে গিয়ে জগা-খিচুড়ী করে ফেলেছেন। জয়ন্তকে শেষ কালে পাগল করে দিয়ে গল্পে পরিচালক দিয়েছেন জোড়াতালি। এক জনার্দন চরিত্র ছাড়া কোন চরিত্রই হয় নি। বিপিন ও ভানু চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছে। নবাগত সাধন সরকার ও জনার্দন চরিত্রে সন্তোষবাবুর অভিনয়ও খারাপ হয়নি। নদের চাঁদের ভূমিকায় নবদ্বীপ হালদার—আমাদের

নি। নবদ্বীপকে ঐ চরিত্রে অভিনয় করিয়ে—পরিচালক—নদের চাঁদের চরিত্রটকে অর্থহীন করেছেন। মেয়েদের মধ্যেও প্রভাব অভিনয়টুকু ছাড়া কারও অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয় নি। চিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ ভাল বলা চলে না। সংগীত পরিচালনা—এক প্রকার হয়েছে।

—দীপঙ্কর

মুক্তির বন্ধন

প্রযোজক : নলিনীরঞ্জন বসু। কাহিনী, গীত ও পরিচালনা : অখিল নিয়োগী। সংগীত পরিচালনা : শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী : মণ্টু পাল। প্রধান শব্দযন্ত্রী : নৃপেন্দ্র পাল। রসায়নাগারাধ্যক্ষ : ধীরেন দে (কে, বি)। রূপায়ণে : গীতশ্রী, উমা গোয়েঙ্কা, রাজলক্ষ্মী (বড়), রাজলক্ষ্মী (ছোট), তারা ভাদুড়ী, রেবা, যমুনা, নীলু রায়, রতন গুপ্ত, কিরণকুমার, নীতিশ মুখো, আশু বসু, প্রফুল্ল দাস, শম্ভু প্রভৃতি।

কলকাতার ২টা প্রেক্ষাগৃহে একসংগে 'মুক্তির বন্ধন' মুক্তি-লাভ করেছিল। যুগান্তর পত্রিকা গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার তাদের আমোদ প্রমোদ আসরে সংবাদ পরিবেশনের ভিতর চিত্রজগতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খবর বলে একে অভিহিত করেছেন। সংবাদটা পড়ে মনে হ'লো 'মুক্তির বন্ধন' সত্যিই বুঝি বাংলা চিত্রজগতে যুগান্তর এনে ফেলেছে। যে কাগজখানি শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মত সুযোগ্য সাংবাদিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—যার বিভিন্ন বিভাগে বহু সুধী ও বিজ্ঞ সাংবাদিকেরা রয়েছেন, সেই পত্রিকার এই অভিমত দেখে 'প্রেস-সো'র জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। 'মুক্তির বন্ধন' সেদিনই দেখতে ছুটলাম। আরও দু'তিনজন সাংবাদিক বন্ধুও সংগ নিলেন। ছবিখানি দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা দায় হ'য়ে উঠছিল। কয়েকজন দর্শক অধৈর্য হ'য়ে যে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তাও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। 'যুগান্তর' পত্রিকার সংবাদটি কথা মনে জাগতে লাগলো। ভাবলাম 'যুগান্তর' বোধ হয় আজ-কাল নিজের 'নাম-মাহাত্ম্যের' প্রতি খুব অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাই সব কিছুর ভিতরই তারা যুগান্তর [illegible] এই মনের ভাব পার্শ্বের বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করতেই আর একজন সাংবাদিক বন্ধু উত্তর দিলেন, ও বিভাগটা যে মুক্তির বন্ধনের পরিচালকই পরিচালনা করেন—। এবং স্বপন বুড়োও তিনিই—তাই তার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর নয় ত কী? ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে এলো। বিষ্ণুশর্মার সবটুকু প্রশংসা যে সব পত্র পত্রিকা করতে পারেন নি—এবার বুঝলাম শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে কিরূপ তাদের ওপর বিষোদগার করেছেন। এবং 'মুক্তির বন্ধনের' প্রশংসা করতে পারবোনা বলে নূতন করে যুগান্তর এবং তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'খেয়া' (যদিও চাকরী বজায় রাখবার জন্য তিনি বলেন পত্রিকা তাঁর নয়) মারফত শ্রীযুক্ত নিয়োগীর বিষোদগারের জন্য তৈরী হ'য়ে থাকতে হবে। খেয়া নয় শ্রীযুক্ত নিয়োগীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—সেখানে নিজের ঢাক যথেচ্ছা ভাবেই পেটাতে পারেন—আর তার শব্দের এমন জোর নেই যা বহুজনের কানে যেয়ে পৌছবে। কিন্তু 'যুগান্তর'কেত তার সংগে তুলনা করতে পারি না। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তার মতামতের মূল্য অনেকখানি এবং তা দিতে আমরা মোটেই কার্পণ্য করবো না। জনসাধারণের মতামত গঠনে পত্র পত্রিকার দায়িত্ব অনেকখানি। সে দায়িত্ব থেকে চ্যুত হ'য়ে 'যুগান্তর' ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচার প্রচারের সহায়ক

শ্রীমান বিশুপাল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরি-চালিত 'কালো ঘোড়া'র প্রভাকরের বিভাগে কাজ করছে।

হ'য়ে তার পাঠক সমাজকে ধাপ্পা দেবেন—এই ধাপ্পাবাজীকে আশা করি যুগান্তরেরও কোন সাংবাদিকই মেনে নেবেন না। এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'মুক্তির বন্ধন' সম্পর্কে আমাদের সমালোচনায় যদি কারো কিছু বলবার থাকে—আমরা তা সাদরে মেনে নেবো এবং অতীতেও যে মেনে নিয়েছি রূপ-মঞ্চ পাঠক সাধারণ তা জানেন। জানেন বলেই রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ নেই। যদি কোন স্বার্থান্বেষীদের সন্দেহ থাকে—তাদের সে সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্য চিত্রজগতের বা যে কোন নিরপেক্ষ সাংবাদিক ও পাঠকদের সালিশী আমরা মেনে নিতে রাজী হ'চ্ছি। রূপ-মঞ্চ কেবলমাত্র তার এই নিরপেক্ষতাকে মূলধন করেই জনসাধারণের অন্তর জয় করতে পেরেছে—যেদিন তার এই ধর্ম নষ্ট হবে—সেদিন আর কাউকে অভিযোগ আনতে হবে না—রূপ-মঞ্চ তার রূপ জৌলুষ হারিয়ে সাংবাদিক জগৎ থেকে কোন অতলে তলিয়ে যাবে—আর তার স্থান দখল করবে—নূতন নিরপেক্ষ কোন পত্রিকা এবং একথাও আমরা জোরের সংগে বহুবার বলে এসেছি—এখনও বলছি, যতদিন রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে—ততদিন তাকে ডিঙ্গিয়ে চলবার শক্তি কারো হবে না। যদি তারাও নিরপেক্ষ মতবাদ নিয়ে পথ চলতে পারেন—আমাদের সংগী বৃদ্ধি পাবে—পথ থেকে আমাদের ঠেলে ফেলতে পারবেন না। এবং এই সংগীর জন্য আমরা সব সময়ই উন্মুখ হ'য়ে আছি। আমরাই প্রথম তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানাবো। যোগ্য সংগী পেলে আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে তৎপরতা বৃদ্ধিই পাবে। এবার 'মুক্তির বন্ধনের' সমালোচনার কথা বলা যাক। মুক্তির বন্ধনের কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। পূর্বে শুনেছিলাম রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিয়োগীর একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করেই চিত্রখানি গড়ে উঠছে—রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত কাহিনীটাকেও আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনুমোদন করিনি—তবু তার ভিতর

যেটুকু সম্ভাবনা ছিল আলোচ্য চিত্রে তাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং সেই কাহিনীর চিত্ররূপ বলেও একে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী ইতিপূর্বে খণ্ডচিত্রের পরিচালনা করেছেন—সে চিত্রখানি দেখবার অবশ্য আমাদের সৌভাগ্য হয়নি—তবু মুক্তির বন্ধনের ভার গ্রহণ করবার সময়—চিত্রজগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই আভাষই তিনি দিয়েছিলেন। কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব রূপেই আমরা তাঁকে দেখেছি এবং প্রচার সচিব রূপেও তাঁর দক্ষতার আভাষ পাইনি—দীর্ঘদিন বাদে এবং সম্ভবতঃ এই প্রথম একখানি পূর্ণাংগ চিত্রের পরিচালনা ভার পেয়েছেন বলে আমাদের কিছুটা আগ্রহ জন্মেছিল। অন্যান্য প্রযোজকদের বেলায় নিঃস্বার্থভাবে চিত্র-নির্মান সময়ে আমরা প্রচারকার্য করে থাকি—শ্রীযুক্ত নিয়োগীর বেলায় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী প্রচারকার্য করেছি। কিন্তু মুক্তির বন্ধনকে ইদানীংকার নিকৃষ্ট ধরণের ছবিগুলিরও নীচের স্তরে হাবুডুবু খেতে দেখে একদিক দিয়ে যেমন ব্যথিত হ'য়েছি—শ্রীযুক্ত নিয়োগীর দক্ষতা সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ যা ছিল—বদ্ধমূল হয়েই রয়ে গেল।

মুক্তির বন্ধনের প্রথম প্রতি বন্ধক তার কাহিনী। মাণিক সোনালীর ছোটবেলার অনুরাগ নিয়ে কাহিনীকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এবং পরিণত বয়সে এদের মিলনের সার্থকতায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি করা হ'য়েছে। এই মিলন ঘটাতে যেয়ে সে সব বাধা বিপত্তি ও ঘটনা পরিবেশ করা হ'য়েছে—তা কোন সাহিত্যিকের মগজ দিয়ে আসতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। এবং কাহিনীকে কী ভাবে কোন চরিত্রের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগীর অজ্ঞতা প্রতি দৃশ্যে যে কোন সাহিত্যানুরাগীকে পীড়া দেবে। সাহিত্য সেবায় যাঁদের কেবল মাত্র হাতে খড়িও হয়েছে, এই দুর্বলতা তাঁদেরও দৃষ্টি [illegible] যাবেনা। তারপর আধুনিক কালের সস্তা প্যাচ পারেননি। কালোবাজারী—কিশোর কিশোরীর মুখ দিয়ে আদর্শের বড় বড় বুলি—কৃষক জাগরণের আভাষ—সমাজের তথাকথিত ভণ্ডামি—বালক বালিকার প্রেমানুরাগ—দাতব্য চিকিৎসালয়—আশু বোসের বহুরূপী—বিবাহ বিভ্রাট—ডুয়েট—সস্তা যৌন আবেদন কোন কিছুই বাদ যায়নি মুক্তির বন্ধন থেকে। একে ঠিক খিচুরী বলা চলেনা। তবু খিচুরীর সাদ গ্রহণ করা চলে, একে বলতে হয় পঁচা খিচুরী। কোন চরিত্রই সবল ভাবে দাঁড়াতে পারেনি। সার্থক হয়ে দেখা দেয়নি। প্রথম দৃশ্যে এক সমস্যার অবতারণা দেখা দিল পরবর্তী দৃশ্যে আবার কাহিনী অন্য কথা বলতে চায়। নায়ক মানিকের কথাই প্রথম বলি। মানিককে দেখা গেল সোনালীর সংগে ঘুরে ফিরে খেলা করে বেড়ায় আবার পরের এক দৃশ্যেই শুনলাম সে মামার বাড়ী কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। নারকেল চুরি করে যেভাবে মানিক আর সোনালী ডুয়েট জুড়ে নাচতে আরম্ভ করলো কোন পাড়াগায়ে ওভাবে ছেলে মেয়েদের নারকেল চুবির পর নাচতে দেখা যায়না। তারপর মানিক আর সোনালীর বিয়ের প্রথমে ওদের মুখ দিয়ে যেভাবে কতাবার্তা বলানো হয়েছে শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগীর কাছ থেকে তা আশা করিনি। বিয়ে ভেংগে দিতে হবে অতএব পোলায়ের বিষয় নিয়ে করালী এমনি অস্বাভাবিক ভাবে ছেলের মামাকে অপমানিত করলো যা মোটেই সমর্থন করা চলেনা। বিবাহটা ভাঙ্গতে হবে অতএব যেমন করে হউক করালীকে দিয়ে অপমান করানো চাই। মানিককে সোনালীর বাবা দু'শ অথবা দু' হাজার বিঘে জমি দিয়ে গিয়েছিলেন। সে জমি মামলা করে মানিক করালীর কাছে থেকে আদায়ও করেছিল অথচ সে জমি দিয়ে কী করলো? মানিকের কোন কার্য কলাপেরই পরিচয় নেই। মানিকের বিয়ে ভাঙ্গা—সোনালীর বিয়ে ভাঙ্গা—গায়ের ছবি বলে প্রথম ঢক্কা পেটানো হচ্ছিল অথচ এ সব গায়ে ঘটতে পারে কিনা নিয়োগী মশায় তা আর ভেবে দেখলেন না। বিরিঞ্চি গ্রামেই ঘুরে ফিরে বেরায় করালীর অপকর্মের এক জন [illegible]। অথচ সে একবার সাধু সাজলো আবার

উড়ের বেশে সাপলার কাছে কু প্রস্তাব নিয়ে গেল অথচ তাকে চিনতে পারলোনা। গায়ে বসে গায়ের লোকের চোখে এমনি ভাবে বহুরূপী সেজে ধোঁকা দেওয়া যায় কিনা সে জানলে অখিল বাবু দর্শকদের সামনে এতটা ধোঁকা বাজী খেলতে যেতেন না। করালীকে যে হেতু কুট চক্রী আঁকতে হবে তমন স্বাভাবিক ভাবে চরিত্রের রূপ দেবার ক্ষমতা যদি শ্রীযুক্ত নিয়োগীর থাকতো তবে তাকে জোড় করে কুটচক্রের সংগে জড়িয়ে ফেলতে পারতেন না। করালী সোনালীর বাপের দুর সম্পর্কে ভাই—তারই দাবী নিয়ে তাদের ওপর এতটা কতৃত্ব করবে এটা খুবই হাস্যজনক। সোনালীকে এক একবারে দেখানো হয়েছে (বয়োঃবৃদ্ধির সংগে) কত গম্ভীর আবার চট করে তাকে এমন পরিস্থিতির ভিতর টেনে আনা হয়েছে যেন কত ছেলে মানুষ। কিশোর চরিত্রটীকে শিশু চরিত্র গুলির ভিতর প্রশংসা করতাম যদি কিশোরকে পাকিয়ে তোলা না হতো। কিশোরের ভিতর দিয়ে বড় বড় বুলি কপচিয়ে কিশোর চরিত্রের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগীর অজ্ঞতাই প্রকটিত হয়ে উঠেছে। কিশোরকে দিয়ে তিনি যেন সমস্ত দুনিয়াটা জয় করে ফেলতে চেয়েছেন। সবপেয়েছির আসরটীও স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত করা হয়নি। তবু এটুকুর ভিতর দিয়ে কাহিনীটি ছোটদের কাছে যে আদর্শ উপস্থিত করতে চেয়েছে তার প্রশংসা করবো। ষ্টুডিওর বাইরে বেশীর ভাগ দৃশ্যাবলী গৃহীত হ'য়েছে বলে চোখকে খানিকটা আনন্দ দিয়েছে সত্য—কিন্তু চিত্র গ্রহণের অনিপুণতায় এবং এই দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় যে গ্রাম্য চরিত্র কাহিনীকার আঁকতে চেয়েছেন—তাদের দুর্বলতায় সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হ'য়েছে। সমস্ত চিত্রটীই হ'য়েছে যেন, গ্রামের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন চরিত্রগুলি সাজ পোষাক পরে অভিনয় করে যাচ্ছে। তারপর চুল দাড়ি দিয়ে এবং ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে চাষীদের পৃথক ছাপ দেওয়া ছাড়া চাষী চরিত্রগুলির আর কিছুই ফুটে ওঠেনি। এমনকী তাদের কথাবার্তাও নয়। কাহিনীর দুর্বলতা যেমনি চিত্রটীর গতির সংগে ধরা পড়ে। তেমনি পরিচালনার দুর্বলতাও চোখ এড়িয়ে যায় না।

বাংলা সবাক ছায়াছবি যেদিন আত্মপ্রকাশ করলো সেদিনকার ছবিগুলি থেকেও যেন মুক্তির বন্ধন বিশ বছর পেছিয়ে আছে। প্রথম দৃশ্যের সংগে পরের দৃশ্যের ঘনিষ্ঠ যোগত নেইই। তাছাড়া আরো এমন মারাত্মক ভুল রয়েছে—যা উল্লেখ না করলে চলে না। এবং এই যোগ্যতা নিয়ে অখিলবাবু কী করে চিত্রপরিচালনা করতে সাহসী হলেন তাই ভাবছি। ভদ্রলোকের আত্ম-বিশ্বাসের জোড় বলতে হবে! কিন্তু নিজেকে নিজে বড় বা যোগ্য মনে করলেই ত চলবে না—বড় বা ছোটর যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচারক হচ্ছেন জনসাধারণ—আশা করি অখিলবাবু সেকথাটা চিন্তা করে ভবিষ্যতে এমন অপকর্ম থেকে বিরত হবেন। কাহিনী, রূপসজ্জার

এদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়কার কথা যখন বলতে চেয়েছেন তখন থেকে দশবছর পেছনের সময়ের কথা যদি ছবির প্রারম্ভে বলতে চেয়ে থাকেন—(এবং তাই যে বলেছেন তার প্রমাণ ছবিতে আছে)—তখনকার পরিস্থিতির সংগে ছবির কোন সামঞ্জস্যই নেই। রামসদয়বাবু তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী সোনালীকে গৌরীদান কইতে চাইলেন—কিন্তু তার পূর্বেই যে সর্দার আইন পাশ হ'য়েছিল এটা অখিলবাবু বেমালুম ভুলে গেলেন। একজন বিজ্ঞ জমিদার সব জেনে শুনেই অমন বেআইনি কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। নেতাজীর কথাও একটু ঢুকিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি।

সাপলা ও বাবলা যেভাবে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়লো এবং উভয়ের প্রাণ-চাঞ্চল্যের যে ইংগিত দিয়েছেন পরিচালক তা বহু বছর পূর্বেকার ছবিগুলিতেই দেখা গেছে। গ্রাম্য পরিবেশে ওভাবে ডুয়েট গাওয়ার ভিতর কোন বাস্তবতাই নেই। তারপর প্রথমবার দেখা গেল গায়ে জামা—পর মুহূর্তেই ঐ একই দৃশ্যে সাপলার খালি গা—এ সব সামান্য ত্রুটিও কী শুধরে নেওয়া যেত না? যেসব নূতনেরা আত্মপ্রকাশ করেছেন—তাদের অনেকের মাঝেই সম্ভাবনার ছাপ রয়েছে উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে এরা অনেকেই যে উন্নতি লাভ করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর ভিতর রামসদয়, করালী প্রভৃতি ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাদের সম্ভাবনাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। ছোট মাণিকের ভূমিকায় মাষ্টার শম্ভু—নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বড় মাণিকের ভূমিকায় কিরণ কুমার দুঃখে যাদের জীবন-গড়া থেকেও আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন। নিজের অধ্যবসায়ের বলে আশা করি পরবর্তী চিত্রে তিনি আমাদের আরো খুশী করতে পারবেন। ছোট সোনালীর ভূমিকায় যে মেয়েটী আত্মপ্রকাশ করেছিল—ইতি মধ্যেই সে মারা গেছে। চিত্রখানি তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাবো। অকালে ঝরে পড়া এই শিশু অভিনেত্রীটীর প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয়ই পেয়েছি। আমরা তার আত্মার সদগতি কামনা কচ্ছি ও তার আত্মীয় স্বজনকে এই প্রসংগে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। বড় সোনালীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে নবাগতা গীতশ্রী। আমরা শুনতে পেলাম শ্রীমতী গীতশ্রী মঞ্চাভিনেত্রী রাজলক্ষ্মীর (ছোট) মেয়ে একজন অভিনেত্রীর মেয়েকে অভিনয় জগতে পেয়ে আমরা বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাছাড়া শ্রীমতী গীতশ্রী যে তার মাকেও ছাড়িয়ে যাবে সে সম্ভাবনার পরিচয় তার ভিতর পেয়েছি। আলোচ্য চিত্রের অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণ যেন গীতশ্রী সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধে ধারণা পোষণ না করেন। বড় সাপলাও ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বলেই মনে হয়।

পুরোণ অভিনেতৃদের ভিতর বাবলার ভূমিকায় নীতিশকে প্রশংসা করবো। কিশোরের ভূমিকাটিও সুঅভিনীত হ'য়েছে।

চিত্রের চিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভাবে নিন্দনীয়। এত নিম্ন শ্রেণীর চিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ অনেকদিন বাংলা ছবিতে দেখিনি। সম্পাদনায়ও বহু ত্রুটি চোখে পড়ে।

সংগীত কোনই সাড়া দেয় না—গানের কথাগুলিও এজন্য কম দায়ী নয়। সাতখানা গান দেওয়া হ'য়েছে—গান গুলি শুনতে ঔৎসুক্য জাগে না—অধৈর্য হ'য়ে উঠতে হয়। সমালোচনা প্রকাশিত হবার পূর্বেই হয়ত মুক্তির বন্ধন প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে বাধ্য হবে। এই ধরণের ছবিগুলিকে এই ভাবে অভিনন্দন জানিয়েই আশা করি দর্শক সাধারণ অযোগ্যদের যোগ্য উত্তর দেবেন।

—শীলভদ্র

দীর্ঘ বিরতির পরে বালীতে অভিনয় আসর: গত শনিবার (১৪ই জুন) রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সম্পাদক, মারুতী নাট্য সমাজ) বহির্বাটিতে মারুতী নাট্য সমাজের নবতম

নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত বলাই ঘটক এবং সংগীত পরিচালক-বর্গ শ্রীযুক্ত বলাই ভট্টাচার্য, শিবদাস রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর চ্যাটার্জি নবভাব ও সুরের আবেদনে দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করেন। অভিনয় সর্বাংগসুন্দর হয় কিন্তু নাটকটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। শূদ্র শম্বুকের দণ্ডবিধান দৃশ্যটির অবতারণার সহিত নাটকের প্রকৃত গতির কোন যোগসূত্র ছিল না। এবং 'গোবর্দ্ধন.' 'রুক্মিণী' 'ভজহরি'র আবির্ভাব অনেকটা 'সাঁজের বেলার ঝোপের ভূত'এর পর্যায়ে পড়েছে। উক্ত হাস্যোদ্দীপক অহেতুক অংশগুলি বাদ দিলেই ভাল হয়। দণ্ডবিধান দৃশ্যটি বজায় রেখে আরও দু'একখানি সংগীত সংযোগ করে পরবর্তী আসরে এইরূপ সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করলে অতীব সুরুচির পরিচায়ক হবে সন্দেহ নাই। সৌখীন সম্প্রায়ভুক্ত প্রথিত-যশা অভিনেতা ও আলোচ্য নাটকের নাট্য-পরিচালক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ ঘটক শ্রীরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শম্বুকরূপে সুশীল মাল, লক্ষ্মণ বেশী চণ্ডী ঘোষ ও বিজয়ার ভূমিকায় সদানন্দ পাল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারূপে দর্শকবৃন্দের অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। সীতা (রামচন্দ্র সিংহ), ঊর্মিলা (ভোলা বক্সী), শত্রুঘ্ন (পান্নাকুমার) ও তুঙ্গভদ্রার অভিনয় অতীব সুন্দর হয়। লব ও কুশ রূপে কুমারী ছায়া কুমার ও সন্ধ্যা ব্যানার্জি এবং দীপকরূপে কুমারী মীণা ব্যানার্জী ভাবে, ভাষণে ও সংগীতে অতীব হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করে! কুমারী কুন্তলা চক্রবর্তী, কুমারী শান্তিকুমার (দেববালা), দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (শ্রীকান্ত), ফুলকুমার মুখার্জী (সত্যশরণ) সংগীতের মূর্ছনায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করেন। শেষদৃশ্য বাল্মিকী (ধ্রুব গাঙ্গুলী) ও চক্রধর (মোহিত ঘোষ) সুসংযত অভিনয় নৈপুণ্যে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। অন্যান্য ভূমিকা মন্দ নহে। দৃষ্টিকটু হলেও গোবর্ধন (সুশীল কয়াল), রুক্মিণী (মদন চ্যাটার্জী), ভজহরি (পশুপতি নস্কর) চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরিচালকগণের সুপরিচালনাগুণে অভিনয়ের গতি অব্যাহত থাকে। অভিনয় শেষ হবার প্রারম্ভে সমাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর ব্যানার্জি নাট্য ও সংগীত পরিচালকবর্গকে পুষ্পস্তবকদানে সম্মানিত করেন। শ্রীযুক্তা শান্তি ব্যানার্জি (বালী), শ্রীযুক্ত রবীন ব্যানার্জী (উত্তরপাড়া), শ্রীযুক্ত বলাই চ্যাটার্জী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণার্জুন শর্মা প্রমুখ অনেক গুণী শিল্পিবৃন্দের গুণমুগ্ধ হয়ে রৌপ্যপদক দান করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে বালী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারীণ ভট্টাচার্য, শশীভূষণ ব্যানার্জীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ রায় (সাধারণ পরিচালক) এর সুব্যবস্থায় অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

পুতুলের দেশ

গত ২৭শে জুলাই সকাল নটায় রঙমহল রঙ্গ-মঞ্চে আনন্দ বাজার পত্রিকার 'আনন্দ মেলার' মৌমাছি লিখিত শিশু-

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানটী উদ্বোধন করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শিক্ষা মন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, অন্যতম মন্ত্রী কমল রায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রবি রায়, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, অখিল নিয়োগী, গোপাল ভৌমিক, সাগরময় ঘোষ, কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো বহু সুধীজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

'পুতুলের দেশ' ইতিপূর্বে আনন্দ মলার শিশুদের দ্বারা অভিনীত হ'য়েছে। তখন এই অভিনয় আনন্দ মেলার সভ্য-সভ্যাদের ভিতরই ছিল সীমাবদ্ধ। বর্তমানে রঙমহল রঙ্গ-মঞ্চে প্রতি রবিবার সকালে সর্বসাধারণ শিশুদের জন্য প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে এই অভিনয়ের দ্বার খোলা থাকবে। রঙমহল কর্তৃপক্ষ এবং আনন্দ মেলার মৌমাছির প্রচেষ্টায় 'পুতুলের দেশ' সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হ'য়ে যেমনি পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চের স্বীকৃতি পেল —অর্থাৎ আরো একটী রঙ্গ-মঞ্চ ছোটদের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন—তেমনি সর্বসাধারণ শিশুরা এই অভিনয় দেখবার সুযোগ পেল।

পূর্ব সংখ্যায় কালিকা রঙ্গ-মঞ্চকে বিষ্ণুশর্মা মঞ্চস্থ করবার জন্য আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি—বর্তমান সংখ্যায় রঙমহল রঙ্গ-মঞ্চকেও অনুরূপ অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'পুতুলের দেশ' নাটকটী রূপক নাটক। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের দু'শবছরের কথা অতি সংক্ষেপে এই নাটকে রূপায়িত করে তোলা হ'য়েছে। তাই রাজনৈতিক রূপক শিশুনাট্যই একে বলা চলে। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছে—তারা সবাই শিশু এবং কিশোর কিশোরীও আছে। এতে এই অভিনয় শিশুদের সংগে অতি সহজেই মিতালী পাতাতে পারবে। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছে—সবাই আনন্দ মেলার সভ্য ও সভ্যা—পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চে এদের প্রথম আত্মপ্রকাশের সেকথা বলতেই হবে। এবং এরা অভিনয়ে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে—কর্তৃপক্ষের মর্যাদা তাতে পূর্ণ ভাবেই রক্ষিত হ'য়েছে। পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চের যেকোন শিশু অভিনেতা বা অভিনেত্রীর চেয়ে এরা যে কোন অংশে কম নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়নি— এজন্য 'পুতুলের দেশের' সমস্ত শিশু শিল্পীদের রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর ভিতর 'পুতুলের মায়ের' ভূমিকায় যে মেয়েটী অভিনয় করেছে তার কথা একটু বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই।

'পুতুলের দেশের' একটী বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে—রূপকের ভিতর দিয়ে নাট্যকার যে বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—তার রাজনৈতিক জটিলতা সব শ্রেণীর শিশুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। অথচ নাট্যকারের এই প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করতেও পারি না। তাই এসম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং কর্তৃপক্ষের কাছেও আমাদের একটী বিশেষ পরিকল্পনা উপস্থিত করতে চাই—আশা করি তাঁরা তা গ্রহণ করবেন। প্রতি দশজন শিশু দর্শক প্রতি অন্ততঃ একজন করে অভিভাবক সংগে থাকবেন এবং প্রতিটী দৃশ্য ও তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা তাঁরা শিশু দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। এজন্য প্রতি দশজন পিছু একজন অভিভাবকের প্রবেশ পত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন মূল্য গ্রহণ করবেন না। কারণ, এঁরা পরোক্ষ ভাবে তাঁদের প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করবেন। তবে শিশুদের সংগে যে অভিভাবক যাবেন—তিনি শিক্ষক স্থানীয় অথবা কোন দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ নিজেদের তরফ থেকে এরূপ কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করতে পারেন—যাঁরা অভিনয়াংশ শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন এবং এই অভিনয় শিশুরা কী ভাবে গ্রহণ করছেন তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এবিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার শিশু নাট্যাভিনয় পদ্ধতির প্রতি আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ' পুস্তকখানির সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চের [illegible] শিশু নাট্যাভিনয় বিভাগটির কথা উল্লেখ করতে চাই।

বিষ্ণুশর্মা

গত সংখ্যায় রূপ-মঞ্চে বিষ্ণুশর্মার যে সমালোচনা প্রকাশিত হ'য়েছে—তাতে বিষ্ণুশর্মাকে আমরা কী ভাবে প্রশংসা করেছি—আশা করি পাঠক সাধারণ তা স্বীকার করবেন। প্রথমে একটা কথা বলে রাখি, রূপ-মঞ্চে কোন সমালোচনা যে নামেই প্রকাশিত হউক না কেন—তাকে ঐ সমালোচকের ব্যক্তিগত অভিমত বলে যেন কেউ মনে না করেন। যে কোন সমালোচকের অভিমত রূপ-মঞ্চেরই অভিমত। এবং তার দায়িত্ব সমষ্টী ভাবে রূপ-মঞ্চের সমালোচক গোষ্ঠীর। গত সংখ্যার সমালোচনা বিষ্ণুশর্মার প্রস্থিক স্বপন বুড়োকে খুশী করতে পারেনি। তাই যেসব পত্র-পত্রিকা তাঁর মুঠোর ভিতর রয়েছে তিনি সেগুলির মারফৎ আমাদের এবং আরো যাঁরা সমালোচনা প্রসংগে দু'একটা সত্য কথা বলেছেন—তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা স্বপন বুড়োর ব্যক্তিগত স্বরূপটা প্রকাশ করছি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। গত সংখ্যায় তাঁরই অনুমতি নিয়ে তার নাম প্রকাশ করা হ'য়েছে। যুগান্তর পত্রিকার 'আমোদ-প্রমোদ' আসরের ভারও তারই ওপর এবং যুগান্তর কর্তৃপক্ষ হয়ত জানেন না—যুগান্তরে সংবাদ মুদ্রণের ও নরম সমালোচনার লোভ দেখিয়ে শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'খেয়ার' জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে থাকেন। মুক্তির বন্ধন চিত্র খানিও তিনিই পরিচালনা করেছেন এবং যুগান্তরকে শিখণ্ডিরূপে দাঁড় করিয়ে—একধারে প্রযোজকের কাছে চিত্র পরিচালনার উমেদারী নিয়ে যে তিনি হাজির হ'য়েছেন সে সংবাদও আমরা রাখি। রূপবাণীর একসময়ে তিনি প্রচার সচিব ছিলেন—রঙমহল ও এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্সের প্রচার সচিব হিসাবেও বহুদিন কাজ করেছেন। এম্পায়ার টকীর প্রচার বিভাগে কাজ করবার সময় তাঁর রচনা এবং রচনার সংগে কিছু পারিশ্রমিক না দিলে অনেক পত্র পত্রিকাতেই কোন বিজ্ঞাপন দিতেন না এবং কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচরে একথা যখন যেয়ে পৌছোয়—এম্পায়ার থেকে চাকরী যাবার মূলে এও একটা কারণ হ'য়ে দেখা দেয়। যে কথাগুলি বল্লাম—এর প্রত্যেকটী প্রমাণ করবার মত মালমসলা আমাদের হাতে আছে। এবং শ্রীযুক্ত নিয়োগীর স্বহস্তে লিখিত কতগুলি চিঠিও আমাদের এই অভিযোগের সাক্ষ্য রূপে দাঁড় করাতে পারবো। জীবনের বেশীর ভাগ দিন চিত্র ও নাট্য-কর্তৃপক্ষের দাসত্ব যিনি করে এসেছেন—কোন পত্রিকার নিরপেক্ষ সত্য ভাষণ যে তিনি সহ্য করতে পারবেন না—তা আমরা জানি। তাছাড়া যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ি বিভাগে অনেকের লেখা স্থান করে দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব পত্রিকার কাজ করিয়ে নেন—এমন কী কাগজ সংগ্রহ করেন তাও আমাদের অবিদিত নেই।

বিষ্ণুশর্মাকে নানাভাবে আমরা প্রশংসা করেছি এমন কী সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও তার কথা উল্লেখ করেছি—কিন্তু তবু নাচের দৃশ্যটীকে প্রশংসা করতে পারিনি বলে স্বপন বুড়ো খুশী হতে পারেন নি। তার নিজস্ব পত্রিকায় জনৈক মুক্তি যোদ্ধার একটী পত্র ছেপে যে কথাগুলি বলতে চেয়েছেন—সে কথাগুলি মুক্তি যোদ্ধার মুখ দিয়ে নিজেই যে বলেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগবার আমাদের কিছুটা কারণ আছে বৈ কী? কারণ, স্বপন বুড়ো বিষ্ণু শর্মার প্রশস্তির উমেদারী নিয়ে যখন আমাদের কাছে উপস্থিত হন, তখন ঐ দৃশ্যটী তাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে বলি—তিনি তার সপক্ষে যে কথাগুলি বলেছিলেন—মুক্তি যোদ্ধার চিঠিতে হুবহু সেই কথাগুলিই স্থান পেয়েছে। তাই এবিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জাগাটা কী অস্বাভাবিক? এমনকী কোন একটী পত্রিকায় বিষ্ণুশর্মার বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হ'লে সেই পত্রিকার বিরুদ্ধেও আমাদের মন্তব্য করতে শ্রীযুক্ত নিয়োগী উত্তেজিত করেন—কিন্তু আমরা তাতে অস্বীকার করি।

নাচের দৃশ্যটী সম্পর্কে আমাদের অভিমত পরিষ্কার করে বলছি। এই দৃশ্যটী পুত্র বিরহ কাতরা রাণীকে আনন্দদানের জন্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। রাণীর বিরহ কাতরা মনের আভাষ নাটকে অন্যত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর নাচের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কেও আমাদের আপত্তি নেই—আমাদের আপত্তি হচ্ছে যেহেতু শিশু নাটক—সেখানে এই

মধ্যবর্তী জাতীয় সরকারের শ্রম-মন্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী সকাশে রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধি !

—(০)০ঃ০(০)—

চিত্র, নাট্য-মঞ্চ, বেতার এবং বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা

১৯শে জানুয়ারী, রবিবার। দমদম বিমান ঘাটিতে যেয়ে অপেক্ষা করছি। মধ্যবর্তীকালীন জাতীয় সরকারের শ্রম-মন্ত্রী মাননীয় জগজীবনরাম এবং রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী বাংলার সেবাব্রতী মেয়ে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীরও আসবার কথা ঐ একই বিমানে। বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত বিরাট চন্দ্র মণ্ডলের শ্রম-মন্ত্রীকে এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করবার কথা। বিরাট বাবু ছিলেন নোয়াখালীতে, সমস্ত আয়োজনের ভার দিয়ে যান এ, সি মুখার্জি এ্যাণ্ড ব্রাদার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের ওপর। 'আসাম বেঙ্গল পেপার মিল' নামে এদেরই আওতায় সম্পূর্ণ বাঙ্গালী এবং আসামীদের মূলধনে একটি কাগজের মিল গড়ে উঠছে। যুদ্ধের সময়ে কাগজের অভাবের জন্য যে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল—আশা করি রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজও তা' ভুলে যান নি। বর্তমানেও কাগজ সরবরাহের অনিশ্চয়তা সময়মত রূপ মঞ্চ প্রকাশে যে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, তাও অস্বীকার করতে পারি না। তাই নূতন একটি কাগজ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান যখন গড়ে উঠছে এবং রূপ-মঞ্চকে সর্ব প্রকার সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি যখন কর্তৃপক্ষ দিলেন—ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সহযোগীতা করবার প্রতিশ্রুতিও আমি না দিয়ে পারিনি। এদেরই কার্যালয়ে ভোজ-সভার আয়োজন হ'য়েছে। একই বিমানে শ্রীযুক্তা কৃপালনীও আসছেন। এই অনুষ্ঠানে তাই তাঁকেও বিশেষভাবে পাবার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শ্রম-মন্ত্রীর ভোজসভায় যোগদানের কথা থাকলেও নিশ্চয়তা ছিল না। প্রথম দিন যখন তাঁর সংগে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি, তিনি বলেন, 'বিমানের অনিশ্চয়তার জন্য আমি সঠিক কিছু বলতে পারি না। যদি সময় থাকে ত নিশ্চয়ই যোগ দেবো। অবশ্য ২-৩০টায় ওদিনই আমাদের দিল্লী রওনা দিতে হবে—২০শে গণ-পরিষদের পুনরাধিবেশন।' তবু তাঁর কাছ থেকে মৌখীক সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলাম, শ্রীযুক্তা কৃপালনী'কে আগে থেকে কিছুই জানানো হয় নি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অসুস্থ। সমস্ত আয়োজন শেষ। আগের দিন সারারাত জেগে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বন্ধুরা এবং এ, সি, মুখার্জি এ্যাণ্ড ব্রাদার্স লিঃ-এর কর্মীরা এই বিশেষ অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য তাদের ৭, হেষ্টিং ষ্ট্রিটস্থিত কার্যালয়টি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখলেন। ১৯শে জানুয়ারী সকাল বেলা, ১০-৩০টায় এঁদের দমদম বিমান ঘাটিতে পৌঁছবার কথা। ৯টায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমায় ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, "এ দায়িত্ব তোমার নিতেই হবে—ওদের আনতেই হবে। গাড়ী প্রস্তুত। কে কে তোমার সংগে যাবে নিয়ে বেরিয়ে পড়।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম—দায়িত্ব আমার নিতেই হ'লো। মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শিবকুমার সিংহ—পুরোন বন্ধু। তিনিও আসছেন এই সংগে। তাছাড়া অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রকাশের সংগেও পূর্বদিন আলাপ আলোচনায় বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। এঁদের কথা মনে করে রওনা হলুম। আমার সংগে চললেন—যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধু প্রদ্যোত

'বীর সৈনিকের তেজস্বিতা নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশনায় নূতন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিয়েছেন—আমি তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলাম।' ফটো :—রূপ মঞ্চ (ডি, সরকার)।

ঘাটীর এলাকার ভিতর আমরা পৌঁছলাম। বিশ্রামাগারের সামনে গাড়ী যেতে না যেতেই আমি লাফিয়ে পড়লাম। আমার বন্ধুরাও আমায় অনুসরণ করলেন। প্রথমেই আই, এন, এ, (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ) —এর 'হেডকোয়ার্টার অফিসে' খোঁজ নিতে গেলাম। আমরা বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হলুম, যখন শুনলাম, এখনও তাঁরা কেউ এসে পৌঁছোননি—একটা বিশেষ 'ডাকোটা' বিমান তাঁদের আনতে সকাল বেলাই রওনা হ'য়ে চলে গেছে। আমাদের কিছু পরেই ডাঃ বিধান রায়ের তরফ থেকে শ্রম-মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁর সহকারী ডাঃ অনিল চক্রবর্তী যেয়ে উপস্থিত হ'লেন। চর্মকার সমিতি এবং বহু প্রতিষ্ঠান থেকে একে একে সকলে যেয়ে হাজির হ'লেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকেও বহু সাংবাদিকেরা যেয়ে উপস্থিত হ'য়েছেন—তাঁদের অনেকের গলায় ক্যামেরা ঝুলছে। আমরা সমস্ত বিমানঘাটীটা মুখরিত করে তুলেছি। সব সাদা মুখগুলো এই কালা আদমীদের সপ্রতিভ চলনে নিজেদেরই ভিতর হয়ত নানান

মিত্র, শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত রমেশ মণ্ডল আসাম বেঙ্গল পেপার মিলের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত শচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বরাজ পত্রিকার ক্যামেরাম্যান বন্ধুবর ধীরেন সরকার। আর সংগে নিলাম মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য আমাদের মনের অভিব্যক্তি স্বরূপ কয়েক গুচ্ছ সাদা ফুলের মালা। রওনা দিতে আমাদের একটু বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। শ্যামবাজারের মোড় পৌঁছতেই সাড়ে দশটা বেজে যায়। জাতীয় পতাকা দিয়ে আমাদের গাড়ী দুটোকে সাজানো হ'য়েছিল। রাস্তার দু'পাশের পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা ছুটে চল্লাম। হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর গাড়ীর চালককে বলছি, "জোরে ভাই জোরে—আরও জোরে, যত গতি সহ্য হয়।" বিমান-

কথা নিয়ে আলোচনা করছে আমাদের দিকে তাঁদের ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকেই তা বুঝে নিলাম। আমাদের বেপরোয়া গতি তাঁদের কিছুটা আশ্চর্যই করে তুলেছিল। 'বোঁ—বোঁ' বিমানের শব্দে আমরা সচকিত হ'য়ে উঠলাম। চেয়ে দেখি বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বিমান ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা উদগ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য করছি বিমানটাকে। আমাদের কালা শ্রীমান শ্রীমতীরা আসছেন! নিকটস্থ রেডিওর ঘোষণা থেকে আমাদের সে ধারণা দূর হ'লো। নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের বিমান ওখানি—আমাদের কেউ নেই ওতে। তবু ওর প্রতি উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। যাত্রীদের অবতরণ লক্ষ্য করলাম। এদের নামা এবং যাবার পালা শেষ হ'তে না হ'তেই আবার উপরে 'বোঁ—বোঁ' শব্দ আরম্ভ হ'লো।

খোঁজ নিয়ে জানলাম—হ্যাঁ আমাদেরই এঁরা আছেন এই বিমানে। কিছুক্ষণ বাদে রেডিওতেও ঘোষিত হ'ল। বিমানটী ততক্ষণ আমাদের মাথার ওপর এসে গেছে। ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। তার ধাপে ধাপে নামা গতির সংগে আমাদের দৃষ্টিও ঘুরপাক খাচ্ছে। বিমানটী মাটি স্পর্শ করে- খানিকটা দূরে চলে গেল—আমাদের দৃষ্টিও তাকে অনুসরণ করে চলেছে। মোড় ঘুরে বিমানটী নির্দেশকের নির্দেশমত আমাদের দিকেই আসতে লাগলো। আমাদের আনন্দ ও উত্তেজনাও যেন ধাপে ধাপে বেড়ে চললো। আমাদের আনন্দ ও উত্তেজনা বহিঃপ্রকাশের জন্য ছটফট করতে লাগলো—আমাদের পূর্বেই পিছনের বন্ধুরা মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ' ধ্বনিতে বিমানঘাটিটী মুখরিত করে তুললেন—আমরাও তাঁদের সংগে যোগ না দিয়ে পারলুম না। বিমানটী আমাদের পাশ ঘেসে এসে দাড়ালো। সিঁড়ি লাগানো হ'লো। দু'একজন যাত্রী নেমে এলেন। আমাদের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি বিমানের ভিতর চলে গেল। হ্যাঁ—এবার পা বাড়িয়েছেন অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকারের শ্রম-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম। দেশের মুক্তি-যুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—দেশমাতৃকার শৃঙ্খলোন্মোচনের জন্য—কতবার, কতবার তাকে বৈদেশিক সরকারের নির্যাতন সহ্য করতে হ'য়েছে। কিন্তু তবুও অমলিন! বীর সৈনিকের তেজস্বিতা নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশনায় নূতন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিয়েছেন—আমি তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলাম বিরামহীন ভাবে আমাদের বন্ধুরা 'বন্দেমাতরম' আর 'জয়হিন্দ' ধ্বনি করে যাচ্ছেন। মালা পরিয়ে আমি নিজেও খানিকটা অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। চল্লিশ কোটি মানবের মুক্তির আহ্বান ধ্বনিতে মুক্তি-সাধকের চোখমুখে যে তৃপ্তির আভাস দীপ্তি পেতে লাগলো—সে ছবি কালির দাগ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় না। চর্মকার সমিতি, বেঙ্গল ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাস এসোসিয়েশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শ্রম মন্ত্রীকে মাল্য ভূষিত করলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে।

ধীর পদক্ষেপে নেমে এলেন—বাংলার সেবাব্রতী মেয়ে রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী। তাঁর

'তাঁর বিষাদক্লিষ্ট মুখাবয়ব নোয়াখালীর নির্যাতিতদের ছবি নিয়ে ভেসে উঠলো ...আমি ঐ বিষাদসিন্ধুর দিকে তাকাতে পারলুম না। মূঢ়ের মত তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলাম।' ফটো : রূপ-মঞ্চ (পি, সরকার)।

বিষাদক্লিষ্ট মুখাবয়ব নোয়াখালীর নির্যাতিতদের ছবি নিয়ে ভেসে উঠলো। নির্যাতিতরা শতকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো। "ওঠো জাগো তোমরা পাশবিক শক্তিকে সমূলে ধ্বংস ক'রো—" কত পুত্রহীনার অসহনীয় জ্বালা—স্বামীহারা, কন্যাহারা, গৃহহারা—কত সর্বহারাদের দুঃখের বিষ আকণ্ঠ পান করে শ্রীযুক্তা কৃপালনী নেমে আসছেন। আমি ঐ বিষাদসিন্ধুর দিকে তাকাতে পারলুম না, মূঢ়ের মত তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলাম। আমার মনের ভাষা বার বার আছাড় খেয়ে মনের মাঝেই কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো—এমনি সেবাব্রতে বাংলার প্রতিটি মেয়ে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—সকলের দুঃখ-

মাননীয় শ্রম-মন্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীকে সাংবাদিক, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভ্য ও আসাম বেঙ্গল পেপার মিলের কর্মীদের মাঝে দেখা যাচ্ছে। ফটো: ধীরেন সরকার (রূপ-মঞ্চ)।
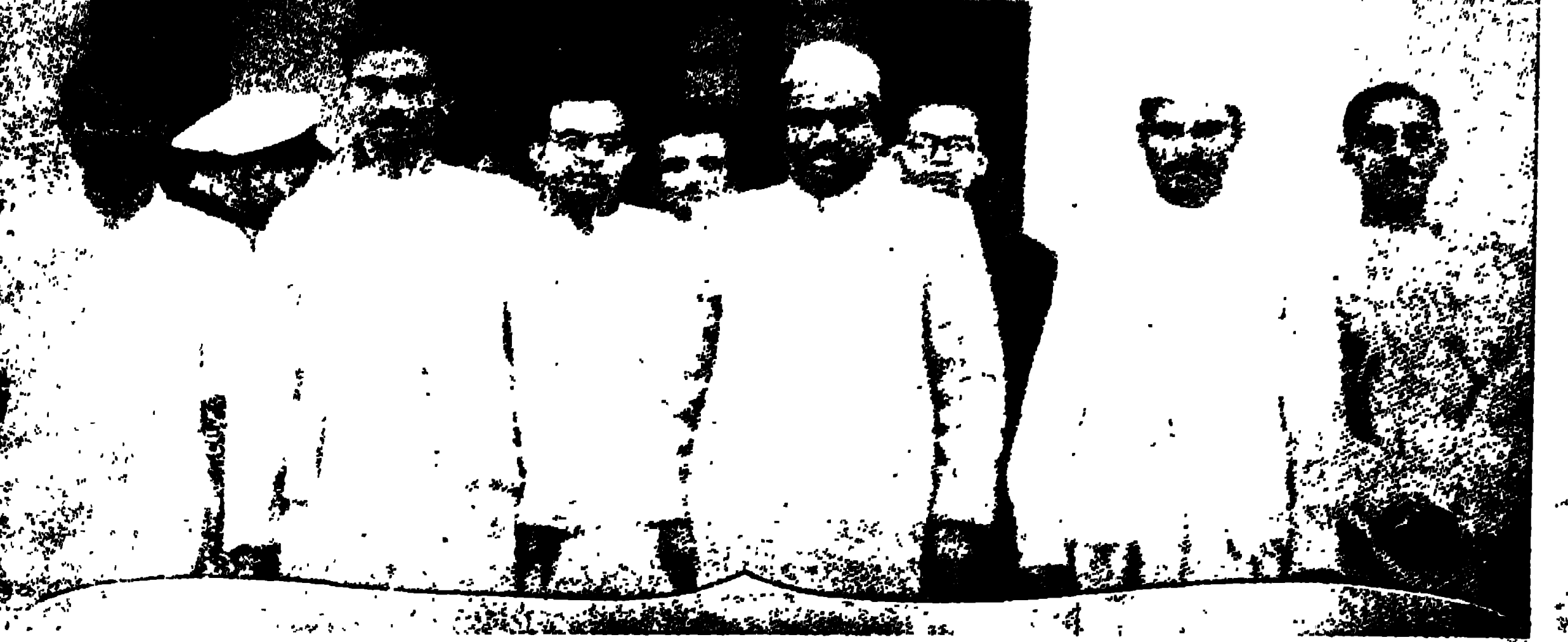
দুর্দশা এমনি আকণ্ঠ পান করে—গৃহের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীর গণ্ডি তুলে দিয়ে সমস্ত ভারত জুড়ে যে বিরাট পরিবার রয়েছে তার দায়িত্ব গ্রহণ করুন তাঁরা।

এরপর নামলেন বন্ধুবর শিবকুমার সিংহ এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশ। তাঁদের আলিঙ্গন দিয়ে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য অনুরোধ করে শ্রীযুক্তা কৃপালনীর কাছে আমাদের উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করলাম। সময় কম বলে তিনি প্রথমে আপত্তি তুললেও আমাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কয়েক মিনিট আমাদের এদিক-সেদিকে গেল। শ্রীযুক্ত প্রকাশ এবং শিবকুমার ওখানেই রয়ে গেলেন—মালপত্র এবং দিল্লী যাত্রার আয়োজনে। ডাঃ রায়ের প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদেরও আমরা আমন্ত্রণ জানালুম। শ্রীযুক্তা কৃপালনীর সংগে অন্য বন্ধুদের দিয়ে—শ্রম-মন্ত্রীকে নিয়ে আমি উঠলাম তাঁরই এক বন্ধুর প্রেরিত গাড়ীতে। আমরা আগে চলেছি—পেছনে আর সকলে। বিমান ঘাটীর সীমানা অতিক্রম করা পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ কাটলো। তারপর শ্রীযুক্ত জগজীবন রামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লাম, "আপনাকে যে আমরা আমাদের মাঝে কিছুক্ষণের জন্যও পেয়েছি—এই টুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের বন্ধুরা আপনাকে পেয়ে খুবই খুশী হবেন।" নোয়াখালী-বিহার এবং দেশের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবার পর আমি বল্লাম, "এবার আমি আপনাকে বাংলার মঞ্চ ও পর্দা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকটি কথা বলতে চাই।" শ্রীযুক্ত রাম আমার প্রশ্নের জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মঞ্চ ও পর্দা মারফৎ দেশের উন্নতির যে সম্ভাবনা রয়েছে তা আপনি স্বীকার করেন কিনা। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী! আপনি নিজে কোন ছবি এবং নাট্যাভিনয় দেখেছেন কিনা এবং দেখে থাকেন কিনা?" প্রশ্নগুলি করার সংগে সংগেই বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। হয়ত বা উত্তর পাবো, "না, দেশটা উচ্ছোন্নে গেল এই সিনেমা আর থিয়েটারের জন্য।" আমার সংশয় কাটিয়ে শ্রম-মন্ত্রী দৃঢ়তার সংগে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। মঞ্চ ও পর্দা মারফৎ দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'তে পারে। আমাদের মঞ্চ ও পর্দা অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার পরিচয় দেয় বলেই মঞ্চ ও পর্দার প্রতি অনেকের সংশয় জাগে। এই সংশয় কাটিয়ে নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে তার দায়িত্ব পালনে সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে। বৈদেশিক ছবির কাছে আমাদের দেশীয় চিত্রের দৈন্যতা সহজেই চোখে পড়ে। আমাদের বিপুল জনসংখ্যার অশিক্ষা দূর করণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই চলচ্চিত্র সম্পাদন করতে পারে। ইংরেজী, আমেরিকান এবং দেশীয় ছবি দেখবার সুযোগও আমার হ'য়েছে। আমি দেখে থাকিও। ইংরেজী ছবি দেখে আমি বেশী আনন্দ পাই। আমেরিকান

রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধি মাল্যভূষিত করবার পর মাননীয় শ্রম-মন্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী। ফটো: রূপ-মঞ্চ (ডি, সরকার)।

ছবির চেয়েও বৃটিশ ছবি আমার ভাল লাগে। কবিগুরুর নাট্যাভিনয়ও দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। আমাদের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের সুষ্ঠু পরিবেশন তার মাঝে পেয়েছি। দর্শক হিসাবে তৃপ্তিও কম পাইনি।"

আমি এবার একটু জোর পেলাম। আমার পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করলাম। "আমাদের বর্তমান জাতীয় সরকার চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের উন্নতির জন্য ব্যাপক-ভাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা এবং এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?" শ্রম-মন্ত্রী বল্লেন, "কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কী ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কী না করবেন—তা বলতে পারেন তিনিই, যিনি এ বিভাগটীর ভার নিয়ে আছেন। তবে প্রাদেশিক সরকারেরও যে এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে আমি তা স্বীকার করি। এবং বম্বের প্রাদেশিক সরকার এ নিয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণও করেছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারদের বম্বেকে অনুসরণ করতেই আমি অনুরোধ করি।" কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা শ্রম-মন্ত্রী এড়িয়ে যাচ্ছিলেন মনে হওয়াতে আমারও মাথায় একটু দুষ্টুমি চেপে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সারাদিন কলকারখানায় কাজ করবার পর আমাদের কুলি মজুর ভাইদের চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে আপনি স্বীকার করেন কিনা।" শ্রম-মন্ত্রী একটু হেসে ফেল্লেন। আমার চাতুরী যে তিনি ধরে ফেলেছেন তাঁর হাসি থেকেই এটুকু বুঝলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমায় এড়িয়ে যেতে দেবেন না এইত! বেশ, এ বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত করে কথা দিতে পারি। শ্রমিকদের আনন্দ এবং শিক্ষার জন্য আমোদ প্রমোদের যতখানি প্রয়োজন হবে তার ব্যবস্থা আমি করবো। এবং তারা যাতে বিনা মূল্যে এইসব সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্যও সচেষ্ট থাকবো।" আমি তখন কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তার কথা উল্লেখ করে বললাম, "এই বিভাগগুলি যে ভাবে প্রচারিত হয়—তার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। শ্রমিক আন্দোলনে যাঁরা শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করেছেন—শ্রমিকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেরূপ বাস্তবদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই এই বিভাগগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হ'বে। এবং শ্রমিককেন্দ্রে বিনামূল্যে বেতার যন্ত্র বিলি করতে হবে—নইলে যাদের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়—তাদের কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।" শ্রম-মন্ত্রী গভীর ধৈর্যের সংগে আমার এই কথাগুলি শুনে উত্তর দিলেন, "আপনার সমস্ত বিষয়গুলিই আমি মেনে নিচ্ছি। প্রগ্রাম কে বা কারা তৈরী করবেন—কী প্রগ্রাম প্রচার করা হ'বে—এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। তবে শ্রমিককেন্দ্রে বিনামূল্যে বেতার যন্ত্র বিলি করবার বিষয়ে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি—এ বিষয়ে আমার বিভাগ ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। শুধু মৌখিক কথায়ই নয়, কাজেও তার নিদর্শন পাবেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা করছি এবং আংশিকভাবে কাজেও অগ্রসর হয়েছি।" আমার সংগে যে বন্ধুটী ছিলেন শ্রমিকদের স্ট্রাইকের প্রতি শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন, "দেশের এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের এই স্ট্রাইক কোন মতেই সমীচীন নয়—"আমি উত্তর দেবার পূর্বেই শ্রম-মন্ত্রী বল্লেন, "যখন আর কোন উপায় থাকেনা শ্রমিকরা শেষ অস্ত্ররূপে স্ট্রাইকের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। তাই স্ট্রাইকের পূর্বেই মালিকদের সকল বিষয়গুলি সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করে দেখতে হবে।" আমি বল্লাম, 'আমরা যদি তাদের ভাল খাওয়া, ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তবে শ্রমিকদের মনে কোন অসন্তোষের কারণ থাকতে পারেনা। এবং সেই দৃষ্টি ভংগী নিয়েই আমাদের শ্রমিকদের সমস্যাগুলি বিচার করে দেখতে হবে।" শ্রম-মন্ত্রী আমার কথায় জোর দিয়ে বল্লেন, "নিশ্চয়ই, শ্রমিক আন্দোলন দমিয়ে নয়—তাদের সমস্ত অসন্তোষ দূর করে দেশের অগ্রগতির পথে তাদের সবল ভাবে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবো।" সহরের বস্তীর উন্নতি এবং শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতির আরো বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'লো শ্রম-মন্ত্রীর সংগে। নোয়াখালীতে বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের ক্ষতির কথা বলতে বলতে শ্রম-মন্ত্রী অভিভূত হ'য়ে পড়েন। মহাত্মা

গান্ধীর প্রসংগে বলেন, "নোয়াখালীতে মহাত্মা যা করছেন তা তাঁর মত মহাত্মারই কাজ। যতই তাঁকে দেখি ততই যেন তাঁর সম্পর্কে ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে। মহাত্মার কার্য-কলাপ পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়—তিনি আমাদের চেয়ে কত উর্ধ্বে। মহাত্মা সত্যিই মহাত্মা।" নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রম-মন্ত্রীর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। নেতাজীর মৃত্যু-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে শ্রম-মন্ত্রী বলেন, "তাঁর মৃত্যু-সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারি না। তিনি বেঁচেই থাকুন আর মারা যেয়েই থাকুন—তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি তাঁর আদর্শের মাঝে আমাদের মনে বেঁচে আছেন।" "He lives in spirit."-এই কথাটী জোর দিয়ে শ্রমমন্ত্রী বলেন। আমার বন্ধুটী বলেন, "বাংলা ঐ সান্ত্বনা নিয়ে অপেক্ষা করছে।" শ্রমমন্ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলেন, "শুধু বাংলা কেন—সমস্ত ভারতের জনগণের মন অধিকার তিনি বেঁচে আছেন।" বাংলার যুবসম্প্রদায়ের জন্য শ্রম-মন্ত্রীর কোন বাণী দেবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন, "আপনারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী পৌঁছে দিন। সংঘ শক্তির দ্বারা সকলকে একসূত্রে বেঁধে ফেলুন। যে অবিশ্বাস ও ঘৃণা সবার মনে জমাট হ'য়ে রয়েছে তাকে দূর করুন।" আমাদের গাড়ী সা সা করে ছুটে চলেছে। চালককে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনিই পথ নির্দেশ করে দিচ্ছেন। আমার একটু আশ্চর্য বোধ হ'লো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ছাত্র জীবনে তাঁর বহুদিন কেটেছে কলকাতায়। বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি বি, এস, সি পড়তেন। আমাদের আলোচনা ইংরেজীতে হচ্ছিল। আমি তাই বল্লাম, "কী অভিশাপ আমাদের দেখুনত—আপনার সংগে আমি কোন ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে পাচ্ছি না। আমাদের এমন রাষ্ট্র ভাষার প্রচলন করতে হবে, যে-ভাষা সকলে বুঝতেও পারবে সে-ভাষায় কথাও বলতে পারবে।" এবং এই রাষ্ট্র ভাষা প্রসংগে হিন্দুস্থানীকেই তিনি প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, "বিশেষ করে শ্রমিকদের ভিতর হিন্দুস্থানীই সাধারণ ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" আমাদের গাড়ী সাত নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সামনে এসে দাঁড়ালো। অপেক্ষামান বন্ধুদের উত্তেজনা ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমি শ্রম-মন্ত্রীকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চল্লাম। ওপরে উঠতে উঠতে এই বাড়ীটার ঐতিহাসিক পট-ভূমিকাটুকু বল্লাম: ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কল্‌কাতার বাসভবন ছিল এই বাড়ীটা। কত অনাচার এবং অত্যাচারই যে এখানে হয়েছে তা কে জানে।" শ্রম-মন্ত্রী দীপ্তস্বরে উত্তর দিলেন, "এমনিভাবে সমস্ত অত্যাচারের মহাশ্মশানে আমরা সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করবো।" এ,সি মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ-এর তরুণ ডিরেক্টর শ্রীমান শৈলেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শ্রম-মন্ত্রীকে পৌঁছে দিলাম। শ্রীযুক্তা কৃপালনী আসছেন শুনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বন্ধুরা তাঁকে সভানেত্রী করবার মনস্থ করলেন। সভার কার্যের পর শ্রমমন্ত্রী অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সংগে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনীকে আমি অফিসের কয়েকটী কক্ষ ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাতে লাগলুম। নোয়াখালীর সমস্যায় তাঁর মন এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে, নোয়াখালীর কথা ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে তাঁর সংগে আলোচনা করতে পারিনি। অনুন্নত সম্প্রদায়ের বন্ধুদের কাছেও তাঁর যে আবেদন—আমার কাছে আলোচনা প্রসংগেও তাই—অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুদের কাছেও ঐ একই আকুল মিনতি। "আপনারা কর্মী দিন—আমায় ভাল কর্মী দিন। যাঁরা দু'তিন দিনের জন্য রংতামাসা দেখতে সেখানে যাবেন না—যাবেন, সত্যিকারের কাজ করতে। সংখ্যায় অল্প হউন ক্ষতি নেই—আন্তরিকতা নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, এমনি কয়েকজন কর্মী দিন। স্থায়ী ভাবে কাজ করতে না পারলে কোন লাভই হবে না" নোয়াখালীর কথা বলতে বলতে শ্রীযুক্তা কৃপালনী অভিভূত হ'য়ে পড়েন—তাঁর গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে আসে। তিনি বলেন, "মানুষে মানুষের প্রতি যে এমনি নৃশংস আঘাত হানতে পারে—আমার তা ধারণাতীত ছিল। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমনি নির্মম হ'তে পারে—তা আমার কল্পনাতীত ছিল। বিহার-নোয়াখালী ও কলকাতা আমাদের যে শিক্ষা দিল—জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকলের মন থেকে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। যেখানে

হাহাকার—যেখানে অন্যায়—যেখানে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সেখানে সেবা ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে যেতে হবে।” শ্রীযুক্তা কৃপালনীকে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম—“নোয়াখালীর জন্য রূপ-মঞ্চ তার পাঠক সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছে, সাড়াও পেয়েছে তাতে। নোয়াখালীতে কাজ করবার জন্য কর্মী সংগ্রহের জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। অনুন্নত সম্প্রদায়ের বন্ধুরাও কর্মী সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। একটা প্রায় বেজে গিয়েছিল। এঁদের আর অপেক্ষা করানো উচিত হবে না মনে করে পৌছে দেবার আয়োজন করা হ'লো। গেটের সামনে গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে—সর্বাংগ ওদের জাতীয় পতাকায় সুশোভিত। এমনি বিশেষ আরোহীদের পেয়ে 'মানুষের গড়া ওদের সচল পেশীগুলিও যেন শিহরিত হ'য়ে উঠেছে। বিপুল বন্দেমাতরম আর জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে শ্রীযুক্ত জগজ্জীবন রাম আর শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীকে গাড়ীতে তুলে দিলাম। মুহুর্মুহু জয়োল্লাসের ভিতর দিয়ে এঁদের গাড়ী ছুটে চল্‌লো। সেই জয়োল্লাসের ভিতর অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর সর্বপ্রকার মুক্তির জন্য এঁরা ভারতের প্রান্তর থেকে প্রান্তান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—বিশ্বের দরবারেও এঁদের আন্তরিকতা যেয়ে ঘা মারছে—যেখানে জরা ও ব্যাধি দারিদ্র ও শোষণ—এঁরা মূর্ত সেবা রূপে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছে—অন্যায় ও অত্যাচারের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে—জাতিধর্ম নির্বিশেষে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সর্বপ্রকার মুক্তির জন্য নিজেদের আজীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে—তবুও কুটচক্রীরা, স্বার্থান্বেষীরা বলে—এরা ভারতকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—এঁদের হাতে দুর্বলের স্বস্তি থাকবে না—এঁরা দুর্বলের শত্রু! ওগো ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জাতিহীন ধর্মহীন বীর সৈনিকেরা—স্বার্থান্বেষীদের দেওয়া অলীক অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে তোমরা পথ ছুটে চলেছো—তোমাদের জাতি ভারতবাসী, ধর্ম দেশপ্রেম—'একজাতি এক প্রাণ একতা' এই মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তোমরা ছুটে চলেছো—তোমাদের কণ্টকাকীর্ণ অভিযান জয়যুক্ত হউক। তোমাদের চলার পথে আমাদের কোটী কোটী অভিবাদন গ্রহণ করো। —শ্রীকাঃ

আজাদ হিন্দ সরকার ও বেতার বিভাগ

শ্রীরবীন মল্লিক

★

এবার আমি 'আজাদ হিন্দ সরকারে'র বেতার সম্বন্ধে আলোচনা করছি। কারণ, প্রচার কার্য হিসাবে বর্তমান যুগে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচার কার্যে বেতারই যে শীর্ষস্থান অধিকার কোরে রয়েছে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই!

নেতাজী বলতেন,—"রণদামামার উচ্চ শব্দ থামিয়ে—শত্রু শিবিরে ও ভিন্ন রাষ্ট্রে (শত্রু-রাষ্ট্রে) অবস্থিত মিত্র-পক্ষ ও স্বদেশবাসীদের দেহ-মনে নব-প্রেরণা ও উৎসাহ জানাবার পক্ষে বেতারে প্রচার কার্যই সবচেয়ে উপযুক্ত ও সময়োচিত। সুতরাং আমাদের সর্বতোভাবে বেতারের সাহায্যে প্রচার-কার্য সম্বন্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হ'বে।"

অবশ্য নেতাজী একথা বলবার বহু পূর্ব থেকেই বেতার-প্রচার সম্বন্ধে আমাদের কর্মকর্তারা সজাগ ও প্রখর দৃষ্টি দিয়ে ছিলেন সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই।

গোড়ার কথা, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ—তথা সমগ্র পূর্ব এশিয়া অধিকার করবার পরই বেতার প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দেয়! সে সময় সাধারণতঃ টোকিও, সায়গণ ও (ইণ্ডোচীনের রাজধানী) ও সোনান (সিঙ্গাপুর) থেকেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বেতার সাহায্যে প্রচার-কার্য চালানো হত। এ প্রচার-কার্য মুখ্যতঃ হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় করা হ'ত—তবে বাংলা ভাষাতেও কখনো কখন প্রচার কার্য চালানো হ'ত!

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে, বোধহয় আগষ্ট মাসে—সর্বপ্রথম রেঙ্গুনে বেতার কেন্দ্র খোলা হয়। সে সময়, এই বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে জাপানীদেরই হাতে ছিল। এবং সে সময় রেঙ্গুন থেকে বেতার যোগে কোনো ভারতীয় ভাষায় প্রচার-কার্য করা হ'ত না!

তখন সমগ্র ব্রহ্মদেশে "Indian Association" নামে একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-টিকে জাপানীরা স্বীকার কোরে নিয়েছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন,—মিঃ এল, বি, লাঠিয়া, আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মিঃ সুবোধ চট্টোপাধ্যায়! ভারতে অবস্থিত ভারতীয়দের যে সব সম্পত্তি ছিল তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল মিঃ টিল্লা মহম্মদ খাঁ ও মিঃ লাল খাঁর উপর। আর মিঃ করিম গণি ছিলেন প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাছাড়া পরামর্শদাতা ও রাজনৈতিক বিভাগে ছিলেন নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ-ভাবে সে সময় Indian Association এ যোগদান করেন নি।

এই Indian Association ও জাপানী সরকারের মধ্যে যোগসূত্রের (liasion office) কাজ করতো ইয়োকুরো কিকান (Iwokuro Kikan) নামক একটি সেমি মিলিটারী জাপানী প্রতিষ্ঠান।

বেতার যোগে ভারতীয় ভাষায় বিশেষ কোরে হিন্দী ও বাংলা ভাষায় প্রচার কার্য চালাবার জন্য 'Iwokuro Kikan' ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে—Indian Association' কাছে একটি অনুরোধে কয়েকটি দায়িত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ভারতবাসীকে চেয়ে পাঠায়। কারণ, সে সময় রেঙ্গুনে বেতার-কেন্দ্র বিশেষ শক্তিশালী ছিল না,—বড় জোর রেঙ্গুন থেকে বেতারের সাহায্যে প্রচার-কার্য চালালে, সেটি কলকাতা পর্যন্ত পৌছতো। সেজন্য বাংলা ভাষার প্রচার-কার্য চালাবার ব্যাপারে তাদের বেশী আগ্রহ ছিল।

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী—এই অনুরোধের জবাবে মিঃ মির্জা বেগ, মিঃ এম, আই নাসিম, মিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ ধীরেন্দ্র কুমার বসুকে পাঠিয়ে দেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মদেশস্থ রেঙ্গুন বেতার-কেন্দ্রে এই ক'জনের নামই প্রথম ভারতীয় প্রচারক বা ঘোষক ব'লে উল্লেখ করা চলে।

এই ক'জনের মধ্যে মিঃ মির্জা বেগ অনেক দিন

পর্যন্ত বেতার-কেন্দ্রের সংস্রবে ছিলেন,—পরে তিনি উর্দ্দু দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন এবং বর্তমানে মৃত। মিঃ নাসিমও বেতার-কেন্দ্র থেকে দৈনিক উর্দ্দু ও রোমান হিন্দী সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন, বর্তমানে রেঙ্গুনে তিনি রয়েছেন। মিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বেতার-কেন্দ্রে বাংলা অনুবাদক ও ঘোষক ছিলেন। পরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) ব্রহ্মদেশস্থ রাষ্ট্রীয় শাখার (Burma Territorial Committee) 'Welfare Department এর ভারপ্রাপ্ত সভ্য হন। তারপর মিঃ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে অনেক কিছু সত্য মিথ্যা গুজব ও অভিযোগ শোনা যায়। বর্তমানে তিনি বাংলা দেশেই রয়েছেন। চতুর্থ ব্যক্তি মিঃ ধীরেন্দ্র কুমার বসু, যদিও অনুবাদক ও ঘোষক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বেতার কেন্দ্রের 'Asstt Director এবং দিন ক'য়েকের জন্য (After 26th. April 1945) প্রচার বিভাগের সম্পাদক (Secretary) হবার সৌভাগ্য লাভও কোরেছিলেন। বর্তমানে ইনি ব্রহ্মদেশেই রয়েছেন।

রেঙ্গুন বেতার-কেন্দ্র থেকে যখন হিন্দী ও বাংলা ভাষায় প্রচার-কার্য আরম্ভ হয়, তার কিছুদিন পর অর্থাৎ অক্টোবর বা নভেম্বরের গোড়ার দিকে জাপানী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মহিলা ঘোষকের অভাব অনুভব করেন, এবং সে বিষয়ে তদানীন্তন ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের ব্রহ্ম রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি মিঃ বালেশ্বর প্রসাদ ও প্রচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ করিম গণিকে জানান। সেই সময় আমি প্রচার বিভাগের বাংলা ও হিন্দী বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলাম। মিঃ প্রসাদ ও মিঃ গণি এ সম্বন্ধে আমাকে একটি বাংলা ও একটি হিন্দী মহিলা-ঘোষক জোগাড় কোরে দেবার কথা বলেন।

তার ফলে,—রেঙ্গুনের প্রাচীন অধিবাসী ডাঃ পি, কে, দে'র ভাই ডাক্তার এস, কে, দে-কে আমি অনুরোধ করায় তিনি তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অণিমা দে'কে বাংলা ভাষায় বেতার বক্তৃতা দেবার জন্য অনুমতি দেন। সুতরাং শ্রীমতী অণিমা দে'ই যে প্রথম ভারতীয় মহিলা—যিনি রেঙ্গুন থেকে প্রথম বেতার বক্তৃতা দেন, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ নাসিমও হিন্দী বক্তৃতা দেবার জন্য একটি জেরবাদী মেয়ে জোগাড় করেন,—মেয়েটির নাম যতদূর মনে হয়,—রাজিয়া বেগম,—বার্মা নাম—মাটিন্‌টিন্।

এই ভাবে আমাদের বেতারের কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রচার বিভাগে,—বিশেষ কোরে, বেতারে,—শুধু একজন মেয়েই বারে বারে (অর্থাৎ সপ্তাহে একবার কি ১৫ দিন অন্তর একবার) ভারতীয় ভগিনীদের উদ্দেশ্যে কিছু বল্‌বেন,—সেটা সত্যি কথা বলতে কি প্রচারের দিক থেকে তেমন কার্যকরী নয়।—সেজন্য ঠিক করা হ'ল যে, একজন মহিলাকে দিয়েই প্রত্যহ বাংলায় সংবাদ ঘোষণা করা হ'বে, এবং বিশেষ বক্তৃতা হিসাবে, প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন মেয়েদের দিয়েই বিশেষ বক্তৃতা দেওয়ানো হ'বে। তার ফলে প্রত্যেক সপ্তাহে বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের একজন মহিলাকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হ'ত, এবং এই সব বক্তৃতার অধিকাংশই আমি লিখে দিতাম।

স্থায়ী ঘোষক হিসাবে মিসেস অণিমা দে'কে নিয়োগ করা হয় এবং সৌখীন (Amature) বিশেষ বক্তা হিসাব প্রথমে আসেন, কুমারী রেণুকা সাহা; পরে কুমারী করুণা গঙ্গোপাধ্যায়,—মিসেস্ কমলা ভৌমিক, কুমারী রেবা সেন, কুমারী গৌরী ভট্টাচার্য, কুমারী সুলতানা তাহির, কুমারী ভরদ্বাজ ও কুমারী ভেলী লিঙ্গম।

এইসময় সোনানে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার (Provisional Government of Azad Hind) প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্রেরও রদ বদল হয়। মিঃ সুবোধ চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্রের পরিচালক হন, এবং নেতাজীর উপদেশ অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে বেতার কেন্দ্র থেকে ছোট ছোট কথিকা ও নাটিকা বেতার যোগে প্রচার করবার ব্যবস্থা করা হয়।

মিঃ চাটার্জি এই নাটিকা ও কথিকা লেখার ভার আমার উপর দেন। সে সময় যে সব নাটক লিখেছিলাম, পাঠক পাঠিকাদের যদি তার পরিচয় পাবার ইচ্ছা থাকে তো রূপমঞ্চ সম্পাদক মারফৎ খবর পেলে, সেগুলির কিছু

উপহার দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। কারণ, সে সময়কার নাটিকা ও কথিকার কয়েকটি—কোন রকমে বাঁচিয়েছিলাম।

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্রে যখন নানাভাবে অদল বদল চলছিল, সে সময়কার অর্থাৎ স্বাধীন ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দিনটি আজও আমার মনে আছে। সেই দিনই নেতাজী সোনান থেকে বেতার যোগে স্বাধীন ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা সগৌরবে প্রচার করেন, ও রাণী ঝাঁন্সি বাহিনী সংগঠনের কথাও ঘোষনা করেন।

রাণী ঝাঁন্সি বাহিনী সংগঠন উপলক্ষ্যে—আমাদের রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্র থেকে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

আমাদের কর্ম তালিকার মধ্যে ছিল—যে রাত আটটার পর থেকে বিভিন্ন ভাষায়,—বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের দ্বারা রাণী ঝাঁন্সি বাহিনীর গঠন। তার কার্য-কলাপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করা হ'বে। এবং যে বীর মহীয়সী নারীর পুণ্য নামে এই নারী বাহিনীর নাম করণ করা হ'য়েছে,—কয়েকটি বাঙ্গালী মেয়ের দ্বারা তাঁর অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে একটি গান গাওয়ানো হ'বে। সেই উপলক্ষ্যে আমি নিম্নলিখিত গানটি লিখি,—এবং স্থির হয় কুমারী শোভা সেন প্রভৃতি কয়েকটি বালিকা এ গান গাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময় অভাবে এ গান গাওয়ানো হয় নি।

"লহ লহ ওগো মহারাণী
(আজি) লহ দেবী জাতির প্রণাম
(আজি) তোমার স্বপন সফলতা পথে—
স্বাধীনতা লাগি অভিযান।
লহ লহ রাণী, জাতির প্রণাম!
মাতৃভূমিরে দানিতে মুকতি,
অগ্নিমন্ত্রে জাগালে শকতি,
বিদেশীর খুনে করিলে স্নিগ্ধ
মাতারে করিলে মোক্ষধাম।
লহ মহারাণী জাতির প্রণাম।
তব প্রেরণার হুতাশনে জাগি,
মাতিয়া উঠেছে ভারত ললনা।
ভারত মাতার স্বাধীনতা লাগি,
বিনাশ করিতে বৃটিশ (বণিক) ছলনা!
মুক্তির লাগি হই আগুয়ান,
মরণেরে তুমি করেছ মহান।
তোমারি জনম দিবসে আজিকে
বেদনা জাগায় তব নাম,
লহ, বীর বালা, জাতির প্রণাম!

এই উৎসব উপলক্ষে,—শত্রুপক্ষের নিদারুণ বোমারু বিমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরে যে কয়টি মেয়ে রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্রের উপস্থিত হ'য়েছিল,—তাঁরা কেউ নিকটে থাকতেন না,—সকলেই অন্ততঃ দু'মাইল দূরে বাস করতেন। এবং সে সময়,—দিনে রাতে অন্ততঃ ৫।৬ বার শ্যামের বাঁশী অর্থাৎ সাইরেণ বেজে—বেসামরিক অধিবাসীদের দেহ-প্রাণ ও মন শ্রীরাধার উৎকট প্রেমারাগের মতই আবেগ চঞ্চল কোরে তুলতো। সুতরাং অকুতোভয়ে যে সব ভারতীয় মহিলা—শত্রুর বোমারু বিমানকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে ও নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ কোরে—এই দিনটিকে চির স্মরণীয় করবার জন্য এগিয়ে এসে ছিলেন—তাঁদের কথা মনে পড়লে আজও আমার মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়, এবং মনে হয়—সত্যি—এঁরাই নব ভারতের চির প্রেরণা।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন,—তাঁদের নাম,—মিসেস্ তিলক, কুমারী মেতা, কুমারী ভেলী লিঙ্গম (আমার জনৈক সহকর্মী বলতেন—বেলারাণী), কুমারী সুলতানা তাহির, কুমারী শোভা-রাণী, মিসেস্ অনিমা দে, এবং বোধহয়, কুমারী রেণুকা সাহা, করুণা গাঙ্গুলী ও মিসেস্ ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নেতাজী যখন তাঁর সদর দপ্তর (Head Quarters) সোনান থেকে রেঙ্গুনে পরিবর্তন করেন—তখন তিনি বিশেষজ্ঞদের এক জরুরী সভা আহ্বান কোরে বেতার কেন্দ্রের কর্মসূচী ঠিক কোরে দেন। সেই কর্মসূচীই শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হ'য়েছিল। এই কর্মসূচীর ফলে, অনেক কিছু রদ বদল হয়। কারণ, পূর্বে রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্র থেকে, হিন্দী, পুস্ত, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, মারহাট্টি, ইংরাজি, নেপালী, বাংলা ও আসামী ভাষায় বেতার প্রচার করা হ'ত। কিন্তু নতুন কর্মসূচীর ফলে এই তালিকা থেকে গুজরাটি ও মারহাট্টি ভাষায় প্রচার বন্ধ হ'য়ে যায়। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে একটি বিশেষ বক্তৃতা (ভারতীয় মহিলাদের উদ্দেশ্যে) ও একটি কথিকা বা নাটিকার অভিনয় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আজ এই পর্যন্ত। —জয়হিন্দ্

সোভিয়েট সংগীতজ্ঞদের প্রসংগে

(দুই)

●

ভিক্টর এস, কোসেঙ্কো

ভিক্টর এস, কোসেঙ্কো ১৮৯৬খৃঃ-এ পিটার্সবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। কোসেঙ্কোর ভগ্নী 'ওয়ারসা কনসারভেটোইরী'তে যখন পিয়ানো শিখতেন, কোসেঙ্কো আট বছর বয়ঃক্রমকাল থেকে তাঁর কাছে পিয়ানো শিখতে আরম্ভ করেন। পরে অধ্যাপক মিখাইলোভস্কীর (Prof. Mikhailovsky) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র বারো বছর বয়সের সময় তিনি পিয়ানোর জন্য কয়েকটি সংগীত রচনা করেন। এর পর আরো কয়েকটী যন্ত্র সংগীত ও কণ্ঠ সংগীত রচনা করেন। ১৯১৪ খৃঃ-এ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সেন্টপিটার্সবার্গ কনসারভেটোইরীতে (St. Petersburg Conservetoire) আইরীন মিখল্যাসেভস্কীর (Irene Mikhlashevsky) অধীনে পিয়ানো বাজনা এবং নিকোলাই সোকোলোভ (Nikolai Sokolov) ও ম্যাক্সিমিলিয়ান স্টেইনবার্গের (Mavximilian Steinberg) কাছে সংগীত-রচনা পদ্ধতি শিক্ষা করেন। ১৯১৮ খৃঃ-এ উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোসেঙ্কো ইউক্রেনে বসবাস করতে গমন করেন। এখানে সংগীত-রচয়িতা, পিয়ানো-বাদক এবং সংগীত-শিক্ষক রূপে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমে কয়েক বছর তিনি ঝীটোমীরে (Zhitomir) কাটিয়েছিলেন। এখানে পিয়ানোর জন্য বিভিন্ন সোনাটোস কবিতা, নৈশ-গীতি (Nocturnes), সংগীতের কতগুলি সূক্ষ পদ্ধতি, চেম্বার-মিউজিক এবং সংগীত রচনায় কাটিয়ে দেন। তাঁর আগমনে সহরের সংগীত জীবনে এক উল্লেখ-যোগ্য আলোড়ন দেখা দেয়। সাধারণ মঞ্চে বহু সংগীতানুষ্ঠানে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। এবং 'স্কুল অফ মিউজিক'-এ (School of Music) শিক্ষকতাও করতে

ভিক্টর এস্, কোসেঙ্কো

থাকেন। কোসেঙ্কোর মৃত্যুর পর তাঁরই নামানুসারে এই স্কুলটীর নাম রাখা হয়। ঝীটোমীর থেকে তিনি প্রায়ই মস্কো, কিয়েভ, খারকোভ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য স্থানে বহু সংগীতানুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রিত হ'য়ে যেতেন। ১৯২৯ খৃঃ-এ কোসেঙ্কো কিয়েভ গমন করেন এবং সেখানকার কনসারভেটোইরীতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় সাধারণ মঞ্চে আত্মপ্রকাশ থেকেও যেমনি তিনি বিরত হননি—তেমনি নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায়ও তাকে মেতে থাকতে দেখা গেছে। অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চদশ বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য তিনি হিরোইক-ওভারচার (Heroic Overture) অর্কেষ্ট্রার জন্য মোলডাভ পোয়েম (Moldav Poem)—পিয়ানো এবং অর্কেষ্ট্রার জন্য কনসারটো, ব্যালাড প্রভৃতি এবং বহু লোক-সংগীতেরও সুর সংযোজনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কোসেঙ্কো ইউক্রেনের কবি তারাস সেভচেঙ্কো (Taras Schvechenko)-র 'ম্যারিনা' (Marina) অপেরা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩৮ খৃঃ-এ 'কোসেঙ্কো আর্ডার অব্ দি রেড

ওয়ার্কাস' ব্যানারে' (Order of the Red Workers Banner) এ ভূষিত হন। অসুস্থতার জন্য বহুদিন তাঁকে শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হয়। ক্রমে ক্রমেই তাঁর ব্যাধি অবনতির দিকে যেতে থাকে। এবং ১৯৩৮ খৃঃ এ, ৩রা অক্টোবর তিনি মারা যান।

কোসেঙ্কোর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুরা—যাঁর ভিতর বরিস লিয়াটোসনস্কী (Boris Liatoshinsky) এবং লেভ রেভুটজীন (Lev Revutzin) এঁর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়—কোসেঙ্কোর অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে চাইকোভস্কী (Chaikovsky) র‍্যাচম্যানিনোভ (Rachmaninov) এবং পশ্চিম ইউরোপীয় প্রণয়মূলক সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এবং চোপীন (Chopin) ও সুম্যানের (Schuman) কথা এই প্রসংগে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। ইউক্রেন এবং মোলডাভের লোক সংগীতও কোসেঙ্কোকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আলেকজাণ্ডার এ, ক্রেইন

নিজনীলোভগোরোড—বর্তমানে যা গর্কী সহর নামে খ্যাত—১৯৮৩ খৃঃ-এ এখানকার এক খ্যাতনামা সংগীত পরিবারে আলেকজাণ্ডার এ, ক্রেইন ((Alexandar. A. Krein) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন খ্যাতনামা বেহালা-বাদক ছিলেন এবং বিভিন্ন লোকসংগীতের সংগ্রাহকরূপেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বড় ভাই ডেভিডও একজন নাম করা বেহালা-বাদক ছিলেন। মস্কোর বলসাই থিয়েটারে তিনি অর্কেষ্ট্রা পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন। অন্য ভ্রাতা গ্রেগরী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জুইলান সংগীতরচয়িতা রূপে কম খ্যাতি অর্জন করেন নি। ছোটবেলা থেকেই আলেকজাণ্ডার সংগীত-শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র সাতবছর বয়সের সময় স্বাধীনভাবে সংগীত রচনায় তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃঃ-এ তিনি মস্কো কনসারভেটোইরীতে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করেন। ১৯০৮ খৃঃ-এ অধ্যাপক এ, গ্রেন-এর অধীনে শিক্ষালাভ করে বেহালা-শিক্ষায় উপাধিলাভ করতে সমর্থ হন।

আলেকজাণ্ডার এ, ক্রেইন

শিক্ষার সংগে সংগে সংগীত-রচনা এবং সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি গভীর অনুরাগের সংগে পড়াশুনা করেন। কনসারভেটোইরীর শিক্ষা সমাপনান্তে—শিক্ষার পরিপূর্ণতালাভের জন্য মস্কোর ফিলহারমোনিক কলেজে আরো এক বছর অতিবাহিত করেন। অপেরা, পিয়ানো, কণ্ঠ-সংগীত প্রভৃতি সংগীতের বিভিন্ন দিক আলেকজাণ্ডার করায়ত্ব করতে কোন সময়ই গাফিলতির পরিচয় দেন নি। আলেকজাণ্ডারের প্রতিভা সংগীতশিল্পের বিভিন্ন দিকে পরিব্যাপ্ত। তাঁর প্রথমদিককার অধিকাংশ রচনায় এবং 'সোলোমন' গীতকাব্যে আরব-সেমিটিক ভংগীমার আলঙ্কারিক ভাব পরিদৃষ্ট হয়—তাছাড়া বিষয়বস্তু তিনি গ্রহণ করেন বাইবেল থেকে। তাঁর প্রথম সিম্ফনী এবং পিয়ানোর জন্য যে 'সোনাটা' রচনা করেন শতাব্দী ধরে পরিচিত 'Song of Songs' এর প্রভাব যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

সভ্যতার আদিম যুগ থেকে সংগীতের যে গৌরবময়

সেই অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে তাঁর সংগীতে বিশেষ এক স্থান করে দেন। আলেকজাণ্ডারের সংগীতের ওপর প্রাচ্যের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করবার বিষয়। ফিউয়েনটি ওভেহিউনা (Fuente Ovehuna) রচনাকে কেন্দ্র করে রচিত আলেকজাণ্ডারের লাইরেনসিয়া (Laurencia) ব্যালেটে স্পেনীসমুরিসের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের পরিলক্ষিত হয় সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর দ্বিতীয় ব্যালেট 'দি রেপ অফ তাতানিয়া'য় (The Rape of Tatania)। রাশিয়ার জাতীয় সংগীতের সংগে এই ব্যালেটের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

প্রথম কবে এঁদের সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হয়—

(২)

সংগ্রাহক : **শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)**

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়—১৯:৪ সালে 'রাজনটী বসন্ত সেনায়' এক অতি নগণ্য অংশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীতারা ভট্টাচার্য—১৯৩৭ সালে শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "চাঁদসদাগর" চিত্রে ইন্দ্রের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন।

অভিনেতা পরিচালক

শ্রীঅমর চৌধুরী নির্বাক যুগে ১৯২৩ সালে শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ম্যাডানের "মাতৃ-স্নেহ" চিত্রে পাগলের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এঁর পরিচালিত প্রথম সবাক ছবি "জামাই ষষ্ঠী"।

শ্রীচারু রায়—নির্বাক যুগে "মোগল রাজকুমারের প্রেম" চিত্রে ইনি প্রথম অভিনয় করেন। এই চিত্রের পরিচালক ছিলেন নিজে। এঁর পরিচালিত প্রথম বাংলা সবাক চিত্র "রাজনটী বসন্ত সেনা"।

অভিনেতা

শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৩০ সালে শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মতিমহল থিয়েটার্সের "রাঙা বৌ"-তে নিমাই-এর ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীআশু বসু—১৯৩৪ সালে শ্রীমন্মথ রায়ের "ত্র্যহস্পর্শ" চিত্রে প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৩৭ সালে চিত্র মন্দিরএর "শশিনাথে" প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন। "শশিনাথ" পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কর্মযোগী রায়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)—১৯৩৩ সালে শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ম্যাডান-এর "জয়দেব" চিত্রে পরাশর-এর ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীজীবেন বসু—১৯৩৬ সালে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় কালী ফিল্মের "অন্নপূর্ণার মন্দির"এ সুধীর এর ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায়—নির্বাক যুগে ১৯২৭ সালে শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস'এর "শঙ্করাচার্যে" মণ্ডনমিশ্রের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। সবাক যুগে ১৯৩৩ সালে 'সাবিত্রী' চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীতুলসী চক্রবর্তী—১৯৩৩ সালে শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় "শ্রীগৌরাঙ্গ" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীনৃপতি চট্টোপাধ্যায়—১৯৩৬ সালে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ডি, জি, টকীজের "দ্বীপান্তর" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীনবদ্বীপ হালদার—১৯৩৬ সালে শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কোয়ালিটী পিকচার্সের "জোয়ার ভাঁটা" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীবিপিন গুপ্ত—১৯৩৮ সালে শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিল্মের "গোরা" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীভুজঙ্গ রায়—১৯৩৪ সালে "মনিকাঞ্চন" চিত্রে গোকুল-এর ভূমিকায় প্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয় করেন। ইনি হিন্দি চিত্রে কামতাপ্রসাদ নামে অভিনয় করেন।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—১৯৩১ সালে শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় "ম্যাডান কোম্পানীর" 'প্রহ্লাদ' চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীশৈলেন পাল—১৯৩৩ সালে শ্রীদেবকী কুমার বসুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স-এর "মীরাবাঈ" চিত্রে ভানু সিংহের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন।

অভিনেত্রী

শ্রীমতী অরুণা দাস—১৯৩১ সালে শ্রীচারু রায়ের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিল্ম-এর "গ্রহের ফের" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী অঞ্জলী রায়—১৯৪০ সালে ব্যবধান চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৪৬ সালে "বন্দেমাতরম্" চিত্রে শকুন্তলা রায় নামে অভিনয় করেন।

শ্রীমতী চিত্রা দেবী—১৯৩১ সালে শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনায় কালী ফিল্ম-এর "মুক্তি স্নান" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়—১৯৩৮ সালে শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষ্মীর "অভিনয়" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। ইনি শ্রীলেখা নামে ১৯৪০ সালে "আলো ছায়া" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী পদ্মা দেবী—১৯৪০ সালে শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় সাগর মুভিটোনের "কুমকুম" চিত্রে প্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয় করেন। হিন্দি চিত্রে অবশ্য ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

শ্রীমতী পান্না দেবী—১৯১৯ সালে শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রুক্মিণীতে" প্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীমতী প্রমিলা ত্রিবেদী—১৯৪১ সালে শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "আহুতি" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী মীরা দত্ত—১৯৩৬ সালে শ্রীচারু রায়ের পরিচালনায় "বাঙ্গালী" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী মেনকা দেবী—১৯৩৬ সালে শ্রীদেবকী কুমার বসুর পরিচালনায় "সোনার সংসার" চিত্রে প্রথম বাংলা অভিনয় করেন।

শ্রীমতী মণিকা দেশাই—১৯৪০ সালে শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনায় "তটিনীর বিচার" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী রমলা দেবী—১৯৩৭ সালে শ্রীচারু রায়ের পরিচালনায় "গ্রহের ফের" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী শীলা হালদার—১৯৩৬ সালে শ্রীসতু সেনের পরিচালনায় "আবর্তন" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

শ্রীমতী সাধনা বসু—১৯৩৭ সালে শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-এর "আলিবাবা" চিত্রে মর্জিনার ভূমিকায় প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী—১৯৩৬ সালে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় "অন্নপূর্ণার মন্দির" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

হৈমন্তিক সংখ্যার ভ্রমসংশোধন

১। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়—'শুকতারা' চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও প্রোগ্রামে আমরা কোন নাম পাইনি। এ ব্যাপারে বিমান বাবুই সঠিক বলতে পারেন।

২। দেবী মুখোপাধ্যায়—'প্রভাস মিলনের' প্রোগ্রাম পুস্তিকায় নাম খুঁজে পাওয়া যায়। শুকতারা অনেক পরে।

৩। কমল মিত্র—'নীলাঙ্গুরীয়' চিত্র প্রথম প্রকাশ। সাত নম্বর বাড়ীর কথা আমরা ভুলবশতঃ উল্লেখ করেছি।

৪। প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়—'অমর গীতি' চিত্রেই প্রথম প্রকাশ—প্রতিশোধ অনেক পরে।

৫। জহর গঙ্গোপাধ্যায়—চাঁদ সদাগরের পূর্বে দেনাপাওনা।

(যদি কোন ভুল চোখে পড়ে দর্শকসাধারণ অথবা শিল্পীরা তা সংশোধন করে দিলে বাধিত হবো।)

বিভিন্ন রূপ-সজ্জায় রবীন্দ্রমোহন রায়

'রাজনটী বসন্তসেনার রাজার ঝলমলে পোষাকে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম।'
রাজবেশে **রবীন্দ্রমোহন রায়**

অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায়ের বাড়ীতে শ্রীপার্থিবের হানা !

★

মাপ করবেন, চুরি ডাকাতি করতে যাইনি। সম্পাদকের দেওয়া শিরোনামাটী দেখে মনে হবে শ্রীপার্থিবের বোধহয় ওধরণের একটু হাত-দোষ আছে। হাত-দোষ অবশ্য একটু আছে—সেটা কাগজ আর কলমের বেলায়—আর এ দোষটা আপনাদেরই দৌলতে—আপনাদেরই চাপে। অন্য কোন কিছুর প্রতি লোভ নেই ও—সেজন্য যাইও নি। বিশ্বাস না হয় -সম্পাদক স্বয়ং সংগেই ছিলেন। আর তাও দিনের বেলা—বটতলা থানা থেকে দু'তিন মিনিটের রাস্তা—১৩।এ রাজা রাজকৃষণ ষ্ট্রীট—যদি কিছু অন্য ধরণের হাত ছাপাই করেই বসতাম—শ্রীঘর না ঘুরিয়ে গৃহস্বামী ছেড়ে দিতেন না। টগবগে রক্তের জ্বালায় দু'এক বার শ্রীঘর যে না ঘুরতে হ'য়েছে তা নয় এবং বিজ্ঞদের কাছ থেকে সেজন্য অর্বাচীন বিশেষণে নিন্দিত হ'লেও নিজের কাছে তা এক গৌরবময় অধ্যায় হ'য়ে আছে—তাই আপনাদের শ্রীপার্থিব অন্য বেশে যে শ্রীঘরে যাবার মত কাজ করবে না, আশা করি অন্ততঃ আপনারা সেটুকু বিশ্বাস করবেন।

১২ই জানুয়ারী, রবিবার, বেলা দশটা। গৃহস্বামী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সোফা দেখিয়ে দিলেন।

'রজনী' চিত্রে রবি রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী ও অমিয় গোস্বামী (স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকার মনমোহন গোস্বামীর ছেলে)

রূপ-মঞ্চ সম্পাদক গৃহস্বামীর সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে যেয়ে বল্লেন, "শ্রীপার্থিব, রূপ-মঞ্চের পরিব্রাজক সাংবাদিক। আর ইনি, আলাপ না থাকলেও পরিচয় নিশ্চয়ই আছে—বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায়।" নমস্কার এবং প্রতি নমস্কারের পালা শেষ করে আসন গ্রহণ করলাম। শ্রীযুক্ত রায় এবং সম্পাদক একথা-সেকথা

পঁচিশ বছর বয়ক্রমকালে রবীন্দ্রমোহন।

জুড়ে দিলেন। ঘরের চারিদিকের দেয়াল গুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি বসে থাকতে পারলুম না। দেওয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন প্রতিকৃতি যেন হাতছানি দিয়ে একসংগে আমায় ডাকাডাকি সুরু করে দিল। কুমকুমের জগদীশ প্রসাদের কাছে গেলাম। রাজনটী বসন্ত সেনার 'রাজার' ঝলমলে বেশ আমায় অভিভূত করলো। মানুষের ঐশ্বর্য-স্পৃহা কী ভাবে তাকে বিলাসের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে—রাজনটী বসন্ত সেনার রাজাকে দেখে সে কথাটাও মনের কোণে বার বার উঁকি মেরে উঠছিল। ঐ স্বার্থের পাশে আত্মত্যাগের মহান আদর্শে দীপ্তিমান দক্ষযজ্ঞের দধিচীর জটাজুটধারী সন্ন্যাসীবেশ আমায় আত্মত্যাগের মহান আদর্শের কথা জানিয়ে ক্ষণিকের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুললো। সংসার ও বার্ধক্যের চাপে ভেংগে পড়া মহানিশার মুরলীধরের প্রতি কিছুটা সমবেদনাও যে না জেগে উঠেছিল তা নয়। তারই পাশে সহজ সরল 'পণ্ডিত মশাই'র কুঞ্জনাথের কাছে দু'দণ্ড না দাঁড়িয়ে পারলাম না। দারিদ্র্যের নিপীড়নেও অবহেলিতা ভগ্নীর প্রতি কোনদিন যার স্নেহের অভাব ঘটেনি। শরৎচন্দ্রের মানস চরিত্র বাংলার শাশ্বত কুঞ্জনাথের প্রতি মনটা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে উঠলো। রজনীর প্রেম-মালা গলায় পৌঢ় দয়িতকে দেখে মনে যে একটু ঈর্ষা জেগেছিল—সেকথা যদি না বলি তাহ'লে সত্যের অপলাপ করা হবে। জনকনন্দিনীর দশরথের সৌভাগ্যকে তারিফ করলেও বৃদ্ধ রাজার শোক-বহুল ভবিষ্যতের ছবি মনের কোণে ভেসে উঠে অনুভূতির নাড়িটা একটু টনটনিয়ে উঠলো। পুরাণের অযোধ্যা রাজ্য ছেড়ে চলে এলাম বিংশ শতাব্দীর একটা চা বাগানে। নানান লোকের ভীড় সেখানে। চা বাগানের অপরিচিত কুলী পুরুষ ও রমণীর ভীড়ের মাঝে চেনাও কয়েকজন বেরিয়ে পড়লো। অমর দুর্গাদাসকে দেখলাম। দেখলাম, জীবন গাঙ্গুলী, রবি রায়, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, কমলা ঝরিয়া, রেণুকা রায়, চিত্রা, চিত্রজগতের আরো অনেককে। হঠাৎ নজরে পড়লো বিরাট এক টাক। যে টাক বাংলার চিত্রামোদীদের কত ভাবেই না একদিন হাসিয়েছে। আজ আর বাংলার ছায়া জগতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছায়া জগতে যায়না বটে, কিন্তু আমার

'রাজনটী বসন্তসেনা'র রাজবেশে রবীন্দ্রমোহন।

মত অনেক চিত্রামোদীদের মনেই যে ৺সত্য মুখার্জি জেঁকে বসে আছেন একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। অতীত আর বর্তমান এঁদের এভাবে মিল কী করে সম্ভব হ'লো? সন্দেহ কেটে গেল কিছু পরেই, যখন দেখলাম, ঐ ভীড়ের মাঝে পরিচালক প্রফুল্ল রায় 'স্ক্রীপ্টে'র খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্লাপ-স্টিকের গায়ে চক-খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'ঠিকাদার' কথাটা সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিল। বুঝলাম, ঠিকাদার ছবির সময় ঐ চিত্রখানি গ্রহণ করা হ'য়েছিল। ছবিগুলি দেখতে দেখতে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলাম। সম্পাদকের ডাকে অশরীরীর মায়া ছাড়িয়ে শরীরীর পাশে যেয়ে বসতে হ'লো।

১৮৯৫ খৃঃ-এ ৭ই সেপ্টেম্বর, রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা গ্রামে আমাদের চিত্র ও নাট্য জগতের খ্যাতনামা অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বরের দেওয়ান পাবনা জেলার পোতাজিয়া নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের কুলীন শ্রেষ্ঠ নবরত্ন বাড়ীর স্বর্গত গোবিন্দ রাম নন্দী রায়রায়াণের অষ্টম পুরুষ স্বর্গতঃ রমণীমোহন রায়ের তৃতীয় পুত্র রবীন্দ্রমোহন। পিতা ৺রমণীমোহন ছিলেন কাকিনার রাজা ৺মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর জামাতা। সেই সূত্রেই ৺রমণীমোহন কাকিনায় বসবাস করতে থাকেন। বাংলার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমোহনের পিতৃ এবং মাতৃকুল উভয়েরই কিছুটা গর্ব করবার অধিকার আছে বৈ কী? ৺সত্যেন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়, প্রভালতা দেবী, রবীন্দ্রমোহন রায়, ভূপেন্দ্রমোহন রায়, ভূমেন রায়, ৺হরেন রায়,—৺রমণীমোহনের এই সাতটী পুত্র কন্যার ভিতর বাংলার চিত্র ও নাট্য-জগত রবীন্দ্রমোহন রায়, ভূমেন রায়, ৺হরেন রায় এই তিন জনকে অভিনেতা রূপে পেয়েছে। ৺হরেন রায় ওরফে ভানু রায় কিছুদিন পূর্বে মারা গেছেন। ভূমেন রায়ের বিশেষ পরিচয় এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, সময় মত তাঁর অভিনেতা-জীবন নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রমোহন রায়—সাধারণের কাছে যিনি রবি রায় নামে পরিচিত—বালক রবীন্দ্রমোহনের দিনগুলি যে পরি-

রবীন্দ্রমোহন, রূপ-সজ্জার বাইরে

বেশের মাঝে কেটেছে, তা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। রমণীমোহন একদিকে ছিলেন ধার্মিক অন্যদিকে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল প্রচুর। দানশীল বলে পরম শত্রুরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করতো। একদিকে শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীর মত সদগুরুর কৃপায় তাঁর ধর্মীয় জীবন যেমনি আলোকোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল—অপর দিকে স্বদেশী যুগের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কর্মবীর বন্ধু বিপিন পালের সাহচর্যে তাঁর মনের প্রসারতাও বিস্তার লাভ করেছিল। পিতার এই প্রভাব অনেকখানি রবীন্দ্রমোহনের বাল্য-জীবনে আলোকপাত করে। বিপিন পালের কোলে বসে রবীন্দ্রমোহন উপকথার কাহিনীর মত লাঞ্ছিতা মায়ের মর্মবেদনার কত কাহিনী শুনেছেন। তাঁর বালক-মন প্রতিকারের জন্য আকুল আর্তনাদে বার বার কেঁদে কেঁদে উঠেছে। এবং এই প্রভাবের পরিচয় পরবর্তী জীবনে আমরা পাই, যখন সরকারী চাকরীর জন্য নির্বাচিত হ'য়েও রবীন্দ্রমোহন তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পিতা ছিলেন অগাধ পণ্ডিত—প্রত্যহ ভোর বেলায় পুত্রকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করাতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সংগে সংগে রবীন্দ্রমোহন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করেন। সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি করতে করতে রবীন্দ্রমোহনের আবৃত্তি-স্পৃহা বেরে ওঠে। বহু বাংলা কবিতাও তিনি আবৃত্তি করতে থাকেন অবসর সময়ে। ছোট বেলায় যাত্রার প্রতিও ঝোঁক ছিল প্রবল। যাত্রা হ'লে আর কথা নেই। রবীন্দ্রমোহন তার এক নম্বর শ্রোতা। শ্লোকাবৃত্তি এবং যাত্রাভিনয় রবীন্দ্রমোহনের অভিনেতা-জীবনের মূল প্রেরণা বল্লে মোটেই ভুল বলা হবেনা। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে রবীন্দ্রমোহন প্রথমে রংপুর জেলা স্কুলে এবং পরে কলকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যাসাগর কলেজে রবীন্দ্র মোহনের উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকালে এক ঐ আবৃত্তি ছাড়া রবীন্দ্রমোহনের অভিনয়ের প্রতি ততটা ঝোঁক ছিল না। কলকাতায় এসে তদানীন্তন বিভিন্ন সুদক্ষ অভি-নেতাদের অভিনয়-প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে রবীন্দ্র মোহন অভিনয়ের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হন বটে, কিন্তু রংগালয়ে যোগদান করবার ইচ্ছা তাঁর কোন দিনই ছিলনা। অবস্থা বিপর্যয়ে আর্থিক কষ্টে পড়েই তিনি রংগালয়ে যোগদান করতে বাধ্য হন। মেট্রোপলিটান স্কুলে অধ্যয়ন কালে রবীন্দ্র মোহনের বন্ধুরা মিলে একটী 'ডিবেটিং ক্লাবের' প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র মোহন ছিলেন তার প্রধান পাণ্ডা। এই ডিবেটিং ক্লাবের বন্ধুরাও কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাই এদিক দিয়েও তাঁকে সৌভাগ্যবানই বলতে হয়। এই বন্ধুদের ভিতর, স্বর্গতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় (মণ্টু), ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, সুবোধ মিত্র (এটর্নী), ডাঃ অনিল মজুমদার এম, বি, ডক্টর শুদ্ধোধন ঘোষ ডি, এসসি, (সায়েন্স-কলেজ), ৺ধীরেন গাঙ্গুলী (এটর্নী), ডাঃ সুধীন মজুমদার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এদের গুরু স্থানীয় ছিলেন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউটের প্রবীণ সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বটব্যাল মহাশয়। এই ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে এঁরা সেক্সপিয়রের এবং আরও ইংরেজী নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্যাভিনয় করতেন। ১৯১৪ খৃঃ রবীন্দ্রমোহন ম্যাট্রিক পাশ করে যখন বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশ করেন, তখন শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী সেখানে অধ্যাপনা করতেন। ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে একটী আবৃত্তি প্রতিযোগীতা উপলক্ষে রবীন্দ্রমোহন শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসেন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রেরা মিলে একবার 'চাঁদবিবি' নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মল্লজীর ভূমিকায় সৌখীন পূর্ণাংগ নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রমোহন এই প্রথম অংশ গ্রহণ করেন। 'ফ্রেণ্ডস ড্রামেটিক এসোসিয়েশনে'র স্বর্গতঃ জিতেন্দ্রনাথ রায় এই নাটকটী পরিচালনা করেছিলেন। ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে শিশিরকুমারের পরিচালনায় 'পাণ্ডব গৌরব' নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়—রবীন্দ্রমোহন ভীষ্মের ভূমিকাভিনয় করেন। সৌখীন নাট্যাভিনয় হ'লেও শিশির কুমারকে কেন্দ্র করে ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে তখন যে সব নাট্যাভিনয় হ'তো—বাংলার নাট্য-পিপাসু জনসাধারণের মনে তা এক বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের কথা আজও অনেকে ভুলতে পারেন নি, যেদিন নূতন প্রতিভার আলোকে শিশিরকুমার ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে 'রঘুবীর' নাটকের নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে পেশাদার রংগমঞ্চ গুলোকেও তাক লাগিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রমোহন উক্ত নাটকে অনন্তরায়ের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে শিশির কুমারের সংগে অভিনয় করেন। ইনসটিটিউটে হরিশ্চন্দ্র নাটকে রবীন্দ্রমোহনের হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকাভিনয়ও তখন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'স্যাডলার কমিশন'কে অভ্যর্থনা করবার জন্য ইন্সটিটিউটে শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' নাট্যাভিনয় হয়। মহারাজ অশোক রূপে দেখা দেন শিশির কুমার। 'মার' চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়। এবং তক্ষশীলার সভাপতি, চণ্ডগিরিক ও আভীর এই তিনটী চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রমোহন। এই সময় রবীন্দ্রমোহন পুলিশ বিভাগে চাকরী পান কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন না। পিতৃবিয়োগ এবং পারিবারিক নানান বিপর্যয়ের জন্য রবীন্দ্রমোহনকে এই সময়টা বেশ খানিকটা বিপাকে পড়তে হয়। কিছুদিন 'শেয়ার-মার্কেটে' জীবিকান্বেষণের জন্য তিনি যাতায়াত করেন কিন্তু 'ঘটী-বাঙ্গালে'র হীন ঈর্ষার জন্য 'বাঙ্গাল' রবীন্দ্রমোহন ঘটীর গুঁতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। তখন রংপুরেই একটী ষ্টেশনারী এবং বইয়ের দোকান খোলেন। কাকিনার ষ্টেটেও তখন আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কাকিনার ষ্টেট 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর হাতে যায় এবং রবীন্দ্রমোহনেরা যে ভাতা পেতেন তা বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৯২০-২১ সালের কথা হবে। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে 'ভারতী'র তখন বিশেষ প্রাধান্য ছিল। রবীন্দ্রমোহন 'ভারতী'র গোষ্ঠীর সংগে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এখানেই তিনি ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন। এঁদেরই উৎসাহে রবীন্দ্রমোহন পেশাদার রংগমঞ্চে অভিনেতারূপে যোগদান করবার সংকল্প গ্রহণ করেন। যদিও রংগালয়ে যোগদান করবার ইচ্ছা তাঁর কোনদিনই ছিল না, কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে আর্থিক কষ্টে পড়েই প্রথম তিনি রংগালয়ে যোগদান করতে বাধ্য হন। খ্যাতিমান সৌখীন শিক্ষাব্রতী অভিনেতা—আজকের নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১ খৃঃ-এ পেশাদার রংগমঞ্চে সর্বপ্রথম 'আলমগীর' নাটকে নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। ১৯২২ খৃঃ-এ যখন নরেশবাবু এবং রাধিকাবাবু মিনার্ভার সংগে সংশ্লিষ্ট, তখন মনিবাবু ও হেমেনবাবু রবীন্দ্রমোহনকে মিনার্ভায় যোগদান করতে অনুরোধ জানান। এবং তাঁর

'নর দেবতা'য় রাজ বয়স্য দেবদত্ত রূপে রবীন্দ্রমোহন।

'যথের ধন' চিত্রে শম্ভু চরিত্রে রবীন্দ্রমোহন।

পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমস্ত কথাবার্তাও ঠিক হ'য়ে যায়। কিন্তু শিশিরকুমার রবীন্দ্রমোহনকে তাঁর থিয়েটারে যোগদান করতে অনুরোধ জানান। মিনার্ভার দেড় শত টাকা মাহিনার চাকরী পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রমোহন শিশির কুমারের সংগেই যোগদান করতে মনস্থ করেন। রক্ষণশীল বংশ মর্যাদা ও আত্মীয়-স্বজনের আভিজাত্য রবীন্দ্রমোহনের নাট্য-জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রমোহনের সেই কীংকর্তব্য বিমূঢ়তায় শক্তি ও সাহস দিয়ে দৃঢ়তার সংগে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে যে মহীয়সী নারী রবীন্দ্রমোহনের অভিনেতা-জীবনের যাত্রা পথে পূর্ণ-সম্মতি, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়ে রবীন্দ্রমোহনকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন—তিনি রবীন্দ্রমোহনের আজীবন-সংগীনী—সহধর্মিণী। ১৯২২ খৃঃ-এ ১লা মার্চ, রবীন্দ্রমোহন পেশাদার প্রতিষ্ঠান ম্যাডান কোংতে (Bengal Theatrical Co) যোগদান করলেন। এবং ১লা মার্চই ম্যাডান কোম্পানীর নির্বাকচিত্র 'কমলে কামিনী'তে অভিনয় করেন। শ্রীমন্তর ভূমিকায় উক্ত চিত্রে অভিনয় করেন 'সিনর লিগরো' এবং তার তিনজন বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রমোহন, ৺তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺চানী দত্ত। ধনপতির ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন শিশির কুমার। এরপর কিছুদিন পরে এপ্রিল মাসে 'আলমগীর' নাটকে রবীন্দ্রমোহন ভীমসিংহের ভূমিকায় পেশাদার রংগমঞ্চে সর্বপ্রথম নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানান। তখন ভীম-সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতেন সত্যেন দে। পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁর অনুপস্থিতির জন্য রবীন্দ্রমোহন ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করেন। চন্দ্রগুপ্ত নাটক যখন মঞ্চস্থ হ'লো তখন শিশির-কুমার চাণক্য ও ৺বিশ্বনাথ ভাদুড়ী চন্দ্রকেতু এবং রবীন্দ্রমোহন কাত্যায়নের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আগষ্ট মাসে শিশিরকুমার ম্যাডান-কোম্পানী পরিত্যাগ করেন—রবীন্দ্রমোহনও তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেন। ম্যাডান-কোম্পানী পরিত্যাগ করে শিশির কুমার তাজমহলে যোগদান করেন। তাজমহলের প্রথম নির্বাক ছবি 'আঁধারে আলোতে' রবীন্দ্রমোহন অংশ গ্রহণ করেন। এবং তাজমহলের পরবর্তী বহু চিত্রেও তাঁকে দেখা যায়। ১৯২৩ খৃঃ-এ ইডেন গার্ডেন 'ক্যালকাটা একজিবিশনের' অনুষ্ঠানের সময় শিশির সম্প্রদায় কর্তৃক ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকের অভিনয় হয়—রবীন্দ্রমোহন দুর্মুখ এবং শম্বুকের ভূমিকাভিনয় করেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটক নিয়ে নানান বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়, শিশির কুমার ৺যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের 'সীতা' নাটক মনমোহন নাট্য-মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্র-মোহন 'কুশের' ভূমিকাভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে জনা, পাষাণী, পুণ্ডরীক, আলমগীর, ভীষ্ম

প্রভৃতি আরো বহু নাটকে রবীন্দ্রমোহন অংশ গ্রহণ করেন। জনা নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন প্রভূত যশ ও খ্যাতি লাভ করেন। এরপর শিশির সম্প্রদায় যখন ছ'মাসের জন্ত বেনারস, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন করে বেড়ান— রবীন্দ্রমোহনও সেই সংগে যেতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে শিশিরকুমার কর্ণওআলিস থিয়েটার ভাড়া করে নাট্যমন্দির লিঃ-এর প্রযোজনায় কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন, রাজা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঘুপতি —শিশিরকুমার এবং রাণীর ভূমিকাভিনয় করেন চারুশীলা। এখানেও বহু নাটকে রবীন্দ্রমোহন অংশ গ্রহণ করেন। তার ভিতর পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, নর-নারায়ণ, প্রফুল্ল, ষোড়শী, শেষরক্ষা, প্রতাপাদিত্য, বিল্বমঙ্গল, দিগ্বিজয়ী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দিগ্বিজয়ী নাটকাভিনয়ের সময় শিশিরসম্প্রদায় ত্যাগ করে রবীন্দ্রমোহন মনমোহন থিয়েটারে যোগদান করেন এবং সেখানে কর্মবীর নাটকে অভিমন্যু, প্রাণের দাবীতে শশাঙ্ক, তপোবলে বশিষ্ট,প্রফুল্লে রমেশ, কণ্ঠহারে রনেন, বঙ্গে বর্গীতে সিরাজ, পথের শেষে-এ নলিনী, সাজাহানে ঔরঙ্গজেব, আবুহোসেনে আবু প্রভৃতি আরো বহু নাটকের বহু চরিত্রে রবীন্দ্রমোহনকে দেখা যায়। শিশির কুমারের প্রতি রবীন্দ্রমোহনের অগাধ শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের পরিচয় এই সময় আমরা পাই। প্রফুল্ল নাটকের এক মিলিত অভিনয়ে মঞ্চের ওপর শিশিরকুমারের সংগে নির্মলেন্দুর বাদানুবাদ হয়। নির্মলেন্দু শিশিরকুমারকে বেশ খানিকটা অপমান করার চেষ্টা করেন সকলের সামনে। রবীন্দ্রমোহন তারই প্রতিবাদে মনমোহন থিয়েটার পরিত্যাগ করে কম মাহিনায় পুনরায় শিশির সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং এখানে সধবার একাদশী নাটকে অটল, রমায় রমেশ, চন্দ্রগুপ্তে চানক্য সীতায় রাম,পাণ্ডবগৌরবে শ্রীকৃষ্ণ,শঙ্খধ্বনিতে অজিত সিংহ, কবিগুরুর তপতী নাটকে রত্নেশ্বর আর কুমার সেন

'কুমকুম'-এর স্যার জগদীশ প্রসাদ।

চরিত্রাভিনয় করেন। তপতী নাটকের পর থিয়েটার উঠে যায়। রবীন্দ্রমোহন মিনার্ভায় যোগদান করেন। মিনার্ভায় রাঙ্গা-রাখীতে অমর, অগ্নিশিখায় রাম, প্রতাপাদিত্যে সুন্দর প্রভৃতি অভিনয় করে মিনার্ভা পরিত্যাগ করে নিজস্ব পরিচালনায় একটা নাট্য-মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় মেতে পড়েন। এবং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সহায়তায় রঙমহল নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩১ খৃঃ।

এখানে বহু নাট্যাভিনয় হয়। 'পথের সাথী' নাটক অভিনীত হবার সময় পরিচালকদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে রবীন্দ্রমোহন রঙমহল পরিত্যাগ করে শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয় প্রযোজিত নাট্য-নিকেতনে যোগদান করেন। এবং এখানে নরদেবতা, বিদ্যাসুন্দর, কেদার রায়, গোরা, আলাদীন, সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি নাটকে

অংশ গ্রহণ করে ১৯৩৮ খৃঃ-এর ডিসেম্বর মাসে নাট্যনিকেতন পরিত্যাগ করে শ্রীযুক্ত মধু বসুর সংগে সাগর মুভিটোনের 'কুমকুম' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য বম্বে চলে যান।

১৯৩৮ খৃঃ অবধি এতক্ষণ রবীন্দ্রমোহনের নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করাতে অনেকে মনে ভাবতে পারেন, নির্বাক যুগের পর কুমকুমই বুঝি শ্রীযুক্ত রায়ের প্রথম সবাক ছবি। কিন্তু তা নয়। সবাক যুগে রাধা ফিল্মের শ্রীগৌরাঙ্গ চিত্রে চাপাল-গোপালের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন সর্ব প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৩৩ খৃঃ-এ। নির্বাকযুগে কমলে কামিনী, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, মানভঞ্জন, বিচারক প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। সবাক যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ, হরিভক্তি, (হিন্দি) শচীদুলাল, দক্ষযজ্ঞ, রাজনটী বসন্ত সেনা, বাসবদত্তা, দেবদাসী, সাবিত্রী, পণ্ডিত মশাই, ইন্সপেক্টার, রজনী, গ্রহের ফের, গোরা, জনকনন্দিনী, ছিন্নহার, নর-নারায়ণ, যখের ধন, পরশমণি প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। বম্বে থেকে প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রমোহনকে ঠিকাদার, যোগাযোগ, পতিব্রতা, বিদেশিনী, ছদ্মবেশী, পথ বেঁধে দিল, বন্দী, সহধর্মিনী, দম্পতি, পথের সাথী, সমাধান, ভাবীকাল, শান্তি, সংগ্রাম, দুঃখে যাদের জীবন গড়া প্রভৃতি চিত্রে দেখতে পাই। বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করবার পর প্রথমে রঙমহল নাট্য মঞ্চে রবীন্দ্রমোহন যোগদান করেন। রঙমহল পরিত্যাগ করে নাট্যনিকেতনে যোগদান করেন। পুনরায় রঙমহলে ফিরে আসেন। ১৯৪২ খৃঃ নাট্য-ভারতীর সংগে তিনি জড়িত হ'য়ে পড়েন এবং এখানে দুই পুরুষে মহাভারত, দেবদাসে ধর্মদাস, ধাত্রীপান্নায় জগমলের ভূমিকাভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৪ খৃঃ-এ জানুয়ারী মাসে নাট্য-ভারতী বন্ধ হ'য়ে প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়।

'দেবদাস' নাটকে পার্বতী ও ধর্মদাস রূপে সরযূবালা ও রবীন্দ্রমোহন।

সাময়িক ভাবে কিছুদিন নাট্য-মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৪৪ খৃঃ-ই ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ষ্টার থিয়েটারে টিপু সুলতানে হায়দার আলী, অযোধ্যার বেগম-এ মীরকাসেম, কঙ্কাবতীর ঘাটে মিঃ মুখার্জি প্রভৃতি চরিত্র দক্ষতার সংগে রূপায়িত করে মিনার্ভায় যোগদান করেন। মিনার্ভায় বিভিন্ন পুরোন নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। এবং নতুন নাটকগুলির ভিতর সীতারামের চন্দ্রচূড় শ্রীযুক্ত রায়কে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ বৃহন্নলা ও দ্রৌপদী রূপে রবীন্দ্রমোহন ও প্রভা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় আমাদের কাছে শুধু অভিনেতা রূপেই পরিচিত —তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার আমরা অনেকেই কোন খোঁজ রাখিনা। ছোটবেলায় তাঁর কবিতা লিখবার খুব ঝোঁক ছিল এবং বহু কবিতা ও গান তিনি রচনা করেন। নাটক রচনায়ও তাঁর হাত ছিল। 'রাজা গণেশ' নামে রবীন্দ্রমোহনের একটি নাটক সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক মনমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরে নিজেই নাটকটীর দুর্বলতা বুঝতে পেরে নষ্ট করে ফেলেন। ১৯১৬ খৃঃ-এ 'বনফুল' নামে শ্রীযুক্ত রায়ের একটী কবিতার বই বরেন্দ্র লাইব্রেরী প্রকাশ করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রমোহন রচিত প্রায় শতাধিক গান প্রচলিত আছে। এর ভিতর আঙ্গুরবালা গীত "চির সুন্দর নাহি হবে গো" এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র গীত "কেন মিছে কর অভিমান" "কাছে গেলে কেন দূরে সরে যায়" প্রভৃতি গানগুলি এক সময় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রেখা-নাট্যে দক্ষযজ্ঞ, কেদাররায়, আলমগীর, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতী, কমলে কামিনী, নরমেধ যজ্ঞ, বিন্দুর ছেলে, শকুন্তলা, লায়লামজনু, সুরথউদ্ধার, টিপু সুলতান প্রভৃতিতে অভিনয় করে রবীন্দ্রমোহন গ্রামোফোন-শ্রোতাদের মন জয় করতে সক্ষম হ'য়েছেন। অভিনেতা জীবনে শ্রীযুক্ত রায় যে সব নাটক এবং চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন তার ভিতর কুশ, লব, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম সিংহ, জয় সিংহ, রত্নেশ্বর, বৃহন্নলা, দারা, অভিমন্যু, বিনোদ, সুন্দর, মুরলীধর (মহানিশা), চাঁদ রায়, (কেদার রায়), সুরেশ (বাংলার মেয়ে) মহিম (গোরা), গোলাম হোসেন

'জনক নন্দিনীর দশরথের সৌভাগ্য তারিফ করলেও বৃদ্ধ রাজার শোক-বহুল ভবিষ্যতের ছবি মনের কোণে ভেসে উঠে—অনুভূতির নাড়ীটা একটু টনটনিয়ে উঠলো।'
(সিরাজদ্দৌলা) ধর্মদাস (দেবদাস), উপেন (চরিত্রহীন) মিঃ মুখার্জি (কঙ্কাবতীর ঘাট) চন্দ্রচূড় (সীতারাম), রাজা (রাজনটী বসন্ত সেনা) জগদীশ প্রসাদ (কুমকুম), কুঞ্জনাথ (পণ্ডিত মশাই) সাধন (ভাবীকাল) প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত যশও যেমনি অর্জন করেছেন—এই সব চরিত্রে অভিনয় করে নিজেও তৃপ্তি পেয়েছেন। পর্দায় শ্রীযুক্ত রায় উপযুক্ত সুযোগ পাননি বলে অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, "পর্দায় আমি আশানুরূপ ভূমিকা প্রায়ই পাইনা। আমার চোখ অবশ্য এজন্য অনেকটা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। অনেকে জানেন, আমি টেরা—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নই। আমার এই ডান চোখটা একদম কাজ করে না—মানে একেবারে অন্ধ। ছোটবেলায় টাইফয়েডে এই চোখটা হারাই। তবে ইচ্ছা করলে পরিচালকেরা নূতনভাবে চরিত্র সৃষ্টি করে এই চোখের সুযোগ গ্রহণ করে আমায় ভূমিকা দিতে পারেন। রূপ-সজ্জার পক্ষেও আমার দাঁত অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।" এই বলেই দু'পাটি নকল দাঁত যখন শ্রীযুক্ত রায় তুলে ফেল্লেন—আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম! সমস্ত মুখাবয়বটাই পালটে গেল।

নাট্য-পরিচালক এবং অভিনেতাদের ভিতর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রতি রবি রায়ের অসীম শ্রদ্ধা। শিশিরকুমারের প্রসংগে বলতে যেয়ে তিনি বলেন, "গুরুদেবের সংগে নাম করা যায় এমন আর একজন পরিচালক আমি আমার এই সুদীর্ঘ নাট্য-জীবনে দেখলাম না।" কথা প্রসংগে শিশির কুমারের অভিনেতা জীবনের জয়ন্তী উৎসব করবার পরিকল্পনার কথা বলতে যেয়ে শ্রীযু রায় বলেন, "আমার ইচ্ছা, নাট্যাচার্যের ছাত্রেরা মিলে একবার তাঁকে অভিনন্দন দি।" রূপ-মঞ্চ সম্পাদক এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রায়কে সর্বপ্রকার সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দেন।

নট ও নাট্যকার ৺যোগেশ চৌধুরীর প্রতিও শ্রীযুক্ত রায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। স্বর্গতঃ শিল্পী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "যোগেশদার মত নিরহঙ্কার ও আপনভোলা লোক শিল্পী গোষ্ঠীর ভিতর দুর্লভ বল্লেও চলে।" আধুনিক নাট্য কারদের ভিতর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনকেই রবীন্দ্র-মোহন শিল্পীদের একমাত্র দরদী বন্ধু বলে মনে করেন। চিত্র পরিচালকদের ভিতর বেহু বাবু অর্থাৎ নীরেন লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার এবং প্রফুল্ল রায়েরও যথেষ্ট প্রশংসা করেন। স্বর্গতঃ প্রফুল্ল ঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রমোহন বলেন, "তাঁরই জন্য আমি সবাক চিত্রে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ লাভ করি।" অভিনেতাদের ভিতর শিশিরকুমারের স্থান সর্বাগ্রে বলে শ্রীযুক্ত রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস। অভিনেত্রীদের ভিতর শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয় দক্ষতাকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। মঞ্চাভিনয়ের মান অধোগতির দিকে যাচ্ছে

বলে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁদের অভিযোগ স্বীকার করে শ্রীযুক্ত রায় বলেন, "এজন্য আমরা শিল্পীরাও কম দায়ী নই। আমরা টাকার মোহে পর্দায় অভিনয় করছি এবং একসংগে বেশী সংখ্যক চিত্রের চুক্তি নিয়ে সারাদিন ষ্টুডিওতে কাজ করে ক্লান্তি নিয়ে মঞ্চে অবতরণ করে কোন রকমে দায়োদ্ধার করেছি। অবশ্য মঞ্চ মালিকদের খামখেয়ালীও মঞ্চের অধঃপতনের জন্য অনেকটা দায়ী।" নতুন অভিনেতারা সুযোগ পাননা বলে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁদের অভিযোগ শ্রীযুক্ত রায় মেনে নিতে নারাজ। রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের নাট্য-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে তারিফ করে বলেন, "নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে। নাট্য-বিদ্যালয় স্থাপিত না-হওয়া অবধি নতুনের অভাব মিটবে না।"

রূপ-মঞ্চ পত্রিকা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায়ের অভিমত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমার সামনে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক বসে আছেন বলেই বলছি না। রূপ-মঞ্চ প্রথম থেকেই আমার মত বহু শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষ মতামত আমার নিজের বিরুদ্ধে হলেও তাকে তারিফ না করে পারি না। আদর্শবাদী এবং নির্ভীক বীরের সকল ক্ষমতা নিয়ে রূপ-মঞ্চ চিত্র ও নাট্য-জগতে এসে দাঁড়িয়েছে—সমাজের চোখে আমাদের শিল্প ও শিল্পীরা যে অবহেলা ও লাঞ্ছনা পেয়ে এসেছে—তার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রূপ-মঞ্চ আমাদের আত্মমর্যদা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টায় এই অবহেলিতা শিল্প জননী জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—একজন দীন শিল্প সাধক হয়ে আর কিছু আমার বড় কামনা নেই।" শ্রীযুক্ত রায় যখন এই কথাগুলি বলেন, আমি আড়-চোখে একবার সম্পাদকের দিকে তাকালাম—দেখলাম পরম তৃপ্তির ছায়ায় তাঁর মুখাবয়ব দীপ্তিভাত।

রবীন্দ্রমোহনের পারিবারিক জীবন খুবই মধুর। শুধু অভিনেতারই নয়—অনেকের কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। রবীন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র শ্রীমান রণেন্দ্র-মোহন প্রিয়দর্শন শিক্ষিত যুবক। অভিনয় এবং সংগীতে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। মৌলভীর কাছে বর্ত্তমানে শ্রীমান রণেন্দ্রমোহন হিন্দি ও উর্দু শিক্ষা করছে।

একটায় আমাদের আলোচনা শেষ হলো—উঠবার আগে আর একবার 'কোকো'র বাটীতে চুমুক দিতে হলো। কিছুক্ষণ পূর্বে যে লোকটীর সংগে আমার আলাপ ছিল না। কয়েক ঘণ্টা তাঁর সংগে কথা বলে—তাঁর অমায়িক ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, বিদায় নমস্কার জানিয়ে পা বাড়াবার সময় মুখ দিয়ে অতর্কিতে বেরিয়ে পড়লো, "রবি দা' যাই।" উত্তর পেলাম, "হ্যা ভাই, এসো।"

'শরৎচন্দ্রের মানস চরিত্র বাংলার শাশ্বত কুঞ্জনাথের প্রতি মনটা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে উঠলো।'

THE MAN
in
INDUSTRY

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে
গোলাম হোসেন ও নাম
ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন
ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী

চলে এলাম বিংশ শতাব্দীর একটী চা বাগানে। নানান্ লোকের ভীড় সেখানে। চা-বাগানের অপরিচিত কুলি পুরুষ ও রমণীর ভীড়ের মাঝে চেনাও কয়েকজন বেরিয়ে পড়লো। অমর, দুর্গাদাসকে দেখলাম। দেখলাম, জীবন গাঙ্গুলী, রবি রায়, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, কমলা ঝরিয়া, রেণুকা রায়, চিত্রা। চিত্র-জগতের আরো অনেককে। হঠাৎ নজরে পড়লো বিরাট এক টাক'।

(দুই)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

'ও পোড়ারমুখী হারামজাদী'-রাই'র মায়ের চীৎকার রায়'দের বাড়ী ভেসে আসে। রায়'দের বাড়ীর লাগা দক্ষিণ দিকে রাই'দের বাড়ী। মাঝখানে ছোট একটা পালান। কচার বেড়া দিয়ে ঘেরা সে জায়গাটা রায়'দেরই। দেবু ওখানে বাগান করেছে। ফুলের বাগান। অতসী ফুল—কৃষ্ণকলি—গাঁদা ফুল—শিউলী—গন্ধরাজ। দু'একটা কলমের আমের চারা পুবপাড়া বোসেদের বাড়ী থেকে একটা সবেদার চারা এনেও দেবু লাগিয়েছে তার বাগানে। কিন্তু চারাগুলি আর বেশী বড় হবার সুযোগ পায় না। রাঙা জ্যেঠাইমার কামধেনুর নবজাত শিশুটী দেবুর অবর্তমানে দুপুর বেলা বেছে বেছে দেবুর ঝাকড়া ঝাকড়া চারাগুলির সদ্ব্যবহার করে। পালানের পাশ ঘুরে রাই'দের বাড়ী থেকে রায়'দের বাড়ীর সদরে যেতে হয়। রাই আর অত ঘোরা ঘুরির ভিতর যায় না। সে পালানের মাঝামাঝি দিয়ে একটা রাস্তা করে নিয়েছে। সেখান দিয়েই সটান দেবুদের অন্দর মহলে যেয়ে হাজির হয়। দেবু যদি বাগানে কাজে ব্যস্ত থাকে—রাই যদি পা বাড়ায়—রাইর আর সেদিন সোজা পথে যাবার উপায় থাকেনা। রাইও পা বাড়িয়েছে—কচমচ করে কচার বেড়াটাও কচমচিয়ে উঠেছে। দেবুর কান খাড়া হ'য়ে ওঠে। হাঁক দিয়ে বলে, "কে রে, কে! পা এ্যাক্যাবারে কাইটা ফ্যালাবো।" রাই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে উপায় নির্ধারণ করে নেয়। দেবু মনে করে, রাঙা জ্যাঠাইমার বাছুরটাই তাহ'লে। আর কোন শব্দ নেই। নিশ্চয়ই তাড়া খেয়ে চলে গেছে। সে কাজে লেগে যায়। ঘাসের পাতাগুলি খস খস করে ওঠে। রাই পা বাড়িয়েছে। দেবু বুঝতে পারে, এ রাঙা জ্যাঠাইমার কামিনী নয়। তার চেয়ে কোন সুচতুর জীবের পায়ের শব্দ। মাথা উঁচু করে তাকায়। দেবু আর স্থির হ'য়ে কাজ করতে পারে না। "দাঁড়াও বাঁদরামুখী তোমারে আজ শেষ কইরা ফ্যালাবো।" রাই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, কী করে দেবুর রাগ ঠাণ্ডা করবে। আরো দু'পা এগিয়ে বলে, "ইস্! ভাখছো দেবুদা, তোমার কমলমণি ক্যামন শুকাইছে।" কমলমণি দেবুর প্রিয় অপরাজিতার লতা। দেবু তাকায় তার দিকে—হয়ত বা সত্যিই! দেবুকে চুপ করে থাকতে দেখে রাই সুযোগ পেয়ে যায়। দেবুর চেয়েও কমলমণির জন্য বেশী দরদ দেখিয়ে বলে, "না, তোমারে নিয়া আর পারা যাইবো না। তুমি তোমার সবেদার চারা নিয়াই মাইতা আছো। কমলমণির দিকে দিষ্টি দ্যাবার সময় তোমার কোথায়?" রাই আরও একটু দরদ দেখিয়ে অপরাজিতার লতাটীর দু'চারটে শুকনো পাতা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ভাঙা পাতার পর থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলে দেয়। দেবু মনে মনে রাইর প্রতি খুশী হ'য়ে ওঠে। রাই সুযোগ বুঝে দেবুকে বুঝতে না দিয়ে সোজা পথেই চলে আসে দেবুদের বাড়ীতে। দুপুর বেলা আর রাইর কোন চাতুরী খেলতে হয়না। দেবু স্কুলে যায়—রাই নিজের খুশীমত দেবুর বাগান দিয়ে যাতায়াত করে।

কিছুক্ষণ বাদে বাদেই 'পোড়ারমুখী—হারামজাদী' শব্দ ভেসে আসে। এ ডাকের সংগে সবাই পরিচিত। সকলেই জানে, এ রাই-এর মায়ের গলা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলমাত্র এই দু'টী শব্দ ভেসে আসে, রাই ভ্রূক্ষেপও করে না। কাজ নেই, কর্ম নেই দেবুদের বাড়ীর এখানে সেখানে রাই ঘুরপাক খাচ্ছে। দেবুর বৌদি মুড়ির ধান সিদ্ধ করে উঠানে শুকোতে দিয়েছে—রাইকে আর হুকুম করতে হয় না। একটা লম্বা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে সে কাক তাড়াতে বসে যায়। দেবুর বৌদি শীতের দিনে রোদে বসে ডালের বড়ি দিচ্ছে—রাই তার কাছে চুপচাপ বসে আছে। সুনন্দা হয়ত বলে, "যা রাই, এখন বাড়ী যা। তোর মা'র গলা চিরে গেল। শেষে দেবে'খন দু'চার ঘা বসিয়ে।" কিন্তু রাই কী আর উঠবার মেয়ে! কোন কোন সময় মায়ের কাছ থেকে দু'চার ঘা যে না খেতে হয় তা নয়, হয়ত

চুলের গোছা ধরেই দিল এক ঝাঁকুনী। বাপের কাছে যেমনি আদর—মায়ের কাছে তেমনি অনাদর। তবু তার হাদিস হয় না। সুনন্দা হয়ত কাজের ভীড়ে কথাও বলতে পারে না—তাতেও রাই'র আপত্তি নেই। বসে আছেত আছেই। "বৌদি কী রান্না করলা—দেবুদা আজ রাগ কইর্‌য়া গেল ক্যানে—বৌদি এ কাপড়খানা কবে পিনলা—তোমারে সাক্ষাৎ ভগোবোতীর মত দেকাইছে।" এমনি কত প্রশ্ন করে। কোনটার জবাব হয়ত সুনন্দা দেয়—কোনটার দেয়না। কাজের ভীড়ে কখনও বা তিরিক্ষি মেজাজেই সুনন্দা বলে, "নে বগবগানীটা একটু থামাতো বাপু! দেখছিস, হিম সিম খেয়ে যাচ্ছি—তার ওপর তোর জবাবদিহির অন্ত নেই।" রাই বেমালুম হজম করে নেয়। প্রশ্নও থামায় না। বরং এ-কথা ছেড়ে সে-কথা পাড়ে। উনোনে কড়াই চাপিয়ে সুনন্দা বিলের ঘাটে তাড়াতাড়ি একটা বেলি মাজতে যায়। এসে দেখে কড়াই তেতে গেছে। বলে ওঠে, "না ছাই! সোম্বারাটা একাবারে তেতে গেল।" রাই কর্তৃত্বের সুরে বলে ওঠে, "তা আমারে বল্‌লা না ক্যান। আমিত চোখের সামনায় বইসা আছি।" সুনন্দা কোন কথা কয় না। মেজাজটা একটু গোলমেলে থাকার দরুণই রাই'র কথা মনে ছিলনা। নইলে রাই'ত তার টুক-টাক সব কাজই করে দেয়। সুনন্দার কাজ করে দিতে রাই'র ভারী ভাল লাগে। অথচ বাড়ীতে তার মা যদি কুটোটাও তুলতে বলে রাই দপ দপ করে জ্বলতে থাকে। "ও হারামজাদী—আইসা নে এ মুখা—এই চল্লা তোর মাথায় ফাটাবো।"

রাই'র বুকটা দুর দুর করে কেঁপে ওঠে। তার মা খুবই চটেছে! এবার না গেলে আর রক্ষা নেই। রাই দ্রুতপদে বাড়ার দিকে অগ্রসর হয়। রাই'র মায়ের নাম কেউ জানেনা। জানবার প্রয়োজনও হয়না। 'জাইলা-বৌ' নামে সে সবাইর কাছে পরিচিত। আশে পাশে বহু জেলে থাকলেও—'জাইলা-বৌ' বল্লে সকলে একডাকে হলধরের বৌ'কেই বোঝে। রাই তাদের বাড়ীর উঠানে পা দিতেই 'জাইলা-বৌ' অভ্যর্থনা জানিয়ে, বলে "আও আসতে যে পারলা—যাও আমার পিণ্ডি চটকাও যাইয়া।" রাই কোন কথা না বলে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে। কলাইর থালায় মোটা চালের ভাত, কাকলে মাছের চচ্চরি—তেতুল একদলা—গোটা তিনেক কাঁচা লঙ্কা আর এক ঘটী জল নিয়ে খেতে বসে যায়। খাবার উপকরণ-এর চেয়ে বেশী বাড়ে না। যেদিন বাড়ে মুসুরীর ডালের জল—কী টাকী মাছ দিয়ে শাক চচ্চরী। হলধরের জালে এত সুন্দর সুন্দর মাছ ওঠে—অথচ রাই'দের খাবার বেলায় যত পঁচা মাছ—কী যে মাছের কোন খদ্দের জোটে না—যার চাহিদা কম, তাই। এতে এদের কারো দুঃখও নেই, হদিসও নেই। রাই যে এত বেছে বেছে মাছ যোগায় সব বাড়ীতে, ছোট বেলা থেকেই সে জেনে আসছে, ও ভাল মাছ খাবার তাদের কোন অধিকার নেই। ওমাছ বাবুদেরই এক চেটিয়া। হলধরের জালের বড় বড় মাছ দিয়েই গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হয়। ক্রিয়া-কর্মে কত লোকজন খায়—হলধরদের আর নিমন্ত্রণ করতে হয়না—সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে যাবার পর পাতা নিয়ে বসে যায়। তাদেরই জালে মারা-মাছ দিয়ে বাবুদের বাড়ীতে মুখ পালটে নেয়। ভোজের শেষ-পর্বে আয়োজনের অনেক কিছুই ওদের জন্য থাকে না। না যাক। আপশোষ নেই। আপশোষের কোন কারণও জাগে না। বাবুদের বাড়ীর হয়ত মাতব্বর গোছের কেউ ঘুরতে থাকেন, "না হলধর মাছগুলি আজ বেশ দিয়েছিলে। এতবড় মাছ আমাদের বিলে কী করে এলো?" হলধরের মন খুশীতে ভরে ওঠে—পাতের পর মাছের কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর বলে, "অতিথ কুটুমরা সব ভাল কইছেন তো।"

"আরে, হ্যাঁ—হ্যাঁ— কুবুরদার সমাদ্দার কাকাত মাছ খেয়েই বল্লেন, মাছ বুঝি হলধর দিয়েছে!" কুবুরদার সমাদ্দার মশায় সমাজের একজন গণ্যিমান্যি ব্যক্তি—তাঁদের বাড়ীতেও ক্রিয়া-কর্মে হলধরই মাছ দিয়ে থাকে। মাছ খেয়েই তিনি বুঝেছেন, হলধরের জালের মাছ। হলধর গদগদ হ'য়ে ওঠে। হলধরের মনে মনে বেশ গর্ব হয় খানিকটা।

"যা লাগে চেয়ে-চিন্তে নিও, তোমাকে ত আর বেশী বলার নেই। আমি যাই আবার ওদিকে।"

হলধর বলে, "হ্যাঁ—আপনি আসুন—আমাগো আর কিছু বলতে অবে না। যা যোগাড় করছেন। নেরে ছ্যামড়ারা—যা যা লাগবে চাইয়া চিন্তা নে।" বাবু চলে যান। হলধরের মেঝো ছেলেটা বলে "ছাখো বাবা—এই মাছটা কিন্তু আমার জালের। এ্যাত বড় ওজন—জাল এ্যাকারে ছিড়া যাবার লাইগা ওলটি পালটি লাগাইছিলো।" কোন পদ পায়—কোন পদ পায় না। যা পায় তাতেই তারা তৃপ্ত। খেয়ে যখন বাড়ীতে আসে, পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে আসে—এমন খাওয়া তারা খায় না। সারাদিনই হয়ত খাওয়ার আলোচনা চলে দাওয়ায় বসে।

সারাদিন সারা বছর জলে-রোদে ভিজে যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দেয়, হায়রে বাংলার চাষা—তাদের দুবেলা দু'মুঠো পেট ভরে অন্ন জোটে না। চালে ছোন থাকেনা—পরণে নেংটীর বেশী আর কিছু ওঠে না। যে শ্রমিক, যে মজুর—নিজেদের রক্ত দিয়ে সহরের ছোট বড় কলকারখানা গুলিকে ফাঁপিয়ে তুলে ধনীর বিলাস ব্যসনের উপকরণ যোগায়—প্যাচা স্যাঁতসেঁতের বস্তীতে অনাহারে—রোগব্যাধিতে তাদের জীবন-দীপ সকলের অলক্ষ্যে নির্বাপিত হ'য়ে আসে। দুনিয়ার এই শাশ্বত নিয়ম—বাংলার এই গণ্ড-গ্রাম বল্লভপুরেও অপরিবর্তিত। হলধর এবং তার ছেলেরা জাল বায়—কত আন্ধা পুকুরের অঠাই জলের কচুরী-পানা ঘেটে—ঝালডাংগার বিলে সামুক আর কাঁচভাংগায় কতবার তাদের পা রক্তাক্ত হ'য়েছে—পোকা মাকড়ের কুট-কাট কামড় ত তাদের গা-সওয়া হ'য়ে গেছে—কতবার সাপের কামড়ে—বিচ্ছুর কামড়ে তাদের মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে হয়—সারাদিন গলা জলে ডুবে তারা জাল বায়। একবার টাইকা জাল বাইতে বাইতে বিরাট এক গজার মাছের ঘায়েত হলধরের চোখই যেতে বসেছিল। আজও হলধরের বা চোখটা সে ঘায়ে লাল হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে অমাবস্যা পূর্ণিমায় চোখটা টনটনিয়ে ওঠে। তবু তার জাল বাওয়া ক্ষান্ত হয়না। শীতের দিনে ছেঁড়া গেঞ্জী, কী মোটা চাদর জড়িয়ে সাররাত ঝালডাংগার বিলে ভ্যাসলা জাল বায়। একবার ঘুমের ঝুঁকে হলধরের অনভ্যস্ত ছোট ছেলে বাঁশীটা ত জলেই পড়ে গিয়েছিল।

বর্ষায় ধান এবং পাট গাছের সংগে পাল্লা দিয়ে বর্ষার জল বেড়ে চলে। নতিয়ে পড়া ধান গাছগুলি জলের বুকের পর নতিয়ে পড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সমস্ত দেহ দিয়ে বর্ষার জলকে আবরিয়ে স্পর্শ দেয়। বিল ভাসে—পুকুর ভাসে। বিল-পুকুর-মাঠ একাকার হ'য়ে যায়—পুকুর এবং বিলের মাছগুলি বিল এবং পুকুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে মাঠের উদার বুকে ভেসে আসে। গায়ে গায়ে লাগা ধান গাছগুলির লতানো ফাঁক দিয়ে তারা পথ করে নিয়ে ছুটোছুটি করে—দল বেধেঁও তারা কখনও চলে! এই দলে মৃগেল—নলা (পোনা)—কালিবউস—চিতলই বেশী থাকে। হলধর তার ছেলেদের নিয়ে ছোট ছোট ডিংগিতে এক এক জনে এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ে। মাথার পরে সূর্য তার বেগ বাড়িয়ে ছুটে চলে—জলের পরে জলো হাওয়া শির শির করে বইতে থাকে—ওরা ধানের জমির আলির কাছে ভুরকী জাল ফেলে ওত পেতে থাকে। একটা, দু'টা, তিনটা—দল যদি ধরা দেয় একসংগে চার পাঁচটা মাছ তুলে বাড়ী ফেরে। সারাদিন রোদে থেকে বাড়ী ফিরে চোখে দেখে অন্ধকার। জাল ধুয়ে মাছগুলিকে ডালায় রেখে—ওরা খেতে বসে যায়। ঠাণ্ডা ভাত—লঙ্কা, তেঁতুল আর কাকলে মাছ—টাকী মাছ—কী ঐ ধরণের কুঁচো মাছের—যা বাবুরা পোছেন না—তার ঝোল বা চচ্চড়ী নিয়ে। কষ্ট করে যারা ঐ বড় মাছগুলি—ঐ টাটকা—লাল টুক টুকে মাছগুলি খেয়ে ওঠে—চাটুজ্জে বাড়ী—বোসেদের বাড়ী—রায়েদের বাড়ী।

খাবার পর রাই বেলিটা নিয়ে ঘাটে যায়। জেলেবৌ বাইরের 'দো-আহা'—উনোনে মাটির চারীতে করে কাপড় সিদ্ধ তুলে দিয়েছে অনেকক্ষণ। একটা কাঠি দিয়ে নাড়া-চাড়া করতে থাকে। ময়লায় তেল সীটে পড়ে গেছে। অনেক সময় নেয়। যেই সিদ্ধ হ'য়ে আসে—কাপড়গুলি নিয়ে সে বিলে কাচতে যায়। রাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, "গিলছো—এ্যানে আর পারা ব্যারাইতে যাইওনা। বাপ ভাইদের আসবার লগন হ' আইচে। ভাত বাইরা দিও। আমি এগুলি নিয়া বিলে যাই।" রাই একটু থেমে শুনে নেয় মায়ের কথাগুলি। তারপর বেলি মাজতে ঘাটে

যায়। ঘাটের কাছে জলে বেলিখানা ভিজিয়ে দিয়ে রাই হাতের কাছ থেকে দু'চারটে ঢিল কুড়িয়ে জলে ছুড়তে থাকে। প্রথমটা দু'হাত গেল—তারপর তিন হাত—চার হাত এমনি ভাবে কতদূরে ঢিল যায় পরীক্ষা করে দেখে। হ্যাঁ, এবার তার ঢিল অনেক দূরে গেছে—দেবুদাও এত দূরে ঢিল ছুড়তে পারে না। এবার রাই মনে মনে বেশ খানিকটা খুশী হয়। ঢিল ছোড়া থেকে ক্ষান্ত হয়। একটু পরে বিলের খানিকটা পরিষ্কার জলে পানিকাউরগুলি ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ খেতে থাকে। রাই'র দৃষ্টি সেদিকে যায়। পানিকাউরদের উদ্দেশ্য করে বলে, "পানিকাউর পানিকাউর তুমি আমার ছোট ভাই—লক্ষী,আমার জন্য একটা ডুব দাও —আর একটা—আর একটা··· ······।"

"ঘাটে যাইয়া মরলি নাকি"—রাইর মার গলা শোনা যায়। রাই তাড়াতাড়ি বেলিটা মেজে বাড়ী আসে।

জেলে-বৌ—বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী ঝাঁকায় করে—কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড়গুলি নিয়ে কাচতে যায়। অদ্ভুত শক্তি এই জেলেবৌ'র। লিকৃলিকে চেহারা, দেখে মনে হয় বাতাসের ভরে ঢলে পড়ে। অথচ বাঁশের ঝাঁকায় দুই পালোয়ানের বোঝা বয়ে নিয়ে সে কেচে আনে। শীতের সকালে চারটে কড়কড়া ভাত খেয়ে নেয়,গ্রীষ্মের সময় দু'টো লেবুর পাতা কচলে নিয়ে পাঁচ সাতটা ঝাল লঙ্কা ডলে নিয়ে —জলে ভাতে মেশানো পান্তা ভাত খেয়ে—সারাদিন চরকীর মত কাজ করে-যাচ্ছে। হাত এবং মুখ দু'টোই তার চলে একসংগে। কোনটা থেকে কোনটা বেশী চলে—তা বলা কঠিন। শুধু নিজের বাড়ীই নয়—অন্যের বাড়ীও যখন যে কাজে জেলেবৌ'কে ডাকা যায়—সে নির্বিবাদে যেয়ে হাজির হয়। সকলের বড় কলসীটা কাঁখে নিয়ে জল তুলে আনে কলসী কলসী। বড় বড় ক্রিয়া-কর্মে বড় বড় মাছ আসে বাবুদের বাড়ী—ঝালভাংগার বিলে অতবড় মাছ পাওয়া যায় না। হলধরই হয়ত ভাংগার হাট থেকে কিনে নিয়ে আসে। অতবড় মাছ কুটতে কেউ সাহস পায় না। জেলেবৌ বড় ধারালো বঁটি নিয়ে বসে যায়। জোয়ান মরদের যে মাছ তুলতে কষ্ট হয়—জেলেবৌ এক ঝাঁকি দিয়ে অক্লেশে বঁটির মুখে দু'হাত দিয়ে তা' তুলে ধরে। ভারী ভারী কাজ আর ভারী ভারী মাছ কাটে বলেই হলধর জেলেবৌ'র গলার কাছে চুপ করে থাকেনা। এমনি করে হলধরের সংসারের দারিদ্রের বোঝাগুলিও জেলেবৌ সমান ভাবে বয়ে এসেছে। জেলেবৌ যদি জেলে সমাজের আর দশটা মেয়ের মত হ'তো—তাহ'লে যখন হলধর বৌ'র পরণে সমানে কাপড় দিতে পারেনি—পেটভরে দু'বেলা খেতে দিতে পারেনি—তখনই হয়ত তাকে ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু জেলেবৌ তা যায়নি –তার সেরকম মতিগতির কোন দিন হলধর পরিচয় পায়নি। তাইত হলধর জেলেবৌর গলার কাছে কেঁচো হ'য়ে থাকে। এখনও যে হলধরের অবস্থা একটু ফিরেছে—জেলে বৌ সারাদিন কাজ করে। কিসে সংসারের সাশ্রয় হয়! গাছের পাতাগুলি অবধি মাটিতে জড় হতে পারে না জেলেবৌর জন্য। সারাদিন পাতা জড়ো করে সে জ্বালানীর যোগাড় করে। চার চারটি সন্তানের মা সে—ঐ লিকৃলিকে চেহারা কোনদিন তার ভেঙ্গে পড়েনি। দেখে জেলে বৌর বয়স অনুমান করা কঠিন। জেলেবৌর চেহারার ছাপ রাইর ভিতর খানিকটা পাওয়া যায়। যারা জানেনা, তাদের পক্ষে মা ও মেয়েকে দু' বোন বলে ভ্রম করাও অস্বাভাবিক নয়। জেলেবৌর কপালে দু' ভ্রু'র মাঝখানে নীল গোল একটা উল্কীর চিহ্ন। সে চিহ্ন হলধরের জন্যই সে নিয়েছে। ঐ চিহ্ন নাকি স্বামীর যম-দুয়ারের কাটা। লিকৃলিকে চেহারার ভিতর থেকে নিখাদ কাসরের আওয়াজ বেরোয়। সেই আওয়াজ যখন সপ্তমে চড়ে হলধরও তটস্থ হ'য়ে ওঠে। (চলবে)

কুমারী গীতাঞ্জলী, আগামী অনেক চিত্রে দেখা যাবে। রূপ-মঞ্চ : ১৩৫৩

শ্রীযুক্ত সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত
পাঙ্গুলি পিকচার্সের 'অলকনন্দা' চিত্রে
শ্রীমতী পূর্ণিমা ও প্রমিলা ত্রিবেদী।
নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাহিনী
অবলম্বনে চিত্রখানি গড়ে উঠেছে।

যাত্রী

(গল্প)

শ্রীঅপূর্ব সুন্দর মৈত্র

★

শক্তিপুর গ্রাম বাংলার একটি শান্তিপূর্ণ ছোট গ্রাম। শান্তি এর পরিচ্ছন্ন পথে, কাজল-কালো দীঘির জলে, নির্মল প্রভাতে আর স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়। কিন্তু বাইরের এই শান্তিপূর্ণ শান্তশ্রী এর আসল পরিচয় নয়। অশান্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে এর অন্তরে অর্থাৎ সমাজ জীবনে। বাইরের শান্তি গ্রামটিকে লোভনীয় ক'রেছে, আর ভেতরেয় অশান্তি ক'রেছে অসুন্দর এবং বর্জনীয়।

এই গ্রামে বাস করেন অবনী রায়, অখিল চক্রবর্তী এবং সমাজপতি হরিনারায়ণ চাটুজ্জে। তিনটি লোকই বিভিন্ন প্রকৃতির। অবনী রায় দরিদ্র; কিন্তু কমলা তাঁকে বঞ্চনা করলেও বাণী কৃপা ক'রেছেন। অগাধ পাণ্ডিত্য এবং কাব্য-চর্চা নিয়ে অবনী রায় ভুলে থাকেন তাঁর দারিদ্র, তাঁর সংসার এবং তাঁর অস্তিত্ব। সংসার অবশ্য তাঁর এই ঔদাসিন্য সহ্য করে না। বাস্তব সংসারের সংগে তাঁর ভাববিলাসী জীবনের সংঘর্ষ লাগে প্রতিনিয়ত। গৃহিনী মন্দাকিনীর মত তিরস্কারও তাঁকে সচেতন ক'রতে পারে না। নিস্ফল ক্রোধে মন্দাকিনী শুধু নিজেই দগ্ধ হন্। অখিল বাবু কিন্তু সংসারের প্রতিই বেশী মনযোগী। ভাববিলাসের স্থান তাঁর জীবনে নেই। বাস্তব জগতের সংগে সহযোগীতা ক'রে স্বীয় বুদ্ধি বলে তিনি দারিদ্রকে জয় ক'রেছেন এবং গ্রামের মধ্যে একমাত্র পাকা বাড়ী তুলে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন। হরিনারায়ণ চাটুজ্জে গ্রামের অন্তর, অর্থাৎ অশান্তির কেন্দ্রস্থল।

অবনীবাবুর পুত্র সন্তান নেই, আছে একটি মাত্র কন্যা—নাম অণিমা। আর অখিল বাবুর একটি মাত্র পুত্র বিশ্বনাথ ওরফে বিশু ছাড়া আর কোন সন্তান নেই। পাঠশালার সহপাঠী বিশু ও অণিমার বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। আর তাদের বন্ধুত্ব বন্ধনের মধ্য দিয়েই ধনী ও দরিদ্র এই দুটি পরিবারের বন্ধুত্ব বন্ধন-বাঁধা হ'য়েছিল দৃঢ় রূপে।

দিন চ'লেছিল হেসে খেলে—বেশ সুখে। কিন্তু কালের বিচারে তা চ'লবে কি ক'রে! চাই পরিবর্তন। তাই পরিবর্তন এলো অনিয়মের রূপ ধ'রে শরতের রৌদ্রোজ্জল প্রভাতের আকস্মিক বর্ষণের মতো। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হ'ল বিশু ও অণিমার জীবনে। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে বিশু এবার উচ্চ-শিক্ষার জন্যে কল্‌কাতায় যাবে। অখিল বাবু অবনী বাবুকে সব জানিয়েছেন, সবই ঠিক্। ক্রমে আসন্ন ঝড়ের মত যাবার দিন দ্রুতগতিতে এসে দেখা দিল। সেদিন অবনীবাবু যখন প্রাত্যহিক অভ্যাস মত দাওয়ায় ব'সে কাব্যপাঠে নিরত ছিলেন তখন বিশু এল বিদায় নিতে। অণিমা উঠানের এক পাশে ব'সে গুটি খেলছিল। বিশু যে আজই যাবে সে কথা সে জানেনা অথবা ভুলে গেছে। বিশুকে দেখে অণিমা আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌ল—"এসনা বিশুদা, দু'জনে খেলি!" বিজ্ঞের মত বিশু উত্তর দিল—"ধ্যেৎ! তোর মত ত' আর কচি খুকিটি নই যে ঐ সব খেলা এখন খেল্‌ব!"

তারপর একে একে সে তার আসার উদ্দেশ্যের কথা এবং কল্‌কাতার যাবার কথা তাকে জানালো। ছোট অণিমা; অপরিণত তার বুদ্ধি। বল্লে,—"আমিও তোমার সংগে যাব বিশুদা।" কৈশোরের সাথীটিকে তার মন কিছুতেই ছাড়্‌তে চাইল না। কিন্তু তার যাওয়াও সম্ভব নয়! বিশু তাকে উপদেশের ছলে অনেক কথা ব'লে বারে বারে সেই কথাটাই জানিয়ে দিল। ব'ল্‌ল,—"আমি যাচ্ছি পড়্‌তে। মেয়ে মানুষত আর পড়্‌তে যায় না!" অণিমা তখন নিরুপায় হ'য়ে তাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ল। কিন্তু বিশু জানালো যে, কল্‌কাতার পড়া শেষ করতে অনেক বছর লেগে যাবে এবং তাড়াতাড়ি তার ফেরা হবে না। তখন দুঃখ, ব্যথা এবং অভিমানে

অণিমা কেঁদে চলে গেল। কিন্তু আজ আর অণুর কান্নার দিকে তাকালে বিশুর চল্‌বে না, আর যে তার যাবার দিন। সন্ধ্যাবেলায় বিশু তার বাবার সংগে ষ্টেশনে গিয়ে কল্‌কাতায় যাবার ট্রেনে উঠ্‌লো। তারও অন্তর তখন আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে। অণিমার ব্যথাকাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানি বার বার তার মনে ভেসে উঠ্‌ছে। গাড়ির জানালায় মাথা রেখে কান্নার বেগ সে আর আটকাতে পারল না।

★ ★

কল্‌কাতায় এসে প্রথমে অণিমাকে ভুল্‌তে না পারলেও ক্রমে সহরের বৈচিত্র ও সমারোহে বিশু অণিমার স্মৃতি হারিয়ে ফেল্‌ল। অণিমা কিন্তু খেলা ভুলে কেবলই তার বিশুদার কথা ভাবে। চারিপাশের সব কিছুই ঠিক্ আছে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে শুধু বিশুদার আসনই আজ স'রে গেছে। এ সে ভুলবে কেমন করে? চারিপাশের সবকিছুই যে তার বিশুদার কথা মনে করিয়ে দেয়। খেল্‌তে ব'সে খেলা ভুলে তাই সে একদিকে চেয়ে থাকে। নাইতে খেতে তার আগ্রহ দেখা যায় না। পাঠশালায় যাওয়া সে বন্ধ করেছে। মেয়ের বিমর্ষ ভাব দেখে মন্দাকিনী স্বামীকে মেয়ের দিকে নজর দিতে ব'ল্‌লেন। আর ব'ল্‌লেন, "বিশু চ'লে যাবার পর থেকেই ওর এ রকম হয়েছে। কিন্তু এমন ক'রে মনমরা হ'য়ে থাক্‌লে যে অসুখ করবে। তুমি একটা ব্যবস্থা কর।" স্বামী উত্তরে হেসে বল্‌লেন—"কোন ভয় নেই গিন্নী। এ-হ'চ্ছে বাল-প্রেম। কাব্য-সাহিত্য এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। দু'দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" সত্যিই সব ঠিক্ হ'য়ে গেল। বিধাতার ইংগিতের মতই এই সময় অখিলবাবু এসে প'ড়্‌লেন এবং কথায় কথায় অণিমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ক'রবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন। অবনীবাবু সানন্দে সম্মতি দিলেন। তখনই সোদরোপম দুই বন্ধুর মধ্যে এ বিষয়ে পাকাপাকি কথা হ'য়ে গেল। অণিমা ও বিশুর বিবাহ স্থির হ'য়ে গেল।

★ ★

এরপর একে একে সাতবৎসর কেটে গেল। অণিমা এখন যৌবনের যাদুস্পর্শে ফুলের মত বিকশিত হ'য়ে নিজের সৌরভে নিজেই বিভোর। এই সাতবৎসরের মধ্যে অণিমা তার গৃহকর্ম নিয়ে, অবনীবাবু কাব্যপুস্তক নিয়ে এবং মন্দাকিনী সংসারের হাল ধ'রে নির্বিঘ্নে সময়ের পারাবার পেরিয়ে এসেছেন।

ওদিকে কলেজ জীবনে প্রবেশ ক'রে বিশু পেয়েছে প্রশান্তকে তার বন্ধু রূপে। প্রশান্তকে বিশুর বড় ভাল লাগে। প্রশান্ত দেশের কথা বলে। প্রশান্ত প্রায়ই তার মামার বাড়ীতে তার পাঠকক্ষে এসে জাঁকিয়ে বসে আর এই সব বিষয়ে তার সংগে বিশুর আলোচনা হয়। প্রশান্তর কথা শুনতে শুনতে বিশুর মন দেশের ও দশের মুক্তির জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সে প্রশ্ন করে— "পথ কোথায়?" প্রশান্ত বলে, "পেয়েছি পথ," বিশু সাগ্রহে ব'লে ওঠে, 'আমাকেও সেইপথ দেখাও ভাই, আমিও তোমার সাথী হব।" প্রশান্ত তখন সুযোগ বুঝে বিশুকে জয় ক'রে নেয় এবং তাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেয় কোন এক গুপ্ত সমিতিতে, যার কর্ণধার ছিল সে এবং যতীন ব'লে আর একটি ছেলে। এই সমিতির বাইরের বিষয় ছিল দেশ সেবা ও জনসেবা, কিন্তু ভিতরের উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন। দেশসেবার নামে সমিতি গঠন ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জন ক'র্‌বার পর সমিতি ভেংগে দেবার মৎলব ছিল। যতীন ও প্রশান্ত সৎ এবং অসৎ সমস্ত উপায়েই তারা দেশের নামে অর্থ সংগ্রহ ক'রত। সমিতির সভ্যদের ওপর এই অর্থ সংগ্রহের ভার থাকৃত। সেক্রেটারী যতীন তাদের শুধু নির্দেশ দিত এবং তারা তা' পালন ক'রত নির্বিবাদে, কারণ সমিতির নিয়ম ছিল যে, সমিতির নির্দেশ কোন ক্রমে অমান্য ক'রলেই তার শাস্তি হবে মৃত্যু। একবার সভ্য হ'লে সমিতি না ছাড়্‌লে কোন সভ্যের সমিতি ছাড়বারও উপায় ছিল না। প্রশান্তর প্ররোচনায় এবং ক্ষণিকের উত্তেজনায় সমিতির সভ্য হবার পর থেকেই বিশুর মন কিন্তু সন্দেহ দোলায় দুল্‌তে লাগ্‌ল। সমিতির কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য সে ভাল ক'রে বুঝতে পারল না। তাদের গোপন থাকার প্রচেষ্টা ও সমিতির মধ্যে চারিদিকেই সতর্কতা

অবলম্বন তাকে সমিতি সম্বন্ধে সন্দিহান ক'রে তুল্লো। প্রশান্তর সংগে সমিতিতে যাবার সময় ট্রামে অকৃত্রিম জ্যেষ্ঠোপম বন্ধু প্রণবদা'র সংগে বিশুর দেখা হ'য়েছিল। প্রণব ব'লেছিল, বিশু যেন আজই তার মেসে গিয়ে তার সংগে দেখা করে। সমিতির সভ্য হ'য়ে ফির্‌বার পথে সে প্রণবের মেসের দিকেই চল্‌ল।

এইখানে প্রণবের পরিচয় দিই। এম্‌,এ পাশ ক'রে চাকরীর সন্ধানে না ঘুরে প্রণব দেশসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছে। পাশে পেয়েছে অকৃত্রিম বন্ধু সুরেশকে। এদের সেবা পদ্ধতি কল্যাণকর এবং আন্তরিক। কোন স্বার্থবুদ্ধি তাদের মনে উঁকি দেয় নি, বরং দেশের জন্যে স্বার্থত্যাগই ছিল তাদের মন্ত্র। তারা চায় জাতির অন্তর থেকে জাতিকে এবং দেশকে উন্নত ক'র্‌তে; বাইরের আন্দোলনের ঘোর পরিপন্থি তার। শুধু শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তারা সব অন্ধকার দুর করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য জাতিকে এবং দেশকে উন্নত করা, তার পথ হ'ল শিক্ষার পথ—জ্ঞানের পথ। প্রশান্তকে প্রণব জান্‌ত। একই কলেজে তারা দু'জনেই প'ড়্‌ত, যদিও প্রশান্ত ছিল প্রণবের কাছে 'জুনিয়ার'। কিন্তু প্রশান্তকে জান্‌লেও তার সংগে প্রণবের পরিচয় ছিল না। সে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো। তার কাছে এবং কলেজে সব ছেলের কাছেই প্রশান্ত ছিল রহস্যপুর্ণ। প্রশান্তর চালচলন, কথাবার্তা কোন কিছুই সে পছন্দ করত না, সেই প্রশান্তর সংগে বিশুকে যেতে দেখে প্রণব বিশুকে তার সংগে দেখা ক'রতে বলেছিল।

বিশু যখন প্রণবের মেসে পৌছাল তখন প্রণব তার ভক্তবৃন্দ নিয়ে আসর জমিয়ে ব'সেছে। বিশু ঘরে ঢুক্‌তেই গান থামিয়ে প্রণব সবাইকে বিদায় দিল। তারপর নানা প্রশ্নে বিশুর সংগে প্রশান্তর বন্ধুত্বের কথা জেনে নিয়ে এবং প্রশান্ত সম্বন্ধে তার সন্দেহের কথা তাকে জানিয়ে অবশেষে বিশুকে সাবধান ক'রে দিয়ে প্রণব বল্‌ল, "আমার মনে হয় ওর জীবনে এমন কোন গোপনীয় ব্যাপার আছে যার কথা ও কিছুতেই প্রকাশ ক'র্‌তে চায় না। তাই সব সময়েই ও নিজেকে ঢেকে রাখে।...·· প্রশান্ত সম্বন্ধে আমার ধারণা not at all favourable or fair, এ তুমি জেনে রেখো।" আরও সে বল্‌ল,—"আমার মনে হয় ওর সংগে তোমার না মেশাই ভাল···তোমাকে ছোট ভাইএর মত ভাবি ব'লেই এ সব কথা ব'ল্‌লাম। আশা করি কিছু মনে করনি।" মনে বিশু কিছুই করেনি কিন্তু প্রণবের অনুরোধ এখন সে রাখ্‌বে কি ক'রে। সে যে এখন গুপ্ত সমিতির সভ্য। সে প্রণবকে জানালো—"আগে সাবধান ক'রে দিলে হয়ত ছাড়্‌তে পারতাম, কিন্তু এখন তাকে ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব!"

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে একটা অসংলগ্ন উত্তর দিয়ে প্রণবকে স্তম্ভিত ক'রে বিশু ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মামার বাড়ি পৌছে তার মামাতো বোন সুশীলার কাছে পেল তার বাবার চিঠি। বাবা লিখেছেন, "পত্রপাঠ চলে এস, বিশেষ প্রয়োজন।" সুতরাং সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে বিশু দেশের দিকে রওনা হ'য়ে গেল। সংগে চ'লল সুশীলা। অণিমার বন্ধু সে। অনেকদিন বন্ধুকে সে দেখেনি। এই সুযোগে একবার দেখে আসবে।

★ ★

কল্‌কাতার যখন বিশুকে নিয়ে এতগুলো ঘটনা পর পর ঘ'টে গেল তখন শক্তিপুরে অবনীবাবু ও অখিল বাবুকে কেন্দ্র ক'রেও ঘ'ট্‌লো কয়েকটা ঘটনা, যার ফলে অখিলবাবু বিশুকে তাড়াতাড়ি দেশে চ'লে আস্‌তে জরুরী চিঠি লিখ্‌লে এবং সেই চিঠি পেয়েই বিশু তাড়াতাড়ি সুশীলার সংগে শক্তিপুরে হাজির হ'ল।

বিশু যখন কল্‌কাতায় প্রশান্তর সংগে দেশোদ্ধারে ব্যস্ত সেই সময় একদিন শক্তিপুরে মন্দাকিনী অণিমাকে ব'ল্লেন, "যাতো অণু, তোর কৈলাস খুড়োকে এই দুটো টাকা দিয়ে আয়; বলিস্‌ ধার সোধের টাকা।" টাকা নিয়ে অণিমা চ'লে গেল। যে গ্রাম্যপথে সে চ'লেছিল, সেই পথেই আস্‌ছিলেন হরিনারায়ণ চাটুজ্জে ও তাঁর চেলা রামেশ্বর। অণিমার নিটোল যৌবন ও বাড়ন্ত গড়ন দেখে সমাজপতির মন অনিষ্ট স্পৃহায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। চেলা রামেশ্বরের সংগে পরামর্শ ক'রে সমাজপতি তখুনি ঠিক্‌ ক'রে ফেললেন যে, এত বয়েস

পর্যন্ত যে মেয়ে অবিবাহিত আছে, সমাজের নিয়মানুসারে তাকে এবং তার বাপ-মাকেও শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে। তাঁরা বুদ্ধিমানের মত আর কালহরণ না ক'রে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যেই বোধ করি অবনীবাবুর বাড়ীর দিকে চ'ললেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলনা। পথেই অবনীবাবুর সংগে তাঁদের দেখা হ'য়ে গেল। অবনীবাবু চ'লেছিলেন রাজেনের কাছ থেকে কাদম্বরী আনতে। ব্যস্ত অবনীবাবুকে থামিয়ে অণিমার প্রসংগ উত্থাপন ক'রে সোজা কথায় হরিনারায়ণ ব'ল্লেন—"এত বড় অবিবাহিত মেয়েকে আর বেশীদিন ঘরে রাখা চ'ল্বেনা। শীগ্‌গীরই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে। নইলে জানইত'……।" কথাটা অসমাপ্ত রেখে সামাজিক শাস্তির কথা আকারে ইংগিতে এমন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, ভাবপ্রবণ সরল অবনীবাবুরও বুঝ্‌তে দেরী হ'লনা যে, কি কঠোর ষড়যন্ত্র চ'লছে তাঁর বিরুদ্ধে। সে ষড়যন্ত্রের পরিণামের কথা ভেবে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেন। রাজেনের বাড়ীর পথ ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চ'ল্‌লেন অখিলবাবুর বাড়ীর পথে। সেখানে গিয়ে শুষ্ককণ্ঠে অখিলবাবুকে ব'ল্‌লেন—"আজ হরিনারায়ণের কথা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। আশাকরি তুমি পূর্বের কথা ভুলে যাওনি।" অখিলবাবু জানালেন যে, বিশু ও অণিমার বিবাহের সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতির কথা তিনি ভোলেননি বটে, কিন্তু বিশুর মত না নিয়েও তিনি বিবাহ দিতে অক্ষম। অখিলবাবুর কথায় অবনী-বাবু মনে আঘাত পেলেন। ছেলের মতের কাছে কি বাপের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই? সাতবছর পূর্বের সঙ্কল্প কি আজ মিথ্যা কল্পনায় রূপান্তরিত হ'ল? তিনিত অখিলবাবুর প্রতিশ্রুতির উপরই নির্ভর ক'রে আজ পর্যন্ত অন্যত্র কোথাও অণিমার বিবাহের চেষ্টা করেননি। এখন উপায়? কিন্তু অন্তর যতই বিদ্রোহী হোক্, মেয়ের বাবা তিনি,—বেশী কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লেন না। শুধু জানালেন যে, বিশুর মত না পেলে তিনিও মেয়ের বিয়ে দিতে চাননা, কারণ তাহ'লে মেয়ে যে তাঁর সুখী হবেনা সেকথা তিনি জানেন। শেষে ব'ল্‌লেন—"বেশত, তুমি তাকে জানত,—তার মত নাও। কিন্তু ভাই, দেরী ক'রোনা। দেখ্‌ছত আমার উপর কি রকম চাপ প'ড়েছে!"

"আপ্‌নি নিশ্চিন্ত থাকুন দাদা! আজই আমি বিশুকে এখানে চ'লে আসার জন্যে চিঠি লিখ্‌ছি। সে এলে সাম্‌নাসাম্‌নিই তার মত জেনে নেব। যদি তার মত পাই, বিয়ে দিতে আমি দেরী ক'র্‌বোনা।"

"সেই ভাল। সে আগে আসুক্।" —এই বলে অবনীবাবু চ'লে গেলেন।

বিশু যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আসন্ন শীতের রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই তাই গ্রাম নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। ইচ্ছে থাক্‌লেও বিশু তাই সেই রাতে অণিমার সংগে দেখা ক'রতে গেলনা। পরদিন খুব ভোরেই সে চ'ল্‌ল অণিমাদের বাড়ীতে। দীর্ঘকাল পরে আজ আবার সে অণিমার কাছে যাচ্ছে, তার বাল্যের সাথী সেই অণিমার কাছে। কিন্তু বাল্যের অণিমাকে সে পেলনা, —পেল যৌবনের যাদুমন্ত্রে প্রস্ফুটিত নতুন অণিমাকে। তারও দেহে এবং মনে যৌবনের নেশা। তাই বাল্যের সাথীটিকে সে আজ নতুন ক'রে অনুভব ক'রল। বিশুকে দেখে আগের মতই অণিমা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। তাকে বস্‌তে পাটি পেতে দিয়ে শিশুর মত কত কথাইনা জিজ্ঞেস ক'র্‌ল। কিন্তু তার সব কথার অন্তরালে এই কথাটাই প্রকাশ হ'য়ে প'ড়্‌লো যে, বিশু কি ক'রে এতদিন তাকে ভুলে ছিল। বিশুর কাছে তার মনের অভিমান গোপন রইল না। আরও গোপন রইলনা তার অন্তরের কথা। কৌশলে বিশু তখন তার মনে আঘাত দিয়ে নারীর মনের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিল। তারপর দিল তার নিজের মনকেও অবারিত ক'রে। বাড়ীতে তখন কেউ ছিল-না। সুতরাং তাদের আলাপ গুঞ্জনেও কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু সহসা অবনীবাবু ও হরিনারায়ণের আবির্ভাবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভয়ে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো,—গুঞ্জন বন্ধ হ'ল। বিশু উঠে অবনীবাবুকে

প্রণাম ক'র্ল এবং আর এক সময় আস্বে ব'লে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। হরিনারায়ণ ব্যাপারটা দূর থেকেই লক্ষ্য ক'রেছিলেন। কুচক্রী নীচমনা সমাজপতি যাবার সময় অণিমা ও বিশুর আলাপের কদর্য অর্থ ক'রে বিশ্রী ইংগিত ক'রে গেলেন। অবনীবাবু নিস্ফল ক্রোধে নির্বাক হ'য়ে রইলেন।

চোখে প্রেমাঞ্জন এঁকে নিয়ে বাড়ীতে এসে যখন বিশু তার বাবার মুখে তাদের বিবাহের ব্যাপারটা আগা-গোড়া শুন্লো এবং যখন অখিলবাবু তার মত কি জান্তে চাইলেন তখন আনন্দে যে বিশুর হৃদয় নৃত্য ক'রে উঠেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সম্মতি দিতে গিয়ে হঠাৎ তার গুপ্তসমিতিতে যোগ দেওয়ার কথা মনে প'ড়ে যাওয়ার একটা বাজে অজুহাতে বর্তমানে সে বিয়ে ক'রবেনা ব'লে আপত্তি জানালো। কিন্তু, অখিলবাবু যখন অবনী বাবুদের বর্তমান অবস্থার কথা সমাজের বিরুদ্ধাচরণের কথা, তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা এবং সর্বোপরি এ বিবাহ না হ'লে অণিমার জীবনের ব্যর্থতার কথা জানালেন তখন অণিমার অনিষ্ট আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়ে বিশু সাগ্রহে সম্মতি দিল এবং শুভদিনে শীঘ্রই পাত্রকন্যার আশীর্বাদ ও গায়েহলুদ্ হ'য়ে গেল। ওদিকে হরিনারায়ণ তাঁর শিকারটি হাত ছাড়া হ'য়ে গেল দেখে ক্রোধে অধীর হ'য়ে উঠ্লেন। রামেশ্বরের সংগে আলোচনায় তাকে জানালেন যে, পাত্র-পাত্রীর পূর্বের কোন অসৎকর্ম ছিল যার জন্যে অখিলবাবু ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। নইলে কি গরীবের ঐ কুৎসিৎ মেয়ের সংগে বড়লোকের এমন রাজপুত্রের মত ছেলের বিয়ে হয়! যাই হোক্, এই মুখরোচক কুৎসা রটনা ক'রে তাঁদের মন কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হ'ল।

আশীর্বাদ যেদিন হ'ল সেইদিন সারাদিনের গোল-মালের পর বিকেলের দিকে বিশু গ্রাম্য পথে বেড়াতে বেরুল। বেশীদূর সে যায় নি, এমন সময় দেখা হ'ল টেলিগ্রাফ্ পিওনের সংগে। পিয়ন তাকে দেখে সাই-কেল থেকে নেমে তার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে চলে গেল। বিশু দেখ্ল টেলিগ্রাম তারই নামে। তাড়াতাড়ি খুলে পড়্ল। প্রশান্ত তাকে বিশেষ জরুরী কাজে আজই কল্কাতায় যেতে লিখেছে। সহসা ভুলে যাওয়া নিজের অবস্থার কথা বিশুর মনে পড়ে গেল। বুঝ্লো যে, সমিতির নির্দেশেই প্রশান্ত তাকে যেতে লিখেছে এবং তাকে যেতেই হবে। আর বুঝ্লো যে, অণিমার সংগে বিয়ের মত দিয়ে কি নির্বুদ্ধিতারই না পরিচয় দিয়েছে! চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে বিশু বাড়ী ফিরে এল।

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকে আলো জেলে টেলিগ্রামখানা সে আর একবার প'ড়্ল, তারপর নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে এখন কি করা যায় তাই ভাব্তে লাগ্লো। ভাব্তে ভাব্তে রাত এগিয়ে চল্ল, কিন্তু তবুও বিশু কিছুই ঠিক্ কর্তে পার্লনা। অবশেষে ঢংঢং ক'রে যখন ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে উঠল তখন সে স্থির সিদ্ধান্ত ক'র্ল যে, আজ রাতেই চুপি চুপি তাকে গ্রাম ত্যাগ ক'র্তে হবে এবং অণিমাকে তার বিয়ে করা চল্বেনা। কারণ নিজের অনিশ্চিত জীবনের সংগে আর একটা জীবন জড়িয়ে নিয়ে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়ার কোন অধিকার তার নেই। তার বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে দ্রুত একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি সে লিখে টেবিলের ওপর রেখে দিল, তারপর স্যুটকেশে জামা কাপড় ভরে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। বাইরে তখন ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্তে সুরু ক'রেছে। বর্ষাতি কোট ও টুপিতে সর্বাংগ আচ্ছাদন ক'রে একটা টর্চ্ হাতে নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে সেই দুর্যোগরাতের অন্ধকারে বিশু গৃহত্যাগ কর্ল। ষ্টেশনে যাবার পথেই অণিমাদের বাড়ী। সেখানে এসে সে সহসা দাঁড়ালো। তারপর কি ভেবে সে অণিমার শোবার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে চুপি চুপি তাকে ডেকে তুল্লো। অণিমা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সশঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'র্ল—"কি হ'য়েছে বিশুদা? এত রাতে ঝড় জলে কোথায় চ'লেছ?" "কল্কাতায়

যাচ্ছি অণু—চুপি চুপি চোরের মত। আর ফিরবো না।" বিস্ময়ে ভয়ে ও ব্যথায় অণিমা ব্যাকুল হ'য়ে তাকে প্রশ্ন ক'রল, কেন সে সে এমনি ক'রে তাকে ফেলে সবাইকে ফেলে চ'লে যাচ্ছে। উত্তরে বিশু জানালো যে, নিরুপায় হ'য়ে সমিতির নির্দেশে সে যাচ্ছে, নইলে তার যাবার কোন ইচ্ছে ছিলনা। আরও সে জানালো যে, নিজের অবস্থার কথা ভুলে এ বিয়েতে মত দিয়ে সে বড় ভুল ক'রেছে। অপরাধের তার শেষ নেই। তাই যাবার আগে অণিমার কাছে সে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তার অবস্থার কথা সব শুনে অণিমা বিশুকে নিরস্ত করবার কত চেষ্টা ক'রল। কিন্তু বিশুর কাছে তার সব অনুরোধই ব্যর্থ হ'ল। বিশু জানালো যে, সে না চাইলেও যে সমিতিতে সে যোগ দিয়েছে তার নির্দেশ তাকে মানতেই হবে।..... "তারা কি জন্যে ডেকেছে জানিনা। যদি ফিরতে না দেয়, ফেরা আমার হবে না অণু।" যাবার সময় অণিমাকে আবার নতুন ক'রে জীবন গ'ড়ে তুলবার অনুরোধ জানিয়ে বিশু চ'লে গেল। সে জীবনে বিশুর স্মৃতি যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। পাষাণের মত নীরবে দাঁড়িয়ে অণিমা সব শুনে গেল। কি বলবে—কিইবা ক'রবে সে।

★ ★

ওদিকে কলকাতায় প্রণব তখন তার প্রধান বন্ধু সুরেশের সংগে বহু জল্পনার পর দেশ সেবার জন্যে দশের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো জ্বালবার মৎলবে গ্রামে গ্রামে সফরের সঙ্কল্প ক'রে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েছে। প্রণব আজ তার মেসের ঘরে বিছানাপত্র বাঁধা ছাঁদা ক'রছে। আজই সে বেরুবে। প্রথমে যাবে মুর্শিদাবাদে। সুরেশ আজ বেরুবেনা বটে তবে খুব শীগ্গীরই বেরুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রণবের মন আশায় উদ্দীপনায় চঞ্চল। তবু একটা অস্বস্তি কাঁটার মত তার মনে বিঁধে আছে। এ সময় বিশুকে পাশে পেলে সে সুখী হ'ত। কিছুদিন আগে সেই যে বিশু তার ঘর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেছে আর আজ পর্যন্ত তার দেখা নেই। সে নিশ্চয় প্রণবের ওপর রাগ ক'রেছে। যাবার আগে তাই প্রণব বিশুর সংগে দেখা ক'রবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। ষ্টেশনের পথে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চললো বিশুর মামার বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে শুনলো বিশু তার দেশ শক্তিপুরে চ'লে গেছে। হঠাৎ প্রণব মুর্শিদাবাদে যাওয়া স্থগিত রেখে শক্তিপুরেই রওনা হয়ে গেল।

শক্তিপুরের মাটিতে পা দিয়েই সে গেল অখিলবাবুর বাড়িতে বিশুর খোঁজে। সেখানে তখন তুমুল কাণ্ড। বিশুর গৃহত্যাগের ফলে বাড়ীতে কান্নাকাটি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রণবের সংগে পরিচয়ের পর বিশুর চিঠি অখিলবাবু প্রণবকে দেখালে। ব'ললেন্ "আমি কি যে ক'রব কিছুই বুঝতে পারছিনা। তুমি বিশুর বড় ভাইএর মত। ভগবানের আশীর্বাদের মতই এই দুঃসময়ে তোমাকে পেয়েছি। তুমি যা হয় কর বাবা।" প্রণব অখিলবাবুকে শান্ত ক'রে ব'লল, "আমার নিজের ছোট ভাই থাকলে যা করতাম বিশুর জন্যে ঠিক্ তাই করবো কাকাবাবু।" এই ব'লে সে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে চলল ষ্টেশনের দিকে কলকাতার ট্রেন্ ধ'রতে। অবনী বাবুদের বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে দেখল হরিনারায়ণ প্রভৃতি সমাজের মাতব্বরগণ অবনীবাবুকে ঘিরে তাঁকে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধের সংগে সংগে ভয় দেখাচ্ছেন। বিনীতভাবে অবনী বাবু তাদের কথার উত্তরে জানালেন যে, আশীর্বাদের পর মেয়ের অন্যত্র বিয়ে কেমন করে সম্ভব হবে। সমাজপতি ব'ল্লেন, 'হোক আশীর্বাদ! শাস্ত্রমতেই ওটা খণ্ডন ক'রে দেওয়া যাবে। তবে তার জন্যে কিছু রৌপ্যের প্রয়োজন।...হেঃ হেঃ হেঃ, সেত তুমি জানই!...কিন্তু তবুও অবনীবাবু রাজ না হয়ে কিছুদিন, সময় চাওয়াতে হরিনারায়ণ রেগে উঠে বললেন, না না, আর সময় দেওয়া হবে না। এবং তাঁর অনুচরদের মুখ দিয়ে বলালেন যে সমাজ চাইছে যে শীগগীরই অণিমার বিয়ে হোক্। বিবাহের ব্যবস্থা যদি অখিলবাবু নাই ক'রতে পারেন তবে সমাজই সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে এবং অবনীবাবুকে তাই মেনে নিতে হবে। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রণব সমস্ত কথাই

শুনছিল। এবার সে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল। গ্রাম্যপণ্ডিতের সংগে এ নিয়ে তার অনেকক্ষণ বাকযুদ্ধ চল্‌ল। অবশেষে হরিনারায়ণ এই ব'লে শাসিয়ে গেলেন, 'অর্বাচীনের সংগে তর্ক করে আমরা সময় নষ্ট কর্‌তে চাইনা, আমরা চ'ল্‌লাম কিন্তু আমরা যা বলে গেলাম সে কথাটা মনে রেখ অবনী।" তারা চ'লে গেলে অবনীবাবু নিতান্ত অসহায়ের মত প্রণবকে বল্‌লেন, "হয়ত কোন কারণে বাধ্য হ'য়েই বিশু গৃহত্যাগ ক'রেছে—হয়ত সে আবার একদিন ফিরেও আসবে, কিন্তু দেখ দিখি বাবা আমার বিপদটা, আমি যে কি কর্‌ব! "আপনাকে কিছু করতে হবেনা। শুধু ধৈর্য ধ'রে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। বিশুকে আমি ফিরিয়ে আন্‌বোই" এই বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এবং অখিলবাবুর সাহায্য গ্রহণ ক'তে পরামর্শ দিয়ে প্রণব ষ্টেশনের দিকে চ'লে গেল।

★ ★

কল্‌কাতায় গিয়ে বিশু উঠেছে গুপ্ত সমিতিতে। এবার আর মামার বাড়ীতে যায় নি, কারণ এখন সে নিরুদ্দেশ। যতীন তাকে জরুরী টেলিগ্রাম্‌ পাঠিয়ে ডেকে আনার কারণ ব্যাখ্যা করে জানালো যে,বালিগঞ্জের বারবণিতা কাঞ্চনমালার কাছ থেকে সমিতির কাজের জন্যে ছলে কিম্বা বলে যেমন ক'রেই হোক্‌ একলক্ষ টাকা বিশুকে আন্‌তে হবে। যতীন বল্‌ল—'আমাদের সকলের মধ্যে তুমিই তাকে ভোলাবার সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত। চেহারা তোমার চমৎকার। আগে তার সংগে আলাপ কর কিছুদিন যাওয়া আসা ক'রে ভাব জমাও। তারপর যদি কৌশলে কার্যসিদ্ধি ক'রতে নাই পার, তবে এরই সদ্ব্যবহার করো—কোন ঝঞ্ঝাট নেই!" এই ব'লে সে একটা রিভল্‌ভার বিশুর কাছে এগিয়ে দিল, বিশু কম্পিত হাতে রিভল্‌ভারটা নিল। যতীন যাবার সময় ব'লে গেল—'মনে রেখ বিশু, তোমার ওপরই এই কাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌লাম," বিশু কিন্তু ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় একেবারে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌ল। প্রশান্ত তার মনোভাব বুঝে তাকে তখন সাহস দিল এবং পরদিন সন্ধ্যায় তাকে সংগে নিয়ে গেল কাঞ্চনমালার বাড়িতে। কাঞ্চনমালার পরিচারিকা নন্দাকে নির্দিষ্ট টাকা গুণে দিয়ে প্রশান্ত স'রে পড়্‌ল, রইল শুধু বিশু।

একটু পরেই কাঞ্চনমালা গন্ধেভরা ফাল্গুনের এক ঝলক্‌ চঞ্চল হাওয়ার মত ঘরে এসে ঢুক্‌লো। অনভ্যস্ত বিশু সে আস্‌তেই উঠে দাঁড়ালো কাঞ্চন তাই দেখে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে ব'ল্‌ল,—'আমাদের কেউ দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায় না, বসুন।" বিশু কাঞ্চনের সান্নিধ্য বাঁচিয়ে দূরে একটা সোফায় ফিরে গিয়ে ব'স্‌ল। কাঞ্চন বিশুর ভাবগতিক প্রথম থেকেই লক্ষ্য ক'রেছিল। এবার তার মনে সন্দেহ জাগ্‌লো। এমন লোকতো তার বাড়িতে আসে না! এ কেন এসেছে? আর এই বোধ হয় তার প্রথম আসা! নিজের ইচ্ছেতেও হয়ত সে আসে নি। এই সন্দেহ তার দৃঢ় হ'ল যখন বিশু মদ, সিগারেট এমন কি পান খেতেও অসম্মতি জানালো। কাঞ্চন তখন প্রশ্ন ক'রল,—'কেন, এখানে এসেছেন বলুন্‌ ত বিশ্বনাথ বাবু?' বিশু মহা-সমস্যায় পড়্‌ল। কি উত্তর দেবে! শেষে বহু কষ্টে ব'ল্‌ল, 'এসেছি মানে...ইয়ে কর্‌বো...মানে তোমাকে ভালবাসবো বলে। কাঞ্চন তার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠ্‌লো। তাকে জানালো যে, তাদের কেউ কখন ভালবাস্‌তে পারে নি এবং পারবেও না। মানুষের দেহের প্রয়োজন মেটাতেই তারা শুধু পৃথিবীতে এসেছে, মনের প্রয়োজন তাদের দ্বারা মিট্‌বেনা। বিশু কি জন্যে এসেছে তা সে জানেনা বটে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যেই যদি এসে থাকে তবে সে সব না বুঝে না জেনেই ভুল ক'রে এসেছে। বিশু ব'ল্‌ল যে, সে বুঝ্‌বে ব'লেই এসেছে। কাঞ্চন জানালো যে, বুঝ্‌তে হ'লে তাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। বিশুর এতোবড় সর্বনাশ কাঞ্চন কিছুতেই হ'তে দেবেনা। তাই এখুনিই যেন সে কাঞ্চনের বাড়ী থেকে চ'লে যায় এবং আর কোনদিন না আসে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাঞ্চন বিশুকে তাড়াতে পার্‌লো না। কাঞ্চনের মার্জিত এবং সহৃদয় ভদ্র ব্যবহারে অজ্ঞাতে বিশু কখন তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে, সুতরাং বাধ্য হ'য়ে তাকে আসার কারণ জানাতে হ'ল। অবশ্য গুপ্তসমিতির

কথা এবং তার আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা সে প্রকাশ ক'র্লো না। সে শুধু জানালো যে, নিজের ইচ্ছের সে যে আসেনি সেকথা সত্যি। এবং আস্বার তার যে খুব ইচ্ছে ছিল তাও নয়। সে শুধু বাধ্য হ'য়েই কাঞ্চনের কাছে এসেছে এবং না এলে তার সর্বনাশ হ'ত। কেন যে সর্বনাশ হ'ত এ প্রশ্নের উত্তরে বিশু আর কিছু জানাতে অক্ষমতা জানালো। তখন কাঞ্চন আর তাকে আস্তে মানা ক'র্লনা বটে কিন্তু তার মনে কিসেব একটা সন্দেহ কাঁটার মত বিঁধেই রইল। বিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সে মনে মনে সঙ্কল্প ক'র্ল যেমন ক'রেই হোক্ বিশুর মঙ্গল সে ক'র্বে। প্রশান্তর দেওয়া টাকাগুলো এনে বিশুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সে ব'ল্ল,—'আপনি আমার অসাধারণ ক্রেতা। সাধারণ মূল্য তাই মূল্যহীন হ'য়ে গেল।'

"তবে মূল্য বলে কি নেবে?"

"তাইত ভাব্ছি। আচ্ছা সে পরে ভেবে ঠিক্ ক'রবো। আপাততঃ আপনার অভ্যর্থনা কি ক'রে করি বলুন্ ত?"

"তোমার গানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। আজ গান দিয়েই আমাকে অভ্যর্থনা কর।"

"বেশ।" —কাঞ্চন অর্গ্যানের ধারে গিয়ে ব'স্ল এবং গান গাইতে লাগ্ল। কাঞ্চনের ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে থেকে কৌতুকের হাসি হাস্লেন।

★ ★

হরিনারায়ণের হুম্কি, প্রণবের কথা সব কিছুই অণিমা ঘরে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। প্রণব চ'লে যাবার পর অবনীবাবু হতাশ হ'য়ে বারান্দার উপর এসে ব'স্লেন। তখন অণিমা তাঁর কাছে এসে কোলের উপর মুখ লুকিয়ে কেঁদে ব'ল্ল,—"শুধু আমার জন্যেই তোমার আজ এতো অপমান সইতে হ'ল বাবা!" অবনীবাবু বুঝ্লেন অণিমা সব শুনেছে এবং নিজেকেই সব কিছুর জন্যে দায়ী মনে ক'রে দুঃখে অভিভূত হ'য়েছে। তিনি তাকে অনেক বোঝালেন। ভগবানই যে সবকিছুর জন্যে দায়ী তা' তাকে জানালেন। কিছুক্ষণ পরে অণিমা শান্ত হ'ল। তখন অবনীবাবু রঘুবংশ আবৃত্তি ক'র্তে লাগ্লেন এবং অণিমা পাশে ব'সে শুন্তে লাগ্লো। মন্দাকিনী কিন্তু এই কাণ্ড দেখে একেবারে তেলে বেগুণে জ্ব'লে উঠ্লেন,—"এখুনি যে বাড়ী ব'য়ে অপমান ক'রে গেল সে কথাও কি ভুলে গেলে! ......আবার মেয়েকে কাব্য শোনানো হ'চ্ছে!"

"অপমানের জ্বালা ভুল্তেইত কাব্য প'ড়্ছি গিন্নী।"

"ভোলাচ্ছি ভাল ক'রে!" তার যত রাগ গিয়ে প'ড়্ল ঐ কাব্যপুস্তকগুলোর ওপরে। ক্ষিপ্র হাতে কাব্যপুস্তকগুলো ছিনিয়ে নিয়ে মন্দাকিনী ছুটে চ'ল্লেন সেগুলো সব পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিতে। অবনীবাবু চকিতে ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর পেছনে ছুটলেন। মন্দাকিনী ইতিমধ্যে ঢুকে উনানের জলন্ত আগুণের ওপরে বইগুলো ধ'রেছেন। তাই দেখে পাগলের মত হ'য়ে অবনীবাবু ঘরে ঢুক্তে যেতেই চৌকাঠে পা লেগে প'ড়ে গেলেন এবং মূর্চ্ছিত হ'লেন। তখন মন্দাকিনীর হাত থেকে সমস্ত কাব্যপুস্তকই আগুণের ওপর এসে প'ড়েছে। অণিমা ছুটে এলো, মন্দাকিনী ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। অবশেষে মা ও মেয়ের চেষ্টায় অবনীবাবুর মূর্চ্ছা ভাঙ্লো। কিন্তু তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় কাব্যপুস্তকগুলো সম্মুখেই দগ্ধ হ'চ্ছে দেখে তিনি আর সহ্য ক'র্তে পার্লেন না। আবার অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্লেন। তখন মা ও মেয়ে দু'জনে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে শুইয়ে দিলেন।

★ ★

ওদিকে প্রণব কল্কাতায় বিশুর সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। পুলিশেও খবর দিয়েছে। তাছাড়া হাঁসপাতাল, সিনেমা, থিয়েটার কোম্পানী—সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই বিশুর খোঁজ ক'রতে ভোলেনি। খবরের কাগজে বিশুর ফটোসহ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপণ দিয়ে তাকে ফিরে আস্বার অনুরোধও জানিয়েছে। তবু এ পর্যন্ত প্রণব বিশুর নাম গন্ধও পায়নি। কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস বিশুকে সে খুঁজে বার ক'র্বেই। এম্নি ক'রে কিছুদিন কেটে গেল।......

শ্রীযুক্ত রতন
চট্টোপাধ্যায়
পরিচালিত
রূপাঞ্জলি
পিকচার্সের
অলকনন্দা চিত্রে
পূর্ণিমা ও
পরেশ বন্দ্যোঃ

রূপ-মঞ্চ
দীপালী-সংখ্যা-
১৩৫৩

— সত্য চৌধুরী —

বাংলার এই জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীকে এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের 'রাঙ্গামাটী' চিত্রে দেখা যাবে।

শক্তিপুরে পীড়িত অবস্থাতেই হরিনারায়ণের তাগাদা পেয়ে পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন অবনীবাবু। কল্‌কাতায় কাঞ্চনের বাড়ীতে বিশুর ও নিয়মিত যাওয়া আসা চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কাজ না হওয়াতে যতীন অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। একদিন যতীন বিশুকে ডেকে ব'ল্‌ল, "আর অপেক্ষা করা অসহ্য! যথেষ্টই সময় তোমাকে দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু আর দেওয়া হবেনা। ....আজ, হাঁ আজ—আজই রাতে তার সমস্ত গয়না কিম্বা একলক্ষ টাকা আমি চাই। খুন ক'রতে পার ভাল, নইলে যেমন ক'রেই হোক্ এ টাকা তোমাকে এনে দিতে হবে। যাও।" বিশু নীরবে তার ঘরে এসে ভাবতে লাগ্‌লো এতবড় দুষ্কার্য সে ক'র্‌বে কি ক'রে! তা'ছাড়া এতদিনের সাহচর্যের মধ্যে কাঞ্চনকে সে যে-চোখে দেখেছে—যে-ভাবে বুঝেছে তাতে আঘাত করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ অবস্থায় কি ক'র্‌বে না ক'র্‌বে তাই নিয়ে বিবেকের সংগে তার কিছুক্ষণ বোঝাপড়া চ'ল্‌ল। কিন্তু বিবেক তার কোন কাজ এবং কাঞ্চনকে খুন করা—কিছুতেই সমর্থন ক'র্‌লনা। তখন নিরুপায় হ'য়ে বিশু আত্ম বিসর্জন দিয়ে তার সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে স্থির ক'র্‌ল।

সেইদিনই রাতে কাঞ্চন সহসা একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করে ফেল্‌ল। সেইদিনের কাগজে সদ্যপ্রকাশিত বিশুর ছবি তার নজরে প'ড়্‌লো এবং তার নীচে প্রণবের দেওয়া বিজ্ঞাপণও সে প'ড়্‌ল। বিশুর অবস্থার কথা এতদিনে সে ভাল ক'রে বুঝ্‌লো, কিন্তু তবু তার এই আসার ব্যাপারটা কাঞ্চনের কাছে সম্পূর্ণ রহস্যাবৃতই থেকে গেল! সে ভাব্‌লো বিশু এলে আজ সবকিছুই তার কাছ থেকে জেনে নেবে। ...... রাত বেড়ে চ'ল্‌ল। বিশুর আসার অপেক্ষায় কাঞ্চন অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। এমন সময় রুক্ষ-শুষ্ক বেশে বিশু এল। এসেই বিশু তার হীন উদ্দেশ্যের কথা জানালে। ব'ল্‌ল,—"কেন তোমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন তোমার কাছে যাওয়া আসা ক'রেছি জান? তোমাকে খুন্ ক'রে তোমার সব গয়না কিম্বা লক্ষ টাকা নিয়ে যাব ব'লে।"

কাঞ্চন চ'ম্‌কে উঠ্‌ল। পাগলের মত বিশু প্রলাপ ব'লে গেল। শেষে বল্‌ল,—"কিন্তু ভয় নেই আমার পক্ষে তোমাকে খুন করা অসম্ভব!" এই ব'লে সে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা এবং আজকের কঠোর কাজের কথা জানালো। কত উঁচু থেকে আজ যে সে কত নীচে নেমে এসেছে এবং এ অবস্থা থেকে আর যে পূর্বের সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া যাবেনা তা সে জানে। তাই বাঁচ্‌তে তার ইচ্ছে নেই। তা'ছাড়া বাঁচ্‌বার তার পথ কোথায়? চারিদিক থেকেই মৃত্যু তাকে ডাক্ দিয়েছে। এই বলে হঠাৎ পকেট থেকে রিভল্‌ভার বার ক'রে বিশু তার নিজের বুকের ওপর ধরল। কাঞ্চন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে সে চিৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সে সামলে নিল। বুঝলো বিশুকে বাঁচাতে হ'লে এখন ভয় পেলে চলবে না। রিভলভারটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবার জন্যে সুকৌশলে সে এমন সব সকল মিথ্যা কথা ব'লে যেতে লাগল যে, সে কথা কাঞ্চনের মুখ থেকে শুনবে ব'লে বিশু কোনদিন আশা করেনি। কাঞ্চন বললে যে, বিশুকে সে এম্‌নি ভাবে ম'র্‌তে দিতে পারেনা। উপার্জনের পথ বন্ধ করে তার অনেক ক্ষতি বিশু ক'রেছে। তবু সব ক্ষতি ভুলে কাঞ্চন এই আশা নিয়ে উৎসুক ছিল যে একদিন সে বিশুকে লাভ কর্‌বে। আজ বিশু মরতেই চায় তবে কাঞ্চনের ক্ষতিপূরণ ক'রে তাকে মর্‌তে হবে। বিশু বিস্ময়ে নির্বাক। সত্যিই কি কাঞ্চনের মনে এই ছিল; তার সংযত আচার এবং বিনম্র ব্যবহার কি তার ছলনা; কিন্তু কেমন ক'রে কাঞ্চনের ক্ষতি পূরণ সে করবে; সে যে আজ কপর্দকশূন্য। সে কথা জানাতে কাঞ্চন বল্‌লো,—"টাকা দিয়ে যে ক্ষতিপূরণ তুমি ক'রতে পার্‌বে না তা আমি জানি। তোমাকে নিজের হাতে মার্‌তে পারলে আমার কিছু তৃপ্তি হবে আমার ক্ষতির ব্যথা কিছুটা ভুলতে পার্‌বো।" বিশুও তাই চায়,—সাগ্রহে রিভল্‌ভারটা সে কাঞ্চনের হাতে

তুলে নিল। কাঞ্চন তাই চেয়েছিল। রিভলভার পেয়ে তৎক্ষণাৎ নন্দাকে ডেকে সে সেটা সরিয়ে ফেল্‌ল। বিশু অবাক! ব'ল্‌ল,—"ও কি, ক'র্‌লে? রিভলভার পাঠিয়ে দিলে কেন?' কাঞ্চন সকৌতুকে হেসে উঠ্‌ল। বিশুকে সে ছলনায় ভুলিয়েছে। তারপর আজকের কাগজটা এনে বিশুকে দেখালো। শেষে তাকে পাশে বসিয়ে তার মুখেই তার সমস্ত খবর, অণিমার খবর এবং তাদের গ্রামের সব কিছুই সে জেনে নিল। সংগে সংগে কাঞ্চন 'ফোন্‌' এর কাছে উঠে গেল এবং রিসিভারটা তুলে নিয়ে কাগজে দেওয়া ফোন্‌ নাম্বারে প্রণবের হোটেলে প্রণবকে ডেকে জানালো যে, বিশুকে পেতে হ'লে প্রণব যেন তৎক্ষণাৎ কাঞ্চনের বাড়িতে চ'লে আসে, প্রণব গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে এই আশাতীত খবর পেয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাঞ্চনের বাড়ি হাজির হল। প্রথমে সব না জেনে প্রণব বিশুকে এবং কাঞ্চনকেও তিরস্কার কর্‌ল। কিন্তু যখন সমিতির কথা, কাঞ্চনের কথা এবং লক্ষটাকা না দিলে বিশুর যে অনিবার্য মৃত্যু সে কথা বিশু বলল তখন কাঞ্চনের ওপর সমস্ত রাগ তার পড়ে গেল। কাঞ্চনের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে প্রণব মুগ্ধ হ'ল। সেই রাতেই সে অন্য কোন উপায় না দেখে বিশুকে নিয়ে চ'ল্‌ল গুপ্ত সমিতি ধ্বংস ক'র্‌তে। কারণ—গুপ্তসমিতি একেবারে নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া বিশুকে বাঁচানোর আর কোন পথ ছিলনা। যাবার সময় কাজের সুবিধার জন্যে কাঞ্চনের অনুরোধে কাঞ্চনের গাড়িখানা তারা নিয়ে গেল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল যে, শক্তিপুরে যাবার আগে একদিন তারা তার বাড়িতে আস্‌বে। সেই গভীর রাতে প্রণবের বিচক্ষণ ব্যবস্থায় পুলিশ এসে গুপ্তসমিতির বাড়ি ঘেরাও ক'র্‌ল এবং সমিতির সমস্ত কাগজপত্র সমেত সব সভ্যদেরই ক'র্‌ল গ্রেপ্তার। কিন্তু নিয়তির এম্‌নি পরিহাস যে, এত ক'রেও ধরা পড়্‌ল না একজন। সমিতির সেক্রেটারী যতীন কোন রকমে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হল। অবশ্য অপরে কেউই জান্‌তে পার্‌লা যে যতীন পালিয়েছে। তারা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'ল যে গুপ্তসমিতিকে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ক'রেছে।

★ ★

অবনী বাবু প'ড়ে গিয়ে সেই যে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন সে অসুস্থতা তাঁর আজও যায়নি। তাঁর অসুস্থতার মধ্যেও অবশ্য কুশল গ্রহণ করার ছলে হরিনারায়ণ তাগাদা দিয়ে যেতে ভোলেন নি। যতই তিনি সুস্থ হ'তে লাগ্‌লেন ততই হরিনারায়ণের কুশল গ্রহণ এবং সংগে সংগে তাগাদা দেওয়া বাড়তে লাগ্‌লো। সেদিন বারান্দার বালাপোষ মুড়ি দিয়ে ব'সে অবনী বাবু মন্দাকিনীর সংগে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধেই কথা ব'ল্‌ছিলেন। হরিনারায়ণ ইদানিং প্রায় প্রত্যহই তাগাদা দিচ্ছেন। এবং ভয় দেখাচ্ছেন. অখিলবাবুও আর খোঁজ খবর নেন না, তাঁর নিজের শরীরও আজকাল ভাল নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাত্র সন্ধান ক'র্‌তেও পার্‌ছেনই না, কারুকে দিয়ে যে করাবেন তাঁরও উপায় নেই। একেত তিনি দরিদ্র তার উপর অন্তরায় হ'য়ে র'য়েছেন হরিনারায়ণ। এ অবস্থায় হরিনারায়ণের হাতে মেয়ের বিয়ের ভারটা ছেড়ে দেওয়াই তিনি সব দিক্‌ থেকে ভাল ব'লে মনে করেন। বিশুর আশা আর তিনি করেন না,—মন তার ভেংগে গেছে, শরীরও তাই। তিনি স্ত্রীকে জানালেন হরিনারায়ণ যে পাত্রের খোঁজ দিয়েছেন তারই সংগে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এতে কিন্তু মন্দাকিনী ঘোর আপত্তি তুল্‌লেন। হরিনারায়ণ পাত্র ঠিক করে ছিলেন যদু সান্যালকে। বিবাহবাতিকগ্রস্ত চল্লিশবছরের পাত্র তিনি। মন্দাকিনী ব'ল্‌লেন, মা হ'য়ে কিছুতেই তিনি মেয়েকে এমন ক'রে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পার্‌বেন না। তাঁদের মধ্যে যখন এই রকম আলোচনা চ'ল্‌ছিল তখন এলেন হরিনারায়ণ। এসেই তিনি বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করলেন। অবনীবাবুর শরীর ছিল অসুস্থ, মনও তাই। সুতরাং হরিনারায়ণের কথায় রাগে, ক্ষোভে এবং বিরক্তিতে তিনি যদু সান্যালের সংগেই মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হ'য়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ চ'ল্‌লেন তাকে আশীর্বাদ ক'র্‌তে। হরি-

নারায়ণ এমনটিই চাইছিলেন। যদু সান্যালের সংগে অণিমার বিয়ে দিতে পার্‌লে সান্যাল মশায়ের কাছ থেকে তিনি একটি মোটা টাকার অঙ্ক পুরস্কার পাবেন। পূর্বে আরও দশবার এম্‌নিই পেয়েছেন। এটি হবে তাঁর একাদশ পুরস্কার প্রাপ্তি, তবে দুঃখের বিষয় সান্যাল মহাশয়ের পূর্বের দশটির একটিও আজ আর বর্তমান নেই। তাই হরিনারায়ণের মধ্যস্থতায় 'একাদশী' লাভের তাঁর এই ব্যবস্থা।

অবনীবাবুরা যখন যদু সান্যালের বাড়ীতে পৌছিলেন তখন ভৃত্য যদু ও রামতারণের সহায়তায় বাতগ্রস্ত পায়ে তিনি কবিরাজী তেল মালিশ ক'র্‌ছিলেন। তাঁদের আসার সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি পায়ের তেল মুছে মাথায় সুপক্ক চুল কলপ্‌ লাগিয়ে কালো ক'রে, পরিপাটি বেশে তাদের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেন। অবনী বাবু কোন রকমে তাঁর মাথায় দু'টো ধানদূর্বা চাপিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যদুনাথ খুসী হ'য়ে হরিনারায়ণকে তখনই তাঁর পাওনা পুরস্কার মিটিয়ে দিলেন। কালই শুভক্ষণে অণিমার সংগে যদু সান্যালের বিয়ে হবে স্থির হ'য়ে গেল এবং লোকমুখে এই মুখরোচক খবরটা বাতাসের মুখে আগুণের মত সারা গ্রামে খুব দ্রুত ছড়িয়ে গেল।

★ ★

শক্তিপুরে যেদিন অবনীবাবু যদু সান্যালকে আশীর্বাদ ক'রে এলেন সেই একই দিনে বিকেলে ক'ল্‌কাতায় কাঞ্চনের বাড়ীতে প্রণব ও বিশু এসে গল্পে গানে এবং হাস্য-পরিহাসে তার বাড়ী গুলজার ক'রে তুলেছে। কালই সন্ধ্যার গাড়ীতে তারা শক্তিপুরে যাবে, তাই আজ কাঞ্চনের অনুরোধ মত যাবার আগে তার সংগে দেখা ক'র্‌তে এসেছে। চা-আদির রস-গ্রহণের সংগে সংগে কাঞ্চনের কণ্ঠসংগীতের রসও তারা উপভোগ ক'র্‌ল। তারপর যাবার জন্যে তারা উঠে দাঁড়ালো। এই সময় কাঞ্চন এক কাণ্ড ক'রে ব'স্‌ল। ব্রাহ্মণের পূজোর সামান্য দুটো চাল কলা ব'লে একলক্ষ টাকার একটা চেক্‌ প্রণবের হাতে এবং তার ক'ল্‌কাতার বাড়ী এবং সমস্ত গহনার দানপত্র বিশুর হাতে তুলে দিল। কিন্তু বিশু কিছুতেই এ দান নিতে চাইলনা। সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'ল্‌ল,—"কেন তুমি এ-সব আমাদের দিচ্ছ কাঞ্চন! আমরা ত তোমার কাছে কিছু চাইনি। তুমি ভেবেছ টাকার জন্যেই আমরা তোমার কাছে……।"

বাধা দিয়ে কাঞ্চন ব'লে উঠ্‌ল,—"ছিঃ-ছিঃ,—কি ব'ল্‌ছ তুমি! তোমাদের আমি এত ছোট ভাব্‌বো!"

"তবে কেন তুমি আমাদের এ-সব দান ক'র্‌লে!"

"তোমাদের দান ক'র্‌ব এতবড় স্পর্ধা আমার নেই। এই বাড়ী,—এই টাকা, এই বিলাসিতা,—প্রত্যহ হরেক রকম লোকের হরেক রকম রুচির দাস ক'রে শরীরটাকে ব'য়ে বেড়ান,—এ—আমি আর পেরে উঠ্‌ছিনা। আমি চাই মুক্তি,—এই অর্থের অনাচারের কারাগার থেকে মুক্তি চাই। সে মুক্তি তোমরা আমাকে দাও।"

বিশু তবু ব'ল্‌ল যে, যার থেকে সে নিজে মুক্ত হতে চাইছে তাতে আবার তাদের বাঁধ্‌তে চাইছে কেন? উত্তরে কাঞ্চন বল্‌ল যে, তারা যে তাতে বাধা পড়্‌বেনা তা সে ভাল করেই জানে। কিন্তু সত্যিই কি বিশু নেবেনা! বিশু জানালো যে সে ফেলে দিতে চায়না কিন্তু নেবেইবা কেমন করে! এবার কাঞ্চন বড় ব্যথা পেল। সত্যিই কি তার অর্ঘ এতই জঘন্য যে পূজার অযোগ্য? তার কলংকময় জীবনের স্পর্শে তার সব কিছুই কি কালো হয়ে গেল! নির্বাক হয়ে কাঞ্চন নত নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা শূন্য মিলিয়ে গিয়ে একমুহূর্তে তার অস্তিত্বহীন হয়ে গেল। এমন সময় প্রণব এগিয়ে এসে বল্‌ল,—'আমি নিলাম। তোমার দান ফেলে দেবার সাধ্য নেই কাঞ্চন। বিশু যদি ফেলে দেয় দিক্‌।" কাঞ্চনের উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আজ প্রণব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, বল্‌ল,—"আমার লক্ষ্যের পথে তোমার দানই হবে আমার সহায় আর সে পথে তোমার মত হতভাগিনী যারা আস্‌বে তাদের দাবীই হবে অগ্রগণ্য।" বিশুও তখন তার দানপত্র প্রণবের হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল,—"তবে আপনার হাতে এ

দানও তুলে দিয়ে আমি বাঁচ্‌লাম প্রণবদা।" তারপর বিদায়ের পালা। কাঞ্চন বল্‌ল,—'আর হয়ত দেখা হবেনা। কিন্তু অণিমার বিয়ের খবরটা যেন পাই প্রণবদা। আর মাঝে মাঝে একটু আধটু খবর যদি আমার কাশীর ঠিকানায়……।"

"তার জন্যে ভেবোনা। কোনদিন হয়ত এই অধর্মই গিয়ে তোমার কাশীধামের বাড়ীতে জাঁকিয়ে বস্‌বেন।

"সে সৌভাগ্য কি আমার হবে!"

"সৌভাগ্য নয়, বল দুর্ভাগ্য। গৃহহীন ভবঘুরে কোনমতেই সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়।" এই বলে বিদায় মুহূর্তের করুণতা লঘু হাস্যে জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে প্রণব বিশুর সংগে কাঞ্চনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু যে ব্যথা অন্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তাকে জয় করা মুখের হাসিতে কি সত্যিই সম্ভব! কাঞ্চনের নির্নিমেশ চোখের কোলে সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুর ধারা নাম্‌লো সেই সকরুণ বিদায়-সন্ধ্যায়। পথে যেতে যেতে প্রণব ও বিশুর চোখের পাতাও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল কিনা কে বল্‌বে!

★ ★

শক্তিপুরে যদু সান্যালের বাড়ীতে সানাই বসেছে। আজ ষোড়শী অণিমার সংগে ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ যদুসান্যালের বিয়ে। সানাই সু-উচ্চে তান তুলে গ্রামময় এই শুভ আনন্দ-সংবাদ চীৎকার করে প্রচার কর্‌ছে। কিন্তু তার আগেই লোকমুখে সংবাদটা অখিলবাবুর কানে এসে গেল। সংবাদ পেয়েই অখিলবাবু ছুটলেন অবনীবাবুর কাছে। যেমন করেই হোক্ এ বিয়ে তিনি বন্ধ কর্‌বেনই। অবনীবাবু তখন বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাজকর্মের তত্বাবধান কর্‌ছিলেন: এমন সময় ব্যস্ত হয়ে অখিলবাবু গিয়ে বল্‌লেন,—'একি করেছেন দাদা! যদু সান্যালের সংগে অণুর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন! কিন্তু আমাকে একবারও জানান নি কেন!'

"জানালে কি কর্‌তেন?"

"যেমন করেই হোক্ এ বিয়ে ভেঙে দিতাম্।"

"তারপর—!" ……তারপর দুই সোদরোপম বন্ধুর মধ্যে চল্‌ল তর্ক ও মান অভিমানের পালা। বিশু ও অণিমার আশীর্বাদ হয়ে যাবার পর এতদিন যে অখিলবাবু অবনীবাবুর কোন খোঁজ করেননি এইটেই অবনীবাবুকে আজ সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ করে তুল্‌ল। বিবাহ বন্ধ করার কোন যুক্তিই তিনি গ্রহণ কর্‌লেন না,—অখিলবাবুর কোন কথা কোন অনুরোধই শুন্‌লেন না। সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে কঠোর স্বরে জানালেন,—"ঐ সোনার প্রতিমাকে নিজের হাতে আমি অ-কালে বিসর্জন দেব তবু তোমাদের অনুগ্রহের দান নিয়ে তাকে বোধনের বাজনা শোনাতে পার্‌বনা। যাও—যাও তুমি।" অপমানিত ও ব্যথিত হয়ে অভিমানে অখিলবাবু বাড়ী ফিরে চল্‌লেন। বাড়ীতে গিয়ে দেখ্‌লেন স্ত্রী সুনীতি দেবী ও সুশীলা তাঁর ফেরার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব। তিনি যেতেই দু'জনে নানা প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলেন। অখিলবাবু হতাশের মত ইজি-চেয়ারে ব'সে প'ড়ে শুধু ব'ল্‌লেন, —"দাদার আজ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমার কোন কথাই শুন্‌লেন না, কোন সাহায্যই নিলেন না। অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। "সুনীতিদেবী বল্‌লেন 'কিন্তু মেয়েটাত কোন দোষ করেনি।"

'তা' জানি, কিন্তু কে তাঁকে বোঝাবে; আমার ওপর অভিমানে আজ তিনি অন্ধ হয়েছেন।"

"অভিমান করা তাঁর পক্ষে অন্যায়। একমাত্র ছেলে হারিয়ে আমাদেরও কি খোঁজ খবর নেবার মত অবসর কিম্বা মনের অবস্থা ছিল!"

'তবু ভেবে দেখছি সুনীতি, আমাদের খোঁজ নেওয়াই উচিৎ ছিল। আমাদের ছেলের সংগেই তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হ'য়েছিল। আর তাঁর কন্যাদায়।" এমন সময় অদূরে ঢাকঢোলের শব্দ উঠ্‌ল। চম্‌কে উঠে অখিলবাবু ব'ল্‌লেন—"ও—কি?"

ভয়ে দুঃখে সুনীতি দেবী আর একবার গিয়ে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে অখিলবাবুকে অনুরোধ ক'রলেন। সুশীলা বন্ধুর বিপদে আর স্থির থাকতে পার্‌লনা। কেঁদে ব'ল্‌ল, "যেমন ক'রেই হোক বিয়ে বন্ধ ক'রতে হবে

হবে পিশেমশায়। আর একবার যান!" অখিলবাবু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক্ সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুক্‌লো প্রণব, বিশু ও সুরেশ যেন দুর্য্যোগে রাতের পথিকের পথে ঘন মেঘের আবরণ ছিঁড়ে একঝলক আলো এসে পড়ল্ আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল পথিকের দুর্গম পথ। এই আকস্মিক আবির্ভাবে অখিলবাবু প্রথমে বিস্ময়ে আনন্দে নির্বাক হ'য়ে রইলেন। কিন্তু যখন প্রণব তাঁকে সব কথা খুলে ব'লে বিশুর অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইতে গেল তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"এখন কোন কথা নয়। বিশুকে নিয়ে শীগ্‌গীর আমার সংগে তোমরা এস। এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হ'য়ে গেল। ঝড়ের মত অখিলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছু না বুঝেই প্রণব, সুরেশ ও বিশু তাঁর অনুসরণ কর্‌ল।······

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। অবনীবাবুর বাড়ীর মধ্যে আঙ্গিনায় সাজানো বিবাহের আসর 'পেট্রোম্যাক্স' আলোয় ঝল্‌মল্ ক'রেছে। বাড়ির বাইরে বাদকেরা প্রবল উৎসাহে ঢোল বাজাচ্ছে এবং ভিতরে বহুদর্শকের সম্মুখে হরিনারায়ণ যদু সান্যালের হাত অণিমার হাতের উপর রেখে মন্ত্র পড়্‌তে উদ্যত হয়েছেন। ঠিক্ সেই মুহূর্তে ভিড় ঠেলে অখিলবাবু প্রণব, বিশু ও সুরেশের সংগে সেই বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হ'লেন। দর্শকের মধ্যে আনন্দের কলরোল উঠ্‌ল, হরিনারায়ণের মুখে মন্ত্র অনুচ্চারিত থেকে গেল এবং অণিমা ও যদু সান্যালের হাত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। তখন পাড়ার ছেলেরা সান্যালমশায়কে উঠিয়ে দিয়ে তাঁকে নানা প্রকারে উত্যক্ত ক'রতে ক'রতে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বিশুকে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। হরিনারায়ণ শিকার হাতছাড়া হ'য়ে গেল দেখে প্রথমে এ বিয়ে দিতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু প্রণবের মুখে ভাল পাওনার কথা শুনে এবং তিনি অসহযোগীতা এমন কি বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌লেও এ বিয়ে আজ হবেই একথা জেনে অবশেষে আনন্দেই বিয়ে দিতে রাজী হ'য়ে গেলেন। আনন্দ কলরোলের মধ্যে বিয়ে শেষ হ'য়ে গেল। শক্তিপুরের দুটি পরিবারের মধ্যে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল তা দূর হ'য়ে গেল। প্রণবের অন্তরেও আজ আর অশান্তির লেশ রইল না। কিন্তু এই শেষ নয়; নিয়তির পরিহাস মর্মান্তিকরূপ ধ'রে সহসা এই আনন্দের মধ্যে এসে আবার দেখা দিল।

বিবাহের শেষে গুরুজনদের প্রণাম ক'রে অণিমা ও বিশু বাসর ঘরে চ'লছিল। এমন সময় দর্শকদের ভীড় ঠেলে রুক্ষশুষ্ক প্রতিহিংসা পরায়ণ এক মূর্তি আত্মপ্রকাশ ক'র্‌ল। সে মূর্তি গুপ্তসমিতির সেক্রেটারী যতীনের। যতীনের হাতে উদ্যত রিভল্‌ভার চোখে অগ্নিময় দৃষ্টি। বিশুর দিকে চেয়ে চিৎকার ক'রে সে ব'লে উঠ্‌ল,—"শয়তান! ভেবেছিলে গুপ্তসমিতিকে ধ্বংস ক'রে খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু তা' হয়না। বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার জন্যে আমি আজও জেলের বাইরে আছি। Now, be ready!" হাতের উদ্যত রিভল্‌ভার সোজা ক'রে সে বিশুর বুক লক্ষ্য ক'র্‌ল। দর্শকগণ চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ। এখনি গুলি ছুটে এসে বিশুর বুকে বিঁধ্‌বে—বাঁচ্‌বার আর তার কোন উপায় নেই। এই ব্যাপারে লক্ষ্য ক'রে মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করে প্রণব ছুটে এসে স্তম্ভিত ভীত বিশুকে আড়াল করে দাঁড়ালো। সংগে সংগে

যতীনের পিস্তল গর্জন করে উঠ্ল এবং প্রণবের গুলি-বিদ্ধ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়্ল। দর্শকেরা এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্তে পার্লো। উত্তেজিত জনতা তৎক্ষণাৎ যতীনকে ধরে ফেল্ল। গোলমালে, কান্নায়, বিলাপে মুহূর্তের মধ্যে বিবাহ মণ্ডপ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠ্ল। বিশু, অনিমা এবং সুরেশ প্রণবের ওপর ঝুঁকে পড়্ল! হায় হায়!……এ-কি করল সে! কেন সে এম্নি করে নিজেকে বিসর্জন দিল! প্রণব ক্লিষ্ট কণ্ঠে তাদের অনুরোধ করে যাবার আগে শুধু বলে গেল,—'অসময়ে চলে গেলাম বলে দুঃখ করোনা ভাই। যেতে আমি চাইনি—যাবার ইচ্ছেও ছিলনা। কিন্তু কি কর্ব বল! আমাকে আগেই যেতে হল। কিন্তু তোমরা রইলে। আমার অসমাপ্ত কাজের ভার আমি তোমাদের ওপরই দিয়ে গেলাম। ……মহৎ আদর্শে দেশকে-জাতিকে যদি নির্মল করে উন্নত করে তুল্তে পার তবে আমার 'কাজ তোমাদের দ্বারাই পূর্ণ হবে,—আমার আত্মা তাতেই তৃপ্ত হবে।"

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আনন্দ-মুখর সেদিনের সেই সন্ধ্যা সহসা গভীর শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং স্তব্ধ হয়ে গেল এই কাহিনীর সব ঘটনা।

খ্যাতনামা কাগজ ব্যবসায়ী স্বর্গতঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

জন্ম—১৩০২ মৃত্যু—১৩৫৩

পরলোকে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষালাভ আরম্ভ হয় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে, পরে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন করেন এবং যথাকালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৩ সালে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) আই, এ ও বি, পড়েন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনীতি শাস্ত্র তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন, তাই অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের তিনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং ব্যবহারিক অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর সহিত অনেক আলোচনা করতেন। কর্মজীবনে এই অর্থনীতি জ্ঞান ব্যবসায়ে সাফল্যলাভে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কৃষ্ণবাবুর পিতা ৺তারাপদ ঘোষ ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থবিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। কিন্তু কৃষ্ণবাবু সরকারী চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সাধারণ ভাবে কৃতবিদ্য হয়েও কৃষ্ণবাবু বুঝেছিলেন যে ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ করতে হোলে যথারীতি শিক্ষানবীশী করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সরকারী চাকুরীর মোহ এড়িয়ে তিনি ১৯১৮ সালে কাগজের ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশী আরম্ভ করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতস্পুত্র ৺হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের এইচ. কে. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী নামক কারবারে তাঁর শিক্ষানবীশী আরম্ভ হয়। এই সময়ে জলপানি হিসাবে তিনি মাসিক ১০৲ টাকা হারে পেতেন।

স্বর্গীয় বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যিনি শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীদের অন্যতম পথ প্রদর্শক ছিলেন, তিনি এই কারবারে পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কৃষ্ণবাবু তাঁরই নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। কারবারের প্রতিষ্ঠাতা ৺হরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নিকটেও তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত বহু বিষয় শিক্ষালাভ করেছিলেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে নিজের বুৎপত্তি, উপযুক্ত শিল্প ও বাণিজ্য গুরুর উপদেশ এবং স্বীয় আগ্রহ, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই সকল সমবায়ে অচিরে কৃষ্ণবাবু কারবারে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর পারিশ্রমিক ও সংগে সংগে ১০৲ হতে ৫০৲, ৫০৲ হতে ১০০৲, ১০০৲ হতে ২০০৲ এইভাবে বর্ধিত হতে লাগল। দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরিপদ ঘোষের মৃত্যু হেতু তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঘোষ পেপার হাউস নামক কারবারের ভার কৃষ্ণ বাবুর উপর পড়ে। কৃষ্ণবাবু তখন এইচ. কে. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কারবারের সংশ্রব ত্যাগ করে "ঘোষ পেপার হাউস" কারবার পরিচালনা করতে থাকেন। কারবারের উন্নতির সংগে সংগে কাগজ ব্যবসায়ী মহলে কৃষ্ণবাবু বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করতে লাগলেন। তাঁর ব্যবসায়বুদ্ধি ও কারবার পরিচালনা প্রণালী অনেক কারবারীর অনুকরণীয় হয়ে উঠল। পেপার ট্রেডারস এসোসিয়েশন নামক কাগজ ব্যবসায়ীদের যে সমিতি আছে, সেই সমিতি কৃষ্ণবাবুকে একজন উদ্যোগী কর্মীরূপে পেলেন। বৈদেশিক কাগজ আমদানী সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল আবেদন নিবেদন বাদ প্রতিবাদ ও আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন হত, সমিতি কৃষ্ণবাবুর নিকট সেই সকল বিষয় যথেষ্ট সহযোগিতা পেতেন। ১৯৪৫ সালে কৃষ্ণবাবু পেপার ট্রেডারস্ এসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এসোসিয়েশনের মুখ পাত্র হিসাবে তিনি কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীতে ভারত গভর্ণমেণ্টের বহু উচ্চ কর্মচারীর সহিত কাগজ ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে অতি দক্ষতার সহিত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচুর থাকায় বহু কাগজ ব্যবসায়ী ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য কৃষ্ণবাবুর স্মরণাপন্ন হতেন, এবং কৃষ্ণবাবু সাগ্রহে ও সযত্নে তাদের উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকার প্রথম জন্ম থেকে তিনি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি 'রূপ-মঞ্চে'র পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। যুদ্ধের সময় কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কোনরকম আচর তিনি রূপ-মঞ্চের গায়ে লাগতে দেন নি। এবং রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়কে কনিষ্ঠের মত স্নেহ ও উপদেশ দিয়ে এসেছেন কাগজ পরিচালনায়। তাঁর অনেক গোপন দান ছিল, প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন দানবীর ছিলেন। মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

জাতির বর্তমান সঙ্কট
ও
জাতীয়তার নাটক।

শ্রী তারা কুমার মুখোপাধ্যায়

★

জাতীয়তার নাটক বলতে আমি কেবল মঞ্চের নাটকই বোঝাচ্ছি না, চলচ্ছবির ব্যাপারকেও বোঝাচ্ছি। ষ্টেজ এবং সিনেমার কলা-কৌশল পৃথক হ'লেও ওদের প্রাণ ও আত্মা একই। উভয় কলারই প্রকাশ অভিনয়ে।

মানবমনের সনাতন সুখ দুঃখ এবং হাসি কান্না নিয়েই নাটকের কারবার। কিন্তু সমাজশরীরে মাঝে মাঝে আসে নিদারুণ সঙ্কট ও সাংঘাতিক বিপর্যয়। সেই সময়কার আন্দোলন-আলোড়ন নাটকেও প্রতিফলিত হয়। বাংলা সাহিত্যের সেরা নাট্যকার "নীল দর্পণ" লিখলেন নীল কুঠীর অত্যাচার নিয়ে। আমরাও বর্তমান সঙ্কটকে "নেতাজী" 'বন্দেমাতরম' অথবা "উদয়ের পথে"র মধ্যে দিয়ে দেখাতে চাইছি। জাতির বর্তমান বিপর্যয় নিয়ে এই সব নাটক ও আখ্যানকে আমরা জাতীয়তার নাটক ব'লে ধরে নিচ্ছি।

এই রকম নাট্যপ্রচেষ্টাকে সকল বুদ্ধিমান সমালোচকই সমর্থন করবেন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে হবে এই সব জাতীয়তার-নাটকের মূল প্রেরণা কোথায়? শিল্প প্রতিভা কতোখানি? জাতীয়তার প্রেরণা কতোদূর?

শিল্পকলার ক্ষেত্রে সব শিল্পই হয় পথ দেখায়, নয় তো তল্পী বহন করে। হয় নির্দেশ দেয়, নয় তো জনমতের পাছে পাছে খুঁড়িয়ে চলে। হয় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, নয়তো তোষামোদ করে তার মতি-গতিকে।

বর্তমান জাতীয় নাটকে আমরা কি কি জাতীয়তার কথা পাচ্ছি? জাতীয়তার গান আছে তাতে, জাতীয় দুর্দশার ছবি আছে তাতে, জাতীয় আন্দোলনের ধুয়ো আছে তাতে। নায়িকা তাতে "বন্দেমাতরম" গান করে। নায়ক তাতে "সর্বহারার" জন্ত সাম্যতান্ত্রিক অথবা ভিন্ন তান্ত্রিক আন্দোলন করে। দশের দৃশ্যে (mob-Scene) কুচ্‌ কাওয়াজ পাই, চরকা কাটা পাই, শ্রমিকমহল্লা পাই, ক্ষুধার্ত নরনারীর উচ্ছিষ্ট নিয়ে টানাটানি হানাহানি পাই।

কিন্তু প্রয়োগাধ্যদের প্রেরণা কী? তাঁরা কি নাটক বা আখ্যানের মধ্য দিয়ে দর্শক সমাজকে পথ নির্দেশ করেছেন! তাঁরা কি নিছক শিল্পরস করে তুলতে পারছেন তাঁদের প্রেরণাকে! মঞ্চ বা পর্দার দুয়ার অতিক্রম করে ঘরে এসে দর্শক যখন বিশ্রাম নিয়ে ছবি বা নাটক খানির কথা ভাবে, সে কি আরো দেশ-প্রেমিক হয়ে ওঠে! আধুনিক কোনো নাটক বা ছবি জাতীয়তার জয়গান গেয়ে আমাদের কি বেশী প্রেরণা জোগাতে পেরেছে!

ষ্টেজ্‌ বা সিনেমা শিল্প হলেও সেগুলো বাণিজ্য। লক্ষ্মী অর্থাৎ টাকার কামনাই সেখানকার ব্যাপারীদের মূল আকাঙ্ক্ষা। জনমতকে খুসী রাখলে তারা পয়সা দিয়ে নাটক দেখবে বলেই জাতীয়তার-নাটক করছেন কর্মকর্তারা। জাতীয় সঙ্কট গুলো এতো বেশী অন্দর মহলে এসে পড়েছে যে, ওদের আর দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলেনা শিল্পের কারবারেও। তাই জাতীয়তার-নাটক মূলতঃ পণ্য, গৌণতঃ শিল্প অথবা জাতীয়তা।

অনেকগুলি জাতীয়তার নাটক থেকেই যদি জাতীয় সঙ্কটের পশ্চাদপট সরিয়ে নি, তবে নিছক গল্পটারই একটি স্বতন্ত্র অবয়ব নজরে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় জাতীয়তার সাধুগিরি বাদ দিয়ে নিছক সামাজিক গল্পটাকে ফুটিয়ে তুললেই শিল্পরস বজায় থাকতো বেশী।

রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়" লিখলেন সন্ত্রাসবাদের পশ্চাদ্‌পটে। মুখে বললেন ওটা নিছক প্রেমের গল্প। অর্থাৎ "শেষের কবিতা"র "লাবণ্য—অমিত—শোভন-লাল"এর মতোই "অন্ত—এলা"র ব্যাপার" চার অধ্যায়ে। —উক্তিটা এ-ভাষায় না লিখলেও কবির অজুহাতটা ছিলো ঐ ধরণের। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। "চার-অধ্যায়ে"র সন্ত্রাসী পশ্চাদ্‌পট বাদ দিলে "অন্ত—এলা"র হাড়-মাসের খাঁচাটা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

"চার অধ্যায়ে"র "অন্ত—এলা"র শিরার রক্তের মধ্যে জাতীয়তা মিশিয়ে গেছে। সেখানে জাতীয়-কর্ম প্রেরণার সংগে ব্যক্তিগত প্রণয়—বেদনার লড়াই লেগেছে। সেখানে "অন্ত—এলা"কে সাজানো হয়নি। তারা গড়ে উঠেছে।

কিন্তু মন্বন্তর নিয়ে বা আধুনিকতার সঙ্কট নিয়ে আমরা যেসব জাতীয়তার-নাটক লিখছি তাতে নায়ক নায়িকার জীবনের সংগে জাতীয়তার নাড়ির যোগ পাই না। সেখানে জাতীয়তা ও গল্প তেলে জলে—মিশে যায় নি। কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বলবে নাটককার বা আখ্যানকার জাতীয় বেদনাটিকে ঠিক ঠিক ধরতে পারেন নি। আমাদের বর্তমান জাতীয় সংকট গুলোকে ধারণা করা খুব সহজ নয়। জাতীয় আন্দোলনের আদি যুগে বা মধ্যযুগেও আমাদের ক্ষত যতো গভীর ছিলো বর্তমান সময়ে তা আরো গভীর হ'য়েছে, তাকে ধারণা করা প্রতিভা সাপেক্ষ। সস্তার ব্যবসায়বুদ্ধি বা ধূর্ত অভিনয়ের প্যাঁচ্ পয়জার তাকে বিকৃতই করে।

তবে একথা ঠিক, বর্তমান এই প্রচেষ্টা গুলি হ'তে বুঝতে পারছি যে, শুধু ন্যাকামিতে আর ভাব ভুলছে না। দর্শকের অজ্ঞাত মনে সত্যিকারের জাতীয়তার নাটক চাইছে। কিন্তু তারাও সেটী স্পষ্টতঃ বুঝছেন না ; ব্যাপারীরাও তার ধার দিয়ে যাচ্ছেন না। এরকম অবস্থায় ধীর ভাবে প্রতিভার জন্য অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চিত্রাভিনয়

বিনয়কুমার চৌধুরী

★

একথা বোধ হয় সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, আধুনিক সভ্য জগতে আমোদ প্রমোদের সাহায্যে অবসর বিনোদনের যে বিজ্ঞানসঙ্গত রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে সমাজের অর্থাৎ মানবের জীবনীশক্তিকে বাড়াবার জন্য, তা একান্ত অপরিহার্য। এবং একথাতেও সকলেই একমত যে, যতগুলো উপায় আজ অবধি উদ্ভাবিত হয়েছে অবসর বিনোদনের, ছায়া চিত্র সে সবের শীর্ষভাগে আসন পাবার যোগ্য। এত অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে মানুষের মনে আনন্দ জাগানো—এক কথায় মানুষকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হয় শুধুমাত্র চিত্র মারফৎই। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুধুমাত্র চক্ষু এবং কর্ণের সতঃপ্রবৃত্ত সদ্ব্যবহারই এ আমোদ লাভের পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না এতে, এমন কি "মন"কে বাদ দিলে ও চলে।

এক্ষেত্রে চিত্রের আমোদজনক অবসর বিনোদনের দিকটার কথাই আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করলুম। তাছাড়া অধুনা গণজীবনে এর প্রভাব যে কত দিক দিয়ে পরিব্যাপ্ত এবং সমাজে এর আবশ্যকতা যে কতখানি অপরিহার্য—সে দিকটা সম্পূর্ণই বাদ দিলুম।

এবারে পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করছি চিত্রের প্রকৃত এবং যথার্থ সংজ্ঞা কি। প্রথমত, এ হচ্ছে এমন একটি অবসর বিনোদনের তথা আমাদের একটি বিশিষ্ট পন্থা যাতে করে যুগের দাবী মেটে। অর্থাৎ যে আমোদ যুগের দাবী পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ। এতে রূপায়িত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। কোনও ব্যক্তি বা চরিত্র বিশেষের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনের নিছক প্রতিচ্ছবিই এ শুধু নয়,—এ হচ্ছে দেশ, জাতি বা সমাজের প্রতিচ্ছবি বা দর্শন। নাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ ক'রতে যেয়ে মনীষী Yeats এক জায়গায় বলেছেন—"The play that is to give them (means audience) a natural pleasure should tell them either of their own life, or of that life of poetry where everyman can see his own image." চিত্রক্ষেত্রও ইয়েট্সের উক্ত উক্তি স্থান পেতে পারে। কিন্তু আরও সুন্দর এবং সহজভাবে বোঝাতে গেলে অপর এক মনীষীর উক্তিতে বলতে হয়—"It is the real life story of an individual or a society depicting his or its struggle for existence, which is not beyond the experience of the audience." এখানে আমি চিত্রের সত্যিকারের রূপ বলতে যা বোঝায় সেটাই বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছি,—কোনও চিত্র বিশেষের বা মামুলি ছবির কথা বলছি না।

এখনই কথা ওঠে আবার চরিত্র কি? চরিত্র বলতে নাট্যশাস্ত্রে গাছ পাথরকে বোঝায় না, বোঝায় মানবকে। এক এক চরিত্র এক এক জাগতিক মানবের প্রতিবিম্ব বলা যেতে পারে।

প্রত্যেক মানবই আবার কতকগুলো বিশেষ ভাবের অধীন। সেইহেতু আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেক চরিত্রও ভাবাধীন সমানভাবেই, যেহেতু কোনও মানুষ মানেই কোনও চরিত্র।

এখন কথা উঠতে পারে যে, প্রত্যেক চরিত্রই কি সমস্ত ভাব গোষ্ঠীর অধীন? এক্ষেত্রে বলব যে, আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে চরিত্র মাত্রই কোন বিশেষ বিশেষ ভাবের অধীন। সুতরাং এখন কথা দাঁড়াচ্ছে যে, প্রত্যেক চরিত্রই ভাবাধীন, কিন্তু সমস্ত ভাবের অধীন সকল চরিত্র নয়। কোনও বিশেষ চরিত্র কোন কোন বিশেষ ভাবের অধীন। একথাতেও রায় দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব নয়। তবে একথা বললেই সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার হবে যে, চরিত্র মাত্রই ভাবাধীন একথাও যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এও সত্য যে, প্রত্যেক চরিত্রেই কতকগুলো বিশেষ ভাবের প্রাধান্য বিদ্যমান।

চিত্রাভিনয়ে প্রকৃত সংজ্ঞার ধাপে উঠতে হলে প্রাথমিক বহু সোপান বেয়ে না উঠলে সে সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। তবে সে সমস্ত সোপান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান আলোচ্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধও নয়। কাজেই সে ধাপে

উঠতে হলে যে গুলো একান্ত অপরিহার্য, সে সম্বন্ধেই আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

পূর্বেই বলেছি যে, চরিত্রমাত্রই মানব চরিত্রকে বোঝায় এবং এর জন্য চরিত্র বিশেষের গুণ বা qualification বা কোনরূপ Identification এর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ চরিত্রের শ্রেণীভেদ, যেমন hero, villain shrewd, scoundral এসব উল্লেখের বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই চরিত্রের বাজারে। বিনা প্রমাণেই চরিত্র অর্থ মানব চরিত্র। "A character is a character of human-being without any qualification." নাট্য-শাস্ত্রে চরিত্রের সংজ্ঞা এই।

এখন কথা ওঠে নাট্যশাস্ত্রে 'চরিত্র,' চরিত্র বলে গৃহিত হয় কখন? সর্বক্ষেত্রে যে নয় একথা অনস্বীকার্য। কারণ, যেখানে সেখানে চরিত্রের কোন সত্ত্বা বা অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। চরিত্র চরিত্র বলে পরিগণিত হবে তখনই, যখনই তার কাঠামোতে কোন গল্প, ঘটনা বা সে জাতীয় কিছু থাকবে এবং তাকে আশ্রয় করেই চরিত্র নিজের রূপ বা সাদা কথায় জীবন লাভ করবে। একথাক'টিকে আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়—

"A character is a character of human-being without any qualification. But, again, a character is then a character when it is supported by a story, incident or something like that, otherwise it has got no value."

চিত্রাভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে ক'রতে আমরা আপনা থেকেই অবলীলাক্রমে এসে পড়েছি চিত্রাভিনেতার কাছে—অর্থাৎ যিনি চিত্রাভিনয় ক'রেন, যাঁর অভাবে চিত্রাভিনয় হ'তে পারে না। সুতরাং চিত্রাভিনেতা সম্পর্কে আলোচনা একান্ত অপরিহার্য এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সে জন্য এপ্রসঙ্গে যেটুকু দরকার মোটামুটি তাই বিবৃত কচ্ছি সংক্ষেপে।

পূর্বেই প্রমাণিত হ'য়েছে যে, চরিত্র মাত্রই ভাবাধীন আবার চরিত্র মাত্রই মানব। সুতরাং যিনি চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলেন বা রূপ দান ক'রেন,—সেই যে অভিনেতা বা শিল্পী, তিনি যেহেতু মানব, সেহেতু ভাবাধীনও সমান ভাবেই। এক্ষেত্রে অভিনেতার কথা স্রেফ বাদ দিয়ে শিল্পীকেই ধরে নিচ্ছি। কারণ, সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রতে গেলে শিল্পী ও অভিনেতার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ বিদ্যমান। যাক্, সে আলোচনার স্থান আলোচ্য প্রবন্ধ নয়।

একজন শিল্পীকে অভিনয়কালে এতটা প্রস্তুত থাকতে হ'বে, যাতে ক'রে তিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত চরিত্রের যথার্থ রূপারোপ দ্বারা দর্শকদের ওপর চারিত্রিক ভাবের একটা প্রতিক্রিয়া আনয়ন করতে পারেন। পরিষ্কার ক'রে বলছি—

"An artist must always be in a position to identify his character bringing upon the audience its emotional reactions."

প্রশ্নেরও অন্ত নেই, জবাবেরও পরিধি নেই। এখন প্রশ্ন ওঠে—how a character takes its shape? অর্থাৎ চরিত্র কি ভাবে আপন রূপ পরিগ্রহ করে?

এর উত্তরে আমরা বলব—এর জন্য দু'টি যোগাযোগ আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক, যা চরিত্রের স্বভাব প্রসূত বা 'mannerism of the character.'

স্পষ্ট ক'রে সব কথাগুলো বোঝাবার জন্যে পূর্বের কথা মাঝে মাঝে টেনে আনছি আবার। আমরা জানি প্রত্যেক চরিত্রে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের অধিকতর প্রাধান্য বিদ্যমান। সুতরাং কি ভাবে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে অথবা শিল্পীর চরিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কি করা প্রয়োজন, সে কথা বোঝাতে গেলে বলতে হয়—পূর্বোক্ত কতিপয় ভাবকে

যদি বিশেষ ভাবপ্রদানকারী ভাবে প্রকাশ করতে পারা যায় তাহলেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

"If certain emotions are 'forcefully' expressed then a character is established." (here 'forcefully' is used to mean 'clear-cut')

প্রত্যেক শিল্পীকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, "under any circumstances his body must react naturally, sponteniously and comfortably." অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতে (অবশ্য অভিনয়কালে) শিল্পীর শরীরের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হ'বে, তা স্বাভাবিক, সতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ হ'তে হবে। এর কোনটির ব্যতিক্রমে চরিত্র সৃষ্টি ব্যর্থ হ'বে।

এখন কথা আসে—"what is the 'art of acting' বা 'অভিনয় কলা' বলতে কি বোঝায়।"

এর উত্তরে আমরা বলব—শিল্পীর নিজের সাধারণ সত্বা বা general-self কে জ্ঞাতভাবে চেপে রেখে শিল্পীর নিজেরই যে অন্য সত্বাগুলি রয়েছে সে গুলোকে প্রয়োজন মত reveal বা প্রকাশ করতে পারাকে 'অভিনয় করা' বলে এবং সেই ক্রিয়াই হল 'অভিনয় কলা'।

এখন কথা ওঠে আবার, সত্বা কি; সত্বার প্রকারভেদ কি? যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে তাহলে সত্বাও তাঁরই দেওয়া প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অবস্থিতি।

মানুষের সাধারণ সত্বার আবার তিন রকম প্রকারভেদ। যথা :—Personal or general-self—অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সাধারণ সত্বা; Domestic-self—পারিবারিক সত্বা এবং social self সামাজিক সত্বা। কাজেই যে কোনও চরিত্র যেহেতু সে চরিত্র পৃথক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, সেই হেতু সেই চরিত্রের উপরোক্ত তিনটি সত্বা বিদ্যমান। চরিত্র ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সুতরাং যিনি শিল্পী তিনি যে চরিত্রে রূপদান করবেন, সেই চরিত্রের সত্বাগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হ'বে আপন সত্বাগুলিকে সেই চারিত্রিক সত্বাগুলির সংগে সূক্ষ্ম মাপকাঠি দিয়ে ঠিক স্কেলের মাপে মেপে, যেন উনিশ-বিশ তফাৎ কোথাও না থাকে, তেমনি সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে মিশিয়ে নিতে হ'বে তাঁকে। এক কথায় শিল্পীকে হুবহু সেই চরিত্রটি বনে যেতে হ'বে। সেজন্য তিনি নিছক অভিনীত চরিত্রটি বনে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে চলবেনা,—তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হ'বে সেই চরিত্র সৃষ্টি। কারণ—"An artist must create cautiously, only making it subcautious to the audience. He can never portray uncautiously."

তবে সাধারণত বা মোটামুটিভাবে কোনও চরিত্র রূপদানে শিল্পী শুধুমাত্র প্রয়োজনানুসারে ভাবের প্রতিক্রিয়া তাঁর কণ্ঠ, মুখ ও অংগভংগীর সাহায্যে প্রকাশ দ্বারা দর্শকচিত্তে চারিত্রিক ভাবের প্রতিক্রিয়া আনয়ন ক'রতে সক্ষম হ'লেই রূপদান হ'বে।

প্রত্যেক মানবই—না, শুধু মানব কেন, জীবমাত্রই সর্বদা অনিচ্ছাকৃত অথচ স্বাভাবিক গতিশীল। অর্থাৎ জীবমাত্রই কিছু না কিছু না-ক'রে চুপ করে বসে থাকতে পারেনা। কিছু না কিছু তাকে করতেই হয়। এটা জীবধর্ম। সুতরাং শিল্পীও এথেকে বঞ্চিত নন। দর্শকের ওপর চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা প্রতিক্রিয়া আনতে হলে প্রত্যেক শিল্পীকেই তাঁর নিজের দেহকে জানতে হ'বে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

দু'ভাবে screen থেকে দর্শকের ওপর প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসা সম্ভব। প্রথমত By universal way এবং দ্বিতীয়তঃ By social way. এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীরই জানা একান্ত আবশ্যক এই যে, কি রকম কণ্ঠস্বর, চরিত্র, মুখাভিব্যক্তি এবং অংগভংগী দিতে তাঁর দেহ সক্ষম।

"Emotions are guided or expressed by conventions." অতএব বিভিন্ন স্তরের চরিত্রের সাথে ক্রিয়াকলাপে বিভিন্ন রকম কণ্ঠস্বর, মুখাভিব্যক্তি এবং অংগভংগী প্রয়োজন।

ওদেশে এদেশে

মোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশ আজ যুদ্ধোত্তর অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে গভীরভাবে চিন্তা কোরছেন কোন্ পথে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্রের আরও উন্নতি সম্ভব। তাঁরা চান, চলচ্চিত্র জাতির চিন্তা-কৃষ্টি-ভাবধারা-শিল্পশিক্ষার বাহনরূপে গ'ড়ে তুলুক দেশের সাধারণকে, সমৃদ্ধ কোরে তুলুক দেশকে। ওদেশের প্রযোজক ও পরিচালকেরা দেশ তাঁদের ওপোর যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ কোরেছে প্রতিনিয়তই সে-সম্বন্ধে সচেতন। তাই তাঁরা কোনোদিনই চাননি যে, তাঁদের চিত্রগুলি কেবল কৃত্রিম বাগানের মাঝে কড়া চাঁদের আলো মাখা নায়ক-নায়িকাদের অবাস্তব প্রেমালাপ আর বিকৃত যৌন আবেদনে ভরা হবে। তাঁরা কোনোদিনই বড়ো বড়ো দুষ্পাচ্য সংলাপের বোঝা (যা প্রলাপোক্তিরই সামিল) দিয়ে দর্শকদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে ভারাক্রান্ত কোরতে রাজি হননি। তাঁদের ছবিতে কিছু অন্ততঃ শিক্ষনীয় বিষয় দেবার জন্যে তাঁরা সবসময়ই সচেষ্ট। তাইতো—

১৯২৫ সালে 'জার্মান ছায়াচিত্র সংঘের' উদ্যোগে ১০ই থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত জার্মানীতে একটি শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। আর সেই প্রদর্শনীতে যেসকল শিক্ষাবিষয়ক ছায়াছবি প্রদর্শিত হলো তার ভেতর শিক্ষনীয় কোনো বিষয়টিরই—প্রকৃতবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত—অভাব ঘটলো না। সাধারণ আনন্দ দেবার জন্যে সংঘ বেছে নিয়েছিলেন বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত নৃত্যের ছবি। তাতেও কিন্তু তাঁরা শিক্ষার কথা ভোলেননি—এতেই নির্বাচনের সার্থকতা।

এই সেদিন রাশিয়ায় Academician Choudokov-এর পরিচালনাধীনে নব্বুই রীলের একটি চিত্র গ্রহণ করা হলো, নাম হলো "দ্য অটোমোবাইল।" ওই চিত্রের প্রদর্শনায় রাশিয়ার কার ট্রাক ট্রাকটর, ট্যাঙ্ক, মোটার সাইকেলের হাজার হাজার চালক চালনাবিষয়ে যে প্রয়োজনীয় উপদেশই শুধু পেল তা' নয়, তারা ওই বিষয়ে শিক্ষিতও হলো।

যে গ্রেটবৃটেনে ১৯৩০ সালের বিজ্ঞানচিত্র সংঘের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই, সেই গ্রেটবৃটেনে গড়ে উঠলো প্রায় একশোটা সমিতি। এই সমিতিগুলি একসংগে মিশে গিয়ে ১৯৪৩ সালে মিঃ আর্থার ইল্টনের নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছে "দ্য সায়েন্টিফিক ফিল্ম এসোসিয়েশন" রূপে (C/o Royal Photographic Society, 16, Princess Gate, London. S. W. 7)। বিজ্ঞানচিত্রের প্রযোজনা, প্রদর্শনা ও ওই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্যর পোলাণ্ড হপকিন্সের সভাপতিত্বে ১৯৩৭ সালে "এসোসিয়েশন অব্ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স্' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশেষ সংসদ "সায়েন্টিফিক ফিল্ম কমিটি' (The Scientific Film Committee of tho Association of Scientific Workers, Kelvin House, 28, Hogarth Road, London, S. W. 7)-র উত্তর ভাগ বলা যায় "সায়েন্টিফিক ফিল্ম, এসোসিয়েশনকে। বিজ্ঞান-ও-শিক্ষা সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছায়াচিত্র সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করার জন্যে আছে "বৃটিশ ফিল্ম্ ইন্স্টিট্যুট" (The British Film Institute, 4 Great Russel Street, London, W. C. I.)। বিজ্ঞানসমস্যা সমাধানের জন্যে গবেষকদের ব্যবহৃত ছায়াচিত্রগুলির খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের জন্যে রয়েছে "দ্য সায়েন্টিফিক রিসার্চ প্যানেল অব্ দ্য এডভাইসরী কাউন্সিল টু দ্য ব্রিটিশ ফিল্ম্ ইন্স্টিট্যুট।"

ইউ. এস. এ.-র "দ্য রোলাব ফোটো-সার্ভিস ল্যাবরেটরীজ্, "(The Rolob Photo Laboratories, Sandy Hook, Conn., U. S. A.)-এর প্রতিষ্ঠা হলো বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক চিত্রের প্রযোজনা, পরিচালনা ও প্রদর্শনা বিষয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বিজ্ঞান ও শিক্ষাচিত্রের নির্মাণকৌশল শিক্ষাদান করাও হলো 'রোলাবে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিন্তু এদেশে ! বিশ্বের চলচ্চিত্র দরবারে আজও এদেশ একটি বিশিষ্ট আসন সংগ্রহ করার যোগ্যতা অর্জন কোর্তে পারে নি ! কিন্তু কেন !

এদেশের—বিশেষতঃ বাংলায়—চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে গভীর গবেষণার সুরু তার জন্ম থেকে হ'য়েছিল আজও তার বিরতি ঘটেনি। তবে গবেষণার রূপ ওদেশ থেকে ভিন্ন,—এই যা। তা' হচ্ছে,—নায়িকা কোন্ এংগল থেকে 'চোখ মার্লে', কতোখানা 'সখি, আমায় ধরো ধরো'-ভাব দেখালে ও 'চোখ মারা'র সংখ্যা কতগুলো হ'লে প্রেম দৃশ্যগুলো আরও রোমান্টিক হবে; গতযৌবন নায়ক-নায়িকার সংলাপে শতকরা কতোগুলো আধো-আধো কথা দিলে সাধারণ দর্শকরা তাদের ব'য়েস সম্বন্ধে কোনই কিনারা কোর্তে পার্বেন না; কিংবা দর্শকদের হৃদয়ে উচ্চ আসন পাবার জন্যে কী ধরণের রাষ্ট্র ও রাজনীতির অবতারণা করা যেতে পারে; আর যদিই বা জাতি হিতৈষণার নামে ওই ধরণের রাষ্ট্র ও রাজনীতির অবতারণাই কোর্তে হয় তো তাতে শতকরা কী হিসেবে 'শট' দিলে একটি উদ্ভট খিচুড়ি হ'তে পারে, যার রসগ্রহণ করা দর্শকদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে, এবং ওই ধরণের রাষ্ট্র ও রাজনীতির খিচুড়ি-চিত্রে কতোটা বিকৃত ও বিশ্রি প্রেমের দৃশ্য দেখালে 'বই মার খাবে না;' (যেসব প্রযোজকেরা অর্থ নিয়োগ করেন কেবল সুদশুদ্ধু উঠে আসার জন্যেই তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য।)

বর্তমান যুগপ্রগতির সংগে সমতা রেখে এদেশকে চল্তে হবে ওদেশের সংগে সমান প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। তাই এদেশের প্রযোজক ও পরিচালকদের কাছে দেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন জাতির ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা কোরে নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকান। তাঁরা যেন মনে রাখেন, তাঁদের প্রতিটি অনুপরমাণুর সাথে দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িয়ে আছে,—বিরাট দায়িত্বের বোঝা তাঁদের ওপোর। তাই তাঁদের আজ অগ্রণী হ'তে হবে দেশকে শিক্ষিত কোরে তোল্বার জন্যে তাঁদের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের মধ্যমে। এদেশের একজন চিত্র প্রযোজক যে অর্থ একখানা প্রেমের চিত্রের রূপ দেবার জন্য ব্যয় করেন সেই অর্থ যদি তিনি নানাবিষয়ী শিক্ষামূলক চিত্রগ্রহণে ব্যয় করেন তো তাঁর চিত্র প্রযোজনা সার্থক হবে। পরিচালকদের পরিবর্তন কোর্তে হবে তাঁদের দৃষ্টিভংগির; তাঁদের সেই সুক্তোর সংগে সন্দেশ চট্কে দেওয়ার 'টেক্নিক্' পরিহার কোর্তে হবে। সাবলীল দৃষ্টিভংগিতে নোতুন টেক্নিকে তাঁদের পরিচালনা কোর্তে হবে—নির্জীব 'সেলুলয়েডে'র বুকে ফুটিয়ে তুল্তে হবে তাঁদের অতল সমুদ্রগর্ভের রহস্যলোক. মহাশূন্যের বিরাটত্ব, প্রাণীদেহের জটিল কৌশলগুলি, জীবজগতের বিস্ময়ে, উদ্ভিদ জগতের জীবন প্রণালী, বলবিদ্যার কারসাজী, পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার নানা কৌশল—আরও কতো কি।

ইতিমধ্যেই এদেশে কয়েকটি শিক্ষাচিত্রের আত্মপ্রকাশ অবশ্য ঘটেছে। তাদের অধিকাংশই Rokefeller Foundation এর প্রযোজনা, তাদের বিষয়বস্তু ম্যালেরিয়া, হুক-ওয়ারম ইত্যাদির প্রতিষেধক বিষয়কে—কেন্দ্র কোরে। "পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট" গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে এই চলচ্চিত্রগুলির সাহায্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। কেননা, ওদের ভেতরও কতকগুলো ছবি—যেমন, 'খাদ্য' সম্বন্ধে—পাশ্চাত্য রীতি ও নীতির ওপোর ভিত্তি কোরে রচিত যা ভারতীয় আবহাওয়ার মাঝে মোটেই খাপ খায় না। ভারতীয় রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রার বাঁধা নিরীখের মাঝে ছবি তুল্তে হবে ভারতীয়কেই। দেশের জনসাধারণের স্বার্থের তথা দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচার কোর্তে হবে বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিকী গবেষণার ফল,—আর, তা' কোর্তে হবে চলচ্চিত্রের সাহায্যে। জনসাধারণের মংগলকামনায় বিজ্ঞানীদের দান তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন, কৃষকদের বুঝিয়ে দিতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষে শস্যের কত উন্নতি হ'তে পারে; ছায়াছবির সাহায্যে তা' সহজেই তাদের বোধগম্য হবে। ওই ধরণের চিত্রগুলি শুধু যে বিজ্ঞান ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেরই প্রচার করে তা' নয়, তারা বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজের ক্রমোন্নতির পথে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির সমাধান করে। 'ইন্ফরমেশন ফিল্মস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ওই ধরণের চিত্র প্রযোজনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চেষ্টা কোর্ছেন। 'ইন্ফরমেশন ফিল্মস্ অব্

ইণ্ডিয়া' ও 'হেডমাষ্টারস্ এসোসিয়েশন অব্ বোম্বে' কিছুদিন আগে একটি পরিকল্পনা কোরেছিলেন যে, বোম্বের কয়েকটি চিত্রগৃহে প্রতিটি রবিবার কেবলমাত্র বিজ্ঞান-ও-শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শিত হবে। ভারতের প্রতিটি প্রদেশে ওই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া উচিত।

কিন্তু সমস্যাও অনেক। ওদেশের তুলনায় এদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক মান বেশ নিচুতে। তাই এদেশের ধনিক সমাজকে প্রথমে এগিয়ে এসে একটি বড়ো অংকের তহবিলের ব্যবস্থা কোর্‌তে হবে। তারপর প্রথিতযশা কয়েকজন বিজ্ঞানী, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কোরে সভ্য। কয়েকজন চলচ্চিত্র বিশারদ ইত্যাদি নিয়ে একটি সংসদ স্থাপিত কোর্‌তে হবে। এই সংসদের প্রথম কাজ হবে গ্রেট বৃটেনের "সায়েন্টিফিক ফিল্ম্ এসোসিয়েশনের" অনুরূপ "অল ইণ্ডিয়া সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড এডুকেশনাল ফিল্ম্ এসোসিয়েশনের" প্রতিষ্ঠা করা এবং বিজ্ঞান ও-শিক্ষা-মূলক চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা সম্পর্কে সম্ভব অসম্ভব সবরকম গবেষণার সংগে সংগে ওদেশের বিজ্ঞান-ও শিক্ষাচিত্র সমিতিগুলির সাথে ওই সম্পর্কীয় চলচ্চিত্রের আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা। যেসব চিত্রপ্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও শিক্ষাচিত্র তুলতে উৎসুক তাদের এই সংসদ আবশ্যকীয় পরামর্শ ও টেকনিক্যাল নির্দেশনা তো দেবেনই কিন্তু প্রযোজনা বিষয়ে তাঁদেরই পথ নির্দেশ কোর্‌তে হবে। এমন কি, যেসব ছাত্রছাত্রী চলচ্চিত্রের সাহায্যে তাঁদের গবেষণা সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যাগুলির সমাধান কোর্‌তে চান তাঁদের গবেষণার গুরুত্ব অনুসারে এই সমিতির তহবিল থেকে অর্থ সাহায্যও কোর্‌তে হবে। সম্ভব হ'লে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের একজন কোরে সভ্য এই সমিতিতে সভ্যরূপে রাখা দরকার। কিছুদিন অন্তর অন্তর একটি কোরে অধিবেশন কোরে এই সমিতিকে সমাধান কোর্‌তে হবে বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিত্রের প্রতিটি সমস্যার। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সমিতিকে পুষ্ট কোর্‌তে হবে চলচ্চিত্রেরই সাহায্যে।

প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আজ এগিয়ে আস্‌তে হবে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করার জন্যে ;—দেশ-জাতি—ছাত্র-সমাজ - জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাদের আজ রচনা কোর্‌তে হবে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

সম্পাদকের দপ্তর
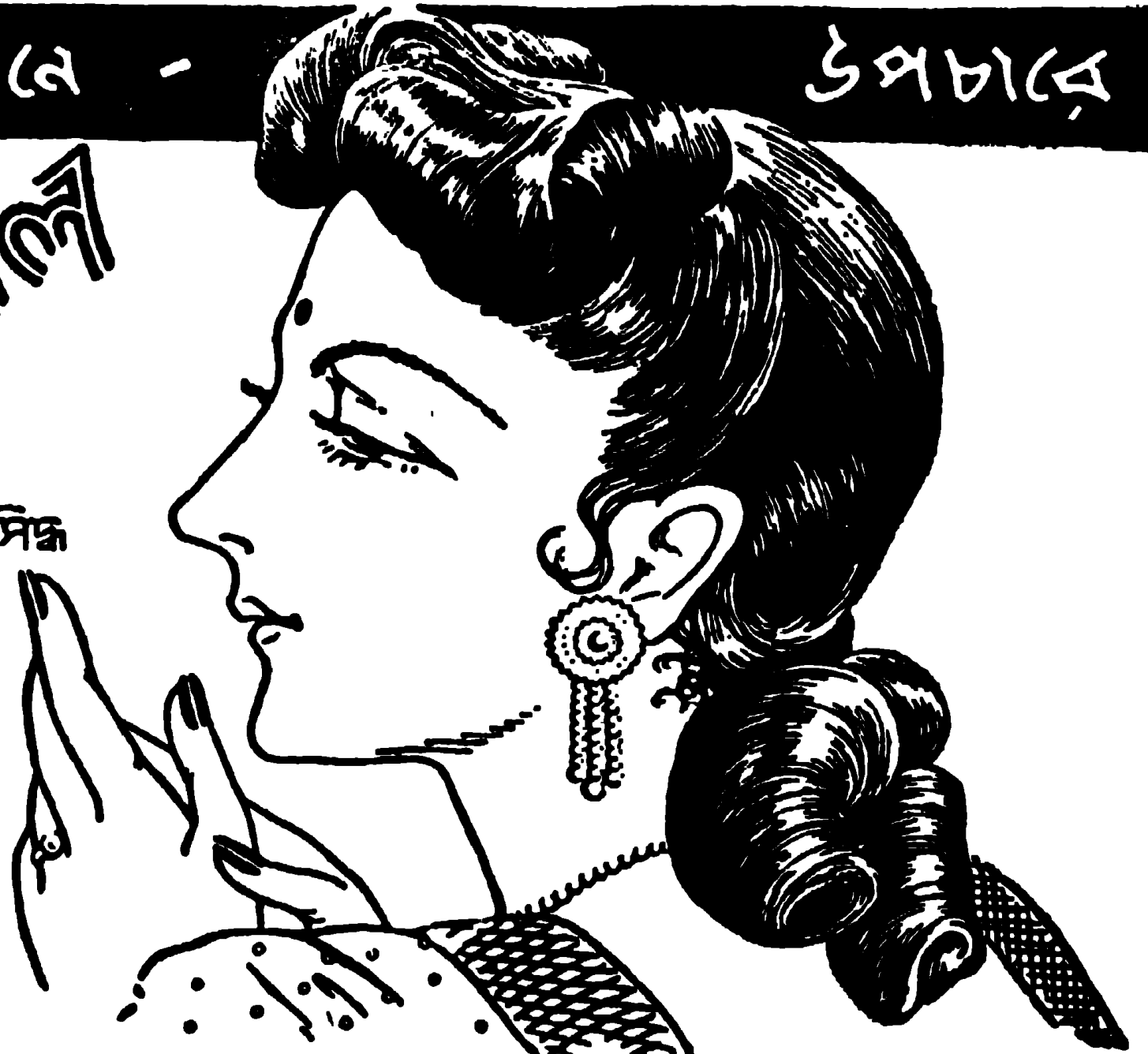
অলকাদেবী (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা)

আপনাদের রূপ-মঞ্চ বেরুতে এত দেরী হয় যে, আমার আর ধৈর্য থাকে না। নূতন রূপ-মঞ্চের অপেক্ষায় দিন গুণি। শ্রীলেখা দেবী কি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিলেন? আমার একটা অভিযোগ আছে, জানি না আমার মতের সংগে একমত হবেন কিনা। আজকাল অনেক বই মনের মত হয় না। কি রকম যেন একটা জগাখিঁচুড়ী পাকিয়ে যায় ও এমন অস্বাভাবিক, যার মানে হয় না। এর কারণটা কি বলতে পারেন। এমন বইও আছে যা সত্যি ভাল অথচ এমন সব আর্টিষ্ট আছেন তাঁদের অভিনয়ের দৌড় এতবেশী যে, ভাল বইটাও খারাপ হ'য়ে যায়। এবিষয়ে ডিরেক্টারদের দোষ। আর্টিষ্ট নতুন বলে হয়ত অভিনয় বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা কম। যাতে অভিনয় বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা জন্মে সেদিকে ডিরেক্টারদের লক্ষ্য রাখা উচিত। নতুনকে যখন নামিয়েছেন তখন তাদের ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শুধু নতুন মুখ দেখালেইত হবে না, তার সংগে চাই তাঁর অভিনয় করবার ক্ষমতা। ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলেই তাঁদের এই অবস্থা হয়--ফলে তাঁদের ভবিষ্যতে উন্নতির আশা থাকে না। এমনও অনেক আর্টিষ্ট আছেন, যাঁদের ভিতরে সত্যি অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে। তাঁরা যদি কোন ভাল ডিরেক্টারের কাছে শিক্ষা পান, ভবিষ্যতে হয়ত তাঁরা অনেককে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। আমার ত এই বিশ্বাস। এ বিষয়ে আপনার মত জানালে বিশেষ বাধিত হব। আমাদের বাংলা দেশে এমন সব ডিরেক্টরদের ব্যাপার যে, তাঁরা যাকে বড় করবার ইচ্ছা করবেন। আর যাঁরা পেছনে পড়ে আছেন, তাঁদের দিকে ডিরেক্টরদের লক্ষ্যই নেই। যদি বা দয়া করে কৃপাদৃষ্টি দেনত আসলে কিন্তু বড় করবার চেষ্টাও করেন না।

আমি এর আগে আপনার লেখা 'গ্রেটাগার্বো' পড়েছি। সত্য আমার খুব ভাল লেগেছে এবং এর মধ্যে অনেক কিছু শেখবার আছে। ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে দয়া করে এই ধরণের বই বার করবেন এই আমার অনুরোধ। কেননা, চিত্রজগতের অনেক কিছুই এই ধরনের বই'র মারফত শেখা যায় এবং ভাল আর্টিষ্ট হতে গেলে ঐ ধরণের বই পড়া খুব দরকার। 'সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ' বেরুতে কত দেরী। উপসংহারে জয়হিন্দ বলে বিদায় নিলাম।

●● ছাপাখানার দিক থেকে আমরা এমনি একটার পর একটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি যে, চেষ্টা করেও আপনাদের এই অভিযোগ থেকে মুক্ত হ'তে পাচ্ছি না। সত্যি, আপনাদের ধৈর্যশীলতার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন—রূপ-মঞ্চের কাজের জন্য আমাদের কর্মীদের তরফ থেকে বিন্দুমাত্রও গাফিলতি নেই। রূপ-মঞ্চ শুধু নিছক একটা পত্রিকা নয়—রূপ-মঞ্চ আমাদের 'সাধনা'। সমস্ত অনুযোগ-অভিযোগ থেকে মুক্ত করে নিখুঁত রূপে যেদিন আপনাদের কাছে রূপ-মঞ্চকে উপস্থাপিত করতে পারবো, সেদিনই আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত এই সাধনার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা—অনুরাগ ও ক্ষমা আমাদের গন্তব্যে পৌছতে সাহায্য করছে—আশা করি যতদিন আমাদের মাঝে আমাদের আদর্শ বেঁচে থাকবে—আপনারা এই ক্ষমা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়ে যাবেন। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা উৎসর্গীকৃত—তার পৃষ্ঠপোষকতায়—চিরদিন আপনাদের সজাগ দৃষ্টি কামনা করি। শ্রীলেখা চিত্র জগত থেকে বিদায় না নিলেও অন্ততঃ সাময়িক ভাবে যে অবসর গ্রহণ করেছেন—একথা বলতে হবে।

নূতন শিল্পীদের পক্ষ নিয়ে আমাদের পরিচালক গোষ্ঠীর

বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন—পুরোপুরি না হ'লেও আমি এই অভিযোগের সংগে একমত। সত্যি, আমরা দর্শকেরা শুধু নতুন-মুখ দেখেই খুশী হবো না—যা প্রতি চিত্রে এক একটীকে এনে দর্শকদের সামনে হাজির করলেও নতুনের সন্ধানী বলে সেই পরিচালককে বাহবা দেবো না। পুরোন শিল্পীদের শুধু মুখই আমাদের মনকে বিষিয়ে তুলছে না, তাঁদের অভিনয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একঘেয়েমীর ছাপ রয়েছে বলে আমাদের মনে অরুচী ধরেছে। কিন্তু একথা বলতে এই বোঝায় না যে, পুরোন শিল্পীরা অভিনয় দক্ষতা থেকে বঞ্চিত। তাই, নতুন যাঁরা আসবেন, অভিনয় দক্ষতা নিয়েই আসা চাই। যে পরিচালকরা নতুনদের উপস্থিত করবেন—উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই করবেন। আমরা সেই নতুনদেরই চাই। কিন্তু আমাদের পরিচালক বা কর্তৃপক্ষ স্থানীয়-দের সেদিকে মোটেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা নতুন, নিছক নতুনকে উপহার দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ বলে আমাদের কাছ থেকে বাহবা পেতে চান। 'নতুনে'র প্রতি তাঁদের যে নৈতিক দায়িত্ব আছে একথা তাঁরা ভুলে যান। তাই নতুনেরা আমাদের খুশী করতে পারেন না। এর মধ্যে যাঁদের নেহাৎ আগ্রহ এবং অধ্যবসায় আছে—তাঁরা নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠা ও যশের আশায় কিছুটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেন—বাকী ঐ ভীড়ের দৃশ্যে ভীড়তে ভীড়তে চিত্রজগত থেকেই সরে পড়েন। যাঁরা থেকে গেলেন, না দেখে ঢিলমারার মতই তাঁরা সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় স্থান করে নেন। তাই, পরবর্তী শিল্প-জীবনে যে নতুনেরা সাফল্য অর্জন করেন, পরিচালক বা কর্তৃপক্ষদের কাছে তাঁদের তেমনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা থাকে না। আমার এই কথাটী বলবার উদ্দেশ্য হলো—অনেক সময় অনেক পরিচালক বা কর্তৃপক্ষরা এই বলে অভিযোগ করেন নতুনদের সম্পর্কে যে, তাঁরা প্রথমে সুযোগ দিলেন অথচ একটা ছবির পরই নতুন শিল্পীটী আর তাঁদের কোন বাধ্য-বাধকতা মানতে চান না। সত্যিই যদি কোন পরিচালক বা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কেউ কোন নতুনকে সুযোগ দিয়ে যত্ন ও আন্তরিকতার সংগে তাঁকে গড়ে তোলেন—অন্ততঃ তাঁদের কাছে বাধ্যবাধকতায় থাকতে অমত প্রকাশ করবেন এমন কৃতঘ্ন কেউ হ'তে পারেন না। আপনার অভিযোগের সংগে যেটুকু আমার অমিল তা হচ্ছে, আপনার চিঠি

পড়ে মনে হয় শিল্পী হবার সম্ভাবনা নিয়ে বহু নতুন বসে আছেন, আমার আপত্তি এইখানটাতেই। পরিচালক বা কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে কিছু বলছিনা, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছি, নতুন আছেন অনেকেই—চলচ্চিত্রে ঝিলিকমারার ঝোঁক বহু যুবক এবং যুবতীর মাঝে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তাদের বেশীর ভাগের মাঝে প্রতিভার সন্ধান মেলেনা। প্রতিভা হয়ত দু'টী করে ব্রীড়ানত মুখে অপেক্ষায় বসে আছেন—তাঁকে খুঁচিয়ে নিয়ে আসতে হবে। পরিচালকদের মেজাজ মাফিক যাকে খুশী তাঁরা বড় করলেন—যাঁকে খুশী ছোট করলেন—এই মেজাজ-মাফিক চলার দিন চলে গেছে। ছায়া-ছবির যাঁরা ভাগ্য নিয়ন্তা, যাঁরা ছায়াছবির বিচারক - পূর্বের চেয়ে আজ তাঁরা অনেকখানি চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। আজকে যদি কোন শিল্পীকে বড় হ'তে হয়—আজ পরিচালক বা কর্তৃপক্ষের মেজাজকে খুশী করলে চলবে না—তাঁর খুশী করতে হবে নব চেতনালব্ধ দর্শক মনকে।

গ্রেটাগার্বো আপনার ভাল লেগেছে—এজন্য ধন্যবাদ। গ্রেটাগার্বোর মত শিল্পীকেও কত বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে পথ করে নিতে হ'য়েছিল—আমাদের চিত্রজগতের ভাবী গ্রেটাগার্বোদের সামনে সেই আদর্শ উপস্থাপিত করবার জন্যই গ্রেটা গার্বোর জীবনী লিখেছিলাম। যদি একজন শিল্পীর জীবনেও গ্রেটা গার্বোর জীবনীটী প্রেরণা জাগাতে পারে, আমার পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করবো। ছাপাখানার দিক থেকে আমরা একটু নিশ্চিন্ত হলেই এই ধরনের বই আপনাদের উপহার দিতে চেষ্টা করবো। 'সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ' অর্দ্ধেকের বেশী ছাপা হয়ে পড়ে আছে। বর্তমান বাংলা বছরের ভিতরই সেটুকু শেষ করতে পারবো বলে আশা করছি। নিজে হিন্দু বলেই নয়—মুসলমানও যদি হোতাম—হিন্দু মুসলমানের গভীর অনুরাগের স্মৃতি নিয়ে যে ধ্বনি আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে—তাই দিয়ে আপনাকে প্রত্যভিনন্দন জানাতুম এবং বর্তমানেও জানাচ্ছি।

অচিন্ত্য বসু (বগুড়া)

(১) বাংলা ছবির পুরুষ তারকার মধ্যে অভিনয়ে বর্তমানে কে শ্রেষ্ঠ ও কোন বইতে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন? ছবি বিশ্বাসকে বড় মার বইতে দেখা যায়না কেন? (২) বাংলা ছবিতে সব চেয়ে সুন্দর অভিনেতা ও অভিনেত্রী কে?

●● ( ) শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস। কোন বইতেই তিনি আমাদের নিরাশ করেন না। তবে 'দুই পুরুষের' অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছে। (২) এর উত্তর এঁরাই দিতে পারেন। হয়ত কোন সুযোগ আসেনি। (২) বর্তমানে যাঁরা আছেন, তার ভিতর অসিতবরণ এবং সুমিত্রার কথাই বলতে হয়। তবে মনে হয় অভিনেতার দিক দিয়ে শীঘ্রই কয়েকজন প্রিয়দর্শনের সাক্ষাৎ আমরা পাবো।

জিয়াউল ইসলাম (বরিশাল)

(১) রাগিনী দেবী, অনুরাধা এবং বিব্ব এই তিনজনকেই আমি মুসলিম বলে জানতে পেরেছি—আচ্ছা এদের নাম বদলানোর পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? (২) রমলা দেবী নাকি ইহুদীর মেয়ে, একথা কী সত্য? (৩) পাহাড়ী সান্যাল বর্তমানে কী করেন? (৪) বন্দিতা এবং গৃহলক্ষ্মী এই দুইটী ছবিকে আপনি কোথায় স্থান দিবেন?

●● (১) এরা সকলেই মুসলমান কিনা আমি সঠিক বলতে পারি না—তাহলেও আপনি যে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দিতে পারবো। মুসলমান শিল্পী যাঁরা চিত্র ও নাট্যজগতে এসে নাম পালটান—তাঁদের কোন মতেই আমি সমর্থন করতে পারবো না—'সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ' এবং মিশরীয় নাট্য-মঞ্চের ইতিহাস নিয়ে ঘাটতে বসলে সহজেই ধরা পড়ে, প্রথম দিকে মুসলিম শিল্পীগণ তাঁদের মুসলীম আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা কতখানি বাধা পেয়েছেন, এমন কী তাঁদের গোঁড়ামীর জন্য অনেককে আত্মাহুতিও দিতে হ'য়েছে। আমাদের এখানেও প্রথম দিকে সেই গোঁড়ামীর জন্যই হয়ত অনেকে নাম পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু আজ মনে হয় আমাদের মুসলীম ভাইদের ততখানি গোঁড়ামী নেই। যদি থাকেও সে ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে যাঁরা সবল ভাবে দাঁড়াতে পারবেন, তাঁদেরই

আমরা অভিনন্দন জানাবো। অতীতে এই গোড়ামীর জন্যও অনেকে নাম পালটাতেন। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতায় আবার অনেক মুসলমান নাম পরিবর্তন করে চিত্রজগতে পা বাড়াচ্ছেন—যেহেতু বেশীর ভাগ দর্শক হিন্দু—তাদের খুশী করবার হীন ইচ্ছা ছাড়া এই নাম পরিবর্তনের অন্য কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। যদি মূল নামের পরিবর্তন ক'রে কেউ ছদ্মনাম গ্রহণ করতে চান, আমাদের আপত্তি নেই, তবে সে ক্ষেত্রে যিনি যে ধর্মের সেই ধর্মকে অনুসরণ করেই ছদ্মনাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) হ্যাঁ। (৩) বর্তমানে বম্বেতে বিভিন্ন চিত্রে অভিনয় করছেন। তবে তাঁকে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের আগামী বাংলা চিত্র 'প্রিয়তমা'য় দেখতে পাবেন। (৪) তৃতীয় স্তরের নীচে যদি কোন স্থান থাকে।

মায়াশীল (মদন দত্ত লেন, কলিকাতা)

(১) রেডিওর আসরে এখন পর্যন্তও পঙ্কজ বাবুর গলা শুনতে পাইনা কেন? এখন কী রেডিওর গোলযোগ মেটেনি, না পঙ্কজ বাবু রেডিওতে আসবেন না? (২) চিত্রাভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে নাম বদলাইয়া থাকেন কেন? যেমন ধরুন শ্রীলেখা দেবী, শকুন্তলা রায় ইত্যাদি এবং আপনারা এদের নবাগতা কেন বলেন?

●● (১) ইতিমধ্যেই বেতার মারফৎ পঙ্কজ বাবুর গলা নিশ্চয়ই শুনেছেন। বাইরের গোলযোগ মিটেছে বটে, ভিতরের গোলযোগ যদি মিটে যেত—আমাদের অর্থাৎ শ্রোতাদের তাহলেত কোন অভিযোগই থাকতো না। (২) নিজেদের প্রতিভার জোরে যারা চলতে পারেন না, তারা নামের জোরে চলতে চান। তাই একবার একটা নাম অচল হ'লে আবার নতুন নাম নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন। আমরা কোনদিনই এঁদের নবাগতাদের ভিতর ধরি না। যদি কোথাও উল্লেখ করে থাকি—জানবেন তা ভুলবশতঃই এবং সেজন্য ক্ষমা করবেন।

জগদীশ (সদানন্দ মজুমদার লেন, হাওড়া)

●● আপনি চিত্রজগতের কয়েকজন শিল্পী, পরিচালক ও অন্যান্যদের ঠিকানা চেয়েছেন—অনেকের ঠিকানা আমাদের জানা নেই—যাঁদের আছে—তাঁরা ঠিকানা প্রকাশ করতে নিষেধ করেন বলেই ঠিকানা দিতে পারলুম না—আশা করি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমার সংগে রবিবার বাদে যে কোন দিন বেলা ১০টা থেকে ১১টার ভিতর ৩০, গ্রে ষ্ট্রীটের ঠিকানায় দেখা করতে পারবেন।

প্রসাদ কুমার বোস (প্যারীমোহন সুর লেন, কলি)

বন্দেমাতরম কথা-চিত্রের সুর-শিল্পী সুকৃতি সেন পুরুষ না মহিলা—এই প্রশ্নটি নিয়ে এক বন্ধুর সংগে বাজী রেখেছি। আমি বলেছি পুরুষ—হেরেছি না জিতেছি।

●● আপনারই জিত হ'য়েছে।

উমানন্দ ভাদুড়ী (চীফ ইঞ্জিনীয়ার বি, এ, রেলওয়ের অফিস, কলিকাতা)

'বাসে'র অপেক্ষায় কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ফুট পাথে রকমারি বই সাজিয়ে হকার বসে আছে। নানা মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক পত্রিকার পাঁচ মেশালী মেলা। তার ভিতর সর্বাগ্রে যে পত্রিকাখানা দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সেটা আপনাদেরই রূপ-মঞ্চ। তৎক্ষনাৎ একখানি কিনে বাসে উঠলাম। ডবল ডেকার বাসের ওপরের ডেকের এক প্রান্তে একটু জায়গা করে নিয়ে বই খানার পাতা ওলটাতে লাগলাম—কখন যে বই-এর ভেতর তলিয়ে গিয়েছিলাম খেয়ালই ছিল না। কালীঘাট বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌছবার পর মনে পড়লো আমার গন্তব্য স্থল পূর্ণ থিয়েটার। ক্ষুণ্ণমনে পথে এসে দাঁড়ালাম। নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলাম বলে এতটুকু দুঃখিত হইনি। ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম পত্রিকাখানার পাঠ তখনকার মত অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হওয়ার জন্য।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বোসার্টের 'প্রিয়তমা' চিত্রে মলিনা ও মাষ্টার মহারাজ

বাস্তবিক, রঙ্গ-মঞ্চ এবং পর্দা সম্বন্ধে এমন তথ্য বহুল নিরপেক্ষ পত্রিকা এর আগে পড়েছি বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ আপনাদের প্রশ্নোত্তর ও সমালোচনা বিভাগ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হ'তে দেখলাম। তাতে মন খুশীতে ভরে উঠেছে। পাঠকের অগণিত প্রশ্নের উত্তর যে ধৈর্য ও সহানুভূতির সংগে দেওয়া হয়, তারও প্রসংশা না করে পারা যায় না। এর সার্বজনীনতাও সমভাবে প্রশংসার যোগ্য। চিত্র এবং নাটকের সমালোচনাতেও একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে চোখে পড়লো যে, কোন চিত্র বা নাটকের শুধু কলঙ্কটুকুই আপনাদের চিত্র বা নাট্য সমালোচকের চোখে পড়েনা—তার ভাল দিকটাও বেশ ভাল ভাবেই প্রকাশ করা হয়। তবে চিত্র সমালোচনার বেলায় গল্প এবং অভিনয়ের সংগে সংগে ফটোগ্রাফী ও সাউণ্ড সম্বন্ধে আরো একটু বিশদ আলোচনা থাকা দরকার। আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ চিত্র সমালোচকই চিত্রের ঐ দু'টি বিভাগ সম্বন্ধে ছোট্ট দুটো চারটে মন্তব্য যেমন—"ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং মন্দ নয়" ছাড়া আর কিছুই বলেন না। এতে আলোচ্য চিত্রের অনেক কথাই না বলা থেকে যায়। একথাটা আপনাদের চিত্রসমালোচক উপলব্ধি করবেন আশা করি। যাই হোক, মঞ্চ ও পর্দা সম্বন্ধে সুসম্পাদিত তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য একখানা পত্রিকার বহুদিনকার অভাব রূপ-মঞ্চ পূর্ণ করেছে বলে খুবই খুশী হ'য়েছি। আপনাদের যাত্রা হোক সহজ, আপনাদের সত্য, শিব সুন্দরের সাধনা জয় যুক্ত হোক! এই প্রার্থনা করে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি।

● ● প্রথম দর্শনে রূপ-মঞ্চ আপনাকে খুশী করতে পেরেছে—প্রথম পরিচয়ে রূপ-মঞ্চ আপনার মন জয় করতে পেরেছে—এর চেয়ে খুশীর খবর রূপ-মঞ্চ কর্মীদের কাছে আর কিছুই বড় নেই। আশা করি, এমনি ভাবে শুধু আপনাকেই নয়, আরো শতজনের অন্তর জয় করে রূপ-মঞ্চ আপনাদের সবাকার অন্তরে বেঁচে থাকবে। আপনার চিঠির শেষের দিকে সমালোচনা সম্পর্কে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন—সর্বান্তকরণে তা মেনে নি। সত্যই, চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ,সংগীত প্রভৃতি বিষয় গুলি আমাদের সমালোচকেরা এড়িয়ে যান। অপরাপর পত্র পত্রিকার কথা বলতে পারিনা—আমরা আমাদের নিজেদের কথাই বলছি—তা'হলে অন্ততঃ আপনার মনে এ ধারণা হবে যে, আমরা এ বিষয়ে অবহিত এবং এই অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করছি। আমাদের সমালোচক গোষ্ঠীতে যাঁরা আছেন—বিজ্ঞান-বাণিজ্য এবং শিল্প প্রভৃতি বিষয়েই তাঁরা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। কিন্তু সকলেরই চিত্রশিল্প সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান, তা পুঁথিগত বিদ্যা এবং দর্শক ও সাহিত্যিক হিসাবে যেটুকু

অভিজ্ঞতা জন্মেছে তা থেকে অর্জিত। হাতে কলমে চিত্র-শিল্পের এই বিশেষ বিভাগগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই—একথা বলতে একটুকুও আমরা লজ্জাবোধ করি না। তাই, রূপ-মঞ্চের পাতায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভিন্ন প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করেছি—কিন্তু সমালোচনার সময় তাঁদের সুযোগ গ্রহণ করতে এই জন্য পারিনি—যদি তাঁরা নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ না করেন—অথচ যেহেতু আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই—তাঁদেরই উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই বা কী হবে সেক্ষেত্রে! তাই, সাধারণ দর্শকের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের সমালোচকেরা চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ এবং সংগীত নিয়ে বিচার করে থাকেন—এইজন্য বিস্তারীত আলোচনার ভিতর তাঁরা না যেয়ে এড়িয়ে যান। আমাদের সমালোচক গোষ্ঠী যাতে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, সে বিষয়ে আমরা যত্নপর হচ্ছি এবং তারপর আপনাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হ'তে পারবো বলে আশা করছি।

রতন সেন, দুলাল ভট্টাচার্য ও মণ্টি সেন
(রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) কয়েক বছর আগে প্রায় প্রত্যেক চিত্রদর্শকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষামূলক ছবি আরোরা ফিল্মের 'হাতে খড়ি' ও 'অন্ধ নাচার' দেখে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন—ছবিগুলি পরিচালনা করেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল। সেই সময়ে আমরা কয়েকটা কাগজে দেখেছিলাম যে, এই ধরণের ছোটদের উপযোগী ছবি আরও তোলা হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ধরণের আর কোন ছবি দেখার সৌভাগ্য হ'ল না। এ সম্বন্ধে আমরা সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত পালের কাছে অনেক কিছুই আশা করি! এ বিষয়ে আপনারা কী বলেন? এই ধরণের ছবি তোলা কি আমাদের দেশে সম্ভব নয়, দেশের প্রযোজকেরা এ বিষয়ে নীরব কেন? (২) পূর্বের ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড কি কোন ছবি বর্তমানে তুলছেন না—এ বিষয়ে অন্তবর্তী সরকার কি কোন ব্যবস্থা করেছেন। (৩) সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' কি অঞ্জনগড় নাম নিয়ে চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে?

● ● (১) এ বিষয়ে শুধু যে নিরঞ্জন পালেরই দায়িত্ব রয়েছে তা নয়—এ দায়িত্ব আমাদের চিত্র জগতের সমস্ত রথী-মহারথীদেরই রয়েছে বলে আমি মনে করি। চিত্রশিল্পের সেবক বলে যদি নিজেদের তাঁরা মনে করেন—আমাদের ভবিষ্যত সমাজ গঠনের দায়িত্ব তাঁরা কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না—ভবিষ্যত দেশ বা সমাজ বলতে দেশের শিশুদেরই বোঝায়। চিত্রের মারফৎ শিশুমন গঠনের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। চিত্রশিল্পের দায়িত্ব সম্পর্কে যাঁরা সচেতন—শুধু আমরাই না—তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষামূলক এবং শিশুদের উপযোগী চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিত্র-শিল্পের ভাগ্য নিয়ে আজ যাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন—তাঁরা এ বিষয়ে একটুকুও অবহিত নন। তাই আরো হয়ত কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে—অপেক্ষা করতে হবে সেইদিন পর্যন্ত—যেদিন আপনাদের, আমাদের সকলের মতামত—সকলের ভালমন্দ নিয়ন্ত্রণ করবো—আমাদেরই দেশের—আমাদেরই ভিতরের—আপনি আমি। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত, অত্যাচারীত ও শোষিত হ'য়ে আসছি। —এতদিন যখন কেটেছে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন। (২) না। ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড বম্বের মিঃ প্যাটেল নামক একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং চিত্র ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি এই সংবাদ চিত্রগুলি গ্রহণ করছেন। মধ্যকালীন জাতীয় সরকার এখন অবধিও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। (৩) হ্যাঁ। ফসিল গল্পটীকে কেন্দ্র করে যদিও অঞ্জনগড় গড়ে উঠছে—তবু চিত্রোপযোগী করে শ্রীযুক্ত ঘোষকে নূতন ভাবে লিখতে হ'য়েছে বৈকী?

সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য (কাঁচড়াপাড়া, আই, এ, হোস্টেল)

ইংরেজী গানের স্বরলিপি সমেত গানের বই কোথায় পাওয়া যাবে?

● ● ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানীর "দি নিউ মিউজিক্যাল এডুকেটর" বইখানি আপনি কিনতে পারেন। যে কোন বড় দোকানে পাবেন।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য (আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট)

(১) শৈলজানন্দের 'পাতাল পুরী' ছবিটি কোন সালের ? (২) বন্ধনের 'রাম', নয়াসংসারের ভোলা ও বসন্তের 'বাবুল' যে হ'য়েছে সেই সুরেশ কে আর কোন ছবিতে দেখতে পাই না কেন ?

●● (১) শুধু 'পাতালপুরী' নয় সমস্ত বাংলা চিত্রগুলির মুক্তির তারিখ রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হচ্ছে। (২) বর্তমানে আমরাও কোন খবর রাখিনা।

অনাথ নাথ দে (নিমতলা, বাঁকুড়া)

(১) প্রমথেশ বড়ুয়া কি চিত্রজগত হইতে বিদায় নিলেন (২) ফিল্মে অভিনয় করতে হ'লে কি কি গুণ থাকা চাই (৩) ঘুস দিলে ফিল্মে অভিনয় করতে দেওয়া হয় কিনা ? (৪) বর্তমানে একটা ছবি তৈরী করতে কত খরচ হয় ?

●● (১) নিশ্চয়ই নয়। ইরাণ-কী-একরাত, অগ্রগামী এবং শুনেছি আরও দু'খানা ছবির তিনি পরিচালনা করছেন। (২) শিক্ষা, অভিনয়-ক্ষমতা, সুন্দর চেহারা, মাইকের উপযোগী কণ্ঠস্বর, সর্বোপরী ধৈর্য। (৩) ঠিক ঘুস না হলেও কিছু পয়সা খরচ করলে পথটা একটু সুগম হ'তে পারে। শুনছি অনেক যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় করলে তাঁরা সুযোগ দিয়ে থাকেন—এওত এক ধরণের ঘুস। তবে যাঁরা এই মনোবৃত্তি নিয়ে চিত্রশিল্পে নামতে চান—তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব আশাবাদী নই। (৪) ১ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ৩ লক্ষ বর্তমানে বাংলা ছবির অনুমানিক নির্মাণ-ব্যয়।

পরিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস (রামধাম, বসিরহাট)

(১) বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির চতুর্থ বার্ষিক জনপ্রিয়তা প্রতিযোগীতার ফলাফল কবে প্রকাশিত হইবে জানাবেন। (২) রূপ-মঞ্চে কোন বর্ষে কোন সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক লিখিত সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে সেই সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইবে কিনা এবং গেলে মূল্য কত ?

●● (১) গত নৈমিত্তিক-সংখ্যায় প্রতিযোগীতার ফল প্রকাশিত হ'য়েছে। আশা করি দেখে থাকবেন। (২) ঐ সংখ্যাগুলি পাওয়া সম্ভব নয় তাই বিস্তারীত জানিয়ে আর লাভ কী ?

আগামী ১লা বৈশাখের ভিতরই সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।

রবীন কুমার দাস (নতুন চটি, বাঁকুড়া)

(১) মেয়েদের আকর্ষণ শক্তি খুব প্রবল কেন ? (২) আমি অনেকদিন যাবৎ কুমার শচীনদেব বর্মনকে চিত্র জগতে নামিতে দেখি নাই।

●● (১) এ প্রশ্নটা আমাদের গণ্ডির ভিতর পড়ে না। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলে আবার কোন মেয়ের তরফ থেকেও পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে—পুরুষদের আকর্ষণ করবার শক্তি প্রবল কেন। তাই এ অবান্তর প্রশ্ন থাক। (২) শচীনদেব অভিনেতা নন। তিনি সংগীত-শিল্পী। দু' একটি ছবিতে হয়ত গানের দৃশ্যেই তাঁকে দেখেছেন। তিনি গান দিয়েই আমাদের মন ভুলিয়েছেন—তাঁর গান শুনেই তৃপ্ত থাকবেন।

দুর্গাদাস, অসিত ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
(সাধন মজুমদার লেন, হাওড়া)

(১) প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা চিত্র জগতে দেখিতে পাই না কেন ? তিনি কি চিত্র জগত হইতে বিদায় লইলেন ? (২) শুনিলাম ৺শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে—পথের দাবীতে কারা অভিনয় করিতেছেন এবং চিত্রখানিকে পরিচালনা করিতেছেন।

●● (১) গ্রহের ফেরে হয়ত তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। গ্রহ একটু কৃপাদৃষ্টি দিলেই তাঁর সাক্ষাৎ আবার মিলবে। 'রক্তরাখী' এবং 'যুগের দাবী'তে তাঁকে দেখতে পাবেন। (২) এসোসিয়েটেড প্রডিউসার্স লিঃ চিত্রখানি প্রযোজনা করছেন। শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন 'পথের দাবী'র পরিচালনা করছেন। দেবী মুখার্জি, জহর, সুমিত্রা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আরো অনেকেই অভিনয় করছেন।

মহম্মদ ইয়াকুব আলী (শম্ভু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা)

(১) আমি একজন সুদর্শন তরুণ। অভিনয় সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে—চিত্রজগতে প্রবেশ করিতে চাই। আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। (২) প্রতিমা দাশগুপ্তা বর্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করিতেছেন!

●● (১) যে কোন দিন ১০।১২টার ভিতর ৩০, গ্রে ষ্ট্রীটে আমার সংগে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে কথা বলতে পারেন। (২) রাত্রি ছবিতে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার, রেখাদেবী, সানন্দা দেবী (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা)

●● আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে দেরী হ'য়ে গেল। ক্ষমা করবেন।

রঘুনাথ মুখার্জি, রামসুন্দর পাত্র (শালবনি বাঁকুড়া)

সর্বাগ্রে আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। রূপ-মঞ্চের একনিষ্ঠ পাঠক, আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বসন্ত কুমার মণ্ডল গত ২৮ শে কার্তিক, মাত্র ২০ বৎসর বয়সে পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে কাঁদাইয়া হঠাৎ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আপনি এবং রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকারা তাঁর আত্মার শুভ কামনা করিবেন আশা করি।

●● আপনাদের চিঠি যে দুঃসংবাদ ব'য়ে এনেছে, তাতে খুবই মর্মাহত হলুম। মানুষ মরণশীল জানি—কিন্তু যে ফুল ফুটবারও অবকাশ পেল না, তার বিয়োগব্যথায় আমিই বা আপনাদের কি সান্ত্বনা দেবো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মৃতের আত্মা শান্তিলাভ করুক—আমাদের এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে এই নিদারুণ শোক সহ্য করবার ক্ষমতা দিন তিনি। রূপ-মঞ্চের কর্মী এবং তার অগণিত পাঠকসমাজের তরফ থেকে রূপ-মঞ্চ আমাদের সমবেদনা ও অনুশোচনার বাণী বয়ে নিয়ে যাক আপনাদের কাছে।

সতীদেবী মুখোপাধ্যায় (মকাই বাড়ী, কার্শিয়াং)

আচ্ছা পাঠকবর্গের (পাঠিকাদের নয়) দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আপনারা যে ছবি গুলি ছাপেন, সেগুলি কি ছাপতে বাধ্য হন—না স্ব-ইচ্ছায় ছাপেন কাটতি হবার জন্য? যদি স্ব-ইচ্ছায় ছাপেন তাহ'লে আমি আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো, ঐ বিশেষ ধরণের ছবি গুলি না ছাপতে। কারণ, ও গুলিতে বিকৃত রুচিরই পরিচয় পাই আমরা। আধুনিক যুগের মেয়েরা হয়তো আমার কথা স্বীকার করবেন না। কেননা তাঁরা এখন সিনেমায় অভিনয় করাটাই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেন। তাই, আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করবো, যদি ভদ্র ঘরের মেয়েরা এই ভাবে একে একে সিনেমায় অভিনয় করতে সুরু করেন তবে যাদের এটা পেশা বা একমাত্র জীবিকা তাদের উপায় কি হ'বে? প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবেন না।

●● ছবিগুলি কোন কোন সময় আমাদের নিজে-

দের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছাপতে হয়। সমালোচনার সময় আমরা কোন বন্ধুবান্ধবের কথাতেই কর্ণপাত করি না— কিন্তু প্রচার কার্যের সময় চিত্রজগতের অনেক বন্ধুবান্ধবদের কথা রাখতে হয়। তাই, অনুরোধে অনেক সময় আমাদের ঢেকি গিলতে হয়। যে ছবি খানি সম্পর্কে আপনি অভিযোগ এনেছেন—এ বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম—কিন্তু ঐ শিল্পীটীর আর এমন কোন ছবি ছিল না যে, তাই প্রকাশ করবো—তাছাড়া অন্য ছবির জন্য অপেক্ষা করবার মত সময়ও আমাদের হাতে ছিল না। আপনি যে এবিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করবো। আপনার চিঠির দ্বিতীয়ার্ধে যে বিষয়ের অবতাড়না করেছেন, তার উত্তর দিতে গেলে অনেক কিছুই আমাকে বলতে হয়। অত বিস্তারীতে বর্তমানে যেতে পারবো না বলে সংক্ষেপেই দু'চারটা কথা বলছি। প্রত্যেক কাজেরই একটা মর্যাদা আছে—যিনি যে কাজ করেন তিনি সেই কাজের মর্যাদা সম্পর্কে যদি সচেতন থাকেন—তবে অপরের কাজের চেয়ে তার কাজটা কোন অংশেই ছোট হয় না। মেথর যে কাজ করে সে সম্পর্কে তার নিজের যদি 'Dignity of Labour'. থাকতো—তাহ'লে তাকে কেউ অবহেলা করতো না। মেথরের নিজেরই বিশ্বাস যে, সে অতি ঘৃণ্যতম কাজ করছে। তাই সে সকলের ঘৃণার্হ। সে যদি দৃঢ়তার সংগে তার দাবী জানাতো—যদি বলতে পারতো, আমার কাজটা কোন অংশে ছোট কাজ নয়—তাহলে তাকে এতটা ঘৃণার চোখে কেউ দেখতে সাহস করতো না। অথচ বিচার করে দেখুন, একটা মেথর যে কাজ করে—আমাদের মত তথাকথিত ধনীবাবুদের কাজকর্ম থেকে তা সত্যিই মহৎ এবং বেশী প্রয়োজনীয়। আজ চিত্র-জগতে ভদ্রবংশীয়রা প্রবেশ করে যখন বলছেন, চিত্রে অভিনয় করাটা কোনমতেই নিন্দনীয় নয়—কোনরকম মর্যাদা হানীকর নয়—আপনাদের কানে শুনতে ভাল লাগছে না। প্রথম থেকেই যাঁরা চিত্র জগতে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁরা যদি বলতেন যে, চিত্রে অভিনয় করা মর্যাদা হানীকর নয়, এতদিন আপনাদের তা গা-সওয়া হ'য়ে যেত। তাঁরা তা বলেন নি—নিজেদের দাবী জোর করে প্রতিষ্ঠা করেননি বলেই এতদিন সমাজের কাছ থেকে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করেছেন—আজ যাঁরা প্রবেশ করছেন—নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়েই প্রবেশ করছেন। আপনাদের তরফ থেকে এঁদের ধৃষ্টতার জন্য নিন্দা করতে পারেন, নাক সিঁটকোতে পারেন—আমাদের তরফ থেকে এঁদের তারিফ না করে পারি না। আজ যদি সত্যই কোন নবাগত-নবাগতা, কী আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতের পুরোন বন্ধুরা মনে করে থাকেন, অভিনয়-কলা কোন শিল্পকলা থেকেই নিকৃষ্ট নয়—একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী জওহরলাল বা বিজয়লক্ষীর চেয়ে দেশের কাছে কম প্রয়োজনীয় নন—কর্মে এবং চিন্তায় তাঁরা যদি এর পরিচয় দেন—আমরা যারা চিত্র ও নাট্য-জগতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই—তারা তাঁদের এই স্পর্ধার জন্য যে অভিনন্দন জানাবো—জওহরলাল কী বিজয়লক্ষীর অভিনন্দনের চেয়ে তার মর্যাদা কোন অংশে খাটো হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কথাই বলছি—চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের পত্রিকার সম্পাদনার

তরুণ নবাগত শিল্পী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

যখন তার নিলাম—আর্থিক জীবনের স্থায়ী আসন থেকে যখন নিশ্চয়তার মাঝে পা বাড়ালাম, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নাসিকা কুঞ্চন না করে কথা বলেন নি—কিন্তু আমি এবং আমার সহকর্মীরা নিজেদের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সব সময় সচেতন ছিলাম—আছিও। সব সময়ই আমাদের মনে এই চিন্তাই ছিল—আমরা যে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি—লোকের চোখে তা আবর্জনা-ঘাটা হলেও—আমাদের চোখে তা জাতির অন্যতম মহত্তর কার্যই এবং এই আবর্জনা থেকে সত্যিকারের মাণিক যেদিন বেড়িয়ে পড়বে—জাতি সেদিন বুঝতে পারবে, সত্যই আমরা আবর্জনাই ঘেটেছি না মাণিক সন্ধানে আবর্জনা দূর করেছি। আধুনিকেরা বা আধুনিকারা যদি বুঝে থাকেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়—সেই বোধশক্তি নিয়ে চিত্রজগতে যদি তাঁদের মর্যাদা বহাল রেখে চলেন—

শ্রীমতী মলিনা এ, এল্ প্রডাকসনের আগামী বাংলা চিত্রের নায়িকার রূপ-সজ্জায়। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত মনি ঘোষের পরিচালনায় রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে।

তাঁরা যে একটা মহৎ কার্যই করছেন, আপনার মত আমি তা অস্বীকার করবো না।

আপনার চিঠির শেষের দিক লিখেছেন ভদ্রবংশীয়রা যদি চিত্রজগতে ভীড় করেন, অভদ্রবংশীয়রা কোথায় দাঁড়াবেন? এখানটাতেও আমার কিছু বলবার আছে। প্রথম কথা চিত্রশিল্পের বিস্তারের সংগে সংগে শিল্পীদের চাহিদা যে বৃদ্ধি পাবে একথা নিশ্চিত—তাই যাঁরা যাবেন—তাঁরা, যাঁরা আছেন তাঁদের বঞ্চিত না করেই নিজেদের স্থান করে নিতে পারবেন। তারপর এই ভদ্র এবং অভদ্র কথা দু'টা সম্পর্কেও আমার আপত্তি আছে। এই ভদ্র এবং অভদ্র স্বার্থান্বেষী মানুষেরই সৃষ্ট। সমাজবিবর্তনের সংগে সংগে পুরোন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যখন প্রগতিশীল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এই ভদ্র এবং অভদ্রের কোন তারতম্য থাকবে না।

দ্বারিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ)

(১) এই কয়টা বই পর পর সাজিয়ে দিন: দেবদাস, উদয়ের-পথে, সংগ্রাম, মানে না মানা, বন্দেমাতরম, শান্তি, মাতৃহারা (২) বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী কে? (৩) যদি কোন অভিনয় পারদর্শী ব্যক্তি ছায়াচিত্রে অভিনয় করতে ইচ্ছা করেন এবং ফটো পাঠান তবে কি আপনি অনুগ্রহ করে তা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করবেন (৪) সহরে এবং গ্রামে 'সিনেমা' বাড়লে ঐ সকল স্থানের ভাল হবে না মন্দ হবে! (৫) বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর সুতরাং তাদের জন্য শিক্ষামূলক ছায়া চিত্র নির্মাণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

●● (১) এক একটা ছবি নিজ নিজ বিশেষত্বের জন্য আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছে। তাই দেবদাস, উদয়ের পথে, সংগ্রাম তিনটা ছবির ভিতর মানের স্তর বিভেদ করতে চাই না। 'মানে না মানা' আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। তার সে দাবীকেও অগ্রাহ্য করবো না। তার পরের ছবি গুলিকে সাজাতে চাই বন্দেমাতরম, শান্তি, মাতৃহারা এমনি ভাবে। (২) এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

খুবই কঠিন। দিন দিন চিত্র শিল্পের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সংগে সংগে গুণী শিল্পীর সংগেও আমাদের পরিচয় হচ্ছে। তাই এই 'শ্রেষ্ঠত্ব' কথাটী যদি আজ কেবলমাত্র একজন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে উল্লেখ করে বলি অপরাপরদের প্রতি অবিচার করা হবে না কি? (৩) নূতনদের জন্য রূপ-মঞ্চ এ বিষয়ে ইতি পূর্বেই ব্যবস্থা করেছে। অভিনয়েচ্ছুক কোন যুবক বা যুবতী যদি তাঁর ছবি রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করতে চান—তবে তাঁর বা তাঁদের ছবি, নাম, ঠিকানা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উচ্চতা প্রভৃতি উল্লেখ করে ১০৲ টাকা পঠিয়ে দিলেই ছবি যথাসময়ে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হবে। (৪) যেসব ছবি আমাদের ছায়াজগত বর্তমানে উপহার দিচ্ছেন—এই ছবি দেখিয়ে গ্রামবাসীদের কোন উপকারই হবে না—তাই অযথা দরিদ্র গ্রামবাসীদের শোষণ করবার পক্ষে কোনমতেই আমি সায় দেবো না। সত্যিই যদি যেরূপ উদ্দেশ্যমূলক ছবি দেখতে পাই, তখন প্রতি গ্রামে গ্রামে এক একটী প্রেক্ষাগৃহ গড়ে উঠলেও আমি আপত্তি করবো না—গ্রামের আর্থিক অবস্থা তখন যদি বৃদ্ধি না পায়, জাতীয় সরকারকে বিনা মূল্যে ঐ সব ছবি প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যদি দু'-একখানাও উদ্দেশ্যমূলক ছবি তৈরী হয়—ভ্রাম্যমান প্রদর্শক প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ের জন্যও গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমন করে বেড়ান—তাঁদের সহযোগীতা করতেও আমরা কুণ্ঠিত হবো না। (৫) আমার অভিমত আপনারই সপক্ষে। এ বিষয়ে শুধু আমারই নয়, কারোরই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

শ্রীকানন চট্টোপাধ্যায় (রেঙ্গুন)

আপনারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে তাঁদের জীবনী রূপ-মঞ্চে প্রকাশের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের তরফ থেকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন কী?

●● শুধু অনুরোধ নয়—আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁদের সংগে দেখা করে এ বিষয়ে অবহিত করে তুলছি।

শ্রীকার্তিক বসাক (বনগ্রাম রোড, ওয়ারী, ঢাকা)

আমার মনে বহুদিন যাবৎই একটা ছোট ইচ্ছা উঁকি মারিতেছিল—সে ইচ্ছাটী আর কিছুই নয় চিত্রজগতে ঢোকা। ভয় নাই অভিনেতা হইতে চাহিনা। সেইজন্ত আপনাকে বিরক্ত করিব না। আমার ইচ্ছা চিত্রগ্রহণ অথবা শব্দ-গ্রহণ বিভাগে প্রবেশ করা। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ শিক্ষানবীশ হইয়াই প্রবেশ করিতে চাই। কমের পক্ষে কি রকম পড়াশুনা থাকিলে উপরোক্ত দু'টী বিষয়ে যে কোন ষ্টুডিওতে ঢোকা যায়। কি ভাবে ঐ সমস্ত বিভাগগুলিতে ঢোকা যায়! এ বিষয়ে আপনারা কি রকম সাহায্য করিতে পারেন।

●● আপনার ইচ্ছাটা নিতান্ত ছোট নয়। অভিনেতা রূপে প্রবেশ করা কঠিন—শব্দগ্রহণ বা চিত্রগ্রহণ বিভাগে শিক্ষানবীশী রূপে প্রবেশ করা তার চেয়ে বহু অংশে কঠিন। প্রথম কথা এ বিষয়ে কোন শিক্ষাগার নেই। দ্বিতীয় কথা ষ্টুডিওর সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাতে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তারও একটা সীমা আছে। তৃতীয়তঃ অন্ততঃ বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কারোর এদিকে পা না দেওয়াই উচিত। কারণ, আমাদের চিত্রজগতকে ভবিষ্যতে যে উচ্চস্তরে আমরা দেখতে চাইছি—তাতে বর্তমান থেকেই আমাদের সতর্ক হ'য়ে থাকতে হবে। চিত্রজগতের ভবিষ্যৎ কর্মীবৃন্দ এমনকী বর্তমানে যারা 'কুলি' বলেও ষ্টুডিও মহলে অবহেলিত—তারাও যাতে শিক্ষার দাবী নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারেন, আমরা সেই স্বপ্নেই বিভোর। আর বিশেষ করে শব্দ-গ্রহণের কাজ করতে হ'লে বৈজ্ঞানিক-শিক্ষার একান্ত ভাবে প্রয়োজন। আপনি যদি অনুরূপ শিক্ষিত হন—তবে নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায় অথবা কালী ফিল্মস ষ্টুডিওর শ্রীযুক্ত যতীন দত্তের সংগে এ বিষয়ে পত্রালাপ করে দেখতে পারেন।

এম, হায়দার আলী ধীৎপুরী (পিচকা, রাঁচি, বিহার)

আমি আমার হিন্দুস্থানী সাথীদের কাছে অনেকদিন পূর্বে থেকেই রূপ-মঞ্চের প্রশংসা করে আসছি। আজ তাদের একজন প্রশ্ন করেছেন অশোককুমার হিন্দুস্থানী না বাঙ্গালী? তাঁরা বলছেন হিন্দুস্থানী আমি বলছি বাঙ্গালী।

●● আশোক কুমার বাঙ্গালী, নাম অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

শাস্তি (পাঠক পাড়া, বাঁকুড়া)

(১) সংগ্রাম ছবিটির মধ্যে রবিঠাকুরের চরিত্রটীর ছাপ দর্শকদের সামনে প্রতিফলিত করবার মূলে কি কোন উদ্দেশ্যে ছিল? (২) যাঁরা সাধারণত বাংলা ছবিতে নায়কের ভূমিকাতে অভিনয় করেন—তাঁদের বয়স লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন রকমে জোর করে তাঁদের যুবকে রূপান্তরীত করে নামান হয়। এর কারণ কি?

●● (১) ঐ চরিত্রটার যে কী উদ্দেশ্য ছিল তা কাহিনীকার বা পরিচালকই বলতে পারেন—হয়ত তাঁরা কোন কবি চরিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটুকু তাঁরা ভেবে দেখেন নি, কবি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে কবি-মনকে ফোটাতে হবে—বাহিক রূপকে নয়। রবীন্দ্রনাথের রূপ-সজ্জার অনুকরণকে আমরা নিন্দাই করেছি সংগ্রামের সমালোচনার সময়—দর্শক সাধারণেরও তাই করা উচিত। একে এক 'exploitation' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। (২) চরিত্রোপযোগী শিল্পী নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা নেই বলে—একদিন যাঁরা যুবকের ভূমিকায় হাততালি পেয়েছিলেন, তাদেরই নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাড়ি দেবার হীন বাসনার পরিচয় পাওয়া যায় বলে।

রাজা কুমার দাস (হালদার পাড়া লেন, শিবপুর হাওড়া)

আমি আপনার সম্পাদিত রূপ-মঞ্চ পত্রিকার পাঠক। আমি আপনার পত্রিকায় প্রায়ই দেখিতে পাই আপনারা অনেক নূতনকে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দেন। বহু সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয় করিয়াছি এবং তাহাতে যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছি। গত ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে আমি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য প্রবেশ করি। ছয়মাস যাবৎ রঙমহল কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধা না দেওয়ায় আমি রঙ্গ-মঞ্চ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। দেখিলাম গুণের আদর নাই। আমার অনুরোধ এই যে, আপনি যদি আমার মত শিল্পীকে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

●● যতদিন নূতনদের শিক্ষা দিবার জন্য কোন নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে না ওঠে—আপনাদের অর্থাৎ নূতনদের প্রবেশ পথ কোন মতেই সুগম হবে না। আমরা এক কাগজ মারফৎ প্রচার কার্য ছাড়া কিছুই করতে পারি না। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে নূতনদের জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করেছি আপনি তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই সুযোগ গ্রহণ করতে হলে আপনার ফটোসহ নাম, ঠিকানা, বয়স অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিস্তারীত লিখে আমাদের কার্যালয়ে ১০৲টাকা পাঠিয়ে দিলে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করতে পারি। এছাড়া বর্তমানে আর কোন সক্রিয় সহযোগীতা আমাদের করবার নেই।

দিলীপ কুমার রায় চৌধুরী (শাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

বড়ুয়া পরিচালিত এবং অভিনীত পরবর্তী বাংলা বই কি?

●● অগ্রগামী।

গুরুদয়াল চট্টোপাধ্যায় (রায় বাহাদুর রোড, বেহালা)

(১) কোন বই তোলার সময় পরিচালকেরা কি বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চলবার, কথা বলার, দাঁড়াবার প্রভৃতি Mood দেখিয়ে দেন? (২) আমার একবন্ধু গীতিকার রূপে সিনেমা জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন। এবিষয়ে তাঁকে কি করতে হবে? (৩) শ্রীমতী কাননিকা চট্টোপাধ্যায় (যাঁর গান আমরা গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনতে পাই) তিনিই কি শক্তির নায়িকা সিপ্রা দেবী?

●● (১) তাইত দেওয়া উচিত। তবে সব

সময় এই দেখিয়ে দেবার যোগ্যতা সব পরিচালকের ভিতর দেখা যায় না (২) কোন সংগীত-পরিচালকের সাহায্য নিতে হবে তাঁর। (৩) হ্যাঁ।

রেখা গোস্বামী (রামতনু বসু লেন, কলিকাতা)

সম্পাদকের দপ্তর বিভাগের যাঁরা প্রশ্ন করেন, তাঁদের যদি আপনি পত্রিকা মারফৎ জানাইয়া দেন যে, প্রত্যেক প্রশ্নের পূর্বে সংখ্যা দিতে হইবে এবং চারিটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে উত্তর দিবার সময় যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার নাম, ঠিকানা বা গ্রাহক সংখ্যার নীচে প্রশ্ন চারিটী লিখিয়া তার উত্তর দিতে পারেন। তাতে চিঠির অংশটী বাদ দেওয়া যায় এবং খানিকটা স্থান পাওয়ার জন্য বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

●● আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এতে প্রশ্নকারী ছাড়া অপর পাঠক পাঠিকাদের আগ্রহ কমে আসবে। তাছাড়া যে কোন পাঠক সম্পাদক সত্যিই ঠিক উত্তর দিলেন কি বেঠিক কিছু বলে ফেল্লেন, তা যাচাই করতে পারবেন না। এতে আপনাদের লাভের চেয়ে আমার লাভও অনেক। অর্থাৎ আমি কোন মতবাদকে আমার পাঠক সমাজের কাছে যাচাই করে নিতে পারি। তাছাড়া পাঠকদের ভিতর স্বাধীন চিন্তা শক্তি যেমনি গড়ে ওঠে তেমনি তাঁরা তা সাধারণের কাছে প্রকাশ করবারও সুযোগ পান। আপনার ১, ২, ৩, প্রভৃতি প্রশ্নগুলির উত্তর অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে পেয়ে থাকবেন।

অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলোনেলগঞ্জ, এলাহাবাদ)

●● আপনার অভিযোগ সম্পর্কে প্রভাতী ফিল্মের কর্তৃপক্ষের কানে আমি পৌছে দিয়েছি—তাঁরা উলটে আপনার ঘাড়ে অভিযোগ চাপালেন। ইতিমধ্যে ফটো ফিরে পেয়েছেন কিনা আমায় জানাবেন—তারপর আপনার চিঠি প্রকাশ করবো।

নিত্য গোপাল মৌলিক (নবাবগঞ্জ, ইছাপুর ২৪, পরগণা)

মমতাজ শান্তির ঠিকানা ও তিনি মুসলমান কি হিন্দু আমাকে জানাইলে বাধিত হবো।

●● মুসলমান। ঠিকানা আমাদের জানা নেই।

নিমাই দত্ত (প্রেম চাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● আপনার চিঠিখানা প্রকাশ করতে পারলুম না এই জন্য যে, তাতে অনেক পত্র-পত্রিকার নাম রয়েছে। কে কী রকম, তার বিচারক আপনারা—তাই অযথা পত্র-পত্রিকাগুলির নাম প্রকাশ করে আমাদের সম ধর্মীদের বিরাগভাজন হ'তে চাই না। 'বন্দেমাতরম' চিত্রখানির নাম গ্রহণে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন, আমি তার সংগে সম্পূর্ণ একমত। এবং এবিষয়ে আমাদের সমালোচনাও আশা করি আপনাদের খুশী করেছে। ভবিষ্যতে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠান এই ধরণের নাম যাতে গ্রহণ না করেন, গত সংখ্যায় সংবাদ-পরিবেশনের ভিতর আমরা তাও আবেদন করেছি। যদি কর্তৃপক্ষ সে আবেদনে কর্ণপাত না করেন--তাহ'লে যা করণীয় তা আপনাদেরই অর্থাৎ ঐ ধরণের ছবিগুলির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকা—এবং সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানানো।

মহাদেব প্রসাদ পাল (বেহালা ডাঃ হাঃ রোড,)

●● 'উদয়ের পথে' বাণীচিত্রে রাজপথের ছাপছিলো বলে আপনি যে অভিযোগ এনেছিলেন—রাজপথের সমালোচনায়ই আমরা তা স্বীকার করেছি। আপনার বর্তমান চিঠিতে অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে। আপনার তখনকার আনা অভিযোগ কেন তখন প্রকাশ করিনি—'রাজপথ' নাটকের সমালোচক কি পরিষ্কার ভাবে তা খুলে বলেন নি? কোন কিছু সম্পর্কে যখনই জোড় দিয়ে কিছু প্রতিবাদ করতে বা বলতে হয়—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ না করে যদি বলা যায়, তা'লে অপদস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না কী? উদয়ের পথের সমালোচনা লিখবার সময়—কী আপনাদের পত্রখানি যখন আমাদের কাছে আসে—তখন 'রাজপথ' মূল উপন্যাসখানি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি—তাই এবিষয়ে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আপনি নতুন বলে আপনার সমালোচনা প্রকাশ করা হয় নি—একথার আদৌ ভিত্তি নেই। তবু

আপনার মনে যদি কোন রকম আঘাত দিয়ে থাকি—আশা করি সে জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার বন্ধুরা, যাঁরা আপনাকে বলেন, রূপ-মঞ্চ আপনাকে টাকা দিয়ে 'প্রপাগ্যাণ্ডা' করতে রেখেছে, তাদের বলবেন, রূপ-মঞ্চ অর্থের বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি—রূপ-মঞ্চ তার অন্তরের মাধুর্যে সকলের অন্তর জয় করেছে—আপনার বন্ধুরা এবং আরো যাঁদের মনের কোঠায় আঘাত খেয়ে রূপ-মঞ্চ ফিরে এসেছে—ভবিষ্যতে তাঁদেরও জয়ের স্পর্ধা রূপ-মঞ্চের আছে।

রমা বসু (কাঁথি, মেদিনীপুর)

ঐখানকার সিনেমা-হাউস 'উদয়নে' প্রায়ই রূপ-মঞ্চের বিজ্ঞাপণ দেখতে পাই। এখানে যে রূপ-মঞ্চ আসে তা একদিনেই শেষ হ'য়ে যায়। এখানকার লোকের সিনেমা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। রূপ-মঞ্চের প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই তার উন্নতি কামনা করে। যে রূপ-মঞ্চকে শত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে আপনারা সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন, সেই রূপ-মঞ্চ যেন তার খ্যাতি, যশ ও সম্মান নিয়ে দেশ বিদেশে এমনি ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। অমাদের বিশ্বাস, রূপ-মঞ্চ কোন-দিনই তার মাথা নীচু করবে না। সে চিরদিনই মাথা উঁচু করে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে এক আদরের বস্তু হ'য়ে থাকবে। (১) কমলা চ্যাটার্জি (বিষকন্যা ও তানসেন) বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। (২) কানন দেবী ছাড়া গায়িকা হিসাবে তারপর কাকে ধরা যেতে পারে? (৩) একটী বই শেষ হ'তে সাধারণতঃ ক'মাস লাগে?

●● হাঁ। 'উদয়ন' সিনেমার কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চের এজেন্সী নিয়েছেন। রূপ-মঞ্চের প্রচারে তাঁদের যে আগ্রহ ও সহযোগীতার পরিচয় আমরা পাচ্ছি—সেজন্য সত্যই তাঁদের ধন্যবাদ। শুধু এঁরা নন, আমাদের নির্দিষ্ট এজেন্ট ছাড়া—যেখানে কোন এজেন্ট নেই সেখানকার প্রেক্ষা-গৃহের মালিকেরা তাঁদের প্রেক্ষাগৃহ থেকে রূপ-মঞ্চ বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করেছেন—বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানের এরূপ প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ রূপ-মঞ্চ শুধু আপনাদেরই নয়, বহু প্রেক্ষাগৃহের মালিকদেরও অন্তর জয় করতে পেরেছে—তাঁরা রূপ-মঞ্চের সমালোচনা দেখে প্রদর্শনের জন্য ছবি নির্বাচন করে থাকেন, এ সংবাদ অনেকেই আমাদের জানিয়েছেন। রূপ-মঞ্চের এই গৌরব, এ গৌরবের মূলে আপনারাই—রূপ-মঞ্চের পাঠক-সমাজ। রূপ-মঞ্চের প্রতি আপনাদের যে বিশ্বাস রয়েছে—আমরা রূপ-মঞ্চের কর্মীরা সে বিশ্বাস যাতে কোনদিন ক্ষুণ্ন না করি, মনের সেই দৃঢ়তা নিয়েই আমরা রূপ-মঞ্চের কাজ করে চলেছি। (১) হাঁ। তিনি মারা গেছেন। রূপ-মঞ্চেও তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা হ'য়েছিল। (২) কাননের গলা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু ঠিক গায়িকা বলতে আরো অনেকে আছেন, যাঁরা তাঁকে ছাড়িয়ে যাবেন অথবা সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁদের কথা বাদ দিয়ে পর্দায় যাদের আমরা দেখতে পাই তার ভিতর খুরশীদ, শান্তা আপ্তে, প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। (৩) নিরধারা তিন মাসের ভিতর একখানা ছবি শেষ করা যায়। আমাদের ষ্টুডিওগুলিতে যে তালে ছবি গ্রহণ করা হয়, তাতে একবছর থেকে দু'বছর ধরে রেখে দিতে পারেন।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (অভিনেতা, ষ্টার থিয়েটার)

গত ৮ম সংখ্যার রূপ-মঞ্চে আমাদের ষ্টার থিয়েটারের 'রায়গড়' নাটকের সম্বন্ধে শ্রীশৈলেশ মুখোপাধ্যায় আমার 'কাশীনাথ' চরিত্রের অভিনয় দেখে নিকৃষ্ট ধরণের অভিনয় বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমার বলার কিছুই নেই—তবে আসামীকে তার পক্ষ সমর্থনে দু'টো কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত এই গণ-তন্ত্রের যুগে। প্রথমতঃ আমি স্বীকার করছি, টাইপ চরিত্রে আমার যেরূপ পারদর্শিতা আছে এ ধরণের চরিত্রে তত

বেশী নেই। সেজন্য আমাকে কৃত্রিম স্বরের সাহায্য নিতে হ'য়েছে যাতে চরিত্রটী হাল্কা না হয়—বর্ত্তমানের (যদিও আমি তার মধ্যেই) অভিনেতারা একই স্বরে অভিনয় করায় অভ্যস্ত। কিন্তু পূর্বের অমৃতলাল দানীবাবু বর্ত্তমানের ন্যাট্যাচার্য শিশির কুমারকে দেখেছি, বিভিন্ন চরিত্রে কণ্ঠ-স্বরের পরিবর্তন আনতে। বিজয়ার পরেশ থেকে আরম্ভ করে আজ ১২ বৎসর যাবৎ যে কয়টী চরিত্রাভিনয় করেছি—কোনটীই আমি নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে অভিনয় করিনি। তবে হয়ত কোন দিন কণ্ঠস্বরের সমতা রক্ষিত হয়নি। আর যেখানে অস্বাভাবিক ভাবে চেঁচিয়ে উঠেছি—সেখানেও শৈলেশ বাবু যদি লক্ষ্য করতেন, দেখতে পেতেন, নিশ্চয়ই পারিপার্শ্বিক কোন চরিত্র একটু ঝুলে পড়েছিল। করুণ দৃশ্যে দর্শকের হাসির জন্য কি আমিই দায়ী ছিলাম না আমার সহ-অভিনেতাও এ বিষয়ে সাহায্য করছিল? তারপর বর্তমানে আমি বাস্তববাদী অভিনেতা—সুতরাং সাধারণ দর্শক যতক্ষণ না 'বেরো বেরো' বলছে ততক্ষণ আমি নিজেকে ছোট মনে করারও কারণ দেখিনা—আমার নিজেরও একটু সমালোচনা করবার বাতিক আছে—তার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোরের সংগে বলতে পারি, আমাদের দেশে নাট্য-সমালোচনা নিরপেক্ষ ভাবে করতে পারেন বা ছাপতে পারেন সে সাহস বা তেমন কাগজ খুব কমই আছে বা নেই বল্লেই চলে। যাই হোক, বারো বছর অভিনয় লাইনে থেকে এবং সাত বছর শিশির কুমারের সদুপদেশ পেয়ে যে ২ সিনের পার্টে নিকৃষ্ট ধরণের অভিনয় করবো এ আমি মেনে নিতে পারছি না—এ সম্বন্ধে আমি অন্য দর্শকের অভিমতও আহ্বান করছি, কেন না আমি নাট্যব্যবসায়ী তবে একদিক থেকে একথা বলা যায় বর্তমান নাট্য-জগতের বারো আনা অংশেই নিকৃষ্ট জিনিষ প্রবেশ করছে।

● ● গত হৈমন্তিক-সংখ্যা রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শৈলেশ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রায়গড়' নাট্যাভিনয়ের সমালোচনার বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ এনেছেন—আপনাকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রূপ-মঞ্চ শুধু দর্শকসাধারণের স্বার্থকেই বড় করে দেখে না—চিত্র ও নাট্যমঞ্চের বন্ধুদের কোথায় কোন বাধা বিপত্তি রয়েছে—তা যদি তাঁরা খুলে বলেন—তা উত্তীর্ণ হবার জন্য রূপ-মঞ্চ যথাসাধ্য চেষ্টাত করবেই—তাছাড়া বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদীদের সহযোগীতার জন্যও এগিয়ে আসতে আবেদন জানাবে। রূপ-মঞ্চ এমনই একটী পত্রিকা, রূপ-মঞ্চকে আমরা এমন ভাবেই গড়তে চাই, সকলের স্বার্থ নিয়ে সকলে যেখানে আমরা মিলিত হ'তে পারবো। সকলের বাধাবিঘ্ন—সকলে একসংগে দূর করে, দেশের চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের সুষ্ঠু রূপদানে সকলে যেদিন এগিয়ে আসবেন—রূপ-মঞ্চের সার্থকতা সেদিনই। তবু রূপ-মঞ্চ তাদেরই কথা বিশেষ ভাবে বলবে—চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের সেবা করতে যেয়ে যারা অবহেলিত, ঘৃণিত ও শোষিত। কারো প্রতি কোন অবিচার করা রূপ-মঞ্চের ধর্ম-বিরুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে কেউ যদি রূপ-মঞ্চ কর্মীদের বড় শত্রু থাকেন—সাংবাদিক জীবনে—তাঁর উপযুক্ততাকে সম্মানিত করবার জন্য রূপ-মঞ্চ কর্মীরা সর্বাগ্রে এগিয়ে যাবেন। এ শুধু আমাদের ফাঁকা বুলি নয়—আমাদের সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ—যার গরিমায় শত শত জনের অভিনন্দন লাভ করে আমরা ধন্য হ'য়েছি। রূপ-মঞ্চ সমালোচক সত্যিই যদি আপনার উপর অবিচার করে থাকেন—আপনি যে তাঁর বিরুদ্ধে রূপ-মঞ্চের কাছে সুবিচারের দাবী জানিয়েছেন—রূপ-মঞ্চের কাছে আপনার এই দাবী জানাবার জন্যই আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আসুন, এমনি ভাবে পরস্পরে আমরা পরস্পরের ভুল ত্রুটী শুধরে—অবহেলিতা শিল্প জননীকে কলঙ্কমুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করি। এবার আপনার অভিযোগের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করি। তার পূর্বে আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি আলোচনায় যদি কোথাও আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকি, সহজভাবেই তা গ্রহণ করবেন। আপনার বর্তমান 'নাটকটী' যদিও আমি নিজে দেখিনি—তবু আপনার অভিনয়ের সংগে বহুদিন থে ই পরিচিত। আলোচ্য নাটকটীর যিনি সমালোচনা করেছেন—সমালোচক হিসাবে নতুন হ'লেও সমালোচনা করবার যোগ্যতা থেকে তিনি বঞ্চিত নন—যোগ্যতা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, রসবোধ এবং

নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে বলেই সমালোচনার দায়িত্ব দিয়ে বর্তমান নূতনকে যাচাই করে নিচ্ছি। এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভংগী থেকেও যে শৈলেশ বাবু বঞ্চিত নন—তার পরিচয় পেয়েছি বলেই তাঁকে এ দায়িত্ব দিতে সাহসী হ'য়েছি নইলে দিতাম না। তবু 'মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ।' এবং সেরূপ ভুল যদি কিছু করে থাকেন, সেজন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার চিঠিতে আপনার নিজের দুর্বলতার কথাও অনেকখানি প্রকাশ করে ফেলেছেন। এবং কতগুলি বিপরীত ভাব এসে আপনার বক্তব্যকে এলোমেলো করে দিয়েছে। শৈলেশ বাবু আপনার সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন, "কাশীনাথের ভূমিকায় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিনয়ও নিকৃষ্ট ধরণের। তিনি কৃত্রিম সুরে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন আর শেষ রাখতে না পেরে উৎকট নিজস্ব সুর জানিয়ে প্রস্থান করেন। যেখানে করুণ অংশ তিনি অভিনয় করেন সেটা হাস্যোদ্দীপক হয়।" আপনার চিঠি পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন—আপনার কৃত্রিম স্বর এবং কৃত্রিমতার সমতা রক্ষা করতে সব সময় যে আপনি সক্ষম হন না—তা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন। করুণ অংশটী হাস্যোদ্দীপক হয় এজন্য আপনি বলেছেন যে, আপনার সহ অভিনেতাও সেজন্য দায়ী। শৈলেশ বাবুর সমালোচনা প্রসংগে যে কথা বলেছেন—তার সবই আপনি তাহ'লে নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন—তাহ'লে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী? কিছুই নয়। বরং শৈলেশবাবু আপনাকে প্রশংসা করেন নি বলে—সেটা সহ্য করতে না পেরে খানিকটা অবান্তর কথা বলেছেন। তাই নয় কি! এবং আপনার একথাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে নিজের অনেক দুর্বলতার কথা জানতে পারবেন। প্রথম মনে করুণ—শৈলেশবাবু সড়াসড়ি কৃত্রিমস্বরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেন নি তিনি অভিযোগ এনেছেন—স্বরের সমতা রক্ষা করতে পারেন নি বলে। তবু কৃত্রিম স্বরের সম্পর্কে আপনি যখন কথা তুলেছেন তখন আমাকেও তার উত্তর দিতে হবে বৈ কি! দানীবাবু বা অমৃতলালের অভিনয় সম্পর্কে সমালোচনা করার মত আমার স্মৃতি-শক্তি নেই। তাই তাঁদের কৃত্রিম স্বর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না। নাট্যাচার্য শিশির কুমারের স্বরে কোন কৃত্রিমতার কথা আমি স্বীকার করি না। অভিনয়ের সময় কণ্ঠস্বরের পরদা চড়িয়ে—ভাব, অভিব্যাক্তি এবং উচ্চারণ সব কয়টির সংমিশ্রণে তিনি যে অভিনয় করেন, তাকে কৃত্রিম স্বর বলা চলে না। আপনি বরং বাণীবিনোদ নির্মলেন্দুর কথা উল্লেখ করলে কিছুটা স্বীকার করতাম—নির্মলেন্দুর অভিনয়ের সময়ও লক্ষ্য করে থাকবেন—যখন কোন ব্যাঙ্গাত্মক কুটচক্রীর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন, তখনই এই কৃত্রিমস্বর তাঁকে চরিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করে এবং সে সাহায্য তিনি গ্রহণ করে থাকেন—অন্য সময় তিনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সাহায্যেই অভিনয় করেন। কৃত্রিম স্বর ব্যাঙ্গাত্মক, কুটচক্রী অথবা সাধারণ টাইপ চরিত্রের সময় সাহায্য করে কিন্তু সাধারণ চরিত্রাভিনয়ের সময় যে অভিনেতা এই কৃত্রিমতার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, তিনি অমৃতলালই হউন আর যেই হউন, তাঁকে আমরা মেনে নিতে পারবো না। শিশির কুমারের সংগে আপনি সাত বছর কাটিয়েছেন অথচ তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যটুকু আয়ত্ব করতে পারেন নি—এমন কি তাঁকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করবার ক্ষমতা থেকে আপনি বঞ্চিত বলে যদি আপনার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ আনি, আপনি কি তা খণ্ডন করতে পারবেন? শিশির কুমার কৃত্রিম স্বরে অভিনয় করেন না—শিশির কুমারকে নকল করে যাঁরা 'ভাদুড়ীক-কায়দা' দেখাতে চান—তারাই কৃত্রিমতার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। প্রত্যেক অভিনেতারই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে—কণ্ঠস্বরও সকলের এক নয়। কিন্তু নিজ নিজ প্রতিভা বলে তাঁরা এক একটী ভিন্ন ধরণের অভিনয়ের ছাপ রেখে যান দর্শক মনে—নরেশ মিত্রের গলাকে পৃথক ভাবে বিচার করলে—প্রশংসা করতে পারবো না অথচ তাঁর ঐ ভ্যাসভেসে গলাই অনেকে অনুকরণ করে থাকেন। অনুকরণ গলাকে করতে হবে না, করা উচিত অভিনয় ভংগিমাকে। আপনি যদি নরেশচন্দ্র বা শিশির কুমারের ভংগীমা অনুকরণ করতে যান—তবে তাঁদের গলার স্বরকে যদি অনুকরণ

করে ফেলেন—আপনার অভিনয়ে কৃত্রিমতা প্রকাশ পাবে, সমস্ত প্রচেষ্টাই হবে ব্যর্থ। নরেশচন্দ্রের গলা নরেশ চন্দ্রকেই মানায়—অহীন বাবুর চিবিয়ে চিবিয়ে হাঁপিয়ে বলায় যে কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়, অহীন বাবুকে নকল করতে গেলে সে কণ্ঠস্বরকে অনুকরণ করতে হবে না। হবে ভংগীমাকে। ভাদুড়ীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—সংলাপ বলার সময় শব্দকে সম্প্রসারিত করে উচ্চারণ করা এবং এই উচ্চারণ সময়ে যে সময়টুকু তিনি পান—সংলাপের মূল অর্থ টুকু অভিব্যক্তির দ্বারা চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলেন। অনেক সময় দেখবেন সংলাপটুকু আর তিনি শেষ করেন না—কিন্তু অভিব্যক্তিতেই তিনি তাঁর দর্শক-দের সেটুকু বুঝিয়ে দেন। যেমন শিশির কুমারের অভিনীত রাম চরিত্রটী কথা মনে করে দেখুন। "প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন ভ'লো আশীর্বাদ, ঋষি করিয়াছে মোরে।" 'ভাল' কথাটী শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী 'ভা—লো'—এমনি ভাবে সম্প্রসারণ করে থাকেন—এবং তাতে 'ভালো' কথাটী যে ব্যাঙ্গাত্মক অর্থে এখানে ব্যবহৃত, ঐ উচ্চারণের সংগেই তিনি বুঝিয়ে দেন। 'প্রজানুরঞ্জন' কথাটী যখন উচ্চারণ করেন তখন মনের মাঝে গুম্ গুম্ করে ওঠে শব্দটী। 'প্রজানুরঞ্জন' ও প্রজাদের মঙ্গল কামনাই তিনি করে এসেছেন—আর তাঁরাই তাকে দিল বেশী আঘাত এবং উপস্থিত করলো ভিত্তিহীন অভিযোগ। তাই ঐ শব্দটী এখানে যখন উচ্চারণ করেন, শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী তখন একদিকে ব্যঙ্গ—অন্যদিকে অভিমান—এরই সংমিশ্রণে করে থাকেন। এখন মনে করুন, আপনার মনে এই দু'টি শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি দাগ কেটে রইল—আপনি ভাদুড়ীর এই বৈশিষ্ট্য দুটি করায়ত্ব করেছেন। অভিনয়ের সময় দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতে চাইলেন। আপনার সংলাপে পেলেন, ভালো আছো অমল! আপনি গলাটা একটু গম্ভীর করে নিলেন, কারণ ভাদুড়ীর গলা তখন গম্ভীর ছিল—তারপর বল্লেন—'ভা—লো আছো অমল।' দর্শকেরা তখন আর আপনাকে বাহবা দেবেন না—হাসির রোলে অভ্যর্থনা করবেন। ভাদুড়ীর শিক্ষা, সাহচর্য এবং অনুকরণ তখনই আপনার সার্থক হবে—যখন এই তাৎপর্য গুলি করায়ত্ব করতে পারবেন।

নরেশবাবুর, 'সুচরিতা একটু পাশের ঘরে।' যেহেতু নরেশ বাবুর গলা ভ্যাসভেসে আপনি যদি সেই গলাকে অনুকরণ করে ঐ সংলাপ টুকু বলেন, দর্শকদের হাসি চেপে রাখা কোন মতেই সহজ নয়। এনিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা সাপেক্ষ। আমার বক্তব্য এই, ভাদুড়ীর সাহচর্য সাত বছর পেলেই হয় না—আয়ত্ব করবার প্রতিভা এবং অনুশীলন ক্ষমতা যেমনি থাকা চাই—তেমনি তার প্রকাশভংগীও হবে নিখুঁত। সামান্য একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। মিহিরের কথাই ধরুণ। বিপ্রদাসের পূর্বে মিহির ভট্টাচার্যের অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন। বিপ্রদাসে মিহির বাবু যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হ'য়ে যেতে দেন নি। মিহির বাবুর বিপ্রদাসের পরবর্তী অভিনয় দেখে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। একথা বলে আমি কী ইংগিত করছি আশা করি তা বুঝতে পারবেন। আপনি বাস্তববাদী অভিনেতা, তাই যতক্ষণ প্রেক্ষাগার থেকে দর্শকমণ্ডলী 'দূর দূর' করে আপনাকে অভিনন্দন না জানাবেন তার পূর্বে আপনি নিজের দুর্বলতা মেনে নিতে রাজী নন এবং শুধরেও নেবেন না। আপনার এই কথা শুনে ছোট বেলার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একটী ছেলেকে রোজই পড়া না পারার দরুন ক্লাসে হাটু গাড়া দিয়ে রাখেন মাষ্টার মশায়। ছেলেটি পড়াশুনা করে না বলে মাষ্টার মশায় তার অভিভাবকের কাছে নালিশ করেছেন। ছেলেটীর পাশের বাড়ীর আর একটি ছেলে ঐ একই স্কুলে অন্যক্লাসে পড়তো। ছেলেটীর অভিভাবক তাকে ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে বলেছেন। পরের দিন পাশের বাড়ীর ছেলেটী হাটুগাড়া অবস্থায় ঐ ছেলেটাকে ক্লাসে দেখতে পেয়েছে—বাড়ীতে যেয়ে ত অভিভাবকের কাছে বলছে—'দেখুন ও আজও পড়া পারেনি—মাষ্টার মশায় ওকে হাটু-গাড়া করে রেখেছিলেন।' ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো, 'কী রে পড়া পারিস নি কেন?' ছেলেটি তখন উত্তর দিল, 'পারিনি বুঝি! না পারলেত মাষ্টার মশায় মাথায় ইট দিয়ে হাটুগাড়া করাতেন—আজ পেরেছি বৈ কি। আজত শুধু হাঁটুগাড়া করিয়েছেন।'

ধারনার দিক থেকে সে ঠিকই ছিল—রোজ হাটু-গাড়া দিতে দিতে ওটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি—রূপ-মঞ্চ শুধু বাংলার নয়—বাংলা, আসাম এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের দর্শকদের অভিমত বহন করে সাধারণের কাছে উপস্থিত হয়—রূপ-মঞ্চ বাংলার যে কোন চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত পত্র-পত্রিকার চেয়ে বেশী সংখ্যক চিত্র ও নাট্যা-মোদীদের প্রতিনিধিত্ব করে—এমনকি আমরা স্পর্ধার সংগে বলতে পারি, অনেক পত্রিকার মুদ্রণ সংখ্যাকেও রূপ-মঞ্চ ছাড়িয়ে গেছে। তাই, রূপ-মঞ্চের অভিমত শুধু শৈলেশ বাবু বা রূপ-মঞ্চের অন্যান্য সমালোচকদের অভি-মত নয়, সমস্ত পাঠক সাধারণের। যদি তাঁরা সত্যিই শৈলেশ বাবুর সমালোচনাকে প্রতিবাদ করে কিছু আপনার সপক্ষে বলেন—নিশ্চয়ই তা মেনে নেবো যুক্তিসংগত হ'লে। বর্তমান নাট্য জগতে বারো আনা অংশেই নিকৃষ্টতা প্রবেশ করেছে—অতএব তার প্রশ্রয় দিতে হবে—কোন নাট্য-সেবীর মুখ থেকে একথা শোভা পায়না। আপনার একটু সমালোচনার বাতিক আছে—সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জেনেছেন—নিরপেক্ষ সমালোচনা কোন পত্র-পত্রিকা করেন না। আমার সমধর্মী কাউকে আমি টেনে আনতে চাইনা—তাঁদের ভিতর যদি কোন দুর্বলতা থাকে—তার বিচারক আমি নই—তার বিচারক হচ্ছেন, বাংলার চিত্র ও নাট্যা-মোদীরা। আমি শুধু আমাদের কথা অর্থাৎ রূপ-মঞ্চের কথাই বলতে পারি। রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষ মতবাদ প্রকাশ করবার শক্তি এবং সাহস আছে কিনা এবং রূপ-মঞ্চ তার সদ্ব্যবহার করে কিনা—বাংলার যে কোন শিল্পী, নাট্যকার, এবং প্রযোজক—যারা টাকার স্তূপের ওপর বসে আছেন—টাকার থলিগুলি রূপ-মঞ্চের সামনে এগিয়ে দিয়ে একবার যাঁচাই করে দেখতে বলবেন না! চিত্র ও নাট্যামোদীদের কথা নাই বা বল্লাম। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করেই রূপ-মঞ্চ আজ স্পর্ধিত ও মহীয়ান হ'য়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (দিঘড়া, দত্তপুকুর, ২৪-পরগণা)

আমার নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। গত কার্তিক মাসের 'খেয়া' মাসিক পত্রিকা বাহির হইবার পর একখানি আনাইয়া পাঠ করিবার কালে দেখিলাম, উহার প্রশ্নোত্তর বিভাগের উত্তরদাতা এক জায়গায় রুবি ও সুমির (কলিকাতা) প্রশ্নের উত্তর জানাইয়াছেন যে, সিনেমা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে একমাত্র 'খেয়াই' সক্ষম। 'খেয়া' ব্যতীত আর কোনও মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা নাকি তেমন সঠিক উত্তর প্রদান করিতে পারে না। তাঁহার এইরূপ অভিমত প্রকাশে নিজের পায়ের ধুলা নিজের মাথায় দিয়া বড় হওয়ার উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায় না কি? কারণ, রূপ-মঞ্চ এবং 'সচিত্র শিশিরের' নাম তিনি করেন নাই। সচিত্র শিশিরের কথা বাদ দিলেও রূপ-মঞ্চের বিশেষত্বকে সাধারণের নিকট গোপন করিতে তাঁহাকেই এই প্রথম দেখিলাম। যাঁহারা রূপ-মঞ্চ পড়েন না, তাঁহারা রূপ মঞ্চের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন একথা সত্য, তবে একবার যদি কেহ পড়েন, তা'হ'লে অপর কোনও পত্রিকা যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না একথা নিঃসন্দেহ। বিশেষ করিয়া প্রশ্নোত্তর বিভাগই উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমি 'খেয়া' সম্পাদককে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র ইতিপূর্বে দিয়াছি এবং উহাতে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছি তাহার একখানি নকল পাঠাইলাম—পাঠ করিয়া অনুমান করিতে পারিবেন। এখন আপনার মতামত এই সম্বন্ধে জানিবার অপেক্ষায় রহিলাম। (খেয়া সম্পাদককে লিখিত পত্রের নকল)

মাননীয় খেয়া সম্পাদক সমীপেষু,—

মহাশয়,

আমার নমস্কার জানিবেন। কার্তিকের 'খেয়া' বাহির হইবার পর অন্য একখানি আনাইয়া পড়িলাম। উহার প্রশ্নোত্তর বিভাগের এক জায়গায় দেখিলাম যে, রুবি ও সুমি (কলিকাতা) উহাদের প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, সিনেমা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর ঠিকভাবে দিতে পারে এরকম পত্রিকা নাম করিবার মত আর

নাই। আপনার ঐরূপ অভিমত জ্ঞাত হইয়া আমি বিশেষ ভাবে আশ্চর্য হইয়াছি এই জন্য যে, মাসিক পত্রিকা রূপ-মঞ্চের কথা উহাদের জানাইয়া দেন নাই। রূপ-মঞ্চের নামোল্লেখ করা আপনার খুবই উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি এবং সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে রূপ-মঞ্চ অপনার পত্রিকাকেও ছাড়িয়ে যাবার স্পর্ধা করে একথা আমি আপনার পত্রিকার একজন দরদী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করিতে পারি না। প্রতি-মাসে আমি ৪।৫ খানি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু নির্ভীক ভাবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভংগী লইয়া উত্তর দিতে রূপ-মঞ্চ যতখানি অত্যন্ত আশা করি কোনও পত্রিকা ততখানি নহে—একথা আপনি স্বীকার করবেন কিনা জানিনা। অনেক কিছুই লিখিয়া ফেলিলাম যদি ইহা অন্যায় মনে করেন তবে আশা করি তাহা মাপ করিবেন।

●● আপনার চিঠি পাবার পূর্বে দু'একজন সাংবাদিক বন্ধু 'খেয়া' সম্পাদকের মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ নিয়ে কিছু আলোচনা করবো না বলেই মনস্থ করেছিলাম। কারণ, খেয়ার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালবন্ধু নিয়োগী হ'লেও, মূলতঃ যিনি সম্পাদকের কাজ করে থাকেন এবং কাগজটীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী—তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু - তাঁর বিরুদ্ধেই তাহলে কতগুলি কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। কাউকে কোন প্রকার আঘাত না দিয়ে আমরা কাজ করে যেতে চাই—যদি কেউ আঘাত করেন—যতখানি পারি সহ্য করে যাবো—সহের সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রতিঘাত না দিয়ে থাকবার মত অহিংস আমরা নই। খেয়ার কর্তৃপক্ষ কিছুটা ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটিয়েছেন বলেই আপনার পত্রের উত্তর দিচ্ছি। মুনি এবং মুষিকের সর্বজন বিদিত প্রাচীন কাহিনীটী ঠিক এসম্পর্কে উপমাস্থলে বলতে হয়। খেয়া কাগজের পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করবার মূলে শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে যতখানি প্রেরণা এবং উৎসাহ দিয়ে যারা সহযোগীতা করেছিলেন—তার ভিতর রূপ-মঞ্চের এই দীন সম্পাদকও একজন। শুধু মৌখীক সহযোগীতা নয়, ছাপবার কাগজ দিয়ে এবং ছয়মাস অবধি জামিন স্বরূপ থেকে আমারই কোন বন্ধুর প্রেসে খেয়া ছাপবার ব্যবস্থা করে দি। শুধু এইটুকুই নয়—রূপ-মঞ্চের দিক থেকেও যতখানি সাহায্য এবং সহযোগীতার প্রয়োজন হ'য়েছে, 'খেয়া' আপনার চিঠির উত্তর লিখবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও পেয়ে এসেছে।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী নিজেই জানেন যে—খেয়া এবং রূপ-মঞ্চের পার্থক্য কতখানি--প্রতি পদে পদে তিনি তার পরিচয় পান—এমন কী নিজে যখন চিত্র পরিচালকরূপে চিত্রজগতে প্রবেশ করলেন,—রূপ-মঞ্চের প্রচার কার্য যে তাঁকে অন্য যে কোন পত্রিকা থেকে বেশী সাহায্য করবে—এ সত্য তিনি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন—এবং আমাদের এসে অনুরোধ যখন করলেন, আমরা স্বার্থহীন ভাবেই তার প্রচার কার্য করেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। অথচ তাঁরই পরিচালিত পত্রিকায় সম্পূর্ণ একটা বিপরীত কথায় আপনার মত আমিও কিছুটা আশ্চর্য হ'য়েছি বৈকী? তবে আমাদের ক্ষোভেরও কোন কারণ নেই। সব সময় মনে রাখবেন, আকাশে যাঁরা থুথু ফেলতে যান—আকাশের কোন ক্ষতি হয়না। অন্যে এই স্পর্ধায় কেবল ব্যংগ হাসি হাসেন। রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার পর তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই ব্যাঙ্গোক্তি করেছিলেন—'এরূপ কোন পত্রিকা আবার চলতে পারে নাকি!' আজ রূপ-মঞ্চের কৃতকার্যতায় অনেকেই রূপ-মঞ্চের ছাঁচে কাগজ প্রকাশের জন্য ওত পেতে আছেন। আমাদের অনেকেই আবার শাসিয়েও যাচ্ছেন—রূপ-মঞ্চকে তাঁরা ছাড়িয়ে যাবেন বলে। আমরা তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানিয়ে কেবল বলি, 'বেশত! আমাদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী যদি পাই, আমাদের লাভ বৈ লোকসান নয়—আমরা আরো বেশী সতর্ক হ'য়ে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হবো।' খেয়া বা আরো পত্র পত্রিকা যাঁরা আমাদের সমালোচনা করেন—তাঁদের শুধু বলে রাখতে চাই—রূপ-মঞ্চ কর্মীদের চেয়ে যদি বড় আদর্শ এবং নিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা সাংবাদিক জগতে পা বাড়াতে পারেন —তবেই রূপ-মঞ্চকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হবার সুযোগ পাবেন—নইলে অযথা রূপ-মঞ্চের কৃতকার্যতায় গাত্রদাহ বাড়বে—আবোল তাবোল বকতে সুরু করবেন।

শ্রীমোহিনীমোহন কুণ্ডুর প্রযোজনায়

প্রশান্ত প্রডাকসন্সের নবতম বাণী চিত্র—

রক্ত-রাখী

রচনা ও পরিচালনা	সুর-সংযোজনা	শিল্প-নির্দেশক
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়	লক্ষ্মীনারায়ণ সেনগুপ্ত

আলোক-শিল্পী	ব্যবস্থাপক	শব্দযন্ত্রী
নিধু দাশগুপ্ত	বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়	গোবিন্দ মল্লিক

=ভূমিকায়=

অহীন্দ্র চৌধুরী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা, প্রমোদ গাঙ্গুলী, অমিতা, পুরু মল্লিক, নিভাননী, আশু বোস, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রেবা বসু, প্রফুল্ল দাস, সুহাসিনী, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ দাস, শিবু ভট্টাচার্য্য, বাসুদেব চ্যাটার্জি, প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক ঃ কাপূরচাঁদ লিমিটেড।

: লাউড-স্পীকার

কর্তাদের ভীমরতি !

বেতার-কর্তাদের যে ভীমরতি ধরেছে তা তাঁদের প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখলেই বেশ মালুম পাওয়া যায়। সম্প্রতি শিল্পী সংঘ বেশ শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন তা সাম্প্রতিক বেতার বয়কট এবং কুখ্যাত দু'জন বেতার-কর্তা সুনীল বসু ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাংলা দেশ থেকে 'বিদ্যুৎ-গতি' বিদায় নেওয়াতে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিল্পী সংঘকে শক্তিশালী করে তোলা মানে, দাবিয়ে-রাখা, অবজ্ঞাত, হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-করা শিল্পীদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তোলা। শিল্পীদের এই শক্তিকে ও সংঘবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন ও ব্যহত করে দেবার জন্য বেতার-কর্তারা 'রৌপ্য চক্রে'র 'নতুন-খেল্' দেখাতে সুরু করেছেন। প্রোগ্রামে কাউকে বেশী করে স্থান দেয়া হচ্ছে—কেউ বা দু' মাস অন্তর একবার মাত্র স্থান পাচ্ছেন কিনা সন্দেহ। শিল্পীদের মধ্যে অভিযোগের গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা শিল্পী সংঘকে অবহিত হতে বলি। বেতারের অভ্যন্তরে 'নতুন-খেল' নানাভাবে সুরু হলেও আমরা এটুকু জোর করে বলতে পারি যে, শিল্পীদের মধ্যে সহস্র রকমের বিভেদ থাকলেও তাঁদের মধ্যে বিভীষণ বৃত্তিধারী 'মিরজাফরের' সংখ্যা একেবারে নেই-ই বল্লেই চলে, একমাত্র বিকৃত ও বিক্রীত-আত্মা বিশ্বাসঘাতক মহীতোষ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া। এঁকে বেতারে স্থায়ীভাবে এবং পাকাপোক্তভাবে রাখবার ব্যগ্র ব্যাকুল চেষ্টা যাঁরা করছেন তাঁদের আমরা জানি। সুনীল বসু ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বেতার থেকে বিদায় নেয়াতে হঠাৎ যাঁদের পদোন্নতি ঘটেছে—তাঁরাই এই সব অন্যায়ের প্রশ্রয় শুধু দিচ্ছেন না—ধামাধরাদের মোটা রকমের 'চাঁদির' ব্যবস্থাও করে দিচ্ছেন। যোগ্যতা যাঁদের আছে—পাণ্ডিত্য জ্ঞান ও প্রতিভা যাঁদের আছে কলিকাতা বেতারে তাঁদের স্থান নেই। মূর্খের দেশে পণ্ডিত হওয়া বিপদের কথা। তাই কলিকাতা বেতারে অকর্মণ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীনদের আড্ডা হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়কে বেতারে পাকাপাকিভাবে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। কর্তাদের দেখছি সত্যিই ভীমরতি ধরেছে !

সুনীল দাশগুপ্তের অপরাধ !

বেতারের ভূতপূর্ব ঘোষক সুনীল দাশগুপ্তের অপরাধের সীমা নেই! তাঁর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হলো তিনি নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। চাকরী করতে গেলো যে মনুষত্ব বিসর্জন দিতে হবে এমন কথা আমাদের জানা নেই। বেতারের অভ্যন্তরে অনেক দুর্নীতির ও অবিচারের কথা শিল্পী-ধর্মঘটের কোন সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত প্রকাশ করে দেন এবং আরো প্রকাশ করেন যে, ১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসে' দেশ ধর্মাত্মক রেকর্ড (যে সব রেকর্ড নিষিদ্ধ নয়) বাজানোর অপরাধে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়, ইন্‌ক্রিমেণ্ট বন্ধ করা হয়—তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, মিঃ জামান ও মিঃ রমেশ ব্যানার্জি পা দিয়ে "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামরা" রেকর্ডখানি ভেংগে দেন। চাকরীসর্বস্ব চাটুতার ও দেশদ্রোহীদের স্বরূপ জন-সভায় দাশগুপ্ত প্রকাশ করে দেবার পর সামান্য কোন অজুহাত না দেখিয়েই তাঁকে বেতার থেকে বিদায় করে দেয়া হলো। অবশ্য বিদায় দেবার আগে বেতার কর্তারা দাশগুপ্তের কাছে নানা হীন প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাঁর চাকুরী অটুট ও অক্ষত রাখার জন্যে দাশগুপ্তের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি পত্র এই মর্মে আদায় করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর (দাশগুপ্তের) সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা কিন্তু স্বীকৃতি পত্র না দেওয়াতে দাশগুপ্তকে বেতার থেকে বিদায় করা হলো। সুনীল দাশগুপ্তের যোগ্যতার কোন প্রশ্নই এই হীন কার্যের বাধা হলো না—দাশগুপ্তের এই 'মহান অপরাধে' সমস্ত দেশ আজ দোষী! আমরা নীরবে অপেক্ষা করছি—দাশগুপ্তের স্থানে কোন অযোগ্য চাটুকারকে বসিয়ে

বেতার-কর্তারা কেমন করে তাঁদের মূর্খের রাজত্ব কায়েম করবেন। কর্তাদের শুধু চুপি চুপি একটি কথাই বলি: ইংরেজ প্রভুরা বিদায় নিচ্ছেন—ইতিমধ্যেই অসংখ্য বিরোধ সত্ত্বেও কেন্দ্রে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বেতার বিভাগ যাঁর হাতে এসে পড়েছে—তাঁকে কলিকাতার বেতার-কর্তারা চেনেন কিনা জানি না, তবে কর্তাদের 'ভীমরতি' ছুটিয়ে দেবার জন্যে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল 'বল্লভী-দাওয়াই' তৈরী করছেন—এক দাগেই আরোগ্য! এ আমরা হলফ করে বলতে পারি। যেমন রোগ তেমনি ওঝা যে বল্লভভাই তা আমাদের অজানা নয়। তবু আমরা অপেক্ষা করছি—বেতার কর্তাদের ভীমরতির চক্রে ভাল করে আঢ়্ড় হবার জন্য। সুনীল দাশগুপ্তকে আমরা সাধুবাদ শুধু দেবো না—তাঁকে তাঁর যোগ্য স্থানে ফিরে যাবার জন্যে 'রূপ-মঞ্চ' যথাসাধ্য করতে প্রস্তুত আছে—একথা এই প্রসংগে 'রূপ-মঞ্চ' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

দুই কর্তা!

এই সেদিন বেতার অফিসে হানা দিলুম শান্তশিষ্ট গোবেচারার মতো। কলিকাতার বেতারে আজকাল দুই কর্তার সংসার। এঁরা দু'জনে ঘর বার দুই-ই-দেখবেন। সংবাদ অতি শুভ সন্দেহ নেই। কলিকাতা বেতারের দুই কর্তা হলেন: শ্রীযুক্ত অশোক সেন ও মিঃ গোপালন। ভেতরে খোঁজ নিলুম—পঙ্কজ মল্লিককে বেতারে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। যাঁদের এত দিন দূরে রাখা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন—স্বনামধন্য তারাপদ চক্রবর্তী ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও বেতারের সংগীত আসরে দেখা দিয়েছেন। আবার একদিন দেখা হলো স্বনামধন্য সুর-শ্রষ্টা তিমিরবরণ ও রাইচাঁদ বড়ালের সংগে। বেতারের সংগীত বিভাগকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বেতারের দুই কর্তা উঠে পড়ে লেগেছেন। দুই কর্তা এবং সংগীত বিভাগের কর্তাকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, শুধু 'সিনিয়র' নয়—'জুনিয়ার' শিল্পীদেরও বেতারের সংগীত আসরে আহ্বান করে আনতে হবে প্রচারিত অনুষ্ঠানকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য। সব 'জুনিয়ার' শিল্পীদের নাম আমরা জানি না—মাত্র কয়জনের নাম আমরা জানি যেমন—কান্ত সাহা, বীরেন মুখোপাধ্যায়, বীরেন বিশ্বাস, রেণুকা ঘোষ ইত্যাদি—এঁদের বেতারের সংগীত-আসরে দেখা যাচ্ছে না অনেকদিন থেকে—এঁদের মতো আরো অনেক শিল্পীকে অকারণে 'জবাই' করা হয়েছে - কলিকাতা বেতারের দুই কর্তাদের সেই সব সংগীত-শিল্পীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমরা অনুরোধ করছি।

'বন্দেমাতরম্'

জাতীয়তার জীবন-মন্ত্র: বন্দেমাতরম্ – এই জীবন-মন্ত্রের উচ্চারণও এককালে এদেশে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু জীবন দিয়ে প্রাণ দিয়ে এই নিষিদ্ধ মন্ত্রই একদিন সিদ্ধ হয়ে উঠলো—'বন্দেমাতরম্'-এ দেশ ভেসে গেল। প্রাণবন্যা এলো এ মরা দেশে। ফাঁসীর মঞ্চে, মেসিন-গানের সামনে, একথা নির্যাতনের মাঝে জীবনের জয়গান গেয়ে এই মন্ত্রোচ্চারণ করে এদেশের কত মানুষ শহীদ হয়েছে। কিন্তু
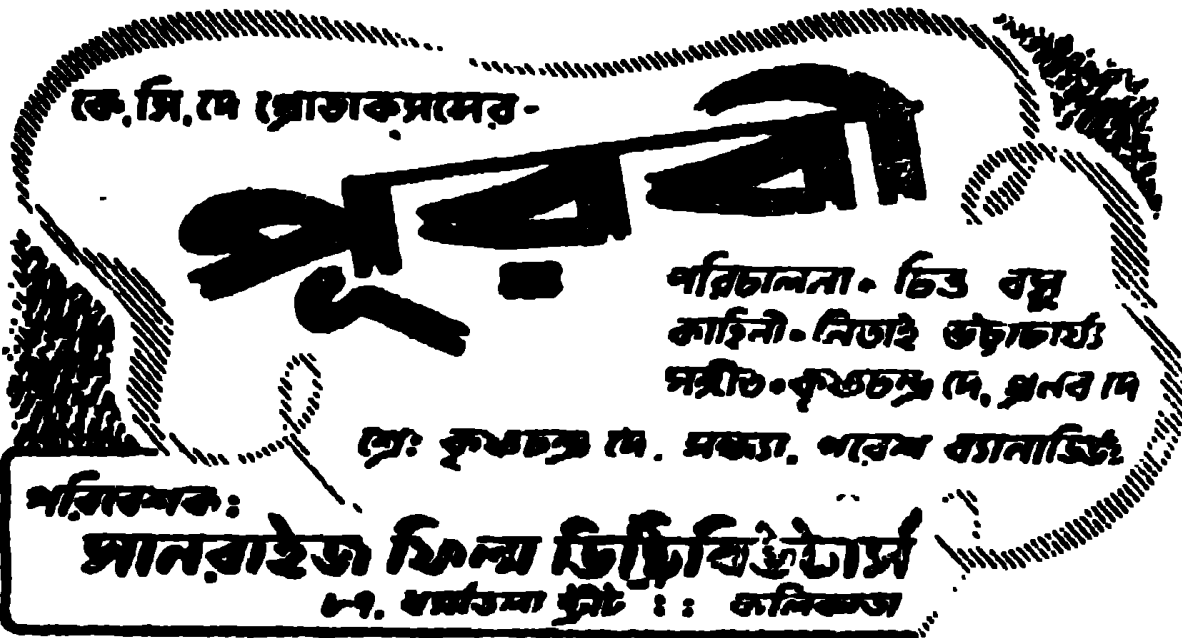
রজনী পিকচার্সের 'তপোভঙ্গ' চিত্রে জীবেন বসু ও প্রমীলা ত্রিবেদী

ইংরেজ-শাসিত ভারতে সাম্রাজ্য-বাদীর প্রচার-যন্ত্র অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে (নেতাজীর কথায় : A. I. R. হচ্ছে—Anti-Indian Radio) এই গান ছিল নিষিদ্ধ। আমরা জানি সংবাদ ঘোষক কৃতি বিজন বসু এককালে কলিকাতা বেতারে দৈবক্রমে এই 'বন্দেমাতরম্' রেকর্ডখানি বাজানোর দরুণ কম নাজেহাল হন নি। সে বোধ হয় ১৯৩৫-৩৬ সালের কথা। তারপর কলিকাতার কর্তারা এই রেকর্ড-খানিতে কাগজের লেবেল মেরে—'নিষিদ্ধ' কথাটা বড়ো বড়ো করে লিখে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন ! ১৯৩৮ সালে বোম্বাই বেতার কেন্দ্রে খ্যাতনামা গায়ক মাষ্টার রামা রাও তাঁর অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' গাইতে সুরু করতেই তাঁর গান বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাঁকে বেতারে আর গাইতে দেয়া হয় নি। সম্প্রতি আমরা খবর পেলাম **সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নির্দেশে 'বন্দেমাতরম্' গান এবং রেকর্ডের-ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে।**

আমরা বল্লভ ভাইয়ের এই কাজকে বেতার 'জাতীয় করণের' প্রথম ধাপ বলে অভিহিত করতে পারি এবং তাঁর এই কাজের জন্য সমস্ত দেশবাসীর তরফ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাচ্ছি। কলিকাতার কর্তারা এই সংবাদ পাবার পর 'বন্দেমাতরম্' রেকর্ড ও গান সম্পর্কে কি করেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়। "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা" রেকর্ড খানির অবমাননাকারীদের কবর খোঁড়ার দিন এলো তারই নিশানা আমরা বল্লভ ভাইয়ের কাজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

"গান-শোনা"

কলিকাতা বেতারে একদিক দিয়ে যেটা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সেটা হচ্ছে বেতার-কর্তাদের অস্থির মতি। এই অস্থির মতি ও চপলতার জন্যে কোন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান বেতারে বেশীদিন ঠাঁই পায় নি। যখনই দেখা গেছে কোন অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, হয় সে অনুষ্ঠানকে অকস্মাৎ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে না হয় সে অনুষ্ঠানের

সময় কমিয়ে দেয়া হয়েছে, না হয়তো অনুষ্ঠানের সময় পরিবর্তিত করে তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করবার অপচেষ্টা হয়েছে। উদাহরণ? উদাহরণ রয়েছে ভূরি ভূরি। এক একটা করে বলে যাই মিলিয়ে নিন—ধরুন: সংগীত-শিক্ষার আসর, বেতার-বিচিত্রা, বেতার-নাটক, স্বনামধন্য বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের ঝঞ্ঝাট।

সংগীত-শিক্ষার আসর, একসময়ে কলিকাতা বেতারে স্বনামধন্য পঙ্কজ কুমার মল্লিক কর্তৃক প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়ে কলিকাতা বেতারকে সমগ্র বেতার কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় করে তুলেছিল কিন্তু দলগত স্বার্থ-পরতাই কলিকাতা বেতারে যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন নিতান্ত দুঃখের সংগে পঙ্কজ কুমার বেতার থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন। বোধ হয় সে ১৩৪১ সালে এবং তারপর থেকে কলিকাতা বেতারকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন এবং কলিকাতা বেতারের কোন অনুষ্ঠানেই যোগ দেন নি। পঙ্কজ মল্লিক পরিচালিত রবিবাসরীয় সংগীত-শিক্ষার আসর বেতারের জনপ্রিয়তার মূলে এবং বাংলা দেশে সংগীত প্রচারে ও বাঙালী ছেলেমেয়েদের ও গৃহস্থ বধূদের সংগীত শিক্ষার দিক থেকে যে অসাধ্যসাধন করেছিল তা বলবার নয়। আমরা সংগীত শিক্ষার আসর-এর সার্থকতা নিয়ে ইতিপূর্বে রূপ-মঞ্চে আলোচনা করেছিলুম এবং পঙ্কজ মল্লিক পরিচালিত সংগীত শিক্ষার আসর নতুন করে বেতারে প্রবর্তনের অনুরোধ বেতারের কর্তৃস্থানীয়ের কাছে রূপ-মঞ্চ মারফৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম। বেতারের অসংখ্য শ্রোতাও সংগীত শিক্ষার আসর নতুন করে চালু করবার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে দাবী করে আসছেন। নতুন বছরের জানুয়ারী মাস থেকে কলিকাতা বেতারে রবিবাসরীয় 'সংগীত শিক্ষার আসর' প্রবর্তিত হয়েছে নতুন নামে—"গান-শোনা" তার নতুন নাম। 'গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে গন্ধ দেবেই'—কাজেই সংগীত শিক্ষার আসরের পুনঃ প্রবর্তনা নতুন নামে ঘটলেও পুরাতন দিনের মত বেতার মারফৎ বাংলা দেশে সংগীত প্রচার যে নতুন করে সুরু হবে তাতে আমরা আনন্দিত না হয়ে পারছি না। এই "গান-শোনা" পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার যদিও কেবলমাত্র পঙ্কজ মল্লিককে দেয়া হয়নি—আরো দু'জন খ্যাতনামা গায়ক জ্ঞান ঘোষ ও শান্তি নিকেতনের শৈলজা রঞ্জন মজুমদার যথাক্রমে উচ্চাংগ সংগীত ও রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা-দানের ভার পেয়েছেন এতে আমরা খুসি। কিন্তু আমরা সবচেয়ে খুসী হয়েছি বেতারে পঙ্কজ মল্লিক আবার সসম্মানে ফিরে এসেছেন সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালক হয়ে। বিগত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা বেতারের স্মরণীয় দিন পঙ্কজ কুমার মল্লিকের, পুনরাগমনের জন্যে। কিন্তু সংগীত শিক্ষার আসর এই নামটার পরিবর্তে "গান-শোনা" নামটি দেবার কি তাৎপর্য বুঝলাম না। অস্থির-মতি বেতারের কর্তারা মতি স্থির করেই বেতারে দীর্ঘদিন পরে সংগীত শিক্ষার আসর প্রবর্তনা করেছেন এবং পঙ্কজ কুমারকে বেতারে আহ্বান করে এনেছেন এটুকু আমরা আশা করতে পারি কি?

বি—বি—সি'র নব প্রচেষ্টা

বি-বি-সি'র নাম শুনেছেন তো? সাত সাগরের পারে লণ্ডনে এই প্রতিষ্ঠান (British Broadcasting

Corporation)। ইংরেজী ভাষাবাসী শ্রোতাদের আনন্দ বিধান এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে সজাগ করে তোলবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান আগ্রহশীল হলেও সাগর পারের তীন দেশগুলির জন্যও এখান থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের 'ইষ্টার্ণ সার্ভিস' এদেশের জন্য বিভিন্ন ভাষায় নানান চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রচার করে থাকেন। বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য প্রতি শনিবার রাত্রে ৮টায় (বেংগল টাইম) লণ্ডন থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান বিচিত্রা এই ইষ্টার্ণ সার্ভিসের অন্তর্গত। আধ ঘণ্টার জন্য ১৯ ও ২৫ মিটারে লণ্ডন থেকে এই 'বিচিত্রা' প্রচার করা হয়। বাংলা ভাষা ছাড়া হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষারও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

'ইষ্টার্ণ সার্ভিসে'র কাজ কেমন চলেছে. ভারতীয় শ্রোতারা লণ্ডন থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি কি ভাবে নিচ্ছেন, প্রোগ্রামের ত্রুটি কি হচ্ছে, শ্রোতারা কি ধরণের অনুষ্ঠান চান তা জানবার জন্যে বি-বি-সি'র নয়াদিল্লীর অফিস-এর Indian Listeners Research বিভাগের মিঃ পাণ্ডে ভারতের প্রধান সহরগুলিতে পরিভ্রমণ করছেন। শ্রোতাদের মতামত সংগ্রহ করবার এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করছি। আরো খবর পেলুম যে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠানে "সিনেমা শিল্পে মেয়েরা" এই পর্যায়ে ধারাবাহিক মোট তেরোটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লণ্ডনের ছায়া চিত্রের স্বনামধন্য মহিলা-শিল্পীরা তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। প্রতি মংগলবার রাত্রে ৯-১৫ মি: (বেংগল টাইম) ১৯ ও ২৫ মিটারে এই বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যাবে। বিগত ৩১শে ডিসেম্বর থেকে এই বক্তৃতা সুরু হয়েছে। বক্তৃতাগুলি ইংরাজিতে দেয়া হলেও এই বক্তৃতা বিশেষ করে এদেশের শ্রোতাদের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলা অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা' সম্পর্কে শ্রোতাদের মতামত রূপ-মঞ্চের বেতার বিভাগে অথবা বি-বি-সি, 'বিচিত্রা' পোষ্ট বক্স: ১০৯, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় পাঠাবার জন্য শ্রোতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নানাকথা—

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তা শ্রীযুক্ত যোগজীবন রামের কলিকাতায় সাম্প্রতিক স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং এদেশের শ্রমিকদের আনন্দহীন জীবনের দিকে শ্রীযুক্ত রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রমিকদের শুধু আর্থিক উন্নতি নয়—তাদের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। বেতার মারফৎ এদেশে যে ক্ষণিক আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা আছে—তাকে আরো ব্যাপক ও শ্রমিক ও পল্লী-বাসীদের ভেতর সহজে গ্রহণ-যোগ্য করে তোলার ইচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি বেতার-যন্ত্র এদেশের শ্রমিক-কেন্দ্র ও পল্লী-বাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার পরিকল্পনা

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ঃ ঃ ৭ম বর্ষ ঃ ঃ ৩য় সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা—

ততঃকিম

খণ্ডিতই হউক আর যাই হউক আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করতে যাচ্ছি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ততঃকিম—তারপর কী? আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, কলা ও ধর্মীয় জীবনে কত সমস্যাই না কিলবিল করে বেড়াতো। সমস্ত সমস্যা আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি—পরাধীনতার জগদ্দল পাষাণ আমাদের বুকে চাপানো ছিল—আমরা তারই অজুহাত দেখিয়ে চাপাই গেয়েছি। কিন্তু আজত আর সে-ছাপাই গাইলে চলবে না—আর লোকে শুনবেই বা কেন? তাই প্রতিটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে—সমস্ত সমস্যা সমাধানেই আমাদের তৎপর হ'য়ে উঠতে হবে। সমস্ত সমস্যাই যে আমরা রাতারাতি সমাধান করে ফেলতে পারবো—তা নয়। বাধা-বিঘ্ন আছে—জয়-পরাজয়ও হয়ত পাশাপাশি ওত পেতে থাকবে। আমাদের অক্ষমতা ধরা পড়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাতে লজ্জার কোন কারণ থাকবে না। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা সে-অক্ষমতাকে ঢাকতে হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি আমরা রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চুপ হ'য়ে বসে থাকি—তাতে আমাদের আন্তরিকতার প্রতি প্রত্যেকেরই সন্দেহ জাগবে। যে শাসন পদ্ধতিই গড়ে উঠুক না কেন—আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—সে শাসন পদ্ধতির মূলে আমরাই থাকবো। আমাদের নিয়েই রাষ্ট্র—আমাদেরই প্রতিনিধি স্থানীয়রা থাকবেন রাষ্ট্র পরিচালনার পুরোভাগে। সমষ্টিগত ভাবেত বটেই—একক ভাবেও প্রত্যেকটী সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব রয়েছে আমাদের সকলের। হিন্দুস্থানই বলুন আর পাকিস্থানই বলুন—যাঁদের হাতে এই হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকবে—তাঁরা কেউ 'সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়' থেকে আসেন নি। তাঁদের দায়িত্ব আর আমাদের দায়িত্বে কোন ব্যবধান নেই। তাই রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে আমাদের নিশ্চুপ হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের সমষ্টিগত ও একক শক্তি নিয়ে যার বা যাদের যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, দেশের সামনে যে সমস্যা রয়েছে, তা সমাধান করতে মনের আন্তরিকতা নিয়েই অগ্রসর হ'তে হবে। একথাত ঠিকই, আমরা যাই করতে অগ্রসর হই না কেন - জুজুর ভয়েত আর সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতে হবে না!

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা এতদিন পুরোভাগে থেকে আমাদের পরিচালনা করে এসেছেন—বৈদেশিক রাজশক্তির আঘাত প্রথমে তাঁদেরই সইতে হ'য়েছে। দেহ তাঁদের ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছে—কিন্তু মন রয়েছে চিরসবুজ—চিরনবীন। প্রলয় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে তাঁরা তরী বেয়ে এসেছেন, কোনদিন হাল ছাড়েন নি। আজও নয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হ'য়েছে—কিন্তু আজকের সংগ্রাম আরো সুকঠিন—আজকের দায়িত্ব আরো গুরুত্বপূর্ণ। কত প্রাণ দিয়ে—কত ত্যাগ স্বীকার করে—কত নির্যাতন সহ্য করে আজ যা আমরা অর্জন করেছি—তাকে সুষ্ঠু

রূপ-মঞ্চ

ভাবে যদি রূপায়িত করে তুলতে না পারা যায়—সমস্ত দুনিয়া আমাদের মুখে যে কালিমা লেপে দেবে, দীর্ঘদিনের পরবশতা থেকে কী তা বেশী জ্বালাময়ী হ'য়ে উঠবে না? এতদিন আমরা যারা পেছন থেকে ফেউ ফেউ করেছি—জুজুর ভয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে রয়েছি—আজ নূতন সূর্যোদয়ের সংগে সংগে সমস্ত জড়তা ও ভয়—অবসাদ ও লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেশের পুনর্গঠনের কাজে আমাদের হাত লাগাতে হবে। কোথায় কোন রং-এর পোঁচ লাগলো না—দূর থেকে অঙ্গুলি নির্দেশে তা না দেখিয়ে নিজেদের হাতে তুলি নিয়ে সে অসমাপ্ত কাজটুকু সমাপ্ত করতে হবে।

আমাদের আজকের সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার স্থান যে রূপ-মঞ্চ নয়—তা আমার পাঠক-পাঠিকারা যেমন জানেন—আমিও তেমনি যে না বুঝি তা নয়। তাই যে সমস্যাগুলির সংগে আমরা জড়িত—তাই নিয়েই আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো। অনধিকার চর্চা করে আমাদের সমালোচনা করবার সুযোগ কাউকে দিতে চাই না।

আমার আজকের সমস্যা শিশুদের উপযোগী আমোদ-প্রমোদ নিয়ে। আমাদের আমোদ-প্রমোদের দায়িত্ব যাঁদের হাতে রয়েছে—রূপ-মঞ্চের প্রথম প্রকাশ থেকেই এ বিষয়ে আমরা তাঁদের অবহিত করে তুলতে চেয়েছি। রাশিয়া—ইউরোপ—আমেরিকা এবং প্রাচ্যেরও কতগুলি দেশের শিশুদের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের কথা তাঁদের সামনে তুলে ধরে যখন তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছি—তাঁরা মুখটি ঘুরিয়ে তখনই জবাব দিয়েছেন, "আরে মশায় রাখুন—স্বাধীন দেশে সবই সম্ভব। পরাধীন দেশে যা কিছুই করতে যাই না কেন টুঁটি চেপে ধরবে।" জবাব দেবার থাকলেও আমরা জবাব দেই নি। আমরা নিজেরাই অগ্রসর হ'য়ে গেছি এ দায়িত্ব পালনে। জুজুর ভয়ে আমরা উলু বনে যাইনি—আমাদের প্রচেষ্টায় জুজুরা টুঁটি চেপে ধরতে আসে নি—আমাদের অক্ষমতার জন্যই আমাদের সে-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারে নি। আর সে অক্ষমতায় আমাদের লজ্জার কোন কারণ ছিল না। আমাদের আন্তরিকতা ছিল—ছিল না অভিজ্ঞতা। তাই বাধ্য হ'য়েই চুপ করে থাকতে হ'য়েছে এতদিন। সক্রিয় ভাবে শিশুদের আমোদ-প্রমোদানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে আমরা অগ্রসর হইনি। আমরা পরোক্ষভাবে রূপ-মঞ্চের ভিতর দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে এসেছি। আমাদের এই আন্দোলন জনসাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছে - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের সংগে সুর মিলিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু তবু আমাদের অপেক্ষা করতে হ'য়েছে সেই দিনটার জন্য—যে দিনটা—আগত ওই!

একদিন ঐ দিনটার নজির দেখিয়ে যাঁরা আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন—আজ অতীতের অন্ধকার কাটিয়ে সেই দিনটা আমাদের সামনে চির ভাস্বর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাকে বরণ করে নেবার জন্য আমাদের শঙ্খনিনাদ দিগদিগন্তে যেয়ে পৌঁচেছে। সেই ধ্বনি কী আমাদের কর্তৃপক্ষদের বধির কর্ণে এখনও আঘাত খেয়ে ফিরে আসবে? না, ফিরে আসবে না। আমরা ফিরে আসতে দিতে পারি না। এলে কানাড়া পিটিয়ে আমরা তাঁদের কর্ণের সে বধিরতা দূর করবো। আজ তাঁদের জাগিয়ে তুলতেই হবে।

জেগেছেনও অনেকে। 'কালিকায়' স্বপনবুড়ো রচিত 'বিষ্ণুশর্মা' মঞ্চস্থ হ'য়েছে—নিউ থিয়েটার্স 'রামের সুমতি' চিত্র রূপায়িত করে তুলছেন। আমাদের মত অনেকের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পেয়েছে—তবে অনেক বিলম্বে। এবং এখনও অনেকে আছেন, যাঁরা এর প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন না—যাঁরা এই প্রয়োজন মেটাতে আজও অগ্রসর হ'য়ে আসছেন না। আজও যাঁরা ইতস্ততঃ করছেন। অথচ বহুপূর্বেই জাতির এই প্রয়োজন স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হ'য়েছিল তাঁর কাছে—বাংলা ও বাঙ্গালীকে বিশ্বের দরবারে যিনি সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—বাংলার সেই সত্যদ্রষ্টা কবির কাছে - যে বাঙ্গালী কবি বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবি বলে সম্মানিত হ'য়েছেন। এক-দিন শিশু থেকে শিশুদের যে বেদনা তাঁর প্রাণে বেজেছিল
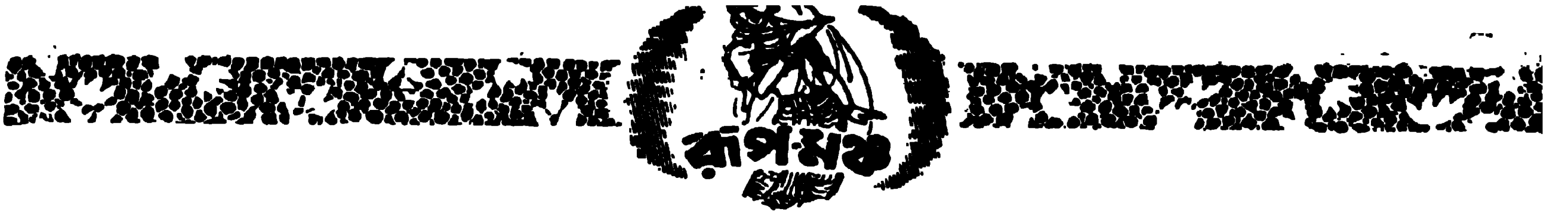
—সে বেদনা কোনদিন তিনি ভুলে যেতে পারেননি। তাই শিশুদের জন্য তিনি নাটক রচনা করে গেছেন—সে নাটক মঞ্চস্থ করে নিজে অভিনয় করে গেছেন। আজকে শিশু আমোদ-প্রমোদ নিয়ে আলোচনা প্রসংগে আধুনিক বাংলার সেই আদি শিশু-নট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই সর্বপ্রথমে মনে হয়—বাংলার সমস্ত বঞ্চিত শিশুদের তরফ থেকে সেই শিশু-নটকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আজ হউক, কাল হউক—শিশুদের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আমাদের কর্তৃপক্ষদের করতে হবেই। মুক্ত—জাগ্রত জাতির দাবীকে কোন মতেই তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না। এতদিন যেদিকে আমরা দৃষ্টি দিতে পারিনি—এতদিন যা গড়ে তুলতে পারিনি—আজ যখন সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছে—আমাদের অনেক দিনের একটা অভাব যখন আমরা অপসারণ করতে হস্তক্ষেপ করেছি—তখন প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে—কোন ভুল যেন এর ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। গোড়াতেই যদি ভুল করে বসি, সে ভুল আমাদের অস্থিমজ্জার সংগে মিশে যাবে। যেমন মিশে আছে বড়দের আমোদ-প্রমোদের বেলায়। আজও সে ভুল সংশোধন করে উঠতে পাচ্ছি না। কিন্তু পরিণত বয়স্কদের বেলায় দায়িত্ব একরকম, অপরিণত বয়স্কদের বেলায় অন্য রকম। পরিণত বয়স্কদের ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি আছে। আমাদের কর্তৃপক্ষরা ভুল দিয়ে পরিণত বয়স্কদের বেশীদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবেন না। যতক্ষণ আমরা মোহাচ্ছন্ন থাকবো—ততক্ষণ পর্যন্তই এই ভুলের পরমায়ু থাকতে পারে। তার বেশী নয়। বর্তমান চিত্র ও নাট্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ যা দিন দিন তীব্র প্রতিবাদের সুর নিয়ে বেজে উঠছে—এইত এর মস্তবড় সাক্ষ্য। কিন্তু ছোটদের অপরিণত বুদ্ধি এই বিচারশক্তি থেকে বঞ্চিত। স্বাদে যেটা ভাল লাগবে তারা তাই গ্রহণ করবে—নইলে বর্জন করবে। স্বাদে ভাল অথচ কার্যকারিতায় অপকারক এমন জিনিষ আমরা বড়রাও গ্রহণ করে থাকি—আর ছোটরাত করবেই। আবার ছোটদের বেলায় আরও একটা মস্ত বাধা আছে পরিণত মনকে জোর করে—বাধ্যবাধকতায় কিছু দেওয় যেতে পারে—কিন্তু ছোটদের মনের কাছে এই জবরদস্তি চলবে না। সেখানে চলতে হবে তাদের মেজাজ মাফিক। এই মেজাজ মাফিক না চললে তারা একদম অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে দেবে। তা'হলে সকল প্রচেষ্টাই হবে ব্যর্থ। তাই ছোটদের আমোদ-প্রমোদের বেলায় দু'টী জিনিষের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটী হচ্ছে তারা কি চায় আর একটী হচ্ছে কী তাদের দিতে হবে। ছোটদের মনের চাহিদা জানতে হ'লে শিশুমন নিয়ে গবেষণা করতে হবে। তাদের মনের প্রতিটি অলি-গলির ভিতর যেয়ে সব কিছু খুঁটিনাটি জেনে আসতে হবে।

এবং ছোটদের মনের চাহিদা আবার বয়সের বিভিন্নতার সংগে বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। ছোটদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব শিশুরা কেবল কথা বলতে ও হাটতে শিখেছে—তাদের চাহিদা আবার একটু যারা ডাট হয়ে উঠেছে তাদের চেয়ে পৃথক। শৈশবত্ব কাটিয়ে যারা বালক-বালিকারূপে আমাদের সামনে দেখা দেয়, তাদেরও প্রয়োজন পৃথক। আবার এই পর্যায় অতিক্রম করে কৈশোরের চাঞ্চল্যে যারা টগবগ করে, তাদেরও চাহিদা এক নয়। শিশু আমোদ-প্রমোদ বলতে —শৈশব থেকে কৈশোর অবধি বিভিন্ন স্তরের সকলের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের কথা আমরা বলছি। সকলের প্রয়োজন এবং চাহিদাকে একটা জগা খিচুড়ী পাকিয়ে পরিবেশন করে এক সংগে মেটাবার হীন মনোবৃত্তি থেকে কর্তৃপক্ষদের বিরত থাকতে হবে। এবিষয়ে অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল শিক্ষাব্রতী—লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক ও শিশুদের মনস্তত্ব সম্পর্কে যাঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—তাঁদের নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করতে হবে। এঁদের অনুমোদন ব্যাতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোন নাটক বা চিত্র উপস্থিত করতে পারবেন না। এই কমিটি সরকারীও হ'তে পারে—বেসরকারীও হ'তে পারে। এবং এই চিত্র বা নাটক কোন বয়সী শিশুদের

জন্য—তাও এঁরা বলে দেবেন। সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দেবেন। শিশুদের আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। নিজে একদিন শিশু থেকে শিশু-মনের এই গোপন ইচ্ছাটী জানতে পেরেছি। এবং শিশুমনস্তত্ব নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করেছেন, শিশুমনের এই ইচ্ছা তাঁদেরও যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ইচ্ছাটী হচ্ছে শিশুদের জন্য যে কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাই করা হউক না কেন—তাতে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে চায়। অর্থাৎ আমাদের মত নিষ্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে বসে থাকতে তারা নারাজ। অনুষ্ঠানের কোন বিষয়টী কিভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা খুঁটিনাটি জানতে চায়। এই জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অভিনব ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বেশীরভাগ শিশু নাট্য-মঞ্চে অভিনয় প্রারম্ভে কিছুক্ষণ সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং ঐ সময়ে উপস্থিত শিশু-দর্শকেরা মঞ্চের ওপর ওঠে এসে নিজেদের খুশীমত নাচগান ও বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। মূল অভিনয়ের সংকেত-ধ্বনি হবার সংগে সংগে তারা তাদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে উদগ্রীব মন নিয়ে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করে।

আমাদের দেশে এর নজির দেখাবো কী করে? কিন্তু শিশুকালে শিশুমন নিয়ে আমার পাঠক পাঠিকাদের অনেকেই যে এ বিষয়টী উপলব্ধি করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং আশা করি অনেকেই আমার মত সে উপলব্ধির কথা ভুলে যান নি। আমি বিশেষ করে ছোটবেলার হু'টী উল্লেখযোগ্য খেলার কথা উদাহরণ স্বরূপ এখানে উত্থাপন করছি—যে খেলা আমার পাঠক-পাঠিকাদেরও অনেকে খেলেছেন। এবং একে অভিনয় বল্লেও অন্যায় হবে না। এই খেলা বা অভিনয়ের ভিতর দিয়ে কীভাবে অভিনয়-স্পৃহা ছোটদের মনে মঞ্জরিত হ'তে থাকে তাও যেমনি বোঝা যাবে—তেমনি অভিনয়ে ছোটদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার স্পৃহারও সাক্ষ্য দেবে। এই দু'টী খেলায় ছেলে এবং মেয়ে দুইয়েরই মনস্তত্ব বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। এই খেলা দু'টী হচ্ছে—'রাজা-রাজা' ও 'বৌ-বৌ' খেলা। 'রাজা-রাজা' খেলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এতে ছেলেরাই প্রধানাংশ গ্রহণ করে এবং শৈশবের শেষ কোঠায় পা দিয়েই এ খেলার প্রতি তারা আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। বাপ দাদা বা অপরাপর অভিভাবকদের কাছ থেকে তারা রাজরাজাদের বিষয়ে যে কাহিনী শোনে—অথবা সবেমাত্র পড়তে শিখে এরূপ কাহিনী জেনেছে—তাকেই এই অভিনয় বা খেলার ভিতর দিয়ে মূর্ত করে তোলে। তাদের এই অভিনয়োপযোগী স্থান নির্বাচন করে বাড়ীর নিকটবর্তী বাগানে। সেখানে যেয়ে কেউ রাজা হয়—কেউ মন্ত্রী সেজে বসে—কেউ বা হয় রাজপুত্র—রাজ মহিষী। লোকজন কম থাকলে সারা বাগানের বৃক্ষ-লতাদিকেই তারা প্রজা করে নেয়। 'বউ বউ' খেলায় বা অভিনয়ে প্রাধান্য থাকে মেয়েদের। কেউ সাজে গৃহকর্ত্রী কেউ গৃহকর্তা—কেউ বর—কেউ কনে। দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। একদল কনে পক্ষ আর একদল মেয়ে পক্ষ। পাওনা-থোয়া নিয়ে কথা কাটাকাটির ভিতর দিয়ে বর-কনের বিয়ে হয়। বৌ'ভাতের আয়োজন হয় বরের বাড়ী—খাওয়া-দাওয়ার পর 'হেঁইও হো' শব্দের ভিতর দিয়ে পাল্কী চড়ে কনে বাপের বাড়ী যায়। অভিনয় শেষ হয়। এই 'বউ বউ' অভিনয়ের সময়ও কোন নাট্যকারের প্রয়োজন হয়না নাটক রচনা করতে, দৃশ্যকারের ডাক পড়ে না দৃশ্য রচনার জন্য। সারাদিন মায়ের পাশে থেকে থেকে পারিপার্শ্বিক যে ঘটনা তাদের মনে রেখাপাত করে—তারই ওপর ভিত্তি করে এরা নিজেরাই নাটক রচনা করে। 'বৌ-বৌ' খেলার স্থান নির্বাচিত হয় গৃহকোণে অথবা অন্দরমহলের কোন নির্জন স্থানে। প্রকৃতির লতাপাতা দিয়ে এরা তরিতরকারী ও মাছমাংসের কাজ চালায়। রান্নার তৈজসপত্র হিসাবে নিজেদের খেলনাগুলিই ব্যবহার করে। এদের এই অভিনয়ে নিজেদের ছাড়া বাইরের কোন দর্শক উপস্থিত থাকতে পারবে না—অকস্মাৎ যদি কেউ উপস্থিত হন কৌতুকবশতঃ,

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মালয়ের পথে

(২)

নৃত্যশিক্ষক প্রহ্লাদ দাস

★

১৬ই জানুয়ারী। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে ১২টা ১৫ মিনিটের সময় মালপত্র নিয়ে উঠে বসলাম বাসে —বাস চলতে আরম্ভ করল ধীরে ধীরে—ক্রমেই সিঙ্গাপুর সহর পেছিয়ে যেতে লাগল গাড়ীর অগ্রগতির সংগে সংগে। বিশ মাইল রাস্তা চলার পর সম্মুখে এগিয়ে এল এক স্রোতস্বনী। অপর তীরে "জহর বারু" ছবির মত ছোট সহরটি দাঁড়িয়ে আছে—মায়ের কোলে শিশুর হাসির মত, নদীর ওপর ভাসমান সেতু—সেতু পার হয়ে গাড়ী সহরে ঢুকতে না ঢুকতেই—এম, পি, এসে দাঁড়াল "হল্ট" বলে। অমনি গাড়ী গেল থেমে—তন্ন তন্ন করে গাড়ী দেখল, সবাইর নাম ধাম লিখে নিল। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটার পর—আবার গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। "জহর বারু" মালয়ের পুরাতন রাজধানী। নদীতীরে ছোট সুন্দর সহর। এখানে সুলতানের বাড়ী আছে এবং শাহী মসজীদ্ নামে একটি বিরাট মস্‌জিদ ছোট একটি টিলা পাহাড়ের ওপর অতীতের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। সুলতান আবুলকর্ এই মসজিদ তৈরী করাতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় অর্ধেক তৈরী হওয়ার পর। তাঁর পুত্র সুলতান ইব্রাহিম—আরও কিছুটা কাজ এগিয়ে দেন এবং তাঁর পুত্র আবদর রহমন প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই মসজিদের নির্মাণ-কার্য শেষ করেন—১৮৫২ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে। আমরা সবাই মসজিদের মীনারের ওপরে গিয়ে ওঠলাম—এই মিনারটী এত উঁচু যে, এর ওপর থেকে সমস্ত জহর বারু সহরটা একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল। বাংলা দেশে মসজিদে হিন্দুর প্রবেশ অধিকার নেই কিন্তু এই বিরাট মসজিদের রক্ষক যিনি, তিনি একজন সাধারণ ফকিরের মত পোষাক পরিহিত মালয়ান—আমাদের আদর করে মসজিদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সব একএক করে দেখালেন। কোরাণের বাণী শোনালেন এবং আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, 'মসজিদে সকলের প্রবেশ অধিকার আছে এবং সেখানে রাজা-প্রজা-দীন-দরিদ্র সব সমান—খোদার রাজ্যে সব মানুষই এক। সেখানে জাতিভেদ নেই—এই দেখ এই মসজিদের চারদিকে চারটী প্রবেশ পথ। যে যে পথ দিয়েই আসুক না কেন—সবাই এসে একত্র হবে মাঝখানে। ঐ রকম—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান যে যা বলেই ডাকুক না কেন—খোদা একজন—আমরা বিভিন্ন নামে তাঁকে প্রার্থনা করি। তাঁর রাজত্বে মানুষ-মানুষের ভাই।' এই বৃদ্ধ মালয়ান ফকিরের কথা শুনে মনে পড়ে বাংলার কথা—আজ যদি বাংলার মসজিদ ও মন্দিরের অধিকারীরা প্রত্যেক মানুষকে ঐভাবে উপদেশ দিতেন তবে বাংলার বুকের ওপর দিয়ে নর রক্তের স্রোত বয়ে যেত না। যাক্ মসজিদ থেকে বের হয়ে সুলতানের বক্তৃতা দেওয়ার সুউচ্চ সৌধের দিকে চললাম নূতন তৈরী এই দরবার কক্ষ। সুলতান বর্তমানে মালয়ে খুব কমই থাকেন—তিনি বেশীর ভাগ সময়ই বিলাতে থাকেন। জহর বারুর আর একটি দেখবার বিষয় হাসপাতাল। এত বড় হাসপাতাল মালয়ের আর কোথাও নেই। দুই একজন ডাক্তারের সংগে আলাপ হল, তারা বাংগালী। বিদেশে দুই চারজন বাংগালীর সংগে দেখা হওয়ায় মনটা খুবই খুশী হলো। পরের দিন আমরা রওনা হলাম—ফ্লুয়াং-এর দিকে। ৭০ মাইল রাস্তা জহর বারু হতে ফ্লুয়াং—পার্বত্য রাস্তা এবং এই ৭০ মাইলের যতটা দেখলুম, রাস্তার দুই দিকে তা প্রায় সবই রবারের জংগলে ঘেরা। তবে মাঝে মাঝে মংগুস্থানের বাগান দেখা যায় এবং চীনা ও বানরের লড়াইও চোখে পড়ে। কারণ, বাগানের মালিক চীনা এবং পয়সা না দিয়ে ফল খাওয়ার প্রয়াসী বানররা—তাই তাদের লড়াই লেগেই আছে। সারা দিন পর সন্ধ্যায় গিয়ে পৌছলাম ফ্লুয়াং বাজারে —রাতটা কেটে গেল। পরের দিন বাজারে গিয়ে দেখে নিলাম ছোট সহরটী—বাজারে পরিচয় হ'লো একজন দোকানীর সংগে। ভারতীয় দেখে সে আমাদের অভিবাদন করল "জয় হিন্দ" বলে। সে ছিল একজন আই, এন, এর সৈনিক—সে আমাদের বসতে বলল তার দোকানে—তার সংগে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম। নেতাজীর সম্বন্ধে

সে তার ট্রাঙ্ক খুলে অতি যত্নে রক্ষিত তার সেই সৈনিকের শতছিন্ন পোষাকটা আমাদের দেখালে এবং বললে—'নেতাজীর জন্ম দিনে আবার আমরা এই পোষাক পরব। আমরা এখানে প্রায় ৩ শত আই এন এর সৈনিক ও ৮।১০ জন ঝানসির নারীবাহিনীর মেয়ে নেতাজীর জন্মদিনে—প্রসেসন বের করব,—এর মধ্যে আমরা অনেক টাকা তুলেছি। সে আমাদের অনেক ছবি দেখালে—নেতাজীর সংগে জাপানে—হংকংএ এবং বেঙ্ককে তোলা। তাদের ধারণা, নেতাজী আবার ফিরে আসবেন তাদের মধ্যে। তার কাছ হতে কত উচ্চ প্রশংসা শুনলাম নেতাজীর সম্বন্ধে। নেতাজীর কাছে কোন জাতিভেদ ছিল না—তারা সবাই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মন, খৃষ্টান এক সংগে একই লংগরে খেত। তাদের হালাল ঝটকা বিবাদ ছিল না। এখানে হালাল ঝটকা সম্বন্ধে বলা দরকার। হালাল হলো জবাই করা মাংস এবং ঝট্‌কা হলো বলি দেওয়া মাংস। মুসলমান যাঁরা, তাঁরা ঝটকা মাংস কখনও খাবে না। এই নিয়ে তাঁদের আই, এন, এর সৈনিকদের মধ্যেও প্রথম একটু মন কসাকসি চল্‌ত। তারপর একদিন নেতাজীর কানে সে কথা যাওয়ায় উনি নিজে এসে দুই দলকে আলাদা ভাগ করে দিয়ে যান—হালাল, ঝটকা করবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন, মাংস কাটা হয়েছে? নিয়ে এস আমার কাছে—এবং আলাদা রাখ হালাল-ঝটকা। তখন সব মাংস নিয়ে আসা হয়—তখন তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন কী তফাৎ এই দুই ভাগ মাংসে—সবাই তখন বলে কিছুই না। তবে কেন এই বিবাদ—মিলিয়ে দাও সব মাংস। তোমরা যখন হিন্দু মুসলমান তখন এক সংগে খাও তোমরা এক জাতি। মাংস নিয়ে ঝগড়া করা তোমাদের উচিৎ নয় —তোমাদের কোন জাত নেই। তোমরা মানুষ। একজাতি দশ উদ্ধারই তোমাদের মূল দীক্ষা—সুতরাং সাধারণ লাকের মত মনের সংকীর্ণতা নিয়ে বিবাদ করা তোমাদের সাজে না। আই, এন, এ, সব এক জাতি এক প্রাণ। এই ভাবে সব বিষয় তিনি মীমাংসা করে দিতেন। তিনি দতেন সাধারণ সৈনিকের মত, প্রত্যেক রোগীর রোগ সজ্জায় সুখে দুঃখে সব সময় উনি এসে দাঁড়াতেন আমাদের মাঝে। তিনি মানুষ নন্ দেবতা—এই বলে সে নমস্কার করল দুই হাত মাথায় তুলে। অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে তার কাছে বিদায় নিলাম—যাওয়ার সময় তার নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম—সে একজন পেশওয়ারী মুসলমান। ফ্লুয়াং সহর অতি ছোট এবং চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় বেষ্টিত। পরেরদিন আমরা রওনা হলাম সকালে সাগামতের উদ্দেশ্যে—৮০ মাইল রাস্তা ফ্লুয়াং হতে সাগামত।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তাদের উপস্থিতির সংগে সংগেই এদের অভিনয় বন্ধ হ'য়ে যাবে। এরা একমাত্র তাদেরই অনুমতি পত্র দিতে পারে—যাদের এরা নিজেদের লোক বলে মনে করবে। অভিনয়ে এরা যে শুধু নিস্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে থাকতে চায়না—তার প্রমাণ আরও যথেষ্ট রয়েছে। যেমন মনে করুন, কোন স্থানে পুতুল নাচ—কী ম্যাজিক—অথবা ঐ ধরণের কিছু অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। বয়স্করা হয়ত অনুষ্ঠান দেখেই খুশী হবেন। কিন্তু ছোটদের অনুসন্ধিৎসু মন অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীন বিষয়-গুলি সম্পর্কে জানবার জন্য অধৈর্য হ'য়ে উঠবে।

ছোটদের কী ধরণের অমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে—অর্থাৎ বিষয় নির্বাচন আর একটী গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। যে কমিটি সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছি—ওরূপ কোন দায়িত্বশীলদের উপরই এই দায়িত্বের ভার ছেড়ে দিতে হবে। অথবা তাঁদের অনুমোদন লাভ করতে হবে। নইলে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন কর্তৃ-পক্ষদের হাতে এ ভার থাকলে—ছোটদের বঞ্চিত মনের খোরাকের জন্য যে আন্দোলন আমরা করছি—তা হিতে বিপরীত হ'য়ে দেখা দেবে। তাই আরো যদি কিছুদিন আমাদের দেশের ছোটরা আমোদ প্রমোদ থেকে বঞ্চিত থাকে, থাক। কিন্তু প্রবঞ্চনার দ্বারা তাদের বিপথে পরিচালিত করবার পরিকল্পনাকে আশা করি কোন অভিভাবকই সমর্থন করবেন না। তাই ছোটদের প্রতি যাঁরা দরদশীল, তাঁদের প্রত্যেককেই এ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। —শ্রীকাঃ

আমাদের ছায়াছবি

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

★

সাহিত্য প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ একবার যে কথাটি বলেছিলেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। সেই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে', সেই উক্তিটির বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পাই যেন আমাদের বর্তমান ছায়ালোকে। ছায়াছবির সংগে দর্শক-সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক আদান-প্রদান ও হৃদ্যতার নতুন গ'ড়ে ওঠা সম্পর্কটি এবং ছায়াজগতের কয়েকজন সত্যকার আদর্শ-বাদী স্রষ্টা এবং কর্মীর বলিষ্ঠ রুচি এবং দৃষ্টিভংগী আমাদের চিত্রজগতে যে নিশ্চিত আধুনিকতার আভাস এনেছে একথা নির্ভয়েই বলতে পারি। তার ভবিষ্যৎ যেমনই হোক, লক্ষণ সম্বন্ধে আশা ও আনন্দ করার অনেক কিছুই আছে বই কি! বলতে কি, বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির সংগে বাংলা ছায়াছবির সাদৃশ্যটি আমাদের চোখ এড়াতে পারে না যদি বাংলা সাহিত্য ও সিনেমার ধারাটিকে মিলিয়ে দেখি। সাহিত্যের মত সিনেমাতেও যদি একটা প্রাচীন যুগ অর্থাৎ সেকাল মেনে নেওয়া যায় ত দেখা যাবে এই কালটা ছিল মোটামুটি ভাবে ধর্ম-সচেতন বা দেব-সচেতন। তখনকার ছায়াছবির সীমাবদ্ধ অবলম্বন ছিল সনাতন পৌরাণিক গার্হস্থ্য ধর্মনিষ্ঠ জীবনের পটভূমিকা তা' সে দেবতার লীলা অথবা অনুগ্রহ নিগ্রহ বর্ণনাই হোক আর দেবোপম অতি প্রকৃত চরিত্র চিত্রণই হোক। ক্রমশঃ এই গতানুগতিকতা যে কোনো কারণেই হোক বাধা পেলো সমাজ-সচেতনার জোয়ারের কাছে। আমরা পেলাম সাধারণ সমাজ ও সংসার চিত্র। অধিকাংশ এই সব ছবিতে সুরু হোলো কল্পিত এবং কষ্টকল্পিত পুরাতন সমস্যার অবতারণা। কাহিনী ছিল সাধারণতঃ নীতিমূলক বা শিক্ষাত্মক। এবং বলা বাহুল্য কাহিনীর সংগে একটি দুর্বৃত্ত চরিত্র বা ভূমিকার যোগাযোগ ও রকমারি সম্ভব অসম্ভব ক্রিয়াকাণ্ড ছিল অপরিহার্য। মনের ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির ছবিটির কথা চিত্রস্রষ্টাদের তেমন মনে হোতো না। ঠিক এই সময়ই আমাদের ছবিতে দেখলাম কাহিনীতে প্রাসংগিক অপ্রাসংগিক ঘটনার ভিড়। ভূমিকাগুলি টাইপবিশেষ, মুখের কথার মানুষ। রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় অজ্ঞাত। দর্শকমহল থেকে কাজেই শীঘ্র একটা আবেদন এলো চিত্র মালিকদের কাছে, ছবিতে বাবস্তুতা চাই, প্রণালীবদ্ধ নিয়মমাফিক ছবি তৈরীর প্রচলিত ধারাটির পরিবর্তন চাই। চিত্রবিধাতা তাকালেন পাশ্চাত্যের দিকে। বিদেশী সাহিত্য এবং সিনেমার ছায়া পড়তে লাগলো আমাদের ছায়াছবিতে। এর ফল অনেক ছবিতেই বিপরীত হ'লেও কোনো ক্ষেত্রেই যে অনুকূল হয়নি এমন কথা বলা চলে না। রক্তমাংসের মানুষ অর্থাৎ 'human being' না পাওয়া গেলেও এক একটি মানুষের একটু ক্ষণিক আবির্ভাব রূপালী পর্দাকে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ক'রে তুলত। কিন্তু এই সময়ই চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিবেরা তাঁদের ছবির বিজ্ঞাপনে এবং বিজ্ঞপ্তিতে বাছা বাছা চোখা চোখা কয়েকটি বিশেষণ যেমন 'আধুনিক' 'অতি আধুনিক' 'প্রগতিশীল' খুসীমত ব্যবহার করতেন। এই সব বিশেষণের সংগে বিশেষ্য অর্থাৎ তাঁহাদের বিজ্ঞাপিত ছবির যোগ রইলো না, সেদিকে ছবির প্রযোজক পরি-চালকের দৃষ্টি দেবার দরকার বা অবসর হোতো না। যৌন আবেদন সঞ্চারের প্রয়োজনীয় উপাদান থাকলেই ছবির আকর্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

এই অবস্থাও ব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কিছুকাল থেকে। বাংলা ছবির অনুরক্ত এবং ভক্তজন একে স্বাগত জানিয়েছেন সংগে সংগেই। এই পরিবর্তন আমাদের ছায়াছবিতে নিয়ে এসেছে ব্যক্তি সচেতনতা, টাইপ চরিত্রের অভ্যস্ত চিত্রণ ছেড়ে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে; তার অনাবৃত রূপ, সুসংবদ্ধ সংবেদনশীল কাহিনী স্রোতের আবর্তনে তার প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়াকাণ্ড তুলে ধরছে দর্শকের রসপিপাসু কৌতূহলী চোখের সামনে। তাই দেখি,
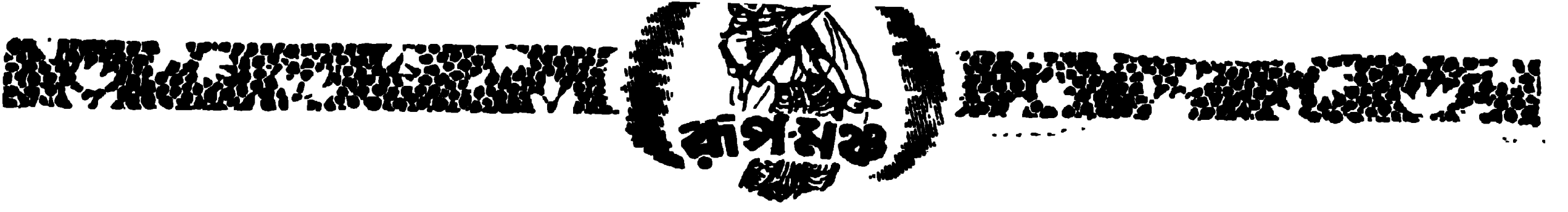
অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতের নিয়ন্ত্রণ অধীন অনিচ্ছাকৃতভাবে দুর্বৃত্তি পরায়ণ মানুষটিও আর যে কোনো ভূমিকার মতই আমাদের সহানুভূতি ও আগ্রহ নেয় আত্মসাৎ ক'রে। তাই দেখি, মিলনান্তক ছায়াছবির শেষেও বাজে কান্না আর ট্রাজেডীর সুর। বাহিঃ প্রকৃতির সংগে ঘটেছে মানবমনের অন্তরংগতা— তারই অপরূপ আলেখ্য পাই বর্তমানের কয়েকটি বাংলা সবাকচিত্রে।

বিশেষ ক'রে দুটি বিষয়ে এই অভিনব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় স্পষ্ট। একটি এই ট্রাজেডীর পরিকল্পনা ও ব্যঞ্জনায়। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার ট্রাজেডীর উদ্দেশ্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে যে সুন্দর কথাটি লিখেছিলেন, 'The spectator of a perfect tragedy goes forth convinced that life is not worth—living,'— জীবনের নিরপেক্ষ এই বিশ্লেষণী মনোভাব, জীবন ও জীবিতের বাণী ও তার প্রতি মমত্ববোধ বর্তমান যুগের বিয়োগান্ত দু'একখানি বাণীচিত্রে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ আগেকার ট্রাজেডী এই চিত্রের এলাকায় যেখানে শোক প্রমাণ ও চোখে বারণ ও কারণহীন জল আনার উদ্যোগেই হোতো বিড়ম্বিত, বর্তমানের বেশীর ভাগ করুণ রসাত্মক ছবিতেই সেখানে আয়োজন রয়েছে অন্তরে ও বাহিরে দুর্নিবার ঘটনাচক্রের আবর্তনে লাঞ্ছিত মানবাত্মাকে বিকশিত ক'রে তোলার এবং প্রসংগক্রমে শোক প্রকাশের, প্রমাণের নয়। অর্থাৎ করুণ রস প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এসেছে নতুনত্ব। করুণরসপ্রিয় দর্শকের চোখ এবং রুমালখানি অশ্রুসিক্ত ক'রে, একান্ত প্রত্যাশিত এই লবণাক্ত অশ্রু-সমুদ্রের ওপর অর্থনৈতিক সাফল্যের শ্যামল দ্বীপটি রচনা ক'রে নিরুদ্বেগ ও নির্বিঘ্ন হওয়ায় যে প্রলোভন ছিল চিত্রজগতের কর্মকর্তাদের মধ্যে তা' নিঃসন্দেহেই কেটে যাচ্ছে একথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে।

বিশ্বকবির আর একটি উক্তি স্মরণ করুন। 'উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা।...তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেওয়া, যেখানে রূপের পূর্ণতা, সেখানে রূপ কুরূপ হ'তেও সঙ্কোচ করে না, কেন না তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে, যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্সপীয়ারের ইয়াগো।' এই যে রূপের পূর্ণতা এবং কুরূপকে অপরূপ ক'রে তোলা, গতিবেগ ও বলিষ্ঠতার সাহায্যে কাহিনী ও ভূমিকায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বাণী ও চিত্রের অপূর্ব সামঞ্জস্য আর সমাবেশই কি সাম্প্রতিক বাণী চিত্র কয়েকটিতে দেখা যায়নি? অবিশ্যি এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। গত জুন মাসে জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লেখা কাহিনী অবলম্বনে যে দুখানি ছবি একই সংগে কলকাতার চিত্রগৃহে দেখানো হয়েছিলো এবং যাদের মধ্যে কাহিনীগত এবং সমস্যাগত মূল সুরের হুবহু মিল দেখা গিয়েছিলো তার কথা আলাদা। সেগুলিকে এই এলাকায় উল্লেখ করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

এই তো গেলো বর্তমান ছবিতে বিষয়বস্তু বা ভাব এবং সেই ভাব প্রকাশের রীতি বা ভংগির পরিবর্তন। ছায়াছবিতে আমাদের চিত্তে সাড়া জাগাবার গুণ বা ক্ষমতাও যে সমান প্রয়োজনীয় একথা এখনকার ছবিই স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ঘটেছে এখানে ছবির মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাজাত্য গর্বকে আবশ্যকীয় উপকরণ ও কাহিনীর সাহায্যে এবং প্রাণময় জীবন্ত সংলাপ ও নাটকীয়তার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত করায়, সেই সংগে আত্মসচেতন এবং উন্মাদনাময় দর্শকসম্প্রদায়ের প্রাণে প্রাণে। চিত্র ও চিত্তের মধ্যে এই যে নতুন ধরণের যোগসূত্র স্থাপনা তা' বর্তমান চিত্রশিল্পের ঐতিহাসকে গৌরবময় ক'রে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেখানে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রথম ধাপ দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের উপলব্ধি, দ্বিতীয় স্তর স্বাধীনতাহীন জনগণের হীনতা ও অত্যাচার বোধ, তৃতীয় স্তরে রয়েছে ভারতের অখণ্ডত্বের অনুভূতি এবং চতুর্থ হোলো শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরাধীন এই জাতির বলপ্রয়োগ কল্পনা আর পঞ্চম ও শেষ

(৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাত্মা গান্ধীর বিহার ভ্রমণের বাস্তব ছবি

শান্তি সাধনায় গান্ধীজী

পরিবেশক ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ, কলিকাতা।

সমৃদ্ধির পথে

সাধনার ঐকান্তিকতায়

আগামী যুগের

শুভ-সূচনা বহিয়া আনিয়াছে

মুক্তি প্রতীক্ষিত

: পরিবেশক :

দি ল্যুকস ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরস

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

…ত ন ব সু
…চা লি ত
…দা ন'-এ
…ন্দা দেবী
…সিতবরণ

জাপানের রংগমঞ্চ

(২)

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

★

জাপানের রংগমঞ্চের রূপচর্চার সহিত সমগ্র প্রাচ্যের আদর্শ ও অনুষ্ঠান জড়িত। জাপান পূর্বাঞ্চলের অনেক সমস্যাকে সহজে সুষ্ঠুরূপে সমাধান করেছে। আধুনিক জগতের ঊর্মি ও প্রত্যূর্মির আঘাত হ'তে জাপান নিজকে দূরে রাখেনি। জাপান রাষ্ট্রহিসাবে স্বাধীনতার সমগ্র প্রেরণায় সমুজ্জল—পরাজিতের মনোভাব কখনও এজাতির রসকৃত্যে কালো ছায়া ফেলেনি। অনেক বিষয়ে জাপান ইউরোপীয়ভাবে এতটা মশগুল যে, তাকে প্রাচ্যের সঙ্কীর্ণ আয়তনে ফেলাও মুস্কিল। আধুনিক সভ্যতার সকল যন্ত্র জাপানের করায়ত্ত হয়েছে। অবলীলাক্রমে জাপান অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে এতটা অগ্রসর হয়েছে যে, চীন ও ভারত আজ বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। এজন্য ভারতের পক্ষে জাপানের কলাকৃত্যের পরিমাপে বিপদ আছে। পরাজিত ও পদদলিত জাতির পক্ষে স্বাধীন জাতির মনন বিশ্লেষণে কল্পনা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন।

কলাকৃত্যেও জাপান চীন বা ভারতের মত স্থবির ও গলিত হয়ে পড়েনি। চীনের ড্রাগন, বা ভারতের মকর অতীতের ছায়াচ্ছন্ন উপাখ্যানের শেষ নিদর্শন—কিন্তু জাপানে পাওয়া যাবে নবতর কল্পনা। বিপ্লবাত্মক সৌন্দর্যবাদ এবং সাহসিক অগ্রগতি। জাপানের নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চ বিচারে জাপানী চিত্তের সমগ্র ঝটিকার গমকই ধরা পড়ে। কোথায় জাপান কতটুকু প্রাচীন আবার কোথায় তা' সম্পূর্ণ নিরাভরণরূপে নবীন তা দেখে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে।

জাপানী থিয়েটার সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছে এবং এই তের শত বৎসর অক্লান্তভাবে চলে এসেছে নূতন আবেষ্টন আবহাওয়া ও আশা পোষণ করে। কাবুকি থিয়েটার আধুনিক জাপানের সৃষ্টি। এর অভিনেতৃদের 'কাওয়ারামনো' বলা হয়। এই কাবুকির ভিতর বহু পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঢুকেছে যাতে করে আগেকার নদীতীরের আবহাওয়া নানাভাবে ভারাক্রান্ত হয়েছে। শুধু তা' নয়, আধুনিক যুগে জাপান রস-প্রসংগে আন্তর্জাতিকতার (Internationalism) মন্ত্র গ্রহণ করেছে। এবং তা'তে করে' এরূপ উপাদেয় সম্ভার উপস্থিত করেছে যা, বিশ্বজনের আনন্দে ভোগ-যোগ্য হয়েছে।

এর কারণ আছে। জাপানের চিত্ত একদিকে একেবারে মুক্ত—ভারত ও চীনের ন্যায় কোন জগদ্দল পাথর ওর বুকে চেপে ছিল না। এজন্য কোন নূতন রীতি গ্রহণ করতে সভ্যতা ও শীলতাগত বাধা জাপানকে প্রতিহত করেনি কোন কালেই। মনে রাখা দরকার, জাপন নো-নৃত্য ও নো-কিওজেন (Kyogen) গ্রহণ করেছে বাহির হ'তেই—সেগুলি খাঁটি জাপানের সৃষ্টি নয়। এসব রঙ্গপ্রথা কোরিয়ার Gigaku হ'তে গ্রহণ করা হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে। এগুলির আদি উৎপত্তি স্থান হচ্ছে মধ্যএসিয়া এবং মধ্য এশিয়াও সম্ভবতঃ পেয়েছে ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হ'তে। কিন্তু সে জন্য জাপান কখনও আপসোসও করেনি—দুঃখও পায়নি। স্বাধীন জাতি আনন্দ চায় এবং এই আনন্দের উপাদান স্বাধীন বলেই সগর্বে সমগ্র পৃথিবী হ'তে আহরণ করতে পারে। ইউরোপীয়দের পোলো খেলাও ইউরোপের নয়—দাবা খেলাও নয়। এসব ভারতবর্ষ হ'তে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করেছে—অথচ তাতে ইউরোপ নিজকে অবনত মনে করেনি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ কামাকুরা (Kamakura) যুগে নো-নৃত্য 'Enner-no-mat' নামক এক বিচিত্র নৃত্য হ'তে কল্পিত হয়। নৃত্য ও সংগীতের ভিতর দিয়ে একটা দীর্ঘ আখ্যানকে উপস্থিত করা ছিল নো-নাট্যের লক্ষ্য।

তা' ছাড়া আর এক রকমের নৃত্যনাট্য জাপানে খুবই প্রচলিত হয়। এ ব্যাপারের নাম হচ্ছে Bugaku। প্রায় হাজার বছর আগে এর সৃষ্টি হয়। এ নাট্যে নৃত্য
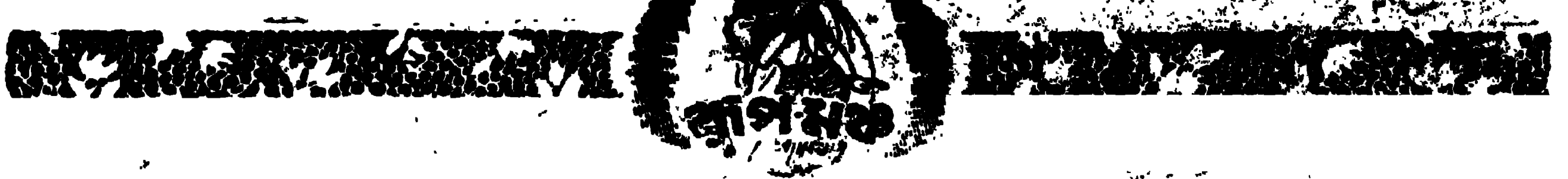
ও সংগীতের প্রভৃত ব্যবস্থা থাকে। জাপানে Bugaku নাট্য সপ্তম শতাব্দীতে চীন, ভারতবর্ষ ও কোরিয়া হ'তে গ্রহণ করা হয়। মুখোশ পরে' নৃত্য করা এবং তাতে করে কোন উপাখ্যান সৃষ্টি করা ছিল এই নাট্যের মূল লক্ষ্য। এতে নৃত্যের দু'টি ধারা অংগীভূত করা হয়। একটি হচ্ছে চীনদেশীয় ও ভারতীয়—অন্যটি হ'ল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার। কাজেই পাঁচরকমের নাট্যপ্রসংগ জাপানে সৃষ্টি হয়। প্রথম হ'ল Gigaku ও Bugaku, দ্বিতীয় নো-নৃত্য, তৃতীয় নো-প্রহসন (Kyogen), চতুর্থ পুতুল অভিনয় এবং পঞ্চম হচ্ছে কাবুকি।

যখন অভিনয়ে দু'টি উচ্চবংশীয় লোকের কথোপকথন চলতে থাকে তখন বাঁশী, দামামা ও 'Samisen' মৃদুভাবে বাজান হয়। এরকমের ঝংকারের পটভূমিকার উপর বাক্য-বিন্যাস খুবই সুশোভন হয়। তা ছাড়া সাজসজ্জা ও অংগভংগীর বৈচিত্র্যও অসামান্য। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় আয়োজনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে জাপানের ব্যবস্থা। বীরেরা প্রতিহিংসার ভংগী করে নাট্যমঞ্চে শত্রুর সম্মুখীন হয়। এ ভংগীর জন্য কিছুটা কৃত্রিমতার ও প্রয়োজন হয়। চোখের চারিদিকে চওড়া লাল রেখা এবং চোখ, নাক ও চিবুকের চারিদিকেও লালরঙের তিলক এঁকে দেওয়া হয়। কপালের উপর ও উর্ধ্বমুখী শলাকার চিহ্ন রচিত হয়। নাটকে যে দুষমনের (Villain) অভিনয় করে ওর মুখের নীচের দিকটাতে কালো রঙ মেখে দেওয়া হয় এবং চিবুকে সাদা রঙ দেওয়া হয়। মুখের উর্ধ্বভাগের শিরাগুলি এঁকে দেওয়া হয় লাল রঙে এবং চোখের ভ্রূকে হরিণের শিঙের মত করে' নীলরঙে আঁকা হয়। কাজেই নাট্যকলায় ভাবসৃষ্টির খাতিরে এ রকম বর্ণ বিন্যাসের কিছুটা অত্যুক্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

প্রাচ্য দেশে যা স্বাভাবিক ইউরোপের চোখে তা হয়ত অস্বাভাবিক। অশ্বারোহীকে মঞ্চের উপর আস্ত জীবন্ত ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হ'তে হয় পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এতটা হুবহুত্বের দাবী দর্শকদের মোটেই নেই। কাবুকি নাট্যে অশ্বারোহীর ঘোড়াটিকে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়েই সৃষ্টি করে। এর ভিতর কোন কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা কেউ লক্ষ্য করে না। ভারতবর্ষের যাত্রা গানের আসরে যে শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করে—সেও সুযোগ বুঝে হুঁকো নিয়ে মাঝে একটু তামাক খেয়ে নেয়। তা'তে কেউ মূর্ছিত বা শিরোরোগগ্রস্ত হয় না। চীনদেশের নাট্যকলার একটা ছোট বাঁশের উপর দু'খানি পা ফেলে যখন অভিনেতা মঞ্চটি একবার ঘুরে আসে তখন সকলেই মেনে নেয় যে, সে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। একেবারে আস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা হ'তে কিছু বাদ না দিলে সত্যিকার অভিনয় কোন কালেই সম্ভব হয় না। এজন্য ইদানীং ইউরোপের রসজ্ঞেরাও মনে করেন, হুবহুত্বের জন্য নাট্যমঞ্চকে একটা প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরে পরিণত করা যায় না এবং অসংখ্য উপকরণ স্তূপাকার করলেও প্রাচীন যুগের আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আধুনিক নাটক পশ্চিমে ও বাস্তববাদী না হয়ে Symbolic হয়ে পড়েছে। দু'একটি চিহ্ন বা তিলকের সাহায্যে একটা বিষয়কে উপস্থিত (suggest) করা সব সময় চরম কর্তব্য বলে' স্থির করা হয়েছে।

পুতুল নাচকেও সব সময় একটা গুরুতর সৃষ্টিরূপে উপস্থিত করার বিপদ যথেষ্ট। ইউরোপীয় হিসেবে এ রকম নাট্যকলা ঠিক স্বাভাবিক অভিনয়ও নয়। নায়ক নায়িকাদের কাঠের পুতুলে পরিণত করে শুধু মুখের বা দেহের ভংগীর সাহায্য নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। বলা প্রয়োজন, জাপানের পৌত্তলিক অভিনয় দুনিয়ায় এ শ্রেণীর সকল অভিনয়ের সেরা।

কারণ, জাপানী পুত্তলিকাগুলির সচল ভংগী অভূতপূর্ব। এজন্য কোন ইউরোপীয় লেখক বলেন, "There is no country in the world with such highly developed types of Puppets।" ভ্রূ, চোখ, মুখ এমন কি আঙুলগুলি পর্যন্ত চালিত করার ব্যবস্থা জাপানী পুতুলমঞ্চে আছে। আধুনিক ইউরোপীয় রসজ্ঞেরা এ শ্রেণীর নাটকের অতিরিক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছেন—কারণ, তাঁদের মতে জীবন্ত অভিনেতারা অভিনয়কালে

সাধারণতঃ নানা অত্যুক্তিই করে থাকে—তাদের শাসন করা কঠিন। এই অত্যুক্তি সংযত করতে হ'লে Marionette ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। এজন্য এযুগে গর্ডন ক্রেগ (Gordon Craig) বলেছেন, "There are tremendous things to be done. We have not yet got near the thing over marionettes and wordless plays and actor-less are the obviovs steps to a far deeper mystery."

বস্তুতঃ প্রাচ্যদেশের এ শ্রেণীর সমস্ত অভিনয়ের প্রভাব সুদূরবিস্তৃত হ'য়েছে। ইদানীং পুঞ্জীভূত স্বাভাবিক আয়োজন বর্জন করে ইউরোপীয় নাট্যকারেরা রূপকের সাহায্যেই সব কিছু প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন। ম্যাক্স রাইনহার্ট সেক্সপীয়ারকে রূপক দৃশ্যাদির (Symbolic scenes) সাহায্যে ইউরোপে উপস্থাপিত করেছেন। মিঃ অচিচি এরকম একটি নাটক অভিনয় দেখে বলেন, "The play was winter's tale. Almost all the scenes in Sicily were played in a perfectly simple yet impressive decoration—a mere suggestion without decorations।" জাপান ও চীনের রঙ্গমঞ্চের প্রভাবেই ইউরোপে নিত্য নূতন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে রূপকের দিকে সকলে আকৃষ্ট হয়। কোন সমালোচক বলেন, "They are passing from naturalism to artistic naturalism, to realism and ultra-realism, thence to artistic synthesis is symbolism and now to ultra symbolism."

শুধু তাই নয়। মিতরলিংক প্রমুখ নাট্যকারেরা নাটকের বহিরংগ ঘটনার দিক্গুলিকে সংযত করে সমস্ত ব্যাপারকে অন্তরংগ ব্যাপারে পরিণত করতে উৎসাহিত হ'য়েছেন। এর মূলে আছে প্রাচ্যের প্রভাব ও আদর্শ। জাপানের জাব ও প্রবাহমান নাট্যলীলা ইউরোপের চিন্তাক্ষেত্রে কর্ম বিপ্লব নিয়ে আসে নি।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় প্রয়োজন হ'লে প্রাচীন রীতি অনুসারে অভিনয় করতে জাপান কখনও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি। কাবুকি নাটকই হোক—পৌত্তলিক নাটকই হোক—এ দুটিতে বহু তথাকথিত অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতাকে সৌন্দর্যের ছন্দে একান্তভাবে হৃদয়গ্রাহী করে' একে উন্নীত করা হ'য়েছে উচ্চস্তরে—যেখানে বাস্তবতার প্রশ্নই উঠে না। পরপদানত ভারত একেবারে নিজেদের প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে' ইউরোপের মাল মসলা ও সমস্ত আবর্জনা নিয়ে ইংরাজী আমলে যে মঞ্চ করেছে তা' ঘরেরও নয় বাইরেরও নয়। ভীরু চিত্ত নিজকে সুসভ্য করতে এমনি মঞ্চ করেছে যা' নাট্যরস সঞ্চারের দিক হ'তে অপটু ও ভ্রান্তিমূলক। অপরদিকে ঠিক পাশ্চাত্য প্রথায় ও কিছু করতে সাহসী হয় নি—কারণ, দুর্বল মনোভাব নূতনত্বকে অবলম্বন করতে কখনও সাহস পায় না।

জাপানে সমগ্র কলা চর্চায় দু'টি পথ গৃহীত হ'য়েছে বলিষ্ঠভাবে। একটা হচ্ছে প্রাচীন—অন্যটি হচ্ছে নবীন। নবীন পন্থীরা নিজেদের কলাকে আন্তর্জাতিক রচনা "International art" বলে থাকে। এই আন্তর্জাতিক রচনা একেবারে পাশ্চাত্য। এক্ষেত্রে পশ্চিমের রচনাকে প্রভাবিত এমন কি পরাজিত করতেও জাপান কম উন্মুখ নয়। সংগীতকলার ধরণ একেবারে বিলাতি ধারারও প্রবর্তন করেছে। বিলিতি জার্মান কনসার্ট এবং উচ্চ শ্রেণীর Beethovian ও Mozart প্রভৃতির রচনাকে ওরা গভীরভাবে চর্চা করেছে। এক্ষেত্রে নিজেরাও নানাভাবে পশ্চিমের আদর্শ অনেক কিছু রচনা করে' ধন্য হ'য়েছে। চিত্রকলাক্ষেত্রেও ওদের আন্তর্জাতিক রচনা Cezanne প্রভৃতিতে শিল্পীর ছন্দে উদ্ভাসিত হ'য়েছে। এতে ওদের মোটেই সংকোচ হয় নি। স্বাধীন জাতির স্বাদেশিকতা এতে মোটেই ক্ষুন্ন হয় নি। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য শুনতে ওরা প্রস্তুত নয়। ওদের এ বিষয়ে কোন সমস্যা নেই। ভোগের ঊর্মিত গতিবেগের ভিতর সৌন্দর্যের সমুদ্র মন্থনে ওরা রূপাধিষ্ঠাত্রী শ্রীকে লাভ করেছে। ভারতের রুগ্ন স্বাদেশিকতার ভীরুতা তাদের নেই। ইংরাজীতে কথা

আছে—"None but the brave deserves the fair." ফলে ইউরোপীয় কায়দায় রচিত রূপ-মঞ্চও নব্য জাপানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। যুগ্মনৃত্যাদি যেমন সামাজিক পান ভোজনে প্রচলিত করা হ'য়েছে তেমনি অপেরা ও ব্যালেটের মঞ্চ নূতন ঐশ্বর্যে জাপানের নব্য সাধনায় মঞ্জরিত হ'য়েছে! জাপানের সৌন্দর্য সাধনার এই যৌবন জলধি তরংগ রুদ্ধ করবার সাধ্য কার'ও নেই। শুধু নৃত্যগীতাদি নয়, পরিচ্ছদ পর্যন্ত ইউরোপীয় গ্রহণ করে' ওরা পাশ্চাত্য জগতের ভীতি উৎপন্ন করেছে।

এইভাবে নব্য জাপানে international stage-এর সূত্রপাত হ'য়েছে যাতে কাবুকির রম্য কল্পনা অপার্থিব স্বপ্ন এবং দুরধিগম্য ভাবসম্পুটের বাড়াবাড়ি নেই। একদিকে জাপান অতীতের সৌন্দর্য উদ্যানে পুষ্প চয়নে মাতোয়ারা হ'তে জানে—কেন না হাজার বছর পুরাতন রসসৃষ্টি ও প্রাচ্য অঞ্চলে কখনও বর্ধিত-শ্রী হয় না। নিত্য নূতনের ফরমায়েস অতীতের সৃষ্টিকে কখনও ইউরোপের মত কংকালিত করে না। লরেন্স্ বিনিয়ন (Laurence Binyon) প্রাচীন চৈনিক শিল্পী কুকাইচির (Kukaichi) একখানি ছবি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন যে, কুড়ি বছর প্রায় রোজই এই প্রাচ্য ছবি খানি তিনি দেখে আসছেন কিন্তু তবুও তা একঘেয়ে হয় নি। নিত্য নূতন সৌন্দর্য চিত্রখানি হ'তে যেন তার চোখে ভেসে ওঠে—মনে হ'য়েছে। প্রাচ্য জাপানের প্রাচীন মঞ্চও এরকমের অনন্ত যৌবন পান করে' জয়ী হ'য়েছে। তা' বলে' একস্তরে বা এক সংকীর্ণ গুহায় মনকে স্বাধীন জাতি কখনও চিরকাল আটকে রাখতে চায় না। প্রাচীন যুগে স্বাধীন ভারত জগতের রূপশ্রীর বহু উপাদান নানা জাতি হ'তে অর্ঘ্য দ্বারা গ্রহণ করে' নিজকে উপবিত করেছে। স্বাধীনতার লক্ষণই হচ্ছে এই শ্রেণীর গ্রহণ ও ভোগ। খাঁটি ইউরোপীয় নৃত্য, গীত ও
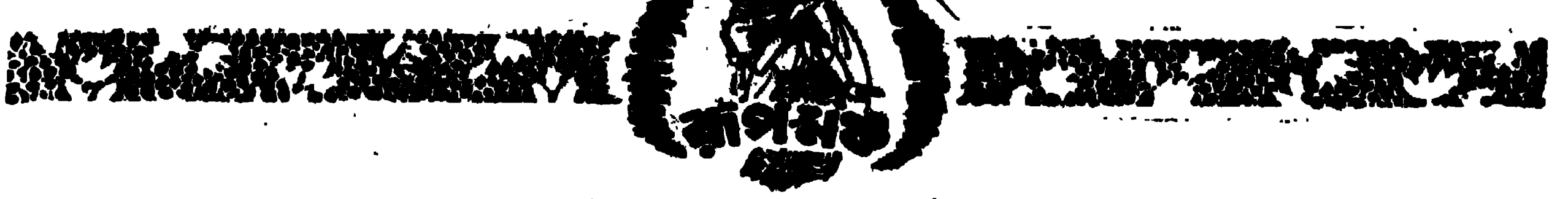
বাদ্যাদির ঝংকারে জাপান নিজের পারদর্শিতা দেখিয়ে ইউরোপকে বিস্মিত করেছে। বলহীনের পক্ষে যা' দুষ্পাচ্য বীরের পক্ষে তা' নয়। কাজেই জাপান যা' করেছে তা'তে গ্লানি বা অগৌরব নেই। ভগ্নপদ ভারতের পক্ষে কোন পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। পোষাকে আচারে, আনন্দে ও অবসরে এদেশে গ্লানির শেষ নেই। ভারতে তাই সব জায়গায় মিশ্র খিঁচুড়ী তৈরী হ'য়েছে মাত্র, যাতে বলিষ্ঠ প্রেরণা মোটেই নেই।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানের মতে কলাকৃত্যেও জাপান, চীন ও ভারতের মত স্থবির হ'য়ে পড়েনি। জাপানে আছে একটা সদাজাগ্রত ভাব এবং সহজ নবীনত্বের উগ্র পিপাসা। জাপানের ধর্ম চীনের মত কনফ্যুসিয়সের নিয়ম কানুনে আড়ষ্ট নয় বা ত্যায়োধর্মের (Taoism) আত্মসর্ববর্জনের নিষ্ক্রিয়তালে কল্পিত নয়। একমাত্র জাপানেই ভারতের তান্ত্রিক শক্তি ও ভোগবাদ এখনও সজীব আছে। একসময় ভারতবর্ষকে এই তত্বই স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে। চীনদেশের দুর্ভাগ্য অপেক্ষাও ভারতের হীনবীর্য প্রেরণা অধিকতর অনুতাপের বিষয়। ভারতের মায়াবাদ, অনাশক্তিবাদ ও বৈরাগ্যবাদ পরাজিত মানসিকতার (defeatist philosophy) ভিতর দিয়ে কংকালটীর 'প্রেম' ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অহিংসার মুখোস পরে' পদলেহন ও সেবার ভিতর দিয়ে দাসত্বের অভিনয়ে অগ্রসর হ'য়েছে। এ অবস্থায় বিন্দুমাত্র সৃষ্টি-শক্তি আশা করা বৃথা। এখানকার নাট্যমঞ্চ এজন্য একেবারে শূন্যগর্ভ, বিরোধপূর্ণ ও জীব-মৃত। ভোগের ঐশ্বর্য যাদের চোখে পড়ে না—ভোগের সুগভীর কারুতা ও তুরীয় শ্রী তারা বোঝে না। তাদের নাট্যমঞ্চে কি আশা করা যায়?

জাপানের কলেজের যুবক যুবতীরা সেক্সপীয়র (Shakespear) অভিনয় করতেও ও পটু। নব্য আন্তর্জাতিক রংগমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে কলেজের যুবকেরা Hamlet অভিনয় ক'রে আধুনিকতার শিরে জয়মাল্য দান করেছে। নৃত্যকলাতেও ইউরোপীয় ভংগী গ্রহণ করতে ওরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। তাই তারা স্বাদেশিকতা-ভংগের কোন সম্ভাবনা দেখে না। ফলে ইউরোপীয় নৃত্য প্রচলিত হয়েছে নানা রূপে।

এমনি ক'রে জাপান প্রমাণ করছে জীবন্ত জাতিদের বলিষ্ঠ সত্তা ও অফুরন্ত মনীষা। প্রাচীনতাকে নূতন জীবন দান ক'রে নবীনতাকেও ভোগ করতে জাপান হাত বাড়িয়েছে। নবীনতার গ্রীবা ছিন্ন করতে বৌদ্ধ অহিংসা বা শূন্যবাদের দোহাই দেয়নি। সমগ্র জাপান কখনও ইউরোপের সৌন্দর্যবিধিকে লীলাকমলের মত হাতে করতে ভয় পায়নি। অথচ জাপান প্রাচ্য! "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এরকম একটা প্রাচীন উক্তি আছে। বীরের পক্ষেই দুনিয়ার সৌন্দর্য লুণ্ঠন সম্ভব। সজীবত্বই এ কাজে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।

জাপানের নৃত্যগীতাদিতে ইউরোপীয় সম্পর্ক দেখে ভারতের পরাজিত মনোভাব সহজেই সন্দেহের চোখে নিক্ষেপ করবে ওদের কলাকৃত্যের দিকে। কিন্তু ওদের স্থানকাল পাত্রের দিকে খুবই হুঁস আছে। খাঁটি জাপানী নাটক অভিনয়ে ইউরোপীয় মালমসলা বা অলীকতাতার ভিতর ওরা ঢোকায় না। কাবুকী নাটকে মানুষকে দিয়ে ঘোড়ার অভিনয় করবে—আস্তাবল হতে আস্ত ঘোঁড়া ষ্টেজের উপর কখনও নিয়ে আসবে না।

জাপানের এই সংগতির প্রতি একাগ্রতা এবং সংহতির প্রতি প্রেরণা সমগ্র জাপানের রংগমঞ্চগত বিধি ও বিধানকে সুস্থ ও জীবন্ত রেখেছে। চীনের মত জাপানের অন্তর শুকিয়ে যায়নি। Chrysanthemum-এর মত তা' পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

বীমা-দালালের হাত থেকে শ্রীপার্থিবের রেহাই

●

৫ই জুন। বৃহস্পতিবার। সকাল আটটায় সম্পাদক তলব করেছেন রূপ মঞ্চ কার্যালয়ে। এই পাগলা লোকটাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। দিন নেই—রাত নেই—কখন যে কোন প্রয়োজনটা দেখা দেবে তার কোন ঠিক নেই। সারা দিন-রাত যদি ৩০, গ্রে স্ট্রীটের দোতলায় বসে ওকে কাজ করতে হয়—তাতেও আপত্তি নেই। দোতলার এই ঘরটা কী যে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছে ওর কাছে তা ওই জানে। দশটায় প্রেসের তালা খোলেন কমলদা, কী দাদাভাই। লোকজন আসতে থাকে—কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু তার বহু পূর্বেই আপনি দেখবেন, দোতলার ঘরটা খুলে দরজা ভেজিয়ে এই লোকটা আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। কয়েক প্যাকেট সিগারেট আর কয়েক বাটি কোকো মুহুর্মুহু জুগিয়ে যেতে হবে আর কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন নেই—সকাল আটটা থেকে রাত ৯টা অবধি অবিরাম ভাবে কাজ করে যাবে। ওর 'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়ান তাই সয়।' আমাদের শরীরটা একটু আয়াসপ্রিয়—অত সইবে কেন? তাছাড়া কয়েকদিন যে গরম পড়েছিল তাত আপনারাই জানেন। শেষ রাতের দিকে তবু ঘুমের আমেজটা জমে ওঠে। সেই আমেজ জড়িত চোখে আকড়ে পড়ে থাকা বিছানার মায়া কাটিয়ে ওঠা কী সম্ভব! রূপ-মঞ্চের কাজে সম্ভব অসম্ভব নেই। হুকুম যখন পেয়েছি উঠতে হবেই—উঠতে হলোও। তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সম্পাদককে আজ টেক্কা দিতেই হবে। ও হরি! সিঁড়ি বেয়ে দু'চারটে স্টেপ উঠতেই বুঝলাম, টেক্কা আর আমার দেওয়া হ'লো না। সম্পাদক আগেই পৌঁছে গেছেন। তাঁর সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই হাত ঘড়িটা এগিয়ে ধরে মুচকী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কটা বাজে?"

"সাড়ে আটটা—" ঘড়িটা দেখে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলাম।

"সাড়ে আটটা! আর ওদিকে যে সে-ভদ্রলোক আপনার জন্য আটটা থেকে অপেক্ষা করছেন।"

"যাচ্ছি একটু কোকো—"

"কোকো আর এখন খেতে হবে না। আগে কাজ সেরে আসুন। আমি নিজে হাতে যত বাটি খুশী কোকো করে খাওয়াবো।"

আমাকে বসবার বা কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঠিকানা লিখে কাগজের একটা চিলতে আমার হাতে দিলেন। আমি সুবোধ অতি ভাল ছেলের মত যে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলাম সেই সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তায় পা বাড়িয়ে ঠিকানাটা দেখলাম—গ্রে স্ট্রীটের নম্বর। নিমতলা-ঘাটের দিকেই আমায় যেতে হবে। সম্পাদকের মতলবটা কী ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। এত তাড়াতাড়ি আমায় ওদিক ঠেলতে চায় কেন? তবে সন্দেহটা আমার কেটে গেল কয়েক পা এগিয়েই যখন বাড়ীটা পেলাম। পি ৮৫বি, গ্রে স্ট্রীটের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। চিলতে কাগজটুকু আমার হাতে। তাতে ধাম আছে—নাম নেই। কাকে ডাকবো? কড়াটা নাড়া দিলাম। একবার—দু'বার—তিনবার। না কারোর সাড়া নেই। একটু চুপ করে রইলাম। ভিতর থেকে ফটর ফটর চটির আওয়াজ কানে এলো। আবার একবার কড়াটা নাড়লাম।

উত্তর এলো, "যাচ্ছি।"

একটু বাদেই দরজাটা খুলে—"আসুন" বলে যিনি আমায় আহ্বান জানালেন, আমিত তাঁকে দেখে অবাক! আলাপ না থাকলেও বহুবার দেখেছি এ লোকটাকে। এত পরিচিতের কাছে আসতে হবে বলেই বোধ হয় নামটা গোপন করে সম্পাদক মশায় আমার সংগে একটু ধোঁকাবাজী খেললেন! রোজ রিক্সায় চড়ে সিগারেট ধরিয়ে এ লোকটাকে যেতে দেখি। তাছাড়া আরও যে অন্যত্রও না দেখি তা নয়। লিখতে লিখতে যখন লেখার খেই হারিয়ে ফেলি—প্রেসের একতলার নির্জন বদ্ধ ঘরে প্রুফের গাদা নিয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠি—চোখ টন টন করে ওঠে। ওপরের
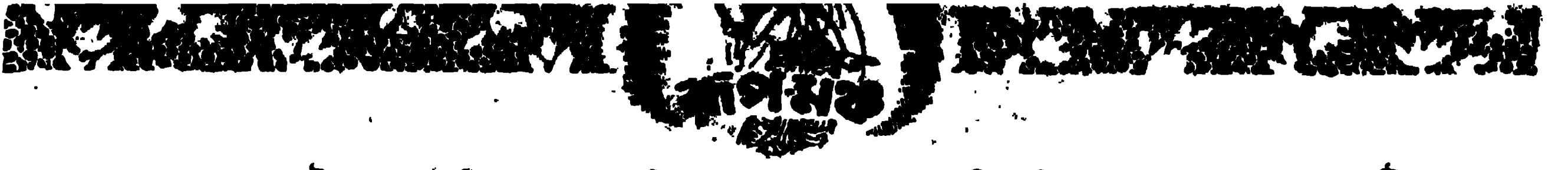
ঝুল বারান্দায় এসে উন্মুক্ত হাওয়া এবং পরিবেশের মাঝে একটু পায়চারী করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এক রকম। পায়চারীর সময় ১টা থেকে তিনটার গণ্ডি বড় ছাড়িয়ে যায় না। 'ম্যাটিনী শো'র সময়টাও কোন কোন দিন এই গণ্ডির ভিতর পড়ে। ঠুনঠুন শব্দ করে কত রিক্সা কত প্রেক্ষাগৃহ-যাত্রী নিয়ে ছুটে চলে। কত ট্যাক্সী, কত প্রাইভেট-কার আমাদের মনে ধাক্কা মেরে মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। কত রং বে রং এর শাড়ীর চলতি সমাবেশ—কত দোদুল্যমান ঝুমকোর ফিসফিসানী! মাঝে মাঝে কয়েকজোড়া আঁখি-পল্লব রূপ-মঞ্চের সাইন বোর্ডটার দিকে তাকাতে তাকাতে এই শ্রীহীন শ্রীপার্থিবের ওপর দিয়েও যে দৃষ্টি না বুলিয়ে নেয়—তা নয়। এঁরা কেউ যাচ্ছেন চিত্রগৃহে—কেউবা নাট্য-গৃহে। ছবি অথবা নাটক দেখতে। কিন্তু এঁদের চটকদার বেশভূষা এবং তা জাহির করবার পদ্ধতি দেখে—(শুধু যে বেশভূষাই জাহির করবার মাধ্যিকীর কাজ করে তা নয়—অনেক সময় চোখের পাতা, ভ্রূ ইত্যাদিও ভাষা-মুখর হ'য়ে বলতে থাকে—'দেখুন না একটু!' অবশ্য আমার এই ইংগিত মাতৃজাতি সম্পর্কে—মাতৃজাতি বল্লে যদি কেউ চটেন, তাঁদের ভগ্নীজাতির পর্যায়ে টানতে আমার আপত্তি নেই)—অনেক সময় এঁদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। এঁরা দেখতে যাচ্ছেন না দেখাতে যাচ্ছেন! নিজের গোষ্ঠী বলেই নয়—পুরুষ জাতির উদ্দেশ্য সব সময়ই এক অর্থাৎ তাঁরা দেখতেই যান! এঁদেরই একটু আগে কী একটু পরে আমার এই পরিচিত লোকটীকে আসতে অথবা যেতে দেখি। দূর থেকে যাঁকে দিনের পর দিন একাধিক স্থান থেকে লক্ষ্য করে আসছি—আজ একাবারে আমারই সামনে সশরীরে তাঁকে উপস্থিত দেখে যদি একটু হচকচিয়ে উঠি—সেটা কী আমার পক্ষে অন্যায়?

ভদ্রলোকটী আবার বল্লেন, "আসুন, ভিতরে আসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! আপনার জন্যই ত অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমাকে আপনি চেনেন নাকি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"চিনবো না? আপনি কী আমাকে চেনেন না নাকি? তাছাড়া আপনি যে আসবেন সে সংবাদ পূর্বেই সম্পাদকের কাছ থেকে পেয়েছি।"

আমি আমতা আমতা করে বল্লাম, "চিনবোনা কেন—তবে আলাপ ছিল না। আর আপনার এখানেই যে আসতে হবে সম্পাদক তা আমাকে বলে দেননি। শুধু ঠিকানাটা লিখে দিয়েছেন।"

ভিতরে যেয়ে বসলাম। ঘরটী বেশ সাদাসিদে ধরণের। আসবাব দিয়ে ঘরটীর দম বন্ধ করা হয়নি। একটা টেবিল একপাশে। একটা চৌকী—তার ওপর গালিচা পাতা রয়েছে—সেখানেই আমরা বসলাম। দেয়ালের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কয়েকখানা ছবি ঝুলছে। তবে তাদেরও ভীড় নেই। আপনারা হয়ত এতক্ষণ অধৈর্য হ'য়ে উঠেছেন আমার এই পরিচিত লোকটীর পরিচয়ের জন্য। শুধু আমারই নয়—আমার মত আপনাদের অনেকেরই সংগে এঁর পরিচয় রয়েছে—আবার আমার মত আপনাদের অনেকেরই হয়ত আলাপ হয়নি। আপনারা যাঁরা পদযান—ঠুন ঠুন রিক্সা—ট্রাম-বাস বা ট্যাক্সী ও গাড়ী হাঁকিয়ে চিত্র ও নাট্য-গৃহে যেয়ে উপস্থিত হন—সেখানেই বহুবার এ লোকটীকে দেখেছেন। কখনও দেখেছেন দেওয়াল টপকে ধনীর দুলালীর গৃহে হানা দিতে—কখনও বেহালা হাতে সুর ভাঁজতে—কখনও বোটানীর থিওরী আওড়াতে। বার্মা মুলুকে এঁর অসহায় অবস্থার কথাও আপনাদের অনেকের কানে পৌঁচেছে। কখনও কামান দাগাতে—আবার সুন্দরী মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরতেও যে এঁকে না দেখেছেন তা নয়। বিচিত্র পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন রূপে এঁর সংগে আপনাদের পরিচয় হ'য়েছে। আমার এই নূতন আলাপী লোকটি বাংলার মঞ্চ ও পর্দার উদীয়মান অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্য। জানি না আপনারা ভাগ্যে বিশ্বাসী না কর্মে বিশ্বাসী। আমি যদিও কর্মে বিশ্বাসী কিন্তু ভাগ্যকেও বা অস্বীকার করতে পারি কোথায়? ধরুন, আজ আপনি তিরিশ টাকা মাইনের একজন কেরাণী—কাল যদি কেউ আপনাকে রাজকন্যার সংগে অর্ধেক রাজত্ব দিতে চায়, তাকে কী বলবেন? কী আপনি একজন কলেজের অধ্যাপক—

কাল যদি আপনাকে হাতুড়ী পিটে কাজ করতে হয়—আপনি যদি মেয়ে হন—ঘরে শাশুড়ী ননদের নির্যাতন সহ্য করছেন—অক্ষম স্বামীর আস্ফালন নীরবে মাথা পেতে সইতে হচ্ছে—কাল যদি এমন হয়, আপনি নামকরা একজন অভিনেত্রী বনে গেলেন আর তাঁরা এসে আপনার কাছে লুটোপুটি খাচ্ছে—তাকে কী বলবেন? ভাগ্য না বলতে চান গ্রহের ফের, একথাত অস্বীকার করতে পারবেন না? নইলে একজন বীমা প্রতিষ্ঠানের দালাল অর্থাৎ যাঁর কাছ থেকে সকলেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তাঁর চাকা এমনি ভাবে ঘুরে গেল যে, তাঁকে একটু দেখবার জন্য—তাঁর সংগে দুটো কথা বলবার জন্য কতজনেই না হাঁস-ফাঁস করে থাকেন। হ্যাঁ, মিহির বাবুর সম্পর্কেই আমি বলছি। একদিন বীমা প্রতিষ্ঠানের দালালী করবার সময় কতজনের দোরে দোরেই না তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে! কতজনেই না তাঁকে দূর থেকে দেখে গা ঢাকা দিয়েছেন। আর এটাত সে কতজনের দোষ নয়। বীমা প্রতিষ্ঠানের দালাল দেখলে আমরা অনেকেই গা ঢাকা দি! একবার নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখুনত—সেদিনের মিহির ভট্টাচার্য যদি পলিসি করাবার পরিকল্পনা নিয়ে আপনাদের পিছু নিত—আপনারা গা ঢাকা দিতেন কি না! আপনারা অনেকেই দেখা করতেও চাইতেন না। বাড়ীতে হাজির হ'লে চাকর দিয়ে বলে পাঠাতেন - বাড়ীতে নেই। চাকর যদি আপনাদের অনেকের মত সত্যবাদী (!) না হ'তো 'বেচারা হয়ত বলেই বসতো—"আজ্ঞে বাবু বল্লেন—বাবু বাড়ীতে নেই।" আর আজ! আজ রূপ-মঞ্চে তাঁর ঠিকানাটা মুদ্রিত হবার পরই কতজন যে চিঠি লিখবেন—কতজন যে তাঁরই দোরগোড়ায় হানা দেবেন, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি এবং মিহিরবাবুও যে তা উপলব্ধি করতেন পেরেছেন তা নয়। নইলে ঠিকানাটা যাতে প্রকাশ না করি সেজন্য আমায় বার বার অনুরোধ করতেন না।

বীমা প্রতিষ্ঠানের যাঁরা দালালী করেন, দালালীতে অতি সহজেই তাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন, যদি আলাপ আলোচনায় অপরকে মুগ্ধ করবার শক্তি তাঁদের থাকে। দালালী করবার সময় মিহিরবাবু বোধ হয় এই গুণটি খুব ভালভাবে আয়ত্তে এনেছিলেন—তাই পরবর্তী কালে আপনাদের মুগ্ধ করতেও তাঁর বেশী বেগ পেতে হয়নি।

আজকের মঞ্চ ও পর্দার উদীয়মান অভিনেতা মিহির কুমার ভট্টাচার্য ৯ই মার্চ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার নবদ্বীপে মিহিরবাবুর পিতৃপুরুষের বাসস্থান। তাঁর পিতামহ স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য এই অঞ্চলে সর্ব প্রথম রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তিনি ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাছাড়া অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একাধিক অঙ্কের বই রচনা করে গেছেন। মিহির কুমারের পিতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভট্টাচার্যও ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং বর্তমানে নবদ্বীপে অবসর জীবন যাপন করছেন। সুশীলকুমার আটজন সন্তানের পিতা—এর সব কয়জনই পুত্র সন্তান। মিহির কুমার এদের ষষ্ঠ। মিহির কুমারের ছোটবেলার শিক্ষা কলকাতাতেই আরম্ভ হয়। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তির প্রতি মিহির কুমারের ঝোঁক দেখা যায়। ছোট বেলার সেই আধো-আধো গলার আধো-আধো আবৃত্তি অনেককেই মুগ্ধ করতো। বিদ্যালয়ে একবার আবৃত্তি প্রতিযোগীতায় রবীন্দ্রনাথের 'বাসবদত্তা' আবৃত্তি করে অনেককেই হারিয়ে দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ মিহিরকুমার একটী পদক লাভ করেন। সেদিনকার

সেই বালক পরবর্তীকালে যে একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হ'য়ে উঠবে—তাই বা কে জানতো! তবে তাঁর অভিনয় দক্ষতা স্কুল-জীবন থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কুল জীবনে বালক মিহিরকুমার কবিগুরুর রাজসিংহ নাটকে বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকাটী এমনি দক্ষতার সংগে ফুটিয়ে তোলেন যে, তখন অনেকেই তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। চাঞ্চল্যভরা কৈশোরের সংগে যখন তাঁর কলেজী জীবন আরম্ভ হ'লো – তাঁর এই নৈপুণ্য ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর বিদ্যাসাগর কলেজের নাট্য-সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন। বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়নকালে মিহির কুমারের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে বহু নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্রশেখর, পথের শেষে, প্রতাপাদিত্য এগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য এবং এই নাটকগুলিতে যথাক্রমে প্রতাপ, দুর্গাশঙ্কর ও প্রতাপাদিত্যের ভূমিকাভিনয় করে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় 'মিলন-বীথি' নামক সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের অন্যতম উদ্যোক্তারূপে মিহিরকুমার জড়িত হ'য়ে পড়েন। এখানে বহুজনের সংস্পর্শে আসবার তাঁর সুযোগ হয় -- পরবর্তীকালে যাঁরা জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হ'য়েছেন। কলেজ-জীবন পরিত্যাগ করে মিহির-কুমারকে জীবিকার্জনের জন্য পথ দেখতে হয়। এই সময় কিছুদিন বীমা প্রতিষ্ঠানের দালালী নিয়ে মেতে পড়েন এবং বাণীকুমারের সংস্পর্শে এসে তাঁরই অধীনে বেতারা-ভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রয়োগশিল্পী সতু সেন মিহির কুমারকে চিত্রজগতে ও মঞ্চে পেশাদার শিল্পীরূপে যোগদান করবার জন্য উৎসাহিত করে তোলেন। এঁদেরই উৎসাহ এবং প্রেরণায় মিহিরবাবু অভিনয়-শিল্পকে জীবনের সাধনা ও জীবিকা বলে গ্রহণ করেন। চিত্রে সর্বপ্রথম রাজকুমারের নির্বাসন এবং ১৯৩৯ খৃঃ, ৬ই আগষ্ট, নাট্য ভারতীর উদ্বোধনের সংগে সংগে তটিনীর বিচার নাটকে মিহির কুমার চিত্র ও নাট্যামোদীদের সর্বপ্রথম অভিবাদন জানান। একদিকে নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠায় হাতছানি –অপরদিকে আত্মীয়-স্বজনের প্রবল বাধা বিপত্তি—জীবনের এই কিং কর্তব্য বিমূঢ়তায় মিহির কুমার শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। সেদিন যদি তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো—আজকের মিহির ভট্টাচার্যের নামও আপনারা শুনতে পেতেন না।

শচীন্দ্রনাথের 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকের মগনলাল চরিত্রটী মিহির কুমারকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়। এরপর নার্সিং হোম, দুই পুরুষ, পথের ডাক, সিঁথির সিঁদুর, পি-ডবলিউ-ডি প্রভৃতি নাটকে তিনি প্রশংসার সংগে অভিনয় করেন এবং দেবদাস নাটকেও কিছুদিন আত্মপ্রকাশ করেন। এই দেবদাস নাট্যাভিনয়ের সময়ই কর্তৃপক্ষের সংগে তাঁর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এবং নাট্য-ভারতী পরিত্যাগ করে শ্রীরঙ্গমে যোগদান করেন। শ্রীরঙ্গমে যোগদান করবার মূলে ছিলেন স্বর্গতঃ অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। এমনকী বিপ্রদাস নাটকের দ্বিজদাস চরিত্রটীতে তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য মিহির কুমার নির্বাচিত হন। দ্বিজদাস চরিত্রাভিনয়ে মিহির কুমার স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বনাথের দূরদর্শিতার প্রমাণ করেন। দ্বিজদাস মিহির কুমারকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। বিপ্রদাসের পর বিধায়কের হাস্যকৌতুক নাটক 'তাইতো'তেও মিহির কুমার নিজের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। ১৯৪৪ খৃঃ-এ শ্রীযুক্ত সতু সেনের আগ্রহে এবং সহযোগিতায় মিহির কুমার রঙমহল রংগমঞ্চে যোগদান করেন। রঙ্-মহলে বিংশ শতাব্দী, অনুপমার প্রেম, সন্তান, রাজপথ, সেই তিমিরে অভিনয় করে নাট্যামোদীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। বর্তমানে রঙমহল রঙ্গমঞ্চের সংগেই তিনি জড়িত এবং ভুলের মাশুল-এ ও অভিনয় করেছেন।

মঞ্চাভিনয়ের সংগে সংগে বহু চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে মিহির কুমার দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানান। কর্ণার্জুন, পরিচয়, বিজয়িনী, পতিব্রতা, ছদ্মবেশী, পথের সাথী, সাত নম্বর বাড়ী, তুমি আর আমি, নারী, ভাবীকাল, মায়ের প্রাণ, পথের দাবী, শ্রীদুর্গা, শেষরক্ষা, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি চিত্রগুলি মিহির কুমারকে চিত্রামোদীদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। মিহির কুমারের নির্মীয়মান চিত্র
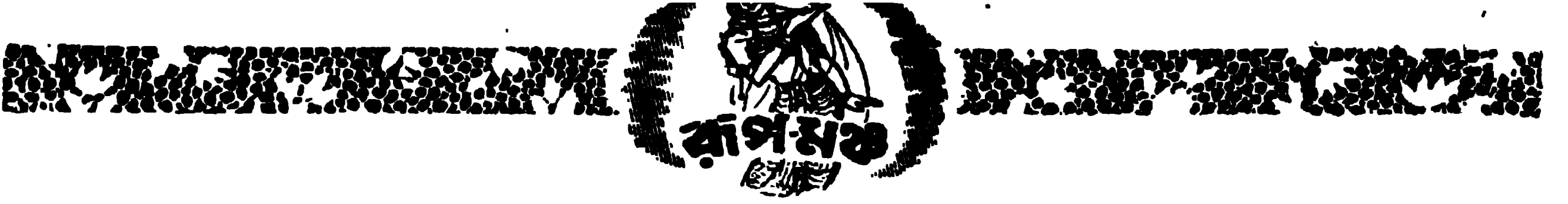
গুলির ভিতর বন্ধুর পথে, যা হয়না, বিপ্লবী (দ্বিভাষী), সত্যাগ্রহী, ললিতাসখী, মহাসম্পদ উল্লেখযোগ্য ।

নারী, জনা, প্রতাপাদিত্য আরও বহু রেখানাট্যেও মিহির কুমার অংশ গ্রহণ করেছেন ।

চিত্রে ছদ্মবেশী, শ্রীদুর্গা, সাত নম্বর বাড়ীর চরিত্রগুলিতে অভিনয় করে মিহির কুমার তৃপ্তি লাভ করেছেন। মঞ্চে বিপ্রদাসে দ্বিজদাস, দুই পুরুষে অরুণ, সন্তানে ভবানন্দ এবং সেই তিমিরে অতনু তাঁকে আনন্দ দিয়েছে ।

চিত্র পরিচালকদের ভিতর মিহির কুমার নীরেন লাহিড়ীর ভক্ত। মঞ্চের প্রয়োগশিল্পীদের ভিতর নাট্যগুরু শিশির কুমারের কথা বাদ দিয়ে স্বর্গতঃ বিশ্বনাথের প্রতি মিহির কুমারের গভীর শ্রদ্ধার কথা সহজেই আমি জানতে পারি। এই স্বর্গত শিল্পীর প্রতি মিহির কুমার তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। আধুনিক নাট্যকারদের ভিতর শচীন সেনগুপ্তের জোরালো ভাষা মিহির কুমারকে মুগ্ধ করে। মধু সংলাপী বিধায়কেরও তিনি কম ভক্ত নন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর মিহির কুমারের প্রিয় সাহিত্যিক। তারাশঙ্করের রচনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে বলেন, "ওর চরিত্রগুলি আমাদের মোটেই অচেনা নয়।"

মিহিরবাবু নিজে গান জানেন না—গান শুনতে ভালবাসেন। রণজিৎ রায়ের সুর পরিকল্পনা ওর ভাল লাগে। চিত্রজগতে সংগীতশিল্পীদের ভিতর রবীন মজুমদার এবং কানন দেবীর কণ্ঠ মাধুর্যের মিহিরবাবু একজন অনুরাগী ভক্ত। মঞ্চে ও চিত্রে ছবি বিশ্বাস ও মলিনার অভিনয় নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। দ্বিজদাসের মত ভূমিকায় অভিনয় করতে মিহিরবাবু ভাল বাসেন। শিল্পীনির্বাচন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মিহিরবাবু তীব্র অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "অনেক ক্ষেত্রেই পরিচালকেরা পরিচিত শিল্পীদের চরিত্র বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। তারপর যিনি এক ধরণের ভূমিকায় একবার নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন—তাঁকে সেই ধরণের চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্র দিয়ে যাচাই করে নেবার ঝুকি নেবেনই না। এতে উক্ত অভিনেতা যদি দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হ'য়ে ওঠেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।" নূতন শিল্পীদের আগমনকে মিহিরবাবু সাগ্রহ-অভিনন্দন জানান। তিনি জোর দিয়েই বলেন, "চিত্র শিল্পের একজন একনিষ্ঠ সেবকরূপে প্রতিভাবান নূতনের জন্য আমাকেও যদি একদিন বিদায় নিতে হয় তাতেও দুঃখিত হবো না।" নূতনদের প্রসংগে তিনি বলেন, "বহু নূতন আমাদের অর্থাৎ অভিনেতাদের কাছে এসে অনুরোধ করেন, যাতে আমরা তাঁদের কোন সুযোগ সুবিধা করে দি। কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, এবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অপারক। তাঁদের কর্তৃপক্ষের কাছেই যেতে হবে। তবে কর্তৃপক্ষকে এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'তে হ'বে।"

শিল্পীদের পারিশ্রমিকের তারতম্যের কথা উল্লেখ করে মিহিরবাবু বলেন—"এই পারিশ্রমিকের একটা নিম্নতম
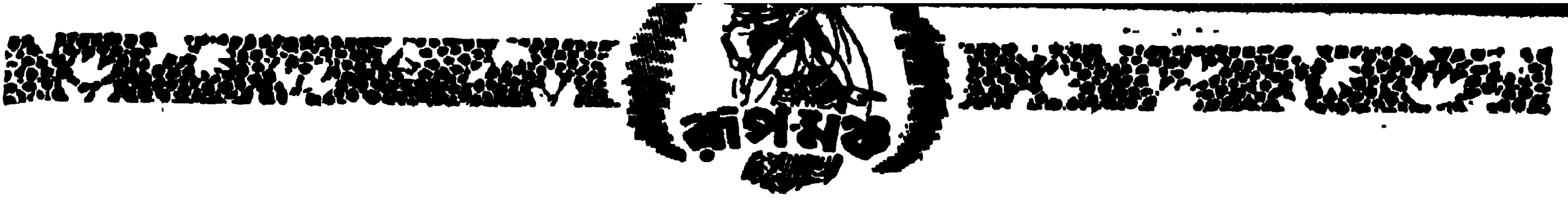
হার থাকা উচিত। মিহির কুমার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন উগ্র সমর্থক। ভারতীয় নেতাদের ভিতর সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল মিহির কুমারের আদর্শ। বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গ বিভাগকে তিনি সমর্থন করেন। মিহির কুমার একসময় একজন মুষ্টি যোদ্ধা ছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধ তাঁর প্রিয় ব্যায়াম। খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা জগা-শীলের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। অন্যান্য খেলা ধূলার ভিতর তিনি সাতারের প্রিয়। অবসর সময় মিহির কুমারের কাটে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্প পড়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। নিজেও পূর্বে সাহিত্য চর্চা করতেন। একবার 'দেবদাসে'র নাট্যরূপ দিয়ে নাট্যনিকেতনে অভিনয় করেন। গল্প করা ও আড্ডা দেওয়া মিহির কুমারের অন্যতম নেশা। সাধারণতঃ এই আড্ডা বসে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়ীতে—ক্রাক্স কর্ণারের ছিট গ্রস্তদের ভিতর মিহির কুমারও অন্যতম।

১৯৪৫ খৃঃ মিহির কুমার বিবাহ করেন। বর্তমানে তিনি একটী সন্তানের পিতা। পরিবারবর্গের সংগেই তিনি গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করছেন।

রূপ-মঞ্চের নির্ভীক মতবাদকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। রূপ-মঞ্চের কথা বলতে যেয়ে বলেন, "আমাদের চিত্র ও নাট্য-জগতের সমস্ত দুর্বলতা শুধরে তাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে রূপ-মঞ্চের আন্তরিকতাকে সব সময়ই আমি অভিনন্দন জানাই। এবং আপনাদের প্রচেষ্টা যে একদিন জয়-যুক্ত হবে সে বিষয়েও আমি আশাবাদী।" বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম—সারা রাস্তা মধু-আলাপী মিহিরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে সম্পাদকের সামনে এসে দাঁড়ালাম খেয়ালই ছিল না। এবারও সম্পাদক হাত ঘড়িটা তুলে ধরলেন—এগারোটা বাজে প্রায়। তিনি কয়েকজনের সংগে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন—আমি আসতেই ইলেকট্রিক ষ্টোভের প্লাগটা দিলেন। সম্পাদকের নিজের হাতে করা কোকোর লোভ সামলানো সম্ভব হ'লো না—তাই চেপেই গেলাম যে, মিহিরবাবুর ওখানেও কয়েকবাটী হ'য়েছে।

বাংলা সবাক ছায়াছবির প্রথম প্রকাশ

(৪)

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

●

১৯৪০ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল

১৫৩। **অগর গীতি** * * ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। প্রথম আরম্ভ—২-১০-৪০ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীহীরেন বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত : শব্দ-যন্ত্রী--শ্রীমধু শীল : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, প্রমোদ, ভানু, বোকেন, নৃপতি, ছায়া, সাবিত্রী, নিভাননী, রেবা।

১৫৪। **অভিনব** (নিশির ডাক) * * আরোরা ফিল্ম। প্রথম আরম্ভ—১৬-১১-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীদেবকী বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণ গোপাল : প্রবর্তনা—কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া : ভূমিকায়—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেশরায়, সুশীল মজুমদার, সমর ঘোষ, নীরেন লাহিড়ী, বিমল রায়, প্রভা, শীলা, হরিসুন্দরী। অভিনব শব্দমুখর হওয়ার পর পরিচয়লিপি—সংলাপ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী : সুর-শিল্পী—শ্রীরঞ্জিৎ রায় : আবহ-সংগীত—শ্রীরঞ্জিৎ রায় ও কুমারী সুনীলা দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—রঞ্জিৎ, বিমল, সুধীর, সুশীল, রাজলক্ষ্মী।

১৫৫। **অভিনেত্রী** * * * নিউ থিয়েটার্স লিঃ প্রথম আরম্ভ—৩০-১১-৪০ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীঅমর মল্লিক : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল : ভূমিকায়—পাহাড়ী, শৈলেন, ইন্দু, সন্তোষ, বিপিন, কানন দেবী, মীরা, মঞ্জরী।

১৫৬। **আলোছায়া** * * নিউ থিয়েটার্স লিঃ প্রথম আরম্ভ—৬-৭-৪০ : চিত্রগৃহ - চিত্রা ও পূর্ণ : পরিচালনা—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীন মজুমদার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে : ভূমিকায়—পঙ্কজ, রতীন, শ্রীলেখা, মলিনা, শৈলেন, কৃষ্ণচন্দ্র, মঞ্জরী, মনোরমা।

১৫৭। **কুমকুম** * * * সাগর মুভিটোন প্রথম আরম্ভ—১০-২-৪০ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী—মিঃ জয়গোপাল পিলাই : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ শান্তিস্ প্যাটেল : সংগীত—শ্রীতিমিরবরণ : নৃত্য—শ্রীমতী সাধনা বসু : ভূমিকায়—ধীরাজ, রবি, ভুজঙ্গ, প্রীতি, সাধনা, পদ্মা, কিরণ, বিনীতা, লাবণ্য।

১৫৮। **কমলে কামিনী** * * * মতিমহল থিয়েটার্স প্রথম আরম্ভ—১১-৫-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী ও চিত্রনাট্য—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা ও শ্রীনির্মল গোস্বামী : আলোক-শিল্পী—শ্রীবীরেন দে : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ ডি, ওয়ালটার্স ; শ্রীঅবনী চট্টোঃ : সংগীত—শ্রীপবিত্র চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, তিনকড়ি, তুলসী, বেণুকা, ঊষা।

১৫৯। **কর্মখালি★**
প্রথম আরম্ভ—১৭-৮-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী ও বিজলী :

১৬০। **কৃপণে কৃপণ**
প্রথম আরম্ভ—১৯৪০ সাল : চিত্রগৃহ—শ্রী :

১৬১। **ঠিকাদার** * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—৮-১১-৪০ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল রায়। আলোক-শিল্পী—বিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ চার্লস্ ক্রীড্, শ্রীমান্না লাডিয়া : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, জীবন, তুলসী, সত্য, রবি, রেণুকা, চিত্রা, কমলা ঝরিয়া, শোভা।

১৬২। **ডাক্তার** * * * নিউ থিয়েটার্স লিঃ প্রথম আরম্ভ—৩১-৮-৪০ : চিত্রগৃহ—চিত্রা ও পূর্ণ : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীফণী মজুমদার : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ
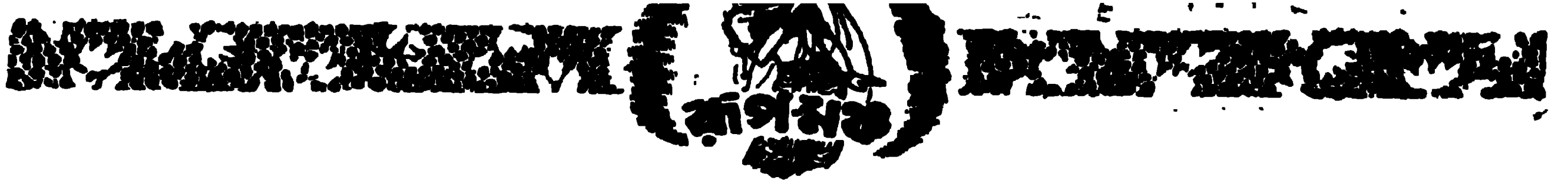
মুলজী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, পঙ্কজ, জ্যোতিঃপ্রকাশ, অমর, শৈলেন, ইন্দু, বুদ্ধদেব, পান্না, ভারতী।

১৬৩। **তটিনীর বিচার** : ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া প্রথম আরম্ভ—৪-৫-৪০ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী —শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, সুধীর, নৃপতি, অর্দ্ধেন্দু, ভানু, সন্তোষ, কানু, জীবেন, রাণীবালা, ইন্দিরা, রমলা।

১৬৪। **দ্বিতীয় পাঠ★** আরোরা ফিল্ম প্রথম আরম্ভ—১৬-১১-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল : ভূমিকায়—ক্যাপ্টেন ভোলানাথ ও কুমারী মঞ্জুলা :

১৬৫। **নিমাই সন্ন্যাস** * * * মতিমহল থিয়েটাস প্রথম আরম্ভ—২৪-১২-৪০ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা : আলোক-শিল্পী—শ্রীনির্মল দে : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ সি, এস, নিগম্ : সংগীত—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস : ভূমিকায়—প্রহ্লাদ, ছবি, প্রমোদ, রবি, তুলসী, সন্তোষ, মণিকা, অপর্ণা, গীতা।

১৬৬। **পরাজয়** * * * নিউ থিয়েটার্স প্রথম আরম্ভ—২৩-৩-৪০ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীরণজিৎ সেন : পরিচালনা—শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবাণী দত্ত : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল : ভূমিকায়—ভানু, অমর, শৈলেন, ইন্দু, জীবেন, কানন দেবী, জ্যোতি, হীরাবাঈ, রাজলক্ষ্মী।

১৬৭। **পথভুলে** * * * দেবদত্ত ফিল্ম প্রথম আরম্ভ—১-৬-৪০ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : পরিচালনা—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসত্যেন দাশগুপ্ত : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত, শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য : ভূমিকায়—ডি-জি, বিভূতি, আশু, রঞ্জিত, ভূমেন, রতীন, সত্য, বেচু, হেম, প্রতিমা, পূর্ণিমা, মণিকা, পান্না।

১৬৮। **ফিভার মিকশ্চার★** শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—২৬-১০-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : ভূমিকায়—তরুণী, তুলসী, সত্য, কমলা ঝরিয়া।

১৬৯। **ব্যবধান** * * * মতিমহল থিয়েটার্স প্রথম আরম্ভ—১৭-৮-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী ও বিজলী : কাহিনী, গান, সংলাপ—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : পরিচালনা—শ্রীফণী বর্মা ও শ্রীনীরেন লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীনির্মল দে : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ সি, এস, নিগম্ : ভূমিকায়—ধীরাজ, সন্তোষ, বিপিন, অর্দ্ধেন্দু, সত্য, নৃপতি, প্রতিমা, অরুণা, অঞ্জলি, নিভাননী।

১৭০। **রাজকুমারের নির্বাসন** : কমলা টকীজ প্রথম আরম্ভ—১৭-১২-৪০ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীকান্ত সেন : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীশচীন দেব বর্মণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, তুলসী, সন্তোষ, অমল, মিহির, কানু, চন্দ্রাবতী, পূর্ণিমা, মীরা, শীলা, কমল।

১৭১। **শুকতারা** * * * ফিল্ম প্রডিউসার্স প্রথম আরম্ভ—৬-১-৪০ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী, পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিদ্যাপতি ঘোষ : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু : সংগীত—শ্রীদুর্গা সেন : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, শৈলেন, সত্যপ্রিয়, খোকেন, ফণী, দেবী, চন্দ্রাবতী, প্রতিমা, চিত্রা, রমা, রেবা।

১৭২। **শাপমুক্তি** * * * কৃষ্ণ মুভিটোন প্রথম আরম্ভ—৯-৯-৪০ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—মিঃ কে, এস, দরিয়াণী : পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীঅনুপম ঘটক : ভূমিকায়—বড়ুয়া, রবীন, নির্মল, জীবেন, ভানু, যন্ত্রীপ্রসাদ, পদ্মা, নিভাননী, সরযূবালা।

১৭৩। **স্বামী-স্ত্রী** * * * কমলা টকীজ
প্রথম আরম্ভ—২১-৩-৪০ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীসতু সেন : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—ছবি, সন্তোষ, সুপ্রিয়া, ছায়া, চন্দ্রাবতী, অপর্ণা, রমা।

১৭৪। **সাবধান**★
প্রথম আরম্ভ—১৯৪০ : চিত্রগৃহ—পূরবী :

১৯৪১ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণানুসারে দেওয়া হ'ল

১৭৫। **অবতার** * * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৬-৮-৪১ : চিত্রগৃহ—শ্রী ও পূরবী : কাহিনী—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস, মিঃ ভি, ভি, দাতে : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ চার্লস্ ক্রীড্ : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, ভূমেন, উৎপল, জ্যোৎস্না, পান্না, রেণুকা, প্রভা, চিত্রা।

১৭৬। **আহুতি** * * * মতিমহল থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২০-৯-৪১ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী, সংলাপ ও গান—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ সি, এস, নিগম : ভূমিকায়—ধীরাজ, ডি, জি, অর্ধেন্দু, ফণী, বিপিন, নৃপতি, প্রমীলা, প্রতিমা, জয়ন্তী, শান্তা, মঞ্জু।

১৭৭। **উত্তরায়ণ** * * * এম, পি, প্রোডাকসন্স
প্রথম আরম্ভ—২১-১১-৪১ : চিত্রগৃহ—উত্তরা ও পূরবী : কাহিনী—অনুরূপা দেবী : প্রযোজক, পরিচালক ও আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীতিমিরবরণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, বড়ুয়া, ইন্দু, সন্তোষ, তুলসী, যমুনা, মেনকা, গিরিবালা, উষা, নমিতা।

১৭৮। **এপার ওপার** * * * নিউ টকীজ
প্রথম আরম্ভ—২০-৬-৪১ : চিত্রগৃহ—পূরবী : কাহিনী—শ্রীকান্ত সেন : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিদ্যাপতি ঘোষ, শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ধীরাজ, ছবি, কানু, নৃপতি, মেনকা, সুপ্রভা, মণিকা, পান্না।

১৭৯। **কর্ণার্জ্জুন** * * * ভ্যারাইটী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—২১-১-৪১ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীঅনুপম ঘটক : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, মনোরঞ্জন, অমল, শরৎ, শৈলেন, মিহির, জহর, নীতীশ, ফণী, বিমান, চন্দ্রাবতী, পদ্মা, রেণুকা, শীলা, চিত্রা, বীণা।

১৮০। **কবি জয়দেব** * * মুভী টেকনিক সোসাইটী
প্রথম আরম্ভ—১৫-২-৪১ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীহীরেন বসু : আলোক শিল্পী—শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল : ভূমিকায়—হীরেন, নরেশ, প্রমোদ, জহর, জীবেন, বিপিন, রাণীবালা, নিভাননী, গায়ত্রী, জ্যোতিকণা।

১৮১। **চিঠি** ★
প্রথম আরম্ভ—১২-৪-৪১ : চিত্রগৃহ—শ্রী

১৮২। **নন্দিনী** * * * কে, বি, পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—৮-১১-৪১ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ মান্না লাডিয়া : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, যোগেশ, জহর, ধীরাজ, ফণী, মলিনা, সন্ধ্যা, সুপ্রভা, প্রভা, মনোরমা।

১৮৩। **নর্ত্তকী** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—১৮-১-১ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীদেবকী কুমার বসু : আলোক-শিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী : শব্দযন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—ভানু, শৈলেন, ছবি, উৎপল, পঙ্কজ, লীলা, কমলা, জ্যোতি।

১৮৪। **পরিচয়** * * * নিউ থিয়েটার্স
প্রথম আরম্ভ—২৫-৭-৪১ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : চিত্রনাট্য,
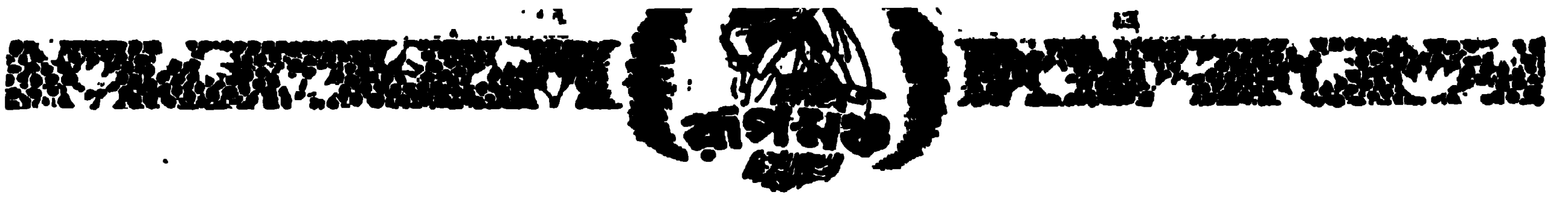
পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল ভূমিকায়—সায়গল, রতীন, মিহির, বিপিন, কানন দেবী, নন্দিতা, পান্না।

১৮৫। **প্রতিশোধ** * ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
প্রথম আরম্ভ—২৮-৬-৪১ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও গান—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীসুশীল মজুমদার : আলোক-শিল্পী—মিঃ জি, কে, মেহতা। শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅমরনাথ হাজরা : সংগীত—শ্রীশচীন দেববর্মন ভূমিকায়—নরেশ, ছবি, প্রমোদ, ডি-জি, জহর, কানু, জীবেন, শীলা, রমলা, রমা, সন্ধ্যা।

১৮৬। **ব্রাহ্মণ কন্যা** * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—১৯-১২-৪১ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌরদাস, মিঃ জে, ডি, ইরাণী : ভূমিকায়—জ্যোতিকুমার, জীতেন, গোকুল, সানু, রেখা, উমা, বিজলী।

১৮৭। **বিজয়িনী** * * * চিত্রবাণী
প্রথম আরম্ভ—২১-৩-৪১ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া : ভূমিকায়—রতীন, জহর, তুলসী মিহির, ভবানী, চন্দ্রাবতী, রমা, রেবা, কমলা ঝরিয়া।

১৮৮। **বাঙলার মেয়ে** * * * কালী ফিল্ম
চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী : পরিচালনা—শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীসমর বসু : ভূমিকায়—তিনকড়ি, নরেশ ধীরাজ, ছবি, ইন্দিরা, পদ্মা, শীলা, ছায়া, সন্ধ্যা।

১৮৯। **ভালবাসা** ★ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
প্রথম আরম্ভ—১৮-১-৪১ : চিত্রগৃহ—ছবিঘর : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতুলসী লাহিড়ী : ভূমিকায়—তুলসী, সত্য, রঞ্জিৎ, বোকেন, মীরা দত্ত।

১৯০। **মায়ের প্রাণ** * * এম, পি, প্রোডাকসন্স
প্রথম আরম্ভ—২৮-৬-৪১ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী ও গান—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : প্রযোজনা, পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর মোহন দাস : সংগীত—শ্রীঅনুপম ঘটক : ভূমিকায়—বড়ুয়া, নির্মল, ইন্দু, জীবেন, ললিত, ধীরেন, সরযূ, অপর্ণা।

১৯১। **মায়ামৃগ** ★
প্রথম আরম্ভ—১৮-১-৪১ : চিত্রগৃহ—ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—মিঃ কে, ভূষণ : ভূমিকায়—কমলা দে, উষা দেবী, ইন্দ্রনাথ, নটরাজ, তারাপদ।

১৯২। **রাসপূর্ণিমা** * * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—১২-৯-৪১ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : ভূমিকায়—অশোক, ভুজঙ্গ, বোকেন, ফণী, বিজয়, চন্দ্রাবতী, বীণা।

১৯৩। **রাজনর্ত্তকী** * * ওয়াদিয়া মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—৮-৩-৪১ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীমন্মথ রায় : পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস ও শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীবায়রাম বরুচা ও শ্রীমিনু থামপল : সংগীত—শ্রীতিমিরবরণ : নৃত্য—শ্রীসাধনা বসু : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জ্যোতিপ্রকাশ, মন্মথ, প্রীতি, বিভূতি, প্রভাত, সাধনা, প্রতিমা, বিনীতা।

১৯৪। **শ্রীরাধা** * * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—২৭-৯-৪১ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী ও গান—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় : পরিচালনা—শ্রীহরিভঞ্জ। আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : ভূমিকায়—জহর, সুশীল, তুলসী, প্রফুল্ল, জীবেন, মলিনা, রাণীবালা, হরিমতি।

১৯৫। **শকুন্তলা** * * * ইন্দ্র মুভিটোন
প্রথম আরম্ভ—৭-৬-৪১ : চিত্রগৃহ—শ্রী : সংলাপ—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে : ভূমিকায়—ধীরাজ, মনোরঞ্জন, সুশীল, কার্ত্তিক, জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, গায়ত্রী।

৬

(উপন্যাস)

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মীপূজার দু' একদিন পর অবধিও উৎসবের হই-হুল্লোড় ছিল। আজ বড়দের নাট্যাভিনয়—কাল ছোটদের। বৌদি বা দিদিদের রঙিন শাড়ী দিয়ে সিন্‌সিনারি খাটানোর তদারক থেকে ছোটরা কোনমতেই দেবুকে রেহাই দেয়নি। তাছাড়া এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বিজয়া-দশমীর দেখা সাক্ষাৎ করতে করতে বাড়ীতে আর দেবু বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি। ভাইয়ের সংগে দু'দণ্ড বসে কথাবার্তা বলবার সুযোগও শিবশঙ্কর পাননি। দেওরের সংগে গল্পগুজব করবার ফাঁকটুকুই বা সুনন্দা কখন পেল? দেবুরও ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সংবাদপত্রের কাজে ছুটি কোথায়! শিবশঙ্কর অনেকদিন থেকেই মনে মনে ভাবছেন, গাঁয়ের মেয়েদের ইউ, পি, স্কুলটাকে 'মাইনর' মান অবধি উন্নিত করবেন এবং ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ের ওপরের শ্রেণীগুলিতে সহ-শিক্ষা প্রবর্তন করবেন। সহ-শিক্ষা প্রবর্তনে বাধা অনেক দেখা দেবে—তা তিনি জানেন। কিন্তু বাধাকে ডিঙিয়ে চলবার শক্তি আজও শিবশঙ্করের ভিতর থেকে অন্তর্হিত হয়নি। তবে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলটাকে মাইনর মান অবধি উন্নিত করতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন, সে কথা চিন্তা করেই তিনি ভেবে পড়েছেন। অথচ এই কাজটাতেই আগে হাত দেওয়া দরকার। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাইমারী স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবশঙ্করের শিক্ষাগুরু পুণ্য ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গতঃ পাঁচকড়ি ভট্টাচার্য। তাঁর মত আদর্শে মহীয়ান তেজস্বী পুরুষ ও অঞ্চলে ছিল না বল্লেই চলে। তাঁর মেজভাই আজীবন দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

পুণ্য ঠাকুর সকলের ছোট, তাঁরই পর স্কুলটার ভার। পুণ্য ঠাকুরের বিদ্যা গাঁয়ের স্কুলের মাইনর মান অবধি। দু' চার ঘর যজমান যা আছে পুরোহিত দর্পণ দেখে কোন মতে তাঁদেরও ঠিক রাখতে হয়, নইলে সংসার চলে না। স্কুলে তাকে যোগান দেবার জন্য আছে যোগীন গাঙ্গুলী। যোগীন গাঙ্গুলী ধারাপাতটা ভাল জানে, তাই অঙ্কের দিকটার জন্য ভাবতে হয় না। ঐ ব্যাটা ইংরেজী ভাষাটাকে নিয়েই এঁদের দু'জনের যত ভাবনা! ছাত্রী এবং অন্যান্যদের কাছে নিজের বাহাদুরী বজায় রাখবার জন্য পুণ্য ঠাকুর প্রায়ই বলে থাকেন, "আরে ও হ'লো ম্লেচ্ছো ভাষা—আমি দেব-ভাষার চর্চা করি—ও ভাষা ছুলেও যে মহাপাপ।" আবার মেজ ভাইর স্বদেশী পানার সুযোগ নিয়ে বলেন, "যে জাত আমার দাদাকে—আরো কতজনকে জেলে পুরে রাখে—তাদের ভাষা প্রাণ থাকতেও ছুতে পারবো না।"

হলধর কী মোহন মাঝি পুণ্য ঠাকুরের ভাইগত প্রাণ দেখে অবাক হ'য়ে যায়। এরাও সায় দিয়ে বলে, "ঠিক! লিজ্জাস কথা।" কিন্তু পুণ্য ঠাকুরের ছাত্রীরা—কী তাদের দাদা কাকারা প্রকৃত ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। পুণ্য ঠাকুরের ইংরেজীর দৌড়টা তাঁদের অজানা নয়। পুণ্য ঠাকুরকে এরা কৌতুক করে 'ফাও' বলে ডাকে! অর্থাৎ জিনিষ কিনতে গেলে মূল্যের বাইরে যেমনি দোকানী যা হউক একটু কিছু দিয়ে দেয়—সেরকম পুণ্য ঠাকুরের দু'ভাইর তুলনায় যখন তাঁর দুর্বলতা অনেকের চোখে পড়ে, তখন অনেকেই আবার তাঁর প্রতি স্নেহবশতঃ বলেন, "ওকে ফাও বলে মনে করোনা। ওর সমস্ত দুর্বলতা আর দু'জনেইত পুরোণ করে নিয়েছে।" ছেলে-মেয়েরা এই থেকে কেউ ডাকে—"ফাও কাকা—কেউ ফাও দাদা।" পুণ্য ঠাকুর যে তাতে রাগেন তা নয়। বড় জোর মুচকী হেসে স্নেহসিক্ত শাসনের সুরে বলেন, "যা, ভারি দুষ্টু হ'য়েছিস!"

পুণ্য ঠাকুরের বাড়ীতেই মেয়েদের স্কুল বসে সকাল বেলা। পুণ্য ঠাকুরই প্রধান শিক্ষক। প্রকৃত যা ঝুকি শিবশঙ্করকেই বইতে হয়। কিন্তু ছেলেদের

স্কুল নিয়েই তাঁকে এত হিমসিম খেয়ে উঠতে হয় যে, এদিক দৃষ্টি দেবারও সময় থাকেনা। তাই ছেলেদের স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শিবশঙ্করের জ্যাঠতুত ভাই নন্দ মাষ্টার শিবশঙ্করের পরামর্শেই স্কুলটী তত্ত্বাবধান করে। নন্দ মাষ্টার পুণ্যু ঠাকুরেরই সমবয়সী। তিনিই স্কুল কমিটির সম্পাদক। তাছাড়া মেয়েদের ইংরেজীটাও পড়ান। সরকারী সাহায্য ও মাইনে হিসাবে যা আদায় হয়—পুণ্যু ঠাকুর আর যোগীন গাঙ্গুলী ভাগাভাগি করে নেয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও নন্দ মাষ্টার করেন—উপরের শ্রেণীর খাতাও তিনি দেখে দেন। আবার অনেক সময় পুণ্যু ঠাকুর ঠাকুর পূজা করতে আসবার সময় বগলে করে খাতার বাণ্ডিল নিয়ে আসেন রায়বাড়ী। সুনন্দাকে ডেকে খাতা-গুলি হাতে দিয়ে বলেন, "বৌদি, দাদা যেন জানতে না পারেন, এক'টা দেখে দেবেন।" সুনন্দা মুচকী হেসে সম্মতি জানায়। পুণ্যু ঠাকুরকে সকলেই স্নেহ করেন। তাঁর দাদাদের জন্যও বটে—আর নিজেও মানুষটী খারাপ নয়। কিন্তু বুদ্ধিটা তাঁর একটু খাটো আছে। বয়স হ'য়েছে অথচ ছেলেমানুষী যায়নি। কোন বিষয়েই গভীর ভাবে মনোনিবেশ করবার মত তার মন নয় - তার মন যেন হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। গাঁয়ের অনেকেই তার অভিভাবক স্থানীয়। বিশেষ করে শিবশঙ্কর।

এমনি গাঁয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে অনেকেরই ততটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তারপর পুণ্যুঠাকুরের ভাবগতিক দেখে অনেকেই তার স্কুলে মেয়ে পাঠাতে নারাজ। তাঁরা বলেন, "পুরোহিত দর্পণ দেখে কোন রকমে ফুল ছিটিয়ে ও পূজো সারে—পড়াবার বেলাতেও ওরকম নমনম করে সেরে দেয়। ওর চেয়ে ঘরে পড়লেও কাজ হয়।" এঁদের এই যুক্তি যে নেহাৎ অমূলক, তা নয়। শিবশঙ্করও যে এসব কথা না বোঝেন তা নয়। কিন্তু এর বিহিত করতে হ'লে টাকার দরকার। মেয়েদের স্কুলে যাকে তাকে পড়াতে দেওয়া যায় না! সেদিক থেকে পুণ্যু ঠাকুর, যোগীন গাঙ্গুলী অথবা নন্দ মাষ্টারের চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া দায়। বাইরে থেকে শিক্ষয়িত্রী আনতে হ'লে খরচা বেশী। অবশ্য মাইনর স্কুল হ'লে শিক্ষয়িত্রী রাখতেই হবে। তখন পুণ্যু ঠাকুরের ছাপরায় স্থান সঙ্কুলানও হবে না। সেকথা অবশ্য শিবশঙ্কর ভেবে রেখেছেন। হলধর আর তাদের বাড়ীর মাঝখানের পালানটা ছেড়ে দেবেন মেয়েদের স্কুলের জন্য।

পুজো উপলক্ষে অন্যান্য পাড়ার আরো অনেকেই বাড়ী এসেছে। এরা শিবশঙ্করের প্রাক্তন ছাত্র। কেউ কলকাতায় চাকরী-বাকরী করে—কেউবা অন্যত্র কাজে লিপ্ত। গাঁয়ের প্রবীণরা কোনদিনই এদের সুনজরে দেখেননি। উচ্ছৃঙ্খল ও বাওটা বিশেষণেও অনেককে ভূষিত করেছেন। কিন্তু শিবশঙ্কর কোনদিনই এদের পর থেকে আশা ছাড়েননি। এদের দিয়ে তিনি স্কুল ভিটের জন্য মাটি কাটিয়েছেন। গ্রামের রাস্তাটী বেঁধে তুলেছেন—গাঁয়ের ঝোপ-ঝাপ পরিষ্কার করিয়েছেন। বর্ষার দিনে যখন ঝালডাঙ্গার বিলের কচুরীপানা বল্লভপুর মাঠে প্রবেশ করে ধানের ক্ষেত গুলিকে রাহুর মত গ্রাস করে ফেলতে চেয়েছে—শিবশঙ্কর এদের এবং ক্ষেতের চাষীদের ডেকে নিয়ে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে কচুরী পানার কবল থেকে ধানের জমিগুলিকে মুক্ত করতে মেতে গেছেন। বল্লভপুর মাঠ থেকে এমনিভাবে কচুরী পানা তাড়িয়ে—শুধু বল্লভপুরই নয়, আশপাশের গাঁগুলিকেও ধানের ঘাটতি থেকে রক্ষা করেছেন। দেশের যেখানে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—দেখা দিয়েছে মহামারী ও বন্যা—মৃত্যুর কবল থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য যখনই কংগ্রেস থেকে কোন সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হ'য়েছে—শিবশঙ্কর এদের নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষা মাগতে বেরিয়েছেন। যে যা দিয়েছে—এরা যা কিছু সংগ্রহ করেছে—সবই থানা কংগ্রেস কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে এরা সহরে গেছে পিকেটিং করতে। যে সব দোকান বিলেতী বেসাতীর কারবার করে, তাদের দোকানের সামনে শুয়ে পড়ে রয়েছে। কতজনের দেহ পুলিশের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হ'য়েছে—কতজনে হাজত বাস করেছে- গাঁয়ে যখন বিজয়ী বীরের দম্ভ নিয়ে এরা ফিরে এসেছে—এদের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দিতেও কেউ অগ্রসর হয়নি। অনেকেই জুজুর ভয়ে এদের সংগে কথা বলতেও সাহস পায়নি। দুঃখ এদের
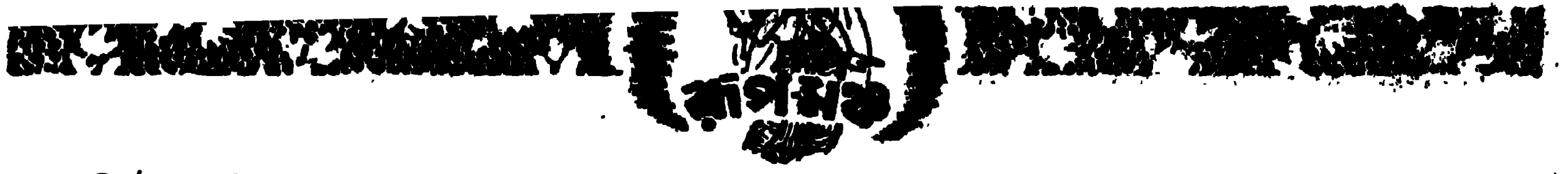
কোনদিনই হয়নি সেজন্ত। এরা জানতো, এমন দিন আসবে, যেদিন এই জুজুর ভয় আর কারো থাকবে না—অভিনন্দনের প্রলেপ দিয়ে এই গ্রামবাসীই সেদিন তাদের ক্ষত মুছিয়ে দেবে—এদের কেউ কেউ যখন ভেঙ্গে পড়তো, শিবশঙ্করই একথা বলে এদের বোঝাতেন। তাছাড়া এরা জানতো, অন্ততঃ গায়ের দু'টি বাড়ীর দোর এদের জন্য সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। একটি হ'লো পুণ্য ঠাকুরের বাড়ী—শুধু পুণ্য ঠাকুরের নয়—ওদের সকলের মেজদার বাড়ী—যে বাড়ীর পর ওদের একচ্ছত্র দাবী রয়েছে আর সে দাবী পুণ্য ঠাকুরও অস্বীকার করেন না। আর ওদের মাষ্টার মশায়ের বাড়ী। বিরাট বট যেমন ক্লান্ত পথিকের জন্য সব সময়ই স্নেহ ছায়া ছড়িয়ে রাখে—তেমনি ওদের জন্য শিবশঙ্করের স্নেহ কোনদিনই অভাব হয়নি। ওরা যে সব সময়ই ন্যায় পথে চলে তা নয়। ওরা অনেক সময় ন্যায়ের জন্যও ভুল করে অন্যায় করে বসে—কিন্তু শিবশঙ্কর সব সময়ই ওদের ক্ষমার চোখে দেখে থাকেন। এই মৃতপ্রায় পল্লীর ওরাই যে আশা ভরসা—সর্বংসহা দেশজননী ওদেরই পানে তাকিয়ে আছে—দেশজননীর অন্তরের আশা শিবশঙ্করের কাছে গোপন রয়নি। তাই ওদের পর কখনও তিনি রাগ করতে পারেন না। ওদের সকল দৌরাত্ম—সকল ভুল ফুল হ'য়েই তাঁর সামনে দেখা দেয়। ওদের অনেকে এবার বাড়ীতে এসেছে। দেখাও করে গেছে। কিন্তু আজ দেবুকে দিয়ে বিশেষভাবে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিকেল চারটায় ওদের বৈঠক বসবে দেবুদের কাছারীতে। এদের অনেকে সুনন্দারও চেনা। কতবার দেবুর সংগে দেবুদের অন্দরমহলে এসেছে। সুনন্দার হাঁড়ি-কুঁড়ি হাতড়িয়ে গুড়টা-নাড়ুটা-মোয়াটা নিদেন পক্ষে হয়ত শুকনো কুল কয়েকটা পকেটে করে নিয়েই চম্পট দিয়েছে। এরাই আবার অন্য সময় অন্য বেশে এসেছে। তখন এরা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মানুষ। মাথায় গান্ধীটুপি। পরণে শুভ্র বাস। হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। শিবশঙ্কর ওদের পুরোভাগে—মাঝে চারজনে একটা চাদরের চারদিক ধরে রয়েছে—ওটা ওদের ভিক্ষার ঝুলি। দেবাদিদেব মহাদেব বুভুক্ষিতের জঠর জ্বালা নেভাতে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অন্নপূর্ণার দ্বারে! সুনন্দা যখন যা হাতের কাছে পেয়েছে—কখনও বা গায়ের গয়না—কখনও পরণের কাপড়—কখনও চাল, উজাড় করে দিয়েছে সুনন্দার কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে এরা অন্য বাড়ী প বাড়িয়েছে। আজ দেবুর মত ওরাও বড় হ'য়ে উঠেছে। ওদের চেহারার পর অন্য রং লেগেছে—মনও পালটিয়েছে। কিন্তু সুনন্দার কাছে যখন আসবে, ওরা সেদিনকার সেই ছোট্টটি ছাড়া আর কেউ নয়। ওরা বর্ণচোরা কিন্তু ওদের আসল বর্ণ যারা চিনতে পারে, তাদের কাছে বর্ণ পালটায় না। ওরা যখন সুবৌদি বলে হাঁক দেবে, সুনন্দার স্নেহ প্রবণ মনে ঝঙ্কার খেলে উঠবে—দীর্ঘ দিনের অ-দেখার সংকোচ কাটাতে সুনন্দার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হবে না—সুনন্দার মনে ছবির মত ভেসে উঠবে—'হ্যাঁ এইত রতন, ও ভাল বাসতো ঝোলা গুড় আর মুড়ি—বীরেনের আবার নিমকীর পর লোভ ছিল বেশী—সন্তোষ যদি তালের পাটালীর সন্ধান পেত সবটুকু শেষ করে তবে ছাড়তো!' তবে সুনন্দার হাতের তৈরী নিমকী আর গজার ভক্তই ছিল ওরা বেশী। তাই আজ ঘরের মেঝেতে সুনন্দা ঘি-ময়দা নিয়ে বসে গেছে। দুপুর বেলা। দেবু খাটের ওপর শুয়ে পড়ে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে একটু ঝুঁকে সুনন্দার সংগে গল্প করছে। সুনন্দার বড় মেয়ে চন্দ্রলেখা। দেবু তাকে লেখা-মা বলে ডাকে। লেখা হ'লো দেবুর মা। লেখার ধারণা, দেবু সত্যি সত্যি ওর পেটে হ'য়েছে। লেখা দেবুর পিঠের পর চড়ে বসে কখনও গলা জড়িয়ে ধরছে—কখনও কাত হ'য়ে পাশ থেকে দেবুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ছে। সুনন্দা লেখাকে দামকী দিয়ে ওঠে—

"আঃ লেখা, কথাটাও বলতে দিবি না?"

লেখা উত্তর দেয়, "বাঃ আমি কী করেছি।" লেখার চেহারাটাও যেমনি মিষ্টি কথাগুলিও মধুক্ষরা। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তাদের বাপমা'র মত গায়ের ভাষায় কথা বলে—লেখা তার বাপমায়ের মত বলে কলকাতার ভাষা। ওর দাদুর বাড়ী কলকাতায়। সেখানেও দু'একবার ঘুরে এসেছে। তাই কলকাতার কথাতেই সে অভ্যস্ত। সুনন্দা বলে, "না তুমি কী করেছো—ওভাবে গা ডলাডলি কচ্ছিস কেন?" লেখা কোন প্রতিবাদ করে না। দেবুর গলাটা

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। দেবু লেখার হাত দু'টো টেনে নিয়ে বলে, "আমার মা মনিকে তুমি বড্ড ক্যাট ক্যাট করো বৌদি। তোমাদের বকাবকিতে ওর চেহারাটা আরও খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"হ্যাঁ এমনি সিংহের পাঁচ পা দেখে—তারপর আরো লাই দাও!" লেখা দেবুর গায়ে মুখ গুঁজে থাকে। দেবু তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, "ওকেত এবার আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো!" একটু থেমে সুনন্দার দিক চেয়ে দুষ্টুমি হাসির সংগে দেবু বলে, "ও থাকবে কোথায় জান বৌদি! মামার বাড়ী নয় কিন্তু!" `লেখাকে দিয়ে যাচাই করে নেয়। "তাইনা মা মনি!" লেখা "হুঁ" বলে সম্মতি জানায়। মামার বাড়ীর কথা বলে মাকে খেপাতে অতটুকু লেখারও বেশ মজা লাগে। দেবু বলে, "ও থাকবে আমার মেসে।" সুনন্দাও কম সেয়ানা নয়। উত্তর দেয়, "বেশত ভুপেনের মেচের মুসুরীর ডাল আর শাক চর্চ্চড়ী খাবে।" একটু থেমে ময়দা চটকাতে চটকাতে সুনন্দা বলে, "যখন যাবি তখন বোঝা যাবে। তুই এখন একবার তোর পিসীকে ডেকে দেতো। আমাকে এগুলি একটু বেলে দেবে!"

লেখা "যাই" বলে উঠে পড়ে। পিসী অর্থাৎ রাই—রাই আজকাল আগের মত যখন তখন আসে না। পাড়ায়ও বেশী বেরোয় না। সুনন্দা খবর পাঠালে তবে আসে। আবার কাজ সেরে চলে যায়। লেখা চলে গেলে দেবু সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বৌদি! ওদের বাড়ীর তমাল গাছের নীচে আবার আখড়া কবে বাঁধলো?"

সুনন্দা উত্তর দেয়, "কেন তুমি এখনও কিছু শোননি।" ও আখড়াত নয়—রাই ধরবার জন্ত মেজকর্তার ফাঁদ।"

"তার মানে?"

"তার মানে কী? মেয়েটা বেশ ডাগর হ'য়ে উঠেছে—লোভও অনেকদিন থেকে ছিল। অথচ কিছুতেই বশে আনতে পাচ্ছে না। তাই বাড়ীর পর কীর্তনের আসর বসিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। সে অনেক কথা। পরে শুনতে পাবে।"

"তা দাদা কোন আপত্তি করলেন না?"

"তাঁকেত জানোই! আর ঠাকুর দেবতার নামেত তোমাদের গায়ের লোক পাগল। তাই ওসব ঝঞ্ঝাটের ভিতর যেয়ে লাভ কী!"

"লাভ কী? চোখের পর লোকটি একটা অন্তায় জবরদস্তি করবে—আর দাদা তাই মেনে নেবেন?"

"এ অন্তায় সেত বরাবরই করে আসছে। তোমরা কে তার কী করতে পেরেছো"—

দেবু কোন উত্তর খুঁজে পায় না। সত্যিইত, গ্রামের কেউইত কোনদিন মেজকর্তার কোন অন্তায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। শুধু মেজকর্তারই বা কী দোষ! এইত গায়ের নিয়ম। যারা অন্তায় করে—শক্তি ও সামর্থের বলে তারাই চোখ রাঙিয়ে সমাজকে হাতের মুঠোর ভিতর রেখেছে। শুধু বল্লভপুরের গায়েই নয়—সারা দুনিয়াটাতেই ন্তায়ের প্রতি অন্তায়ের—দুর্বলের প্রতি সবলের এই আধিপত্য ও অত্যাচার চলছে—এর কী কোন বিহিত নেই—কোন বিহিত নেই! দেবু আর ভাবতে পারে না। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। শুদ্ধ মূকের মত সুনন্দার ময়দা মাথার চিকে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ, এমনি ভাবে—একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন সমস্ত অন্তায়কে এমনি ভাবে ময়দা-ডলার মত চটকে পৃথিবী থেকে দূর করতে হবে।

সুনন্দা বলে, "ভেবে কী করবে বল। ওর চেয়ে যদি পারো মেয়েটার একটা বিহিত করে দাও—কলকাতায় নার্সিং-ফার্সিং-এর কাজের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা কর। এখন অবধিও বিগড়ে যায়নি। তবে সোমত্ত বয়েস—ওসব ঘরের মেয়েদের বিগড়ে যেতে কতক্ষণ?"

দেবু শুধু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—'হুঁ'। রাই কখন যে এসে বাইরের চৌকঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে—তা এরা কেউ টের পায়নি। দেবু একটু চুপ করে থেকে যেই কী বলতে যাবে—অমনি রাইকে নজরে পড়লো। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে সুনন্দাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "আরে বৌ'দি—your most obedient—সুনন্দা সংগে সংগে বলে ওঠে—"কে! রাই"—

রাইর দিকে তাকিয়ে দেখে—ওর মুখে কে যেন একছোপ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। সুনন্দা ময়দায় জলের ছিটে দিতে দিতে বলে, "তোর কথাই হচ্ছিল"।

রাই গম্ভীর ভাবে বলে, "আমি শুনছি।"

সুনন্দা সান্ত্বনার সুরে উত্তর দেয়, "দুঃখ করিস না ভাই। গরীবের ঘরে জন্মালে কতকী সহ্য করতে হয়। কিন্তু তুইত আর সকল মেয়ের মত নস—সবই বুঝিস। অত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?" রাই চুপ করে থাকে। সুনন্দা আবার বলে, "তোর দেবুদাকে বলছিলাম, কলকাতায় একটা কোন কাজ ঠাজ ঠিক করে দিতে—যাতে স্বাধীনভাবে অন্তত: নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারিস।" রাই অভিমানের সুরে বলে, "দেবুদার কথা তুমি আর কইও না বৌদি। সেবার বইল্যা গ্যালো কল পাঠাইয়া দেবে—ক্যামন আছে?" এর পূর্বে দেবু যখন একবার বাড়ী এসেছিল, তখন বলেছিল কয়েকটা সেলাইর কল কিনে সুনন্দার কাছে পাঠিয়ে দেবে—সুনন্দা রাই এবং রাইর মত গায়ের আরো দু'একটী মেয়েকে সেলাই শিখিয়ে দেবে। যাতে অন্ততঃ গায়ের দশজনের পোষাক তৈরী করে এরা কিছু রোজগার করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবু আর সে কল পাঠাতে পারেনি। দেবু এবার উত্তর দিল, "তোরা ভাবিস—ন'শ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই—কেমন! ইচ্ছাত অনেক কিছুই করে কিন্তু টাকার অভাবে এমনি কত ভাল ইচ্ছা যে ডুবে যায়।"

রাই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো—সত্যি দেবুকে আঘাত দেবার জন্য সে কিছু বলে নি। মুখ দিয়ে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। সে সবই জানে। কত কষ্ট করেই না তার দেবুদা নিজের পড়াশুনার খরচ চালাতো! সংসারের খরচ চালিয়ে শিবশঙ্কর সব মাসে দেবুকে টাকা পাঠাতে পারতেন না। যা পাঠাতেন তাও নগণ্য। দেবু টিউসানি করে নানান ভাবে নিজের খরচা চালিয়েছে—কোন মাসে টাকা বাচলে সুনন্দার নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুনন্দার কাছ থেকেই রাই এসব কথা জেনেছে। রাই কোন কথা বলতে পারলো না। তার দেবুদাকে যে আঘাত দিয়েছে—সেই আঘাতের ব্যথায় দু'ফোটা জল তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

সুনন্দা রাইর দিকে তাকাতেই দেখলো, রাইয়ের চোখে জল, সুনন্দা বলে উঠলো—"ওকী রে! কাঁদছিস কেন—কী হ'য়েছে?" সুনন্দার কথায় রাইর কান্না যেন আরো বেড়ে চললো। সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগলো, "না দেবুদা, এবার যাইয়া যদি কিছু না করো—আমার অয় জলে ডুইবা আর না অয় গলায় দড়ি দিয়া মরতে অবে।"...সুনন্দা ধমকে উঠে, "নে—থাম। সে যা হয় পরে হবে—তোকে যেজন্য ডেকেছি—এগুলি নিয়ে চল রান্না ঘরে—আমায় বেলে দিবি। ওদের আসবার সময় হ'য়ে এলো।" সুনন্দা ও রাই চাকী, বেলুন ও ময়দার থালা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। দেবু গেঞ্জি গায় দিয়ে কাছারীর দিকে বেরিয়ে পড়ে।

চারটেয় দেবুদের বৈঠক বসবার কথা ছিল। সহরে বাবুদের নিয়ে বৈঠক হ'লেও—গায়ে এসে তাদের গায়ের রীতিটাই মেনে নিতে হয়। তাই বৈঠক বসতে বসতে পাঁচটার আগে আর বসতে পারে না। প্রত্যেকেই শিবশঙ্করকে আশ্বাস দেয়—যে যার সামর্থানুযায়ী মাসে মাসে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাবে। এর মধ্যে বীরেন বসুই সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নেয়। তার বাড়ীর অবস্থাও ভাল—তাছাড়া সম্প্রতি এম, বি পাশ করে কলকাতায় বেশ পশার জমিয়েছে। স্কুলঘর তুলবার সমস্ত খরচের দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এবং এবারই প্রাইমারী স্কুলের পরীক্ষার শেষ হবার সংগে সংগে যাতে নূতন শ্রেণী খুলে নূতন বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরীত করা যায় শিবশঙ্করকে সেই ভাবেই প্রস্তুত হ'তে বলে। শিবশঙ্কর প্রস্তাব করেন, 'বল্লভপুর বালিকা বিদ্যালয়ে'র পরিবর্তে স্কুলের জন্মদাতা

পুণ্যঠাকুরের বড়দা স্বর্গতঃ পাঁচকড়ি ভট্টাচার্যের নামানুসারে বিদ্যালয়টার নাম রাখা হবে 'পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয়'। সকলেই এই প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় সমর্থন করে এবং স্কুল কমিটির সামনে উপস্থিত করবার জন্য শিবশঙ্করকে অনুরোধ করে। সভায় আরো ঠিক হয়, স্কুল পুনর্গঠনের সংগে সংগেই আপাততঃ একজন শিক্ষয়িত্রী নেওয়া হবে। এবং বাড়ীর পর যখন, সুনন্দাও মাঝে মাঝে পড়িয়ে যেতে পারবে—সে কথাও আলোচিত হয়। তাছাড়া পুণ্যঠাকুর, যোগীন গাঙ্গুলী, আর নন্দ রায় ত থাকবেনই। সভা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। শিবশঙ্কর এদের নিয়ে যে জায়গাটায় ঘর তোলা হবে, সেখানে যেয়ে হাজির হন। কাছারী ঘরের হোগলার আটি থেকে একটা হোগলা টেনে নিয়ে মেপে ঝুপে এদের দেখিয়ে দেন। বীরেন দেবুকে চিমটি কেটে ফিস ফিস করে বলে ওঠে, "তোর সেই অপরাজিতার লতাটা কোথায় রে?" দেবু আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, "ওই দেখনা—।" অর্থাৎ সেখানে রাঙ্গা জ্যেঠাইমার কুমড়ো গাছ বেশ লতিয়ে উঠেছে। দেবুর বাগানে এরা একসময় অনেকেই আস্‌তো—এই বাগানে ওদের ছোট বেলার কত স্মৃতিই না জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ আর সেখানে কোন চিহ্নও নেই। কেবল একধারে একটা ঝুমকো জবার গাছ অতীতদিনের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া সবগুলির স্থান দখল করেছে রাঙ্গা জ্যেঠাইমার কুমরোর মাচা—ডাটার ক্ষেত—পুঁই শাক ইত্যাদি। দেবুর ফুল বাগানের অপমৃত্যুর শোক দেবুর মত ওদের মনেও কম বাজে না—সে শোক স্কুল বাড়ী গড়ে ওঠার সান্ত্বনা দিয়ে দেবুর মতই ওরা ভুলে যায়। মাপ-ঝোক হ'য়ে যাবার পর দেবুর সংগে ওরা বাড়ীর ভিতর আসে। ইতিমধ্যেই ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জলে উঠেছে। সুনন্দা সন্ধ্যা দিয়ে ওদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। মুহূর্তের মধ্যেই দেবুদের ঘরটা কলহাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠলো। লেখাকে ও একবার কাছে টানে, এ একবার কাছে টানে। ওদিকে অনেকদিন বাদে হলধরের বাড়ী থেকে খোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। 'কোথা বিনোদিনী রাই' বলে মেজকত্তার দল রাগিনী ধরেছে।

আজ অনেকদিন বাদে হলধরের বাড়ীতে মেজকত্তাদের কীর্তনের আসর বসেছে। পুজোর হাঙ্গামায় এ আসর এ'কদিন বসতে পারেনি। হলধরের বাড়ীতে এই আসর বসবার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। এ অঞ্চলের জেলেরা স্বভাবতঃই একটু কৃষ্ণ ভক্ত এবং তার নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক জেলে বাড়ীতেই একটা করে তমাল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তমাল গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে বেদী বেঁধে দেওয়া হয়। আর প্রতি হাটবার অর্থাৎ বল্লভ-পুরের বার অনুযায়ী প্রতি শনি মঙ্গলবার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে এরা তমাল গাছের তলায় গুড়—বাতসা—নিদেন পক্ষে কলা কী অন্যান্য ফল দিয়ে হরির লুট দেয়। হলধরের বাড়ীতেও তার ব্যাতিক্রম হয় না। জেলেদের এই কৃষ্ণ-ভক্তির অন্য কোন কারণ হয়ত আছে। সব জেলেরাই বৈষ্ণব এবং কণ্ঠি ধারণ করে। তবে যখনই যে জেলে জাল বাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে পারে না—সংসারে সেরূপ কোন আবিল্যি না থাকলে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য সংগে বৈষ্ণবী জোটাতেও ভুল করে না। যে সব বিধবাদের পুনরায় বিয়ে বসবার বয়স পাড় হ'য়ে যায়—অথচ মনের ইচ্ছা মরে না—তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বৈষ্ণবী হয়ে সে ইচ্ছাকে বাচিয়ে রাখতে পারে। কোন বিধবা মেয়ে বাপের বাড়ীর নির্যাতন সহ্য করতে যদি অপারক হ'য়ে ওঠে—অথবা স্বভাব দোষেই হউক আর মনের দোষেই হউক যদি কারোর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে—তখন তার সংগে যদি পালিয়ে যায়—তাতে কুৎসা রটলেও ভেক নিয়ে যদি গায়ে ফিরে আসে—রাজবংশী সমাজের কেউ তাদের নিন্দা করেনা. এরকম ঘটনা হামেসাই ঘটে থাকে। সমাজের এই উদারতাটুকুর জন্যই রাজ-বংশীরা কৃষ্ণ-ভক্ত কিনা কে জানে! হলধরের বংশে অবশ্য এরূপ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হ'য়ে বেরিয়ে যাবার কোন নজির নেই। তা'হলেও তাদের কৃষ্ণ-ভক্তিতে কোন ভাটাই পরিলক্ষিত হয় না। হলধরের বড় ছেলে বাদলের কৃষ্ণ-ভক্তি যেন হলধরকেও ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি সে বিয়ে করেছে। এবং জেলেদের সমাজের সাধারণ বিয়ের
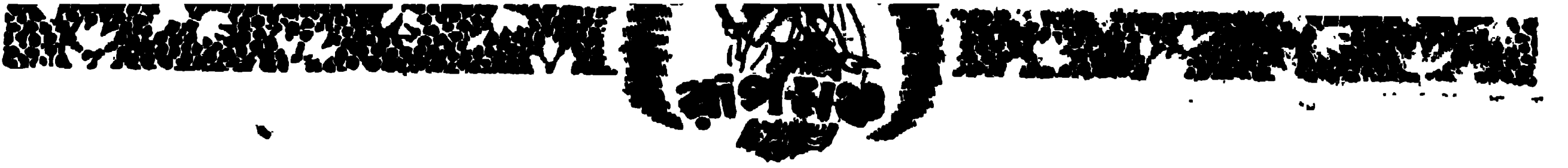
বয়েসী মেয়েদের চেয়ে তার বউ একটু বেশী ডাগর-ডোগর। এজন্য অবশ্য হলধরকে বেশী টাকা মেয়ের পণ বাবদ দিতে হ'য়েছিল।

হলধরের বয়স হ'য়েছে। আগের মত নিজে জাল বাইতে পারে না। বিয়ের পর বড় ছেলে লায়েক হ'য়েছে, সেই বাড়ীর কর্তা। স্বভাবতঃ কর্ত্রীর আসনে তার বৌ'ই অধিষ্ঠিত। জেলে বৌরও আর সে দাপট নেই। মাঝে মাঝে তার গলা সপ্তমে চড়লেও পেছন থেকে বাদলের বৌ অষ্টমে রাগিনী ধরে। রাইর প্রতিও নির্যাতন যে একটু আধটু আরম্ভ না হ'য়েছে তা নয়। কিন্তু রাই সব বুঝেই চুপ করে থাকে। আগের রাইর সে আব্দার নেই—সে উদ্দাম চাঞ্চল্যও তার ফুরিয়ে গেছে। ঝরের পর নদী যে শান্ত সমাহিত ভাব ধারণ করে—রাইর অবস্থাও তাই। হলধর মেয়েকে লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে। তার বুক ভেংগে যায়। কিন্তু অসহায় পিতার মর্মপীড়া শুধু মনের মাঝেই গুমরে গুমরে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে মেজকত্তার জুড়ি মেলা দায়। তিনি হলধরের বড় ছেলেটাকে ধীরে ধীরে দলে টেনে নিয়েছেন। হঠাৎ ওর গলা মেজকত্তাকে এতই মুগ্ধ করেছে যে, ওকেও কীর্তন আসরের একজন সাকরেত করে নিয়েছেন। তাছাড়া সময়ে অসময়ে বাদলের বৌ'কে দু'একখানা শাড়ী উপঢৌকন দিয়ে মূলকে হাত করতেও কসুর করেন নি। রাইর জন্যও অবশ্য ঐ সংগে দু'একখানা জুড়ে দিয়েছেন। রাই কিন্তু তা একবার ছুঁয়েও দেখে নি। বাপের দেওয়া জোলার শাড়ীই সে পছন্দ করে। হলধর আজকাল মেয়েকে আর দামী শাড়ী কিনে দিতে পারে না—কিন্তু মেয়েটাকে সাজাবার সখ আজও তার যায় নি। মেজকত্তার দেওয়া শাড়ী দেখে তবু একটু আশ্বস্ত হয়। মনে মনে ভাবে—"না মাইজা কত্তা লোক খারাপ অইলেও তার দয়ার শরীর।" রাইকে ডেকে বলে, "মাইজা কত্তার শাড়ীটা একদিন পিনলি না।" রাই উত্তর দেয় না। টিপ্পনী কেটে ওঠে বাদলের বৌ,……"তা পিনবে ক্যান—তোমার মাইয়্যা নেকাপরা জানে। মাইজা কত্তার শাড়ীতে যে মান খোয়া যায়। আইচ্ছ্যা ঠাহুর তুমিই বোলত, মনিব ত বাপ তুল্য। তারগো জিনিষে কী অপমান আছে।"

হলধর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, "না তা ক্যান আছে।" আর মেজকত্তা একদিক দিয়ে তাদের মনিবইত বটে! মেজকত্তাদের বহু জলায় হলধরেরা জাল বায়। রাই উত্তর দেয়, "আমিত তা কইছি না। তুমিও কী বুঝোনা বৌ—আমার দামী শাড়ী পিনা সাজে কিনা? লোকে কী বলবে!" বাদলের বৌ মনে মনে রাইর এ যুক্তি মেনে নেয়। তা মন্দ কী! তারইত লাভ। সবক'খানাই তার নিজের থেকে যায়—বাইরে অবশ্য বলে, "তা ননদাই তোমার আর বয়েসটা কী—এ বয়সে লোকের স্বাদ আস্বাদ যায় না।"

কথা আর এগোয় না। হলধর বোঝে রাইর বাধা—নইলে রায় বাড়ীর গিন্নি যখন যা হাতে করে দেয় রাইত মহাখুশীতে নিয়ে আসে।

মেজকত্তা নানান ভাবে জাল পাতেন। কিন্তু কোন খ্যাপেই তার জালে মাছ ওঠে না। জেলের মেয়ে রাই—জালের ধর্ম তার অজানা নয়—তাই মেজকত্তার জাল থেকে দূরে দূরেই থাকে। ধরা দেয় না। মেজকত্তা এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার মত পাত্র নন। শেষ চেষ্টা তিনি করে দেখবেনই একবার। অন্যবাড়ী হ'লে কথাই ছিল না। কিন্তু হলধরের পেছনে রায়বাড়ী রয়েছে। তাই এখানে জোর খাটিয়ে কিছু করা যাবে না—এখানে তার বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে। এবং সেই খেলাই তিনি খেলছেন।

ঝুলন পূর্ণিমার আগের দিন। মেজকত্তা খুব ভোর থাকতে হলধরের বাড়ী এসে হাজির হলেন। মেয়েরা সংসারের কাজে হাত লাগিয়েছে, হলধর সবেমাত্র উঠে এক ছিলাম তামাক সাজছে। মেজকত্তাকে দেখেই হলধর হচকচিয়ে উঠে দাওয়ায় এসে নামে—আশ্চর্য হ'য়ে যায় এত ভোরে মেজকত্তাকে দেখে। জিজ্ঞাসা করে, "মাইজাকত্তা কোন বিপত—…"মেজকত্তার চোখ মুখে তন্দ্রালু ভাব। তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন—হলধরের হাত দুটো ধরে বলেন, "না হলধর, বিপদ
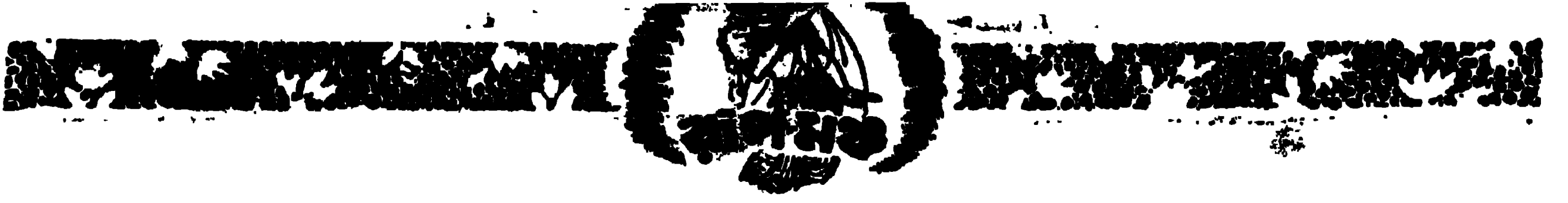
নয়—বিপদ নয়—তুমি যে কতবড় ভাগ্যবান।" হলধর বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যায়। মেজকত্তার ভাব এবং ব্যবহার দেখে। বিস্ফারীত নেত্রে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে —। মেজকত্তা বলেন, "আমায় কী দেখছো হলধর। ভাগ্যবান তুমি। ভগবান তোমার প্রতি কৃপা করেছেন। তোমার তমাল পূজা সার্থক হ'য়েছে।" মেজকত্তা বলে চলেন, "আজ শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—তোমার তমাল তলায় আমাদের কীর্তনের আসর বসেছে—শ্রীকৃষ্ণ যুগল মূর্তিতে তমালের ডালে ঝুলন খেলছেন। আমাকে বল্লেন—তোর কীর্তনে খুবই মুগ্ধ হ'য়েছি—মাঝে মাঝে আমায় তোর কীর্তন শোনাবি। তোদের মংগল হবে।"

ততক্ষণ জেলেবৌ—বাদল—বাদলের বৌ সবাই এসে মেজকত্তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ায় নাই শুধু রাই। সে ঘরের ভিতর থেকে পাটখড়ির বেড়ার ফাক দিয়ে কান পেতে সব শুনছে ও দেখছে। মেজকত্তা একটু থেমে আবার বলেন—তার চোখমুখ কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত, "আমি বল্লাম, প্রভু! আমি রোজ তোমায় কীর্তন শোনাবো—কিন্তু তুমিকী কোন নিদর্শনই রেখে যাবে না! তখন রাধাবল্লভ হেসে ফেল্লেন—। শ্রীরাধা তখন বল্লেন, আমরা এই তমাল গাছের মায়া ছাড়তে পারবো না—কালা পারলেও আমি পারবো না। এই বলে যেই তাঁরা অন্তর্ধান হচ্ছেন—অমনি তমালের কাটায় ননীচোরার কাপড় আটকে গেল—শ্রীরাধা হেসে বল্লেন, এই রইল তোমার নিদর্শন! যুগল মূর্তি আর দেখলাম না, দেখলাম ননীচোরার পীতবাসের এক খণ্ড জড়িয়ে রয়েছে তোমার তামালের ডালে। হলধর তোমার চেয়ে কে ভাগ্যবান বলোত? কী সে রূপ! সে কালো-রূপে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমার এতদিনের কীর্তন-সাধনা সার্থক হ'লো।" এই বলে মেজকত্তা হাতে তালি দিতে দিতে "সখি কী হেরিনু তামালের ডালে" গাইতে গাইতে তমাল তলায় যেয়ে হাজির হলেন—সকলেই তাকে অনুসরণ করলো। তমাল তলায় হাজির হয়ে সকলের দৃষ্টি তমাল গাছকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগলো—বাদল "ঐ ঐ" বলে দেখাতেই সকলের নজরে পড়লো—সত্যি, পীত রং-এর ছোট একটা কাপড়ের টুকরো তমালের ডাল জড়িয়ে রয়েছে।—মেজকত্তা আনন্দের আতিশয্যে তমাল তলায় লুটোপুটি খেতে লাগলেন। সেই সংগে সংগে হলধরের বড় ছেলেটাও। মেয়েরাও গড় হ'য়ে প্রণাম করলো। সকলের ডাকাডাকিতে রাইকেও শেষ পর্যন্ত একবার প্রণাম করে যেতে হ'লো। বেলা হবার সংগে সংগে সমস্ত গায়ে এই ঘটনা রটে গেলা। মেজকত্তার অন্যান্য সাকরেতরা তার পূর্বেই খোল করতাল নিয়ে নাম গান আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা পূর্বে থেকেই কিছু জানতো কিনা কে জানে! গায়ের যারা এলো, কেউ বিশ্বাস করলো—বাড়ী ফেরার সময় মেজকত্তার উদ্দেশ্যে বলতে বলতে গেলো—"আর যাই থাক—ভগবানের দয়া আছে—নইলে কার ভাগ্যে এরকম স্বপ্নাদেশ হয়।" যারা বিশ্বাস করতে পরেলো না—মেজকত্তার উর্বর মস্তিস্কের তারিফ করতে করতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ নাম গান হবার পর অবনী ঠাকুর স্নান করে একখানা ধোয়া চৌকি ও নূতন কাপড় নিয়ে আসে। মেজকত্তারা নাম গান করতে থাকেন—অবনী ঠাকুর গদ গদ ভাবে পীতাম্বরের পীতবাস খণ্ড চৌকির পর স্থাপন করে চৌকীটাকে বেদীর ওপর রেখে দেয় এবং নূতন কাপড় দিয়ে সমস্ত বেদীটা মুড়ে ফেলে। পরের দিন ঝুলনের সময় মহাসমারোহে তমালগাছে দোলনা ঝুলিয়ে ঐ চৌকীটাকে দোল খেলানো হয়। সেই থেকেই মেজকত্তার কীর্তনের আসর তার বাড়ীতে না বসে হলধরের তমাল তলায় বসে।, তমাল তলার পাশে মেজকত্তার টাকাটেই একটা ঠাকুর ঘরের মত তৈরী হ'য়েছে। তাতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে।

পুজোর ক'দিন কীর্তনের আসর বসতে পারেনি—আজ বিরহের পালা দিয়ে মেজকত্তা আসর উদ্বোধন করেছেন। তমাল তলায় রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ দেবার ভার রাইরই ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে মেজকত্তার আসর বসেছে, সেদিন থেকে সে আর তমাল তলায় সন্ধ্যা জ্বালাতে যায় না। এদের আসর ভাঙার পর একা এসে তমাল তলায় প্রণাম করে যায়। (চলবে)

কেশ-বিন্যাসে---

চিকুরিণ

●

শুধু মলিনাই নন—কেশ-বিন্যাসে যাঁরা রুচির পরিচয় দিয়ে থাকেন, 'চিকুরিণ' সম্পর্কে তাঁরা সকলে একই অভিমত পোষণ করে থাকেন, 'স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে, কেশচর্চায় চিকুরিণ অপরিহার্য।' চিকুরিণ কেশবৃদ্ধিতে যেমনি সহায়ক, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখতেও তেমনি তার জুড়ি নেই।

●

একবার ব্যবহারেই অভিজ্ঞদের এই অভিমতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন !

বি, ডি, এণ্ড কোঃ লিমিটেড :: কলিকাতা

সম্পাদকের দপ্তর
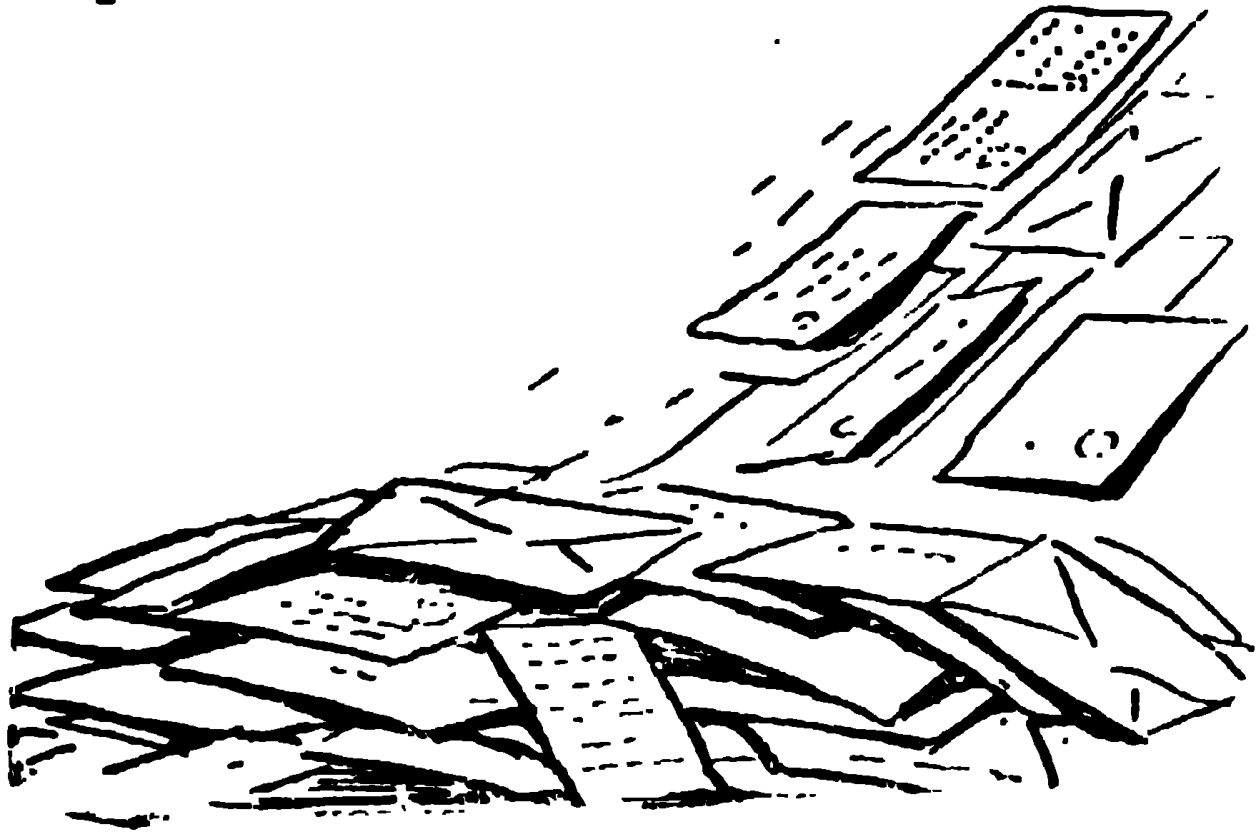
সুষমা চৌধুরী (রতনবাবু রোড, কাশীপুর)
বোসার্ট প্রোডাকসনের বাংলা চিত্র 'প্রিয়তমা'য় সুশীল মজুমদারের স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা মজুমদারকে দেখা যাবে বলে রূপ-মঞ্চে মুদ্রিত হ'য়েছে—কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী সংখ্যা রূপ-মঞ্চ ও অন্যান্য কাগজ থেকে জানতে পেরেছি, সুশীল মজুমদারের স্ত্রীর নাম আরতি মজুমদার—অনিতা মজুমদার নহে। কোনটা ঠিক।

●● সপ্তম-বর্ষ প্রথম সংখ্যা রূপ-মঞ্চে ভুলবশতঃ অনিতা মজুমদার প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী আরতি মজুমদার—অনিতা মজুমদার নহে। ইনি 'প্রিয়তমা' চিত্রে সর্বপ্রথম আপনাদের অভিবাদন জানাবেন। গত ২য় সংখ্যা রূপ-মঞ্চে পাহাড়ী সান্যাল ও আরতি মজুমদারের যে ছবি প্রকাশিত হ'য়েছে, তাতে আমরা প্রথমে লিখেছি আরতি মজুমদার—অনিতা মজুমদার নহে। কিন্তু আর্টপ্লেটটী যিনি কম্পোজ করেছিলেন—তিনি মনে করলেন, আমি ভুল লিখে দিয়েছি এবং আমর ভুল সংশোধন করে লিখে দিলেন—অনিতা মজুদার, আরতি মজুমদার নহে—অর্থাৎ ভুল সংশোধন করতে যেয়ে ভুলটাকেই কায়েমী-করে দিলেন। ঐ সংখ্যায়ই অবশ্য ৭১নং পৃষ্ঠায় 'ভুলের ভুত' শিরোনামায় এ সম্পর্কে আমরা মন্তব্য করেছি। আমাদের কম্পোজিটার ভাইয়ের পক্ষ থেকে এ ভুলের জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।

করালী মোহন চট্টোপাধ্যায় (নবাব লেন, বড় বাজার)
বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

●● এ সম্বন্ধে একথায় উত্তর দেওয়া যায় না। অথচ বেশী স্থান নিয়ে অপর পাঠকদেরও আমি বঞ্চিত করতে চাই না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ থেকে বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে বাঙালীদের যে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হ'য়েছিল—কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে বঙ্গবিভাগের অনুকূলে আমাকে অনেক ভোটই সংগ্রহ করতে হ'য়েছিল—কিন্তু আমি নিজে ভোট দেই নি। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অখণ্ডতাই আমার কাম্য। এ বিষয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলি আমায় সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। তবু বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করবো এইজন্য যে, এই বিচ্ছেদ মুসলীম লীগের অনমনীয় মনোভাব থেকেই উদ্ভূত। তাঁরা যদি হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের ছাপ দিয়ে ভারতকে বিভাগ করতে না চাইতেন, তাহলে বঙ্গবিভাগের কোন কথাই উঠতো না। মুসলিম লীগ যদি অসাম্প্রদায়িক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করতেন, অবনত মস্তকে আমরা তা মেনে নিতাম। হিন্দুমহাসভার বা মুসলিম লীগের মনোভাব যতই উদার বলে তাঁরা মনে করুন না কেন, একথাটাত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তাঁরা সাম্প্রদায়িক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন প্রগতিবাদী হিন্দু বা মুসলমানই তাঁদের সমর্থন করতে পারেন না। এবং কংগ্রেসও যদি একদিন প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে—তার আনুগত্য অস্বীকার করতেও আমি সেদিন দ্বিধা করবো না। আমি হিন্দুমহাসভার পাণ্ডাদের চেয়ে কম নিষ্ঠাবান হিন্দু নই—কিন্তু তবু হিন্দুমহাসভাকে কোন দিনই সমর্থন করতে পারবো না।

যা হ'য়ে গেল তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। যাঁরা

পাকিস্থান চেয়েছিলেন—তাঁরা তা পেয়েছেন। বঙ্গ-বিভাগের সমর্থকদের আন্দোলনও জয়যুক্ত হ'য়েছে। কংগ্রেস সভাপতির ভাষায়ই বলতে হয়, এবার প্রত্যেকের অগ্নি পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় যদি তাঁরা কৃতকার্যতা লাভ করেন—তবেই পরস্পরের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। নইলে তাসের ঘরের মত সবই ভেংগে যাবে। তবে একথা ঠিকই, বাংলার এক অঞ্চলের অধিবাসীর সংগে আর এক অঞ্চলের অধিবাসীর যে আত্মীয়তা রয়েছে, এই কৃত্রিম বিভাগ একদিন যে মিশে যাবে তা হয়ত আজকের বিভাগকারীদের অনেকেই বুঝতে পাচ্ছেন না—আর আমরা বাংলার নিপীড়িত সমাজ—বাংলার দুই প্রান্তে থেকে সেই শুভদিনের আগমন প্রতীক্ষায় আজকের অভিশাপকে মেনে নেবো।

দীপালি দাশগুপ্ত (রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● রূপ-মঞ্চের ভুলত্রুটী নিয়ে রূপ-মঞ্চের পাতায় আলোচনা করবার আপনাদের দাবী সব সময়ই রয়েছে কিন্তু অন্য পত্র-পত্রিকা নিয়ে আপনাদের কোন অনুযোগ-অভিযোগ কেই রূপ-মঞ্চের পাতায় স্থান করে দিতে পারবো না। আশা করি এই অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন।

সুবিমল রায় চৌধুরী (জগন্নাথ টেম্পল রোড, কাশীপুর)

সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্ত কি সহোদর ভাই ?

● ● হাঁ।

আখতার ভুসেন (গুদারা ঘাট, জামালপুর, মৈমনসিং)

(১) বাংলার কোথাও গান রেকর্ড করবার বন্দোবস্ত আছে কি ? (২) শুনিলাম অশোক কুমার বাংলা ছায়াচিত্রের যোগদান করিয়াছেন—যদি ঘটনা সত্য হয় তবে তার পরবর্তী বাংলা ছবি কী জানাবেন।

● ● হাঁ, কলকাতার এইচ, এম, ভি'র ষ্টুডিওতে ব্যবস্থা আছে। (২) হাঁ—আগামী বাংলা চিত্র 'চন্দ্রশেখর'-এ শীঘ্রই আপনাদের অভিবাদন জানাবেন তিনি অস্থায়ী ভাবে যোগদান করেছিলেন। কাজ শেষ করে আবার বম্বে ফিরে গেছেন।

সুধীর চট্টোপাধ্যায় (ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ)

বর্তমানে আমাদের দেশে কিশোরদের জন্য কি জাতীয় ছবি তোলা হ'চ্ছে ?

● ● নিছক ছোটদের জন্যই ছবি তুলতে বর্তমানে কাউকে হস্তক্ষেপ করতে শুনিনি। নিউ থিয়েটার্স 'রামের সুমতি'কে রূপায়িত করে তুলছেন—'রামের সুমতি' শিশুদের উপযোগী হ'য়ে দেখা দিলেও তাকে সত্যিকারের শিশুচিত্র বলতে পারবো না।

সরোজ কুমার মুখোপাধ্যায় (ইলেকট্রিক সাপ্লাই, বাঁকুড়া)

আচ্ছা নবাগত কমল চ্যাটার্জি যিনি 'শৃঙ্খল' চিত্রে নবীনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি বর্তমানে কোন চিত্রে অভিনয় করিতেছেন ?

● ● তাঁকে ডি, জি-র 'জীবন ও যুদ্ধ' চিত্রে একটা বিশেষ ভূমিকায় দেখতে পাবেন।

কুমারী শেফালী দত্ত (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)

কুমারী অজন্তা কর কি চিত্রজগৎ হইতে অস্থায়ী ভাবে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

● ● 'ঝড়ের পরে' চিত্রে তাঁকে দেখতে পেয়েছেন। 'স্বপ্ন ও সাধনা' ও 'রবীন মাষ্টার'-এ ও তিনি আপনাদের অভিবাদন জানাবেন।

সুশীল চক্রবর্তী (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর ভিতর প্রয়োগশিল্পী হিসাবে কাকে উচ্চ স্থান দেবেন।

● ● বিনা দ্বিধায় প্রমথেশ বড়ুয়াকে। তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্যে যে সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত বসুর মাঝে তা পাওয়া যায় না। অবশ্য এই প্রতিভা বর্তমানে যে জৌলুষ হারিয়ে ফেলছে একথা স্বীকার করবো।

নিতাই বসু (বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
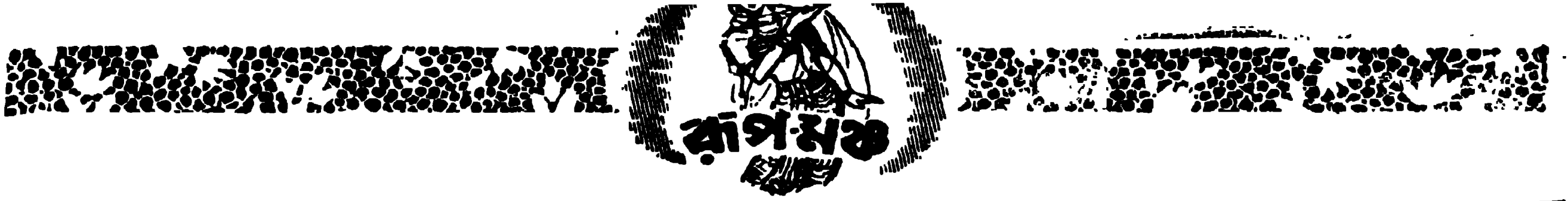
পথের দাবীতে 'প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে' গানটি কে গেয়েছেন।

●● সত্য চৌধুরী বলেই আমার মনে হ'য়েছে।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য (আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য)

কানু রায় (কিসমৎ ও সফর খ্যাত) কোন বাংলা ছবিতে আছেন কি ?

●● না।

শেলী বসু (বেলিয়াঘাটা)

শুনলাম কোনও চিত্র প্রতিষ্ঠান ভিকতর হুগোর অমর উপন্যাস 'হাঞ্চব্যাক অফ নতর দাম'এর বাংলা চিত্ররূপ দিতে ব্যস্ত আছেন। আরও শুনেছি হাঞ্চব্যাক চরিত্রে অভিনেতা শ্যাম লাহা মনোনীত হ'য়েছেন। আমি এ জাতীয় উদ্ভট মনোনয়নের তীব্র প্রতিবাদ করি। কারণ, ঐ মনোনীত অভিনেতা দ্বারা এরূপ কঠিন একটি চরিত্রের পরিস্ফুটন কতখানি সম্ভব সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। বিশেষ করে এদেশে মেক-আপ এর কোনই উন্নতি হয়নি। হয়ত দেখতে পাব কুঁজো লোক বেশ সোজা হ'য়েই অভিনয় করে যাচ্ছে। আর শ্যাম লাহার কণ্ঠস্বরও খানিকটা মেয়েলি। প্যান প্যান স্বরে কথা কওয়া চরিত্রে জনসাধারণ কতখানি প্রভাবান্বিত হ'বেন সে প্রশ্ন আপনাকে করবো। যাই হউক, বাংলা দেশে অহীন্দ্র--শিশির—ছবির মত অভিনেতার দুর্ভিক্ষ এখনও ঘটেনি। অভিনেতা কমল মিত্রও ঐ চরিত্রে সুঅভিনয় করতে পারতেন।

●● আপনার পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার কারণ হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশেষতঃ বিষয়টি যখন ব্যক্তিগত তীব্র প্রতিবাদ !

এবিষয়ে আমার মতামত হয়তো আপনার খুব মনঃপুত হবে না। একথা অস্বীকার করিনা যে, আপনার উল্লিখিত 'অহীন্দ্র-শিশির-ছবি' এমনকি কমল মিত্রও শ্যাম লাহার চেয়ে অভিনেতা হিসাবে অনেক বড়। কিন্তু কেন এঁদের মনোনীত করা সম্ভব হয়নি এবং কেন শ্যাম লাহাকে এই চরিত্রের জন্যে মনোনয়ন করা হ'ল সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আপনাদের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম।

'অলকানন্দায়' রবি রায়

প্রথমতঃ শিশিরকুমারের সম্বন্ধে বলি—তিনি সিনেমাজগতের বাইরের লোক রূপে নিজেকে গণ্য করেন। তাছাড়া রঙ্গালয়ে নিয়মিতভাবে যে কারণে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না, ঠিক সেই কারণেই সিনেমার নিয়মিত স্যুটিং-এ তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

মেক্-আপের ব্যাপারে অহীন্দ্র চৌধুরীর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু উপস্থিত 'হাঞ্চব্যাকের' পক্ষে তাঁকে কিছু বেশী শীর্ণ ও দীর্ঘ বলেই মনে হয়। ছবি বিশ্বাসত এত বেশী দীর্ঘকায় যে, তাঁর পক্ষে কুব্জ দেহ খর্বাকৃতি একটি

চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া দুরূহ। ছবি বিশ্বাস কোনদিন এই রূপ চরিত্র রূপায়িত করেছেন বলে আমাদের মনে পড়ে না। তাছাড়া আপনারা বোধ করি জানেন না, ছবি বিশ্বাস কোন বিকৃত make-up এর বিকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক ন'ন।

কমল মিত্রই প্রথম এই চরিত্রের জন্য মনোনীত হ'ন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘাকৃতি, বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর ও athelet-এর মত বলিষ্ঠ চেহারা এই চরিত্রোপযোগী করে মানান গেল না।

এরপর সন্তোষ সিংহ এই চরিত্রে মনোনীত হ'ন। প্রথম দিনই make-up করে সন্তোষ সিংহ মাথা ঘুরে পড়ে যান—সন্তোষ সিংহ মহাশয় high power চশমা ব্যবহার করেন; এই make-up-এ একটি চোখ একেবারে চাপা পড়ে যায়—ষ্টুডিও-লাইটের প্রখরতা আর একটি চোখের nerve-এর পক্ষে এত উগ্র হয়ে উঠেছিল যে, তিনি তা সহ্য করতে পারেনি।

'হাঞ্চব্যাক' চরিত্রটি কমেডি-রসসিদ্ধ শিল্পীর মনোনয়নই সার্থক ও সংগত। আকারে ইংগিতে ও বিকৃত অভিব্যক্তিতে সে সাধারণের হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়ে ওঠে এবং সেইখানেই তার ব্যর্থতা এবং সেই বেদনাদায়ক উপলব্ধির জন্যই এই চরিত্র classic চরিত্র বলে স্বীকৃত। কমেডি-অভিনেতা হিসাবে শ্যাম লাহার কৃতিত্ব তাঁকে এই চরিত্রটি উপলব্ধি করবার অভিব্যক্তি দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করছে। 'হাঞ্চ-ব্যাকে'র মুখের সকল কথাই অপরিস্ফুট জড়ানো বিকৃত শব্দ মাত্র। সেই জন্যেই কণ্ঠস্বরের বিশিষ্টতার সেখানে প্রয়োজন হয় না। আমরা অবগত হ'লাম, রূপ-সজ্জায় ও অভিনয়ে শ্যাম লাহা আপনাদের হতাশ করবেন না। হয়তো, এই চরিত্রে একটি শিল্পীর নূতনতর গভীর পরিচয় আপনাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীমতী মায়া বোস (মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা)

●● আপনি যা জানতে চেয়েছেন—জানাতে পারলুম না বলে দুঃখিত। যাদের ঠিকানা জানাতে কোন বাধা নেই—তাদের ঠিকানা আমরা প্রকাশ করে থাকি। এবং তা দেখতেও পান, ভবিষ্যতে পাবেনও।

কানাই মণ্ডল (মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা)

পথের দাবীতে সব্যসাচীর ভূমিকায় দেবী মুখার্জি যতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আপনার কি মনে হয় যে, ছবি বিশ্বাস তাঁর চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন? তাহলে তাঁকে কেন সুযোগ দেওয়া হয়নি? এটা কি সত্য যে, ঐ ভূমিকায় সকলকে দিয়েই নাকি রিহার্সেল দেওয়া হ'য়েছিল—তার মধ্যে দেবী মুখার্জিই বেশ কৃতিত্ব দেখান।

●● নিশ্চয়ই। এবং দেবী বাবুও যেটুকু করেছেন চেষ্টা করলে তাঁর চেয়ে আরো ভাল অভিনয় করতে পারতেন, তাঁর ইতিপূর্বে'কার অভিনয় দেখেই একথা বলতে পারি। এবং তিনি তা করেননি বলে কর্তৃপক্ষের নির্বাচনের চেয়ে তাঁর গাফিলতিকেই বেশী দায়ী করবো। তবে একথা ঠিকই, ছবি বাবু আরও নিখুঁতভাবে সব্যসাচীকে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি
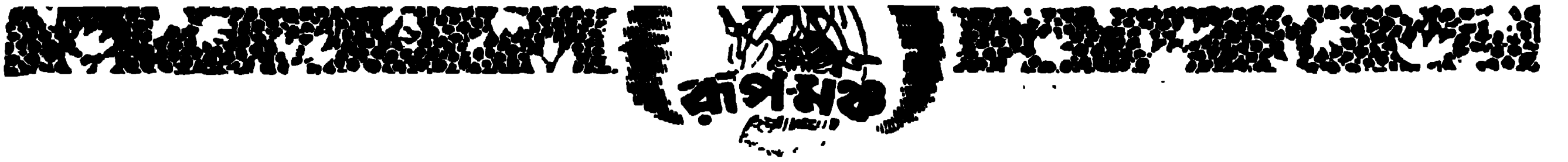
হয়ত টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে। একথা একদম বাজে। মহলা দিয়ে কখনও দেবী বাবুকে নির্বাচন করা হয়নি—তবে টাকার অংকের দিক থেকে হয়ত সকলকেই একটু কর্তৃপক্ষ যাঁচাই করে দেখতে পারেন। তাও দেখেছেন কিনা সঠিক বলতে পারি না।

অনিল কুমার বসু (ভবানীপুর, কলিকাতা)

(১) 'ধরতী-কে লাল' চিত্রটা কি ভারতীয় গণ-নাট্য সম্প্রদায়ের 'নবান্ন' নাটকের হিন্দি সংস্করণ? কলিকাতায় ইহার মুক্তিলাভ কবে ঘটিবে? (২) কমল মিত্রের ভবিষ্যৎ অভিনেতা জীবন সম্বন্ধে আপনার ধারনা কী?

●● (১) হ্যাঁ। এখনও কিছু জানতে পারিনি। (২) কমল মিত্র সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী।

চিত্ত দে (জলপাইগুড়ি)

(১) সুরসাগর জগন্ময় মিত্র কি কোন চিত্রের গানের সুর দিচ্ছেন? (২) শ্রীযুক্ত দেবী মুখার্জি এবং শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস এদের দু'জনে কোন বইতে ভাল অভিনয় করেছেন?

●● (১) কিছুদিন পূর্বে শুনেছিলাম নবগঠিত ক্লাসিক ফিল্মের একখানি চিত্রে তিনি সুর দেবেন। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আপাততঃ নির্বাক আছেন। অন্য কোন ছবিতে জগন্ময়বাবু সুর দিচ্ছেন কিনা বলতে পারি না। (২) আমার কাছে দেবী বাবুর 'উদয়ের পথে' এবং ছবিবাবুর 'দুই পুরুষে' অভিনয় ভাল লেগেছে।

নীলমনি বসু (গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

রেণুকা রায় তিনি কী?

●● তিনি বাংলা ছায়া জগতের একজন অভিনেত্রী।

শচীন্দ্রনাথ রায় (বড় গোলা, বগুড়া)

জহর গাঙ্গুলী কি শুধু অভিনয়ই করেন না অন্য কোন পেশা আছে। জহরবাবু কি গান জানেন?

●● না। অভিনয়ই তাঁর পেশা। না। তবে অনেকগুলি গলার সংগে ঠোট নাড়তে পারেন।

সন্তোষ কুমার ঘোষাল (রেল কোয়ার্টার, খুলনা)

শুনছি শ্রীমতি সুনন্দার শেষ বই নাকি অঞ্জনগড়। তিনি কি চিত্রজগত থেকে অবসর গ্রহণ করছেন?

●● না। 'দৃষ্টিদান' ছবির প্রযোজক ও অভিনেত্রী রূপেও তাঁকে দেখতে পাবেন।

রিভার সাইড কালচারাল এসো-সিয়েশনের সভ্যবৃন্দ (গৌহাটী)

(১) নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওর ভিতর যেয়ে শুটিং দেখতে চাই। (২) রূপ মঞ্চের পাতায় দেখেছিলুম শ্রীমতী সুনন্দা দেবীর স্বামী জনৈক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় কী বন্দেমাতরমের পরিচালক?

●● (১) অতদূর থেকে কলকাতার ষ্টুডিওর শ্যূটিং কী করে দেখবেন? (২) না। বন্দেমাতরম্-এর পরিচালক হচ্ছেন সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলকা সরকার (বিডন ষ্ট্রীট)

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র 'প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে' গানটী এবং 'রাত্রি' কথাব চিত্রের পান্থশালার গানটী কে কে গেয়েছেন।

●● প্রথমটী গেয়েছেন সত্য চৌধুরী আর দ্বিতীয়টী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

শঙ্কর মুখোপাধ্যায় (সরখেল পাড়া ষ্ট্রীট, বালী)

(১) দেবী মুখার্জি সর্বপ্রথম কোন বইয়ে আত্মপ্রকাশ করেন? (২) বর্তমানে বাঙালী অভিনেত্রীদের ভিতর কে সবচেয়ে বেশী টাকা উপার্জন করেন?

●● (১) রূপ-মঞ্চের ৬ষ্ঠ বর্ষের ৮ম ও পৌষালী সংখ্যা (৯ম-১০ম) দেখুন। (২) সবচেয়ে কে বেশী উপার্জন করেন বলা কঠিন। তবে ছবি, অহীন্দ্র, জহর, কানন দেবী, মলিনা, সুনন্দা, কমলমিত্র—এঁরাই সম্ভবতঃ আজকাল বেশী উপার্জন করে থাকেন।

গৌর কিশোর মণ্ডল ও অজিত কুমার মণ্ডল (চুঁচুড়া, হুগলী)

ধীরাজকে বহুদিন চিত্রে দেখিনি কেন? তিনি চিত্র-জগত থেকে বিদায় নিলেন নাকি? শুনলাম তিনি নাকি কোন বইয়ের পরিচালনা ভার নিয়েছেন। বইটীর নাম দয়া করে জানাবেন কি?

●● ধীরাজবাবুকে ভ্যানগার্ডের 'জয়যাত্রা' চিত্রের একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখতে পাবেন। চিত্রখানির

কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। বর্তমানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় আওয়ার ফিল্মের নির্মীয়মান চিত্র 'নতুন খবরে' ধীরাজবাবু একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন। বাণী পিকচার্সের 'কাল-বৈশাখী' চিত্রখানি ধীরাজবাবুর পরিচালনা করবার কথা ছিল। আমরা যতটা খবর পেয়েছি, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে মতানৈক্যের জন্যই সম্ভবতঃ তিনি আর উক্ত চিত্রখানি উক্ত প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে পরিচালনা করবেন না। বাণী পিকচার্সেরও অন্য কোন প্রচেষ্টার আমরা আর কোন খবর পাইনি।

এ, গনি, বিশ্বাস (ইছালী, গৌরনগর, যশোহর)

আপনারা যদি নতুনদের জায়গা করে দেবার একটা ব্যবস্থা না করেন তবে তাদের অভিনয় করবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও কি তারা করতে পারে বলুন? আপনারা যদি সেই সমস্ত বেকার অভিনয়েচ্ছুক বন্ধুদের একটা ব্যবস্থা না করেন, তবে কে তাদের দিকে তাকায়? আপনারাই নতুনদের পথ করে দেবার জন্য যদি কোন প্রতিষ্ঠান খোলেন—সকলেরই সহানুভূতি পাবেন আশা করি।

●● আমাদের কাজ হ'চ্ছে কাগজ পরিচালনা করা। এই কাগজ পরিচালনায়ও আমাদের নিজেদের বহু দুর্বলতা রয়ে গেছে এবং নিজেদের কর্তব্য প্রতিপালনেই আমরা হিমসিম খেয়ে উঠি—যতক্ষণ না রূপ-মঞ্চকে নিখুঁত রূপে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পাচ্ছি—ততক্ষণ অন্য বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা আপনারাই ভেবে দেখুন না! নতুনদের জন্য রূপ-মঞ্চের ভিতর দিয়ে যতখানি করা সম্ভব আমরা সেবিষয়ে কর্তৃপক্ষদের অবহিত করে তুলতে কোন সময়েই যে গাফিলতির পরিচয় দেই না—আশা করি তা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন। এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা যে আংশিক ভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠছে—বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন নতুন মুখ সেই সাক্ষ্যই দেবে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ ভাবেও আমরা কয়েকজন নতুনকে সাহায্য করতে সক্ষম হ'য়েছি—সে খবর রূপ-মঞ্চের পাতায় যেমনি দেখতে পান-এই নতুনদের সংস্পর্শে যদি আসেন—তাঁদের কাছ থেকেও শুনতে পাবেন। বর্তমানে নতুনদের যেটুকু সাহায্য আমরা করছি—এর চেয়ে বেশী করবার আমাদেব সামর্থ নেই।

মোজাহারুদ্দিন মোল্লা (ঘাশীয়ারী, যশোহর)

(১) বনানী চৌধুরী বি, এ, ইহার আসল নাম কি বেগম রাবেয়া খাতুন? বনানী চৌধুরী কি যশোহর জেলার মাগুরা সাবডিভিশনের অন্তর্গত সোনাখণ্ডি গ্রামের মৌলভী আসফারউদ্দিন দারোগা সাহেবের মেয়ে? বনানী চৌধুরী চিত্রজগতে আসল নাম প্রকাশ করেন নাই কেন? (২) সন্ধ্যারাণী, সুনন্দা, বনানী, সুমিত্রা ইহাদের ভিতর কে ভাল অভিনয় করেন?

●● (১) বনানী চৌধুরীর যে পরিচয় আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন—সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। ভবিষ্যতে যখন তাঁর জীবনী রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হবে তখন এ বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ কাটাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। (২) সুনন্দা, সন্ধ্যারাণী, সুমিত্রা, বনানী।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (লেক বুক স্টল, রাসবিহারী এভিনিউ)

●● আপনার অভিযোগ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। সাধারণতঃ আমরা নতুন বানানই অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু আমাদের ভিতর অনেকেই আছেন—নতুন বানান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন অথবা এতদিনের অভ্যাসকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন না। তারপর কমপোজিটারদের ভিতরও এই তারতম্য আছে। শব্দের ব্যবহারেও অনেক সময় মারাত্মক ভুল দেখা যায়—যা যে কোন সুধীজনের হাস্যোদ্রেক করবে। তবে সাময়িক পত্রিকার
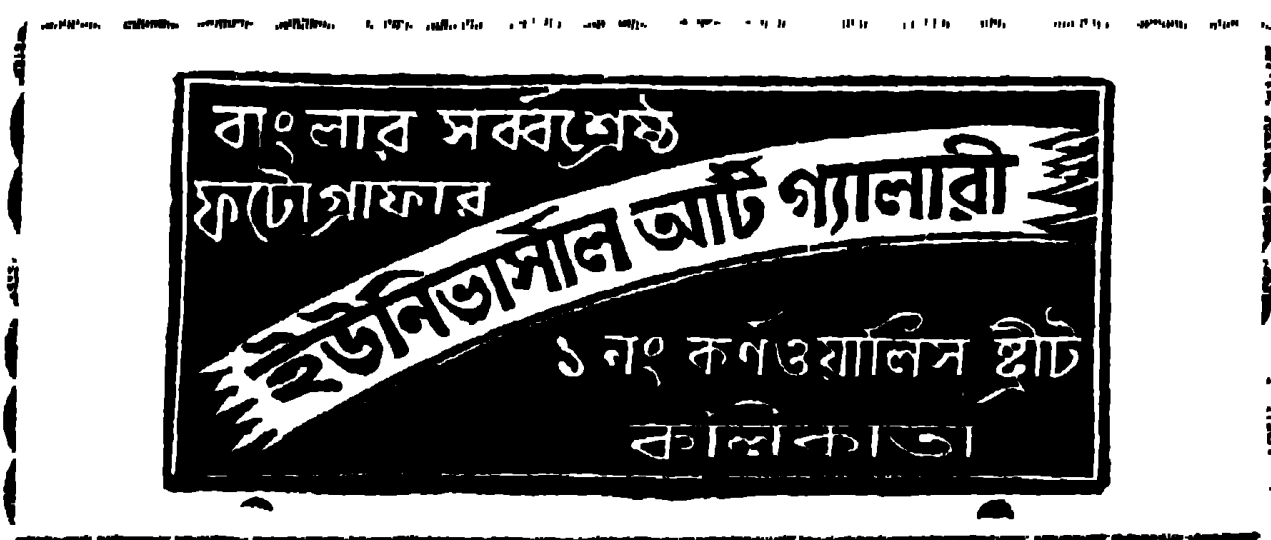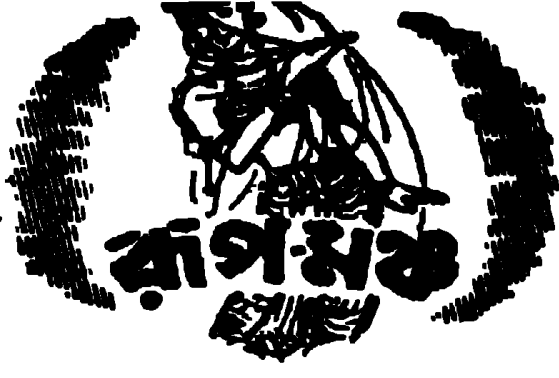
বেলায় খানিকটা স্বাধীনতা আশা করি আপনারা দেবেন। কারণ, যে তাড়াহুড়োর ভিতর দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়—একটু অবহেলা করলেই আর রক্ষা নেই। অথচ এই অবহেলা যে আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়—তা আমাদের মত ভুক্তভোগীরাই স্বীকার করবেন। তবু ভবিষ্যতে আপনাদের অভিযোগ খণ্ডাতে সতর্ক থাকবো।

সরোজ কুমার ঘোষ (গৌরীবাড়া লেন, কলিকাতা)
পথের দাবী ও রায়-চৌধুরীর ভিতর শ্রেষ্ঠ কোনটী?

●● বহু দুর্বলতা থাকা সত্বেও 'পথের দাবী'র শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করবো না।

শৈলেন্দ্র নাথ সরকার (তৈলমুড়াই, বর্ধমান)
রাত্রি বইটা কার লেখা?

●● শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শৈলেন হালদার (সৈয়দপুর, রংপুর)

●● আপনি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মল্লিক, পি ১৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, ফ্লাট নম্বর—৩, এই ঠিকানায় পত্রালাপ করে দেখতে পারেন।

মিজানূর রহমন খাঁ (রবি) (নারিকেল ডাঙ্গা মেইন রোড, কলিকাতা)

●● শিল্পীদের নাম পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের অভিমত একাধিক বার প্রকাশ করেছি। গত ৭ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় জনৈক পাঠকের প্রশ্নোত্তরে একথা আরো পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে বলতে প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি দেখেছেন। তাই এ নিয়ে বেশী বাদানুবাদ করতে চাই না। আমাদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সত্যতা যাঁচাই করতে চিত্র জগতে যে কয়জন মুসলমান বন্ধুর আগমন হ'য়েছে—তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করবেন। হিমাদ্রী চৌধুরী মুসলমান বলে চিত্রজগতের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হিন্দু বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধে যে চক্রান্তজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, যে মুহূর্তে সেকথা আমাদের কানে আসে সেই মুহূর্তেই এই হীনতার বিরুদ্ধে রূপ-মঞ্চ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের সতর্ক করিয়ে দেয়। এবং রূপ-মঞ্চের সাধ্যানুযায়ী এঁদের সাহায্য করতে পিছপাও

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক

হয়নি—চিত্রজগতে মুসলমান ভাইয়ের এ আগমনকে স্বাগত অভিনন্দন জানাতে রূপ-মঞ্চের ভিতর কোন নীচতাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। মিঃ উদয়ণ মুসলমান বলেই রূপ-মঞ্চের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ছদ্মনাম গ্রহণ থেকে যদি এঁরা বিরত না হন—আমাদের কী বলবার আছে বলুন ত? কিরণকুমার মুসলমান বলেই যে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছিলেন একথা মোটেই বিশ্বাস করবো না। 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'র প্রযোজক মুসলমান ছিলেন—তাহ'লে কিরণকুমার মুসলমানী নাম নিয়ে তাঁর চিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন না কেন? পূর্বেও বলেছি—এখনও বলছি - কোন নূতন মুসলমান বলেই যে প্রত্যাখ্যাত হবেন আর হিন্দু বলে যে অভিনন্দিত হবেন—এ কথার কোন ভিত্তি নেই। নূতনদের সামনে যে বাধা তা হিন্দুর বেলায়ও
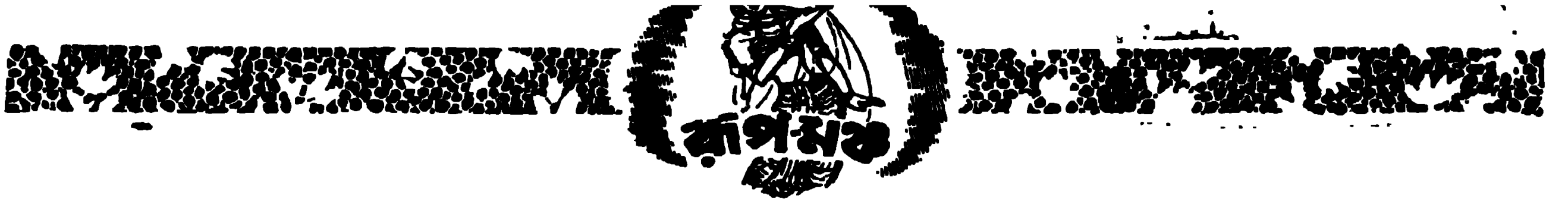
অটল আর মুসলমানদের বেলায়ও। কিরণকুমার যদি ইতিপূর্বে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে থাকেন কারোর কাছ থেকে—সেজন্য যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের দোষ দিতে পারবো না। কারণ, কিরণকুমারের ভিতর অভিনয় প্রতিভার এমন উন্মেষ দেখতে পাইনি—যা দেখে প্রথমেই কেউ মুগ্ধ হ'তে পারেন। তিনি যদি প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে থাকেন তাহ'লে এইজন্যই—মুসলমান বলে নয়। আগামী শারদীয়া সংখ্যায় কমল মিত্রের জীবনী প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে—কমল মিত্রের অভিনয় প্রতিভা কিরণকুমারের চেয়ে যে শতগুণ বেশী আশা করি সেকথা স্বীকার করবেন। কিন্তু তাঁকেও কত বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে পথ করে নিতে হ'য়েছিল, তা তাঁর জীবনী থেকেই বুঝতে পারবেন। এবং শুধু কমল মিত্রই নন—প্রতিটি শিল্পীকেই এই বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে পথ করে নিতে হ'য়েছে। মুসলমান শিল্পীদের বেলায় একে আপনারা একটা সাম্প্রদায়িক রং মাখিয়ে তুলে ধরতে চাইছেন—আপনাদের এই নীচতাকে রূপ-মঞ্চের অন্যান্য মুসলমান ভাইরাও প্রশংসার চোখে দেখবেন না। এবং তাঁরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের মতবাদ রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে জানাতে দ্বিধা করেননি।

তারকুল আলম খান (বগুড়া)

●● শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে আমরা বর্তমানে কোন খবর রাখি না। খোঁজ নিয়ে পরে জানাবো।

প্রণয়কুমার দাস (দোলতলা, বাঁকুড়া)

●● আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর অন্যান্য পাঠকদের উত্তরের ভিতরই রয়েছে। তাই পৃথকভাবে উত্তর দিলাম না।

দ্বিজেন্দ্রকুমার মণ্ডল ও প্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)

প্রায়ই শোনা যায় যে, বহু বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিভিন্ন কোম্পানীর মারফৎ অভিনয়ের জন্য প্রচুর অর্থ-বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হন। দেশের দুর্দিনে তাঁদের ঐ উপার্জনের মোটা অংশ দেশবাসীর সেবায় ব্যয় করা উচিত। আপনারা রূপ-মঞ্চের মারফৎ এঁদের অবহিত করে তোলেন না কেন?

●● দেশের সামনে যখনই কোন দুর্দিন দেখা দেয় এবং সাধারণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের তাগিদে যখনই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—তাতে সাহায্যদানের জন্য সব সময়ই আমরা শিল্পীদের অবহিত করে তুলি। এবং শিল্পীরাও যে তাতে অগ্রসর হ'য়ে না আসেন তাও নয়।

অরুণ বসু (চক্রবেড়ে রোড, কলিকাতা)

এম, পি প্রডাকসন্সের 'স্বপ্ন ও সাধনা, কবে আত্মপ্রকাশ করবে?

●● শীঘ্রই মুক্তির কথা আছে।

নলিনী ও ইন্দ্রানী দেবী (ঢাকা)

মণিকা গাঙ্গুলী (গুহ ঠাকুরতা) কি ছায়া জগত থেকে বিদায় নিলেন?

●● না। তিনি বর্তমানে ডি, জি পরিচালিত 'জীবন ও যুদ্ধে' নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

সোমনাথ, দেবনাথ ও পরিতোষ মিত্র
(হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন)

সিনেমা এবং থিয়েটারে যে সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি কি সত্যিকার অস্ত্র না খেলনা?

●● 'অভিনয়'-এর ভিতর দিয়ে যাঁরা আপনাদের মুগ্ধ করেন—সত্যিকারের জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তাঁদের বাহাদুরী কোথায়?

রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় (সবজীবাগান লেন, কলিঃ)

তপোভঙ্গের নায়িকা নবাগতা বনানী চৌধুরীর প্রশংসা মাঘ সংখ্যায় দেখিলাম। প্রশংসা দেখে আপনাদের নিরপেক্ষ এবং বিচক্ষণ সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদের যদি সন্দেহ জেগে থাকে তা খণ্ডন করবেন কী বলে?

●● প্রত্যেক নূতনকেই প্রথমে আমরা সহানুভূতিশীল দৃষ্টির সংগে বিচার করে থাকি। বনানী চৌধুরী সম্পর্কে আমরা এমন কোন বেশী প্রশংসা করিনি যা আমাদের

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপনাদের সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। বাংলা ছায়া জগতে শিক্ষিতা অভিনেত্রীর সংখ্যা খুবই কম—তারপর তিনি নবাগতা—সেই দৃষ্টিভংগী থেকেই তাঁর সম্পর্কে একটু নরম সুরে কথা বলেছি। একে কী আপনারা সমর্থন করবেন না?

ভগ্নাবিশে (শ্রীরামপুর, হুগলী)

প্রমথবিশির 'মৌচাকে ঢিল' বাংলা সবাক চলচ্চিত্রে এইরূপ রাজনীতি সমালোচনা মূলক চিত্র এই প্রথম কিনা?

●● হঁ্যা। অনেকে এর পূর্বে একটু আধটু দিতে চাইলেও এরূপ পূর্ণাংগ সমালোচনামূলক রসোত্তীর্ণ ছবি বাংলা ছায়াচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি।

এঁদের মাঝে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখুন।

মোহাম্মদ সাহেব আলি (হলওয়েল লেন, কলিকাতা)

●● এসব প্রশ্ন নিয়ে বার বার আলোচনা করে লাভ কী বলুন? তাই উত্তর দিলুম না। আশা করি ক্ষমা করবেন।

কান্তি সেন (পূর্ণিয়া, বিহার)

মঞ্চের দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলার নাট্য-মঞ্চ যেন বেশ মন্থর গতিতে চলছে। নাট্যাভিনয় বলতে আমি এই বলছি না যে, 'অভিনয়-রজনীর' সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমার কথা হ'লো—নাট্যাভিনয়ে একঘেয়েমী ঢুকেছে। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী বাংলা নাট্য-জগতে যে যুগান্তর এনেছিলেন—আজ তা একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে। আবার কোন নতুন ভাদুড়ীর আবির্ভাবের দরকার।

●● বাংলা নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কে আপনার অভিযোগ স্বীকার করি। সত্যি, ভাদুড়ীকে ঘিরেই আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। কিন্তু প্রতিভাকেত আর তৈরী করা যায় না। তাই প্রতিভার অপেক্ষায় আমাদের থাকতেই হবে। তবে নাট্য-মঞ্চের যেসব গলদ অপসারণের দায়িত্ব রঙ্গ-মঞ্চ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে রয়েছে—তাঁরা তাঁদের সে কর্তব্যই বা সমাধান করছেন কোথায়?

অশোক কুমার হালদার (হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা)

(১) 'অন্নপূর্ণার মন্দির' এর সুরশিল্পীই কি বিখ্যাত পরিচালক নীরেন লাহিড়ী?

●● (১) হঁ্যা। আপনার (২) নম্বর প্রশ্নের উত্তর গত সংখ্যায় রাত্রির সমালোচনা প্রসংগেই জানতে পেরেছেন। আপনার ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর বর্তমান সংখ্যার এই বিভাগের অন্যত্র দেওয়া হ'য়েছে।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (ফরিদপুর)

জাগরণ চিত্রের সুরশিল্পী কে?

●● কিছুদিন বাদে প্রশ্ন করবেন।

মহম্মদ মুসারফ হোসেন (লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা)

মহুয়া ফিল্মের খবর কি? তারা যে নতুন বই 'পিয়া চলে পরদেশ' আরম্ভ করিয়াছিল তাহাই বা কতদূর?

●● এঁদের সম্পর্কে কোন খবরই আমাদের কাছে আসেনি—এলে জানাবো।

অসীম কুমার সেনগুপ্ত (বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা)

কমলমিত্রের অভিনয় আপনার কেমন লাগে—ভবিষ্যতে উন্নতির আশা রাখেন কী?

●● ভাল—সব অভিনয়ই যে, তা নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী।

ভূপেন্দ্র মোহন ঘোষ (যশোহর রোড, খুলনা)

পঙ্কজ মল্লিককে কি রূপালী পর্দায় আবার দেখতে পাব? তিনি তো দেখছি বহুকাল থেকেই পর্দার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছেন।

●● পর্দার সামনে আপনাদের কাছে ধরা দেবেন না, এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেন নি।

তবে বর্তমানে পর্দার অন্তরাল থেকেই আপনাদের মন মাতাবেন।

মীরা মুখোপাধ্যায় (ডবসন রোড, হাওড়া)

ডাঃ হরেন মুখার্জি নামক জনৈক অভিনেতাকে অলকানন্দায় দেখা যাবে—ইনি কী নবাগত?

●● না। বহু পূর্বে এঁর সংগে আপনাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে। পাপের পথে, চৌরঙ্গী এবং আরো অনেক চিত্রেই ইনি আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (গিরিশ ব্যানার্জি লেন, শিবপুর)

●● আপনি যে বিষয়ে আমার সাহায্য চেয়েছেন সে বিষয়ে আমার কোন হাত নেই। ক্ষমা করবেন।

সুনীলকুমার বসাক (বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

এক বৎসর ধরিয়া শুনিতেছি যে মোহিনীমোহন কুণ্ডুর প্রযোজনায় রক্তরাখী প্রস্তুত হইতেছে। তাহার আর দেরী কত? প্রমথেশ বড়ুয়ার জাগরণ বইখানি আসিতে কত দেরী?

●● রক্তরাখীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। জাগরণ বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্সের ছবি—শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার সংগে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এর প্রযোজক একজন ব্যবসায়ী এবং চিত্র প্রযোজনায় এই প্রথম হস্তক্ষেপ করলেন।

আমিনুল ইসলাম খন্দকার (ফরিদপুর)

শানওয়াজ, অশোককুমার, কিশোর সাহু, নার্গিস, নাছিম, মমতাজ শান্তি এদের অভিনয়ের মান অনুসারে সাজিয়ে দিন।

●● অশোককুমার, কিশোর সাহু, শানওয়াজ, নাছিম, মমতাজ শন্তি, নার্গিস।

তৃপ্তি কুমার মুখোপাধ্যায় (ঠাকুর ক্যানেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

অনেকে বলেন, দেবী মুখোপাধ্যায় এ পর্যন্ত যে কয়টী বইয়ে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে 'উদয়ের পথেই' সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন। আমি তাদের সংগে একমত হ'তে পারছিনা এই জন্য যে, আমার মনে হয় ভাবীকালেই তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে।

●● আমিও কিন্তু আপনার সংগে একমত হ'তে পারবো না। উদয়ের পথের অভিনয় আমারও বেশী ভাল লেগেছে।

[সম্পাদকের দপ্তরে কোন প্রশ্ন করবার সময় পাঠক-পঠিকাদের বাংলায় পুরো নাম ও ঠিকানা লিখতে অনুরোধ করছি। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সে প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে দেওয়া হবে। নাম বা ঠিকানা প্রকাশে যাঁদের আপত্তি থাকবে—তাঁদের নাম বা ঠিকানা আমরা প্রকাশ করবো না। কিন্তু প্রশ্নের সংগে নাম ও ঠিকানা থাকা একান্ত প্রয়োজন।]

আমাদের ছায়াছবি—

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

ধাপে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের চেষ্টা চলে নিষ্কাম জনসেবার আদর্শ স্থাপনার সাহায্যে। আলোচ্য যুগের বাংলা ছায়াছবিতে বিশেষ প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা দেখা গেছে দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তর তিনটির। তার মধ্যে সেবা ও সাধনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সবাকচিত্র অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। এ যুগের উদ্দেশ্যমূলক আদর্শবাদী ছবিতে চিত্ররূপ পেয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, ক্ষোভ পেয়েছে ভাষা, সে ক্ষোভ অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্যজনিত বিলাস নিয়ে নয়, আপন মহৎ মর্যাদার প্রতিষ্ঠা নিয়ে। জাতীয়তা-আন্দোলনের প্রথম ঢেউটিই বলতে গেলে মুক্তি পেয়েছে। আসল রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্ররূপ আমরা এখনো পাইনি, তবে অদূর ভবিষ্যতে পাবার আশা ভরসা যথেষ্ট রয়েছে। পুরোপুরি ন্যাশনাল ফিল্ম বা জাতীয় ছায়াছবি পাবো তখন। বাংলা ছায়াছবিতে বহু প্রত্যাশিত এবং অধীর-প্রতীক্ষিত Practical politics-এর প্রথম ও সার্থক আবির্ভাবের আর হয়ত বিশেষ দেরী নেই। অন্ততঃ তার আয়োজন এবং সূচনা ত দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছায়াছবি শিল্পের প্রাংগনে প্রাংগনে। সেদিনের এই শুভ আবির্ভাবকে এখন থেকেই জানিয়ে রাখি সম্বর্ধনা এবং অভিনন্দন আর সেই নতুন দিনের নতুন ছবির দেশ প্রেমের আন্তরিক ও সক্রিয় বার্তা এবং জাতীয়তাবোধের আদর্শময় উদাত্ত বাণী যে জনসমাদর লাভে আশাতীত ভাবে ধন্য হবে এ বিষয়েও দরকারী মহলকে আশ্বস্ত করা চলে।

জাতীয় সংস্কৃতির এই অংগটিতে জাতীয়তার পোষকতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দুটি অভাব আমাদের ছায়াছবিতে লক্ষ্য করা যায়—অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশ প্রেমের উপলব্ধি মূলক ঐতিহাসিক ছবি আর ভারতের অখণ্ডতার অনুভূতিব্যঞ্জক ঐক্য ও মহামিলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত উদ্দেশ্যমূলক ছবি। প্রথমটির কার্যকারিতা দর্শকমনে দেশাত্মবোধের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় আর দ্বিতীয়টির উপকারিতা ভারতের দুটি বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণামহীন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা দূর ক'রে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপনে। হিন্দী ছবিতে এই দুই আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি, একথাটা প্রসংগতঃ বলা যেতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ—সোরাব মোদীর ঐতিহাসিক চিত্রগুলি আর 'ভক্ত কবীর, ভাইচারা, পড়শী' এবং '40 crores' জাতীয় ছবি দ্বিতীয় ভাবাদর্শের নিদর্শন। আমাদের চিত্রজগতে প্রথমটির দৃষ্টান্ত খুঁজে না পেলেও উৎসাহী অনেকে দ্বিতীয়টির নমুনা দেখাবেন হয়ত রবীন্দ্রনাথের নামকরা উপন্যাস 'গোরা'র চিত্ররূপের উল্লেখ ক'রে। কিন্তু তার মধ্যে সময় উপযোগিতা বা সমসাময়িকতার কোনো চিহ্ন ছিলো ব'লে ত আমার মনে হয় না। এই সূত্রে বাংলার তথা ভারতের মনীষীবৃন্দের জীবন ও আদর্শ, প্রতিভা ও চিন্তাধারা অবলম্বনে জীবনীমূলক ছায়াছবি তৈরীর কথাটাও বেশী ক'রে বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। আমাদের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আশা ভরসা পোষণ করার কথা যা বল্লাম তার সাক্ষ্য এবং সমর্থনে কয়েকটি জনপ্রিয় আদর্শবাদী ছবির নাম করতে পারি। যেমন, 'সমাধান', 'উদয়ের পথে', 'শহর থেকে দূরে' 'দুই পুরুষ' 'ভাবী কাল' এবং 'সংগ্রাম'। এর মধ্যে 'ভাবীকাল' ছবিখানি আর একটি নতুন তত্ত্ব ধরেছে চিত্রের এলাকায়—সেটি হোলো এই যে, সিনেমায় সংগীত অপরিহার্য নয়, তার একটা নির্দিষ্ট আবশ্যকতা ও প্রয়োগসীমা আছে। সবাকচিত্রে গানের উপযোগিতা এবং সার্থকতা দুরকমের—চিত্রনাট্য মূলতঃ বস্তু ধর্মপ্রধান হওয়ায় যে সব বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে চিত্রনাট্যকারকে কোনো মূল চরিত্রের অথবা মূল কাহিনীর পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে হয় অথবা আসন্ন ঘটনার আভাস ও ইংগিত দেওয়ার কাজটি সারতে হয়, তার মধ্যে গান অন্যতম। গানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে relief বা বিরতি সাধন—কাজেই ক্ষেত্রনির্বিশেষে গানের প্রয়োগের প্রচলিত রীতিটি যে সকল ক্ষেত্রেই যুক্তিসহ নয় এইটিই প্রমাণ করেছে আলোচ্য ছবিখানি। তা' ব'লে আবহ-সংগীতের অনিবার্য উপযোগিতাকে অস্বীকার করা হয়নি এতে।
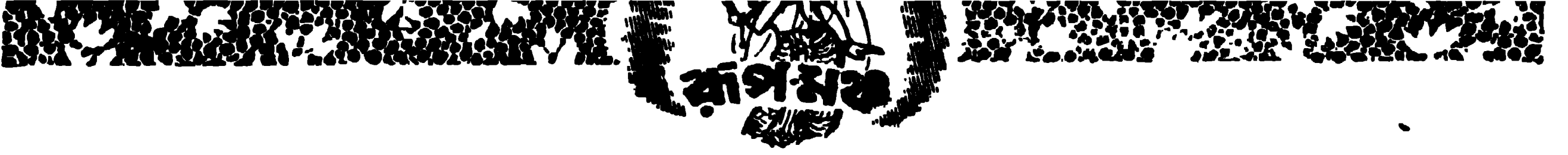
এযুগের ছায়াছবির ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাহিত্য ও সিনেমার সংযোগ। সিনেমার এলাকায় কাহিনীকার, চিত্রনাট্য রচয়িতা বা পরিচালনারূপে কৃতবিদ্য সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যুদয়। এঁদের মধ্যে নবীন ও প্রবীণ দু'দলই আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথিতযশা কর্ণধারগণের উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়ার চেষ্টা এবং ঝোঁক তখনও ছিলো, এখনও আছে। বলতে বাধা নেই, এই সব চিত্ররূপের মধ্যে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ছবিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বা হয়। তবে এযুগে এই ধরণের চিত্ররূপ দেওয়ার মধ্যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য, আন্তরিকতা এবং অনাবশ্যক বস্তু এবং উপাদানকে অকারণ প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে উৎকর্ষের পরিচয় মেলে।

আর একটি কথা ব'লে শেষ করি। বর্তমানে ভাব-গম্ভীর চিন্তাশীল ছবির পাশাপাশি উচ্চাঙ্গের মননশীলতাময় হাস্য কৌতুক বা ব্যঙ্গরসাত্মক ছবির বিশেষ দরকার রয়েছে। এই ধরণের দুখানি পূর্ণাংগ ছবির সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা ছবির অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে, 'রজত জয়ন্তী' এবং 'পথভুলে'। প্রথম খানিতে বিদেশী কাহিনীর ছায়াপাত থাকলেও ছবিখানিই তখনকার দিনে উপভোগ্য হয়েছিলো। গাম্ভীর্যের সংগে হাস্যরসের যোগ না থাকলে ভাব সাম্য নষ্ট হয়, তাতে প্রাণধর্মকে করা হয় অস্বীকার। গাম্ভীর্যরসপূর্ণ ছবির মধ্যে হাস্যরসের নিয়মিত এবং সমীচীন প্রয়োগ অভিপ্রেত নয় একথা বলছি না। একথা সর্বাংশে মেনে নিয়েও বলাটা অন্যায় হয় না যে, পূর্ণাংগ হাসির ছবির দিকে চিত্রকারের সজাগ দৃষ্টি এবং পরিকল্পনা থাকা উচিত।

আগামী দিনের বাংলা ছবির তালিকা যেমন দীর্ঘ, হয়তো তেমনি আশাপ্রদ। হয়তো বলেছি এইজন্যে, এই সব বিজ্ঞাপিত ছবির কাহিনী বা পরিকল্পনার সংগে অনেক ক্ষেত্রেই আমার পরিচয় নেই। তবে ছবির নামকরণ এবং ভারপ্রাপ্ত প্রচার-সচিবদের বক্তব্য র ওপর আস্থা রেখে বলা চলে, নিরাশ হবার কারণ তেমন নেই। নতুন দিনের নতুন ছবি আমাদের আশা ও ভাষাকে রূপ দেবে আপাততঃ এই ভরসা নিয়েই থাকা যাক।

বেতার জগৎ

পরিচালিকা - মনিদীপা

দুর্গম গিরি কান্তার মরু......

সেদিন তারিখটা ঠিক মনে নেই—রাত বোধ হয় দশটা বেজে ক'মিনিট হয়েছে—কলিকাতা বেতারের শেষ অনুষ্ঠান শোনবার জন্য বেতার সেটটি খুলে দিলুম। হঠাৎ বেতারের বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত কবি-শিল্পী সুর-রচয়িতা বাংলার বিদ্রোহী কবির গানের একটি কলি ভেসে এল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু...

কলিকাতা বেতার যাঁর দানে সংগীত বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে একদা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—দলগত পাপচক্রের ঘৃণ্য আবর্তে যাঁকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ চিত্তে দূরে সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা বা লজ্জা বোধ যে কলিকাতার বেতার করে নি—সেই বেতারে কাজী নজরুল ইসলামের গান এতদিন পরে বেতার-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কম বিস্মিত করে নি। তারপর আরো একটি গান 'সংঘ শরণ যাত্রা পথে'... মিলিত ভারতের জয়গাথা কলিকাতার সাম্প্রদায়িক অন্ধ বিদ্বেষের কালো আকাশের আবহাওয়াকে ভেদ করবার চেষ্টা করলো। জনপ্রিয় শিল্পী সত্য চৌধুরী দীর্ঘদিন পরে এই গানদুটি গেয়ে কলিকাতা বেতারের অবজ্ঞাত শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন। সেজন্য শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ।

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

মনে পড়ে সে সব দিনগুলোর কথা। কলিকাতা বেতার তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী তখন কলিকাতা বেতারের সংগীত বিভাগের কর্ণধার। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর মতো এমন গুণী ও নীরবকর্মী আমি খুব কম দেখেছি। বেছে বেছে প্রতিভাবান আর গুণীদের ধরে কলিকাতা বেতারে আনছেন—এ যেন গন্ধময় পুষ্প চয়ন করে পুষ্প-স্তবক রচনা করার ঐকান্তিক আগ্রহ। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর সময়েই কলিকাতা সংগীত বিভাগের যে বৈচিত্র্য ও ঘনিষ্ঠতা এবং জনপ্রিয়তা দেখা গিয়েছিল আর কোন কালে দেখা যায় নি। যন্ত্রী সংঘের শ্রীসুরেন্দ্র লাল দাসের কথাও এখানে স্মরণীয়। এই সুর পাগল আত্মভোলা মানুষটি আসেন শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর আমলে। এইচ-এম-ভি ছেড়ে কাজি নজরুল পরিপূর্ণভাবে যোগ দিলেন বেতারে। সুর-রচনা ও সংগীত বৈচিত্র্য নিয়ে রইলেন কাজি নজরুল ইসলাম, সংগীত বিশ্লেষণ ও বিকাশ নিয়ে সংগীতসহ আলোচনা সুরু করলেন শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্র লাল দাস যন্ত্রকে সংগীতে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন। কলিকাতা বেতারে এই ত্রয়ীর প্রতিভা ও প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। আজ এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রথম জন কাজি নজরুল ইসলাম অসুস্থ, দ্বিতীয়জন শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বেতার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তৃতীয়জন শ্রীযুক্ত দাস মৃত। কলিকাতা বেতার এই ত্রয়ীর ওপর সুবিচার করেন নি।

কাজি নজরুল তাঁর সংগীত প্রতিভায় সুরের বৈচিত্র্যে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় ও শব্দের ঝংকারে যে সংগীত রচনা করেছিলেন সংগীত-অনুরাগীদের কাছে তা 'নজরুল-গীতি'

বলে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করে। এবং এই গান সে যুগের বেতারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হয়। স্বর্গতা শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার ও বিমল ভূষণ এই গানের ভিতর দিয়ে আপনাদের অপরিসিম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কাজি নজরুল যখন কলিকাতা বেতারে সংগীত সাধনায় রত তখন হীন দলগত চক্রান্তে বলিয়ান বেতার তাঁকে বিদায় করে দিল—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র লাল দাসও বিদায় নিলেন—শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে ঢাকা বেতারে বদলী করা হলো। আমার মনে হয় কাজি নজরুল কলিকাতা বেতার থেকে যে আঘাত পেয়েছিলেন—সেই আঘাতই তাঁর বর্তমান অসুস্থতার কারণ। বেতারের এই দলগত চক্রান্ত সুরেন্দ্র লাল দাসের জীবনকে স্বল্পায়ু করে তুললো। হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা উজাড় করে দেবার প্রত্যুত্তরে যে হীন আঘাত কলিকাতা কেন্দ্র তাঁদের দিলো, তা থেকে কেউ নিজেদের রক্ষা করতে পারলেন না। না নজরুল—না সুরেন্দ্রলাল দাস। বেতার ত্যাগ করে সুরেন্দ্র লাল দাস বেশীদিন বাঁচেন নি।

নজরুল বেতার থেকে বিদায় নেবার পর থেকে নজরুলের গান বেতারে গাওয়া বন্ধ হলো। সুর বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যবান যে সংগীত বৈচিত্র্যের অবদান বেতারের সংগীত বিভাগকে সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেই নজরুল গীতির তিরোভাবও বেতারে ঘটলো অবশেষে। বেতার নজরুলকে ভুলে গেল—বাংলা ভুলে গেল তার বিদ্রোহী কবিকে। কলিকাতা বেতারের এই অনাচারের প্রতিবাদ কোন কোন পত্রিকা করেছিল কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। বাংলা দেশের অকৃতজ্ঞ বেতার এবং ততোধিক অকৃতজ্ঞ শিল্পীরা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার ও সংগীত রচয়িতাকে বিনা প্রতিবাদে শুধু বেতার থেকে সরে যেতে দিলেন—শুধু তাই নয়—নজরুল-গীতি গাওয়া বেতারে বন্ধ হলো তাও স্বচ্ছন্দে মেনে নিলেন।

যদু-মধু-কালো-ভুলোর দল আজ বেতারে করে খাচ্ছে—তাদের রচিত প্রলাপ আজ বেতারে গান বলে চলে যাচ্ছে অথচ যাঁর প্রতিভা ও প্রাণ কলিকাতা বেতারকে সমৃদ্ধ করলো, আজও বেতারে তাঁর যোগ্য সমাদর হলো না। অর্থের অভাবে আজ কাজি নজরুলের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত—বাংলা সরকারের সামান্য অর্থ তাঁর ক'দিনের আশ্বাস?—তাঁর গানের 'কপি রাইট' তাঁর নিজের না থাকার দরুণ নজরুলের সংগীত প্রচারে বাধা আছে বলে একদল মনে করেন। আমাদের মনে হয় তাঁর অজস্র গান আছে যার 'কপি রাইট' নিজেরই—বেতারে অবস্থান কালে যে সব গান তিনি লিখেছিলেন—তাও সংখ্যার দিক থেকে সামান্য নয়—এ সব গানগুলো বেতারে অথবা রেকর্ডে অথবা ফিল্মে প্রচারে বাধা কিছু নেই। রেকর্ড ও ফিল্ম সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। কলিকাতা বেতার কাজি নজরুলকে বিদায় করে যে মুর্খতার ও কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছিল অতীতে বর্তমানে পাপ ও গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়ে দেবার, কলংকমুক্ত হবার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি—অসুস্থ কবির জীবিতকালে কলিকাতা বেতারের এই কলংক মুক্তি ঘটানো দরকার এবং তা সম্ভব হতে পারে নজরুল গীতির ও সংগীত রচনার নব প্রবর্তনায়। এই আমাদের দাবী। কলিকাতা বেতারের বর্তমান নায়ক শ্রীযুক্ত অশোক সেন এবং শিল্পী সংঘের দৃষ্টি আমরা অবিলম্বে আকর্ষণ করছি।

লণ্ডন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে আপনি স্বচ্ছন্দে তা করে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়: 'বিচিত্রা' বি, বি, সি, পোষ্ট বক্স: ১০৯, নতুন দিল্লি—লণ্ডন "বিচিত্রা" মারফৎ আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন। প্রশ্ন করবার সময় 'রূপ-মঞ্চে'র নামোল্লেখ করবেন।

নবযুগের সূচনা

আগে আগে বেতারে লাট বেলাট এলে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। বেতারকে ঘিরে চলতো মাজা ঘসা কত ভাবের। লাট আসার আগে বেতারের চার পাশে বসতো—
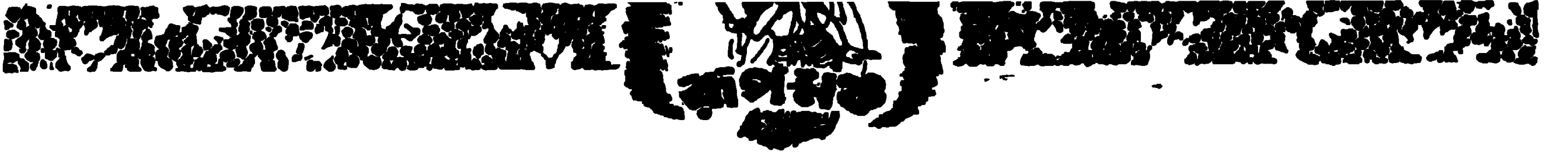
কড়া পাহারা। সময় সময় কেরাণী কর্মীদের আগেভাগেই বিদায় করা হতো—অপরিচ্ছন্ন পোষাকে কাউকে বেতারে দেখলে কোন ঘরে বন্ধ করে রাখা হতো—বেতার থেকে লাট বিদায় নিলে তবে ঘটতো তার মুক্তি। এ গল্পকথা নয়—বেতারের অতীতের হালচাল জানা যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই লাটের উপস্থিতি ও আগমনের তিক্তকর প্রতিক্রিয়া সাধারণ কর্মীদের জীবনকে কে কী পরিমাণে বিব্রত ও বিপন্ন করে তুলতো তা বলবার নয়। লাট বেলাট এলে সাধারণ বেতার কর্মীদের জীবনকে অসহ্য এবং সংকিত করে তুলতো। পুলিশ মিলিটারী ছাড়াও সাদা পোষাকের টিকটিকিদের উপদ্রবই কি কম ছিল! এদের হাতেও বেতারের কর্মীরা কম নাজেহাল হন নি।

পোষাকী ভদ্রতা ও আদর আপ্যায়ন করতে করতে কলিকাতা বেতারের কর্তারাও কম গলদঘর্ম হন নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে পুষ্ট বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিকে তুষ্ট রাখতে না পারলে সমূহ বিপদ তাই দুর্গা নাম জপ করতে করতে কর্তারা কাঁচা-কোঁচার সামাল দিতে দিতে সব করতেন। বেতার তখন ছিল বিদেশী শাসকের প্রচার যন্ত্র—তাই এ দেশের জননায়করা ছিলেন বেতারে অপাংক্তেয়—জনসাধারণ ছিল বেতার থেকে দূরে। দেশের কথা বলা, সে বিষয়ে চিন্তা করা—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ছিল পাপ। বেতার ছিল ধনীর খুশীর খেলার পুতুল—ড্রয়িং রুম সাজাবার একটা উপকরণ মাত্র—দেশের ও জনসাধারণের যোগ বেতারের সংগে ছিল না।

কিন্তু কালের পরিবর্তনে পুরাতন দৃশ্যপট গেছে বদলে। জননায়কদের বেতারে উপস্থিতি এখন গর্বের ও গৌরবের। বিগত ২১শে জুন, শনিবার, কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুচেতার কলিকাতা বেতারে উপস্থিতি আমাকে অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

সর্বভারতের শ্রদ্ধেয় নেতার উপস্থিতিতে বেতার কর্তাদের যে আন্তরিকতা দেখা দিল তা উপভোগ্য।

পোষাকী ভদ্রতা ও সৌজন্য, পুলিশ ও মিলিটারীর কড়া পাহারা এবং সাদা পোষাকে টিকটিকির দৌরাত্ম এবার বেতার কর্মীদের সহ্য করতে হয় নি এবং অপরিচ্ছন্ন পোষাকে থাকার দরুণ কয়েক ঘণ্টা বেতারের কোন ঘরে কয়েদ থাকার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি—রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর পত্নী এসেছিলেন অতি সাধারণ বেশে। সাধারণের একজন হয়ে অতি সহজ সুন্দর বেশে। তাই বেয়ারা থেকে সুরু করে বেতার পরিচালক পর্যন্ত যে প্রীতি নমস্কার ও সম্বর্ধনা দিয়ে ছিল—তা তাঁরা দু'জন অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে প্রতিদানে দিয়েছিলেন সস্মিত অভিবাদন। পদ মর্যাদা ভেদে এই অভিবাদনের কোন প্রকার ভেদ হয় নি। কলিকাতা বেতারে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পত্নীর পদার্পণ এবং বেতারে জাতীয় সংগীত স্থায়ী অনুষ্ঠানে পরিণত করা কলিকাতা বেতারে এক নব যুগের সূচনা করলো।

বেতারের আভ্যন্তরীণ নীতি ও নিয়ম

কলিকাতা বেতারের নানা কুৎসা নিন্দা পল্লবিত হয়ে আমাদের কাছে আসে। শিল্পী বিশেষের বিরুদ্ধে নানা অভদ্র ইংগিত নিয়ে বেনামী পত্র আমাদের কাছে আসে। কলিকাতা বেতারে "বড় বাবু" "ছোট বাবু" ইত্যাদি বাবুদের যে পোষ্য-পোষণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা জানি, নানা অবাঞ্ছিত ও অপদার্থেরা বেতার থেকে বেশ কামিয়ে নিচ্ছেন—এই সমস্ত তথাকথিত শিল্পী নামধারী পোষ্যদের একটি তালিকা তৈরী করছি—বেতার সচিবকে আমরা যথাসময়ে তা উপহার দেবো। আমরা এও জানি, কোন বিশেষ মহিলা শিল্পী বহু বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে বেতারকে তাঁর জমিদারী করে তোলবার চেষ্টা করছেন। কলিকাতা বেতার থেকে এই দুর্নীতি দমন ও পোষ্য-পালন বন্ধ করবার জন্যে দৃঢ়মনা "মানুষের" প্রয়োজন—এমন মানুষের অভাব বেতারে বড় বেশী। কলিকাতা বেতারে সম্প্রতি নিযুক্ত সহকারী বেতার পরিচালক মিঃ বি, কে, নন্দীকে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ বলে জানি। আমরা শুনে সুখী হলুম যে, মিঃ নন্দী কলিকাতা বেতারের ভিতরকার জঞ্জাল পরিষ্কার করবার কাজ সুরু করেছেন। কোনও মহিলা শিল্পী বিশেষকে তাঁর দুগ্ধ পোষ্য বালসুলভ চাপল্য এবং অফিস পরিচালনার পক্ষে যে নীতি নিয়ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়া দরকার—তার বিপরীত আচরণ প্রকাশ পাওয়ায় মিঃ নন্দী এই মহিলা শিল্পীকে বেতার যে কারো বৈঠকখানা নয় একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে মিঃ নন্দীর ফ্যাসাদ হয়েছে। ওরই সহকারীরা এক সভা করে মিঃ নন্দীকে ক্ষমা প্রার্থনা অন্যথায় পদত্যাগের দাবী করে এক প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন—শুধু তাই নয়—এই প্রস্তাবের নকল দিল্লীর সদর অফিসে পাঠান হয়েছে। আমরা জানি, বেতারের কয়েকজন শিল্পী ও সহকারীরা বেতারকে তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানা বা জমিদারীর সেরেস্তা ঘর মনে করেন। এই মনোবৃত্তিই বেতারের ভিতরে নানা নিন্দা, গ্লানির ও গুজবের জন্ম দিয়েছে। এই গ্লানি থেকে কলিকাতা বেতারকে বাঁচাতে গেলে দৃঢ় হস্তে এর উৎস-মুখ বন্ধ করে দেওয়া দরকার। দরকার বেতারের আভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ম আরো কঠোর ভাবে প্রতিপালিত হওয়ায়। সেই জন্যে মিঃ নন্দীর এই কঠোর মনোভাবের আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি। মিঃ নন্দীর সহকারীদের বিপরীত আচরণে আশ্চর্যন্বিত হয়নি—ভাল কাজে বাধা দেবার জন্য সব সময়েই একদলকে দেখতে পাওয়া যায়—যারা কোন না কোন ছল ছুতোয় সৎকর্মীকে শুধু বিপদগ্রস্থ নয়—বিপন্নও করে তোলে তাদের দলগত চক্রান্ত শক্তিতে।

দেখা যাক—এ ব্যাপারে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ?

ভুলে না যাই

কলিকাতা বেতারে "বন্দেমাতরম" ও বিবিধ জাতীয় গানের প্রবর্তনা ও রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পত্নীর উপস্থিতি নব যুগের সূচনা ঘটালেও বেতারের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব যে এখনও কায়েম আছে, তার স্বল্প আভাস পাওয়া গেছে মিঃ নন্দীর ভালো কাজে বাধা দেওয়ার মধ্যে। বিদেশী শাসকের স্নেহ-ছায়ায় বর্ধিত এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কর্মচারীদের অতীত ইতিহাস আমরা যেন ভুলে না যাই। স্বাদেশিকতার চোরা রঙে ও দেশপ্রেমের মুখোসে এরা বর্তমানে আত্মগোপন করলেও জাতীয় সংগীত বাজানোর দরুণ বেতার থেকে এঁরাই শিল্পী সুনীল দাশগুপ্তকে বিদায় করে দিয়েছিলেন—এদেরই মধ্যে দু'জন জাতীয় সংগীতের অবসানকারী হিসাবে সমস্ত বাংলা ও ভারতের ধিকৃত—জনমতের দরবারে এদের "স্বদেশ-দ্রোহীতা"র বিচার হবে—এ আশা আমরা এখনও করি। সাময়িক উত্তেজনায় আমরা ভুলে না যাই—"অনুরোধের আসর"-এ স্বদেশী গানের রেকর্ড বাজানোর দরুণ স্বনামধন্যা শিল্পী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারকে রেকর্ড বিভাগ থেকে বদলী করে দেওয়া হয়েছে এবং লাইব্রেরীয়ান মিঃ গুপ্ত "ওয়ার্নিং" পেয়েছেন। ভুলে না যাই—সময়ের সংগে এরাও তাদের রং বদলাবার ফিকিরে আছেন।

ইনি আবার কে ?

বেতারে সম্প্রতি এক পার্থ সারথীর আবির্ভাব হয়েছে 'মজদুর মণ্ডলী'তে। ইনি তাঁর স্বরে মস্ত মস্ত কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে যান, 'রামধন রায়' (গরীবদের) পুত্রকন্যার জন্ম দেয় অথচ খেতে দিতে পারে না বলে তাদের দারিদ্র্যের ও অক্ষমতায় উপহাস করেন। পার্থ সারথী ধনের আভিজাত্যে আজ স্ফীত—তাই এই উপহাস—এই বিদ্রূপ। কিন্তু পার্থসারথী মশাইকে জিজ্ঞাসা করি, সমাজ ব্যবস্থায় অসাম্য হেতু তিনি ধনবান বলেই রামধন গরীব—পুত্র কন্যাকে মানুষ না করে তোলার জন্য দায়ী সমাজ এবং পার্থসারথীর মতো ধনী কূপমণ্ডুকেরা। মজুর স্বার্থ-বিরোধী প্রচার করতেও ইনি কম যান না।

—এই সবজান্তা পার্থসারথীটি (আমরা-ত্রিপুরারী মধুসূদন !) কে—তা জানতে ইচ্ছে করেন। এঁর খুশীমত আগড়ম বাকড়ুম না বকতে দিলেই আমাদের মনে হয় বেতার-কর্তা কাজটা ভাল করবেন।

বেতারের নাটক বিভাগ

কলিকাতা বেতারের মধ্যে যে বিভাগ সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি করেছে তা হচ্ছে বেতার নাটক বিভাগ। ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করছে তা হচ্ছে বেতারের সংগীত বিভাগ। সংগীত বিভাগ থেকে স্বনামধন্য শিল্পীরা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছেন এবং "ফি" সম্পর্কে অ-সমান এবং পক্ষপাতমূলক ব্যবহারই বেতারের সংগীত বিভাগ থেকে নামকরা গায়করা সরে যাচ্ছেন। বেতার নাটক বিভাগ স্বল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারছেন এই কারণে যে, এই বিভাগ সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাটক নির্বাচন ও অভিনয় করে থাকেন। বেতারের জন্য বিশেষ করে লেখা নাটক লেখাও আস্তে আস্তে সুরু হয়েছে। বেতারের জন্য বিশেষ করে লেখা নাটকের "পারিশ্রমিক" বৃদ্ধি করলে ফল আরও শুভ হবে—এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। ছায়াচিত্রের ও রংগমঞ্চের স্বনামধন্য শিল্পীদের সমাবেশ বেতার নাটক অভিনয়কে আরো জনপ্রিয় করে তুলছে। বিভাগীয় কর্তার আন্তরিকতার ও উদ্যমের আমরা প্রশংসা করি।

লণ্ডন 'বিচিত্রা'

লণ্ডন থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান "বিচিত্রা" বাঙালী ও বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠছে। লণ্ডন 'বিচিত্রা' যে সত্যিই বিচিত্র সুন্দর তা এর যে কোন শ্রোতা স্বীকার করবেন। 'বিদেশীর চোখে বাংলা' অনুষ্ঠানে বহু বিদেশীয়ের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা, গান ইত্যাদি শ্রোতাদের কৌতূহল ও আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি ডাঃ বাকের মুখে রবীন্দ্র সংগীত শুনে সংগীত অনুরাগী শ্রোতা মাত্রই খুসী হয়েছেন। লণ্ডন 'বিচিত্রা'য় 'প্রবাসী বাঙালী' নতুন করে সংযোজিত হওয়ায় বিচিত্রা আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রবাসী বাঙালী অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালীর নিজের কথা আপনারা জানতে পারবেন। আমারা বিচিত্রা পরিচালকের নব উদ্যমের প্রশংসা করি।—লাঃ স্পীঃ

সমালোচনা, চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

★

ঝড়ের পর

কাহিনী—মন্মথ রায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অপূর্ব মিত্র। সংগীত পরিচালনা—অনিল বাগচী। চিত্র-শিল্পী: সুধীর বসু। শব্দ-যন্ত্রী: পরিতোষ বসু। ভূমিকায়—জহর গাঙ্গুলী, ছায়াদেবী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, তুলসী চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

কাহিনীকার মন্মথ রায় বহুদিন থেকে জন সমাজে সুসাহিত্যিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। "ঝড়ের পর" রচনার পর সে খ্যাতি দর্শকদের কাছে ম্লান হয়ে আসবে। এজন্য পরিচালক অপূর্ব মিত্র কম দায়ী নন। কাহিনীটী প্রথমে গড়ে উঠেছে ডাক্তার পশুপতি সামন্ত ও তার সহকর্মী দুলাল মিত্রের আদর্শের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। এই চরিত্রটী শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা বলতে পারেন একমাত্র কাহিনীকার। মোটের উপর কাহিনীটী কোন কার্যকরী সমস্যার রূপদান করতে পারেনি। প্রথমে কাহিনীটী দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার কোরে শেষে হতাশায় অন্তর্হিত হয়েছে। কাহিনীটীকে কতকগুলি অবাস্তব রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে। "ঝড়ের পর" দেখবার সময় এই আশা করেই গিয়েছিলাম যে, বিরাট একটা কিছু ওলটপালটের ভিতর দিয়ে কাহিনীকে গোড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু সে বিরাট কিছু তো দূরের কথা, কতকগুলি অবাস্তব ও আদর্শবাদের ফাঁকা বুলি দিয়ে দর্শকদের মন জয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাহিনী ও পরিচালনার দিক থেকে প্রথমে যে দৃশ্যের ত্রুটি চোখে পড়ে, তা হচ্ছে দুলাল মিত্রের জেল থেকে পলায়ন। এই পলায়ন দৃশ্যটী দেখাতে গিয়ে কাহিনীকার ও পরিচালক উভয়েই কাচা মনের পরিচয় দিয়েছেন। যেহেতু দুলাল মিত্রকে জেল থেকে পালাতে হবে সেহেতু ঝড়ের দৃশ্যটীর অবতারণা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলে দরজার তালা খোলা অবস্থা ও প্রহরীদের অন্তর্ধান দুলাল মিত্রের পালানোর সহায়ক দৃশ্য দেখিয়ে চিত্রটিকে হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছে। পালাবার সময় এবং পালাবার পরও জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হওয়া সত্বেও কাহিনীটিকে টেনে বাড়াবার জন্য পুলিসের যে অসতর্কতা দেখান হয়েছে, তাতে আমরা পরিচালকের কাঁচা মনেরই পরিচয় পেয়েছি। পালাবার পর যখন দুলালের খোঁজে পুলিস অফিসার বাড়ীতে এলেন, তখন অজিত চট্টোপাধ্যায়ের কৌতুকের যে দৃশ্যটীর অবতারণা করা হয়েছে তা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। পুনরায় দুলালের উপর পুলিসের কড়া নজরের জন্য যখন দুলালকে গ্রামছেড়ে ট্রেণ ধরতে হল, তখন ট্রেণের ভিতরের দৃশ্যটীকে একেবারে ছেলে মানুষীর পর্যায়ে টেনে আনা হয়েছে। যে আদর্শবাদের উপর নির্ভর করতে যেয়ে দুলালকে জেলে যেতে হয়েছিল, সেই দুলালকে একটী রুগীকে ট্রেণে দেখতে যেয়ে অনবরত পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়—পুলিস তার পেছু নিয়েছে কিনা তা দেখতে যেয়ে অন্য ট্রেণের কামরায় পুলিস অফিসারকে মামা সম্বোধন করাটা অস্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়েছে।

সবচেয়ে বেশী অভিযোগ আনবো সেই দৃশ্যটীর বিরুদ্ধে, যেখানে নিম্ন স্তরের একটী নাচের দৃশ্য দেখান হয়েছে। যদি কাহিনীটীকে গড়ে তোলবার জন্য একটী নাচ দেওয়া হতো, তাহলে খুব বিশেষ অভিযোগ আমরা আনতাম না। কিন্তু শুধু শুধু একটা রুচি বিগর্হিত নাচকে আমরা আদৌ গ্রহণ করব না। বিশেষ কোরে চোখমারার দৃশ্যটীকে এমন পর্যায়ে আনা হয়েছে, যা অন্ততঃ কোন ভদ্র পরিবারের দেখার অনুপযুক্ত।

পরিচালক ও কর্তৃপক্ষ যদি এই ভাবে দৃশ্যটীকে আকর্ষণীয় করে বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তাঁদের এইরূপ হীন স্পর্ধার যোগ্য উত্তর দর্শকেরা দিতে দ্বিধা করবেন না। তাঁরা যেন মনে রাখেন, যৌন আবেদন দ্বারা লোকের মন জয় করবার দিন শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর নেতাজীর পলায়ন কাহিনীর সংগে চিত্রের নায়কের

পলায়ন কাহিনীটি অত্যন্ত অবাস্তব। চিত্রের জনতার যে রূপ দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত ছেলেমানুষী। যে নেতা পৃথিবীর সকলের সংগে ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত—অপর এক ব্যক্তিকে দেখে তারা ভুল বশত তাকেই মেনে নেবে এ একমাত্র গঞ্জিকা সেবীদের পক্ষেই সম্ভব। নেতাজীর পলায়ন কাহিনীর আরও কতকগুলি দৃশ্যকে এর মধ্যে টেনে এনেছেন—যার জন্য কাহিনীকার ও পরিচালকের হীন exploitation-এরই পরিচয় পেয়েছি। যেহেতু নেতাজীকে লোকে দেবতার মত ভক্তি করে, সেইজন্য সেই সম্বন্ধে একটা কিছু "বোল হরি বোল" করে দিলেই দর্শকরা মেনে নেবেন এ ধারণা তাদের ত্যাগ করতে হবে। নিছক ব্যবসাদারীর জন্য এই ধরণের বই তুলে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন না করার জন্যই আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি। তখনই তাঁদের কাজে হাত দেওয়া উচিত, যখন অন্ততঃ কিছু নূতনের সন্ধান আমাদের দিতে পারবেন। "ঝড়ের পর" সম্বন্ধে সমালোচনার অনেক কিছুই বাকী রইল। কারণ এটী এমন স্তরের বই যা সমালোচনা করতে গেলে নিজেদের মনকেই দুর্বল করতে হয়। কারণ আমরা (দর্শক সাধারণ) আলোচ্য চিত্রের কর্তৃপক্ষের চেয়ে রুচিবান বলেই মনে করি।

চিত্রে পশুপতি ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সন্তোষ কুমার সিংহ। তাঁর অভিনয় চলন সই হয়েছে। দুলাল মিত্রের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী সুন্দর অভিনয় করেছেন। রাধার পিতার ভূমিকায় রবি রায় যে টুকু সুযোগ পেয়েছেন তার মর্যাদা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। হলধরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তুলসী চক্রবর্তী। তাঁর অভিনয় উপভোগ্য হয়েছে। ছায়াদেবীর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। নবাগতা অজন্তা কর যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মর্যাদা রাখতে পারেন নি। তার সম্ভাবনা এখন আমাদের মনে সন্দেহ জাগায়। গানের ভিতর সংগীত পরিচালক অনিল বাগচী কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। চিত্রের গানগুলি দর্শকমনের কোন সাড়া দিতে পারেনি। ছবির আলোক নিয়ন্ত্রণ ও ক্যামেরার কাজ প্রসংশনীয়। কবি গোপাল ভৌমিকের একখানি গান সংযোজিত হ'য়েছে এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবো। —মদন চক্রবর্তী

বিষ্ণু শর্মা

পরিকল্পনা ও প্রযোজনা: শ্রীকালিদাস। রচনা: স্বপন বুড়ো। সুর-সংযোজনা ও পরিচালনা: রণজিৎ রায়। দৃশ্য পরিকল্পনা: মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)। স্থান: কালিকা নাট্য-মঞ্চ। গত ২২শে জুন পেশাদার মঞ্চ-মালিকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম শিশু নাট্যাভিনয় বিষ্ণু শর্মার এক বিশেষ অভিনয় উপলক্ষে আমরা আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। আমাদের মত আরো বহু সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রতিনিধি এবং বহু সুধীজনকেও আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ কালিদাস নাগ।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'কালিকা' নাট্য-মঞ্চের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী মহাশয় গল্পচ্ছলে ছোটদের শিক্ষা দেবার বিষ্ণু শর্মার পদ্ধতিকে ছোটদের জন্য মঞ্চে রূপায়িত করবার পরিকল্পনার কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। এবিষয়ে আমাদের দিক থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতিই তাঁকে দিয়েছিলাম। আজ শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—তাঁর এই আন্তরিকতাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিষ্ণু শর্মার গ্রন্থিক হিসাবে স্বপনবুড়োকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো। স্বপন বুড়ো যুগান্তর পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি বিভাগটী পরিচালনা করে ছোটদের মনের অনেক কথাই জানতে পেরেছেন—তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে তিনি (শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী) শিশু-সাহিত্য রচনা করেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই এবিষয়ে যে একজন যোগ্য ব্যক্তির উপরেই ভার দেওয়া হ'য়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পেশাদার কর্তৃপক্ষের দ্বারা শিশু-নাটক মঞ্চস্থ করবার সর্বপ্রথম গৌরবে কালিকা নাট্য-মঞ্চকে আমরা অভিনন্দিত করছি। কিন্তু সর্ব ভারতের সর্ব প্রথম শিশু নাট্যাভিনয় বলে তাঁরা যে

বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন—তাতে তাঁদের অজ্ঞতার কথাই জনসাধারণের কাছে ঘোষিত হচ্ছে। ডাঃ কালিদাস নাগ অবশ্য ওদিনকার অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের এই অজ্ঞতা সম্পর্কে ইংগিত করতে ইতস্ততঃ করেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন শিশু নট, তাছাড়া শিশুদের জন্য বহু নাটক রচনা করে গেছেন এবং তিনি নিজেও সেগুলির অভিনয় করেছিলেন। তেমনি বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে পল্লীতে সেগুলি অভিনীত হয়েছে এবং হচ্ছেও। সহরেও যে সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত না হ'য়েছে তা নয়। তাছাড়া বাংলার পল্লীতে শিশুদের আমোদ-প্রমোদের যত বিচিত্র অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়—তাও বহুদিন থেকে প্রচলিত হ'য়ে আসছে। রূপ-মঞ্চ কর্তৃপক্ষ কিছুকাল পূর্বে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় এক রজনীর জন্য 'সব শিশুদের দেশে' মঞ্চস্থ করেছিলেন। আনন্দবাজার আনন্দমেলার উদ্যোগে শিশুদের উপযোগী যে সব অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'য়েছে তাইবা ভুলবো কেমন করে? তাছাড়া আরো যাঁরা একক প্রচেষ্টায় শিশুদের আমোদ-প্রমোদের অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন—তাদের কথাও সমগ্রভাবে স্মরণ কচ্ছি। আশা করি কালিকার কর্তৃপক্ষ যেটুকু তাঁদের প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশী পেতে চাইবেন না। মহানগরীর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পেশাদার নাট্য-কর্তৃপক্ষদের ভিতর কালিকাকে সর্বপ্রথম শিশু নাটক মঞ্চস্থ করবার গৌরবে আমরা ভূষিত করবো। এবং কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টায় যত খুঁতই থাক না কেন, আশা করি কলকাতার প্রত্যেক অভিভাবকই তাঁদের শিশুদের নিয়ে এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত হবেন। তাহ'লেই ভবিষ্যতে এঁরা আরো নূতন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

পৃথক পৃথক ভাবে নামোল্লেখ করে কাউকে খুশী আবার কাউকে অখুশী করতে চাই না--যে সব শিশু অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এবং বড়দেরও যারা এই শিশু নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন—তাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—অভিনয়ের ভিতর যাঁদের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে—অন্তরালে থেকে যাঁরা এই অভিনয়কে রূপ দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমরা অভিনন্দিত করছি। কিন্তু নাটকখানি সম্পর্কে আমাদের কয়েকটী কথা বলবার আছে—আশা করি কর্তৃপক্ষ তা ভেবে দেখবেন। প্রথম কথা মুখোস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যে ভাবে নাটককে রূপ দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে—তাতে ছোট ছোট শিশুরাও আনন্দ উপভোগ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্রভাবে এ নাটকটী হ'য়েছে ঠিক যেন কিশোরদের উপযোগী। তারপর এতগুলি ঘটনা সংযোগ করা হয়েছে যা ছোটদের মস্তিষ্ক একসংগে গ্রহণ করতে পারবে না। এবং বিষ্ণু শর্মার গল্প বলার সময় প্রথম থেকে শেষ অবধি ঐ একই 'flash back' টেকনিক গ্রহণ করবার পদ্ধতিরও প্রশংসা করতে পারবো না। কারণ, প্রথমত ঐ flash back পদ্ধতি ছোটদের মগজে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। একটা দু'টো হ'লে নয় ছেড়ে দিতাম। কিন্তু সব কাহিনীগুলিকে একই টেকনিকে ফেলে দেওয়াতে যেমন একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে, তেমনি ছোটদের পক্ষে এই টেকনিক অনুসরণ করা কতখানি সহজ হবে কর্তৃপক্ষদের ভেবে দেখতে বলি। আর অভিনয়ের সময় দেড় ঘণ্টা কী দু'ঘণ্টা—তার বেশী হওয়া কোন মতেই উচিত হবে না। গানগুলি সুগীত হ'য়েছে। কিন্তু কোন ছোটরাই গানের ভাব বা কথা অনুসরণ করতে পারবে না। অভিনয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী দেখেছি। নাচ এবং গানের জন্যই কর্তৃপক্ষ হয়ত এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন—কিন্তু মেয়েদের বয়স আর একটু কম হলে কথা ছিল না। নইলে ছোটদের অভিনয়ে যে বাধা সৃষ্টি করে আশা করি যাঁরা অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করবেন। বিশেষ করে যে মেয়েটী গাধা'র ভূমিকাভিনয় করেছে তার কথা আমরা বলতে চাইছি। ব্যাধদের নাচের দৃশ্যটী বাদ দিলে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ ব্যাধেরা মরা হরিণ দেখে জাল ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেই হরিণ কাকের ডাকে ছুট দিয়েছিল। হরিণের মাংসের লোভে তাদের ওভাবে দল বেঁধে এসে উল্লাস করবার কোন নজির নেই। তারপর রাজপুত্রদের বিরহে কাতরা রাণীর সামনে তিনটী নর্তকীর নাচ ত কোন মতেই সমর্থন করতে

পারবো না। নব যৌবন প্রস্ফুটিতা উন্নতবক্ষা তিনটী মেয়ে যে ভাবে অর্ধ আচ্ছাদিত পোষাক পরিচ্ছদে নর্তকী-রূপে দেখা দিল, তাতে শিশুদের দূরের কথা তাদের বাপ দাদাদেরই যে বুক দুর দুর করে ওঠে। আশাকরি এই দৃশ্যটি বাদ দিয়ে শিশুদের মাথা চিবিয়ে খাওয়ার মনোবৃত্তি থেকে কর্তৃপক্ষ নিবৃত্ত থাকবেন। শিশুদের আমোদ প্রমোদ প্রসংগে আমরা এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে কথা বলেছি তার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমালোচনা প্রসংগে বিশেষভাবে যে কথাগুলির ওপর আমরা জোর দিয়েছি, কর্তৃপক্ষ এগুলি সংশোধন করে নিলে যে কোন শিশুদের বিষ্ণুশর্মা'র অভিনয়ে যোগদান করে কালিকার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য আমরা জনসাধারণকে আবেদন জানাবো। বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে নাটকটীর যে সব দৃশ্য রচনা করা হয়েছে—শিশুদের মনোরঞ্জনে তা সমর্থই হবে। আশা করি কোন অভিভাবকই শিশুদের "বিষ্ণুশর্মা'র অভিনয় থেকে বঞ্চিত করবেন না। এবং শিশুরা বিষ্ণুশর্মা দেখে কিরূপ উপভোগ করলো না করলো তা যদি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকেরা আমাদের জানান খুবই বাধিত হবো। —রমেশ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরাধানাথ সিংহ। চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চান। সুযোগ পেলে উন্নতি করবার আশা রাখেন। সুযোগদানেচ্ছুক কর্তৃপক্ষ সরাসরি এর কাছে ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিন, এই ঠিকানায়, অথবা রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে সন্ধান নিতে পারেন।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী প্রযোজিত চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বাংলা বাণী চিত্র "মাটি ও মানুষ"-এর মহরৎ উৎসব গত ৪ঠা আষাঢ় বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। 'বন্দেমাতরম্' চিত্রখ্যাত শ্রীযুক্ত সুধীর বন্ধুই চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। 'মাটি ও মানুষ'এর কাহিনীও তিনিই রচনা করেছেন।

লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লাল পাঞ্জা' কাহিনীটাকে কেন্দ্র করে এদের প্রথম রহস্য-মূলক বাংলা বাণীচিত্র 'দেব-দুতের' মহরৎ উৎসব গত ৯ই মে রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। দেবদুতের সংলাপ ও চিত্রনাট্য শরদিন্দু বাবুই রচনা করেছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতাংশের ভার পড়েছে বিনয় গোস্বামীর ওপর। চিত্রগ্রহণ ও শব্দ-গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে অশোক সেন ও নৃপেন পাল। মহরতের দিনে ভাস্কর দেব, অচিন্ত্য কুমার, হারাধন বন্দ্যো এবং মণি সরকারকে নিয়ে চিত্রগ্রহণ করা হয়। তাছাড়া থাকবেন—অমিতা বসু, আভি ভট্টাচার্য (বম্বে-টকীজ-খ্যাতা) প্রণব, সন্তোষ প্রভৃতি।

রমা আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'সংসার'-এর মহরৎ উৎসব গত ৩০শে মে শ্রীযুক্ত এন, সি, চ্যাটার্জির পৌরহিত্যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। সংসারের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায়—চিত্রখানির পরিচালনা ভারও তিনিই গ্রহণ করেছেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন অহীন্দ্র, সুপ্রভা, সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার, ইন্দু মুখার্জি, শান্তি গুপ্তা, জয় নারায়ণ, রেবা বসু,

নিভাননী, বেচু সিং, সুকুমার সরকার, সনাতন প্রভৃতি। সংগীতাংশের ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীযুক্ত সুবল দাশগুপ্তের ওপর। রীতেন এণ্ড কোং চিত্রখানির পরিবেশনা স্বত্ব লাভ করেছেন। বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে চিত্রখানি গড়ে উঠছে।

শ্রীরূপা ফিল্মস লিঃ

শ্রীযুক্ত এ, কে, চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের প্রথম হিন্দুস্থানী চিত্র "টু-লেট" এর মহরৎ উৎসব গত ২০শে জুন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন এস, কে, প্রভাকর। সংগীত পরিচালনা করবেন কালীপদ সেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন মণিমালা, ইফতিকার, আনন্দ, ফৈজ, কালী ও সারীতা।

কে, সি, দে, প্রডাকসন্স

কে, সি, দে প্রডাকসন্সের প্রথম গীতিবহুল বাংলা কথাচিত্র পূরবীর কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বর্তমানে আধুনিক ও উচ্চাংগ সংগীতের ভিতর যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তারই ওপর ভিত্তি করে পূরবীর কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু। এবং সংগীতাংশের ভার নিয়েছেন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রণব দে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন—সন্ধ্যারাণী, পরেশ ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্তী, কানু প্রভৃতি। সান রাইজ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করবে।

আর, কে, ফিল্ম করপোরেশন

এদের 'মায়াডোর' বাণীচিত্রের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কিছুদিন পূর্বে পরিচালক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে বেনারস গিয়ে কয়েকটী বিশিষ্ট অংশের চিত্র গ্রহণ করেন। মায়াডোরে পদ্মা দেবী, প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে প্রকাশ। 'মায়াডোর'এর সংগীতাংশের ভার রয়েছে শ্রীযুক্ত চিত্ত রায়ের প্রতি। ছবিখানি শিগ্‌গিরই একাধিক চিত্র গৃহে মুক্তি লাভ করবে।

সুধা প্রডাকসন

গত ২২শে জুন, রবিবার, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ষ্টুডিওতে নবগঠিত সুধা প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র "ভাঙ্গা দেউল"এর মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানির নাম 'ভাঙ্গা দেউলে পূজারিণী' পরিবর্তন করে "ভাঙ্গা দেউল" রাখা হ'য়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত বসু দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং চিত্রশিল্পের কর্তব্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, "আজ চিত্রশিল্পকে দূরে সরে থাকলে চলবে না। দেশের এই সংকট কালে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাকে তৎপর হ'য়ে উঠতে হবে। বিভিন্ন বৈদেশিক চিত্র দেখলে আমাদের দেশীয় চিত্রের দীনতা সহজেই চোখে পড়ে। জাতিগঠনে—প্রচার কার্যে বিভিন্ন দেশ চলচ্চিত্রকে কী ভাবে কাজে লাগিয়েছে! এর সম্ভাবনাকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। যুদ্ধের সময় জার্মেনী ও বিভিন্ন দেশ ঘুরে নেতাজীও এর প্রয়োজনীয়তার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হবার পর একাধিক চিত্র গড়ে উঠবার কথাও আপনারা শুনেছেন। এব সব ছবি দেখে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরেরা কম উৎসাহিত হননি। আপনারা 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' ছবিখানির কথা শুনেছেন। আমি মূল ছবিখানি দেখেছি—যতবার দেখেছি মুগ্ধ হ'য়েছি। কিন্তু ভারতে বর্তমানে যে ভাবে সেই ছবিখানিকে রূপায়িত করা হ'য়েছে, তাতে তার মর্যাদা অনেকাংশে নষ্ট হ'য়েছে। মূল ছবির যে সব দৃশ্য উত্তেজিত করে তোলে—যে সব দৃশ্য এবং নেতাজীর বাণী শুনতে শুনতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে হয় বর্তমান ছবিখানিতে তা বাদ দেওয়া হ'য়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ করা হ'য়েছে এবং আমাদের মূল ছবিখানিকে যাতে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারি, তারও পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের

অখণ্ডতা ও মৈত্রীর কাজে শীঘ্রই আজাদ হিন্দ ফৌজকে সংঘবদ্ধভাবে আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের এই মহতী কার্যে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা ভুলে যাবো না। তখন কোন কাহিনী অনুমোদন করে আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে পারি—আপনারা তাকে রূপায়িত করে তুলতে পারেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হতে চলেছে কিন্তু এখন যে সংগ্রাম, তা আরও সুকঠিন। ধনীকশ্রেণীর হাত থেকে শোষিত জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে; যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করবো—মুষ্টিমেয় শ্রেণীবিশেষের যেন তা কুক্ষিগত হতে না পারে। চল্লিশ কোটী নিপীড়িত জনসাধারণের সর্ব-প্রকার মুক্তি সংগ্রামেই আমাদের রত থাকতে হবে। আপনারা চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে এই বাণী প্রচার করুন। আর কিছু আমার বলবার নেই। জয় হিন্দ।"

সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন, "আমাদের চিত্র শিল্প নিয়ে দেশনেতারা ততটা মাথা ঘামান না। আজ এই ষ্টুডিও প্রাংগনে আমরা এমন একজন লোককে পেয়েছি—দেশের মুক্তি আন্দোলনে যাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা আমাদের কারো অবিদিত নেই। আমাদের এই নবীন কর্মী বন্ধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসুকে আমাদের মাঝে পেয়ে—আপনাদের এবং আমার নিজের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ বিশেষ করে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটী কথা বলবো, প্রথম কথা চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত খগেন রায়কে কেন্দ্র করে। কিছুদিন হ'লো আমাদের কানে নানান অভিযোগ আসছে। যে সব সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বন্ধুরা চিত্রজগতে প্রবেশ করেছেন—চিত্র-জগতের অন্যান্য বন্ধুরা তাঁদের ততটা সুনজরে দেখছেন না। শ্রীযুক্ত রায় একজন সাংবাদিক। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতার কাজও করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। পরিচালনা ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে 'প্রতিমা' ছবিখানির ভিতর দিয়ে তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল মজুমদার, জ্যোতির্ময় রায়, প্রণব রায় ৺অজয় ভট্টাচার্য—সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের ভিতর আরো যাঁরা এসেছিলেন বা রয়েছেন—চিত্র জগতের পুরোণ বন্ধুদের প্রতিভার সংগে আমি এঁদের যাচাই করতে চাইনা। অনেক ক্ষেত্রে এঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে দিতে পারেন নি। কিন্তু এরা যে বিরাট আদর্শ নিয়ে চিত্র জগতে পা বাড়িয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই আদর্শের কথা চিন্তা করেই চিত্র জগতের বন্ধুদের এঁদের সহযোগিতা করতে অনুরোধ করছি।

আজকালকার ছবিগুলির বিরুদ্ধে দর্শক সাধারণের অভিযোগ ও অসন্তোষ দিনদিনই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে। ছবি গুলির ব্যার্থতার মূলে যে বিষয়টী আমার সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হ'চ্ছে—ছবির গঠন মূলে যে শক্তি রয়েছে—তা যেন পরস্পরের প্রতি উদাসীন। একখানি ছবির কৃতকার্যতার মূলে প্রত্যেকের যেমনি একক প্রচেষ্টা দায়ী তেমনি সংঘ বদ্ধ প্রচেষ্টাও। ইংরেজীতে "team-work

বলতে যা বুঝি। এই team work এর অভাব সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়। team work গড়ে তুলতে হ'লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে। ছবির নির্মাণমূলে একজন নগণ্য-কর্মীর প্রচেষ্টাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয় না। ইলেকট্রিসিয়ান—ক্যামেরা ম্যান—সাউণ্ড ম্যান—মেক-আপ ম্যান—আরও যে সব কর্মী রয়েছেন—তাঁরাত চিরদিন পর্দার অন্তরালেই থেকে যাচ্ছেন। কোন প্রচার কার্যই তাদের করা হয়না। এঁরা আর্থিক দিক দিয়ে প্রচারের দিক দিয়ে চিরদিন অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হ'য়ে আসছেন। কর্তৃপক্ষদের এঁদের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। ছবির রূপ-সৃষ্টির মূলে এঁদের প্রচেষ্টা যখন স্বীকৃতি পাবে—তখন এঁরা নিজেরাই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠবেন। এবং যার চোখে ছবির যেখানে যে খুঁত ধরা পড়বে তা সংশোধন করতে দ্বিধা করবেন না। এদের আর্থিক অবস্থার কথাও কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে হবে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের শেষ হ'তে চলেছে কিন্তু জাতি গঠনের সংগ্রামের কেবল সুরু। এই সংগ্রামে চিত্র শিল্পের এগিয়ে আসতে হবে। এতদিন জাতীয়তাবাদের নামে তার যে জারস রস আমাদের কর্তৃপক্ষরা পরিবেশন করে এসেছেন—আজ আর তা দিয়ে জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করতে পারবেন না। জাতীয়তাবাদের ফাঁকা বুলির সময় চলে গেছে। এখন সত্যিকারের জাতি-গঠনমূলক ছবি পরিবেশন করে জাতির চাহিদা মেটাতে হবে। জাতীয় ছবি বলতে জাতির যা নিজস্ব—সামাজিক রাষ্ট্রিক ও কৃষ্টিগত ছবির কথাই আমরা মনে করি।"

চিত্রের অন্যতম প্রযোজক ও সুরশিল্পী জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাহিনীকার শ্রীযুক্ত পূর্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সাফল্য কামনা করে সভাপতি তাঁর অভিভাষণ শেষ করেন।

কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত খগেন রায় ও জহর মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে বক্তৃতা প্রসংগে ধন্যবাদ জানান। শ্রীযুক্ত অরবিন্দু বসু, কালীশ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত মিত্র (যুগান্তর) জহর মুখোপাধ্যায়, খগেন রায়, পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ নারাং, মিঃ নারায়ণ ও আরো অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রযোজকের বিপদ

রূপশ্রী কথাচিত্রের 'সাহারা'র প্রযোজক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও থেকে তাঁর দলবল নিয়ে ফেরবার পথে যে বিপদে পড়েছিলেন, তা বেশ কৌতুককর। 'রসিদ আলি দিবসের' পটভূমিকার একটা দৃশ্য বাস্তবরূপে তোলার জন্য প্রযোজক তার দু'নালা বন্দুক নিয়ে পুলিসী গুলিবর্ষণের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলেন অন্তরাল থেকে বার কয়েক ফাঁকা আওয়াজ করে। ষ্টুডিও থেকে ফেরার পথে তাঁর বিরাট বাহিনী ও দু'নালা বন্দুক দেখে শ্বেতাংগ সৈনিক তাদের আটক করে। বন্দুকের লাইসেন্স দেখানো সত্বেও শ্বেতাংগ সৈনিক তাদের ছেড়ে না দিয়ে নিকটবর্ত্তী থানায় নিয়ে যেতে চায়। তাদের কথা হলো, এমন দিনে এত লোক ও বন্দুক নিয়ে কেন তারা পথে বেরিয়েছে। শেষে পরিচালক সুনীল মজুমদার 'সাহারা' বাণীচিত্রের সংগে দু'নালা বন্দুকের সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিতেই তবে শান্তিরক্ষক শ্বেতাংগ সৈনিকের সন্দেহ ভঞ্জন হয় এবং তাদের বিপত্তির মেঘ কেটে যায়।

ফিল্মিস্তান লিঃ (বম্বে)

এদের সিঁদুর এবং সেহানী ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিলাভ করেছে। প্রযোজক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় 'লীলা'কে নিয়ে মেতে পড়েছেন। 'লীলা'য় শোভনা, কানু রায় ও বীরাকে দেখা যাবে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন ডি, এন, পাই। 'দো ভাই' নামে অপর আর একখানি চিত্রের কাজও আরম্ভ হ'য়েছে। 'দো ভাই'র কাহিনী লিখেছেন মুন্সী দিল এবং তিনিই চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। 'দো ভাই'র বিভিন্নাংশে থাকবেন উল্লাস, কামিনী কৌশল, রাজেন হাসকার প্রভৃতি।

আর একখানি সামাজিক চিত্র পরিচালনা করবেন কিশোর সাহু। রেহেনা এবং অশোককুমারকে প্রধানাংশে দেখা যাবে।

আমেরিকায় প্রদর্শিত ভারতীয় চিত্র

দি কোর্ট ডান্সার, দানেশ্বর, ডাঃ কোটনীশ, শকুন্তলা, পর্বত পে পর আপনা ডেরা, রামরাজ্য, বিক্রমাদিত্য, হুমায়ুন—এই ভারতীয় চিত্রগুলি আমেরিকায় প্রদর্শিত হ'য়েছে।

বম্বের চিত্রশিল্পের অবস্থা

বম্বের চিত্রশিল্প একটা সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছে বলে প্রকাশ। বিভিন্ন ষ্টুডিও মালিকেরা নিজস্ব প্রযোজনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং ষ্টুডিও-হীন প্রযোজকদের ভিতরও যেন একটা শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। বরং এবিষয়ে সাম্প্রতিক যে সব প্রযোজকেরা চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদেরই তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের সাম্প্রতিক ছবিগুলিও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে। শিল্পীদের ভিতরও যুদ্ধের সময় যারা ফেঁপে উঠেছিলেন, তাদের অনেককেই এখন অবসর সময় কাটাতে হচ্ছে। বীরা, নীনা, খুরশীদ, স্বর্ণলতা, সুরাইয়া, নার্গিস, স্নেহপ্রভা, শোভনা সমরথ, সামিম, মমতাজ শান্তি, চন্দ্রমোহন, মতিলাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি যুদ্ধের সময় বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। বর্তমানে এদের অনেককেই চুক্তিহীন ভাবে সময় কাটাতে হচ্ছে।

সোহরাব মোদীর পুত্রলাভ

ভারতীয় চিত্র জগতে মোদী ভ্রাতৃবৃন্দের নাম কারো অবিদিত নেই। চিত্র ব্যবসায় এরা যেমনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হ'য়েছেন, তেমনি জনসাধারণের প্রশংসাও কম অর্জন করেননি। কিন্তু এদের কোন ভাইয়েরই কোন সন্তানাদি ছিল না। সম্প্রতি বম্বের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯শে এপ্রিল মিসেস মেহতাব মোদী একটী পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পাঠক সাধারণের স্মরণ থাকতে পারে কিছুদিন পূর্বে চিত্র পরিচালক সোহরাব মোদী চিত্রাভিনেত্রী মেহতাবের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্তানের আগমন মোদী-পরিবারে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছে। আমরা নবজাত শিশু টীর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

গীতাঞ্জলি মুভিটোন (কলিকাতা)

পরিচালক অপূর্ব মিত্র এদের হ'য়ে 'ফয়সালা' নামক একখানি হিন্দি চিত্রের পরিচালনা করছেন। চিত্রখানির সুর সংযোজনার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্তের ওপর এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন কানন দেবী, পরেশ ব্যানার্জি, আঙ্গুরী, হীরালাল, নিজাম, দেবকুমারী, পার্বতী, গোকুল মুখার্জি প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ ঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস "ধাত্রীদেবতার" চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ছায়াদেবী, অঞ্জলী রায়, রাজলক্ষী' শম্ভু মিত্র, মাষ্টার শম্ভু প্রভৃতি পরিচিত শিল্পী ছাড়াও এই ছবিতে কয়েকটি নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রকাশ, ছবিখানিতে মূলকাহিনীর মর্মবাণী যাতে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হয় পরিচালক ও প্রযোজকেরা সেদিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জের তত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ছবিখানির কাজ চলছে। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি "ধাত্রীদেবতা" মুক্তিলাভ ক'রবে ব'লে আশা করা যায়।
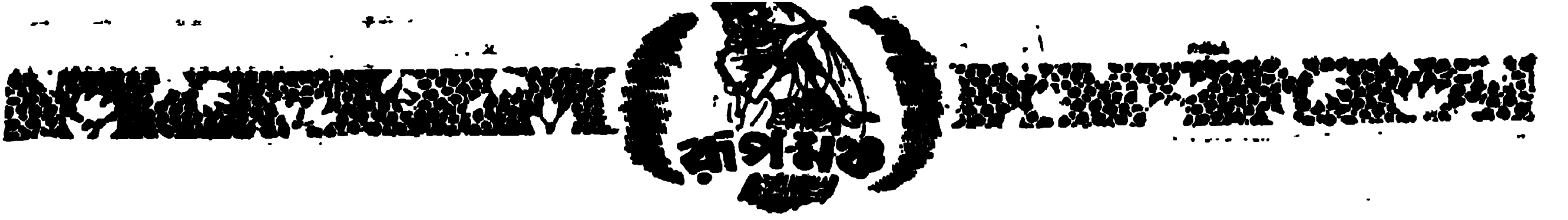
এ, আর, প্রোডাকসন

সম্ভবত এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই 'এ-আর প্রোডাকসন'-এর বাংলা বাণীচিত্র "আমার দেশ"-এর চিত্রগ্রহণ কার্য রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে শেষ হ'য়ে যাবে। ছবিখানিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অর্থ বা অন্য কোন দিক দিয়েই কার্পণ্য করেন নি। পরিচালক অনাথ মুখোপাধ্যায়ও এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন—আমরা আশা করি তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক হবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স লিমিটেডে'-এর পরিবেশনায় পূজার পূর্বেই 'আমার দেশ' একযোগে কয়েকটি জনপ্রিয় চিত্র গৃহে মুক্তিলাভ ক'রবে বলে এঁদের প্রচার সচিব নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন।

শান্তি সাধনায় মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর বিহার ভ্রমণের বাস্তবরূপ নিয়ে চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি কংগ্রেস নেতা ও বিহারের অধিবাসীদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কলকাতায় শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। চিত্রখানির প্রযোজক মেসার্স ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

মহাজাতি ফিল্ম কর্পোরেশন

নবগঠিত 'মহাজাতি ফিল্ম কর্পোরেশন' প্রথমেই একখানা রহস্যঘন বাংলা অপরাধমূলক বাণীচিত্র নির্মাণ ক'রছেন অবগত হ'য়ে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই চিত্রখানির নামকরণ হ'য়েছে "তারপর"। কাহিনী রচনা ক'রেছেন রাণী মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করবেন অনাথ মুখোপাধ্যায়। ছবিখানি প্রযোজনা ও এর সংগীতাংশ পরিচালনা ক'রবেন সত্য ঘোষ।

শতাব্দীর শিল্পী

কিরীট সেনের পরিচালনায় 'শতাব্দীর শিল্পী'-র প্রথম বাংলা সবাক্ চিত্র "শিল্পী"র চিত্রগ্রহণ কার্য অনতিবিলম্বেই সুরু হবে বলে প্রকাশ। এর কাহিনী রচনা ক'রেছেন মায়া দেবী।

রোড টু লাইফ

রাশিয়ার বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। হালকা মন দেয়া নেয়ার চিত্র 'রোড টু লাইফ' নয়। 'রোড টু লাইফ' শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির বাণী বহন করে এনেছে শিশু ও যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে চিত্রখানি সকলের পক্ষেই অপরিহার্য। ইউ-রোপে চিত্রখানি অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম উজ্জলায় মুক্তিলাভ করছে।

কয়েকখানি নূতন পত্রিকা

মহিলামহল—সম্পাদিকা অঞ্জলি সরকার ও কমলা মুখোপাধ্যায়—১৬এ ডাক ষ্ট্রীট, থেকে প্রকাশিত। **নতুন লেখনী** সম্পাদক মাধবলাল মল্লিক—৪।১।১, হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকে প্রকাশিত। **চলন্তিকা**: সম্পাদক: প্রসাদ সিংহ ও শক্তি দত্ত—৩এ ডাফ লেন থেকে প্রকাশিত। **চিত্রিতা**—সম্পাদক নিকুঞ্জ পত্রী, ৯এ কার্তিক বসু লেন থেকে প্রকাশিত।—এঁদের আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমার দেশের অগণিত দীন দুঃখী···অশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের দল···চারিদিকে তাদের অভাব আর হাহাকার··· নীচতা ও দীনতা···বাধা আর প্রাচীর—

তাদের মধ্যে মহামুক্তির মন্ত্র নিয়ে আসছে

এ. আর. প্রোডাকশন-এর
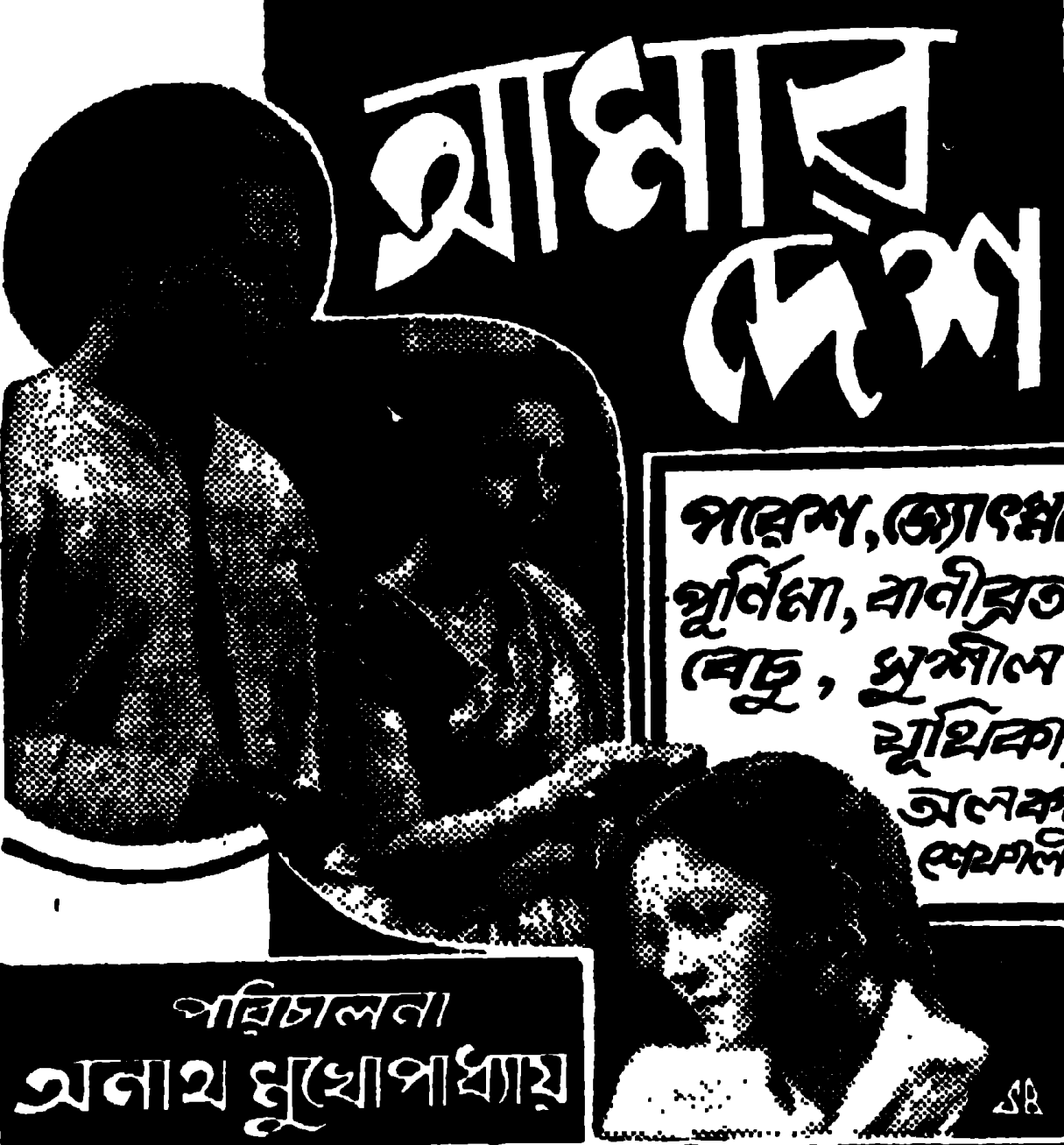
একযোগে একাধিক সম্ভ্রান্ত চিত্রগৃহে আগতপ্রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড-এর

আগামী দুইখানি অভিনব বাণীচিত্র

১) আগত ওই

২) যাদের করেছ অপমান

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

৫, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট — কলিকাতা

কতিপয় নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী আবশ্যক—সত্বর আবেদন করুন অথবা শনি ও রবিবার ব্যতীত যে কোন দিন অপরাহ্নে ২টা হইতে ৪টা মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন।

চলন্তিকা

মাসিক পত্রিকা

কার্যালয়—৩এ, ডাফ লেন, কলিকাতা—৬

ফোন : বি, বি, ৩৮১৪

প্রতি সংখ্যা—৷৷০ : ষাণ্মাসিক—৩৷৷০ : বার্ষিক—৬

★

দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ) থেকে "উদয়ের পথে"র লেখক

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

সিনেমা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে লিখবেন।

★

সম্পাদনা :

প্রসাদ সিংহ এবং শক্তি দত্ত

প্রাপ্তিস্থান :

দি বুক এমপোরিয়ম্ লিমিটেড

২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

---

* * * * মুক্তি প্রতীক্ষায় * * * *

বেঙ্গল ফিল্মের

প্রথম জীবনীমূলক বাংলা বাণীচিত্র

সাধক

রাম প্রসাদ

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য

দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন

কাহিনী ও সংলাপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ গুপ্ত

—: রূপায়ণে :—

সুজিত চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, প্রভাত সিংহ, বেচু সিংহ, তুলসী, শিশুবালা, সাবিত্রী মনি শ্রীমানী, বোকেন চট্টো, আশু বোস, নৃপতি চট্টো প্রভৃতি আরো অনেকে।

অগ্রহায়ণ :: ৬ষ্ঠ বর্ষ :: ৯ম সংখ্যা

সাম্প্রতিক প্রসংগে

সাম্প্রতিক প্রসংগে কয়েকটী কথা বলতে চাই। 'সাম্প্রতিক প্রসংগে' বলতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা—মধ্যবর্তী-কালীন জাতীয় সরকার—অথবা গণ-পরিষদের কথা আমাদের পাঠকদেব মনে উঁকি মারাই স্বাভাবিক। তাই, প্রথমেই বলে রাখছি, আমার আলোচনার বিষয় বস্তুর সংগে সরাসরি এর কোন যোগ নেই। বৃহত্তর রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে, আমি এখানে তার অবতাড়না করতে আসিনি। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আমাদের চিত্র ও নাট্যজগত কতখানি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হ'য়েছে—তা নিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদুনি গাইবার ইচ্ছাও আমার নেই। এতে যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় চিত্র বা মঞ্চ ব্যবসায়ীরা মনে করেন, আমি একটা পাষণ্ড—মস্তবড় পাষণ্ড, তাও আমি মাথা পেতে নেবো। তবে প্রতিবাদে শুধু এইটুকু বলবো—দেশের বুকের ওপর দিয়ে যে ঝড় বাতাসই বয়ে যাক না কেন—দেশবাসী বলে দেশের শান্তি ও সম্পদের দিনে যেমনি নিজের প্রাপ্য অংশটুকু গ্রহণ করে থাকি, তেমনি দুর্দিনেও সবল বীরের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবার সহনশীলতাও যদি না থাকে—দেশবাসী বলে গর্ব করবার আমার কী অধিকার আছে? সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দেশের কতখানি ক্ষতি হ'লো—নিজেদের কাপুরুষোচিত ঘৃণ্যতায় বলির পশুর মত যাদের মাথা এগিয়ে দিতে হ'য়েছে—মায়ের কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা হ'য়েছে—দয়িতের সামনে যেখানে দায়িতাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'তে হ'য়েছে—আমাদের যদি কিছু অনুশোচনা করবার থাকেত তাঁদেরই জন্য। আমাদের চোখের পাতা যদি জলে ভেবে ওঠে,—তা তাঁদেরই জন্য। আর অনুশোচনা করবো নিজেদের ভিতর যে পাশবিক প্রবৃত্তি মাথা উঁচু করে উঠেছিল তারই জন্য। আমার কত টাকা লোকসান হ'লো—সেইটেই বড় কথা নয়। যে অন্যায় আমাদের মাছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—যে অন্যায়ের শিখা ধূমায়িত হ'য়ে ধীরে ধীরে চিত্র ও নাট্য জগতের নির্মল আকাশকে ছেয়ে ফেলতে আসছে—আমাদের অনুশোচনা, আমাদের সতর্ক বাণী তারই সম্পর্কে।

ইতিপূর্বে—ইতিপূর্বে বলতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পূর্বে—দু'একজন পাঠক চিত্রজগত সম্পর্কে যে অলীক সাম্প্রদায়িক অভিযোগ এনেছিলেন—আমরা তার ভিত্তিহীনতা প্রমান করে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছি। চিত্রজগতের-অলি-গলি আনাচি-কানাচি ঘুরে, গর্বের সংগেই তখন এ রায় দিতে পেরেছিলাম—না সাম্প্রদায়িকতার কোন বিষ আমাদের চিত্র-জগতের [illegible] ভিতর [illegible] পারেনি। [illegible] গত ১৬ই আগষ্টের হাঙ্গামার পর থেকে আমাদের পরস্পরের মাঝে [illegible]—তার প্রভাব আর চিত্রজগতেও যে এলো না

---দাঙ্গাবিধ্বস্তদের সাহয্যার্থে---

যাঁরা আমাদের কাছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের নির্দেশ মত বিভিন্ন সাহায্য-কেন্দ্রে সে অর্থ আমরা পৌঁছে দিয়েছি।

১। অমূল্য মুখোপাধ্যায়——৫০:৲
নীলমণি দাস মারফত (যশোয়াল রিলিফ ভাণ্ডার)

২। ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স——৫১৲
(হিন্দুমহাসভা)

৩। গৌরচন্দ্র সাহা——১০৲
(ফরিদপুর সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি)

৪। শ্রীযুক্তা রাধারাণী মিশ্র——২১০
(ফরিদপুর সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি)

অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই—কোন একটী বিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠানের জন্য পুরুষ এবং মহিলা শিল্পী চাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ পক্ষে ৫,০০০৲ টাকার শেয়ার ক্রয় অথবা বিক্রয়ের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন—তাদের আবেদনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিস্তারীত বিবরণের জন্য আবেদন করুণ। রূপ-মঞ্চ : বক্স নং ৫।
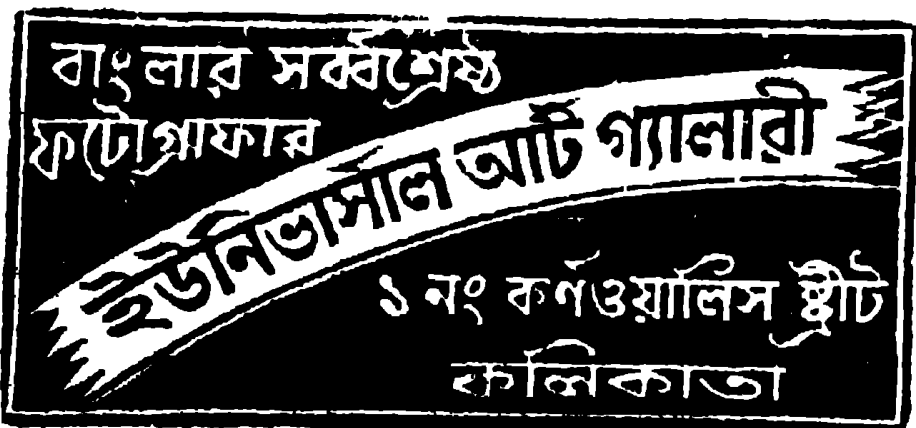
লেগেছে তা নয়। এবং আমাদের সাম্প্রতিক সমস্তার ভিতর থেকে—তাই তাকে বাদ দিতে পাচ্ছিনা। আজ যে বিষ-বৃক্ষের বীজ মাথা গজিয়ে উঠেছে—তাকে যদি অঙ্কুর থেকে বিনষ্ট করা না হয় - চিত্রজগতের উন্মুক্ত আকাশ থেকে যে স্বচ্ছ চাঁদিমার বিচ্ছুরিত আলো তার উদারবক্ষকে ঝল মল করে তোলে—তা কী আর কোনদিন আমরা প্রতিভাত দেখতে পাবো!

বম্বে, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বহু মুসলমান বন্ধু হিন্দুদের পাশাপাশি এসে চিত্রজগতে প্রবেশ করেছেন। হিন্দু প্রযোজকেরা যেমনি ভারতের কৃষ্টি ও অগ্রগতির পথে চিত্র-শিল্পের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁরাও সে উপলব্ধি থেকে দূরে সরে থাকেন নি। তাঁরা হিন্দু বা মুসলমান এই বিশেষ ছাপ নিয়ে আসেন নি—তাঁরা এসেছেন চিত্র ব্যবসায়ী রূপে—কৃষ্টির সাধকরূপে। আমরা—দর্শকেরা তাঁদের নৈপুণ্যের তারতম্য বিচার করে—পৃষ্ঠপোষকতা করেছি, অভিনন্দন জানিয়েছি—নিন্দাও যে না করেছি তা নয়। আমাদের দর্শকদেরও কোন সাম্প্রদায়িক-গোষ্ঠী নেই। বাংলার চিত্রজগত কেবল হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল বলে যদি কেউ অভিযোগ আনেন—সে অভিযোগ অতীতে যেমন স্বীকার করিনি—বর্তমানেও করবো না। কারণ, প্রথম কথা মুসলমান ব্যবসায়ীরাই চিত্রজগত থেকে দূরে সরে ছিলেন—দ্বিতীয় কথা বাংলার প্রযোজক গোষ্ঠীও সাম্প্রদায়িক ছাপ নিয়ে প্রবেশ করেননি—নিছক ব্যবসায়ী এবং কৃষ্টির সাধকরূপেই তাঁদের আগমন।' আজ চিত্র-জগতে কয়েকজন মুসলমান বন্ধুদের আগমন দেখতে পাচ্ছি। এই আগমনকে যে-কোন বাঙ্গালী সাদরে অভিনন্দন জানাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের—এঁদের এই আগমনের সংগে সংগে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আমাদের সবাকার মনে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ ছড়িয়ে গেল—তাকে যদি ধ্বংস না করি প্রথম থেকেই—তবে এই দুর্ভাগ্য কী চিরদিন আমাদের সৌভাগ্যকে ঢেকে রাখবে না? যে অভিযোগ একদিন দৃঢ়তার সংগে অস্বীকার করেছি—আজ সেই অভিযোগের উত্তর দিতে

রূপ-মঞ্চ

না হ'লেও—আশঙ্কায় আমাদের মনের দৃঢ়তা কেঁপে উঠেছে—এও কী কম দুর্ভাগ্য।

মুসলমান প্রযোজকের চিত্রমুক্তি সম্পর্কে হিন্দু ব্যবসায়ী বলছেন—'মশায় আপনি যে মুসলমান তা যেন কেউ না জানেন—এর মাঝেই কয়েকজন দর্শক জেনে ফেলেছেন যে. আপনি মুসলমান—তাই দর্শকেরা ধমকী দেখিয়ে গেছেন—তাঁরা প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে ফেলবেন, চুরমার করে ফেলবেন।' আবার মুসলমান প্রদর্শক হিন্দু পরিবেশককে বলছেন—আপনার ছবিতে হিন্দু অভিনেতা মুসলমান চরিত্রে অভিনয় করছেন—এ ছবি আমার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলে মুসলমান দর্শকেরা আমার প্রেক্ষাগৃহ পুড়িয়ে দেবেন বলে শাসিয়ে গেছেন।' এছাড়া এমনও আমরা শুনতে পেয়েছি—মুষ্টিমেয় মুসলমান শিল্পী বা কর্মী যাঁরা আছেন চিত্রজগতে—তথা-কথিত হিন্দু শিল্পী এবং কর্মীদের বহু টিটকারীই নাকি তাঁদের সহ্য করতে হ'য়েছে বা হ'চ্ছে। কয়েকটি চিত্র প্রতিষ্ঠান কয়েকজন মুসলমান যুবককে সুযোগ দিয়েও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্য তাঁদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন—এ সংবাদও আমাদের কানে এসেছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আমাদের কতখানি আর্থিক ক্ষতির কথা ছেড়েই দিলাম—নৈতিক ক্ষতি করেছে—যে কোন উদারনৈতিক হিন্দু এবং মুসলমানই তা স্বীকার করবেন। চিত্রজগতের চাট-চামুণ্ডাদের কথা বাদ দিলাম—একথা এখনও বাঙ্গালী দর্শকদের সম্পর্কে বলবার অধিকার এবং দৃঢ়তা আমাদের আছে—বাংলার চিত্রামোদীরা এই সাম্প্রদায়িক নীচতা থেকে এখনও বহু উর্দ্ধে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিত্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থকে সিদ্ধ করবার জন্য চিত্রামোদীদের ঘাড়ে যে অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছেন—তারই দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক প্রতিবাদ।

তবু—তবু আমাদের চিত্রামোদীদের কাছে কয়েটা কথা বলবার আছে বৈকী? কোন কার্য সিদ্ধির জন্য যখন আমরা কোন সংকল্প-বাণী গ্রহণ করি—কার্য সিদ্ধি না হওয়া অবধি নির্দিষ্ট দিনে মনের দৃঢ়তার জন্য আবার সেই সংকল্প বাণী নূতন করে গ্রহণ করি। ভারতের মুক্তির জন্য আমাদের অগ্রগামীরা যে সংকল্প-বাণী গ্রহণ করেছিলেন—আজও প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী আমরা সে সংকল্প-বাণী গ্রহণ করে থাকি। এই নূতন করে সংকল্প গ্রহণে—আমাদের মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়—আমাদের আকাঙ্খিত বস্তুটী পাবার জন্য আমরা নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হ'য়ে উঠি। তেমনি একপক্ষ আজ যখন দর্শক-দের ঘরে অভিযোগের বোঝা চাপাতে চাইছেন—যদি আমাদের কারো মাঝে সেরূপ কোন সাম্প্রদায়িক বীজ মাথা গজিয়ে থাকে—তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্য চিত্রামোদী-দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আবেদন জানাবো বাংলার চিত্র ও নাট্য মঞ্চের সংগে সরাসরি ভাবে যেসব শিল্পী ও কর্মী বন্ধুরা জড়িত আছেন তাঁদের কাছে—আর যাঁরা চিত্র ও নাট্যমঞ্চের পুরোভাগে রয়েছেন তাঁদেরও কাছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—যে উন্মাদনায় আমরা মেতে উঠেছি—তার পেছনে কোন সত্য নেই। যে জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় আমরা দিচ্ছি, কোন সভ্য সমাজে তা আদৃত হ'তে পারেনা—তার পরমায়ু ক্ষণিকের। পরস্পরের ভুল বোঝা-বুঝির স্থায়িত্বটুকু অবধি। তাই, প্রত্যেক প্রগতিবাদী জাতীয়তাকামী হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণকে এই হীনতাকে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য আমরা আবেদন করছি। আশা করি আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হবে না। পাশাপাশি বংশ পরাম্পরগত ভাবে যেমনি আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বসবাস করে এসেছি—আজও তার কোন ব্যতিক্রম হবেনা। তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন—তৃতীয় পক্ষের উসকানীতে যতই নাচানাচি করুন না কেন—, হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ কঠোর ভাবেই তাদের এই 'নাচন' বন্ধ করবে। তৃতীয় পক্ষ অন্তরাল থেকে যতই চাতুরী খেলুন না কেন—সামাজিক ও রাজ-নৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এক সংগে আমরা তাদের ব্যয়নেটের সামনে বুক পেতে দেবো—হিন্দু মুসলমান চল্লিশ কোটী জনসাধারণের গুলবাগ এই ভারতবর্ষ থেকে বন্ধ করবো বৈদেশিক বেনিয়াদের সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচার। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ ভুলে চল্লিশ কোটী মানবাত্মার মুক্তির যে আহ্বান-ধ্বনি ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে ছড়িয়ে প'ড়েছে—আমাদের চিত্র ও নাট্য জগতের শিল্পী ও কর্মী—ব্যবসায়ী ও দর্শক—সবাইকে তার সংগে সুর মিলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠতে আবেদন জানাবো। 'জয়হিন্দ'। শ্রীকাঃ

নবগঠিত এ, সি, মুখার্জি এ্যাণ্ড ব্রাদার্স লিঃ এর প্রথম বিশেষ এবং সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রতিষ্ঠানের সভ্য, কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের ফটো। বসে ডান দিক থেকে : মিঃ এ, সি, মুখার্জি (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর), এস, সি মুখার্জি (ডাইরেক্টর), কুমারী লতিকা গাঙ্গুলী (ডাইরেক্ট্রেস্), ভবতারিণী দেবী—মালা গলায় (মুখার্জি ব্রাদার্সের মা এবং প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী), কুমারী শ্যামলী মুখার্জি (ডাইরেক্ট্রেস্), প্রীতি দেবী (সভ্যা), এবং একদম বাঁদিকের শেষে "রূপ মঞ্চ" সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়কেও দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে বাম দিক থেকে : এম বোস, আর বৈদ্য, বি মিত্র, বি মণ্ডল, এস ঘোষাল, এস দে, পি মুখার্জি, বি পাল, বি মুখার্জি, টি মুখার্জি, কে চক্রবর্তী, এস দাস—প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ। পেপার মিল, প্রেস, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটী গড়ে উঠেছে—ফরিদপুরের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণ দাস এবং শ্রীযুক্ত যতীন ভট্টাচার্যের শুভেচ্ছা নিয়ে এঁরা কাজে নেমেছেন—দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থই প্রতিষ্ঠানের কাছে সবচেয়ে বড়। ফটো—ডি. রতন।

আপনার জাতীয়-বাহিনীকে বাঁচান

শ্রীরবীন মল্লিক (এ, রায়)

★

গত শারদীয়া সংখ্যায় আমি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে F. P. U. বা Field Propaganda Units এর বিষয়ে কিছু বলেছিলাম এবং F. P. U.-র কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইংগিত করেছিলাম। এবার আমি প্রচার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, যে-কোন সরকারই হোক না কেন, জনসাধারণের আস্থা লাভ করবার জন্য তাকে নানাভাবে প্রচার বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হ'তে হয় এবং এই প্রচারকার্য, যে যত ভালরকম চালু করতে পারবে অর্থাৎ সুষ্ঠু ও সংযত প্রচারকার্যই জনসাধারণকে তার নিজস্ব সরকার সম্বন্ধে সচেতন কোরে তুলবে,—আর জনসাধারণ সেই সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা জ্ঞাপন করবে।

আমাদের সরকারও (Provisional Govt. of Azad Hind) ভারতীয় জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য সর্বাধিক উপায়ে প্রচারকার্য চালাত। এবং এই প্রচারকার্যের মূলে ছিল,—জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে এই সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা। একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান শুধু জাতীয় প্রতিষ্ঠান বললে ভুল হ'বে,—একটা পরাধীন জাতির স্বাধীন প্রতীক,—স্বাধীন প্রতিনিধি, একটা অস্থায়ী স্বাধীন সরকার,—যা'র না আছে কোনো উপনিবেশ বা নিজস্ব ভূমি,—যে স্বাধীন সরকার পর রাজ্যে বিদেশীর বদান্যতায় গড়ে' উঠে—মানবজাতির ও স্বাধীনতার চির শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে সেই সরকারকে ঠিকভাবে বাঁচতে হ'লে প্রয়োজন—জনসাধারণের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছা ও অর্থ সাহায্য।

কিন্তু, জাপানীদের সহযোগীতায় পর-রাজ্যে একটি স্বাধীন সরকার গড়ে' উঠেছে, এবং সরকারই তাঁর মাতৃভূমি পুণ্য তীর্থ পরাধীন দেশকে উদ্ধার করবার জন্য পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে একথা বললেই কি স্বাধীন সরকারের স্বদেশবাসীরা,—তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে এই সরকারকে রণসাজে সজ্জিত ও সমরোপকরণ কেনবার জন্য অর্থ সাহায্য করবে? একথা বললে কি ভুল বলা হবে না?—

সত্যি কথা বলতে গেলে—এভাবে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় না, কারণ, যারা অর্থ দেবে—তারা যদি দেশের চেয়ে, অর্থটাকে বড় বলে' স্বীকার করে তো—তা'দের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়াটা কি সুদূর পরাহত ও কঠিন নয়! কঠিন শিলার অন্তঃস্থল থেকে সুপেয় জল নিষ্কাসন কি খুব সহজ? ব্যাপারটা বোধ হয়, ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলা হ'ল না। সত্যের খাতিরে পরিষ্কারভাবে সমস্যাটার সমাধান করা যাক্।

আমার বক্তব্য, আজাদ হিন্দ সরকার পরিচালনা ও আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিপালনের জন্য, আমাদের প্রয়োজন ছিল অর্থের,—সে দু'এক লক্ষের কথা নয়, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রয়োজন কোটি কোটি টাকার! কিন্তু, সে টাকা দেবে কে?—আপনারা বলবেন, কেন—ভারতবাসীরা—আমিও বলবো,—নিশ্চয়ই, আজাদ হিন্দ সরকারকে পরিচালনা করবার ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়ীত্ব ভারতবাসীর, তারা অর্থ সাহায্য না করলে —আর কে করবে!'

কিন্তু, এর-মধ্যেও আবার কিন্তু এসে পড়ে! অর্থাৎ, সে সময় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপানী অধিকারের পর সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় যেসব ভারতবাসী ছিল, তারা অধিকাংশই ব্যবসায়ী—শুধু ব্যবসায়ী বললে ঠিক হ'বে না,—পাকা ব্যবসায়ী ও অর্থ পিশাচ। তারা অর্থটাকে তা'দের স্ত্রী পুত্র পরিবার—এমন কি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলেই ভাবতো দেশ প্রেমিক না বলে তাদের সোজা কথায় বলা চলতো—অর্থ-প্রেমিক। সেক্ষেত্রে রাজনীতির আবর্তে প্রবেশ করবার আগ্রহ তো তা'দের ছিলই না—পরন্ত শত নয়—সহস্র হস্তেন—দূরে থাকাটাই তারা মনে করতো বুদ্ধিমানের

কাজ। যেখানে জাপানী সামরিক বাহিনীকে যে কোনো জিনিষ সরবরাহ কোরে দু'পয়সা রোজগার করা যায়,—সেখানে নিরস রাজ-নীতি চর্চায় অর্থ ও সামর্থ দুই নষ্ট কোরে লাভ কি?—

অবশ্য, এর মধ্যেও কথা আছে! এইসব ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁরা চালাক তাঁরা দেখলেন যে,—এই সুযোগে লীগে যোগদান কোরে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নেওয়া যাবে,—তাঁরা এসে সোৎসাহে আমাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ বা 'Indian Independence League'এ যোগদান করলেন।

এইভাবে ভেতর ও বাইরে থেকে শোষিত হ'য়ে হয়ত Indian Independence League বেঁচে থাকতে পারতো,—কিন্তু, তা'তে তো আর তা'র শৈশবত্ব ঘুচ্‌তো না,—আর, আজকের আজাদ হিন্দ সরকারের মত বিরাট মহীরুহ রূপে আপন গর্বে ও বীরত্বে—ভারতের আবাল বৃদ্ধ-বণিতার শ্রদ্ধা ও সদিচ্ছা লাভও করতে পারতো না!—

তাই, এইসব অর্থশোষক বেনিয়া ভারতবাসীদের অন্তরে দেশ-প্রেমের দীপ-শিখা জ্বেলে দেবার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, এবং এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল স্বাধীন অস্থায়ী সরকারের, প্রেস ও প্রচার বিভাগ (Publicity, Propaganda & Press Dept, Provisional Government of Azad Hind)—যা'র সংগে আমি ছিলাম ওত-প্রোতভাবে জড়িত!

আমরা যে আমাদের ৪০ কোটি অসহায় পরাধীন ভাই-বোনের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছি! এবং প্রস্তুতির মূলে রয়েছে পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়দের একনিষ্ঠ সহযোগিতা, সাহায্য ও সহানুভূতি,—তাদের সাহায্য বিনা আমরা আমাদের ও স্বাধীনতার চির শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোরে, নিগৃহীত ও নিপীড়িত পরাধীন ভারতবাসীদের কোনদিনই স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুর আস্বাদন দিতে পারবো না—একথা বোঝাবার জন্য, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হ'য়েছে। এবং সেই চেষ্টার ফলেই, সমগ্র পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রাণে জেগে উঠেছিল,—জাতীয়তাবোধ,—তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল একতা, বিশ্বাস আর আত্মত্যাগের উদ্দীপনা,—যে তিনটে ছিল আমাদের ত্রিরঙ্গা জাতীয় নিশানের প্রতীক—Unity, Faith and Sacrifice.

এ ছাড়া সে সময় আমরা জনসাধারণকে দেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে সজাগ করবার জন্য কয়েকটি Slogan এর সাহায্য নিয়েছিলাম! এইসব Slogan যা'তে ভারতের সমগ্র প্রদেশের অধিবাসীরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে,—তারও ব্যবস্থা আমরা কোরেছিলাম!

Slogan গুলির মধ্যে ছিল,—"Do or Die"—"করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে", "Liberty or Death", আজাদী ঔর মৌৎ, "Mass conscription" গণ-বাহিনী গঠন,

কানাই লাল পাচাল

বয়স ২৫, উচ্চতা ৬ ফিট। রং ফর্সা—সংগীতানুরাগী। মটর, মটর-সাইকেল, সাইকেল চালাতে জানেন—সাঁতার কাটা ও ঘোড়ায় চড়তে পারদর্শী। সিনেমায় অভিনয় করতে চান। ২০৮, বিলিয়াস রোড হাওড়া (ফোন হাওড়া ৪৫৯) বর্তমান ঠিকানা।

Total mobilizatin," "সর্বস্ব ত্যাগ" "কর সব্ নিছবার্ বন সব্ ফকির্"

শুধু এগুলি প্রচার কোরেই আমরা যে চুপচাপ থাকতাম তা নয়। এগুলি প্রচারের ফলে জনসাধারণের উপর কি ভাবে এর প্রতিক্রীয়া হ'ত,—আর জনসাধারণ এইসব Slogan গুলি কিভাবে গ্রহণ করতো সেটাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম এবং সেইভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রচার-ক্ষেত্র প্রসার করাতাম। এবং এইসব Slogan এর অর্থ যা'তে নিরক্ষর জনসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে, সেজন্য আমাদের প্রচার-ভ্যান্ অর্থাৎ উচ্চরব (Loud Speaker) বিশিষ্ট টহলদারী মোটর ভ্যানের ব্যবস্থাও করতে হ'য়েছিল। আর এইসব টহলদারী প্রচার ভ্যানের মধ্যে থাক্‌তো—বিভিন্ন ভাষাবিদ্ প্রচারক বৃন্দ!

এসব ছাড়া, অর্থাৎ টহলদারী প্রচারক দ্বারা প্রচার কার্য ছাড়াও,—আমরা হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্প্লেট, সংবাদপত্র, ও জনসভা আহ্বান দ্বারা পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতাম।

ব্রহ্মদেশে সাধারণতঃ কুরঙ্গী ও মাদ্রাজীদের ভীড় ছিল বেশী! কুরঙ্গী ও মাদ্রাজী—এরা যদিও মদ্র দেশের অধিবাসী,—কিন্তু বিভিন্ন ভাষা দ্বারা তারা তাদের মধ্যে হাবভাব আদান প্রদান করতো! কুরঙ্গী ছিল শ্রমিক শ্রেণীর, তাদের ভাষা তেলেগু, আর ভদ্র শ্রেণীদের ভাষা ছিল তামিল। তাছাড়া,—উড়িয়া, গুজরাটি, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীও ছিল। সেজন্য, আমাদের বিভিন্ন ভাষায়—হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্ফলেট ও সংবাদপত্র ছাপ্‌তে হ'ত।

আমরা সাধারণতঃ, ইংরাজী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, উড়িয়া, উর্দু ও রোমান হিন্দীতে দৈনিক সংবাদপত্র ছাপতাম। কিন্তু, পরে গুজরাটি ও উর্দু ভাষার সংবাদপত্র অল্প চাহিদার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর, আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু, দৈনিক সংবাদপত্র ছাপবার উপযুক্ত, বাংলা অক্ষরের অভাবেই আমাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয় নি।

হ্যাণ্ডবিল বা প্যাম্ফলেট সাধারণতঃ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু ও উড়িয়া ভাষায় ছাপা হ'ত—এবং এগুলি সমস্ত সদর দপ্তরে অর্থাৎ রেঙ্গুনেই ছাপা হ'ত, আর ছাপা হ'বার পর,—ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলাগুলির ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian Independence League) শাখা অফিসে—সেই স্থানের Chairman এর নামে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

বিভিন্ন জেলার ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের Chairman-দিগের কাজ ছিল এইসব হ্যাণ্ডবিল বা প্যাম্ফলেট ও সংবাদ পত্রগুলি প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখা ও সুদূর গ্রামগুলির ভারতীয়দের মধ্যে এগুলি বিলি করা।

Publicity, Propaganda ও Press Department এর Press Section এর আমিই ছিলাম in-charge এবং আমার দায়ীত্ব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতগুলি সংবাদপত্র যা'তে সময়মত ও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়, তার ব্যবস্থা করা,—হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্ফলেট প্রভৃতি ছাপবার ব্যবস্থা, এমনকি, সামরিক কার্যের যেকোন গোপনীয় প্যাম্ফলেট বিশেষ সতর্কতা সহকারে ছেপে, সেগুলি সামরিক দপ্তরে পৌঁছে দেওয়ার দায়ীত্ব, সবকিছুই আমার করতে হ'ত! তাছাড়া, এই সব সংবাদপত্র প্রভৃতি যা'তে ঠিকভাবে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা অফিসে—পৌছায় তারও ব্যবস্থা করতে হ'ত আমায়। এবং এইসব প্রচারমূলক সংবাদপত্র প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের সুদূরবর্তী স্থানগুলিতে (যথা—লাসিও, ভামোমিচিনা প্রভৃতি স্থানে) বা ব্রহ্মের বাইরে মালয়, ইণ্ডোচীন, সিঙ্গাপুর (সোনান) শ্যাম প্রভৃতিতে পাঠাবার জন্য আমাদের জাপানী সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হ'ত। এই সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেবার অর্থ ইয়োকুয়া বা হিকারী কিকান—অর্থাৎ ভারত গভর্ণমেণ্ট ও জাপানী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে Liaison অর্থাৎ সংঘটনকারী দপ্তর!

প্যাম্ফলেট, হ্যাণ্ডবিল ও সংবাদপত্র ছাড়া, আর একদিক থেকে আমরা প্রচারকার্য চালাতাম! সেটা হ'চ্ছে প্রচার পুস্তিকা (Propaganda booklet, Pictorial Pamphlet) বা সচিত্র প্রাচীর পত্র।

প্রচার পুস্তিকাগুলি সাধারণতঃ, নেতাজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যেসব বক্তৃতা দিতেন সেগুলি, যা'তে সুদূর পল্লীর ভারতীয়েরা জানতে পারে,—সেই উদ্দেশ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে বিভিন্ন ভাষায় ছেপে বিলি করা হ'ত! এইভাবে নেতাজীর "Revolution what it is," "বিপ্লব কি", "On to Delhi," "দিল্লী চল", "Flood Bath." "রক্ত-তর্পণ" Inquilab Zindabad" "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্" "Intiqum Zindabad" "প্রতিহিংসা দীর্ঘজীবী হোক্" "Netaji-Ki Joi" "নেতাজীর জয়" প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকা ইংরাজি ও তামিল ভাষায়, ছাপা হ'য়ে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে পাঠানো হ'ত।

রোমান হিন্দীতে যে দৈনিক সংবাদপত্রটি ছাপা হ'ত, তার সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাসিম। এবং এই সংবাদপত্রটি আজাদ হিন্দ ফৌজের (স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনী) নিজস্ব সংবাদপত্র ছিল! অবশ্য রোমান হিন্দী ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য অন্যান্য ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রও পাঠানো হ'ত।

আমাদের এইভাবে প্রচারের ফলে,—পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অদ্ভুদ জাগরণ এসেছিল। জাগরণ এসেছিল মানে পূর্ব এশিয়ার যেসব ভারতীয় বণিকেরা শুধু অর্থটাকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতো,—অর্থাৎ যারা ছিল মনে প্রাণে অর্থ-প্রেমিক, —কয়েকজন উৎকট Pro-British—(ধামাধরা জোহুকুম দলীয় বৃটিশ পক্ষ) ছাড়া,—তাদের অধিকাংশই দেশাত্মবোধে, উদ্বেলিত হ'য়ে, স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য তা'দের সর্বস্ব পণ করে বোসেছিল!

শোচনীয় অবস্থা হ'য়ে উঠেছিল এইসব ধামাধরা জোহুকুম দলীয় প্রো-বৃটিশদের। কারণ, I. M. P. (Indian Military Police) ও J. M. P. (Japanse Military Police কিংবা কিম্প্যাথাই) কখন তা'দের উপর নেকনজর পাত করবে,—এই ভয়ে তা'দের প্রথমতঃ সর্বদা থাকতে হ'ত সশঙ্কিত,—দ্বিতীয়তঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধু I. M. P. ও J. M. P.র দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাদের বাধ্য হ'য়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সংস্পর্শে থাকতে হ'ত! এত সতর্কতা সত্ত্বেও J. M. P. ও I. M. P.র শ্যেনদৃষ্টি থেকে অনেক সময় তারা আত্মরক্ষা করতে পারতো না! ভণ্ডামী ও চালাকী দ্বারা যে কোন সৎকার্য করা যায় না,—তার প্রমাণ দিত এইসব, "Yes Sir" এর দল!

দেশকে স্বাধীন করতে হ'বে—৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হ'বে—এই দৃঢ় পণ নিয়ে যখন পূর্ব এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়েরা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের পতাকাতলে এসে সম্মিলিত হ'ল—সেসময় ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে রণ-দামামা বেজে উঠেছে!—জেগে উঠেছে,—স্বাধীন ভারতের জাতীয়—বাহিনীর বিজয় উল্লাস—তারা এগিয়ে চলেছে দিল্লীর পথে, অকুণ্ঠিত চিত্তে, দৃঢ়পদে, নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে,—এগিয়ে চলেছে,—এগিয়ে চলেছে দিল্লীর লাল কেল্লার শীর্ষে ত্রিবর্ণ জাতীয় নিশান উড়াবার জন্য, এগিয়ে চলেছে জয় যাত্রার পথে নির্ভীক হৃদয়—বীর মুক্তি সেনার দল!—

"অগ্নি-মন্ত্রে বলির মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
তাজা রুধিরের উৎসব লাগি,
করে সবে অভিযান।"

ঠিক এইসময় আমাদের আজাদ হিন্দ সরকারের প্রয়োজন হ'ল, অর্থের! বিজয়ী মুক্তি-সেনার জয় যাত্রার পথ মসৃণ করবার জন্য কোটি কোটি টাকার জন্য, প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট আমরা আবেদন জানালাম!

এই আবেদনের নাম ছিল,—"Feed your Army Campaign." (আপনার জাতীয় বাহিনীকে বাঁচান)

সত্যি, এবার এই আবেদনের যে জবাব পাওয়া গেল, —তা' অভূতপূর্ব, অপূর্ব! প্রবাসী ভারতীয়েরা দেশমাতাকে ভালবাসে, এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তারা, দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজেদের যথাসর্বস্ব এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়,—এই কথা প্রমাণ করবার জন্য তারা যেন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিল!

রূপ-মঞ্চ

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল "আপনার জাতীয় বাহিনীকে বাঁচান"—এই আন্দোলনের সাহায্যে,—ধনী, দরিদ্র নর-নারী সকলের কাছ থেকেই কিছু কিছু চাঁদা গ্রহণ করে,—জাতীয় বাহিনীকে পুষ্ট করা! এবং সেই সংগে জাতীয় বাহিনী যে গণতন্ত্রের চিরশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করছে, এই সংবাদের সাহায্যে ভারতীয়দের মনে নব আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা! এইজন্য আমরা, ছোটোখাটো টিকিট করেছিলাম এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রত্যেকটি শাখার—চেয়ারম্যানদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া ছিল যে—তাঁরা যেন সেই টিকেটের বিনিময়ে—যে যা দেবে বিনা প্রতিবাদে,—সেই অর্থ বা জিনিষ গ্রহণ করেন!

এই টিকিট ছিল দু'রকম! "Feed your Army" এবং "Clothe your Army Campaign".

এই আন্দোলনের জবাবে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হ'ল! ধনী ব্যবসায়ীরা তো যা'র যতদূর সাধ্য কাপড় অর্থ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে লাগলোই—এমন কি অতি নিঃস্ব দরিদ্র—নর-নারী পর্যন্ত কেউ আধগজ কাপড়,—কেউ একগজ কাপড়,—কেউবা—একটা ছেঁড়া জামা,—বা, কাপড়,—কেউবা—সামান্য সঞ্চয় থেকে ২।৪ পয়সা—এনে এই মহান উদ্দেশ্য সাধনার্থে দান করতে লাগ্‌লো!

এই আন্দোলনে এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে—যে অতি দরিদ্র নর-নারী, তা'দের অতি সামান্য মুষ্টান্নের—ভাগ দেবার জন্য এগিয়ে এসেছে,—এ দৃশ্য বর্ণনার অতীত, শুধু মহান ভারতীয়, যাঁরা সত্যি দেশকে ভালবাসতে শিখেছেন, তাঁরাই মাত্র এভাবে তাঁদের জাতীয় বাহিনীকে রণজয়ের জন্য, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য দিতে পারেন, এই অতি দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান—ভারতীয়ই সেদিন—মুক্তি-সেনা বাহিনীর মনে এনে দিয়েছিল অপূর্ব পুলক—জাগরণের প্লাবন তাঁদের এগিয়ে দিয়েছিল—জয়-যাত্রার পথে!—চল্ দিল্লী, জয়-হিন্দ!

সোভিয়েট সংগীতজ্ঞদের প্রসংগে

[এক]

[সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ, চলচ্চিত্র, ব্যালেট প্রভৃতি নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রসংগে সোভিয়েটের কয়েকজন সংগীতজ্ঞের পরিচিতি দিতে প্রয়াস পাবো। এই পরিচিতি আমরা সংগ্রহ করেছি ইগোর ফেডেরোভিচ্ বোয়েল্‌জা (Igor Federovich Boelza), লিখিত 'সোভিয়েট মিউজিসিয়ানস' নামক পুস্তকখানি থেকে। যাঁরা বিস্তারীত ভাবে সোভিয়েটের সংগীতজ্ঞদের সম্পর্কে জানতে চান—তাঁরা উক্ত পুস্তকখানি পড়তে পারেন। ইগোর ফেডেরোভিচ্ বোয়েল্‌জা—নিজেও একজন সংগীত-বিশারদ। কিয়েভ কনসারভেটোইরীতে (Kiev Conservatoire) প্রথম তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। 'কিয়েভ ফিলম ষ্টুডিও'র সংগীত বিভাগের ভার নিয়েও তিনি অনেক দিন ছিলেন—এবং 'কিয়েভ ইনসটিটিউট অফ সিনেম্যাটোগ্রাফীতে'ও অধ্যাপনা করেন। 'সোভিয়েট মিউজিক' পত্রিকার সম্পাদনা করতেও তাঁকে আমরা দেখতে পাই। তারপর 'ইউক্রেনিয়ান মিউজিক্যাল পাবলিকেশনে'র দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৪১ খৃঃ তিনি মস্কোতে আসেন। আমরা এই প্রতিভার উদ্দেশ্যে দূর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—আর এই প্রসংগে এ্যালান বুস (Alan Bush) এবং তাঁর প্রকাশক পাইলট প্রেস লিঃ-কেও আমাদের স্বীকৃতির সংগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি]

ম্যারিয়ান ভি, কোভাল—

(Marian V. Koval)

ম্যারিয়ান ভি, কোভাল ১৯০৭ খৃঃ-এ ওলোনেজকা (Olonezka) সহরের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রিস্তান-ভোজ নেসেয়েতে (Pristan-Voznessey) জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা একটি কৃষি-স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন তাই গ্রীষ্মের সময়টা তাঁকে তার কাকার কাছে নিজনী-নোভগো-রোড-এ (Nijni-Novgorod) কাটাতে হতো। এবং শীতের সময়টা কাটতো সেণ্ট-পিটার্সবার্গে। এখানে পাঁচ বছর বয়ক্রমকাল থেকে তিনি সংগীত বিদ্যালয়ে পিয়ানো বাজাতে শিখতে লাগলেন। তাঁর এই শিক্ষাতে ছেদ পড়লো না। নিজনীতে ১৯১৮ খৃঃ থেকে ১৯২১ খৃঃ অবধিও শিক্ষা চলতে লাগলো এবং পুনরায় পিটার্সবার্গের সংগীত বিদ্যালয়ে কোভাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃঃ থেকে সংগীত রচনা শিক্ষায় তিনি উদ্যোগী হন এবং ঐ বছরের শেষের দিকে মস্কো 'কনসারভেটোরীয়ে'তে ভর্তি হয়ে ১৯৩০ খৃঃ অবধি গ্নেসীনের (Gnessin) অধীনে কাজ করেন। এই সময়টায় ব্যক্তিগতভাবে মিয়াসকোভস্কীর (Maiskovsky) অধীনেও কাজ করেন এবং শেষের দিকে তাঁর অসমাপ্ত অপেরা গ্রাফনুলীন (Graf Nulin) রচনায় কাটাতে দেখা যায়।
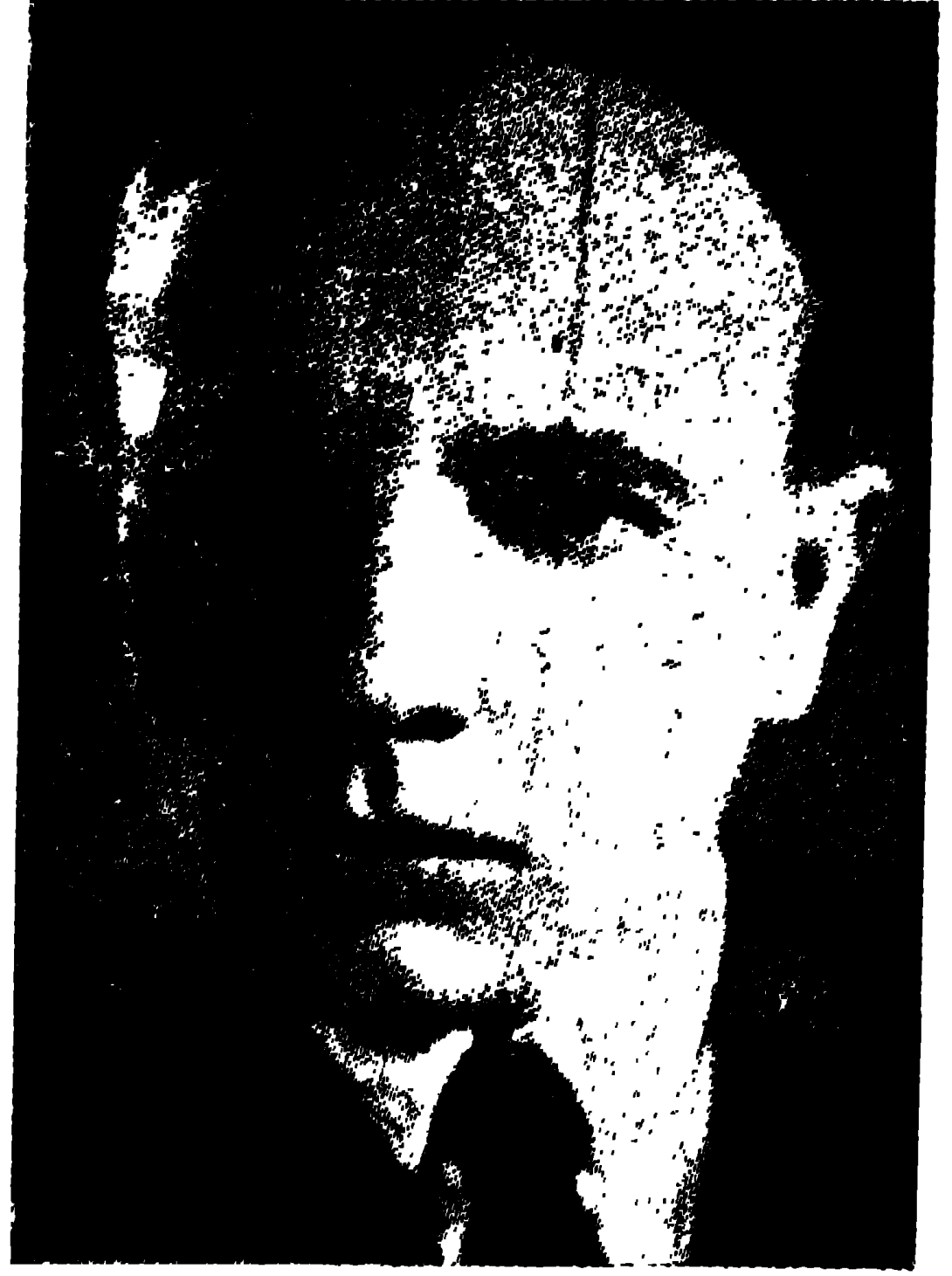
ম্যারিয়ান ভি. কোভাল

কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রচুর সংগীত এবং কোরাল রচনা করেন। রাশিয়ার কাব্য-সাহিত্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে—পুসকিন, নারকীসোভের বহু কবিতায় তিনি সুর সংযোজনা করেন। অতীতের অধিবাসীদের তিনি ভুলতে পারেন না তাই তার "The Accursed Past'—'1905' —"Tale of Partisan" দেখতে পাই—বর্তমানের নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েন—'Songs to Lenin' এবং 'Songs to Stalin' তার সাক্ষ্য দেবে। কোভাল পশ্চিম ইউরোপের এবং আমেরিকার কাব্য-সাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হন—"Songs of Loneliness" প্রভৃতিতে তার অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৯ খৃঃ ভ্যাসিলি কামেনস্কী অবলম্বনে কোভাল তাঁর সোলো কোরাস এবং অর্কেষ্ট্র—ইমেলিয়ান পুগাচেভ" (Emelian Pugachev) শেষ করেন। এবং ঐ বছরই ছোটদের জন্য তিনি তাঁর জনপ্রিয় অপেরা "The wolf and the seven goats" শেষ করেন।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন ফ্যাসিস্ত জার্মেনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকারকে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে হয়—সোভিয়েট সরকার সমস্ত জনসাধারণকে যুদ্ধ জয়ের যে দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য আহ্বান জানান, কোভাল সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। কোভাল মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেন, তাঁর এখন নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে চলবে না। তাঁর সংগীত প্রচেষ্টাকেও যুদ্ধজয়ের জন্য কাজে লাগাতে হবে। জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ় করে তুলতে তাকে সুরের খেলা খেলতে হবে। বহু যুদ্ধ সংগীত তিনি তৈরী করলেন। "The Peoples sacred war" জনসাধারণকে বিস্মিত করলো। গত যুদ্ধে নিহত সমসাময়িক বীর বৈমানিকদের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোভালের "Valery chkalov"-এর কথাও আমাদের কানে এসে পৌঁছেচে। কোভালের প্রত্যেকটী সংগীত জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। রাশিয়ার প্রাচীন সংগীতের সংগে সেগুলির রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। রাশিয়ার লোক-সংগীতের প্রভাবও যথেষ্ট তাঁর সংগীতে পরিদৃষ্ট হয়।

কন্সটানটিন ওয়াই, লিস্তোভ

কন্সটানটিন ওয়াই, লিস্তোভ

(Konstantin Y, Listov)

কন্সটানটিন ওয়াই, লিস্তোভ ১৯০০ খৃঃ-এ একটী মজুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই ম্যানডোলীন, ব্যালালাইকা পিয়ানো প্রভৃতি শুনতে ভালবাসতেন এবং একটু বড় হবার সংগে সংগে বাজাতেনও। ১৯১৪ খৃঃ তদানীন্তন জারিটসিনের (Jaritsin) বর্তমানে যা ষ্টালিনগ্রাদ নামে পরিচিত একটী সংগীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়ে যান। এবং ১৯১৭ খৃঃ সংগীতের উপাধি লাভ করে পিয়ানো এবং সংগীত রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ঐ বছরই স্বেচ্ছায় লালফৌজে যোগদান করেন। বহুবার তাঁকে যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে—জারিটসিন রক্ষা করবার সময় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

লিস্তোভ দশম বাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তাঁর দলের লোকেরা প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রচিত গান গাইতো। তাঁর এই প্রতিভা সৈন্যাধ্যক্ষের নজরে পড়ে। এবং তিনি

লিস্তোভকে সারাটোভের (Saratov) কোন সংগীত বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার জন্য পাঠাতে মনস্থ করেন। সেখানে ১৯১৯ খৃঃ থেকে ১৯২১ খৃঃ অবধি তাঁর অতিবাহিত হয়। অধ্যাপক রুডোলফ্ (Prof. Rudolph) এর অধীনে সংগীত রচনা শিক্ষা করে 'কনসারভেটোইরীয়ে' থেকে উপাধিলাভ করেন। কিন্তু এ কয় বছরের ভিতরও তিনি মাঝে মাঝে যুদ্ধপ্রান্তে লালফৌজের নৌ এবং পদাতিক বাহিনীর মাঝে যেয়ে হাজির হতেন। নিজের রচিত সংগীতগুলি তাদের শিখিয়ে আসতেন। ১৯২৩ খৃঃ-এ লিস্তোভ মস্কোতে এসে বাস করতে থাকেন—তাঁর সৃজনী ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে। সংগীত শিক্ষার সময় তিনি বহু 'সিমফনী'-ও রচনা করেন। মস্কোতে এসে মিউজিক্যাল-কমেডি রচনায় তাঁকে বেশী লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এর ভিতর "The Queen is Wrong ;" "The Ice House and Tenny" প্রভৃতি নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। তাছাড়া মলিয়েরে লিখিত "The Bourgeoi's Gentil's home" লিয়াবিস (Lyabitch) লিখিত "Money Box"—এবং মস্কোর লিট্‌লথিয়েটারে অভিনীত বিভিন্ন ব্যাঙ্গাত্মক নাটকেরও তিনি সুর সংযোজনা করেন।

তবু সংগীত রচনায় তাঁর প্রধান দান যে যুদ্ধ সংগীত একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। লালফৌজের নৌ এবং পদাতিক বাহিনীর জীবন যাত্রার সংগে রয়েছে তাঁর নাড়ীর যোগ—গৃহ যুদ্ধের সময় তাদের সংগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্খা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই জন্যই তাঁর রচিত সংগীতগুলি—লাল ফৌজের সৈনিকদের কাছে এত প্রিয়। শুধু সৈনিকদের কাছেই কেন, সমস্ত সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের কাছে লিস্তোভের রচিত সংগীতগুলি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু। এই প্রসংগে লিস্তোভের 'Songs of Tchank.' 'Beloved Grass', 'On Guard.''In the Dug out' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। দু'শরও বেশী লিস্তোভ সংগীত রচনা করেছেন—তার বেশীর ভাগই রচিত হ'য়েছে বিগত যুদ্ধের সময়।

ইংরাজী নাটকের উৎপত্তি

শ্রীঅরবিন্দ কুমার বসু

★

ইংরাজী নাটকের উৎপত্তি হয় মধ্যযুগে, ক্যাথলিক চার্চের নিরূপিত ভজনাপদ্ধতি থেকে। Roman Catholic mass বা সম্মিলিত উপাসনাই নাটকের প্রতিরূপক; যীশু ও তাঁর শিষ্যগণের Last Supper-কে রূপ দেওয়া হোত' অভিনয়ের মত action দিয়ে। কৃষ্ণযুগে (Dark age) যখন সাধারণের Latin-এর জ্ঞান ক্রমশঃ ক'মে গেলো—তখন উপাসনায় ব্যবহৃত Latin-কে সাধারণের বোধগম্য ক'রতে চার্চ এক নব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন—উপাসনাকালে ল্যাটিন শব্দকে সংগীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন। সর্বপ্রথমে শুধু সংগীতেরই ব্যবহার ছিল। Christmas, Easter প্রভৃতি ধর্মোৎসবের যেসকল ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে উৎপত্তি হয় Musical Tropes বা সংগীতময় রূপকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হোত' ঐসব ঘটনাকে। চার্চের গায়কেরা (এঁরা Choir নামে অভিহিত) দুই দলে বিভক্ত হয়ে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গানের মধ্য দিয়ে রূপ দিতেন ঐ ঘটনাবলীর। উদাহরণস্বরূপ, Christ এর Resurrection অভিনীত হোত' নিম্নরূপ Musical dialogue এর মধ্য দিয়ে :—

১ম দল –"Whom are you seeking ?"

২য় দল—"Jesus of Nazareth."

১ম দল—"He is not here."

২য় দল—"Where is He ?" ইত্যাদি Musical Tropes ক্রমে আরও উৎকর্ষ লাভ করে। ক্রমে আর এক নতুন ধরণের নাটক আত্মপ্রকাশ করে, একে Miracle Play (অলৌকিক নাটক) বলা হয়। নাটকে অভিনয় করতেন priests বা যাজকগণ ও choirs বা গায়কগণ। Miracle Play-র একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—ভজনালয়ে গায়কদের নির্দিষ্ট স্থানকে যীশুর সমাধিস্থান কল্পনা করা হয়; এক গায়ককে বাইবেল-বর্ণিত দেবদূত-এর ভূমিকায় সেখানে উপস্থিত করা হয় এবং অপর তিনজন গায়ক বা যাজক তিন রমণীর (বাইবেলোক্ত যে তিন রমণী যীশুর সমাধি সন্দর্শনে গিয়েছিলেন) প্রতিরূপ রূপে প্রবেশ ক'রে ঐ দেবদূতের সংগে dialogue আরম্ভ করেন।

১১শ শতকে New Testament-এর ঘটনাবলী সম্বলিত ছোট ছোট ল্যাটিন নাটকের অভিনয় চার্চের ধর্মোৎসবের প্রধান অংগ হ'য়ে ওঠে। ১২শ শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে নাটকে Latin-এর পরিবর্তে ইংরাজী শব্দ যোজনা করা হয়। ১৩শ শতাব্দীতে ঐ পবিত্র মাতৃভাষারূপে পরিগণিত হোতে দেখা যায় ও নাটকের অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১২শ শতকে ঐ নাটকের উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি পায় যখন নাটকগুলি Saints বা সাধুদের জীবন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে লাগ্‌লো। এইসময় জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পায় যে, চার্চের মধ্যে অসংখ্য দর্শকদের স্থান সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেজন্য এরপর থেকে চার্চের অন্তর্বর্তী অভিনয় স্থানের পরিবর্তে চার্চ বহির্ভাগস্থ উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় হোতে লাগ্‌লো। যদিও এখনও নাটক যাজক ও গায়কগণ কর্তৃক অভিনীত হোত কিন্তু এখন থেকে অভিনয় আর ভজন পদ্ধতির কোন কাজে লাগতো না। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী নাটক এই সময় হতেই নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। ১৩শ শতকের শেষভাগ থেকে অভিনয়ের ভার যাজক ও গায়কের পরিবর্তে Guilds বা অভিনেতৃ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত হোল। প্রতি প্রতিষ্ঠানের একটি করে চলনশীল মঞ্চ (movable stage যাকে Pageant বলা হয়) ছিল। ঐ মঞ্চকে এক এক নির্দিষ্ট দিনে জেলা বা সহরের নির্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করে তার ওপরে ধর্ম সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক নাটকের দৃশ্য অভিনয় করা হোত। এক সম্প্রদায় চলে গেলে আর এক সম্প্রদায় এসে সে স্থানে অভিনয় করত। প্রতিটী জেলায় Miracle Play অভিনয়ের জন্য Guild থাক্‌তো ও নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করত।

এই নাটকের অভিনয় এর সমালোচনা এখানে আবশ্যক। প্রথমতঃ, নাটকের মূল কাহিনী সকলের জানা থাকায় দর্শকেরা নাটকের Dialogue এর পরিবর্তে Action দর্শনেই অধিক আগ্রহশীল ছিল; সেইজন্য নাটকীয় বৃত্তান্তকে গ্রীক নাটকের মত চরিত্রের dialogue এর ভিতর ফুটিয়ে না তুলে মঞ্চের ওপর action দিয়ে তাকে রূপ দেওয়া হোত'। এর ফলেই পরবর্তীযুগের এলিজাবিথীয় রোম্যান্টিক নাটকের প্রধান অংগ হয়ে ওঠে Stage action। দ্বিতীয়তঃ, অভিনেতৃ-সম্প্রদায় শুধু বাইবেলের কাহিনীর অভিনয় করেই সন্তুষ্ট রইলেন না—তাঁরা ঐ কাহিনীগুলিকে সমসাময়িক জীবনধারার সংগে ঘনিষ্ঠতর ক'রে তুলতে এবং কাহিনীর মূল সত্য উপলব্ধি করাতে নাটকে মধ্যযুগীয় চরিত্র ও ঘটনার সন্নিবেশ করেন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, খৃষ্টের জন্মের সময়ের মেষপালক সংক্রান্ত কাহিনীকে সমসাময়িক জীবনধারার সংগে মিশ্রিত করার জন্যে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের মেষ-চারণ-সংক্রান্ত ঘটনাকে সংযোজিত ক'রে পুরাতন কাহিনীকে নবরূপ প্রদান করা হয়। Miracle নাটকের অজ্ঞাত লেখকরা এইরূপে গম্ভীররসের সংগে লঘুরসের সংমিশ্রণ করে পরবর্তীকালের ইংরাজী রোম্যান্টিক নাটকের বিষয়বস্তুর এই সংমিশ্রিত রূপ প্রদান করেছেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং Shakespeare-ও Classical Drama-র Unity মেনে চলেন নি—তাঁর নাটকে করুণরস ও হাস্যরসের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, সাধারণ জীবনযাত্রার সংগে ঘনিষ্ঠতর করে তোলায় নাটক অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অভিনেতৃ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিজ নিজ সংঘের সুনামবৃদ্ধির জন্য স্বচ্ছ ও সুন্দরতর অভিনয় করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, যার ফলে অভিনয় পদ্ধতির উন্নতি হয়। Miracle নাটকের অভিনয় সাধারণের নাট্য দর্শনের রুচি ও Stage tradtion বা মঞ্চের পারম্পর্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে পরবর্তীকালের এলিজাবিথীয় নাটকের উৎকর্ষতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

মধ্যযুগে রূপকের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রদানের প্রথা ছিল। নাটকগুলি যেহেতু ছিল' শিক্ষামূলক সেইজন্য ঐগুলিও রূপকাত্মক (allegorical) হ'য়ে ওঠে। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম রূপকময় নাটক বা Morality Play-এর উদ্ভব হয়। মানবহৃদয় অধিকারের জন্য সৎ ও অসৎ শক্তির দ্বন্দ্বই Morality নাটকের উপজীব্য বিষয়। এই সকল নাটক তাৎপর্যপূর্ণ ও উপদেশাত্মক। এই সকল নাটকে virtue, vice, seven deadly sins, প্রভৃতি abstract qualityগুলিকে personified বা মানবত্ব করে চরিত্ররূপে অংকিত করা হোত' এই নাটকেও হাস্যরসাত্মক প্রসংগের স্থান ছিল। এই নাটক প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তে কাল্পনিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতো। miracle নাটকগুলির কাহিনীগুলি সকলের জানা থাকায় দর্শকেরা actionএর প্রতি বেশী আগ্রহশীল ছিলো কিন্তু moralityর দর্শকদের শ্রবণ-এর ওপরই বেশী নির্ভর কোরতে হোত' কারণ গল্পের জ্ঞান না থাকায় তাদের dialogueএর মধ্য দিয়ে নাটকীয় বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে হোতো। এইজন্য নাট্যকারদের

সুষ্ঠু ও সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে রচনা করতে হোতো নাটক। অভিনেতাদের দুইদিকে দৃষ্টি রেখে কোরতে হোত' অভিনয় —অংগভংগীমা ও বাচনভংগীমার ওপর। Morality নাটক যদিও উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোককেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলো, কিন্তু নাট্যকারগণ যেন উচ্চশ্রেণীর জন্য নাটক লিখতে অভিপ্রেত ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোকেরা নিজ নিজ গৃহে স্থায়ী মঞ্চ-স্থাপনা করতেন ও ভ্রাম্যমান অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। এর ফলে 'পেশাদারী' অভিনেতা ও অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। Stage tradition-এরও শক্তিবৃদ্ধি হয়। Morality নাটক ক্রমে ক্রমে চার্চের সম্বন্ধ হোতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে—সম্পূর্ণ অযাজকীয় (Secular) রূপ ধারণ করে —বিশেষ করে Reformation-এর রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনকালে। এইখানে একটা কথা বলি, Res Publica নাটকে নাট্যকার Suppression of Monasteries এর দ্বারা যাঁরা লাভবান হয়েছিলেন তাঁদের আক্রমণ করেন। সমসাময়িক ঘটনার সংযোজনা নাটক অভিনয় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে Moralityতে abstract Qualityকে personified করার পরিবর্তে সমসাময়িক মানব চরিত্রের রূপ দান করা হয়। এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয় Bishop Baleএর 'King John' (1547) নামক ঐতিহাসিক Moralityতে।

এইরূপে, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, আজ ইংরাজী নাটক বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

রংগমঞ্চ ও নাটক

গোপী রায়

বাংলা রংগমঞ্চের দিকে তাকালে একটি সত্য সকলের চোখে স্পষ্ট করে' ধরা দেবে। সেটি হচ্ছে—নাটক নামক বস্তুটি রংগালয় থেকে মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দিয়েছে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, অনুগ্রহ করে রংগালয়-গুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখ্‌বেন—সেখানে উপন্যাসেরই নাট্যরূপ সাড়ম্বরে এবং সগৌরবে (?) অভিনীত হ'চ্ছে।

যাঁরা বলেন—ভাল নাটক নেই—তাঁদের একটা কথা স্মরণ ক'রতে বলি। বাংলাদেশে খ্যাতনামা সাহিত্যিকের অভাব নেই, ইচ্ছে থাকলে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাঁদের দিয়ে নাটক লিখিয়ে নেওয়া যায় অথবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েও নতুন নাটক সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু, এই দুটি পন্থার কোনোটিই অনুসরণ না করে' কর্তৃপক্ষ উপন্যাসের এমনকি গল্পের নাট্যরূপ দিতে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। যাঁরা এককালে নাটক লিখ্‌তেন তাঁরা পর্যন্ত উপন্যাসের নাট্য-রূপ রচনায় মনোনিবেশ ক'রেছেন। নতুন নাট্যকার নতুন বলে রংগমঞ্চে কল্কে পান্ না। তাঁদের নাটক প্রযোজনা করায়ও ঝুঁকি—অর্থাৎ, কর্তৃপক্ষ লোকসানের ভয় করে থাকেন। এমন মূর্খ কোন্ প্রযোজক আছেন, যিনি নতুন নাট্যকারের নতুন নাটক নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ করবেন? ফলে নাটক জিনিসটি সসম্মানে রংগালয় হতে বিদায় গ্রহণ করেছে।

কর্তৃপক্ষের নেকনজরটা এখন শরৎচন্দ্রের প্রতিই দেখা যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে এমনি অনুরূপা-প্রভাবতী প্রীতি আমরা লক্ষ্য ক'রেছিলাম। শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস-এর অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে আর কি নিশ্চেষ্ট থাকা যায়? শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিদেনপক্ষে গল্পেরও দু-তিন ঘণ্টার মতো নাট্যরূপ দিয়ে যেমন ক'রেই হোক্ অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে সকলেই কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। একের পর এক এলো রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, বৈকুণ্ঠের উইল, নব পর্যায়ে (এটা কী বস্তু?) দেবদাস, অনুপমার প্রেম, মেজদি প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই যে তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হ'চ্ছে—এ-কথা যদি মনে করেন, তা'হলে প্রচণ্ড ভুল করবেন। শ্রদ্ধাবশতই যদি হতো, তা'হলে এঁদের শরৎ স্মৃতি-ভাণ্ডারে মোটা রকমের আর্থিক সাহায্য করতে দেখ্‌তে পেতেন। চক্ষুলজ্জা থাক্‌লে এক-দিনের (অবশ্যই রবিবারের) টিকিট বিক্রয়ের সব কটি টাকাই উক্ত ভাণ্ডারে দান করতেন। শ্রদ্ধা ভক্তি কিছু নয়, আসল হচ্ছে ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি। শরৎচন্দ্রের লেখা হ'লে আর তার মার নেই। যেমন করে হোক্, যাকে দিয়ে হোক্ নাট্যরূপ দিতেই হবে,—নামের লেবেলটি যেন শরৎচন্দ্রের থাকে।

কিন্তু, প্রযোজকরা একটা কথা ভেবে দেখ্‌ছেন না। শরৎচন্দ্রের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, একদিন (এবং তা' খুব সত্বরই!) অবশ্যই তা ফুরিয়ে যাবে। তখন তাঁরা কি করবেন? সৌরীন মুখুজ্জেকে ধরবেন না ফিরে যাবেন গিরিশ-ক্ষীরোদ-অমৃতলালে? বংকিমচন্দ্রকে নিয়ে তো পুনরায় টানা হ্যাঁচড়া সুরু হ'য়েছে। দেবী চৌধুরাণী, সন্তানের পর সীতারামের আবির্ভাব ঘটেছে পাদ-প্রদীপের আলোয়।

সম্প্রতি পুরোনো নাটকের নব পর্যায়ে অভিনয় নামক আরেকটি নতুন উপদ্রব সুরু হয়েছে। মনোমোহন নাট্য-নিকেতনে বহুবার অভিনীত গৈরিক পতাকা ১৯৪৫ সালে পুনরুজ্জীবিত হ'য়েছে, দুটি রংগমঞ্চে বহুকাল মৃত মেবার পতন-কে কবরের ভিতর থেকে টেনে আনা হ'য়েছে। সংবাদ পত্রে কারাগার-এর পুনরাবির্ভাবের কথা-ও ঘোষণা করা হ'য়েছিল। কিছুদিন পর বিল্বমংগল, শাজাহান, মিশরকুমারী, কিন্নরী প্রভৃতিকে-ও (যদিও কোনো অভি-নেতা—অভিনেত্রীর সম্মান রজনী উপলক্ষে শাজাহান, মিশর কুমারী প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে থাকে) হয়তো আমরা নতুন সজ্জায় নতুন পরিবেশে পুনরায় দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হবোনা। আসলে, এই নব পর্যায় কথাটির মানে কি? তা কি এই নয় যে, দর্শকদের

ধোকা বানিয়ে ঠকিয়ে নিজেদের লাভের অংক ফাঁপিয়ে তোলা? থিয়েটার চলেছে কোন্ মুখে? এই প্রশ্ন রংগালয়ের শুভাকাংখী প্রত্যেক মানুষের মনেই জাগা উচিৎ থিয়েটারের উপর প্রত্যেক মানুষের সহানুভূতি যেদিন নষ্ট হ'তে ব'সেছে—এ কথা বিলম্বে হ'লেও কর্তৃপক্ষকে একদিন বুঝ্‌তে হবে। এঁদের অদূরদর্শিতা এবং অর্থ গৃধ্নুতাই যে রংগমঞ্চের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে, এ-কথা এঁরা আর কবে বুঝ্‌বেন?

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে রংগালয় কর্তৃপক্ষ প্রচুর পয়সা পিটেছেন। অত্যন্ত রদ্দি ছবি-ও যেমন পয়সা দিয়েছে, ভালো মন্দ নির্বিশেষে নাটক দেখ্‌বার জন্যেও তেমনি হাজারে হাজারে দর্শক থিয়েটারের দরজায় ভিড় করে গেছেন। ভাবনা ছিলোনা, চিন্তা ছিলোনা—নতুন নাটক নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর্‌বার কী সুযোগটাই না চলে গেছে। রংগালয়কে নতুন করে গড়ে তোলবার নতুন রূপ দেবার কোনো সুবর্ণ সময় থাক্‌তো তো ছিলো যুদ্ধকালীন সময়। কর্তৃপক্ষ সে সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছেন।

এই সব দেখে কোনো নতুন লেখক যদি নাটক লিখ্‌তে প্রেরণা না পান, সেটা কি আমরা অন্যায় বল্‌বো? অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োয় নতুন নাট্যকার এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নাটক অভিনীত হচ্ছে। এঁদের মধ্যে দু-একজন সত্যিকারের নাট্যকারের সাক্ষাৎ কি মিল্‌বে না? অবশ্যই মিল্‌বে। কিন্তু, সে চেষ্টা করবে কে? কর্তৃপক্ষ চলেছেন গতানুগতিক পথ ধরে: প্রগতি, অগ্রগতি প্রভৃতি রংগমঞ্চে একেবারে অচল।

সুতরাং, আরো কিছুদিন—যতোদিন না রংগালয়ের পরিচালনা ভার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করছেন, ততোদিন পর্যন্ত নাটকের বদলে নাট্যরূপই আমাদের দেখতে হবে।

রাই

[বড় গল্প]

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

★

বল্লভপুর গাঁয়ের বামুনপাড়া শেষ হ'তেই হলধর রাজবংশীর বাড়ী। গাঁয়ের পশ্চিম দিক ঘেঁসে উত্তর দক্ষিণে ঝালডাঙ্গার বিলটা অনেক দূর এঁকে বেঁকে গেছে। বামুনপাড়া আর হলধর মাঝির বাড়ীর মেয়েরা বিলের জলে কাজ করে। হলধর তার ছেলেদের নিয়ে ওরই কাছাকাছি জাল যায়। খেপলা-জাল, টাইকা-জাল, ভেসাল-জাল—কোন জালে কোন মাছ ওঠে-—মেয়েরা বিল-ঘাট থেকে দেখতে পায়। কোন বাড়ীর কোন বাবু কোন মাছ পছন্দ করেন—মাছের দাম দেবার যোগ্যতা কোন বাবুর কতটুকু হলধর এবং তার ছেলেদের তা অজানা নয়। এক এক খেপে যে মাছ ওঠে—তার বিলি ব্যবস্থা মনে মনেই তারা করে রাখে। হলধরের বড় মেয়ে রাই—রাইকিশোরী। সে জানে প্রত্যিটি বাড়ীর অন্দরমহলের কথা। পুণ্যু ঠাকুরের পুকুরপাড়ের কুল গাছটার বড় বড় টোবা টোবা কুল খেতে হ'লে—তার বৌকে কী মাছ দিয়ে খুশী করতে হয়—রাই তা জানে। রাই জানে, গাঙ্গুলী বাড়ীর আমতলায় প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য যোগীন গাঙ্গুলীর মুখরা মেয়েকে 'কাঁকলে' মাছ দিয়ে খুশী করতে না পারলে—সে হয়ত দা' নিয়েই তেড়ে আসবে। চাটুজ্যে বাড়ীর পিসিমা—রায়েদের বাড়ীর বৌদি কার কোন মাছের দিকে ঝোঁক, রাইয়ের তা অজানা নয়। তবে নিজে থালই ভরত্তি করে পৌঁছে দিয়ে আসে কেবল রায় বাড়ীর বৌদির বেলায়। মাঝে মাঝে গণ্ড-গোল বেঁধে ওঠে। রাইয়ের নির্বাচন মত তার বাপ-ভাইয়েরা সব সময় মাছ বিলি করতে দেয় না। পুণ্যু ঠাকুরকে যদি একবার মাছ ধারে ছাড়া যায়—তার দাম যে আদায় করা যাবে না—হলধর তা জানে। কাট-ছাট দিয়ে আটআনা দাম হ'লেও যোগীন গাঙ্গুলী মরে গেলেও সে দাম হলধরকে দেবে না। তিনহাট ঘুরিয়ে পাঁচ আনার পয়সা দেবে।

হলধর যদি আপত্তি তোলে—চোখ মুখ উলটিয়ে যোগীন গাঙ্গুলী বলে বসবে: "আরে, হ্যাঁ হে হলধর, —একী মগের মুল্লুক পাইছো নাকি? বলি ইট কাটানো আরম্ভ করছো কী? কাটছিত মোটে তিন গণ্ডার পয়সা।" হলধর আর কী করবে—মাথা চুলকাতে চুলকাতে সড়ে পড়ে। তাই দ্বন্দ্ব বাধতো এই পুণ্যু ঠাকুর আর যোগীন গাঙ্গুলীর বেলায়। কিন্তু সব সময় ধার না দিয়েও পারা যেত না। তারপর রাইকেও থামিয়ে রাখা যেত না। পারতপক্ষে রাইয়ের কোন ইচ্ছাতেই হলধর বাধা দিত না। হলধরের তিনটি ছেলে এখন যুগ্যি হ'য়ে উঠেছে—দু'বেলাই তার হাঁড়ি চড়ে। তিন পোতায় তিনখানা ঘর তুলেছে—একখানা টিনের ছাপরাও করেছে এই ক'বছরে। অথচ রাইকে যখন বিয়ে দেয়—কচিৎ দুবেলা হাঁড়ি চড়তো—বাদলার দিনে রায়দের বাড়ীতে যেয়ে উঠতে হ'তো—বছরে একবার করে 'ছোন' দিয়ে চাল ছাইবারও সংগতি ছিল না হলধরের। তাই, রাইকে বিয়ে দেয় টাকা নিয়ে—দশকুড়ি এক টাকা নিয়ে—বামুনপাড়ার একপাশ দেওয়া ছেলেরাও অত টাকা পায় না। বিয়ে দেয় পদ্মার পাড়ের এক টাকাতে ঘরের ছেলের সংগে। হলধরের নাড়ীটা এইখানটাতেই টন টন করে ওঠে—ছেলেত নয়—পঞ্চাশ বছরের এক বুড়োর সংগে। প্রথম দু'পক্ষের ঘর ভরা ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও বিপিন মাঝি হলধরের ছয় বছরের মেয়ে রাইকে তৃতীয় পক্ষ করে ঘরে নেয়। বিপিনের বাড়ী পদ্মার পাড়ে। তারা ইলসে-জাল বাওয়া মাঝি, বংশমর্যাদায় হলধরদের চেয়ে বড়। তাছাড়া টাকাও আছে যথেষ্ট। বিয়ের সময় একবার কেবল রাই গিয়েছিল স্বামীর ঘরে। তারপর আর যায়নি—যেতে চায়নি—যেতে হয়নি। বিপিন আসতো মাঝে মাঝে। বছরে দু'একবার করে। বিপিনকে দেখলেই রাই ছুটে পালাতো—ওকে ধরে নিয়ে যাবে বলে। বিপিন যখন আসতো—কাঁদি কাঁদি কলা নিয়ে আসতো—হাড়িতে হাড়িতে

ইলিশ মাছ কেটে নিয়ে আসতো—বামুন পাড়ায়ও হলধর অনেক বিলিয়েছে তা। বিপিন তার সাদায় কালোয় মেশানো চুলগুলিকে কলকে রাঙিয়ে আসতো—পরণে থাকতো নীলে ছোপানো সাদা তাঁতের ধুতি। পাড়ার বৌয়েরা বিপিনকে রাই'র নীলাম্বর বলে ডাকতো। রাইকে আর বেশী দিন তার নীলাম্বরের সংগে লুকো-চুরি খেলতে হ'লো না—বছর চারেকের ভিতরই বৈকুণ্ঠ থেকে নীলাম্বরের ডাক পড়লো। হলধরের কাছে খবর এলো—হলধরের বৌ কান্নাকাটি করলো—হলধর রইল গুম মেরে। রাই যেমন হাসতো—খেলতো—বেড়াতো—তেমনি রইলো।

শিশু রাই আজ কৈশোরের চঞ্চলতায় ভরপুর। তার কোঁকড়ান চুলগুলি ঘাড় অবধি এসে পড়েছে—কালো মেয়ের ডাগর ডাগর কালো চোখ দুটী—মুখ-খানাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে—নিজের মেয়ে বলেই নয়, সত্যি, এমনি একটা আলগা চেহারা রাই'র—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে—ঐ কালো মসৃনের মত চেহারার ভিতর কৈশোরের এমনি একটা দুর্দান্ত ভাব রয়েছে যে, ওকে দেখলেই একটু খুঁচিয়ে নিয়ে ক্ষেপিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। হলধর মাঝে মাঝে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজের মনের মাঝে কত কী ভাবে। ভাবে, কেন তুই আমার ঘরে এসেছিলি পোড়ারমুখী—তোর বামুন-কায়েতের ঘরে আসাই উচিত ছিল—বেটা ভগবানেরও আক্কেলটা দেখ। না, মেয়েটার আবার বিয়েই দেবে হলধর। ওদের সমাজে ত এরকম মেয়েদের আবার বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই সেদিনওত কৈলাস মাঝির বিধবা মেয়েটার বিয়ে সমাজ মেনে নিল—আর সেত ধিংগী বয়সেই বিধবা হ'য়েছিল। তবে—তবে আর আপত্তি কি? রাইকে সে আবার বিয়ে দেবে—তার তিন তিনটে ছেলে যুগ্যি হ'য়েছে—অবস্থাও ফিরেছে আগের চেয়ে—তবে আর আপত্তি কী! আপত্তি কারো হবে না হলধর তা জানে—আপত্তি যা, তা' তার নিজের মনের মধ্যেই। বামুন-পাড়ার পাশাপাশি থাকতে থাকতে হলধরের গায়েও একটু বামুনে গন্ধ লেগেছে। তার ছেলেরা বামুন পাড়ার ছেলেদের সংগে পিরাণ গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়াবান্ধা খেলতে যায়—এইত সেদিনও মেঝো ছেলেটা বামুন পাড়ার দেবু ঠাকুরের মত এক ফিতে আলা জুতো কিনে এনেছে—রোজ রাত্রে যখন উঠোনের পর দিয়ে সে জুতো পায় দিয়ে হাটে, ভারী ভাল লাগে হলধরের—তাছাড়া সে নিজেও বামুন-পাড়ার রীতিনীতিটাই বেশী মানে—এজন্য তার নিজের সমাজেও একটু প্রতি-পত্তি হ'য়েছে। তাই, বামুনপাড়ার বাবুরা কী বলবে—এজন্যও রাইকে আবার বিয়ে দেবার চিন্তা হলধরের মন থেকে মুছে যায়। তাছাড়া রাইর যুগ্যি বরই বা কোথায় তার সমাজে! একবার একটা ভুল করে ফেলেছিল—হলধর আর সে ভুল করবে না। বামুন পাড়ার পাঠশালায় রাই পাতা লেখা শিখেছে—বামুন পাড়ার বৌয়েদের কাছ থেকে সে কত মোটা মোটা বই এনে পড়ে—শিব ঠাকুরের বৌ'র কাছে রাই চটের আসন বোনা শিখতে যায়। জেলে সমাজের আর দশটা মেয়ের মত রাই গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে পাড়া বেড়াতে যায় না। তার পরিধি ঐ বামুনপাড়া। ফেলা মাঝি, প্রসন্ন মাঝি এদের মেয়েদের মত কোন দিনত রাই বড় হবার পর থেকে খালি গায়ে থাকেনা। শিব ঠাকুরের বৌ ওকে খুব ভালবাসে। নিজের গায়ের কায়দাকলম আলা পিরাণগুলি সে রাইকে দেয়। তাছাড়া হলধরও ভাঙার হাট থেকে 'বডিজ' কিনে এনে দেয় রাইকে। নিজের পরণে আট হাত ধুতি চড়ালেও হলধর রাইকে রঙিন সাড়ী পরায়। হ্যাঁ, বিয়ে সে দিত, যদি দেবু ঠাকুরের মত—লেখাপড়া জানা ফুট ফুটে একটী ছেলে পেত তার সমাজে—তাহলে তার আপত্তি থাকতো না। কিন্তু সে ছেলে তার সমাজে কোথায়! হলধর নিজের মনে মনেই বলে, না থাক। ও এমনি থাক। এমনি ভাবেই সাড়াটা জীবন তার চোখের সামনে হেসে খেলে বেড়াক।

বামুনপাড়ায় দেবুর বৌদিরই রাই ছিল বেশী অনুগত। দেবুর দাদা শিবশঙ্কর রায়—গাঁয়ের ইংরেজী

স্কুলের মাষ্টার। শুধু মাষ্টার বললে ভুল বলা হবে, স্কুলটী তার প্রাণ। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক ঝড়-ঝাপটের ভিতর দিয়ে পুরোণ মাইনর স্কুলটীকে সে হাই স্কুল করেছে। শিবশঙ্কর রায়ের যেমনি স্কুলটী প্রাণ—স্কুলের ছাত্রদেরও তেমনি শিবশঙ্কর রায়। ওদের অভাব অভিযোগ অভিভাবকের মত শিবশঙ্কর দূর করে। ওদের রোগ-ব্যাধির সময় আত্মীয়ের মত যেয়ে হাজির হয়। গাঁয়ের কোন দলাদলি—খাওয়া-খাওয়ির ভিতর শিবশঙ্কর রায় থাকতেন না। স্কুলের ব্যাপার নিয়ে অনেক সময় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় তাঁকে —কিন্তু নিজের সহজ ব্যবহার ও বুদ্ধির গুণে এমনি ভাবে সেগুলির সমাধান করে বসেন যে, কোন স্বার্থ নিয়েই কেউ স্কুল কমিটির ভিতর প্রবেশ করে কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে আর সাহস পান না। তারা বুঝে নেন, শিবশঙ্কর রায় যেখানে আছে, সেখানে স্বার্থ নিয়ে নাক গলানো যাবেনা— কারোর বিশেষ স্বার্থই সেখানে স্থান পাবে না অথচ সকলের স্বার্থই থাকবে অক্ষুন্ন। স্কুলটী ধীর-পদক্ষেপে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিদেশ থেকে ভাল ভাল মাষ্টার আসে— পরীক্ষার ফল আশ-পাশের স্কুলগুলিকে ছাড়িয়ে যায়— 'ছোনের' চালের ওপরে ওঠে—টিন বাঁশের খুটিগুলিকে সরিয়ে দিয়ে স্থান নেয় সাল-কাঠ। শিবশঙ্করের স্ত্রী সুনন্দার বিরুদ্ধেও কারো কোন অভিযোগ নেই। তাঁকে লক্ষ্য করে সবাই বলে, 'যেমনি দেবা তেমনি দেবী।' সুনন্দাকে পাড়ার সকল ছেলে মেয়েরা ডাকতো সু-বৌদি বলে। রাই-ও তাই ডাকতো। সুনন্দার একমাত্র দেবর দেবশঙ্কর—দেবু প্রায় রায়েরই সমবয়সী। দু'এক বছরের বড় হবে দেবু। ওরা একই পাঠশালায়— এক সংগে পাতা লিখেছে—চারিদিক অন্ধকার করে যখন কাল বৈশাখীর ঝড় দেখা দিয়েছে—এক জোটে ওরা গাঙ্গুলী বাড়ীর আমতলায় যেয়ে হাজির হয়েছে। দুরন্ত বৈশাখী ঝড় ওদের গা থেকে কাপড় জামা উড়িয়ে নিতে চেয়েছে —আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতে চেয়েছে ওদের। ওরা সমানে ঝড়ের সংগে লড়াই করে মুখ উপরে তুলে চেয়ে রয়েছে আমগাছের দিকে। যে গাছগুলি ভেংগে আম ঝুলে পড়েছে—যে আম গাছের আমের বোটাগুলি নরম—একটু দোলনেই খসে পড়ে, ওরা তারই নীচে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। বাতাসের সংগে লড়াই করে দোদুল্যমান আম গুলি যখন আর বোটা জড়িয়ে থাকতে পারতো না—মাটির টানে ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকতো না। আর ওদের মাঝে তখন বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তো—নানান দল ভীড় করতো আমতলায়—বিভিন্ন দলের ভিতর কাড়া-কাড়ি থেকে হাতা-হাতি ধস্তা-ধস্তিও আরম্ভ হতো। কখনও বা একটা ডালই মরমর করে ভেংগে পরতো। তখন ওদের হুসিয়ারী দৃষ্টি সকলকেই সতর্ক করিয়ে দিত। ওরা সরে দাঁড়াতো। ডালটা যেই নির্জীব হ'য়ে পড়ে যেত—আবার এসে ওরা কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিত। আষাঢ়ের শেষের দিক থেকে বর্ষার জল মাঠ পেরিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করতো। বাড়ীর নিচের চটান যায়গা ডুবে যেত—গায়ের রাস্তা ডুবে যেত—পুকুরের পার ভেসে যেত—বর্ষার সদ্য আসা স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুরে মাটির সবুজ দুর্বা গুলি তখন অবধিও দেখা যেত— ওরা দল বেধে ঝাপাঝাপি করতে নামতো যেয়ে ঐ জলে। যতক্ষণ না জলের স্বচ্ছতা দূর হ'তো—ওদের চোখ লাল হ'য়ে উঠতো না—ওরা উঠবার নামটিও করতো না। পৌষ-মাঘ মাসে সারা মাঠটায় সবুজ রংয়ের খেলা খেলে যেত। ওদের মন দুলতে থাকতো—আর কিছুদিন—আর কিছুদিন বাদে—মটর কলাইর সবুজ গাছগুলি ভেঙ্গে কতো সিম ফলবে! কচি কচি সিমগুলি—খেতে কী না মজা! দুপুর বেলা যখন মদন সেখ—ছকু মিঞা এরা নাস্তা করতে যাবে —কী সন্ধ্যার পর মাঠ থেকে যখন একএক করে ঘরে ফিরে যাবে—সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে—ওরা চুপি চুপি যেয়ে চোরের মত ঐ সবুজের সংগে মিশে যাবে। কোঁচড় ভরতি করে সিম তুলে আনবে—মটর মটর করে কলাই গাছের ডগা তুলে আনবে শাক খেতে—সু-বৌদি—পাড়ার আরো কত বৌদিকে উপহার দেবে। শাক ভাজার সময় সিম তুলবার সময়—কলাই গাছের পাতার সদ্য-পরা শিশিরে-

ওদের কাপড় ভিজবে—গায়ে লেগে শিহরণ জাগাবে—জোৎস্নায় ফুট ফুটে আলোর পাতায় শিশির বিন্দু ঝিক ঝিক করবে—মদন—কী মধু—ওদের সাড়া পেয়ে ধেয়ে আসবে—ওরা তাদের আসবার আগেই এক ছুট দিয়ে বাড়ী চলে আসবে। এমনি ভাবে দেবু, রাই ওদের দলের আর সকলের চলাফেরা গতিবিধি একসূত্রে ছিল গাঁথা। ওরা জানতো না—ওরা বুঝতো না—ওদের দেখলে মনেও হতো না যে, ওরা কেউ বামুনের ঘরে জন্মেছে—কেউ জন্মেছে কায়েত—জেলে—নাপিত বা কেউ জন্মেছে মদন সেখের ঘরে। ওদের কোন জাত ছিল না—ধর্ম ছিল না—ওদের যা ছিল—তা কয়েকটী একই বয়সের নানা রং বেরং এর ফুল—এক সংগে গায়ে গায়ে মিশে একটা গুচ্ছ তৈরী করেছে—কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে ধরা যায়না। ওদের ধর্ম বেপড়োয়া দৌরাত্মপানা—পাহাড়ী ঝরণার মত ওরা চঞ্চল দুর্দান্ত ছন্দে সমস্ত পাড়াটা মাতিয়ে রাখতো।

দেবুর বৌদির বেলায় বাপ ভাইয়ের কোন বারণই রাই শুনতো না। অবশ্য এ বেলায় তাদের বারণ করবার কোন কারণ ও থাকতো না। মাছের ডালিটা এনে উঠোনের পর ফেলতে যতটুকু দেরী—রাই অমনি থালই নিয়ে বসতো মাছ বাছতে। বড় বড় সরপুঁটি—পাবদা—টাটকেনী আরো কত নানাজাতীয় খুচরো মাছ।

চাটুজ্যে বাড়ীর মেজকর্তা রোজ সকাল বেলা একবার করে জেলে পাড়াটা টহল দিয়ে বেড়াতেন মাছের সন্ধানে। ঠিক মাছের সন্ধানে বললে ভুল বলা হবে—তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি মাছের ডালি থেকে জেলেদের আনাচে কানাচে যেয়ে পড়তো। মিষ্টি কথার মুরুব্বিয়ানায় মেয়েদের সংগে জমিয়ে নেওয়াটাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। হলধরের বাড়ীতেও যে নেহাৎ মাছের সন্ধানেই মেজকর্তা আসতেন তা ঠিক নয় এবং এই ঠিকনয় এর ভিতর যতটুকু কিন্তু ছিল কিছুদিন বাদে সেটা একদম দুরীভূত হয়। মেজকর্তা আসতেন—রাই হয়ত মাছের ডালি থেকে কেবল মাছগুলিকে বেছে বেছে তুলছে—মেজকর্তা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। হলধর কী তার ছেলেরা একটী চৌকী এগিয়ে দিত। মেজকর্তা দাঁড়িয়ে থাকতেন—গাঁয়ের তালুকদার তিনি—এসব বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়ে থাকাটাই তাঁর আভিজাত্য। মেজকর্তা মাঝ বয়সী হবেন—খালি গা—শীতের দিনে বড়জোর একটা উলের গেঞ্জি থাকতো গায়ে, বোতাম খোলা—পৈতেটা ভাজ করে গলায় মুড়িয়ে রাখতেন। মজবুত গড়ন তাঁর দেহটার। পেশীগুলো ফুটে বেড়িয়ে লোককে জানিয়ে দিত, তিনি যে একজন পালোয়ান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কথা খুব কম বলেন—চোখের দৃষ্টিতে একদিকে গোয়ার্তুমীর ছাপ—আর একদিকে কাঠিন্য ভরা গাম্ভীর্য। রাইকে যখন তিনি উদ্দেশ্য করে বলতেন—আস্তে আস্তে একটু মিষ্টি করেই বলতে চাইতেন"—মাছগুলি বেশ খাসা বেছেছিস—দিয়ে আসিস আমাদের বাড়ীতে।"

মেজকর্তাটীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবার বা করবার ছিল না। অথচ হলধর জানতো—ও মাছ কোন্ বাড়ীর জন্য রাই বেছে রাখছে—তাকে বাধা দিতে সে পারবে না। তাই চুপ করে থাকাটাই এই পরিস্থিতিতে হলধরের ছিল সবচেয়ে সোজা পথ। বল্লভপুর গায়ে এমন লোক খুব কমই ছিল, যে বা যারা এই চাটুজ্যে বাড়ী থেকে টাকা, নিদেন পক্ষে দু'চার কাঠা ধান না ধারতো। হলধরও যে-জলায় জাল বাইতো, তার বেশীর ভাগ অংশই চাটুজ্যেদের। অথচ রাইর ঐ বাছা মাছ থেকে যে একটাও পাওয়া যাবে না, হলধর তা জানে। যদি কোন দিন হলধর রাইকে বলতো, "দুগা মাছ ভাইদের লাইগা রাইখা দাও না!"

রাই মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠতো, "আগে সুবৌদির মাছ দিয়া আসি—এ মাছ আর খায় না।"

বাপকে নয় যা বলবার বল্ল—কিন্তু এমন যে মেঝকর্তা—যাঁর ভয়ে গায়ের বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, ও তাঁকেই বলে বসে কিনা, "ইস আমি যেন ওনারই জন্য মাছ বাছছি—আমি তোমার বাদী কিনা!"

হলধরের বুকটা কেঁপে উঠে, "না, এ নচ্ছার বেটীরে নিয়া আর পারা যাইবো না—হারামজাদী কাউরে মাস্তিগস্তি কইরা কথা কইবার পারে না।"

রান্নাঘরের ভিতর থেকে হলধরের বৌ চাপা গলায়

বলে; ওঠে, "চুল ধইরা :মাটিতে মুখ ঘইসা দাও—তুমিইত মাথায় উঠাইছো—আবার নেকাপড়া করাও।"

আশ্চর্য, মেজকত্তা কিন্তু একটুকুও রাগেন না। পান থেকে চুনটুকু খসলে যিনি গায়ে খাণ্ডব দহনের ব্যবস্থা করে বসেন—রাইর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় তিনি একটুও রাগ করেন না। বরং রাইকে তারিফ করে তিনি বলেন, "তোমার এ মেয়েটা ছেলে হ'লে ডিপটী হ'তো। ওর মেজাজটা ডিপটীর মতনই।"

রাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমাদের বাড়ী আর যাসনা কেনরে—যাবি বুঝলি! জমির উচ্ছে এসেছে অনেক, নিয়ে আসবি কতগুলি। হ্যাঁ, হে হলধর, মেয়েকে পাঠিয়ে দিও—নতুন উচ্ছে নিয়ে আসবে কতগুলি।" হলধর কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়ে—মনে মনে মেয়েকে তারিফও করে। মেজকত্তাকে আরো একটু বেশী খুশী করতে চৌকীটা আরো একটু এগিয়ে দেয় সন্তর্পণে। "না, বসবো না, তা কিছু মাছ পাঠিয়ে দিও"—

মেজকত্তা চলে যান। তিনি বসেন না। দিনের বেলা কোন বাড়ীতেই তিনি বসেন না বা বেশীক্ষণ থাকেন না। সূর্যের তাপ তাঁর সহ্য হয় না। বড় লোকের ছেলে রোদের আলো সইবে কেন! তাই মেজকত্তা আসেন—বসেন—গল্প করে বেড়ান—জেলে বাড়ী—কাপালি বাড়ী—আরো কত বাড়ী। রাতের অন্ধকারে রাত কাটাতেও মেজকত্তার বংশমর্যাদায় বাধেনা। দিনের বেলার মেজকত্তা রাত্রের আঁধারে সম্পূর্ণ পালটে যান। তাঁর সে-রূপ জানতো ব্রজ কাপালির বিধবা বোন—জানে শান্ত ঠাইরেন। আর—আর অনেকেই। তাছাড়া মেজকত্তাকে ভালভাবে বোধ হয় চিনেছিল গাঁয়ের মেয়েরা। ছোট বয়স থেকে মেজ—বড় সব বয়সের মেয়ে এবং বউরা মেজকত্তাকে যতখানি চিনেছিল—আর কেউ ততখানি চিনতে পারেনি। পুরুষকে বিশেষ ভাবে চিনবার বোধ-শক্তি বোধ হয় মেয়েদের জন্মগত। একহাত ঘোমটার তলা থেকে পুরুষের হাসি শুনে—কথা শুনে—দৃষ্টি দেখে তারা বলে দিতে পারে—কোন পুরুষের মনের কোণে কোন ভাব লুকিয়ে আছে। এমনকী ছোট মেয়েরাও—যারা সাবালিকত্বের থেকে অনেক দূরে—তারাও মেজকত্তার কাছ ঘেঁসতো না। মেজকত্তাই তাদের ডেকে ডেকে কথা বলতেন—মিষ্টি দিতেন—আদর করতেন। তবু অমন বাঘরাশী মেজ-কত্তাকে তারা যাতা বলে দিত মুখের পরে। বেচারী মেজকত্তা—এত তেজ—এত বিক্রম—মেয়েদের কাছে যেন একাবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়তেন—মন্ত্রপুত সাপের মত মেয়েদের সামনে তাঁর সমস্ত আস্ফালন বন্ধ হ'য়ে যেত—মাটির সংগে মিশে যেতেন তিনি। তখন মেজ-কত্তাকে দিয়ে যে-কোন কাজ করিয়ে নেওয়া যেত—। মেয়েদের ব্যাপারে মেজকত্তা ছিলেন দাতাকর্ণ। শুধু মেজকত্তাই নন, এটা তাদের বংশের ধারা। মেয়েদের পেছনে তাদের পূর্ব পুরুষেরা বহু তালুক—বহু জমি খুইয়েছেন—মেজকত্তাও তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলেছেন। মেজকত্তার পিতামহ স্বর্গতঃ কৈলাশ চাটুজ্যের দাপটে আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা কাঁপতো। নিজেও ছিলেন খুব পালোয়ান। একসংগে দু'টো সড়কী ঘোরা-তেন। কিন্তু তাঁকে একটা অশিক্ষিতা কুৎসিৎ ধোপানী নাকে দঁড়ি দিয়ে ঘোরাতো। মেজকত্তার বাবা গদাই মণ্ডলের বিধবা মেয়েটার জন্য নাকি শেষ পর্যন্ত খুনই হ'লো। সে-খুন আজও গাঁয়ে একটা রহস্য হ'য়ে আছে। সত্যি, ঐ চাটুজ্যে বংশটার খুনেই যেন কী রহস্য!

"বৌদি ও সু-বৌদি"

রাই খালইটা টানতে টানতে দেবুদের বাড়ীতে নিয়ে চলেছে। ওর এই সময়কার ঐ ডাকের সংগে বাড়ীর এঘর-ওঘরের আর সকলের পরিচয় আছে—তাই এ ব্যাপারে যারা কৌতূহলী, রাই পৌছবার পূর্বেই তারা যেয়ে জড়ো হয় যথাস্থানে। রাই দেবুদের অন্দরমহলে রান্নাঘরটার সামনে চটান জায়গাটায় যেয়ে হাজির হয়।

"কৈ খালইর মুখটা খোলনা—কী মাছ আনছিস দেখি আজ।"

দেবুদের বাড়ীর অন্য দুই সরিকের প্রতি-নিধি তালকাকীমা আর বিধবা রাঙা জেঠাইমা জিজ্ঞাসা

করেন। দেবুও এসে হাজির হয়। কিন্তু রাই রাজী নয় খুলতে।

"ইস দেখাবো ক্যান?"

যতক্ষণ সু-বৌদি না আসতো রাই খালইটাকে মাটিতে রাখতো না। দাঁড়িয়ে থাকতো। দর্শকেরাও রাইর চেয়ে এককাঠি ওপরে যেত। রোজই তারা মাছ দেখছে—ঝালডাঙ্গার বিলে যে মাছ ওঠে তা' তাদের অচেনা নয় তবু মাছ দেখবার কৌতূহলকে তারা চেপে রাখতে পারেনা। সুনন্দা হাতে কাজ থাকলে সেরে এসে বলতো, "খোলত মুখটা, দেখি!"

রাই তবু রাজী নয়—মুখ টিপে টিপে হাসতো—আর মাথা নেড়ে বলতো "না—খুলবো না—বল আজ দেবা।"

রাঙা জ্যোঠাইমা অত রয়ে সয়ে কাউকে কথা বলেন না—তিনি যা বলেন—সোজাসুজি বলেন—মুখের পর বলে দেন—কারোর 'অসইলাপনা' তিনি সহ্য করতে পারেন না—তিনি মুখ নেড়েই বলেন, "নে ছেমরী আর অত আদিখ্যাতা করিস না—আনছিস ত পুঁটি মাছ—তার ঢং দেখ না।"

রাই তাকে শুধু একটী কথায় উত্তর দিত, "বেশ।"

তারপর সুনন্দার দিকে চেয়ে থাকতো। সুনন্দা জানতো, রাইর প্রশ্ন কী।

"হ্যাঁ দেবোখন আজ ভাল দেখে একখানা বই পড়তে—তাড়াতাড়ি খোল!"

এবার আর কথা নেই—শুধু মুখ খুলেই নয়—খালই থেকে সমস্ত মাছ গুলিকে রাই মাটিতে ঢেলে ফেলতো। তরতাজা মাছ গুলি চটপট করে লাফাতো। কোনটা হয়ত ছিটকে যেত রাঙা জ্যোঠাইমার পায়ের কাছে। তিনি তিন হাত দূরে সড়ে যেতেন। আর রাইর মুণ্ডপাত করে বলে উঠতেন, "সুনন্দা আস্কারা দিয়া এ গুলারে মাথায় তোলছে—হ্যাঁরে কানী অন্ধ হ'য়ে গ্যাছিস। দিল পা'টা আঁস করে।"

সুনন্দা রাইকে উদ্দেশ্য করে বলতো, "না।এ মেয়েটার জ্বালায় আর পারিনা। এনেছিস—বেশ করেছিস, তা সারা বাড়ীটা মাথায় করে তুলেছিস কেন? আর গোটা জায়গাটা যে তুই আঁস করে ফেললি, কে এখন লেপবে বলতো?"

রাই নির্বিবাদে হজম করে উত্তর দেয়, "কে আর ল্যাপবে? আমি।"

দেবুর রাঙা জ্যোঠাইমা ও ভাল খুড়িমার মনের ভিতরটা যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়—বেটি বাড়ীতে বয়ে এনে মাছ দেবে আবার কুটেও দেবে। আর মাছও বলি মাছ। এরকম জ্যান্ত বড় বড় পাবদা, পুঁটি তারাত চোখেও দেখেনা। মনের এই ভাবটা তারা কেউ চেপে রাখতে পারেননা। ভাষায় প্রকাশ করে ফেলেন। রাঙা জ্যোঠাইমা চোখ দু'টো কপালে তুলে বলেন, "আমার পোলাদের কী আর এ মাছ চোখে পড়ে!"

ভালখুড়ীমা তার কথার জের টেনে নিয়ে বলেন—"পড়ে গো দিদি পড়ে—কিন্তু আমাদের পয়সা কী আর পয়সা?"

রাই বক্র দৃষ্টিতে তাদের দেখে নেয়। চলে গেলে বলে, "বৌদি, উনানে একটা মাছ পোড়াইয়া তিনবার থুইক্যা বিল পাড়ে শাকচুন্নির জন্য ফেইলা দিও। নইলে দাদাগো অজম হবেনা। যে দিষ্টি দিয়া গেল।" সুনন্দা মুখ টিপে হাসে। রান্না ঘরে যেতে যেতে বলে, "রাই, লক্ষ্মী বোন! তুই মাছগুলি কুটে একাবারে আমায় ধুয়ে দিয়ে যা। তোর দাদারা এখুনি খেতে আসবে। আমি ডালটায় সোম্বারা দিয়েনি।" রাই আঁস বটিটা নিয়ে মাছ কুঁটতে বসে যায়।

দেবু কখনও তার দাদার সংগে খেতে বসেনা—যেদিন বসে বেচারীর আর খাওয়া হয়না। টু-শব্দটী না করে মাথাটী গুজে কোন রকমে দু'টি মুখ দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় রাই-ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে বলে, "দেবুদা'র মত এমন শান্তটী আর হয় না।"

দেবু কথা বলতে না পেরে মনে মনে গোজরাতে থাকে—ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়

ভেঙচী কেটে বলতে বলতে যায়, "রাই কিশোরী—পোড়ার মুখী—কলাখাকী—কলা নিল চিলে—হাউ হাউ করে কাঁদে।"

রান্নাঘরে শিবশঙ্করও দেবুর ছড়া শুনে না হেসে পারেননা। সুনন্দা দেবুকে বলে দিয়েছে, "তুমি ঠাকুর পো তোমার দাদার আগেই খেতে বসো। নইলে তোমার পেট ভরে না—স্কুলে যেয়ে মনে মনে আমায় গালি গালাজ করো—বৌদি খেতে দেয়নি বলে।" দেবু তাড়াতাড়ি ডুবটা দিয়ে খেতে বসে যায়।

সত্যি, বৌদি যে কি করে তার মনের কথা টের পায়! তাইত দেবুর এত ভাল লাগে তার বৌদিকে!

সংসারের কাজ সেড়ে আর মাছ রান্না করে দিতে পারে না সুনন্দা। গরম ভাত বেড়ে—আলু মেখে খেতে দেয় দেবুকে। ঘরে করা সরভাজা ঘি আর উনোনের পর থেকে গরম গরম মুসুরী ডাল কেটে দেন কয়েক হাতা। দেবুর খাওয়া শেষ হ'য়ে আসে। রাই মাছ ধুয়ে এনে হাজির করে রান্নাঘরের দোর গোড়ায়। ফোটা ফোটা জল পরে খালইর ছেদা দিয়ে। জেলের মেয়ে—মাছগুলি এমন সুন্দর করে কোটে রাই—আর ধুয়ে এনে যখন হাজির করে রূপোর টাকার মত ঝক ঝক করে। মনে মনে সুনন্দা রাইকে তারিফ না করে পারে না। একটা কাঁসার বেলি এগিয়ে দেয় মাছ রাখবার জন্য। রাই খালই থেকে মাছ রাখতে রাখতে কার জন্য কোন মাছটা রাখতে হবে তার বিলি ব্যবস্থাও করে দেয়। ওর কথার ধরণ শুনে মনে হয়, ও-ও যেন দেবুদের বাড়ীরই একজন। যেদিন মাথায় ছুটুমি চেপে যায়—দেবুকে লক্ষ্য করে রাই বলে, "বৌদি আজ সরপুঁটি মাছ ক্যাবল একটাই পাওয়া গ্যাছে—তুমিত আবার সরপুঁটি মাছই ভাল খাও—তুমিই খাইও, আর টাটকেনী মাছ দু'গা শিবদারে দিও—দেবুদাকে এই রয়না মাছ দিও।" রয়না মাছ দেবু খায় না। এ রকম মাংসল মাছ দেবুর দু'চোক্ষের বিষ। সরপুঁটি মাছ দেবুর খুব প্রিয়। রাই যে দেবুকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্য একথা বলে সুনন্দা তা বোঝে। তাই সেও আরও একটু উসকিয়ে দিয়ে দেবুকে জিজ্ঞাসা করে, "কি ঠাকুর পো—তোমার জন্য তাহ'লে রয়না মাছই নেবো।"

দেবু মুখের ভাত ফুরোবার আগেই জলের গ্লাসটায় চুমুক দেয়—তাড়াতাড়ি গলা থেকে ভাত নামিয়ে বলে, "ইস যেনা মাছ—ওর মাছ আমি খাই না। স্কুল থেকে এসেনি, বড়শী দিয়ে কত মাছ ধরবো।"

ভাতের থালাটা চাটা শেষ হলে দেবু উঠে পড়ে। যাবার সময় রাই'র পিঠে গুড়ুম করে এক কীল মেরে দৌড় দেয়। রাই "উঃ" করে ওঠে। দেবুর কীল বা চড় যখন যার ওপর বসে একটু জানিয়েই বসে। রাই চীৎকার করে বলে, "দ্যাখছো বৌদি!"

দেবুর উদ্দেশ্যে বলে, "ছুয়ে দিলা ডুব দিয়া আসো।" সুনন্দা বলে, "না এ পাগলটাকে নিয়ে আর পারি না। আর তুই কেনই বা ক্ষেপিয়ে নিস। ওকি এখন আবার ডুব দেবে নাকি? রাঙ্গা জ্যেঠাইমা শুনলে আর আমায় বকে রাখবেন না।"

রাই অপরাধীর মত চুপ করে থাকে। সত্যি, রাই'রত দোষ! সে জেলের মেয়ে—ছোয়া বাচিয়ে চলাই যে তার কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য জ্ঞানটুকু সব সময় সে মনে করে রাখতে পারে না। তাই সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বৌদি, তুমি অতসত মানোনা ক্যান—ওবাড়ীর জ্যেঠিমারা কাছ দিয়া গেলেই ডুব দিয়া আসেন।"

সুনন্দা গম্ভীর ভাবে বলেন, "আমি যে ম্লেচ্ছো।"

"ম্লেচ্ছো না ম্লেচ্ছো—তোমার মত সবাই ম্লেচ্ছো হয় না ক্যান বৌদি!"

—(চলবে)

ছিন্নতারা

(গল্প)

শ্রীঅহিংসাব্রত মল্লিক

★

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

রীণা এসে দরজা খুলে দেয়। দুকানের পাশ দিয়ে উসকোখুসকো চুল। বিমর্ষ।

সমর দরজার ভেতরে আসে। সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মুখে যেন চিন্তার ছাপ।

... সমর বি, এ পাশ করে পঁয়তাল্লিস টাকা মাহিনায় ব্যাঙ্কে চাকুরী করে। আজ দু' বৎসর হতে চল্‌ল এই টাকা দিয়েই তার স্ত্রী রীণা, তিন বৎসরের ছেলে এয়ারো; তিনজনের ছোট্ট সংসার পেলে আসছে। এয়ারোর জ্বর হয়েছে। আজ ডাক্তার এসেছিল। ডাক্তার বলেছে, এয়ারোর টাইফয়েড্। রীণা খুবই মুসড়ে পড়েছে তার একমাত্র সন্তানের নিরাময় চিন্তায়।......

রীণা দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়, ছোট্ট একটু দীর্ঘনিশ্বাস বোধ হয় তার নিজেরই অজানিতে ছাড়ে।......

'...ডাক্তার এসেছিল। বল্‌ল, এয়ারোর টাইফয়েড।...'

কথা বলতে গিয়ে রীণার যেন কান্না চেপে আসে। কোনমতে সামলিয়ে নেয়।'......আজ ত মাসের একুশে তারিখ, কিন্তু আমার কাছে যে টাকা ছিল তাত সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ ডাক্তারের প্রাপ্যটাও দিতে পারি নি। এয়ারোর ঔষধও ফুরিয়ে গিয়েছে। কাল না আনলেও চলবে না।' বলতে বলতে এয়ারোর বিছানার পাশে এগিয়ে আসে রীণা সমরের পেছনে পেছনে।

সমর এয়ারোর পাশে বসে তার গায়ের উত্তাপ অনুভব করে। সস্নেহে এয়ারোর চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

'এয়ারো'......আস্তে ডাকে সমর।

'......কেমন লাগছে?'

এয়ারো ওর পিতার আদর যেন সম্পূর্ণ গ্রহণ করে। চোখের পাতাদুটি সরিয়ে দেয়, ফেলে দেয় ওর চাহনি ওর উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত পিতার মুখের ওপর। প্রথম দৃষ্টি যেন অবুঝ। তারপর চিনে নেয় পিতার মুখ। একটু বক্র হাসির রেখা যেন মিলিয়ে যায় তখনি।

'বাবু তুমি এসেছ?'..... এয়ারো ওর সর্বশক্তি দিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে।......'আমার চকলেট্ এনেছ?'

কথা বলে যেন পরিশ্রমের ভার আলগাতে পারে না। আবার চোখ বুজে এয়ারো।

'আনব, কাল ঠিক আনব তোমার জন্য খুব ভাল চক্‌লেট্।' সমরের একটু কম্পিত কণ্ঠ।

এয়ারোর চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।'... ...বাবু তুমি বড্ড দুষ্টু। আমার অসুখ হয়েছে আর তুমি কত দেরি করে আস বাড়ী। আমার একটুও ভাল লাগে না তোমাকে ছাড়া। তুমি আমাকে কত আদর কর। তুমি না থাকলে মাও চুপটি করে বসে থাকে আমার মুখের দিকে চেয়ে। কোন কথা বলতে চায় না। কাল থেকে তুমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসবে। কেন এত দেড়ী কর বাবু?'

এতগুলি কথায় একবারে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

'বাবু একটু জল।' এয়ারো পাশ ফিরে শোয়।

সমর থাকে কলকাতার বাইরে শ্যামনগর। কলকাতা থেকে করতে হয় 'ডেইলি পেসেঞ্জারী' রেলে। বাড়ী থেকে রওনা হতে হয় ভোরেই কোনমতে চারটি গরম ভাত খেয়ে। আবার কাজ থেকে ফিরতে ফিরতেও বেশ দেরি হয়ে যায়।

'তুমি হাত পা ধুয়ে এস।'......রীণা একটু ঘেসে দাঁড়ায় সমরের।......'আমি চা করে নিয়ে আসছি।'......বলে রীণা চলে যায় ভেতরের ঘরে।

সমর এয়ারোর দিকে চেয়ে ভাবছিল ওর গত জীবন, আর তার সাথে অচ্ছিন্ন বন্ধনে ওর অদৃষ্ট।

......সমর ছোটবেলা থেকে সংগতি পারিপার্শিক আবহাওয়াই প্রতিপালিত। সমরের বাবার ছিল চালের ব্যবসা। হঠাৎ ব্যবসায়ের উত্থানপতন রীতির তালিকাভুক্ত হয়ে সমরের বাবা যতীন বোস কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বন্ধু ব্রজনারায়ণ মল্লিকের সাথে ভাগে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। যতীন বাবু কিছু লাভবান হন।

এই সময়ে সমর বি, এ পরীক্ষার পার্থী হয়। সমরের তখন হেসে খেলে দিন যায়।······

······সমর একদিন বিকেলে বাসায় এসে দেখে ওদের পাশের বাসায় নূতন ভাড়াটে এসেছে। নূতন ভাড়াটে ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক। প্রায়ই সমরদের বাসায় আসে। নাম বিপিন মিত্র।

সমর সেদিন নটা দশটার সময় কোথায় যেন বের হচ্ছিল, এমন সময় ওর বাবা ডাকে। বোধ হয় বাইরের ঘর থেকে। 'সমর এদিকে এস······।'

সমর ঘরে ঢুকে দেখে বাবার পাশের চৌকিতে বসা নূতন ভদ্রলোক।

'······এই যে সমর, আমার ছেলে। এর কথাই বলছিলাম। এবার বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে। উনিকে প্রণাম কর সমর।'

সমর প্রণাম করে।

'থাক্ বাবা থাক্। বেঁচে থেকে জীবনে উন্নতি কর এই প্রার্থনা। তারপর পাশ করে কি কবে ভেবেছ? তা বেশ ত এখন ত কিছু করছ না, যে সময়টা ফাঁকা কাটাচ্ছ ওই সময়টা না হয় আমার রীণুকে একটু আধটু পড়াওনা কেন। তোমার কোন আপত্তি নেই ত?'

বিপিন বাবুর গলায় অমায়িকতার ভাব।

সমর যেন কুণ্ঠিত হয়। '······না এতে আমার আপত্তি থাকবার কি আছে। বরং সময়টুকু বেশ কাজে লাগানো যাবে।'

'বেশ বেশ তবে কাল থেকেই তুমি রীণুকে পড়াতে যেও। আচ্ছা এখন আমি উঠি। আমার একটু বেরোবার দরকার ছিল।'

সমর দৃষ্টি নামিয়ে চৌকি হতে উঠে দাঁড়ায়। ······এই সূচনাতেই সমর রীণার সাথে জীবনের অকাট্য সম্পর্ক বেঁধে ছিল······

······তারপর······

চিন্তার ধারা বেঁধে দিয়ে রীণা চা নিয়ে আসে। সমরের মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির রেখে মুখোমুখি দাঁড়ায়।—

'—নাও চাটা খেয়ে নাও।'

সমর ফিরে চায়, হঠাৎ তার সাথে বেরিয়ে আসে অন্তরের অতলস্পর্শী একটা দীর্ঘ তপ্তশ্বাস।

রীণা ছোটপটটা সামনে টেনে চা'র বাটিটা রেখে দেয়।

'এখনও হাতপা ধুতে যাওনি! কি ভাবছিলে এতক্ষণ বসে বসে। সংসারের আবর্তমান ধারা? ভেবে আর কি হবে। চা খেয়ে নাও জুড়িয়ে যাবে। আমি এয়ারোর জন্য একটু 'গ্লুকোস' নিয়ে আসি।'

সমরের আজ চিন্তার শেষ নেই।

চা'র বাটি থেকে উঠ্ছে ধুঁয়া, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় কয়েক মুহূর্ত পরেই।

সমর সেদিকে চায়। শুষ্ক দৃষ্টি তার। ওর মনে হচ্ছে যেন এমনি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় ওরও আজ জীবনের সব শক্তি, উদ্দীপনা উৎসাহ মিলিয়ে যাচ্ছে কালের ক্রূঢ় চাহনিতে।

রীণার হাতে বাটী। সমরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'······এয়ারোকে একটু ডাক। গ্লুকোসটা খাইয়ে দিই।'

সমর জবাব দেয়না। বিছানার পাশ থেকে উঠে চৌকিতে বসে। '·····রীণু তোমার কাছে ত আর একটি টাকাও নেই। কালকে কি করে চলবে তাই ভাবছি। ম্যানেজারের কাছে কিছু চাইব অগ্রিম, কিন্তু যদি না পাই। এয়ারোর ঔষধ কালকে ত আনতেই হবে।'

সমরের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দেয়······

'কি করবে বল? সবই আমাদের ভাগ্য।' উদাস দৃষ্টি রীণুর।

রীণুর অপলক দৃষ্টি স্মরণে এনে দেয় ওর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হতে আজকের দীনতম অবস্থার সূচনা। ···...সেদিন, যেদিন সমর প্রথম এলো ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতে, শিক্ষকের গাম্ভীর্য নিয়ে, রীণা এসে বসেছিল একই মাদুরে সমরের সাথে সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে, সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে, পদপ্রান্ত

ঢেকে দিচ্ছিল বারবারই ওর আঁচল দিয়ে, অনবগুন্ঠিতা হয়েও যেন নববধুর সঙ্কোচতা নির্বিবাদে অধিকার করেছিল।……

……তারপর পিতার অনুমতি সমরের সাথে নূতন জীবন চালনায়। তাদের ছোট্ট সংসারে আসে নূতনত্বের দীপশীখা নিয়ে এয়ারো।……

……তারপর……। সমরের পিতা শয্যাশায়ী হয়, প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে অন্যলোকে যাবার উদ্যোগে। বাধ্য হয়ে সমর বুঝে নেয়ে সবকিছু ব্যবসায়ের। কিছুদিন পরেই এলো মনুষত্বের চরম অভিশাপ। দুর্ভিক্ষের লুব্ধ ক্রূঢ় গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ লুপ্ত হল জীবনের সুচিপত্র হতে। আর একদিকে মনুষত্বের চরম দীনতার উদাহরণ দেখিয়ে চোরা কারবারেরা চারকুল বানের ডাকে কাঁপিয়ে টাকার অঙ্ক বাড়াতে লাগল ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সমর এই অমানুষিকতায় তাল দিতে পারলনা। সে তার বিবেককে কিছুতেই বুঝিয়ে দিতে পারছিল না, কেন মানুষ মানুষেরই মুখের গ্রাস ছিনিয়ে এনে তার স্বার্থের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা করে। সমর তার ব্যবসায়ের ভাগী ব্রজনারায়ণ বাবুর সহকারীতা করে স্বার্থের অঞ্চল বোঝাই করতে পারছিল না। ব্রজনারায়ণ মল্লিক ঘোর ব্যবসায়ী। ও কিছুতেই এই সুযোগ ছেড়ে নিজের বুদ্ধির দৈন্যতা স্বীকার করতে চায় নি। ফলে সমর ব্রজনারায়ণের উল্টো টানে নিজেকে সামলাতে না পেরে ব্যবসায়ে তার অংশ ব্রজনারায়ণের কাছে সমর্পণ করে—ব্রজনারায়ণ মল্লিককে ব্যবসায়ের একছত্র অধিপতি ও চোরাবাজারের একনিষ্ঠ সহায়ক করে দিল। ……… এরপর থেকেই তাদের বর্তমান পরিস্থিতির সুচনা……।

এয়ারো অনেক কষ্টে এপাশ ফিরে—

'মা একটু জল।'

রীণার মগ্নতা হঠাৎ ছুটে যায়। রীণা এয়ারোর উপর ঝুঁকে বলে—'নাও গ্লুকোসটা খেয়ে নাও।'

……রাতটা একটু ভালই কেটেছে। এয়ারোর আর জর বাড়েনি। ভোরে উঠে স্নান আহার সেরে সমর কাজে যায়। কার্যালয়ে এসেই সে ম্যানেজারের খোঁজ নেয়। ম্যানেজার নাকি কিছুক্ষণ হল বেরিয়ে গিয়েছেন দরকারী কাজে, আসতে তিন চার ঘণ্টা দেরী হবে। সমর নিরুপায় ভাবে নিজের চেয়ারে এসে বসে, কাজে মন দিতে পারেনা কিছুতেই। ছটফট করে কোনমতে অপেক্ষা করে ম্যানেজারের জন্য। ম্যানেজার আসলে ছুটে যায় সমর তার কাছে, কুন্ঠিত ভাবে দাঁড়ায়—

'আজ্ঞে, আজ দশ বার দিন হল আমার একমাত্র ছেলের অসুখ। মাসের ত শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়টার হিসেবের অতিরিক্ত খরচ করবার মত সামর্থ ত থাকেনা কাজেই দয়া করে যদি আমাকে কিছু অগ্রিম……'

'আপনাদের সংসারের পারিবারিক দৈন্যতার কি জবাব দেবে এই অফিস? এটা চেরিটেবল ফাঙ্কশন নয়।'

কথাগুলি শুনে সমরের সমস্ত শিরাগুলি যেন অবশ হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। তারপরই যেন ঝলক দেয় রক্ত তার মস্তিস্কের শিরা উপশিরায়।

সমর যেন তার টুটি ধরে বুঝিয়ে দেয় সে ভিক্ষা চাইতে আসেনি শুধু তার প্রাপ্যটিই দাবী করতে এসেছিল আইনতঃ তার সাথে কালের শুষ্কহাসির সঙ্কেতে তার দৈন্যতার সহানুভূতির একটু প্রয়াসের দাবী নিয়ে।

কিন্তু যে সমাজ যে সংসার পয়সার দাম্ভিকতায় অভিজাত্য তৈরী করে নেয় সে সংসারে সমরের ক্ষমতা কতটুকু!

সমর চুপ করে যায়……।

'তবে দয়াকরে আমাকে এই কয়েক ঘণ্টার ছুটিদিন, কোন মতে টাকার বন্দোবস্ত আমাকে করতেই হবে আজকের মধ্যে।' সমরের গলায় ব্যকুলতা।

ম্যানেজার কিছুক্ষণ চুপ করে হয়ত। তার দাম্ভিকতার ওজন ঠিক করে নেয়—'আচ্ছা যান।' নম্রস্বর ম্যানেজারের।

সমর কার্যালয় হতে সোজা নিজের বাড়ী আসে। বিমর্ষভাবে চৌকি খানায় বসে পড়ে। রীণা এসে

সমরের গা ঘেঁসে দাঁড়ায় অনেকক্ষণ। চিবুক তুলে ধরে সমরের।—

'—টাকার জোগাড় করতে পারনি বুঝি?'

সমরের ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইতে থাকে। '—না ম্যানেজার দিলনা অগ্রিম।'

কিছুক্ষণ সবচুপ।

রীণা আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় সমরের চুলে! হয়ত: একটু আবেগ তন্ত্রীতে। আরো কাছে ঘেঁসে দাঁড়ায় রীণা। আবেগের অনুকম্পায় সমর টেনে নেয় রীণার একটি হাত ওর দুহাতের মধ্যে, মৃদু চাপ দিতে দিতে বলে—'রীণু হয়ত: আমার জীবনের অভিসম্পাত—তোমাকে আমি সুখী করতে পারলাম না। তোমার প্রতীক আমাদের এয়ারোকেও বোধ হয় দারিদ্রের বেড় হতে ছিনিয়ে আনতে পারব না।'

সমর চায় রীণার মুখের দিকে হয়ত ওর কথার নিহিত বেদনার অংশীদার পাবার জন্য।

রীণা নীরব। উত্তর দেয় তার সুন্দর নিটোল গণ্ড বেয়ে পড়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

রীণা নিঃশব্দে খুলে দেয় ওর হাতের একগাছা চুরী যার মধ্যে জড়িয়ে আছে ওর পিতার স্নেহের সর্বস্ব খুইয়ে দেওয়ার স্মৃতি।

'নাও এটা। ওষুধ নিয়ে এস এয়ারোর জন্য।'

নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় সমর। পরক্ষণেই যেন ছড়িয়ে যায় ওর অনুভূতি প্রত্যেক তন্ত্রীতে। টেনে নেয় ওর হাত পেছনে—'না, না, না রীণু এ আমি নিতে পারবনা কিছুতেই।

কপালের শিরা ফুলে উঠে উত্তেজনায়।

'এয়ারোর দিকে দেখ। তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে এস। এই ট্রেণেই চলে যাও, না হলে আসতে দেরী হয়ে যাবে।' রীণার গলায় গাম্ভীর্য।

সমর যেন অবাধ্য হতে পারেনা রীণার। যন্ত্রচালিতের মত চলে যায় জামা কাপড় পরে।

……ট্রামে, বাসে অসম্ভব ভীড় ঠেলে এক হাতে ওষুধের শিশি ও আর এক হাতে রুমালে বাঁধা কিছু ফল আর পকেটে এয়ারোর জন্য কয়েকটা চকলেট নিয়ে ছুটে আসে সমর ষ্টেশনে।

গাড়ীতে এতটুকু যায়গা নেই। সমরের সঙ্কীর্ণতায় যায়গা খুঁজে বের করবার আগেই ট্রেন শত শত প্রাণ বুকে করে ধক্ ধক্ করতে করতে চলতে সুরু করে দেয়। সমর এই সময়টুকুতেই কোনমতে ট্রেনের পাদনিতে ঝুঁকে পড়ে অন্যলোকের পা ঠেলে।

ট্রেণ জোরে চলে। সমরও কতক্ষণে এয়ারোর কাছে পৌছবে, ওকে চকলেট দিয়ে কত খুসী করবে; ওর চিন্তার স্রোত ট্রেণের গতির তালে তালে মিলিয়ে অগ্রসর হয়।

সমর সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। ট্রেণের বেগ কমে আসে। বোধ হয় ষ্টেশনে আসে। হঠাৎ ট্রেণে ঝুঁকি লাগে। পাশের ভদ্রলোক ঝোঁকের তাল সামলায় সমরের কাঁধ ধরে।

আনমনা সমর সবকিছু বুঝে নেবার আগেই ছিট্‌কিয়ে পড়ে ট্রেণ থেকে দূরে। মূর্চ্ছিত, রক্তাক্ত হয়ে যায় কপালের চারপাশ। সন্ধ্যার ধূসরে: ঠোঁট দুটো নড়ে সবাইর অজানিতে হয়ত বেরোয় অস্পষ্ট একটু শব্দ, অস্ফুট আর্তনাদ হয়ে—'এয়ারো, রীণু…… ।'

সম্পাদকের দপ্তর

[illegible] (জিলা স্কুল, বরিশাল)

বেগম নূর বানু (সুন্দরকাঠি, বরিশাল)

(১) গত শ্রাবণ সংখ্যার 'নতুনের সন্ধানে' শীর্ষক আপনার প্রবন্ধটী পাঠ করলুম। চিত্রে যোগদানেচ্ছু বাংলার অগণিত তরুণ-তরুণীর কাছে এবং ফিল্ম কোম্পানীর বড় কর্তাদের নিকট এ লেখাটি নতুন পথের ইংগিত দেবে। আপনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখার শেষে 'জয় হিন্দ' বলে সমস্ত পাঠক-গোষ্ঠীর কাছ থেকে আপনি বিদায় নিয়েছেন। আগেই বলছি, কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগি নিয়ে এ প্রশ্ন করছিনে। রূপ-মঞ্চ হিন্দু বন্ধুদের কাছে যেমন প্রিয়—সংখ্যায় অল্প হ'লেও মুসলমানদের কাছেও তেমনি প্রিয়—তাই আপনার লেখা 'জয় হিন্দ' হিন্দু বন্ধুদের কাছে প্রিয় হ'লেও মুসলমানরা অপছন্দ করতে পারেন তো? (২) পার্কসার্কাস অঞ্চলে কোন মুসলিম ভদ্রলোক পরিচালিত 'মহুয়া ফিল্মস কোম্পানী নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং 'আজাদ' পত্রিকায় ছাড়া আর কোন পত্রিকায় উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। রূপ-মঞ্চ চিরদিন যে-কোন নূতন প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা করে আসছে—পরবর্তী সংখ্যায় আশা করি এ বিষয়ে বিশেষ করে জানতে পারবো—জানাবেন তো? ( ) "দুঃখে যাদের জীবন গড়া" "ঝড়ের পর" করে কোথায় মুক্তিলাভ করবে? "দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রটির কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম করবেন কী?

● ● (১) 'নতুনের সন্ধানে' আপনাদের প্রশংসালাভে সমর্থ হ'য়েছে—এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'জয় হিন্দ' বলে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছি বলে আপনারা এই বলে অভিযোগ এনেছেন—এতে মুসলমান পাঠক-পাঠিকাদের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু এই আপত্তির মূলে যে কোন ভিত্তি নেই একথা আশা করি আপনারা মুসলমান হ'য়েও অস্বীকার করতে পারবেন না। 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি—তা নিয়ে বাদানুবাদ করে আর তিক্ততা বাড়িয়ে তুলতে চাই না কিন্তু এ কথাও আপনারা স্বীকার করবেন—'জয় হিন্দ' কথাটী হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলনের মহান আদর্শ থেকেই উদ্ভূত। ঐ ধ্বনির মধ্য দিয়ে মিলনের যে সুর বেজে উঠেছিল—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে, সে সুর আমাদের দেশমাতৃকার বন্ধন মূলে যে কঠোর সংঘবদ্ধ আঘাত করেছিল—তার ভিতর ত সব জাতিই ছিল। তাই, হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলনের বাণীই ঐ শব্দটীর ভিতর নিহিত রয়েছে। এতে মুসলমানদের মোটেই আপত্তি করা উচিত নয়। তবে এই প্রসংগে আমার ব্যক্তিগত কয়েকটী কথা বলবার আছে। কলকাতার গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এবং এ প্রসংগে আমার যা সাবধান বাণী তা হিন্দু ভাইদেরই বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই। দাঙ্গাটা হ'য়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—প্রত্যেক নেতারাই স্বীকার করেছেন—রাজনীতির সংগে এর কোন যোগ নেই। অথচ দাঙ্গার সময় রাজনৈতিক ধ্বনি দুই পক্ষই ব্যবহার করেছেন। এতে পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে খুবই ছোট করা হয়। মুসলমানরা 'আল্লাহ আকবর' বলেন তাতে আপত্তি নেই—হিন্দুরা 'হর-হর বম্ বম্—ভোলানাথ' বলুন তাতেও বলবার কিছু নেই—কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানরা মুসলীম লীগের কোন রাজনৈতিক ধ্বনি যেমন ব্যবহার করতে পারেন না—হিন্দুরাও তেমনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কোন ধ্বনি ব্যবহার করতে পারেন না। বন্দেমাতরম—জয়-হিন্দ কংগ্রেসের জাতীয় ধ্বনি—সে ধ্বনি—কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় কোন হিন্দুরই তা উচ্চারণ করবার অধিকার নেই। কারণ, কংগ্রেস তা শিক্ষা দেয় না। ঠিক অনুরূপ বলা যেতে পারে মুসলমানদের বেলায়ও। হিন্দুদের

দেবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা মোটেই শোভন নয়—সেখানে যদি কোন পতাকা তুলতে হয়—তা হিন্দু মহাসভার পতাকা তুলতে হবে। হিন্দুরা তা করেন না বলেই—আজ জাতীয় পতাকা—বন্দেমাতরম বা জয়-হিন্দ মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগীতে দেখে থাকেন—তাঁদের দিক থেকে যা মোটেই অশোভন নয়। তাই, হিন্দু ভাইদের কাছে বিশেষ করে আমাদের বলবার—কংগ্রেসের প্রতি যদি তাঁদের আনুগত্য থাকে—কংগ্রেসের ধ্বনি—পতাকা প্রভৃতিকে তাঁরা যেন ধর্মীয় ব্যাপারের সংগে জড়িয়ে না ফেলেন। তাহ'লে কোন মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ই এগুলিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগীতে দেখবেন না। এ বিষয়ে কংগ্রেসেরও সচেতন হওয়া দরকার। অন্যত্র বিষদভাবে এ নিয়ে আমাদেরও আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

রূপ-মঞ্চের বহু পাঠক-পাঠিকা মুসলমান। রূপ মঞ্চ সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে আছে। তার সম্পাদক হিন্দু বলে মনে করবেন না—রূপ-মঞ্চের পাতায়ও সে ধর্মকেই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হবে। ঘরে বসে আমি হরিনামের মালা জপতে পারি—কিন্তু এখানে যখন রূপ-মঞ্চের জন্য কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসি, তখন আমি কোন্ ধর্মাবলম্বী তাও ভুলে যাই। তখন মনে থাকে, আমি রূপ-মঞ্চের সম্পাদক—বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অগণিত যাঁর পাঠক। যাঁরা ভারতের সন্তান। এবং ঐ ভারত-সন্তান টুকুর সংগেই যতখানি যোগাযোগ। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের সাধ্যানুসারে সর্বপ্রকার নীচতা থেকে রক্ষা পাবার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই রূপ-মঞ্চের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যয়িত হয়। আপনারা রূপ-মঞ্চের পাঠক-সমাজ যদি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থেকে—দেশের মহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেন, রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টা তখনই স্বার্থক বলে মনে করবো।

(২) মহুয়ার কর্তৃপক্ষ কোন সংবাদই আমাদের কাছে পাঠান নি—তাহলে নিশ্চয়ই রূপ-মঞ্চের পাতায় তা দেখতে পেতেন। চিত্র ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা বা ব্যবসায়ীরা অন্ততঃ বাংলায় মোটেই দৃষ্টি দেন না—তাই চিত্রজগতে কোন্ মুসলমানের আগমনকে আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। এবিষয়ে যা ত্রুটি আমাদের নয়—'মহুয়া'র কর্তৃপক্ষদের। তারপর তাঁরা যদি চিত্রের কাজ আরম্ভও করতেন, তখন আমরা ষ্টুডিও মহল থেকে সংবাদ পেতাম এবং নিজেরা আগ্রহ করে সে সংবাদ প্রকাশ করতাম, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কোন সংবাদই আমরা পাইনি। তারপর অনেক মুসলমান আছেন—চিত্র ব্যবসায়ে যাঁরা অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক—বা ইতিমধ্যে হ'য়েছেনও তাঁরা মুসলমান বলে প্রকাশ করতে চান না এই জন্য যে, তাহ'লে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পাবেন না। আপনারা জেনে খুশী হবেন—ছায়ানট পিকচার্সের 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের স্বত্বাধিকারী একজন আদর্শবাদী মুসলমান। তাঁর নাম মিঃ আতাউল হক। আমরা যখনই একথা জানতে পারলাম—তখনই আমাদের সাধ্যানুযায়ী সৎপরামর্শ তাঁদের দিলাম। এবং ছবির প্রচার কার্য কীভাবে করতে হবে—তাও তাঁদের জনৈক প্রতিনিধিকে স্বার্থহীন ভাবেই বলেছি। এবং আমাদের এই আদর্শের কথা জানতে পেরে তাঁরাও খুশী হ'য়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। (৩) 'ঝড়ের পর' এবং 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' সম্পর্কে অন্যত্র যে সংবাদ প্রকাশিত হ'লো তা থেকেই চিত্র দু'খানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

জয়াদেবী (বরানগর) (১) 'বন্দেমাতরম' চিত্রে শকুন্তলা নামে যে অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন তাহার প্রকৃত নাম শকুন্তলা না এটী তার ছদ্মনাম? (২) শ্রীমতী শ্রীলেখা আর চিত্রে নামছেন না কেন? (৩) ছবি বিশ্বাসের প্রতিভা কোন চিত্রে বিকাশ লাভ করেছে এবং কোন চিত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন!

● ● (১) শকুন্তলা রায় ছদ্মনাম। এর সংগে পূর্বে আপনারা অঞ্জলি রায় নামে পরিচিত আছেন। (২) সম্প্রতি কোন একটী ছবিতে শ্রীলেখা বলে এক শিল্পীর নাম দেখতে পেলাম। ইনিই আমাদের পরিচিত

শ্রীলেখা কিনা সঠিক জেনে পড়ে জানাবো। (৩) 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' প্রথম শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের চিত্রাবতরণ। 'দুইপুরুষে' তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পরিচয় পেয়েছি।

বেণীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাকপুর) অশোক কুমার এবং কানন দেবীকে সত্যই এক সংগে দেখা যাবে? যদি যায় কোন চিত্রে?

● ● হ্যাঁ। দেবকী বসুর পরিচালনায় 'চন্দ্রশেখর' চিত্রে তাঁরা একত্রে অভিনয় করছেন।

অমিতাভ রায় (বালীগঞ্জ) রক্সী সিনেমা কি শুধু 'কিসমৎ' এর জন্যই তৈয়ারী হ'য়েছে? এর কারণ কী?

● ● এর উত্তর দিতে পারেন একমাত্র দর্শক-সমাজ। রক্সীর কর্তৃপক্ষ ব্যবসা করতে বসেছেন—যে মাল বাজারে চলে তাঁরা তাই চালাবেন। মাল পঁচা কী খাঁটি তা বিচার করবার দায়িত্ব ক্রেতাদের।

বেলা মুখোপাধ্যায় (পূর্বাচল, লালদীঘি, বহরমপুর) সুনন্দা দেবীর ঠিকানা কি? আমি তাঁর সহিত পত্রালাপ করিতে চাই।

● ● সুনন্দা দেবীর সঠিক ঠিকানা আমাদের জানা নাই। আপনি ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও টালীগঞ্জ—এই ঠিকানায় পত্র দিতে পারেন।

করালীমোহন চট্টোপাধ্যায় (শ্যামবাজার) ফিয়ার লেন, বহুবাজারের প্রাক্তন বাসীন্দা) (১) 'উদয়ের পথের' রাধামোহন ভট্টাচার্য কি পূর্বে অপরাধ ছবিতে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য নামে অভিনয় করেছিলেন? (২) সংগ্রাম ও বন্দেমাতরম এই ছবি দুটীর কোনটী শ্রেষ্ঠ। বন্দেমাতরম ছবি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?

● ● আপনার চিঠির প্রথমাংশ প্রকাশ করতে পারলুম না বলে দুঃখিত—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আপনাদের বিপর্যয়ের কথায় খুবই মর্মাহত হ'য়েছি। রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করবেন।

(১) হ্যাঁ। (২) 'বন্দেমাতরম' এর সমালোচনা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে। 'বন্দেমাতরম' এর প্রযোজক এবং পরিচালকদের সংগে পারিবারিক দিক থেকে আমার সম্পর্ক রয়েছে—সেদিক থেকে তাঁরা দু'জনেই আমার পূজ্য ব্যক্তি। তাই তাঁদের প্রভাব সমালোচনায় যদি অতর্কিতে এসে যায়—এইজন্য 'বন্দেমাতরম এর সমালোচনা লিখবার পর যখন আমাদের বিভাগীয় সম্পাদকদের ভোট গ্রহণ করা হয়—আমি তা থেকে দূরে ছিলাম। এবং গত সংখ্যায় যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে—তা লিখবার সময় সমালোচক মণ্ডলীর যে বিচার-সভা বসে তা থেকেও আমি দূরে ছিলাম। কিন্তু সমালোচক মণ্ডলী 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে যে রায় দিয়েছেন—রূপ মঞ্চের একজন একনিষ্ঠ সেবক হ'য়ে আমি তাকে কোন মতেই অবমাননা করতে পারি না। তাই 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে—সে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে—তাই সত্যিকারের অভিমত বলেই মনে করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে বন্দেমাতরম থেকে সংগ্রামকেই আমি উচ্চে স্থান দেবো।

সুনীল কুমার বসাক (বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা) শুনিতেছি 'তোমারই হউক জয়' এই নামে একখানি বই গ্রহণ করা হইতেছে একথা কী সত্য?

● ● হ্যাঁ। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ক্লাসিক ফিল্মের এই চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। কাহিনীটীও তাঁরই রচনা।

শিশির কুমার সেনগুপ্ত (শ্রীবাস দত্ত লেন, হাওড়া) (১) আপনাদের পত্রিকায় যে সমালোচনা-গুলো বেরোয় সেইগুলি বেশ ভাল লাগে। প্রথমে বোধ হয় সমালোচনা করতেন আপনি নিজে। তারপর সেখানে আবির্ভাব ঘটলো শ্রীপার্থিবের। গত বৈশাখ মাসের রূপ-মঞ্চে দেখলাম সমালোচনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছেন শ্রীপার্থিব, রাজগুরু এবং শীলভদ্র। শেষোক্ত ব্যক্তি দু'জন সমালোচনা করেছেন 'মাই সিষ্টার' এবং মেঘদূত। এটা বোধ করি স্বীকার করবেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি সমান নয়। সুতরাং আপনাদের সমালোচনা ক্ষেত্রে যদি নিত্য নূতনের আবির্ভাব ঘটে .

তবে আপনাদের সমালোচনার মান যে কি করে বজায় থাকবে তাত ভেবে পাইনে।

(২) শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত কর্তৃক সুর সংযোজিত গরমিল, শেষ উত্তর, দম্পতি প্রভৃতি বইগুলোর গানের স্বরলিপি বহুদিন আগে পুস্তকাকারে পাওয়া যেত—বর্তমানে সেগুলি পাওয়া যায় কিনা? এবং পাওয়া গেলে কোথায় ও কোন ঠিকানায়।

●● (১) নিত্য নূতন নাম দেখে রূপ-মঞ্চের সমালোচনার মান নীচু হ'য়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেন, রূপ-মঞ্চের একজন হিতকাঙ্ক্ষী পাঠক হ'য়ে আপনার পক্ষে এই আশঙ্কা অহেতুক নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা যে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি, তা জানলে আপনার আশঙ্কা দূর হ'তে পারে বলেই সমালোচনা সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার কয়েকটী কথা বলছি। প্রথমতঃ রূপ-মঞ্চের সমালোচনার ভার কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নেই- কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত—নিরপেক্ষদৃষ্টি-সম্পন্ন—রা জ নৈ তি ক-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়েই রূপ-মঞ্চের সমালোচক-মণ্ডলী গঠিত। আপনারা বোধ হয় জানেন, কর্তৃপক্ষ চিত্রমুক্তির পর (পূর্বে চিত্রমুক্তির পূর্বে) বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিকদের ছবি দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করে থাকেন। ভদ্রতার খাতিরে আমাদের তরফ থেকেও প্রতিনিধি পাঠিয়ে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকি। তাই চিত্রজগতের অনেকে মনে করেন, যিনি প্রেস-শোতে এলেন তিনিই বুঝি ছবির সমালোচনা লিখবেন। মূলতঃ কিন্তু তা নয়। সমালোচক মণ্ডলীর একাধিক সভ্য (সবসময় সকলে একত্রে যেয়ে উঠতে পারেন না) টিকিট কেটে সাধারণ দর্শকদের মাঝে মিশে ছবি দেখে সমালোচনা লিখে থাকেন। লিখবার ভার অবশ্য এঁদেরই ভিতর যে-কোন একজন নিয়ে থাকেন। তাঁর লিখিত সমালোচনাটী সমালোচক মণ্ডলীর বৈঠকে (সভ্যদের দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকা চাই) পড়া হয়। এবং সকলের মত নিয়ে—অদল বদলের প্রয়োজন হ'লে তা করে নিয়ে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়। এই সমালোচক মণ্ডলীর নাম সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হয়—তাই সমালোচনাটী যদি আমিও লিখি—অনেকক্ষেত্রেই আমার নামও প্রকাশ করা হয় না—কোন চিত্রও নাটক সৃষ্টির মূলে আমার কোন বন্ধু থাকতে পারেন—সাংবাদিকের আদর্শ রক্ষা করতে যেয়ে তাঁর বিরুদ্ধেও আমাকে রূঢ় কথা বলতে হ'লো—যা তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে নাও পারতে পারেন (যদিও তাঁর পারা উচিত) সেক্ষেত্রে বেনামটীর দোহাই দিয়ে আমি বন্ধুর কাছ থেকে রেহাই পেতে পারি। তাই, যে নামেই সমালোচনা প্রকাশিত হউক না কেন—আপনাদের সংকিত হবার কোন কারণ নেই—সেজন্য সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। রূপ-মঞ্চের কাছে বাংলা ছবি ও নাটকের উন্নতির দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী—এ বিষয়ে আমরা যদি আংশিক কৃতিকার্যতাও লাভ করি—তখন সর্ব ভারতীয় চিত্র ও নাট্যজগতের প্রতি দৃষ্টি দেবো। তাই হিন্দি এবং অন্যান্য প্রদেশের ছায়াছবির সমালোচনা অথবা প্রচারকার্যে যদি আমাদের কোন শিথিলতার প্রকাশ পায় বর্তমানে—বাঙ্গালী হয়ে আশা করি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনবেন না। এ কথায় প্রাদেশিকতার অভিযোগ এনে আমায় ছোট করতেও যদি চান—আমার আপত্তি নেই—কারণ, প্রথম আমি বাঙ্গালী—তারপর ভারতীয়—তারপর হয়ত বিশ্ব-প্রেমিক হ'তে চেষ্টা করবো।

(২) শেষ উত্তরের জন্য আপনি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচার সচিব রীতেন এণ্ড কোং ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীটে লিখলে প্রকৃত সংবাদ জানতে পারবেন। এবং দম্পতি ও গরমিল সম্পর্কে সুশীল সিংহ, প্রচার সচিব এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ ৩২-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীটে পত্র লিখবেন।

সুনন্দা রায় (দাওনাগাছি রোড, বালী) আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রূপ-মঞ্চের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—লণ্ডন অবধি রূপ-মঞ্চ পৌঁছেছে রূপ-মঞ্চ পাঠকদের কাছে তা সুখেরই। তাই রূপ-মঞ্চের অক্লান্ত কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতিমাসে রূপ-মঞ্চের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকি। দেখুন ইংরেজী শব্দের টুকরোগুলি কি বাদ দিলে চলে না—মাতৃভাষার

ভিতর কি উক্ত উচ্চারণগুলি নেই? শ্রীমতী সাধনা বসু বর্তমানে কোন্ ছবিতে অভিনয় করছেন? শ্রীমতী মলিনা কী নিজস্ব বাড়ীতে বাস করেন? রেণুকা রায়, পূর্ণিমা দেবী, ভারতী দেবী ও সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব পর পর সাজিয়ে দিন।

● ● রূপ-মঞ্চের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পাঠিকা হ'য়ে আপনি তার কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন—আমরা রূপ-মঞ্চের কর্মীরা সশ্রদ্ধভাবে এই অভিনন্দন গ্রহণ করেছি—আপনাদের এই অভিনন্দন আমাদের কর্মজীবনে প্রেরণা জাগাবে। ইংরেজী শব্দ যতটা সম্ভব আমরা এড়িয়ে চলি। এবং ইংরেজী শব্দের পরিভাষা ব্যবহারের দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখি। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যার উচ্চারণ আমরা সকলে একভাবে করি না···তাই যে উচ্চারণ আমরা করি তা লিখে সংগে সংগে মূল শব্দটী বসিয়ে দি। কোন উদ্ধৃতাংশ বাংলায় অনুবাদ করে মূল অংশের সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। এ বিষয়ে যেখানে আমরা ইংরেজী শব্দ এড়িয়ে যেতে পারবো—সেদিকে আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। শ্রীমতী সাধনা বসুর বর্তমানে কোন খবর নেই। 'অজন্তা'র কোন গুহায় এখন শিল্পী সাধনা গভীর ধ্যানে মগ্ন—ধ্যান ভংগ হ'লে সংবাদ জানাবো। হ্যাঁ শ্রীমতী মলিনা তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে বাস করেন। যে চারজন অভিনেত্রীর আপনি নাম করেছেন—প্রায় প্রত্যেকেরই এক একটী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চাপল্যের দিক থেকে—চার

রজনী পিকচার্সে'র 'তপোভঙ্গ' চিত্রে সন্ধ্যা ও জহর

জনেই নৈপুণ্যের দাবী করতে পারেন। রেণুকার বয়সের জন্য— তার চাপল্য আমরা সহ্য করতে পারি না। যৌন আবেদনের দিক থেকে সন্ধ্যা বোধ হয় সকলকে ছাড়িয়ে যাবে। তারপর পূর্ণিমা এবং রেণুকা। ভারতীর অভিনয়ে একটা সংযত, শান্ত ভাব ফুটে উঠে যার সার্বজনীনতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই অভিনয় প্রতিভার দিক বিচার করে বলতে গেলে—ভারতীর জনপ্রিয়তার কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। তারপর সন্ধ্যা, রেণুকা এবং পূর্ণিমার কথা বলতে হয়।

শ্রীমতী লীলা চট্টোপাধ্যায় (হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ) (১) বসুমতি শারদীয়ায় চলচ্চিত্র সাংবাদিক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিই কী শারদীয়া রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়েছে। তার ঠিকানা কী?

(২) আমার পিতা একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান করছেন—তাতে নূতনেরাই স্থান পাবে—কাহিনীকার থেকে আরম্ভ করে টেকনিসিয়ান পর্যন্ত নূতন। এ উদ্দেশ্য কী আপনি সমর্থন করেন?

(৩) বর্তমানের শ্রেষ্ঠ পরিচালক কে?

(৪) শ্রীপার্থিবের ঠিকানা কি?

(৫) আমি আপনাদের গ্রাহক হ'তে চাই—কি করতে হবে?

(৬) বর্তমানে উপযুক্ত সংগীত পরিচালক পাওয়া যায় না কেন?

●● (১) হ্যাঁ। তিনি বাগবাজার অঞ্চলে কোথায় যেন থাকেন—ঠিকানাটা আমাদের জানা নেই। (২) আপনার পিতার এ পরিকল্পনাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তবে কার্যক্ষেত্রে কী তার পরিচয় পাওয়া যাবে? আর নূতন নিতে হবে বলে—যাকে তাকে দেখলেই আমরা খুশী হবো না—যে নূতনের ভিতর সম্ভাবনা আছে তাকে দেখলেই সম্পূর্ণভাবে আপনার পিতাকে সমর্থন করতে পারবো—এবং এ ব্যাপারে আমাদের সামর্থানুযায়ী সহযোগীতাও তিনি আশা করতে পারেন। (৩) ১৯৫২ সালে দর্শক সাধারণের নির্বাচনে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হ'য়েছেন। (৪) শ্রীপার্থিব, ৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। (৫) মণিঅর্ডার করে নাম, ঠিকানাসহ প্রচারসচিবের নামে আট টাকা পাঠিয়ে দেবেন—গ্রাহক করে নেওয়া হবে। (৬) খোঁজার মত খুঁজলেই পাওয়া যায়।

ডি ব্যানার্জি (১১৬৯) (১) কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আই, এন, এ পিকচার্সের পক্ষ হইতে নরেশ মিত্র যে 'স্বয়ংসিদ্ধা' বইখানা তুলিতেছেন তাহার ভূমিকায় কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছেন?

(২) শান্তি প্রডাকসন্সের পক্ষ হইতে সুকুমার দাশগুপ্ত এস, পি নং ১ বলিয়া যে বইখানা তুলিতেছেন তাহাতে কে কে অভিনয় করিতেছেন?

(৩) প্রমোদ দাশগুপ্তের পরিচালনায় ইউ, সি, এ ফিল্মের পক্ষ হইতে 'যা হয় না' বলিয়া যে বইখানা তুলিতেছেন তাহাতে কোন্ কোন্ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছেন?

(৪) প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নিউ থিয়েটার্সের ২ নং ষ্টুডিওতে যে 'সুধার প্রেম' বলিয়া বইখানা তুলিতেছেন—তাহাতে কে কে অভিনয় করিতেছেন?

●● (১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পিকচার্স (আই, এন, এ) প্রযোজিত 'স্বয়ং সিদ্ধা' চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয়ের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। শ্রীযুক্ত মিত্র ছাড়া আরো অনেককে দেখা যাবে 'স্বয়ং সিদ্ধা'য়—তার ভিতর কয়েকজন নূতনও আছেন। (২) এ বিষয়ে এখন অবধিও আমরা কোন খবর জানতে পারি নি। (৩) গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করা হ'য়েছে। (৪) 'সুধার প্রেমের' কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী অমলা দেবী। কাহিনীটা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকালিপি এখন পর্যন্তও নির্বাচিত হয় নি।

ভগবতী শীল (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা) (১) ভারতীকে আর কোন্ বাংলা ফিল্মে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

(২) সিপ্রা দেবী, অজন্তা কর ও মায়া দেবী এই নবাগতদের ভিতর কে ভাল অভিনয় করেন?

(৩) যুগের দাবী, মন্দির, অভিযোগ ও তুমি আর আমি এই চিত্রগুলির মুক্তির আর কত দেরী?

(৪) যুগের দাবী নামে বইখানিতে যে পান্না অভিনয় করছেন, তিনি কী সেই জীবন সঙ্গিনীর পান্না? তাই যদি হয় তাহা হইলে এতদিন চিত্রজগৎ হইতে দূরে সরে ছিলেন কেন? (৫) বন্দেমাতরম, সংগ্রাম, বিরাজ বৌ ও নতুন বৌ এই চিত্রগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিন। (৬) মৌচাকে ঢিলে অভিনয় করবার পর শমিতা দেবী চিত্র হইতে বিদায় নিয়েছেন কী?

● ● (১) দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর' চিত্রে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'নতুন খবর'-এ ভারতীকে দেখতে পাবেন। (২) নিঃসন্দেহে সিপ্রা দেবীর নাম করা যেতে পারে। (৩) কলকাতায় নূতন করে বিশৃঙ্খলা না দেখা দিলে বড়দিনের সময় থেকেই এদের দেখতে পাবেন।

(৪) হ্যাঁ। সেকথার উত্তর তিনিই দিতে পারেন। (৫) সংগ্রাম, বিরাজ বৌ, বন্দেমাতরম, নতুন বৌ। (৬) না।

চন্দ্রশেখর প্রসাদ দে (জামালপুর, ময়মনসিংহ) (১) বাংলা ছবির এত অবনতির কারণ কী? (২) যে মহিলাটী পূর্বের ছবিতে যে যুবকের সংগে স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন পরের চিত্রে তাহাকে তার (যুবকের) মাতা অথবা কন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এটা খুবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না কী? বয়সেরও তো কথা আছে? (৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ-প্রশ্ন কী চিত্রে হইতে পারে না? (৪) শ্রীমতী ছায়াদেবীকে (বড়) বোধ হয় চিত্রজগত হইতে অবসর নেওয়া উচিত। তাহার আর কোন উন্নতির আশাই নাই।

● ● (১) দর্শকেরা নীচুস্তরের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলে। (২) সবক্ষেত্রেই যে অশোভন মনে হয় তা নয়। স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে যে অভিনেত্রী সুনাম অর্জন করলেন—মায়ের ভূমিকায় যদি তিনি মাতৃত্বকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাহলে বলবো—তাঁর অসীম অভিনয়-নৈপুণ্য রয়েছে। যুবক বা যুবতীর ভূমিকায় যুবক বা যুবতীকে ত মানাবেই—বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ভূমিকায় যে যুবক বা যুবতী অভিনয় করে বার্দ্ধক্যকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন—তাঁর অভিনয় প্রতিভার কাছে আপনা থেকেই মাথা নুইয়ে পড়বে। তবে যখন কোন যুবক বা যুবতী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করবেন—সত্যিই তাঁর অভিনয়ে এবং রূপ-সজ্জায় অভিনীত চরিত্রটী ফুটে উঠেছে কিনা সেইটেই বিচার্য। স্ত্রীর ভূমিকাভিনয়ের সময় যদি স্ত্রীকে খুঁজে না পাওয়া যায় —তবেই আমাদের অভিযোগের কারণ থাকতে পারে —নইলে নয়। কোন অভিনয় দেখবার সময় শিল্পী পূর্বে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সেটা বিচার্য নয়—বর্তমানে যে চরিত্রে অভিনয় করলেন তাঁকে সুষ্ঠুরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন কিনা সেইটেই বিচার্য। বরং আমার ত মনে হয়, এতে অনেকটা একঘেয়েমীর হাত থেকে বাচতে পারি। (৩) কেন হ'তে পারবেনা —তবে সেজন্য যেমন পাকা হাতের প্রয়োজন—তা গ্রহণ করবার মতও পাকা মনের দরকার। (৪) শ্রীমতী ছায়াদেবী নিঃশেষিত হ'য়েছেন বলে আমার মত আরো অনেকেই বিশ্বাস করেন না।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্ণেল গঞ্জ, এলাহাবাদ) (১) সমস্ত ভারতীয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের বিশেষতঃ প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনী লইয়া একটী পুস্তক রচনা করতে চাহি এবিষয়ে কিরূপ সুবিধা হইতে পারে? (২) আমার বয়স ২০। স্কুলে বিদ্যার্জন করিতে পারি নাই সুতরাং খুব কম বয়সেই আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল—কিন্তু সিনেমা বা চিত্রজগতের নানান বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। (৩) রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওর রূপকার শ্রীযুক্ত কালিদাস দাস মহাশয়ের নিকট কিছু কথা জানিতে চাই—তাহার ঠিকানাটী যদি সঠিক জানান খুবই উপকৃত হবো।

● ● (১) এরূপ একখানি পুস্তকের যথেষ্ট সম্ভাবনা

রয়েছে। (২) তবে আপনি নিজের সম্পর্কে—যা বলেছেন—তাতে আমার মনে হয়না এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটী আপনি সমাধান করতে পারবেন। এজন্য শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই চলবে না—শিক্ষা ও লিখবার ক্ষমতা থাকা চাই—শিক্ষা বলতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ'-এই কথাই আমি মনে করি না। কিন্তু আপনার লিখিত পত্রখানি দেখে আপনার পক্ষে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্য-সমাধান সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়েছে। হয়ত কতকগুলি ছবি দিয়ে বইখানিকে আকর্ষণীয় করলে পয়সা পেতে পারেন—কিন্তু তাতে কাজ হবেনা। আর এই তেইশ বছরে চিত্রজগত সম্পর্কে কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন! তবু আপনাকে নিরুৎ-সাহিত করতে চাইনা—নিজের সম্পর্কে ভাল ভাবে যাচাই করে তবে অগ্রসর হবেন। (৩) শ্রীযুক্ত কালিদাস দাস, রূপ-কার, রাধা ফিল্ম ষ্টুডিও, টালীগঞ্জ এই ঠিকানায় পত্র দিতে পারেন।

শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজচন্দ্র সেন লেন, কলিকাতা) (১) আমাদের দেশের চিত্রজগতের কয়েকটী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কেউই নতুন-মুখের সন্ধান দিতে পারেন না কেন? কোন নতুন প্রতিভাকে কেন স্থান দেওয়া হয়না? প্রতিভার অব-হেলায় কী চিত্রজগতের উন্নতি সম্ভব? (২) শুনিয়াছি বাংলায় উচ্চ শিক্ষিত অভিনেতার সংখ্যা নগণ্য অথচ বিলাতে নাকি অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত—ইহার কারণ কী? (৩) সিনেমা জগতে প্রবেশ করতে হইলে কি কি গুণ থাকা উচিত—ঐ সকল গুণের অধিকারী হইলে আপনি কি প্রবেশ পথের সন্ধান দিতে পারেন।

● ● (১) এনিয়ে বিশদ ভাবে গত শ্রাবণ সংখ্যায় আমি আলোচনা করেছি। শুধু প্রতিষ্ঠান গুলিরই ঘাড়ে দোষ চাপালে চলবে না। সত্যিকারের নতুন যে আসেন না—বা তাঁদের সন্ধান যে খুবই কম পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—নতুন যদি তৈরী করে নেওয়া যায় তবেই এ অভাব মিটবে নইলে নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে সব নতুনেরা ষ্টুডিও জগতের আশপাশে ঘুরে বেড়ান বা আমাদের কাছে এসে ধর্ণা দেন—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি—তাঁদের মাঝে প্রতিভার সন্ধান মোটেই পাওয়া যায় না। তাঁরাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান যে, নতুনদের পক্ষে চিত্রজগতের পথ একদম বন্ধ। চিত্রজগতের পথ যে উন্মুক্ত সর্ব-সাধারণের জন্য আমি তা বলছিনা—কিন্তু আমাদের সমাজের অন্যান্য স্তরে প্রবেশ করতে যে সব বাধা বিঘ্ন আছে—চিত্রজগতের প্রবেশপথ তার চেয়ে বন্ধুর বলে আমি মনে করিনা। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভা শুকিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিভা থাকলে কেউ তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা। তাই, চিত্রজগত প্রতিভাকে অবহেলা করে বলে যদি অভিযোগ করেন, আমি তা মোটেই স্বীকার করবো না। (২) বিলেতের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের এখানে জনসাধারণের ক'ভাগ শিক্ষিত বলুন ত? চিত্রজগতেও তাই এই দৈন্য। (৩) তারপর বি, এ পাশ করে কেউ ৫০৲ টাকায় কেরাণীগিরি করতে রাজী আছেন—কিন্তু উক্ত যুবকটী যদি প্রিয়দর্শন হন—অভিনয় দক্ষতাও যদি তাঁর থাকে কোন মতেই চিত্রজগতে পা বাড়াবেন না। তাঁর ইচ্ছা হলেও আত্মীয় স্বজনের কথা চিন্তা করে সে ইচ্ছাকে দাবিয়েই রাখতে হয়। অথচ ওরূপ একটী যুবক ৫০৲ টাকার ৫০ গুণ যে চিত্রজগতে আয় করতে পারেন—তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাও ভেবে দেখেন না। তারপর নিছক লোকে দুর্ণাম দেবে বলে চিত্রজগতে পা বাড়াবো না—এই অভিমতকে আমি কোন মতেই স্বীকার করতে পারবো না। যদি আমি বুঝি আমার প্রতিভা রয়েছে—আত্মীয় স্বজনের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে আমায় আসতে হবে। কিন্তু মনের সেই সবলতা আমাদের ক'জনের আছে? ছেলেদের কথা ছেড়েই দিলাম, যুদ্ধের দৌলতে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদেরও ত দেখেছি বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতে—এবং তাদের জীবনযাত্রার বিরুদ্ধেও যেসব অভিযোগ আমাদের কানে এসেছে—তা

যে সম্পূর্ণ অলীক নয় তাও অনেকে স্বীকার করবেন—কিন্তু তবু তাঁরা চিত্রজগতে পা বাড়াতে সাহসী হন না কারণ লোকে নিন্দা করবে। পুরুষ এবং মেয়ে সকলেরই মনোবৃত্তি যখন এই, তখন নূতন আপনি আশা করতে পারেন কোত্থেকে—তাই আজও দেখছি সেই বিশেষ এক শ্রেণীর ভিতর থেকেই নতুন অভিনেত্রী সংগৃহীত হচ্ছে। চিত্রজগতের একজন একনিষ্ঠ সেবকরূপে তাই ঐ বিশেষ শ্রেণীর ঘৃণীত, অবহেলিত নতুনদেরই অভিনন্দন জানাচ্ছি—।

(৩) শিক্ষা, রুচী, চেহারা, কণ্ঠস্বর অভিনয়ের সম্ভাবনা থাকলে যেকোন পুরুষ এবং মেয়েকে চিত্রজগতে প্রবেশ-লাভে সাহায্য করতে পারি। তবে প্রার্থীরূপে আসবার পূর্বে প্রত্যেককেই নিজেকে একবার নিজের কাছে যাচাই করে নিয়ে হাজির হতে অনুরোধ করি।

কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় (ডিষ্ট্রিক্ট জাজেজকোর্ট হুগলী) (১) D. G. এখন কি বই তুলিতেছেন। (২) 'তুমি আর আমির' পরিচালক ও সংগীত পরিচালক কে কে?

●● (১) ডি, জি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী শৃঙ্খলের কাজ শেষ করে 'শেষ-নিবেদন' নিয়ে ব্যস্ত। (২) পরিচালক: অপূর্ব মিত্র। সংগীত পরিচালক: রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সনৎ কুমার ঘোষ (ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা) (১) জীবন গাঙ্গুলী কি চিত্রজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন? (২) রাধামোহনের পরবর্তী চিত্রের নাম কী? (৩) শ্রীজ্যোতীর্ময় রায় ও বিনতা বসুর যে বিবাহ হইবার কথা ছিল—তাহা কী সত্য?

●● (১) অসুস্থতার জন্যই তাকে বিদায় নিতে হ'য়েছে, তাঁর সঠিক সন্ধান আমরাও পাচ্ছি না—পেলে জানাবো। (২) অভিযাত্রী, হবে জয়। (৩) হ্যাঁ। তাঁরা বর্তমানে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

নীরোদবরণ নাথ (কাজলসার, শ্রীহট্ট) কবে কোন শিল্পী প্রথম অভিনয় করেছেন—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে বিল্টু গুপ্ত সংগৃহীত 'কবে এদের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছে' প্রবন্ধই পেয়েছেন। পৃথক-ভাবে আপনার সবগুলি প্রশ্নের যদি উত্তর দিতে হয় তাহ'লে একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা দরকার। তাই ভবিষ্যতে সংক্ষিপ্ত করে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করবেন—উত্তরও দিতে চেষ্টা করবো।

শান্তারাণী মুখোপাধ্যায় (যদুনাথ মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা) (১) আপনাদের পত্রিকার প্রথমেই লেখা আছে মঞ্চ, পর্দা প্রভৃতির……কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা মঞ্চের চেয়ে পর্দাই পছন্দ করেন বেশী। কারণ, গতপ্রায় তিন সংখ্যা ধরে মঞ্চের কোন খবরই দেন নাই—কিন্তু এই কমাসে কী মঞ্চে কোন নতুন নাটক অভিনীত হয় নি?

(২) কালিকার উপর আপনাদের এত রাগ কেন? প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছি যে, আপনারা তার ওপর বিতশ্রদ্ধ। কালিকার প্রথম মুক্তি থেকে আজ অবধি আপনাদের পত্রিকায় তাদের নাটকগুলির যে কয়টী সমালোচনা পড়লাম—সমস্তই তাদের বিরুদ্ধে কেন? তাদের নাটক কী একটীও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নি—তারা দর্শক বা সাংবাদিকদের কী ভাল ব্যবহার করেন না? আমার মনে হয়, তাদের থিয়েটার অন্যান্য থিয়েটার অপেক্ষা ভাল। সিন-সিনারি তাছাড়া ওরাই প্রথম আমাদের মহাত্মাদের মর্মর মূর্তি ওদের থিয়েটারে স্থাপন করেছেন—তবু ওদের ওপর আপনাদের কেন রাগ?

●● (১) আপনার এই অভিযোগ মোটেই মেনে নিতে পারবো না। কারণ, মঞ্চ সংক্রান্ত প্রবন্ধ রূপ-মঞ্চে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। দেশীয় নাট্য-মঞ্চ, মিশরিয় নাট্য-মঞ্চ, সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ সংক্রান্ত প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হ'য়েছে। তাছাড়া নাট্য-মঞ্চ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশ করা হয়। এমন কী সৌখীন নাট্যান্দোলনকেও রূপ-মঞ্চে শ্রদ্ধার সংগে আসন করে দেওয়া হ'য়েছে। নাট্য-মঞ্চকে সবসময়েই আমরা অগ্রে স্থান দি' এবং দেবো। তবে স্থানীয় নাট্য-মঞ্চগুলির সংখ্যাল্পতার জন্য—তাদের সংবাদ হয়ত খুব কমই দেখতে পান। সংবাদ পরি-

বেশনের দায়িত্ব থেকে মঞ্চে নতুন আলোক পাতের দায়িত্বকে আমরা বড় বলে মনে করি। তারপর নাটকের সমালোচনাও রীতিমত ভাবেই করা হ'য়ে থাকে। ২।১ টা হয়ত বাদ পড়ে যেতে পারে—কিন্তু সেটা বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য। নাট্য-মঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা মোটেই উদাসীন নই। এবিষয়ে যদি কেউ উদাসীন হ'য়ে থাকেন—তবে তাঁরা আমাদের মঞ্চমালিকেরাই। তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগকে সত্য বলে প্রমাণ করবার মালমসলার অভাব হবে না। তবু আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন—সে অভিযোগ থেকে মুক্ত হ'তে আমরা সচেষ্ট থাকবো। (২) আপনার এ অভিযোগটীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কালিকা, শুধু কালিকা কেন? কারোর বিরুদ্ধে আমরা কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করি না। অনেকক্ষেত্রে চিত্র ও নাটকের প্রযোজকেরা বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না—তাই তারাই একহাত নেবার জন্য তাদের প্রচার বিভাগকে রূপ-মঞ্চে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন এই মনে করে যে, হয়ত বিজ্ঞাপনের কথা চিন্তা করে রূপ-মঞ্চ আবার লেই লেই করে এগিয়ে যাবে। কিন্তু রূপ-মঞ্চের দৃঢ়তার পরিচয় তাঁরা পেয়ে থাকেন যথাসময়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করলেও—সত্যি যদি তাঁরা প্রশংসার কোন কাজ করেন—সকলের আগে রূপ-মঞ্চ তাঁদের অভিনন্দন জানায়—আবার বিজ্ঞাপন দিয়েও যদি নিন্দার কোন কাজ তাঁরা করেন সেকথা বড় করে বলবার মত রূপ-মঞ্চের বড় গলাও কোন সময় খাটো হয়না। ব্যক্তিগত ভাবে বা কাগজ সংক্রান্ত বিষয়ে কাউকেও আমরা শত্রু বা আমাদের বিরুদ্ধদলীয় বলে মনে করি না —আমাদের আদর্শের তাপ সহ্য করবার যাঁদের শক্তি নেই—অযথা তাঁদের তাতিয়ে তুলবার চেষ্টা থেকে কেবল আমরা দূরে থাকি। কারণ, জেগে যাঁরা ঘুমোয় তাঁদের ঘুম ভাঙাতে এখনও আমরা কৃতকার্য হয়নি। কালিকার কর্তৃপক্ষ সবাই আমাদের বন্ধু। যে কয়েকখানি নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন—তাঁর ভিতর যেটুকু তাঁদের প্রশংসা প্রাপ্য আমরা দিতে কার্পণ্য করিনি। কালিকার নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, প্রযোজক শ্রীকালিদাস, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতসিংহ (বর্তমানে রঙমহলে) এঁদের কাছে লিখলেই আমাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শ্রীপ্রসাদ কুমার বোস (প্যারীমুর লেন, কলিকাতা) অধুনা বাংলা ছবিতে কোন অভিনেতা এবং অভিনেত্রী সকলের চেয়ে বেশী অর্থ গ্রহণ করেন? (২) কমল দাশগুপ্ত এবং পঙ্কজ মল্লিকের মধ্যে সুরশিল্পী ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ?

● ● (১) অভিনেতাদের ভিতর জহর, ছবি এবং অহীন্দ্র প্রায় সম পর্যায়ভুক্ত। অভিনেত্রীদের ভিতর কানন দেবী। (২) সুরশিল্পীরূপে কমল দাশগুপ্ত এবং গায়ক হিসাবে পঙ্কজ মল্লিক।

সন্দীপ বসু (বোলপুর, শান্তিনিকেতন) আচ্ছা জগন্ময় মিত্র কী সুরসাগর হ'য়েছেন? বাংলাদেশে গায়কদের মধ্যে এ পর্যন্ত কে কে ঐ সম্মানলাভ করেছেন?

● ● হ্যাঁ। স্বর্গতঃ হিমাংশু দত্তও সুরসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। বর্তমানে আর কে কে আছেন সঠিক বলতে পারি না।

মোহাম্মদ আত্তোয়ার রহমন (হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা) রাণীবালা কী চিত্র জগত হইতে বিদায় নিয়েছেন?

● ● না। কিছুদিন পূর্বে তাঁকে 'নতুন বৌ'তে দেখেছেন? এবং ভবিষ্যতে আবার তাঁকে দেখতে পাবেন। বর্তমানে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে 'রাজপথ' নাটকে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং রঙমহলের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন।

সিদ্ধেশ্বর কংসবণিক (টালীগঞ্জ রোড, কলিকাতা) পি, ডাবলিউ ডি নাটকে মিঃ সেনের ভূমিকায় স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে কার অভিনয় অধিক জনপ্রিয় হ'য়েছিল। মাইকেলের ভূমিকায়ও শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের ব্যাপারে ঐ একই প্রশ্ন আমার।

● ● পি, ডাবলিউ ডি'তে ৺দুর্গাদাস এবং মাইকেলে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার।

সুনীল নন্দী ও পুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় (স্কট লেন, কলিকাতা) (১) সৈনিক নাকি পর্দা'য় রূপায়িত হচ্ছে ভূমিকা লিপি এইরূপ হ'লে কোন হয়? পান্নালাল—দেবী। অনুপম—মিহির। উমা—রেণুকা। সুপ্রিয়া—সুমিত্রা। দ্বারিক—অহীন। সাহেব—জীবেন। যামিনী—সন্ধ্যা। অনিমা—মণিকা। কার্তিক—শ্যামলাহা। বিজয়—বুদ্ধদেব। রঞ্জন—জহর। লীলা—সুনন্দা। ভূষণ—ফণী। কেদার—অমর। (২) শিশির কুমারকে বাদ দিয়ে ছায়া জগতের শ্রেষ্ঠ—চারজন অভিনেতার নাম পর পর সাজিয়ে দিন।

● ● (১) আপনাদের চরিত্র বণ্টনের প্রশংসা করবো। (২) ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, নরেশ মিত্র, দেবী মুখোপাধ্যায়।

তারক নাথ দাস (রূপলাল হাউস, ঢাকা) জানতুম না যে আপনারা শারদীয়া সংখ্যায় গ্রাহকদের মতামতকে রূপায়িত করবেন কেননা এর পূর্ব-সংখ্যা আমি পাইনি, আর সেইজন্যই আমি শারদীয়া সংখ্যাকে অভিনন্দিত করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছি। পড়ে দেখলুম ঢাকা থেকে কেউ কিছু লেখেন নি—কতকটা হয়তো বা সেকারণেও। আমার মতামত জানাবার প্রয়াস পেলুম—মনে আশা আছে যে, আপনাদের আগামী সংখ্যায় আমার মতামতটুকু প্রকাশ করবেন।

সম্পাদক মহাশয় তাঁর দরদী মন নিয়ে প্রতি সংখ্যায় দেশপ্রীতিমূলক যেসব প্রবন্ধ পরিবেশন করেন তাতে এটুকু স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, উনি আমাদের রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগত যাতে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো আমাদের দেশের জনগণকে জাতীয়ভাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উপযোগী হ'য়ে ওঠে সেটা দেখতে চান—এজন্য আমি সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সম্পাদকীয় বিভাগ উপভোগ করবার মতো। চিত্রজগতের অজ্ঞাত মনকে সজাগের পথে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাছাড়া চিত্রজগতের শিল্পীদের সাথে পাঠকদের পরিচয়সূত্রে বেঁধে দেবার শ্রীপার্থিবের নৈপুণ্য সত্যিই অভিনব ও মনোরম। ভবিষ্যতে শিল্পীদের সাথে এরকম সহজ আলাপী প্রবন্ধ তাদের সংগে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠতর করে আনবে এটুকু আশা করি।

এবার কার শারদীয়া সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কালীশ বাবুর 'দেশ বিদেশের পুতুল নাচ', নিতাই সেনের 'ছবির জন্ম রহস্য' খগেন রায়ের 'পরিচালকের বাধাবিপত্তি' অমিতাভ রায়ের 'আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার কার্য' এবং ফণীন্দ্রনাথ নাথ পালের 'নব কনলাকান্তের স্বপ্ন-কাহিনী' প্রভৃতি পড়ে প্রচুর আনন্দের ভিতর জ্ঞানের খোরাক পেয়েছি। আমার মনে হয় শারদীয়া রূপ-মঞ্চে গল্পের সংখ্যা কমিয়ে প্রবন্ধ বাড়ালে আরো সর্বাংগ সুন্দর হ'তো। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে রূপ-মঞ্চই চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত একমাত্র নির্ভীক মাসিক পত্রিকা। আমি আপনাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কামনা করছি, যাতে রূপ-মঞ্চ তার নিজস্ব স্পষ্টবাদীতায় দিন দিন আরো জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

● ● গত সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ আপনার অভিনন্দন পত্রটী প্রকাশ করতে পারিনি। সেজন্য দুঃখিত। আপনাদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতায় রূপ-মঞ্চের রূপ চিরদিন যাতে উজ্জলতর হ'য়ে ওঠে—তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্যামলশ্রী

কদম কদম বাড়ায়ে যায়
খুশীকে গীত গায়ে যায়
এ জিন্দগী হায় কোম্ কী
(তো) কোম্ পে লুটায়ে যায়।
তু শেরে হিন্দ্ আগে বাড়
মরনেসে ফিরভি তুন ডর
আসমান্ তক্ উঠাকে শর্
জোসে বতন বাড়ায়ে যায়॥
তেরে হিম্মৎ বাড়তি রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
যো সামনে তেরে চড়ে
তো খাক্‌মে মিলায়ে যায়।
চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী নিশান্ সামালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহরায়ে যা লহরায়ে যা॥

হিন্দুস্থান রেকর্ড—এইচ ১২২৪ (এইচ, এস, বি ৩৫২৫) আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বজননন্দিত সমর সংগীত হিন্দুস্থান রেকর্ড কম্পানী অনেকদিন আগেই সাধারণ্যে প্রচারের জন্য রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু বাধা-নিষেধের কবলে পড়ে তা প্রকাশিত হয়নি—সম্প্রতি এই গানখানি প্রকাশিত হ'য়েছে। এই গানখানির সুর দিয়েছেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক—গেয়েছেন নেতাজীর ভ্রাতষ্পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রীগণ। 'কদম-কদম বাড়ায়ে যা' সংগীতটীকে যে কয়জন শিল্পী সুর সংযোজনা করেছেন তার ভিতর শ্রীযুক্ত মল্লিকের সুর সংযোজনাকে নিঃসন্দেহে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারি। সংগীতটী গীত হবার সংগে সংগেই কুচকাওয়াজের তালে তালে পা চলতে চায়—আর মনে অপূর্ব প্রেরণারও সঞ্চার করে। এখানেইত সুরকারের সার্থকতা। যাঁদের দরদী গলায় সংগীতটী গীত হ'য়েছে—তাঁরাও এ বিষয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারেন। আমরা পঙ্কজ বাবু সুর সংযোজিত রেকর্ডটীর বহুল প্রচার কামনা করি। আমাদের মত যে কোন শ্রোতার মনকেই এই সংগীতটী উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস—এন ১৬৭৫৭ (ও, এম, সি ২১২৯১) 'কদম কদম···বাড়ায়ে যায়' সংগীতটীর রেখা-রূপ হিজ মাষ্টারস' ভয়েসও দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্তের সুর সংযোজনায় এই গানখানি রেখা রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। গেয়েছেন জগন্ময় মিত্র, কল্যাণী দাস, প্রিয়া চ্যাটার্জি প্রভৃতি। একথা স্বীকার করতেই হবে, পঙ্কজবাবুর সুরে সংগীতখানির যে 'spirit' তা অব্যাহত রয়েছে কিন্তু কমলবাবুর সুরে ক্ষুন্ন হ'য়েছে অনেকখানি। কমলবাবুর মোলায়েম সুর আনন্দ দেয় কিন্তু উদ্দীপিত করে তোলে না। তাই কমলবাবু আমাদের কিছুটা নিরাশ করেছেন বৈ কী ?

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস—কিউ, এস, ২১২৮ (ও, এম, সি, ২১৩১৪৬), সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টসের উক্ত সংগীতখানির সুর সংযোজনা করেছেন কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-খ্যাত শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন। জাতীয় সংগীতগুলির সুর সংযোজনায় ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত সেনকে আমরা অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করেছি। কিন্তু তাঁর বর্তমান সুর সংযোজনাকে সেরূপ প্রশংসা করতে পারবো না বলে দুঃখিত। এখানে গেয়েছেন শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর পার্টি। বাইচ খেলবার সময় যেমন বৈঠা দিয়ে নৌকাকে ঠেলা মেরে এগিয়ে দিতে হয়—শ্রীযুক্ত সেন তেমনি ভাবে আলোচ্য সংগীতটীর গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। চলার ছন্দ তাতে ফুটে উঠেছে সত্য—কিন্তু কুচকাওয়াজ করবার সময় সৈনিক যখন এগিয়ে চলে—তখন তার গতি খুব স্বাভাবিক—ও

দীপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে তার পরিচয় পাইনি। তাছাড়া রেকর্ডিং-এরও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—টি এম ৮-৪৩২ (এন জি ৮৯২৯) সরকারের বিধিনিষেধের হাত এড়াবার জন্যই বোধ হয় মূল সংগীতের কথার মাঝে মাঝে অন্য শব্দ সংযোগ করে এঁরা আলোচ্য সংগীতখানিকে রেখায় রূপায়িত করে তুলেছিলেন। এ গান খানির সুর (এন জি ৮৯২৯) কোন রকমে হলেও যে কণ্ঠে—সংগীতখানি বেজে উঠেছে সে কণ্ঠই সংগীতটিকে ব্যর্থ করেছে। এই চারখানা রেকর্ডের ভিতর হিন্দুস্থানকে প্রথম—হিজ মাষ্টার ভয়েস দ্বিতীয়, সেনোলা তৃতীয় এবং ইয়ং ইণ্ডিয়াকে চতুর্থ মানে স্থান দেওয়া যেতে পারে। এবং কিনবার সময় এই মানের কথা শ্রোতাদের মনে রাখতে অনুরোধ জানাই। তবে সংগীতখানির রেকর্ড করবার জন্য আমরা উক্ত চারিটী প্রতিষ্ঠানকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুভ সুখ চৈনকি বরখা বরষে ভারত ভাগ হ্যায় জাগা,
পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালয় নীলা যমুনা গঙ্গা,
তেরে নিত গুণ গায়
তুঝে জীবন পায়ে
সব তন পায়ে আশা,
সুরজ বন কর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা
জয়হো, জয়হো, জয়হো জয় জয় জয় জয়হো।
সব কি দিলমেঁ প্রীত বরষে তেরি মিঠে বাণী,
হর সুবেকে রহনেওয়ালে হর মজাহবকে প্রাণী,
সব ভেদ ও ফারাক মিটাকে
সব গোদমে তেরি আকে
গুঁথে প্রেম কি মালা
সুরজ বনকর জাগপর চমকে ভারত নাম-সুভাগা
জয়হো, জয়হো, জয়হো জয় জয় জয় জয়হো।
সুবহ্ সবেরে পাখ পাখেরু তেরিহি গুণ গাওয়ে
বসতারি ভরপুর হওয়ে জীবন মেঁ রুট-লায়ে
সব মিলকর হিন্দ ফুকারে
জয় আজাদ হিন্দ কি নারে
পিয়ারা দেশ হামারা
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম-সুভাগা,
জয়হো, জয়হো, জয়হো, জয় জয় জয় জয়হো।

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস উক্ত গান খানির রেখা-রূপ দিয়েছেন। এই গান খানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'র হিন্দি অনুবাদ। আজাদ হিন্দ সরকারের বেতার কেন্দ্র থেকে এই গানখানি অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার সময় প্রতিদিন প্রচার করা হ'তো। সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস এই গানখানির রেকর্ড করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন এবং গেয়েছেন সুকৃতি সেন এণ্ড পার্টি। এরই বিপরীত পিঠে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গান খানি রূপায়িত হ'য়েছে। সুর সংযোজনায় শ্রীযুক্ত সেন এ গানখানির জন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু রেকর্ডিং গানখানির মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে অনেকাংশে।

হিন্দুস্থানের 'কদম কদম বাড়ায়ে যায়' র বিপরীত দিকে "শুভ সুখ" গানখানির শুধু সুর রূপায়িত হ'য়েছে। সুর এবং রেকর্ডিং প্রশংসনীয়। হিজমাষ্টার্স ভয়েসের রেকর্ড খানির বিপরীত দিকে শুনতে পাই "আজাদ করো……" গানখানি। এই গান খানির সুর এবং ভংগীর জন্য সুর শিল্পী কমল দাশগুপ্ত এবং গায়ক বৃন্দকে ধন্যবাদ জানাবো। এইচ, এম, ভির এই গানখানি সত্যই আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছে।

(১)

হতচেতন ভারতবাসী,
জাগো জাগো এ তন্দ্রা তেয়াগি।
জাগো উল্লাসে জাগো॥
নাশি রাত্রির তমিস্রারাশি
এক—মহাসংযমী আছেন জাগি।
জাগো নির্ভয়ে জাগো॥
হিংসাক্ষুব্ধ ভব জলধি শোণিত তরঙ্গ রোলে,
শত অসত্য অন্যায় মাঝে সত্যের কেতন দোলে।
জাগো অহিংস কল্যাণ ভাবী।

জাগো সার সত্যের অনুরাগী।
জাগো আনন্দে জাগো ॥
দম্ভের শাসন নাশন ওঐ শোন নব অভ্যুদয় বাণী,
ধ্বংসের শ্মশান ভস্ম মাঝে হের শিব-বরাভয়—পাণি।
হও উত্থিত জাগ্রত সবে মুক্তির জ্যোতির্লোকে।
আর থেকো না বিমূঢ় কেহ আত্মলাঞ্ছন-শোকে।
জাগো ভারতের মুক্তি পিয়াসী
ধরণীর শান্তির লাগি।
জাগো গৌরবে জাগো ॥

(২)

সারা ভারতের মর্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি।
স্বরাজের হাওয়া লাগিল কি শুভক্ষণে—
ওঠে মর্মরি নূতন যুগের বাণী ॥
স্বরাজের রঙ কুসুম হইয়া ফোটে
আঁধার বিদারি নূতনের আলো ছোটে
ফেটে যায় মেঘ নির্মল নভে হেরি
চির অমলিন মুক্তির রূপখানি ॥
সারা ভারতের মর্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি ॥
সারা ভারতের নদী তরঙ্গ জুড়ি নব সংগীত ধারা
সহসা শুনিয়া এ গাঢ় ঘুমের মাঝে জাগিয়া উঠিল কারা ?
জাগিয়া উঠিল গ্রামের মজুর চাষী
শহরের ধনী জাগে দীন উপবাসী
জাতির জীবন তরুণ তরুণী জাগে
আকাশে বাতাসে শোনে কি যে কানাকানি ॥
সারা ভারতের মর্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি ॥

কলম্বিয়া—জি, ই ৭০০২ (সিই আই ২৬৬৯৫ ও সিই আই ২৬৬৯৬) কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের গীতিনাট্য অভ্যুদয়ের দু'টী গান ইতিপূর্বে রেকর্ডে রূপায়িত করে কলোম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। জাতীয় ভাবধারায় অনুসৃত গানগুলি যে জাতির কাছে বিশেষ সমাদর লাভে সমর্থ হয় একথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই তা উপলব্ধি করতে পারেন। কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের পূর্বেকার গান দু'খানিও সেই সাক্ষ্য দেবে। বর্তমানে কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের গীতিনাট্য 'অভ্যুদয়' থেকে আলোচ্য গান দু'খানি রেকর্ডে রূপায়িত করে কলম্বিয়া প্রতিষ্ঠান আমাদের ধন্যবাদ আশা করতে পারে। কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের তরফ থেকে এই গান দু'খানি রচনা করেছিলেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনী মোহন দাস। ভাব এবং ভাষার দিক থেকে গান দু'টী যে-কোন সুধীজনের প্রশংসা পাবে। সুর সংযোজনায় শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেনও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'হতচেতন ভারতবাসী' গান খানি গেয়েছেন শ্রীযুক্ত সেন নিজে। আর 'সারা ভারতের মর্মের বনে বনে' গেয়েছেন সুকৃতি সেন এণ্ড পার্টি এদিক থেকে শোষাক্তদল বেশী প্রশংসা পেতে পারেন।

মানেনা মানা—সেনোলা মিউজিক্যাল কোম্পানী, (ও এস ৭০২-৭০৯) সেনোলা মিউজিক্যাল কোম্পানী শৈলজানন্দের জনপ্রিয় কথাচিত্র 'মানে-না-মানা'র রেখা নাট্য-রূপ দিয়েছেন। আটখানি রেকর্ডে এই নাট্যরূপ সম্পূর্ণ হ'য়েছে। রেখা-নাট্যর উপযোগী করে শৈলজানন্দের জনপ্রিয় কাহিনীটির নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্তী। ইতিপূর্বে শৈলজানন্দের 'সহর থেকে দূরে' চিত্র কাহিনীটার রেখা-রূপ দিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী আমাদের প্রশংসা লাভ করেছেন। আলোচ্য নাটকেও তা অক্ষুন্নই আছে। রেখা-নাট্যের পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেশ বাবু। পরিচালনার দিক থেকেও আমাদের কোন অভিযোগ নেই। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন—প্রভা, অহীন্দ্র, জহর, মলিনা, ফণী, সন্তোষ, বিমল বন্দনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি আরো অনেকে। অভিনয়ের দিক থেকে প্রভা, অহীন্দ্র, ফণীরায়, জহর মলিনা সন্তোষকে আমাদের ভাল লেগেছে। নাটকের সুরসংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন। চিত্র কাহিনী গুলিকে রেখা নাট্যে

রূপায়িত করবার সময় যদি রেকর্ড কোম্পানী গুলি মূল গান গুলি সংযোজিত করতে পারেন—তবে এই নাট্যরূপ বেশী জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। এবিষয়ে তাঁরা চিত্রের রেকর্ড সত্ব যে প্রতিষ্ঠানের, তাঁদের সংগে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থাও করতে পারেন—অথবা যে চিত্র খানির গানগুলি যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের তাদেরই সেই চিত্রকাহিনীর রেখারূপ দেওয়া উচিত।

হোটেলের দুই সাল (জে, এন, জি ৫৮-৩৯) মেগাফোন কম্পানীর 'হোটেলের দুই সাল' এই কৌতুক চিত্রটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। যুদ্ধের সময় বোমা বিধ্বস্ত কলকাতার কথা কেউই এখন পর্যন্ত ভুলে যাননি। বোমার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত সহরবাসীদের সহর ত্যাগের হিড়িক আজও স্পষ্ট করেই সকলের মনে আছে। তখন কলকাতার হোটেল এবং বোর্ডিং সবই ফাঁকা হ'য়ে এসেছিল। আলোচ্য কৌতুক নাট্যের একসালে তখন হোটেল ম্যানেজারেরা কি ভাবে তাদের বোর্ডারদের আপ্যায়িত করতেন তারই ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় সালে যখন লোকের মন থেকে আতঙ্কভাব দুর হ'য়ে গেছে স্বাভাবিক থেকে যখন অস্বাভাবিক ভাবে সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন এই হোটেল ম্যানেজারেরা কি ভাবে তাদের বোর্ডার-দের আপ্যায়িত করা আরম্ভ করলেন—তারই ছবি ফুটে উঠেছে। হোটেল ম্যানেজার রূপে শ্রীযুক্ত ফণীরায় আমাদের খুবই আনন্দ দিয়েছেন। তার পরই বলতে হয় হোটেলের উড়ে বামুনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্তীর কথা। অপরাংশে নবদ্বীপ ও ল্যাংড়া ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীযুক্ত বিমল সেন ও পবিত্র দাশগুপ্ত। হোটেলের দুইসাল আমরা উপভোগ করেছি—শ্রোতারাও উপভোগ করতে পারবেন আশা করি।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস-এন ২৭৬৩৪ শতেক বরষ পরে (ও এম্ সি-২১৩০৫): আকাশ প্রদীপ ডাকে (ও এম সি-২১৩০৪)। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীর এই আধুনিক গান দু'খানি গেয়েছেন যূথিকা রায় এবং সুরসংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত। দু'খানি গানেরই কথা রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত মোহিনী চৌধুরী। রেকর্ডের শ্রোতাদের কাছে কুমারী যূথিকার নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কুমারী যূথিকার মিষ্টি গলা অনেককেই মুগ্ধ করেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা কুমারী যূথিকাকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—তাঁর গানের ধাঁচ এবং কমলবাবুর সুরেও যে একঘেঁয়েমীর রেশ পাওয়া যাচ্ছে—সে বিষয়ে যদি তাঁরা সতর্ক না হন তবে তাঁদের দু'জনেরই এই জনপ্রিয়তায় যে একটু ভাটি পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইদানীং কতগুলি বাংলা আধুনিক গানে হয় কুমারী যূথিকাকে বেশী চীৎকার করতে শুনেছি আর না হয়—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গা ছেড়ে দিয়ে গান গাইতে শুনেছি। আলোচ্য গান দু'খানি সম্পর্কে শেষোক্ত অভিযোগ আনা যেতে পারে। গান দু'খানির কথার জন্য শ্রীযুক্ত মোহিনী চৌধুরীকে প্রশংসা করবো। বিশেষ করে তাঁর 'শতেক বরষ পরে' গানখানির কথা উল্লেখ করতে হয়। গান দু'খানি অনেককেই তৃপ্তি দেবে। অনেক সময় গানের অনেক কথা বোঝা যায় না—এব্যাপারে গায়িকা একটু সচেতন হবেন আশা করি।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস—এন ২৭৬৩৭

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস-এর এই পল্লী সংগীত দু'খানি গেয়েছেন শ্রীমতী বীণা চৌধুরী। 'নাইয়ারে ভাঙ্গা ডিঙ্গা বাইয়া বন্ধুর দেশে যাইয়া' (ও এম সি ২১১৬) গানখানি রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত মোহিনী চৌধুরী এবং 'আজ বৃন্দাবনের আঁখি ঝরে পথে কাঁদে ধূলিকণা' (ও এম সি ২১.৭) গান-খানি রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত শিশির সেন। দু'খানি গানেরই সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত শৈলেশ দত্তগুপ্ত। দু'খানি গানের বিষয়বস্তু এক। প্রথমখানি পল্লীবধুর এবং দ্বিতীয়খানি শ্রীরাধিকার বিরহ ব্যথা সহজ কথার ভিতর দিয়ে গীতিকারদ্বয় ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীমতী বীণা চৌধুরীর সুমধুর দরদী কণ্ঠে দু'খানি গানই বড়ই শ্রুতিমধুর হয়েছে। গান দু'খানি আমাদের মত প্রত্যেক শ্রোতারই ভাল

লাগবে। সুর সংযোজনার জন্য শ্রীযুক্ত শৈলেশ দত্তগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস—রাইরাজা পি

১১৮-৭৯-৮০ হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের আলোচ্য পালা কীর্তন 'রাইরাজা' দু'খানি রেকর্ডে সমাপ্ত। 'রাইরাজা' রচনা করেছেন খ্যাতনামা গীতিকার কবি শৈলেন রায়। এবং গেয়েছেন ও সুর সংযোজনা করেছেন জনপ্রিয় অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। 'চারু তমাল বনে কুসুম' সিংহাসনে শ্রীমতী রাই রাজা হ'য়ে বসেছেন। রাই হ'য়েছেন মাধবের পতি। আর মাধব সেজেছেন তার পত্নী। দু'জনেই বিপরীত সাজে সজ্জিত। চারিপার্শ্বে সখিগণ রয়েছেন। নীলমনি শ্যাম নারীবেসে সজ্জিত—তাকে দেখে

তখন রাইরাজা ভ্রুকুটিয়া
বলে ভ্রু বাঁকাইয়া
'কেবা এই নারী
এ নারী সহজ নয়
হিয়া নিয়ে করে কাড়াকাড়ি।'
অনেকেরে সনে করে গো পিরিতি
এ নহে গো একেশ্বরী।'
তখন হেসে কয় শ্যাম
'পেলে রাইরাজা পিরিতি করিয়া মরি।

রাই তখন বলেন, যে পিরিতির রীতি জানেনা তাঁকে সাজা পেতে হবে আমি তাকে সাজা দেবো।

তখন হেসে কয় শ্যাম
অপরাধী আমি, সাজা পেতে হবে জানি
ঐ ফুলের শিকল ছিড়ে যেতে পারে,
ভুজ পাশে ধর টানি।
আর পাষাণ করিয়া ঐ দেহভার
রাখহে বুকের পরে—।
তোমার হৃদয়ের তাপে জলিয়া জলিয়া
যেন এ হিয়া পুড়িয়া মরে॥
তনু কারাগারে নিবিড় করিয়া
আমারে রাখগো ধরে।

নারীরূপী শ্যামের এই দুষ্টু বুদ্ধিতে রাই রাজা সায় দিতে চায় না। রাই শ্যামকে সেই সাজা দিতে চায়—যে সাজা শ্যামকে ভালবেসে সে লাভ করেছে। শ্যামের প্রেমে পাগলিনী রাই শ্যামের প্রেমের জন্য যে জ্বালা সহ্য করে, সেইটুকু সে রাজা হ'য়ে এখন শ্যামকে বুঝিয়ে দিতে চায়। তাই—

তখন কুপিতা রাধা গরজিয়া কয়
'অত সখে নাহি কাজ—'
কঠিন শাস্তি বিধান করে রাই বলে—
'তুমি ননদির ঘরে বসতি করিবে
উঠিতে বসিতে গালি।
আর কলঙ্কিণী নাম রটিবে তোমার
কালা মুখে দিব কালি।'

শুধু তাই নয়

'এ বাঁশী বাজাবো হৃদয় জ্বালাবো
তুমি যমনই যাইবে জলে—
আর বুঝাবো তোমারে নারীর ও হৃদয়
কেমন করিয়া জ্বলে।'

'আমি তোমার বাঁশী শুনে যেমন পাগল হই—তোমাকেও তেমনি পাগল করবো। তোমার বাঁশী শুনে—তোমাকে না দেখে আমি যেমন আখিঁজলে আঁচল ভাসাই—বেদনার ভার সহ্য করতে না পেরে যেন ভূতলে ছিন্নতরুর মত লুটিয়ে পড়ি—তোমাকেও তেমনি পড়তে হবে। তোমার জন্য যে জ্বালা আমার সহ্য করতে হয়—সেই জ্বালা তোমায় দিয়ে বোঝাবো—প্রেমের কী জ্বালা। তাহ'লে আর তুমি আমায় জ্বালা দেবে না।'

রাইর অন্তরের ব্যাথা যেমন কবি শৈলেন রায় তাঁর দরদী মনদিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হ'য়েছেন—তেমনি তার কল্পনা দিয়ে রাই ও শ্যামকে বিপরীত সাজে সাজিয়ে একটী সুন্দর কৌতুক চিত্র আঁকতে সফল হ'য়েছেন। আর তাঁকে মূর্ত করে তুলেছেন—সুর মূর্চ্ছনায় আমাদের অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। দুই প্রতিভার সমন্বয়ে যে 'রাই রাজা' শুনতে পেয়েছি—যে কোন শ্রোতার মনে তা আসন পেতে নেবে।

সমালোচনা

মাতৃহারা

পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী : রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য। গান : শৈলেন রায়। সুর-সৃষ্টি : শচীন দেববর্মণ। সংগীত অনুসৃতি : দি ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। আলোক চিত্র : সুধীর বসু। শব্দানুলেখন : সমর বসু। আলোক নিয়ন্ত্রণ : হেমন্ত বসু। রসায়নাগারিক : শৈলেন ঘোষাল। সম্পাদনা : সুকুমার গোস্বামী। রূপ-সজ্জা : অভয় দে। দৃশ্য-সজ্জা : গোপী সেন। প্রযোজনা : পান্নালাল পাঠক ও মঙ্গল চক্রবর্তী। রূপায়ণে : মলিনা, জহর, প্রমীলা, পূর্ণিমা, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, মঙ্গল চক্রবর্তী, ফণি রায় কানু বন্দ্যো (এ:), প্রভা, রাজলক্ষ্মী, সুরুচী দেবী, বেলারাণী, মনোরমা, বেচুসিংহ, পশুপতি, অমর চৌধুরী, শেখর মুখার্জি, ভূপেন চক্রবর্তী, ফণী মুখার্জি, গোপাল চ্যাটার্জী, মাষ্টার পুণ্টা, ধীরেন পাত্র, রাধারমন পাল, মনোজ চ্যাটার্জি, যুগল দত্ত, মথুরা মিশ্র, রেনু মিত্র প্রভৃতি। পরিবেশনা : প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ।

সিনে প্রডিউসার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র মাতৃহারা গত ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হ'চ্ছে। চিত্রখানি কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত হ'য়েছে। বহুদিন বাদে শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একখানি চিত্রোপহার দিলেন। তাঁর সহকারী রূপে দেখতে পেয়েছি পঙ্কজ দত্ত, অনামী চৌধুরী এবং রবি বসুকে। শ্রীযুক্ত দত্ত সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিছুদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চের শ্রীপঙ্ককের বিভাগটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন। সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'দেশ' এর সিনেমা বিভাগটির দায়িত্ব নিয়ে আছেন। চিত্র জগতেও তিনি অপরিচিত নন। বহুদিন কাপুরচাঁদ লিঃ-এর প্রচার সচিব রূপে তিনি কাজ করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পঙ্কজ বাবুর মত একজন গুণী ব্যক্তিকে সহকারী রূপে গ্রহণ করে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। আমরা পঙ্কজ বাবুর পরবর্তী চিত্র-জীবনের সাফল্য কামনা করি। দ্বিতীয় সহকারী-পরিচালক শ্রীঅনামী চৌধুরী সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার আছে। ষ্টুডিও মহল থেকে আমাদের কাছে যে খবর এসেছে তাতে জানতে পারলুম, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সহকারীটি একজন মুসলমান। তাই যদি সত্য হয়—সংবাদটি আমাদের কাছে খুশীর বিষয় বলতে হবে। পরিচালক শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মুসলমানকে তাঁর সহকারী রূপে গ্রহণ করে এই সাম্প্রদায়িকতার দিনে যেমনি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আমাদের মুসলমান ভাইদের দৃষ্টি পড়েছে দেখে একটু আশান্বিতও হ'য়ে উঠছি। কিন্তু এই সংবাদটি সত্য হ'লে সংগে সংগে আমরা মর্মাহতও কম হবো না। মর্মাহত হবার কারণ, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান সহকারীকে অনামী চৌধুরী নাম দিয়ে ঢেকে রাখা এবং সে নীচতাকে কোন মতেই আমরা সহ্য করতে পারবো না। মনে করবো, সত্যকে মেনে নেবার মত সাহস থেকে মাতৃহারার কর্তৃপক্ষ বঞ্চিত। এবং যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প আমাদের সমাজজীবনকে বিষিয়ে তুলছে—তা ধীরে ধীরে চিত্র জগতেও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে বলে চিত্রামোদীদের সে বিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠতে আবেদন জানাবো। শ্রীঅনামী চৌধুরী যদি হিন্দু হন—'শ্রীঅনামী' যদি তাঁর নিজস্ব অথবা ছদ্মনাম হয়—তবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ থাকবে না। আশা করি, পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়—সিনে প্রডিউসার্স অথবা শ্রীঅনামী চৌধুরী স্বয়ং—'শ্রীঅনামী'র প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করে আমাদের সমস্ত সন্দেহ কাটিয়ে দেবেন।

মাতৃহারার কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে তাঁর সংগে আমাদের পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয় নি। তা না হউক, চিত্র জগতের তাতে কিছু যায় আসে না। এবিষয়ে চিত্র জগতের কর্তৃপক্ষরা উদারতার পরিচয় দিতে মোটেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন না।

বালবিধবা মাধবী বিগ্রহ সামনে রেখে উৎপলকে

পতিত্বে বরণ করেছিল। তাদের এই বরণকে সার্থক করে তুলতে একটি ছেলেও হ'য়েছিল। চিত্রে গল্পের সংগে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন দেখি, উৎপল মাধবীকে নিয়ে কলকাতায় আসছে। এবং পথে এক ষ্টেশনে উৎপল ছেলেটীকে আর একটী বিপরীত গামী ট্রেনে রেখে এলো। মাধবী ঘুমিয়ে ছিল—ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর ছেলেকে না দেখে 'খোকা—খোকা' বলে কেঁদে উঠে। ট্রেন তখন চলতে থাকে—মাধবী চেন টেনে ট্রেন থামাতে যায়। উৎপল তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'কেন পাগলামী করছো। নিশ্চয়ই ছেলে চুরি গেছে। আজকাল প্রায়ই এরূপ হ'য়ে থাকে। তুমি ভেবো না—আমি মুচিপাড়া থানায় জানিয়ে এর একটা হেস্তনেস্ত করবো। তারপর যে আমাদের বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়েছে তাকে সমুচিত শাস্তি দেবো।' মাধবী নিরুপায় হ'য়ে চুপ করে। তারপর মাধবীকে নিয়ে কলকাতায় উৎপল যেখানে গিয়ে উঠলো—তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং ভিতরের বাসিন্দাদের দেখে মাধবী বুঝতে পারলো—সে এক গণিকালয়ে এসে উঠেছে। এখানে এসে উৎপলের স্বরূপ প্রকাশ পেলো। মাধবীকে সে বল্ল, 'আমাদের বিয়ে হয়নি। সমাজ এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনা।' এবং যাতে কোন প্রমাণ না থাকে সেজন্য ছেলেটিকেও সে সড়িয়ে দিয়েছে, তবে তাকে সে মারেনি - বেঁচেই আছে হয়ত। উৎপল আরো পরিষ্কার করে মাধবীকে বল্ল যে, তার রূপ আর যৌবন আছে এবং তা দিয়ে বেসাতী খোলার জন্যই সে মাধবীকে নিয়ে এসেছে। মাধবীর সমস্ত স্বপ্ন—সমস্ত আশা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। সে এখানে এসেই প্রথম বুঝতে পারলো, কতবড় পাষণ্ড এবং ধাপ্পাবাজ এই উৎপল এবং তার প্রকৃত স্বরূপই বা কি? বাড়ীওয়ালীর কথায় তার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। বাড়ীওয়ালীর কাছে নিজের সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে তাকে মা ডেকে মন গলিয়ে মাধবী ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বেরিয়েই বা সে যাবে কোথায়—যদি মা গঙ্গা তাকে বুকে না নেয়! তখনও ভোর হয়নি। রাজা বাহাদুরের পার্শ্বচর নিশীথ বিলাস সদাপাণ্ডে ওরফে পটল মাধবীকে রাজাবাহাদুরের উপযোগী মস্তবড় শিকার মনে করে, তাকে কৌশলে নিয়ে চলে নিজের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করবার জন্য। পথে প্রণবের আবির্ভাব। সে পটলের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তার হাত থেকে মাধবীকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়।

অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে জগদীশ বাবু গাঁয়ে ফিরছিলেন তার কুমারী মেয়ে সান্ত্বনার বিবাহ দিতে। মাঝপথে ট্রেনের কামরায় শিশুটিকে পেয়ে শিশুর কোন ওয়ারিস নেই দেখে সংগে নিয়ে চলেন। গাঁয়ে এসে ব্যাপারটি কিন্তু একটু জটিলতর হ'য়ে উঠলো। গাঁয়ের সকলের ধারণা হ'লো শিশুটী সান্ত্বনারই। এবং সান্ত্বনার যতগুলি বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো, বর পক্ষের কানে—এই ভাঙচানী দিয়ে ভেঙে দিতে লাগলো। গাঁয়ের মাতব্বরদের টাকা দিয়ে মুখবন্ধ করে—বিয়ের যোগাড় হ'য়েও শেষপর্যন্ত বরের বাপ বিয়ের আসরে এই রটনাকে সত্য মনে করে ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। জগদীশ বাবুর প্রাক্তন ছাত্র প্রণব উপস্থিত ছিল—সে সান্ত্বনাকে বিয়ে করে জগদীশ বাবুকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে।

নতুন সংসারে স্বামী, শাশুড়ী এবং ননদকে নিয়ে সান্ত্বনার দিনগুলি সুখে কাটলেও—কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের জন্য তার মাতৃত্ব কেঁদে কেঁদে উঠতো। প্রণব তার মায়ের মত নিয়ে জগদীশ বাবুর কাছ থেকে শিশুটীকে তাদের বাড়ী নিয়ে এলো। এই নিয়ে আসাতেও কোন অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিল না। কিন্তু সমস্ত বিষয়টী জটিলতর হ'য়ে উঠলো তখন—যখন প্রণবের পিসীমা এলেন। তিনি ঐ ছেলেকে একটু বাঁকা ভাবে দেখতে লাগলেন। শুধু দেখা নয়—সান্ত্বনার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে কুড়িয়ে পাওয়া বলে তিনি মনে করতে পারলেন না। এবং এই নিয়ে যখন পারিবারিক আবহাওয়া বিষিয়ে উঠছিল—তিনি প্রণবদের বাড়ী থেকে যাবার সময় তা আরও বিষিয়ে দিয়ে গেলেন। প্রণবের মায়ের মনে এতদিন কোন সন্দেহ জাগেনি কিন্তু তিনি আজ তা রোপন করে গেলেন—সান্ত্বনা আর তার

ছেলের আসল এক বলে। বিনা প্রমাণে সান্ত্বনাকে নিষ্পাপ বলে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। পারিবারিক মাংগলিক অনুষ্ঠান যা একদিন সান্ত্বনার হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন—তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। শুধু তাই নয়, তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনা সম্পর্কে এমন কতগুলি কথা তিনি বল্লেন, আড়াল থেকে যা শুনে ছেলেকে নিয়ে সেই রাত্রেই সান্ত্বনা স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করলো। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হ'য়েছিল বলে প্রণব সেদিন একটু দেরীতেই বাড়ী ফেরে। সমস্ত ব্যাপার শুনে—তার মায়ের প্রতি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এসেছিল তা সমস্তই ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। এবং সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় বলে যায়—যদি সান্ত্বনাকে পায় তবেই ফিরবে—নইলে নয়।

প্রসাদ একজন খেয়ালী শিল্পী। কুড়িয়ে পাওয়া ভৃত্য পঁচা ছাড়া আর কেউ তার সংসারে ছিল না। প্রসাদের সংসারের মাধবী শ্রী ফিরিয়ে এনেছে। প্রসাদ মাধবীর প্রতি মনে মনে প্রণয়াসক্ত হ'য়ে উঠেছে—প্রকাশ করবে করবে করেও করতে পাচ্ছে না। এমনি সময় উৎপলের আবির্ভাব হয়। প্রসাদ তখনই জানতে পারে উৎপল মাধবীর স্বামী—তাছাড়া তার একটা ছেলেও আছে। উৎপলকে তাড়িয়ে দিয়ে মাধবীর কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত সে শোনে। প্রথমে মাধবীর প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠলেও সমস্ত শুনে মাধবীর নিখোঁজ ছেলের সন্ধান করে তাকে সুখী করতেই যত্নপর হ'য়ে উঠে। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া একটা কাগজের টুকরোর ছেলে হারানোর সংবাদ দেখে—মাধবীকে দেখায়। মাধবী বলে, হ্যাঁ এ তারই ছেলে। তখনই তারা রওনা হয় জগদীশ বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে সান্ত্বনার শ্বশুর বাড়ীর দিকে গরুর গাড়ীতে রওনা হয়। এবং মাঝ পথে সকলের মিলন হয়। সকলে যখন মিলনের আনন্দে বিভোর—প্রসাদ সেখান থেকে সড়ে পড়ে। প্রসাদের যখন খোঁজ পড়ে, আমরা দেখি প্রসাদ তার ষ্টুডিওতে বসে মাধবীর অসমাপ্ত ছবি নিয়ে ব্যস্ত। এখানেই কাহিনীর শেষ।

চিত্রের নাম রাখা হ'য়েছে 'মাতৃহারা' এখানে কাহিনী কী বিভিন্ন মাতৃহারাদের (যেমন সান্ত্বনা এবং মাধবীর ছেলে) কথাই বলতে চেয়েছে না তার অন্য কিছু বলার ছিল?—কাহিনীটি সত্যই সমস্যামূক না সমস্যা-বিহীন! কাহিনীর ভিতর সমস্যা যে না ছিল তা নয়—কিন্তু কাহিনীকার অথবা পরিচালকের সেদিকে দৃষ্টি পড়েনি বা সে সমস্যা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে দেখিনি। যা দেখেছি, তাকে সমস্যা মোটেই বলতে পারবোনা। তাই মাতৃহারা সার্থকতা নিয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি—করেছে বিভিন্ন রসপরিবেশনের মধ্য দিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করবার চিত্রজগতের সেই চিরাচরিত মনোবৃত্তি নিয়ে। বম্বের আচার্য আর্ট প্রডাকসন্সের কিশোর সাহুর 'কুয়ারা ব্যপ' ছবি খানা যাঁরা দেখেছিলেন, মাতৃহারাকে তারই বিপরীত অর্থাৎ 'কুয়ারামা' বলা যেতে পারে। তবে কুয়ারা বাপ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল প্রচুর—আমরা চিত্রখানি উপভোগও করেছিলাম। কারণ, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৌতুক পরিবেশন করা এবং সে প্রধান লক্ষ্য থেকে পরিচালক স্খলিত হ'য়ে পড়েন নি। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে 'কুয়ারাবাপ' এর ছাপকে ঢেকে রাখবার জন্য—তাছাড়া বাঙ্গালী দর্শকদের কাছে কৌতুক-রসের চেয়ে করুণ-রসের আবেদন বেশী বলে কাহিনীকে নানান সমস্যার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে ডেকে ঢুকে হাজির করা হয়েছে। তাই, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার চেয়ে তাদের আকর্ষণ স্পৃহাই আমাদের কাছে প্রকট হ'য়ে উঠেছে—তাদের সমাজের সমস্যা সমাধানের আন্তরিকতার চেয়ে—ব্যবসায় স্বার্থ রক্ষন-স্পৃহাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শুধু কুয়ারাবাপ নয় 'ব্লসমস্ অব দি ডাষ্ট' নামক ইংরাজী বই খানার প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে মাতৃহারায়। গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে যে কাহিনীকার স্খলিত হ'য়ে পড়েন—মূল উপপাদ্য বিষয় থেকে যে পরিচালক শাখা প্রশাখা নিয়ে মেতে পড়েন তাদের ওপর সন্দেহ জাগাটা কী অস্বাভাবিক? গুণময় বাবু যদি নূতন পরিচালক হ'তেন, তাঁর অক্ষমতাকে প্রথম-ভুল বলে নয় ক্ষমা করতে পারতাম। যেমন

করবো কাহিনীকারের বেলায়। নূতন হ'য়েও—গল্পের মূল উদ্দেশ্য থেকে তিনি স্খলিত হয়েছেন বলে নূতন বলেই তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারে। যে-কোন একটা সাধারণ লোকও স্বীকার করবেন—কাহিনীর মূল বক্তব্য মাধবী। মাধবীকে নিয়ে যদি কাহিনী গড়ে উঠতো—তাতে সমস্যা পেতাম—এবং তার সমাধানের জন্যই প্রথম থেকে আমাদের দর্শকমন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার কাছ দিয়েও কাহিনীকার বা পরিচালক যাননি। যাননি এইজন্য যে, সে সমস্যা অবতাড়না করবার মত তাঁদের দূরদৃষ্টি বা সৎসাহস নেই। তাই যাকে মোটেই সমস্যা বলা চলে না—তাকে নিয়েই ঘুরপাক খেয়েছেন। সান্তনা'কে নিয়েই তাঁরা মেতে পড়েছেন এবং সে অংশের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁদের অবাঞ্ছিত এবং চিত্রজগতের চিরপরিচিত চরিত্রের আমদানী করে কাহিনীকে টেনে নিতে হ'য়েছে। গায়ের যদু-মধু-বিনোদিনী প্রভৃতির দলকে আনতে হয়েছে—আনতে হয়েছে কাশী থেকে প্রণবের পিসীমাকে। যদু-মধু, বিনোদিনী এবং পিসীমার চরিত্র একদিন আমাদের সামাজিক জীবনের অগ্রগতিতে অনেকখানি বাধা সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের বাধা ডিঙ্গিয়ে আমরা যে অনেকখানি অগ্রসর হ'য়েছি—আমাদের সে অগ্রগতির সন্ধান রাখবার মত কাহিনীকার বা পরিচালকের মন অগ্রসর হয় নি বলেই সেই 'ডিঙ্গিয়ে আসা দিনের' সমস্যা এবং চরিত্র গুলিকে এনে হাজির করেছেন। কিন্তু যদি তারও সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ দেখতে পেতাম তবু 'সান্তনার' মাঝে সান্তনা পেতাম। কিন্তু তাই বা পেয়েছি কোথায়—যদু-মধু পরিবৃত গাছতলা দিয়েই কী কাহিনীকে কম ঘুরপাক খাওয়ানো হ'য়েছে। যা সত্য একদিন তা প্রকট হ'য়ে উঠবেই। নিষ্পাপ সান্তনা সমাজের সমস্যা নয়। প্রতাড়িত—নিরাশ্রয় মাধবীর দল-কে এতদিন সমাজের দোড়ে দোড়ে ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে—শিরোমণি, যদু-মধু, সমাজের তথাকথিত ধুরন্ধর নীতিবাগীশদের জন্য তাদের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—উৎপল পটল-পথ দেখিয়ে তাদের যেখানে হাজির করেছে—যে ঘৃণ্যতম জীবন যাপনে তাদের বাধ্য করেছে—সেই স্থান থেকে তাদের উদ্ধার করে সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের জানিয়ে দিতে হবে—বলে দিতে হবে—পটল—উৎপলের নির্দেশিত পথ তোমাদের নয়—সমাজেই তোমাদের জন্য মধুর স্থান আছে। সেই পথের নির্দেশ দিয়ে—তাদের প্রতিষ্ঠা করার সময়ই আমাদের সামনে। কাহিনীর ভিতর একটু যে আভাষ না পাই তা-নয়—প্রসাদ এবং মাধবীকে নিয়ে এই আভাষ যতটুকু ফুটে উঠেছে আলোচ্য চিত্রে, কেবল মাত্র ততটুকুর জন্যই কাহিনীকারকে প্রশংসা করবো। মাধবী এবং প্রসাদকে ছেড়ে দিলাম। 'মাতৃহারা' ছবির নাম হ'য়েছে—'মাতৃহারা'দের সমস্যাও কী ফুটে উঠেছে মাতৃহারায়! সান্তনার মত মাতৃহারাকে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা মাধবীর ছেলের মত মাতৃহারাদের নিয়ে। কিন্তু সান্তনা এবং জগদীশ বাবু যখন 'মাধবী'র পরিত্যাক্ত ছেলেটাকে সংগে নিয়ে গেলেন—ছেলের জন্ম রহস্য তাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল—হারিয়ে যাওয়া ছেলে তারা কুড়িয়ে পেয়েছে বলেই ধারনা ছিল। সান্তনার ননদ যখন মাতৃজাতির কর্তব্য নিয়ে ফাঁকা বুলি ঝাড়ছিল—তার সংগে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। মাধবীর বুকে মাধবীর ছেলে তুলে দিয়ে জগদীশ বাবু তাদের নিজের ঘরে স্থান দিলেন—এই কী সমাধান! মাধবী এবং তার ছেলের ভবিষ্যত কী? অতশত মাথা ঘামাবার মত যেমনি কাহিনীকারেরও ফুরসুৎ হয় নি—পরিচালকেরও না। তাই, নানান রকম-মেশালী দিয়ে তাঁরা আমাদের যা উপহার দিয়েছেন, তাকে সাড়ে বত্রিশ ভাজার দল থেকে একটুকুও উচ্চ আসন দিতে পারি না।

চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে প্রসাদ, মাধবী এবং প্রণবের চরিত্রকে প্রশংসা করবো। মাধবী যে সমস্যা নিয়ে দেখা দিয়েছিল—তাকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হ'তো—আলোচ্য চিত্রখানি আমাদের অনেকখানি শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হ'তো। তবু যেটুকু আভাষ পেয়েছি সেজন্য প্রশংসা করবো। মাধবীর চরিত্রে শ্রীমতী মলিনা আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারেন। প্রসাদের চরিত্রটাও যতটুকু ফুটেছে, চিত্রের অপরাপর চরিত্রের

প্রসঙ্গ

চেয়ে প্রশংসাই করবো—কিন্তু চরিত্র নিয়ন্ত্রণে পরিচালক মোটেই নিপুণতার পরিচয় দিতে পারেন নি। প্রসাদ—শিল্পী—খেয়ালী। খেয়ালী বলে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন অথবা একটা অস্বাভাবিক পাগলাটে ধরণের আঁকলেত চলবে না! শুধু আলোচ্য চিত্রের পরিচালকই নন—আমাদের চিত্রজগতের অনেক রথী মহারথীরাই 'খেয়ালী' কথাটার অপব্যবহার করে থাকেন। কোন চরিত্রকে যখনই তাঁরা নিজেদের খুশীমত অবৈজ্ঞানিক ভাবে চালাতে চান—তখনই তার সংগে 'খেয়ালী' লেজুড়টা জুড়ে দেন। 'খেয়ালী' কথাটার অপব্যবহারের পূর্বে তাঁদের খেয়ালীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাবো। চরিত্র-বিশ্লেষণ সম্পর্কে যাঁদের একটুকুও অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন—প্রত্যেকটা বিভিন্ন ধরণের চরিত্রেরই নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক গতিপথ আছে - খেয়ালী চরিত্রের বেলায়ও তাই। খেয়ালী চরিত্র চলে নিজের মেজাজ-মাফিক। এবং তারও একটা নির্দিষ্ট ধর্ম আছে। 'খেয়ালী' চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। যখন যেটা ভাল লাগলো—তখন সেটা করলো—যখন যেটা ভাল লাগলো না—কোন মতেই খেয়ালীর চরিত্র তা' করবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি হয়ত দেখলেন খেয়ালী লোকটা পর পর তিনচারদিন কোন বিশেষ ধরণের জামা গায় দিয়ে যাচ্ছেন—অথবা মনে করুন গ্রামোফোন রেকর্ড শুনছেন। তাঁকে আপনার খুশী করা দরকার। আপনি যদি ঐ বিশেষ ধরণের জামা—বা গ্রামোফোন রেকর্ড শুনিয়ে তাঁকে খুশী করতে চান—দেখবেন ব্যর্থ হয়েছেন। হয়ত তখন সেগুলি দেখে চটেই উঠবে এবং আপন'র মনে হবে, এগুলি যেন তাঁর দু'চোখের বিষ। এমনকী কখনও যে তাঁকে এগুলির অনুরক্ত থাকতে দেখেছেন তাও ভুল বলে মনে হবে। আবার হয়ত তারই কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে ঐ গুলিরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতে দেখলেন। এই ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে বীজগণিতের 'সাইক্লিক অর্ডারের' মত আসছে-যাচ্ছে। যাক, এনিয়ে বেশী না বলে আমাদের মূল বক্তব্যে আসা যাক। প্রসাদ চরিত্রের যে অসামঞ্জস্য ফুটে উঠেছে তাই বলি। প্রসাদ যখন উৎপলকে মাধবীর স্বামী বলে জানতে পারলো—তাকে বের করে দেওয়াটা কী চরিত্র সায় দেয়! তখন অবধিও মাধবীর কাছ থেকে সে কিছুই জানতে পারে নি। গলা ধাক্কা দিয়ে উৎপলকে বের করে দেওয়াতে দর্শকমন অতি সহজেই প্রসাদের এই বীরত্বপূর্ণ কার্যে প্রথমটায় খুশী হ'তে পারেন—কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন এতে প্রসাদকে কতখানি ছোট করা হ'য়েছে। ঠিক তারই পূর্বে দেখানো হ'য়েছে—বিশ্ব প্রেম-সমুদ্র মন্থন করে প্রসাদ মাধবীকে প্রেম নিবেদন করতে কতই না ব্যগ্র! প্রসাদের অন্তরে প্রেম সঞ্চার এবং প্রেম নিবেদনের ভনিতা কোন স্থির মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি বলে কেউ মেনে নিতে পারেন না। দর্শকমন নিয়ে এভাবে ছিনি মিনি খেলার সপক্ষে কর্তৃপক্ষ কী যুক্তি দেখাবেন! এসব ভাড়ামী কী তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারবেন না? প্রসাদের ষ্টুডিও এবং তার আসবাব পত্র যেভাবে দেখানো হ'য়েছে তাতে তাকে 'Fine arts' এর শিল্পী বলেই মনে হ'য়েছে। তার মাঝে 'পেনসল' এর বিজ্ঞাপনটা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের হ'লেও এই সুলভ লোভটাকে সম্বরণ করা উচিত ছিল। যদি বিজ্ঞাপনটী 'Fine arts' এর অঙ্কন হ'তো আমাদের বলবার কিছু ছিল না। রাত দুপুরে মাধবীর ঘরে হাজির হওয়াটাকেও আমরা সমর্থন করতে পারি না কোন মতেই। প্রসাদের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়। তার অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই। প্রণব চরিত্রটীকে বরং নিখুঁত বলতে পারবো—বলিষ্ঠ, সবল এবং পূর্ণাংগ ভাবেই এ চরিত্রটী ফুটে উঠেছে। সান্ত্বনাকে সে বিয়ে করেছিল—একটা সাময়িক উত্তেজনায় বাহবা পাবার জন্য নয়। নিষ্পাপ সান্ত্বনাকে সে গ্রহণ করেছিল মনুষ্যত্বের দাবীতেই।

এবং মায়ের অনুগত ছেলে হ'য়েও মায়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও তাঁর বলিষ্ঠতার অভাব হয় নি। প্রণবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। মঙ্গল চক্রবর্তীর সংগে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। যুদ্ধের বাজারে তিনি চিত্রজগত থেকে একটু গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এবং এই অনুপস্থিতিতে দেবযানীর 'কচ'—এর ওপর মাংসের প্রলেপও যেমনি এক পরতা পড়েছে—তাঁর অভিনয়ের মানও একটু উচ্চ স্তরে যেয়ে যে পৌঁছেচে একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে মাঝে মাঝে একটু জড়তাও প্রকাশ পেয়েছে। এবং ফুলসজ্জার রাত্রের দৃশ্যে, দরজা বন্ধ করে যখন সান্তনার দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন—তার চোখ মুখে অনুরাগের পবিত্রতা ফুটে ওঠেনি—উঠেছে ক্ষুধার্ত শিকারীর ছাপ। এবিষয়ে আর একটু সতর্ক হ'লে আমাদের কোন অভিযোগ থাকতো না।

প্রণবের মায়ের ভূমিকায় সুরুচী দেবীর অভিনয়কে প্রশংসাই করবো। এবং এ চরিত্রটীর বিরুদ্ধেও আমাদের কিছু বলবার নেই। সান্তনার ভূমিকায় প্রমীলা ত্রিবেদীর অভিনয়ের নিন্দা করবো না। তবে তার উচ্চারণ সম্পর্কে একটু সতর্ক হ'তে বলবো। সান্তনা সম্পর্কে একটী ব্যাপারে পরিচালক খুবই অবাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটীর জন্য তার আনমনা ভাবটায় একটু বেশী বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেয়েছে। একটা বেড়ালছানাকে দু'দিন পুষলেও মায়া হয়—সেখানে একটী মানব শিশুর প্রতি মন কাঁদবেনা? —স্বীকার করি। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি যে, কনে শশুর বাড়ী গিয়ে তার পোষা বেড়ালের জন্য অনেক সময় খাওয়া দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কনের বয়স এবং বুদ্ধির কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? আমাদের সান্তনাত কচি খুকীটী নয়—তারপর যে শিশুকে নিয়ে তাদের এত দুর্ভোগ ভুগতে হ'য়েছে—তারজন্য মনের অতটা ব্যাকুলতা বাড়াবাড়ি নয় কী? ছেলেটীকে আশ্রয় দেওয়া এবং প্রতিপালন করাই হচ্ছে বড় কথা—তাঁর জন্য নিজের আশ্রয়ের ভিত্তি ধ্বংস করে মিথ্যা কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকা মোটেই যুক্তি যুক্ত নয়। বদু মধু-এবং বিনোদিনীর চরিত্র কয়টি অতিরঞ্জিত। এই তিনটী চরিত্রে ফণীরায় এবং বেলারাণীর অভিনয়ের প্রশংসা করবো—আর একজন গোপওয়ালা ভদ্রলোক (নাম জানিনা)—তার অভিনয়ে আড়ষ্টভাব প্রকাশ না পেলেও দেহের আড়ষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে সমগ্রভাবে এদের ব্যাপারটাকেই একটা ভাড়ামী ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। শিরোমণির ভূমিকায় ভূপেন চক্রবর্তী আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন। প্রণবের পিসীমাকে—বদু-মধু-এবং বিনোদিনীর পরবর্তী কাজটুকু করবার জন্যই হাজির করা হয়েছে। পিসীমার ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার 'মা-বাবাগো' ছাড়া আর কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের বলবার নেই। জগদীশ বাবুর ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। প্রণবের ছোট বোনের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছি শ্রীমতী পূর্ণিমাকে। প্রণবের মতই এই চরিত্রকে বলিষ্ঠ ভাবে আঁকা হ'য়েছে। এই চরিত্রটীর ভিতর বিধায়কের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। এই চরিত্রটীর যদিও মূল কাহিনীর সংগে কোন যোগ নেই—তবে সান্তনার শ্বশুর বাড়ীর দিন গুলিকে দর্শকসাধারনের কাছে উপভোগ করে তুলতে সাহায্য করেছে অনেকখানি। এই চরিত্রটীকে আমরা যে জন্য প্রশংসা করবো—তা হ'চ্ছে শ্রীমতী পূর্ণিমাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে এবং চঞ্চলা রূপে দেখতে পেয়েছি বলে। অভিনয়ে শ্রীমতী পূর্ণিমা আমাদের আনন্দও দিয়েছে প্রচুর। বেচু সিংহের সমাপাণ্ডে, রাজলক্ষ্মীর বাড়ীওয়ালী প্রশংসা করবো। কমলমিত্রকে খুব রুঢ়—খল রূপে আঁকবার ইচ্ছা ছিল কাহিনীকারের। চরিত্রটীর পরিচিতি থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবীর পরিচিতির সংগে সংগেই তার পরমায়ু শেষ হ'য়েছে—শুধু কমল মিত্রকে দোষ দিলেই চলবে না—কোন সুযোগই তিনি পান নি।

এবার সমগ্রভাবে চিত্রটীকে নিয়ে আলোচনা করছি।

সিগারেটের ধুঁয়োকে প্রতীকরূপে দেখিয়ে চিত্রারম্ভের প্রশংসা করবো। একটা বিপরীত গামী ট্রেন থেকে আর একটা ট্রেনে প্যাসেঞ্জারের চোখে ধূলি দিয়ে ছেলে রেখে আসা একমাত্র চিত্রজগতের চরিত্র দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। দু'টী ট্রেনের স্থায়ীত্ব কতটুকু ছিল? তারপর যখন ছেলে রেখে আসা হ'য়েছিল তখন কেবলমাত্র জগদীশ বাবু এবং তার মেয়েই দেখলাম। জগদীশ বাবুর জাগার সংগে সংগে আরো বেশ কয়েকজন দেখা গেল। এরা কী সকলেই ঘুমিয়ে ছিল! সারারাত ছোট বোন নেচে নেচে দাদার বাসর ঘরের বাইরে কাটিয়ে দিল একলা। গান ঢোকাতে হবে—তাই কর্তৃপক্ষ একটা সুযোগ বেছে নিলেন। ছেলে খুঁজতে হবে—অমনি সংগে সংগে ছেলে হারানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল। যখন যেটা দরকার সেটা যেন তাদের হাতের কাছেই এসে ধরা দেয়। শেষ দৃশ্য হ'তে হ'তেও যে দৃশ্যটী থেমে গেল প্রসাদকে আর একবার দেখাবার জন্য—তাকেই বা সমর্থন করি কী করে! মিলন ঘটাতে যখন হবে, তখন স্থান-কাল প্রভৃতির কথা চিন্তা করে ধীর স্থির ভাবে কোন কিছুকে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার করবার মত সুবুদ্ধি কর্তৃপক্ষের কবে হবে? জল ঝড় না আনলে 'climax' এরই বা সৃষ্টি হবে কী করে।

প্রসাদের যেই খোঁজ পড়লো, অমনি দেখা গেল প্রসাদ তার ষ্টুডিওতে। প্রসাদের পক্ষে রাত করে ঐ অচেনা স্থান থেকে ঐ জল ঝড়ের মাঝে আসা সম্ভব কী অসম্ভব তা কী কর্তৃপক্ষ বুঝলেন না! কেন, একটা রাত নয় প্রসাদ সেখানেই থাকতো তাতে এমন কী ক্ষতি হ'তো। প্রসাদ-জগদীশ বাবুরা যদি একটু পূর্বে রওনা দিতেন অর্থাৎ তারা প্রণবের বাড়ীর কাছে যেই পৌঁছে যেতেন—এমনি সময় যদি সান্ত্বনাকে বের করা হ'তো—তাতেই বা ক্ষতিটী কী ছিল এবং পরের দিন—এক ফাঁকে নয় প্রসাদ সরে পড়তো। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে নিয়ে যেভাবে ঢং দেখিয়েছেন—তারিফ করতে হয় কর্তৃপক্ষকে। পাড়াগাঁয়ে—সিনেমার কায়দায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের এরূপ ঢং কোথায় পরিচালক দেখেছেন? গানের সুর সংযোজনার জন্য শচীনদেবকে প্রশংসা করবো—রচনায় হালকা কথা ও হালকা ভাবের জন্য শৈলেন রায়কে ধন্যবাদ জানাতে পারলুম না। তবে স্থানোপযোগী রচনায় তিনি কর্তৃপক্ষের ফরমাস তামিল করেছেন। চিত্রগ্রহণে—সুধীর বসুকে প্রশংসা করবো। শব্দগ্রহণও নিন্দনীয় নয়। সংলাপে বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর মিষ্টি হাতের সুনাম রেখেছেন। "মাতৃহারা"য়—যে সমস্যা ছিল তা স্থান পায়নি—প্রাধান্যও পায়নি—মাতৃহারার বদলে 'কুমারী মা'ই নাম হওয়া উচিত ছিল। সস্তার বিভিন্ন মুখরোচক মালমসলা দিয়ে দর্শকদের হালকা মনকে আনন্দ দিতে মাতৃহারার সৃষ্টি, সেদিক দিয়ে হয়ত কর্তৃপক্ষ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন—তবে চিত্রামোদীদের ভিতর অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধ করবো—অল্প বয়স্ক বা বয়স্কাদের নিয়ে যেন 'মাতৃহারা' দেখতে না যান। গণিকালয়ের দৃশ্য আছে বলেই নয়—বলিষ্ঠতা থেকে জ্যাঠামীর ভাগ বেশী বলে কিশোর কিশোরীদের কাঁচা মনের ক্ষতিই করবে।

—শ্রীপার্থিব

ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘ (আই, পি, টি, এ)

ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের নবতম প্রচেষ্টা 'ছায়া নৃত্যাভিনয়' কিছুদিন পূর্বে ২৫ নম্বর ডিকসন লেনে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা উক্ত অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম। সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করবার পূর্বে—বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথিদের অভিনয় দেখিয়ে মতামত গ্রহণই ওদিনকার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। অভিনয়ের পূর্বে শ্রীযুক্ত হিরণ কুমার সান্যাল গণ-নাট্য সংঘের প্রচেষ্টা ও ছায়ানৃত্য সম্পর্কে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ইকবালের একটী সংগীত—সহিদের গান ও শম্ভু মিত্রের আবৃত্তির পর ছায়ানৃত্যাভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনয়ের সমালোচনার পূর্বে একটী কথা প্রথম বলা দরকার—মঞ্চকে জাতির প্রতিফলক রূপে আমরা যেমন সোভিয়েট রাশিয়াতে দেখতে পেয়েছি—আমাদের দেশের মঞ্চমালিকেরা যদি একটু সচেতন হন—তবে আমাদের দেশেও যে তা অসম্ভব নয়—ভারতীয় গণ-

নাট্য-সংঘ এবং কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘের বন্ধুরা তা' প্রমাণ করতে সক্ষম হ'য়েছেন। মঞ্চ শুধু অতীতকেই প্রতিফলিত করে তুলতে বা ভবিষ্যতের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়—বর্তমানকেও সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে সে সক্ষম। সংবাদপত্রের মত সংবাদ প্রচারে মঞ্চের তৎপরতা এবং কৃতিত্ব যে অনেকখানি, সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চের ইতিহাস ঘাটলে যেমন তা আমরা জানতে পারি—গণ-নাট্য সংঘের বর্তমান ছায়ানৃত্য দেখে তা সহজেই প্রমাণিত হবে। ছায়ানৃত্যের সংগে বহু পূর্ব থেকেই আমরা পরিচিত। বলি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও ছায়া-নৃত্যের প্রচলন আছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করও ছায়া নৃত্যের প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু গণ-নাট্য সংঘের ছায়া-নৃত্যের বিশেষত্ব হ'চ্ছে—এতে দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি স্থান পেয়েছে। বম্বের নৌ-বিদ্রোহ—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাবে রসিদ আলীর মুক্তি আন্দোলন—প্রভৃতি আরো সমসাময়িক ঘটনা এই ছায়া-নৃত্যে স্থান পেয়েছে। নৃত্যের সংগে মাইক্রোফোন থেকে নৃত্যের বিষয়বস্তু বিবৃত করাতে দর্শক মনকে সহজেই তা আকৃষ্ট করে। ওদিনকার মাইক্রোফোনের দায়িত্ব ছিল শ্রীযুক্ত শম্ভুমিত্রের ওপর। তিনি সে দায়িত্বপালনে খুবই যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে আমরা তা বলবো। এবং যদি শ্রীযুক্ত শম্ভুমিত্রের চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে মাইক্রো-ফোনের দায়িত্ব দেওয়া হয়—তাহলে অভিনয়ের আকর্ষণ যে অনেকাংশে কমে যাবে একথাও এ প্রসংগে বলা দরকার। এবার অভিনয় সম্পর্কে দু'একটা কথা বলবো। নৃত্যের সময় যাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে—মঞ্চে তাঁদের দিক থেকে পদক্ষেপ বা অংগ সঞ্চালনের সময় মঞ্চে শব্দ করা সমীচীন হবে না বা কোন শব্দ উচ্চারণ করাও সংগত নয়। তাঁদের মনে রাখতে হবে—তাঁরা চলমান ছায়া। কোন প্রকার শব্দ তাঁরা করতে পারেন না। যা কিছু প্রয়োজন তা করবে নেপথ্যে যিনি বা যাঁরা মাইকের দায়িত্ব এবং সংগীতের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাঁরা। অভিনেতারা শুধু নিঃশব্দে ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষয়বস্তুকে মূর্ত' করে তুলবেন। অভি-নয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কেও আমাদের কয়েকটা কথা বলবার আছে। অভিনয় যতই নিখুঁত হউক না কেন—তা যদি সত্যের রূপ নিয়ে ফুটে না ওঠে কখনই তা সর্বসাধারণের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হবেনা। অভিনয়ের উদ্দেশ্য যদি প্রচার হয় এবং গণ-নাট্য সংঘ যদি নিজেদের রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্য করতে চান—নিজেদের মতবাদকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে এবং বিরুদ্ধ দলীয়দের দুর্বলতা বৈজ্ঞানিক ভাবেই পাশাপাশি দাঁড় করাতে হবে—তার ভিতর কোন মিথ্যা থাকবে না। সত্যিই যদি বিরুদ্ধ দলীয়রা নিন্দনীয় হ'য়ে থাকেন—যেখানটায় তারা নিন্দনীয় যথাযথ ভাবে তাই ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেখানে অবৈজ্ঞানিক ভাবে কোন মিথ্যাকে যদি তাঁরা প্রচার করেন—সেক্ষেত্রে জন-সাধারণ, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে ওঠাই স্বাভাবিক। নিজেদের এবং অপরদের সত্যিকারের রূপ ফুটিয়ে তোলাই তাঁদের কর্তব্য। জনসাধারণ তারপর বিচার করে যে পথ গ্রহণীয় সেটাই বেছে নেবেন। বম্বের নৌ-বিদ্রোহের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে কংগ্রেস ভাবাপন্ন বন্ধুদেরই প্রাপ্য—তাঁরাই এব্যাপারে অগ্রণী হ'য়ে ছিলেন এবং সমস্ত অগ্রগতি দলগুলির সমর্থন তাঁরা পেয়ে-ছিলেন—এই জয় কংগ্রেস ভাবাপন্ন বন্ধুদের প্রাপ্য। কিন্তু গণ নাট্য সংঘের বন্ধুরা সেটুকু দিতে কার্পণ্য করেছেন—এমন কী পতাকা উত্তোলনের কথা বলেও আর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারেন নি। তারপর আরও একটা বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন হ'তে অনুরোধ জানাবো। কাউকে তোষণ করাও তাঁদের উচিত হবেনা। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর নায়কদের বিচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সমগ্র ভাবেই দাবী জানিয়েছিলেন—কংগ্রেস বা অন্যান্য প্রগতিশীল রাজ-নৈতিক দলের আহ্বানে যাঁরা এই প্রহসন মূলক বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন—তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে রসিদ আলী বা শানওয়াজের বিচারের বিরুদ্ধেই

কেবল করেন নি। তাঁরা সমগ্রভাবে এই নীতির বিরুদ্ধেই করেছিলেন। এবং মুসলিম জনসাধারণের কতকাংশেরও সমর্থন কংগ্রেস লাভ করেছিলেন। রসিদ আলীকে মুসলীম লীগ সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা মুসলীম লীগের সংগে যোগ না দিয়ে দূরে সরে থাকেন নি। অথচ এই দলে হিন্দু এবং মুসলমান সবাই ছিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগ কেবল রসিদ আলীর সময়ই এসেছিলেন—অন্ত সময় নয়। রসিদ আলীর সময় মুসলীম লীগের সংগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে যেমনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন—অন্যান্যদের বেলায় মুসলীম লীগের অসহযোগের কথা বলে লীগের অনুদার মনোবৃত্তির কথাও গণ-নাট্য সংঘের বন্ধুদের বলা উচিত। এপ্রসংগে একথা বলা দরকার যে, সমালোচক কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'য়ে কোন কথা বলতে চায় না। লীগ যদি কেবলমাত্র মুসলীমদের উন্নতি এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য গড়ে না উঠে কংগ্রেস বা অন্যান্য জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রগতিশীল মতবাদ নিয়ে আমাদের সামনে দেখা দিতেন, তাকে সমর্থন করতে কারোরই বাধা থাকতো না। তাই, গণ-নাট্য সংঘের মুসলীম লীগ তোষণকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারবো না। প্রকাশ্য অভিনয়ের সময় গণ-নাট্য সংঘের বন্ধুরা এবিষয়ে একটু সচেতন হ'লে খুশী হবো। তাঁরা কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা-সবাইকে সমালোচনা করতে পারেন—কিন্তু তার একটা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তি-যুক্ত পথ গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য অভিনয় প্রসংগে উপরোক্ত কথা গুলির মৌলিক যোগ রয়েছে বলেই উল্লেখ করলাম। অতীতের মত গণ-নাট্য সংঘের বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও যে দর্শক সাধারণের অনুরাগে অভিনন্দিত হ'য়ে উঠবে—সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এবং এই প্রসংগে একথাও বলে রাখি, গণ-নাট্য সংঘের বন্ধুদের এরূপ কৃষ্টিমূলক সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার—নিপীড়িত গণ-আত্মার মুক্তি সংগ্রামের জন্য তাঁদের যে-কোন আহ্বানে আমাদের সাড়া পাবেন। —শ্রীপার্থিব

শব ও স্বপ্ন (নাটক) শ্রীমন্মথ কুমার চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থানঃ—ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'শব ও স্বপ্ন' নাটকখানি আমার ভালো লেগেছে। ঘাত-প্রতিঘাতে—নাটকীয় ভংগীতে ঘটনা সংস্থানের সার্থকতা ঘটেছে—ফলে নাটকখানির স্বচ্ছন্দ ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে এসে সমাপ্তি ঘটেছে। রঙ্গমঞ্চে নাটকখানি অভিনয়ে সাফল্য লাভ করবে বলে মনে করতে কোন দ্বিধা লাগে না। বিষয় বস্তুর নির্বাচনের মধ্যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক অবস্থাও প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের শেষ কথা Future belongs to the common man—এই কথায় বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে অর্থপূর্ণ ইংগিতময়তার মধ্যে। কাল নিরবধি এই সত্য এই নাটকে রক্ষিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণের মধ্যেও কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পীজনোচিত সুকৌশলে পরস্পরের বিপরীতধর্মী মনের আলোছায়ার প্রতিফলনে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুতরাং নাটক ভালো হয়েছে—এ কথা অন্তর থেকেই বলছি।"

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

"যা' হয় না"

ইউ-সি-এ ফিল্মস্-এর "যা' হয় না" ছবির চিত্রগ্রহণ কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় বেতার, গ্রামোফোন ও সৌখিন্ সম্প্রদায়ের বহু জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। এঁরা ছাড়া ও অন্যান্য মুখ্যাংশে অভিনয় করছেন, দেবী মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন পাল, নবদ্বীপ হালদার, সুষমা দেবী, বাণীদত্ত, সবিতা ঘোষ প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত প্রমোদ দাশগুপ্ত। কাহিনীটিও তাঁরই রচনা।

বর্মা আজ আর অনেক দূরের পথ নয়—
বর্মা আজ স্থান নিয়েছে আমদের হৃদয়-
সিংহাসনে। এইখানেই প্রথম স্থাপিত
হয় আজাদ হিন্দ
সরকার—গঠিত
হয় আজাদ হিন্দ
ফৌজ। এই
"বর্মার পথে"
হারিয়ে যাওয়া এক
মহামানবের রূপক
কাহিনী—
ভারতী চিত্রনের নিবেদন!
বর্মার পথে
ভূমিকায়-
সমর, পারুল, জ্যোৎস্না
অহীন্দ্র, ছায়া, শৈলেন
পূর্ণ, প্রদীপ, দাদু, গোরা
কুঞ্জ, রেবা, আশু প্রভৃতি
রচনা ও পরিচালনা
হিরণ্ময় সেন
আলোকচিত্র:- জি. কে. মেহতা
শিল্প:- প্রফুল্ল চক্রবর্তী
ম্যানেজিং এজেন্টস: ইউনিভার্সাল ফিল্ম

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

ডি, লুক্স পিকচার্স

এম, পি, প্রডাকসন্সের 'তুমি আর আমি' চিত্রখানির প্রযোজনা স্বত্ব লাভ করেছেন ডি, লুক্স পিকচার্স। চিত্রখানি ১৫ই ডিসেম্বর একযোগে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। কবি শৈলেন রায় 'তুমি আর আমি'র কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য এবং গান রচনা করেছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব মিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন কানন দেবী, সন্ধ্যারাণী, পূর্ণিমা, মনোরমা, সবিতা, রেখা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, বলিন বোস, নির্মল রুদ্র, প্রবোধ মুখার্জি, মাষ্টার শম্ভু, প্রফুল্ল, কেনারাম, আদিত্য এবং আরো অনেকে। শ্রীমতী কানন দেবী এবং পরেশ ব্যানার্জি এক সংগে এই বোধ হয় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। তাছাড়া উদীয়মান অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্যকেও কানন দেবীর বিপরীত ভূমিকায় এই বোধ হয় প্রথম আমরা দেখতে পেলাম। আগামী সংখ্যায় 'তুমি আর আমি'র সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

নিউথিয়েটার্স লিঃ

নার্স সি, সি—নিউথিয়েটার্সের আগতপ্রায় বাংলা চিত্র 'নার্স সি সি' নানা দিক দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে প্রকাশ। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা নিখুঁত সমালোচনা 'নার্স সিসি'র মুখ থেকে আমরা শুনতে পাবো। যুদ্ধ মানুষকে কতখানি শোচনীয়তার মাঝখানে টেনে নিয়ে গিয়েছে নার্স সিসি তাও বলতে কুণ্ঠা প্রকাশ করবে না। মানুষের দুঃসহ বেদনার কথা বলতে যেয়ে নার্স সিসির দরদী মনের দ্বার উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠবে। অসিতবরণ এবং শ্রীমতী ভারতী নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন—তাছাড়া ছবি বিশ্বাস এবং সুনন্দা দেবীকে এমন দু'টী বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে—কাহিনীর নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে যাদের অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে অনেকখানি। নার্স সিসির দৃশ্যপট সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। শিল্পী সৌরেন সেন—স্থান, কাল প্রভৃতির কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করে যে পরিবেশের সৃষ্টি করছেন তাকে একরকম নিখুঁতই বলা যেতে পারে। মণিপুর রিলিফ রেফেউজিস ক্যাম্পের ডকুমেণ্টারী রেকর্ড ঘেটে ঘেটে নার্স সিসির প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট নিখুঁত করে তুলেছেন। শিল্পবিভাগ সত্য সত্যই ষ্টুডিওর ভিতর যেন একটা শুশ্রূষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। জিপ, এ্যাম্বুলেন্স, ট্রাক্টরী, রেফেউজী ভ্যানস এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হবে যেন ষ্টুডিওর ওপর দিয়ে সম্প্রতি আবার বোমা-বর্ষণ হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। চিত্রগ্রহণ এবং শব্দগ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে সুধীন মজুমদার ও রঞ্জিৎ দত্ত।

আউটকাষ্ট বা জাতিচ্যুত—

পরিচালক হেমচন্দ্র তাঁর 'আউটকাষ্ট' এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কাজ কেবলমাত্র বাকী আছে। সম্প্রতি চিত্রের অন্যতম প্রধান চরিত্র বেণীপ্রসাদকে নিয়ে একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কাজ পরিচালক সমাপ্ত করেছেন। বেণীপ্রসাদের ভূমিকায় বাংলা সংস্করণে দেবী মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দি সংস্করণে পালমাহিন্দ্রকে দেখা যাবে। এই দৃশ্যটীতে আমাদের সমাজের বর্ণ-প্রথার বিরুদ্ধে বেণীপ্রসাদের অভিমত সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সমাজের এই নিন্দনীয় বর্ণ-প্রথার বিরুদ্ধে নিজের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে বেণীপ্রসাদকে কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। গোঁড়া হিন্দু পরিবারে বেণীপ্রসাদের জন্ম—কিন্তু সে বুঝতে পারে না—ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মাঝে কেন থাকবে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ—চরিত্রের দৃঢ়তা এবং মনের এই উদার মনোভাবের জন্য বেণীপ্রসাদকে আজীবন বিরুদ্ধবাদীদের সংগে সংগ্রাম করতে হ'য়েছে। এই দৃশ্যটীর দৃশ্যপটও তৈরী করেছিলেন শিল্পী সৌরেন সেন। বেণীপ্রসাদের গাঁয়ের বাড়ী রাতের ছায়াপাতে নিখুঁত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। আউটকাষ্টের চিত্রগ্রহণ এবং শব্দ

গ্রহণে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুধীন মজুমদার এবং শ্যামসুন্দর ঘোষ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন চিত্রমুক্তির পর তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অঞ্জনগড়—গ্রামের কতগুলি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক বিমল রায় সম্প্রতি কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে একটী গ্রামে যেয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। দলের লোকজন নিয়ে শ্রীযুক্ত রায়কে ঐ গ্রামে প্রায় চারদিন থাকতে হ'য়েছিল। সেখান থেকে ফিরে শ্রীযুক্ত রায়কে আবার 'বরাকরে' ছুটতে হ'য়েছে। এখানে কয়লার খনির কতগুলি দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলবে। ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত রায়ের দলবল প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র এবং শিল্পীদের নিয়ে বরাকর চলে গিয়েছেন। এই প্রসংগে একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কয়লা খনির দৃশ্য গ্রহণে খনির কর্মী ও বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন দৃশ্যাবলীকে বাস্তব রূপদানের জন্য। নবীন চিত্রশিল্পী কমল বসু শ্রীযুক্ত রায়ের মত চিত্রশিল্পীকেও নাকি তাঁর ক্যামেরার যাদুমন্ত্রে তাক্ লাগিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বাণীগ্রহণে— বাণী দত্ত পিছু হটবেন না বলে প্রকাশ। অঞ্জনগড়ের পরিবেশন স্বত্ব লাভ করেছেন ডি, ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স।

রামের সুমতি—চিত্রামোদীরা বিশেষ করে আমাদের শিশু ভাইয়েরা শুনে খুশী হবেন—নিউথিয়েটার্স 'রামের সুমতি'কে চিত্ররূপায়িত করে তুলতে অগ্রসর হ'য়েছেন। নবীন পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের ওপর 'রামের সুমতি' পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হ'য়েছে। তিনি ইতি মধ্যেই চিত্রনাট্য শেষ করে চিত্র গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছেন। বহু শিশু অভিনেতার সন্ধান পাওয়া যাবে 'রামের সুমতি'তে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে নিউথিয়েটার্সের খ্যাতনামা পরিচালকদের অধীনে থেকে চিত্রপরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বলে প্রকাশ। নিউথিয়েটার্স এই নবীনকে সুযোগ দিয়েছেন বলে একদিক দিয়ে যেমনি আমরা খুশী হ'য়েছি, তেমনি
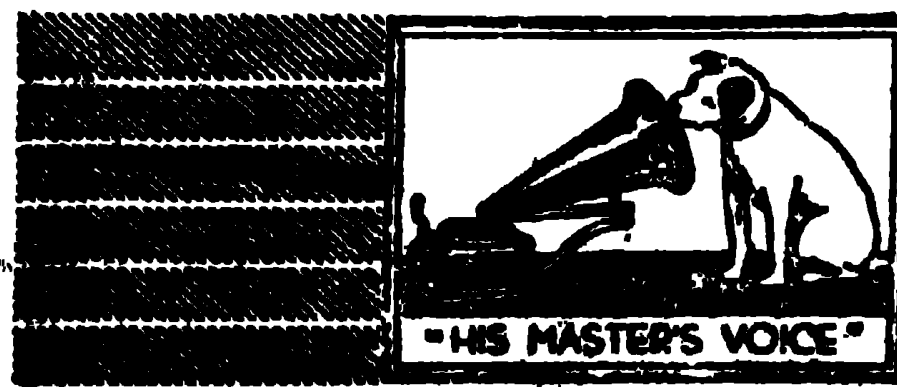
তাঁর নূতন জীবনের যাত্রারম্ভে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে সর্বপ্রকার সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় শুধু আমাদেরই নয়, একদিকে বাংলার বিপুল দর্শক সাধারণের যেমনি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ পাবেন, তেমনি চিত্রাপিপাসু বাংলার যে বালকমনের কণ্ঠ শুকিয়ে উঠেছে—তাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভাকামনা থেকে বঞ্চিত হবেন না। আশা করি নবীন তাঁর যোগ্যতার দম্ভ নিয়ে প্রবীণদের তাক লাগিয়ে দিতে পারবেন।

ওয়াশীয়াৎ নামা—

শ্রীযুক্ত সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ওয়াশীয়াৎ নামা' নিউথিয়েটার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্রের প্রথম আসন জুড়ে বসে আছে। ওসাশীয়াৎনামার চিত্রগ্রহণ এবং শব্দগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকেন বসু। প্রবীণ সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল ওয়াশীয়াৎনামার সুর সংযোজনা করেছেন এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, ভারতী, সুমিত্রা দেবী, অহীন, রাজলক্ষ্মী, লতিকা, হীরালাল, মায়া বসু এবং আরো অনেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে কেন্দ্র করে নিউথিয়েটার্সের বর্তমান হিন্দি চিত্রখানি গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম দ্বিভাষী কথা চিত্র 'জয়হিন্দ' শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। 'জয়হিন্দ' ইতিপূর্বে সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হ'য়েছিল। সে অভিনয় যদিও আমরা দেখতে পারিনি তবু প্রকাশ, নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়েই নাকি সঞ্জীব বাবু তাঁর বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে তুলেছেন। 'জয়

হিন্দে'র সুর সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নবীন সংগীত শিল্পী জহর মুখোপাধ্যায়—রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজ যেমনি তাঁর রচনার সংগে পরিচিত, তেমনি বেতারের শ্রোতারাও তাঁর উচ্চাংগ সংগীতে তৃপ্ত হ'য়ে থাকবেন। কর্মসচিব রূপে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত আছেন। আমরা ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি। কিন্তু কথা প্রসংগে তাঁদের উদ্দেশ্য করে আমরা অনেককেই দু'একটি কথা বলতে চাই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, জাতীয় সমস্যার নাম জড়িয়ে পর পর কতগুলি চিত্র প্রতিষ্ঠান জাতির দেশপ্রীতির আবেগের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ব্যবসায় স্বার্থকেই কায়েমী করে নিতে চেয়েছেন—ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম চিত্রের নাম 'জয় হিন্দ' রাখাতে তাঁদেরও প্রতি যদি আমাদের সে সন্দেহ জাগে—সে সন্দেহ খণ্ডাবার মত মালমসলা কি তাঁদের আছে? আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, 'জয় হিন্দ', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি নামগুলি ব্যবহার করবার ক্ষমতা দেশবাসী তাঁদেরই হাতে আছে বলে মনে করেন—যাঁরা দেশ এবং দেশবাসীর সমস্যা নিয়ে আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন। তাই, যদি কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে অথবা জাতীয় সরকার উদ্যোগী হ'য়ে এরূপ কোন ছবি তোলেন—তখন দেশবাসীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না। তাছাড়া কোন ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রতিষ্ঠান যদি এই নাম গুলি ব্যবহার করেন—তাহলে তাঁদের প্রতি দেশবাসীর সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। জয়হিন্দ এবং বন্দেমাতরম-এর ফাঁকা আওয়াজে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার হীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে যদি আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে দেশ এবং দেশবাসীর বিভিন্ন সমস্যাকে পর্দায় বা নাটকে রূপায়িত করে তোলেন—দেশবাসীর সমর্থনও যেমনি তাঁরা পাবেন—সহযোগীতা থেকেও তেমনি বঞ্চিত হবেন না। তাই, যাঁরা চিত্র বা নাটকের নাম এই ধরণেরই রাখতে চাইছেন, তাঁদের প্রথম থেকেই আমরা সতর্ক করিয়ে দিতে চাই।

এ, আর, প্রডাকসান্স

এ, আর, প্রডাকসনের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'আমার দেশ'-র মহরৎ গত ২১শে নভেম্বর রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তার চিত্রগ্রহণ করে চিত্রের প্রারম্ভ উৎসব সম্পন্ন করা হয়। বহু শিল্পী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংবাদিকগণ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানের বিবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে শ্রীযুক্ত রমেন চৌধুরী 'আমার দেশ'-এর কাহিনী রচনা করেছেন। চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়। নির্বাক যুগে 'অন্নপূর্ণা' নামে তিনি একখানা চিত্রপরিচালনা করেছিলেন। এবং তদবধি চিত্র জগতের সংগেই সংশ্লিষ্ট আছেন। 'আমার দেশ'র সুরসংযোজনা ও শিল্প নির্দেশনার ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে জটাধর পাইন ও এ,সি, গাঙ্গুলী। শ্রীঅনিল কৃষ্ণ রায় ও গোষ্ঠ বিহারী কুণ্ডু অনুষ্ঠাতা রূপে এই চিত্রের সংগে জড়িত রয়েছেন এবং কর্মসচিব রূপে কাজ করছেন শ্রীনিখিল রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স

নবনির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের প্রচার সচিব নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, এদের প্রথম নিবেদন একখানি দ্বিভাষী সবাক চিত্র। এর বাংলা সংস্করণের নাম হয়েছে 'আগতওই' শ্রীযুক্ত রমেন চৌধুরী 'আগতওই'র কাহিনী রচনা করেছেন। চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন অনাথ মুখোপাধ্যায়। আমরা এদের প্রথম প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

ইষ্টার্ণ মুভিজ

গৌহাটীর ইষ্টার্ণ মুভিজের নির্মীয়মান অসমীয়া ঐতিহাসিক চিত্র 'বদন বরফুকন' এর কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। 'বদন বরফুকনে'র বিপ্লবী জীবনের সংগে এযুগের সর্বজন প্রিয় বিপ্লবী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের বহু সাদৃশ্য রয়েছে। দেশ এবং জাতিকে নূতন মন্ত্রে নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বিপ্লবী 'বদন বরফুকন' আমরণ যে সংগ্রাম করে গেছেন—বহু স্থানে নেতাজীর সংগে তার মিল পাওয়া যাবে। আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সুপ্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ভুল নিদর্শন এই চিত্রখানিকে সর্বাংশে সুন্দর করে তুলবে। 'বদন বরফুকন' এর বিভিন্নাংশে রূপদান করবেন আসামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত পুরুষ এবং মহিলাগণ। ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ নিখুঁত ভাবে রূপায়িত করবার জন্য সাহায্য করছেন ডক্টর সূর্য কুমার ভূঞা, এম, এ, পি এইচ্ ডি, এবং সংলাপ রচনা করছেন জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রীলক্ষ্য চৌধুরী।

জামসেদপুর-সাকচী বেঙ্গল ক্লাব রঙ্গমঞ্চ

দুর্গত বাংলার সাহায্যার্থে গত ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর জামসেদপুর সাকচী বেঙ্গল ক্লাব রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে মাটির ঘর ও জয়দেব অভিনীত হয়। উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক ২৩শে নভেম্বর রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় মাটির ঘর এবং পরদিন গার্লস ওন ক্লাবের সৌজন্যে উক্ত রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় জয়দেব অভিনীত হয়। মাটির ঘর পরিচালনা করেন বেঙ্গল ক্লাবের সুপরিচিত তরুণ শিল্পী শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস। পরিচালনায় তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। অভিনয়াংশে ছিলেন সত্যপ্রসন্ন-সুবোধ দাশগুপ্ত। অলক-মণিময় ভট্টাচার্য। চঞ্চল সৌরেন দত্ত। তন্দ্রা—তাপস সোম। নন্দা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী। এরা সকলেই উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। মঞ্চশিল্পী এবং আলোক শিল্পী রূপে শ্রীঅমরেশ রায় চৌধুরী এবং শম্ভুদে যথাক্রমে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা : পরিমল এজেন্সী)

মারুতিনাট্য সমাজ (বালী)

মারুতি নাট্য সমাজের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ কর্ম-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হ'য়েছেন।

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ : শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারা মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, কালীশ মুখোপাধ্যায়, নির্বানীতোষ ঘটক, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, প্রদ্যোত মিত্র, বিনোদ বিহারী শেঠ, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, ও শৈলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি : শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ঘোষ ও জীবন কৃষ্ণ ঘোষ। সাধারণ

সম্পাদক: শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক: বিজয় রায় (বিকু)। সহঃ সম্পাদক: পঞ্চানন মুখার্জি। কোষাধ্যক্ষ: প্যারি মোহন কুমার। প্রধান পরিচালক: বলাই চাঁদ ঘটক। সাধারণ পরিচালক: জয়কৃষ্ণ রায়। সহ: পরিচালক: মোহিত ঘোষ। সভ্যবৃন্দ: দুলাল ঘোষ শৈলেন ব্যানার্জি, কিশোরী চ্যাটার্জি, নির্মল ব্যানার্জি, শৈলেন রায়। চাঁদা সংগ্রাহক: মন্মথ ঘোষ, রাধা দাস ও গৌর পাল।

ফ্রি ইণ্ডিয়া পিকচার্স

সম্প্রতি এই নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানটীর প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' চিত্রের মহরৎ উৎসব গত ২০শে নভেম্বর রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন অজিত বসু ও অতুল দাশ-গুপ্ত। সুর-সংযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন তিমিরবরণ। প্রযোজনা করছেন মনোজ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত শ্রীতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সত্য কুমার রায় প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার। শিক্ষামূলক এবং জাতীয় আদর্শে চিত্র গ্রহণের জন্ত এঁরা অগ্রসর হ'য়েছেন। এই প্রসংগে ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশনে আমরা যেকথা বলেছি এঁদেরও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

নৃত্য-ভারতী

শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ দাস পরিচালিত নৃত্য-ভারতী ২২, তারক দত্ত রোড, পার্ক সার্কাস, থেকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ২১১, ফার্ণ রোড এ অবস্থিত ক্যালকাটা গার্লস একাডেমীর বাড়ীতে উঠে এসেছে। গত ৭ই নভেম্বর থেকে বিকেল ৪॥০ টা থেকে ৫॥০ টা অবধি প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার এখানে রীতিমত ক্লাস বসছে। নূতন ছাত্রীরাও ভরতি হ'তে পারবেন বলে পরিচালক আমাদের জানিয়েছেন।

হিন্দুস্থান ফিল্ম

'বন্দেমাতরম' চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান ফিল্মস' নামে তাঁর নিজস্ব প্রযোজনাধীনে একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। হিন্দুস্থান ফিল্মের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'মধু যামিনী'র পরিচালনা ভারও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই গ্রহণ করবেন। রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে শীঘ্রই 'মধু যামিনীর' কাজ আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ।

ধূপছায়া লিঃ

গত ৯ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে ধূপ-ছায়া লিঃ এর হিন্দিচিত্র বিপ্লবীর মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ, সতু সেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত উৎপল সেন চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। কাহিনীটীও তাঁরই রচনা। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন শ্রীমতী কৌশল্যা, বেগম পারভিন, নারাঙ, প্রভৃতি। নবীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার লাহা ও করুণাময় দাস অভ্যাগতদের আপ্যায়নে

সব সময় যত্নবান ছিলেন। আমরা নবীনদের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

মহামায়া চিত্রপীঠ

ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে মহামায়া চিত্র-পীঠের প্রথম বাংলা ছবি 'মা আর মাটি'র চিত্র গ্রহণের কাজ শীঘ্রই শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আরম্ভ হবে। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে নবাগতা মণিমালা দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, অমিতা দেবী প্রভৃতি আরো অনেককে।

মধুবোস প্রডাকসন্স

মধুবোস প্রডাকসন্সের 'গিরিবালা' হিন্দি চিত্রখানির কাজ সমাপ্ত হ'য়েছে বলে এক সংবাদে প্রকাশ। কবিগুরুর গল্পগুচ্ছের 'মা ন ভ ঞ্জ ন' কাহিনীকে অবলম্বন করে শ্রীযুক্ত বসুর বর্তমান চিত্র গড়ে উঠেছে। গিরিবালার বিভিন্নাংশে দেখা যাবে অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, হীরালাল, রাজলক্ষ্মী, পূর্ণিমা, তুলসী লাহিড়ী, কামতা প্রসাদ, ট্যাণ্ডন, বিঠলদাস পাঙ্কোটিয়া প্রভৃতি আরো অনেককে। ছবির নায়িকা গিরিবালার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী দেবী নামে এক শিক্ষিতা তরুণীর সংগে দর্শকসাধারণ পরিচিত হ'তে পারবেন।

শুভ্রা দেবী—দর্শকদের অভিনন্দন আশীষে ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনের সাফল্যের দৃঢ়তা নিয়ে চিত্রজগতে পা বাড়াবেন।

বসুধারা বাণীচিত্র

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'অভিযাত্রী' উদয়ের পথে খ্যাত লেখক জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত হেমেন গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করেছেন নবীন সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন বিনতা রায় (বসু), রাধামোহন, নির্মলেন্দু, কমল, শম্ভু, নরেশ, বিকাশ প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানি মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের পরিবেশনায় মুক্তির দিন গুণছে।

ছায়ানট পিকচার্স

ছায়ানট পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ২০শে ডিসেম্বর থেকে একযোগে

শ্রী—রূপম—রূপালী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন হিমাদ্রি চৌধুরী। অভিনয় করেছেন—রেণুকা, জহর, অহীন্দ্র, প্রভা, সন্তোষ, রবি, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা, কিরণকুমার, ভুজঙ্গ, লীলা, নবদ্বীপ, বাণীবাবু, প্রীতিধারা প্রভৃতি। আগামী সংখ্যায় 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'র সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

মুভি টেকনিক—

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সে'র পরিবেশনায় মুভি টেকনিক প্রযোজিত বাংলা বাণীচিত্র 'প্রতিমা' ২১শে ডিসেম্বর থেকে মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খগেন্দ্র নাথ রায়। কাহিনী রচনা করেছেন শৈলজানন্দ এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন সমরেশ চৌধুরী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সিপ্রাদেবী, প্রমীলা, ত্রিবেদী, অজিত ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, ফণীরায়, হরিমোহন, আরতি, তুলসী চক্রবর্তী, অহীন্দ্র, রাজলক্ষ্মী, সেবু মুখার্জি প্রভৃতি। আগামী সংখ্যায় প্রতিমার সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

রঙমহল

প্রবীণ উপন্যাসিক উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যরূপায়িত হ'য়ে এখানে অভিনীত হচ্ছে। এদের নূতন নৃত্যগীতবহুল হাস্যরসাত্মক ব্যংগ নাটক—'সেই তিমিরে' গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার থেকে মধ্যসাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে অভিনীত হচ্ছে। রাজপথের সমালোচনা গত সংখ্যায় প্রকাশ করা হ'য়েছে। 'সেই তিমিরে' পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

কালিকা: বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'খেলাঘর' এখানে অভিনীত হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়

য়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র, ফণী, ইন্দু, জ্যোতি, ভরতকুমার
ধু, গোপাল, মলিনা, হরিমতী, রমা, কঙ্কা প্রভৃতি।
রবর্তী সংখ্যায় 'খেলাঘরের' সমালোচনা প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

শ্রীরঙ্গম—নাট্যগুরু শিশির কুমার পরিচালিত শ্রীরঙ্গম নাট্য-মঞ্চে 'দুঃখীর ইমান' নূতন নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী। পরিচালনা করেছেন নাট্যগুরু স্বয়ং। আগামী বারে 'দুঃখীর ইমান' এর সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

স্টার থিয়েটার

এখানে রায়গড়, দেবী চৌধুরাণী অভিনীত হচ্ছে। বড়দিনের আকর্ষণ রূপে কপালকুণ্ডলা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন পরে বিপিন গুপ্ত বোম্বাই থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেছেন।

পরলোকে ইন্দুসাহা

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় ঘোষক ও শিল্পী ইন্দু সাহার অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদে অনেকেই মর্মাহত হ'য়েছেন। ১৯২০ খৃঃ ঢাকা সহরে ইন্দু সাহা জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এবং ছাত্রাবস্থাতেই বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিযোগীতায় নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিও, ঢাকা কেন্দ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েন এবং ১৯৪২ সালে বি, এ পাশ করে রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতে প্রবেশ করবার জন্য কলকাতায় আসেন। তারপর কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রধান ঘোষকের পদ গ্রহণ করে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ অবধি সুনামের সংগে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন। গত ১৮ই অক্টোবর শনিবার রাত্রি ৯ টায়, আকস্মিক ভাবে তিনি এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ভবানীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও সভ্য ছিলেন। ক্লাবের প্রত্যেকটী সভ্যের অন্তরই তিনি জয় করতে সমর্থ হ'য়ে ছিলেন। রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ স্বর্গতঃ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য এক শোকসভার ব্যবস্থা করেন। বহু শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, ইন্দুসাহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমরা ইন্দু সাহার আত্মার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

মণি দাশগুপ্ত—এইচ, এম, ভি'র শিল্পী কৌতুক নক্সায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'যা হয় না' এবং 'রাত্রি' প্রভৃতি চিত্রে দেখা যাবে।

নূতন নাট্য-মঞ্চ

গত রবিবার ১৫ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস, আর দাস শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে 'দি বেঙ্গল ন্যাশনাল থিয়েটার্স লিঃ' এর 'মেম্বার সিপ' থিয়েটার গৃহের ভিত্তি স্থাপনের শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষ্যে সহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী,

রূপাঞ্জলি পিকচার্স—

রূপাঞ্জলি পিকচার্স-এর প্রথম অবদান 'অলকনন্দা'র কাজ রাধাফিল্ম ষ্টুডিও-তে দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত রতন চট্টোপাধ্যায়। ইনি দেবকী বাবুর সহকারী ছিলেন। অলকনন্দার কাহিনী রচনা করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। এবং সংগীত পরিচালনার ভার রয়েছে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের ওপর। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, পরেশ ব্যানার্জি, অজিত চট্টোপাধ্যায়, আশু, ইন্দু, পূর্ণিমা, প্রমিলা ত্রিবেদী, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। আগামী সংখ্যায় অলকনন্দা সম্পর্কে বিশেষ ষ্টুডিও-সংবাদ প্রকাশিত হবে। নবীন প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের আমরা সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

ইউ, সি, এ ফিল্মের 'যা হয় না' চিত্রে জনপ্রিয় শিল্পী দেবী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে।

রাত্রি—

চিত্রজগতে মানু সেন বহুদিন যাবৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা ব্যর্থ হয়নি। সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই চিত্রবাণীর 'রাত্রি' ছবিখানি শেষ করে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। 'রাত্রি' ছবির কাহিনী সাধারণ সামাজিক কাহিনী নয় এবং সেইজন্যই তার চিত্ররূপান্তরের ধারাও সহজ নয়। দস্যু অথচ লোভ নেই, চুরি করে অথচ শয়তান নয়, চুরি তার পেশা নয় নেশা, খুন করতে সে ঘৃণা করে, অস্ত্র ব্যবহার করতে তার লজ্জা হয়—বুদ্ধিই তার কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র, অনুচর তার রাত্রির অন্ধকার। দিনের আলোয় যে মানুষটি লেখক সূর্য রায়, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে সে-ই হ'ল রহস্যময় 'কালো কোর্তা।' কাহিনী-রচয়িতা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক রচনা নিপুনতায় এই 'দিন-

শ্রীমোহিনীমোহন কুণ্ডুর প্রযোজনায়

প্রশান্ত প্রডাকসন্সের নবতম বাণী চিত্র—

রক্ত-রাখী

রচনা ও পরিচালনা	সুর-সংযোজনা	শিল্প-নির্দেশক
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়	লক্ষ্মীনারায়ণ সেনগুপ্ত

আলোক-শিল্পী	ব্যবস্থাপক	শব্দযন্ত্রী
নিখু দাশগুপ্ত	বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়	গোবিন্দ মল্লিক

=ভূমিকায়=

অহীন্দ্র চৌধুরী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা, প্রমোদ গাঙ্গুলী, অমিতা, পুরু মল্লিক, নিভাননী, আশু বোস, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্তী, রেবা বসু, প্রফুল্ল-দাস, সুহাসিনী, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ দাস, শিবু ভট্টাচার্য্য, বাসুদেব চ্যাটার্জি, প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক ঃ কাপুরচাঁদ লিমিটেড।

'উদয়ের পথে' খ্যাতা অভিনেত্রী বিনতা রায়কে নূতন রূপে 'অভিযাত্রী'তে দেখা যাবে।

রাত্রি'র বিদুষী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে এমন একটি রহস্যময় মূর্তি দিয়েছেন যার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত রোমাঞ্চ-কর। পরিচালক মানু সেন বিশেষ কৃতিত্বের সংগে এই বিশিষ্ট কাহিনীটিকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে কমল মিত্র, প্রতিমা দাশগুপ্তা, জহর গাঙ্গুলী, সাবিত্রী, সুপ্রভা মুখার্জি, অমর মল্লিক, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন, সুহাসিনী, অমিতা, নীলিমা, কানু বন্দ্যো, শ্যাম লাহা, ধ্রুব চক্রবর্তী, মণি দাশগুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উদীয়মান তরুণ সুরশিল্পী এই চিত্রের সুররচনা করেছেন।

মহাকাল—

পরিচালক ধীরেশ ঘোষ চিত্রবাণীর 'মহাকাল' নামে ছবিখানির কাজ জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগ হ'তেই পুরাদমে সুরু করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।

জয়যাত্রা—

স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিন কোনখানে বিপ্লব ছাড়া রচিত হয়নি। অগ্নিমন্ত্রে এই বিপ্লবের পথ রচিত হ'য়েছে। অসহোযোগিতা ও অহিংসাবাদ দিয়ে যে সংগ্রামের সুরু সে সংগ্রামও একদিন গণজাগরণের বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করে—সেখানে বিপ্লব আসেই, যে-বিপ্লব জাতির আত্মচেতনার সমগ্রতর একটি প্রাণবন্ত রূপ। প্রথমে এই বিপ্লবের আগুণ জ্বলে ওঠে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তারপর তাদের ত্যাগ, তাদের লাঞ্ছনা, তাদের অপরিমেয় সুপ্তশক্তি, তাদের একাগ্র স্বপ্ন ও সাধনার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছড়িয়ে যায় মানুষ হ'তে মানুষের মনের অরণ্যে, দেশ হ'তে দেশান্তরের জীবনযাত্রায়। শাসকদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে অমান্য করবার দুর্জয় সাহস আসে বুকে, দিকে দিকে প্রতিবাদের নির্ভীক কণ্ঠ শোনা যায়। স্পেনে ও ফ্রান্সে, চীনে ও জার্মাণীতে শোনা গেছে এই প্রতিবাদ, দেখা গেছে এই দুঃসাহস এবং তার জোরে তারা পেয়েছে স্বাধীনতা—আজ ভারতবর্ষ এসে দাঁড়িয়েছে মুক্তিকামী জয়যাত্রার দুর্ণিবার গতিপথে—সেখানে বহুদিনের বন্ধন হয়তো ছিঁড়ে যাবে, বহুদিনের মতবাদ হয়তো টিঁকবে না, বোন মানবেনা দিদিকে, ছন্নছাড়া হতভাগাকে চিনতে পারব নূতন করে, বিশ্বাসঘাতকরা পাবে শাস্তি, দেশ পাবে নূতন নেতা। এমনি করে আসছে স্বাধীনতার সম্মান, বেঁচে থাকার নূতন গৌরব। ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের প্রথম দ্বিভাষী চিত্র 'জয়যাত্রা'-র কাহিনী এই গণ-আন্দোলনের কথাই বলেছে। নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় ছবি তোলার কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই কাহিনীটি রচনা

করেছেন। সুরসংযোজনা করছেন কমল দাশগুপ্ত। গান লিখেছেন অজিত দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে শ্রীমতী সুনন্দা, শ্রীমতী সুমিত্রা, অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী মুখার্জি, জহর গাঙ্গুলী, কৃষ্ণধন, রাধামোহন, ধ্রুব চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা প্রভৃতি শিল্পীদের সাক্ষাৎ পাবেন।

ডি, জি, পিকচার্স—

পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'শৃঙ্খল' হৃদয়াবেদনের সহজ স্বাভাবিক ছন্দে গাঁথা বাঙালী ঘরের ও সমাজের নিতান্ত আপনার কাহিনী। জহর গাঙ্গুলী তাঁর নিজস্ব ভংগীতে সরল একরোখা হৃদয়বান মানুষের যে চরিত্র জীবন্ত করে তোলেন, 'শৃঙ্খল' চিত্রের নায়ক হরিপদ ঠিক এমনি একটি মানুষ। পশুপতির চক্রান্তে দরিদ্র নিরীহ হরিপদর সাংসারিক জীবনে যে কুয়াশা জমে উঠেছিল তার সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার উপায় ছিল তার নিজের স্ত্রীকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ওপর। নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের নানা অনুভূতির রসবৈচিত্রের মধ্য দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর অটুট বন্ধনের চিত্তস্পর্শী কাহিনী 'শৃঙ্খল' চিত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। 'শৃঙ্খল' চিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী মলিনা, অমিতা, জহর গাঙ্গুলী, দেবী মুখার্জি, ডি, জি, নবদ্বীপ, রঞ্জিৎ রায়, আশু বোস প্রভৃতি। 'শৃঙ্খল' ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতার কয়েকটি চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করবে।
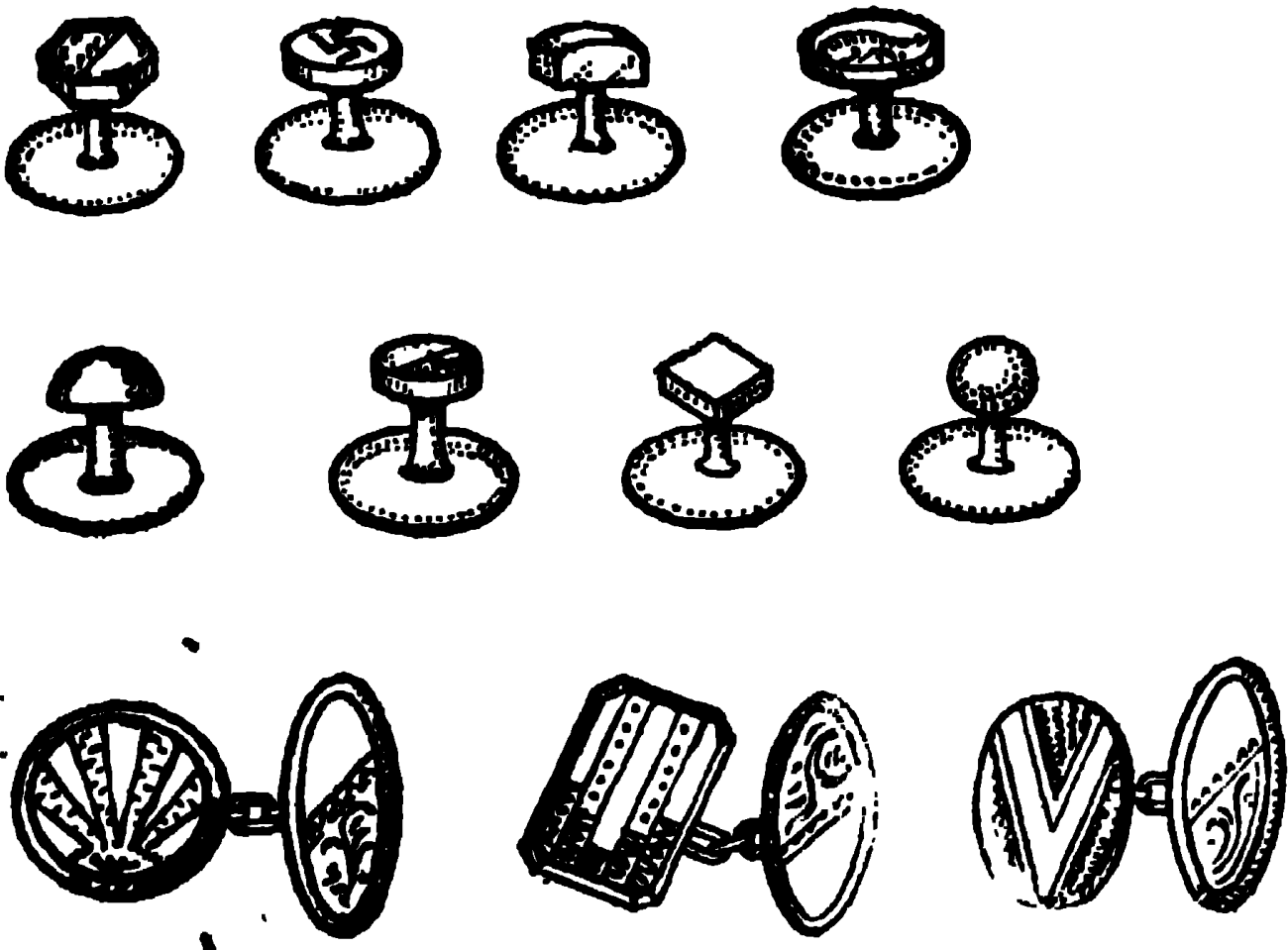
পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী ইতিমধ্যে আর একখানি বাঙলা ছবির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। ছবিখানির নাম 'শেষ-নিবেদন'। শরৎচন্দ্রের 'আলো-ছায়া' কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে শ্রীমতী মলিনা, সরযূবালা ও ছবি বিশ্বাস, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতিকে দেখা যাবে।

রায়-চৌধুরী—

সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দের 'রায়-চৌধুরীর' কাজও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও-তে শেষ হ'য়ে এসেছে। 'রায়-চৌধুরী' চিত্রে চরিত্র ও ঘটনার এত ভীড় এবং সেই ভীড়ের মধ্যেও প্রত্যেকটি চরিত্র এত সুস্পষ্ট ও ঘটনাগুলি এমন অনিবার্য ভাবে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে যে, একমাত্র শৈলজানন্দের মত কুশলী কথাশিল্পী ও নিপুণ চিত্রপরিচালকের হাতেই তার সুসামঞ্জস্য বিন্যাস ও পরিণতি আশা করা যায়। যাঁদের নাম এখানে আমরা দিলাম তাঁরা প্রত্যেকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যে কোন আকারেই হোক কাহিনীর মধ্যে চরিত্রবৈশিষ্ট্যে এক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন—কমল মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী মুখার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর চৌধুরী, নবদ্বীপ, হরিধন, নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যো, আশু বোস, প্রমীলা ত্রিবেদী পূর্ণিমা, সুপ্রভা মুখার্জি, প্রভা, শ্যামলেশ্বর, প্রবোধ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ, প্রভৃতি। শৈলেশ দত্তগুপ্ত এই ছবিতে সুরসংযোজনা করছেন।

পুস্তক = পরিচয়

মিনুর গল্প ঃ শ্রীবিমল বসু। পরিবেশক : ছোটদের আসর, ১৬।এ ডফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : একটাকা।

মিনুর গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত বিমল বসু বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নন। বেতার এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মারফৎ তিনি বিশেষভাবে ছোটদের কাছে খুবই পরিচিত। তাঁর আলোচ্য পুস্তকখানিতে ছোটদের উপযোগী পাঁচটী গল্প সন্নিবেশিত হ'য়েছে। প্রত্যেকটী গল্পই ছোটদের মন কেড়ে নেবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। শিল্পী সমর দে অংকিত রঙিন প্রচ্ছদপটটী অতি সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করবে।

মেলুর পাঁচালী ঃ নির্মল ভাই। প্রকাশক : ছোদের আসর ১৬।এ ডফ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : একটাকা, আট আনা।

নির্মল ভাইর সংগে বেতারের ছোটদের সংগে খুবই পরিচয় আছে। মেলু এবং মেলুর ছোড়দাকে নিয়ে 'মেলুর পাঁচালী।' মেলুর পাঁচালী যেন বিশেষ করে বেতারের ছোটদের জন্যই লেখা। তবু অন্যান্য ছোটদেরও তা ভাল লাগবে। রঙিন কাগজে ছাপা। বোর্ড বাঁধাই। তবু দামটা একটু বেশী বলেই মনে হয়। শিল্পী বরদা গুহ অংকিত প্রচ্ছদপটটী বইখানিকে ছোটদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ছাপাও খুব ঝরঝরে।

পূজোর হাসি খুশী ঃ সম্পাদক : নির্মল ভাই। প্রকাশক : ছোটদের আসর : ১৬।এ ডফ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : দু'টাকা, আট আনা।

পূজাবার্ষিকী। লিখেছেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, অশোক নাথ শাস্ত্রী, শৈলেন রায়, পরিমল গোস্বামী, অঞ্জলি সরকার, বাণী গুপ্তা, সুনির্মল বসু, নলিনীকান্ত সরকার, নরেন্দ্র দেব, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, কমল বসু, ধীরেন্দ্র লাল ধর, গীতা বসু, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বাণী কুমার, দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতি আরো অনেকে। প্রত্যেকটী লেখাই মনোজ্ঞ এবং শিশু মনের উপযোগী। তাছাড়া যতীন সাহার ছবি ও ছড়া 'দেদার মজা' এবং জয়ন্ত চৌধুরীর অংকন—শিশুদের কাছে সমাদর পাবে। শিল্পী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় অংকিত (রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পেনসিল স্কেচটীও বইখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে। সমর দের প্রচ্ছদ পট—ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ইভাকুয়ি ঃ রামেন্দ্র দেশমুখ্য উপন্যাস। প্রকাশক : প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস : ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : আড়াই টাকা।

লেখক একজন সাংবাদিক—ইতিপূর্বে কবি হিসাবে তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। তাঁর কবিতার বই 'ধানক্ষেত' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রশংসা অর্জন করেছে। আলোচ্য উপন্যাসখানিতেও লেখকের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গত যুদ্ধের সময় বার্মা থেকে যাঁরা পালিয়ে আসছিলেন—মধ্যবর্তী একটী ছোট সহরের পটভূমিকায় তাদেরই নিয়ে উপন্যাসখানি গড়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল।

অভ্যুদয় ঃ কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ। গীতিনাট্য। প্রকাশক : কংগ্রেস-সাহিত্য সংঘের পক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য : একটাকা।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ অভিনীত গীতিনাট্য 'অভ্যুদয়' মঞ্চে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের অভিনন্দন লাভ করে। বর্তমানে সেই 'গীতিনাট্য'টিকে পুস্তককারে প্রকাশ করা হ'য়েছে। নাটকটীর পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের—সমস্ত নাটকটীর আবৃত্তি অংশ, বিভিন্ন ভূমিকার গল্পরূপ ও 'জাগে নব ভারতের জনতা' গানটী তাঁর রচনা। শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী 'ওভাই চাষী' "গ্রামের রজনীগন্ধা' 'মহা সমরের দাস" নাটকের বিশিষ্ট তিনটী কথাকে গানে রূপ দিয়েছেন। এবং বাকি সমস্ত ভূমিকার কথাগুলি রূপান্তরিত করেছেন শ্রীযুক্ত সজনী দাস। প্রস্তাবনার গান এবং বিপ্লবীর গানও

তাঁরই রচনা। এঁরা এই গ্রন্থের স্বত্ব কংগ্রেস সাহিত্য সংঘকে দান করেছেন। আমরা পৃথকভাবে এদের প্রত্যেককেই এবং সমগ্রভাবে কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকেই অভ্যুদয়ের অভিনয় দেখবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি—সে ক্ষেত্রে বইটী পড়ে অন্ততঃ কিছুটা ধারণা করে নিতে পারবেন। তাছাড়া যদি কেউ এর অভিনয় করতে চান, তারও অনুমতি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের এই নাট্যান্দোলনকে 'কেবল মাত্র সহরের গণ্ডির মাঝেই' আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। বইখানি প্রকাশ করে এবং অভিনয়েচ্ছুক জনসাধারণকে অনুমতি দেবেন বলে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত ভূমিকায় যে কথা স্বীকার করেছেন—তাতে আমাদের অনুরোধ কিছুটা রক্ষিত হ'য়েছে বলেই মনে করি। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —প্রীতিদেবী

শ্রাবণ-ভাদ্র : : ৭ম বর্ষ : : ৫ম সংখ্যা

স্বর্গতঃ হরেন্দ্র ঘোষ

খ্যাতনামা প্রয়োগশিল্পী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ২৪শে আষাঢ়, ১৩৫৪ সাল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় নৃশংসভাবে নিহত হ'য়েছেন। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু শুধু তাঁর আত্মীয় স্বজন—বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতদের অন্তরে যেয়েই আঘাত হানেনি—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকেই বিচলিত করে তুলেছে। যাঁরাই হরেন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও উদার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ না হ'য়ে পারেননি। প্রয়োগশিল্পী রূপে তাঁর প্রতিভা সর্ববাদী সম্মত। উত্তরকালে হয়ত হরেন্দ্র ঘোষের চেয়েও প্রতিভাসম্পন্ন প্রয়োগশিল্পীর সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হ'তে পারে—কিন্তু পাহাড়ের বুক কেটে যে পথিক সর্ব প্রথম পথ রচনা করে গেলেন—তাঁর কথা সব সময়ই জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বাগ্রে মনে করবে। এই কথা চিন্তা করেই হরেন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর বেদনা আমরা ভুলতে চেষ্টা করবো। কিন্তু মানুষ হরেন্দ্র ঘোষকে ভুলবো কেমন করে? মানুষ হরেন ঘোষের পরিচয় যাঁরা পেয়েছিলেন—তাঁর এই মৃত্যুর ব্যথা কোনদিন তাঁদের অন্তর থেকে মুছে যেতে পারে না।

ব্যক্তিগত ভাবে রূপ-মঞ্চের তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। রূপ-মঞ্চের রূপ-পরিকল্পনায় সময়ে অসময়ে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ থেকে অমোদের কোনদিন বঞ্চিত করেননি। রূপ-মঞ্চের প্রথম জন্মদিনে যে সম্ভাবনা তাকে মুগ্ধ করেছিল—পরবর্তীকালে তার বিকাশ হরেন্দ্র ঘোষের অভিনন্দন লাভেও সমর্থ হ'য়েছিল। কিছুদিন পূর্বেও কালী ফিল্মস স্টুডিওতে সাক্ষাৎকালীন তাঁর কথাগুলি এখনও আমাদের কাণে বাজছে—'রূপ-মঞ্চের এই রূপ যেন কোনদিন নষ্ট হ'য়ে না যায়।' আমরা যারা মানুষ হরেন ঘোষের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ পেয়েছিলাম—তাঁর আদর্শকে যদি জয়মণ্ডিত করে তুলতে পারি, তবেই সে পরিচয়ের মর্যাদা রাখতে পারবো। মাঝে মাঝে যখন অনুভূতির নাড়ীটা টনটনিয়ে উঠবে—চোখের জল দিয়ে শিল্পীর স্মৃতি-তর্পণ করবো। শিল্পীর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক। সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার তমসা কাটিয়ে আমাদের শুভবুদ্ধি চির প্রোজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিক।

প্রতি সংখ্যা —

তুই টাকা

★

ডাকযোগে—

তুই টাকা চারি আনা

★

শারদীয়া ১৩৫৪

●

অন্যান্য বছরের মত এবারও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে 'রূপ-মঞ্চ শারদীয়া সংখ্যা' তার পাঠকদের অভিবাদন জানাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের আমাদের সংগ্রাম-মুখর দিনগুলির কথা নিয়ে একটী বিশেষ অধ্যায় এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করবে। যে শহীদদের রক্ত দিয়ে আমাদের এই সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হ'য়েছে —তাঁদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধার সংগে 'শারদীয়া রূপ-মঞ্চ' নিবেদিত হবে।

এই সংখ্যাটিকে যাঁরা তাঁদের মহামূল্য রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের ভিতর আছেন—

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নাট্যগুরু শিশিরকুমার ভাতুড়ী, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সজনী দাস, নরেন্দ্র দেব, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরযূ দেবী, সুনন্দা দেবী, বনানী চৌধুরী,গোপাল ভৌমিক, নরেশ চক্রবর্তী, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সুকতি সেন, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, যতীন দত্ত, বিভূতি লাহা, ফণীন্দ্র পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, নির্মল ভটাচার্য, শক্তিপদ রাজগুরু, যামিনী সেন, প্রদ্যোত মিত্র, এন, কে, জি, নিতাই সেন, মণিদীপা, লাউড স্পীকার, শ্রীপার্থিব, খগেন রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে—

●● **মফঃস্বল এজেন্টবর্গ ঃ** মফঃস্বল এজেন্টগণ যেন পূর্ব থেকেই তাঁদের চাহিদার সংগে ২ টাকা মূল্য হিসাবে তাঁদের কমিশন বাদ দিয়ে পৃথকভাবে টাকা পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যার সংগে যেন শারদীয়া সংখ্যাকে জড়িয়ে না ফেলেন।

●● **সাধারণ পাঠক ঃ** কেবলমাত্র শারদীয়া সংখ্যাই যাঁরা কিনে থাকেন বা যাঁরা আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত নন, শারদীয়া সংখ্যার জন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে হলে পূর্বেই যেন মণিঅর্ডার করে ডাক খরচা সমেত তাঁরা ২।০ আনা পাঠিয়ে "শারদীয়া-সংখ্যার" গ্রাহকদের তালিকাভুক্ত হ'য়ে থাকেন।

☞ —"শারদীয়া-রূপমঞ্চ" প্রচার বিভাগ থেকে প্রচারিত— ☜

মানুষ হরেন ঘোষ

গোপাল ভৌমিক

★

এক একটি মানুষ থাকে যার সংগে যারা জীবনে মিশলেও সে মনের উপর স্থায়ী কোন দাগ কাটতে পারে না। আবার এমন এক একটি লোক দেখা যায় যে, মনের উপর অতি সহজেই দাগ কেটে যায় এবং চেষ্টা করলেও সে দাগকে সহজে মুছে ফেলা যায় না। এই শেষোক্ত ধরণের লোকের সংগে বেশ কিছুদিন অদর্শনের পরেও যদি দেখা হয়, তবে তাঁর সংগে পূর্বের মতই নৈকট্য অনুভব করা যায় এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানজনিত জড়তা আদৌ মনকে সঙ্কুচিত করে তোলে না। সুপ্রসিদ্ধ ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ ছিলেন এই শেষোক্ত ধরণের মানুষ। তিনি অতি সহজেই মানুষকে আপনার করে নিতে পারতেন। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটি সহজ সারল্য, অনাড়ম্বর অমায়িক ভাব, সহজাত সৌজন্য ও মধুরতা ছিল যে, সামান্যমাত্র পরিচয়ের সুযোগেই সহজে তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠত।

হরেনবাবুর সংগে আমার প্রথম অলাপ হয়েছিল ১৯৪০ এর শেষের দিকে। সেই সময় আমি সংবাদপত্রে প্রবেশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

এমন সময় আকস্মিকভাবে সে সুযোগ জুটে গেল সাহিত্যিক বন্ধু সুশীল রায়ের প্রয়াসে। একদিন তিনি আমাকে জানালেন যে, হরেন ঘোষের ভাই ধীরেন ঘোষ পুরাতন 'নাচঘর' পত্রিকাখানিকে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করতে উদ্‌গ্রীব এবং তিনি তাঁর সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেছেন। সংগে সংগে তিনি আমাকে তাঁর সহকারী সম্পাদকরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব জানালেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম—এই ভেবে তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে রাজী হলাম। ফলে [illegible] এর গোড়ায় 'নাচঘর' পত্রিকা মাসিকপত্ররূপে [illegible] ঘোষ ছিলেন পরিচালক, সুশীল রায় সম্পাদক এবং সহ সম্পাদক আমি। কার্যালয় হল ৮নং ধর্মতলা স্ট্রীটের ওয়াসেল মোল্লা ম্যান্‌সনে দোতালায় হরেনবাবুরই অফিসে।

এমনই করে আমি সর্বপ্রথম হরেন ঘোষের সুমধুর সংস্পর্শে এলাম। দুদিন যেতে না যেতেই দেখলাম তিনি কখন আমার অজ্ঞাতসারে হরেনদা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আমার হৃদয়ে অনেকখানি শ্রদ্ধার আসন দখল করে বসেছেন। আমি জানতাম যে ইম্প্রেসারিও রূপে হরেন ঘোষের খ্যাতি তখন শুধু ভারতব্যাপী নয়—সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায়ও সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এই খ্যাতি-জনিত কোন অহংকারের দেওয়াল নিজের চারিদিকে তুলে দিয়ে নিজেকে সাধারণের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হরেনদাকে কোন দিনই দেখি নি। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরে সৌম্যশান্ত মূর্তি নিয়ে তিনি তাঁর টেবিলে বসে কাজ করতেন এবং তাঁর চার-পাশে এসে ভিড় জমাতেন নর্তক-নর্তকী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা ও সাহিত্যিক-শিল্পীর দল। দেখতাম সকলেই তাঁর প্রতি সমান শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন এবং তিনিও সকলকে গ্রহণ করেন উদারচিত্তে। কোন সময় তাঁর ব্যবহারে কোন কৃত্রিমতা বা অসৌজন্যের পরিচয় পাই নি কোনদিন। 'নাচঘর' মাসিক পত্রিকাখানি প্রায় এক বৎসরকাল চলেছিল এবং এই এক বৎসরকাল নানা দৃষ্টি কোণ থেকে হরেনদাকে বিশ্লেষণ করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর চরিত্রের সহজাত রস বোধ ও শিল্প বোধের অনেক পরিচয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় পেয়েছিলাম সেটা হল তাঁর চরিত্রের অননুকরণীয় মনুষ্যত্ব বোধ। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনেক উচুতে। আজ তাঁর শোচনীয় ও আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্রের এই দিকটাই সবচেয়ে বড় হয়ে আমার চোখে ফুটে ওঠে।

নৃত্যপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হরেনদার ব্যবসায় বা উপজীবিকা ছিল বটে কিন্তু তিনি নিছক নৃত্যশিল্প প্রদর্শনব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁর অন্তরে একটি শিল্পী সত্তা সুপ্ত হয়ে
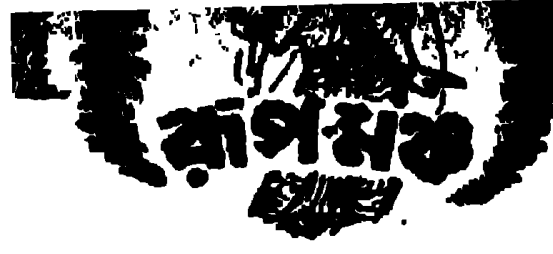
ছিল। এই শিল্পবোধ নিছক নৃত্য-ঘটিত ছিল না। ব্যাপক ভাবেই তাঁর মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল—তা সে শিল্প নৃত্য-শিল্পই হোক, সাহিত্য শিল্পই হোক, সংগীত শিল্পই হোক আর চিত্র-শিল্পই হোক। এসব বিষয়েই তিনি ছিলেন প্রকৃত সমঝদার। বিভিন্ন বিষয়ক আলাপ আলোচনায় বহুবার বহুভাবে তাঁর চরিত্রের এই ব্যাপক শিল্প-বোধের পরিচয় পেয়েছি। শিল্পরসিক সমাজও তাঁর চরিত্রের এই দিকটির সংগে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কেনা জানেন তাঁর কর্মময় জীবনের মধ্যেও অবসর করে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে 'Four Arts' Annual' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের শিল্পকলাবিষয়ক বার্ষিকীর সম্পাদনা করতেন এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'নাচঘর' পত্রিকারও তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার?

বাংলার চলচ্চিত্র জগতেও হরেন ঘোষের দান উপেক্ষণীয় নয়। নির্বাক যুগে বাঙ্গালী চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তারপর জীবনের পরিবর্তিত ঘটনা চক্রে পড়ে তাঁকে চিত্রজগৎ থেকে দূরে সরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আদর্শ একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার একটা স্বপ্ন তাঁর মনে বরাবরই বিদ্যমান ছিল। একাধিকবার কথা প্রসংগে তাঁকে তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেছি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি চলচ্চিত্রজগতে পুনঃ প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আরম্ভ কাজ সমাপ্ত করার সুযোগ তিনি পান নি।

হরেন ঘোষকে নিছক নৃত্যব্যবসায়ী বলে যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে ভুল করা হবে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নৃত্যশিল্পের আবিষ্কারক এবং প্রচারক। শিল্পীর মন নিয়ে নৃত্যশিল্পকে ভাল না বাসলে একাজ কখনও করা যায় না। ভারতীয় নৃত্যশিল্পের প্রচার ও প্রসারে তিনি যখন হাত দিয়েছিলেন, তখন এদেশে জন সমাজে এ বস্তুটি ছিল অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। আর বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের তো কোন স্বীকৃতিই ছিল না। তাঁর পূর্বগামীদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই একক প্রচেষ্টায় ভারতীয় নৃত্যশিল্পকে একটা সাংস্কৃতিকরূপ দেবার প্রয়াস পেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের স্মারক, নৃত্যশিল্পের একজন সমর্থক মাত্র ছিলেন না, তাঁর মধ্যে কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ের মত নৃত্যবিষয়ক সৃষ্টিমূলক প্রতিভাও ছিল। হরেনদার মধ্যে এই শেষোক্ত ক্ষমতা হয়ত ছিল না—তবে তিনি ছিলেন এক জন খাঁটি জহুরী। কোন নৃত্যের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে তা তিনি সহজেই ধরতে পারতেন এবং ভারতের যে কোন প্রান্তে কোন ভাল সম্ভাবনা-পূর্ণ লোক-নৃত্য দেখতে পেলে তিনি তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠতেন। এমনি করে আমরা দেখছি তিনি বহু নতুন নৃত্য প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন এবং সাধারণ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতের বর্তমান বহু খ্যাতিমান ও খ্যাতিমতী নর্তক নর্তকীর সাফল্যের পিছনেই আছে হরেন ঘোষের দান। তাঁরা অবশ্য তাঁদের সহজাত প্রতিভা ও নৃত্যকুশলতার গুণেই যশ ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। তবে সাধারণতঃ নৃত্য সম্বন্ধে উদাসীন জনসমাজের কাছে প্রথম তাঁদের প্রতিভাকে তুলে ধরার কৃতিত্ব দিতে হয় হরেন ঘোষকে।

ভারতে বহু প্রদেশের ও বহু দেশীয় রাজ্যের অপরিচিত লোক-নৃত্য উদ্ধার করে হরেন ঘোষ তাকে বসিয়ে গেছেন শিল্পরসিক সমাজের শ্রদ্ধার আসনে। তা ছাড়া ভারতের নৃত্য জগতে এনে দিয়ে গেছেন এক নবযুগ—নৃত্যশিল্পের এক অভিনব রেণেসাঁস। এ সত্যকে যদি আমরা অস্বীকার করতে চাই, তবে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি অসম্মানই প্রদর্শন করা হবে। তাঁরই উদ্যোগ ও আয়োজনে আমরা প্রায় প্রতি বৎসরই কলকাতা সহরে একটা না একটা নতুন নৃত্যশিল্প দেখার সুযোগ পেতাম। এতে শুধু নৃত্যশিল্প রসিক সম্প্রদায় আনন্দ লাভেরই সুযোগ পেতাম না—এর ফলে স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরাও উৎসাহিত হতেন এবং তাঁরা বিভিন্ন নৃত্যকলার চর্চা ও উন্নতি সাধনে আত্ম-নিয়োগ করার সুযোগ পেতেন।

সাম্প্রদায়িক দুর্দৈবের দিনে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় আমাদের প্রিয় হরেন দা নিহত হয়েছেন। তাঁর মত শান্ত প্রকৃতির সজ্জন অমায়িক লোক [illegible]

নিষ্ঠুরভাবে গুণ্ডাদের হাতে নিহত হতে পাবেন—এ কথা আমার কল্পনাতীত। কিন্তু গুণ্ডাদেব কাছে যে শিল্প বা কলা বিজ্ঞানের কোন মূল্য নেই এই ঘটনাব দ্বারা তাই নতুন করে প্রমাণিত হযেছে। আমি বিস্মিত হয়েছি অন্য একটা জিনিষ দেখে। আমাদেব দেশেব পত্র পত্রিকায় মৃত হবেন ঘোষের স্মৃতি তর্পণের অপ্রচুবতা আমাকে সত্যই মর্মাহত করেছে। তাঁব আকস্মিক শোচনীয মৃত্যুকে আমাদেব শিল্প জগতেব যে একটা বিবাট ক্ষতি হযে গেল—যে ক্ষতি অদুর ভবিষ্যতে আর কেউ সহজে পূবণ কবতে পাববে না—সে বোধ যেন আমাদেব নেই। আমাদেব নৃত্যশিল্পেব ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে তাঁব যে কি অপরিমেয দান জাতি হিসাবে আমাদেব সে বোধ থাকলে জাতীয পত্র পত্রিকায় এমনভাবে তাঁব স্মৃতিকে উপেক্ষা কবা হত কি না -সন্দেহেব বিষয়। এক একজন ইম্প্রেসাবিওব কি মূল্য তা ইউবোপ ও আমেবিকাব লোকেবা জানে। তাই সেখানে নৃত্যশিল্পীব চেয়ে ইম্প্রেসাবিব মূল্য কোন দিক থেকেই কম নয। মঞ্চ পরিচালক পর্দাব আড়ালে থাকলেও নাটকাভিনযে তাঁব অদৃশ্য ভূমিকায় গুরুত্ব কম নয। ইম্প্রেসাবিও সম্বন্ধেও এই কথাটা সমানভাবেই খাটে। কলিকাতাব শিল্প-বসিকদেব পক্ষ থেকে হবেন ঘোষেব স্থাযী স্মৃতিবক্ষাব কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলে আমি মনে কবি।

যাক্, মানুষ হবেন ঘোষেব কথা বলতে গিযে কিছুটা অপ্রাসংগিক উক্তি হযত কবে ফেলছি। আব অপ্রাসংগিকইবা বলি কি কবে? এই সব জিনিস বাদ দিয়ে তো মানুষ হবেন ঘোষকে বিচাব কবা যায না। তাঁব সংগে আমাব ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আজ যতই মনে কবি, ততই মনে হয যে, আমাদেব শিল্প জগতে এরূপ একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি দুর্লভ। ১৯৪১ সালের পর 'নাচঘব' পত্রিকা উঠে যাওযায় হরেনদার অফিসে আব বড বেশী যাওয়া হত না। কিন্তু মাঝে মাঝে যখনই কোন কোন কাজে বা বিনা কারণে সেখানে গেছি তখনই হরেনদাব কাছ থেকে পেয়েছি সেই চিরাচরিত সাদর অভ্যর্থনা ও মধুর [illegible] যে কোন বিষয়ের জন্যে যে কেউ তাঁর সাহায্য-

তাঁকে নিবাশ করতেন না। এই প্রসংগে মনে পড়ে 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার প্রথম যুগেব সংগ্রাম মুখর দুর্দিনেব কথা। সম্পাদক বন্ধুবব কালীশ মুখোপাধ্যায় কি অসীম সাহসে নির্ভর কবে এই পত্রিকাখানি আরম্ভ কবেছিলেন তা জানেন তিনি নিজে এবং আমবা কয়েকজন অন্তবঙ্গ বন্ধু। সেই অবস্থায় একাধিকবাব বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হযে হবেনদার কাছে যেতে হয়েছিল। তিনি একবাবেব জন্যেও আমাদেব হতাশ করেননি বরং পত্রিকা পবিচালনা ব্যাপাবে নানাবকম উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে উজ্জীবিত কবে তুলতেন। আজ তাই তাঁব মৃত্যুতে ব্যক্তিগত আত্মীয বিযোগেব ব্যথা অনুভব কবছি। তিনি নিজে সুকৌশলী প্রচাবক ছিলেন। তাঁব প্রচাব নৈপুণ্য দেখা যেত তখন, যখন তিনি কোন নতুন নৃত্যশিল্পীকে এনে আমাদেব সম্মুখে উপস্থিত কবতেন কিন্তু প্রচাবেব সকল কলা কৌশল তাঁব আযত্তে থাকলেও তাঁকে আত্মপ্রচার কবতে দেখিনি কোনদিনও। আত্মপ্রচাবের অভ্যাস যদি তাঁর থাকত, তবে বাংলা ও ভাবতেব জাতীয পত্র পত্রিকাগুলি তাব স্মৃতি সম্বন্ধে নীবব থেকে এমন উদাসীন্য দেখাতেন না বলেই আমাব বিশ্বাস। আগামী কিছুকালেব মধ্যে আবার আমবা তাঁব মত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নতুন ইম্প্রেসারিওকে হযত পেতে পাবি— কিন্তু মানুষ হবেন ঘোষের শূন্য স্থান কেউ পূবণ কবতে পারবে কিনা তা গভীব সন্দেহেব বিষয়।

হরেন ঘোষ

[স্মৃতি-তর্পণ]

(লেখকের অনিচ্ছা সত্বে নাম প্রকাশ করা হ'লো না)

★

হরেন ঘোষের কৃতিত্ব অতুলনীয় গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে চিরকাল আমাদের জাতীয় কলা-কৃষ্টির ইতিহাসে। কেননা, তিনি এদেশের নৃত্যনাট্যবিকাশে কলামোদীর আনন্দায়োজন প্রযোজনার ক্ষেত্রে এনেছিলেন অভাবনীয় যুগান্তর!

আধুনিক জগতে রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা, এই দুটিই হোলো জনগণের অবসর বিনোদনের প্রথম ও প্রধান ব্যবস্থা। এই দু'টী ক্ষেত্রেই হরেন ঘোষের যথেষ্ট মৌলিক অবদান আছে। ১৯২৬ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি ইউরোপ ও ইংলণ্ড প্রবাসের পর দেশে ফিরে এসে "আর্য্য ফিল্ম্‌স" নামে একটি ছায়াচিত্র-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর সহযোগী যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম আধুনিক ছায়া চিত্রজগতে সুপরিচিত। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বীরেন সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হরেনবাবুর তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি সহজতঃই তাঁকে ছায়াচিত্র শিল্পের প্রসার ও প্রসিদ্ধি সম্পর্কে সচেতন করেছিল। তাই তিনি শুধু ছায়াচিত্রের নির্মাণ-ব্যবস্থার সংস্থাপনেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি। চিত্র-প্রদর্শন যা'তে জনসাধারণের সুবিধা মত হয় সেইজন্য বহু পরিশ্রমে তিনি "চিত্রা" প্রেক্ষাগৃহের জমি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সরকার কর্তৃক "চিত্রা"র প্রতিষ্ঠার সর্বকার্যে প্রচুর সহায়তা করেন। "ছবিঘর"-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন পাল মহাশয়কেও হরেনবাবু অনুরূপ অনেক সাহায্য করেছিলেন। "বুকের বোঝা" আর "অপরাধী" এই দুটি (নির্বাক) ছায়াচিত্র "আর্য-ফিল্ম্‌স্"-এর অবদান। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রথিতযশা চিত্রনির্মাতা শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া হরেনবাবুর এই ছবি দু'টিতে অভিনয় ছায়াচিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ঐ সময় হরেনবাবু "সিনেমা লাইব্রেরী"র আয়োজন ক'রে বিচক্ষণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমেরিকায় ছায়াচিত্র-শিল্পের উন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির যথার্থ পরিচয় হরেনবাবু উপলব্ধি করেছিলেন। সেই থেকেই "সিনেমা লাইব্রেরী"র সূচনা। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ছায়াচিত্র-সম্পর্কে নূতন শিল্পাগ্রহীর সমক্ষে ছায়াচিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে উপযুক্ত অধিকারীর সহজায়ত্ত হওয়ার সাহায্য দেওয়া। "সিনেমা লাইব্রেরী"টি একাধারে সিনেমার অভিনয় কুশলতা, চিত্রগ্রহণের বিচিত্র ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ দক্ষতা ও চিত্রামোদিগণকে ছায়াচিত্রের মারফৎ রস-পরিবেশনে উপযুক্ত প্রযোজনা প্রভৃতি যথাবশ্যক বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের সমবিকাশে সাহায্য করে সমগ্র শিল্পোন্নতির প্রকৃষ্ট বিকাশ সম্ভবপর যাতে হয় তার ব্যবস্থাবিধান। জাতীয় শিল্পগৌরবের সার্থক আয়োজন এই রকমে ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে হরেনবাবুর এই ছিল মহদুদ্দেশ্য।

হরেনবাবুর বিচিত্র কর্মকুশল জীবনে রঙ্গমঞ্চাত্মক আনন্দায়োজনই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। এবং সেই ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু হরেনবাবু সিনেমার প্রয়োজন কোনদিনও ভোলেননি। তাঁর শেষ জীবনেও তিনি অদম্য উৎসাহে কতিপয় বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে "ভারত ফিল্মল্যাণ্ডস্ কর্পোরেশন" নামে একটি ছায়াশিল্প প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার কাজে অনেক সাহায্য করেন। তাঁরই তত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর "সৈনিক" বইখানির ছবি তোলবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। "সৈনিক" এখন অসমাপ্ত।

ছায়াচিত্রে হরেনবাবুর কর্মকুশলতার প্রসংগ আগেই করা হোলো, কারণ এক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয় অনেকেই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে যে, বাংলাদেশে ছায়াচিত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের অন্যতম হরেন ঘোষ। হরেনবাবুর আশ্চর্য সংগঠন-ক্ষমতার যথেষ্ট অবদান আছে ছায়াশিল্পের প্রাথমিক আবির্ভাব ও বিকাশের যুগে।
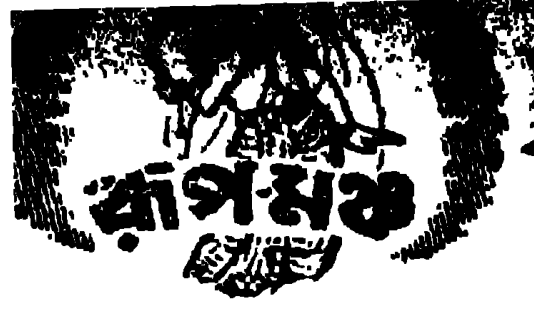
থেকেই দেখা যায়। হেয়ার স্কুলের ছাত্র যখন ছিলেন তখনই তিনি সমপাঠীদের সংগে অভিনয় করেছেন। বৌবাজার ক্লাব এবং ক্যালকাটা য়্যুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ এর নাট্যোৎসাহীদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন হরেনবাবু। তাঁদের অনেকে আজ নেই, অনেকে নাট্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছেন সাংসারিক কর্মব্যস্ততার চাপে। শুধু হরেনবাবুই আজীবন তাঁর নাট্যকলা-প্রীতি সজীব ও সক্রীয় রেখেছিলেন এবং ১৯৩০ থেকে নাট্য ও নৃত্য-কলা-চর্চাই উপজীবিকা ক'রে রঙ্গমঞ্চজগতে নূতন যুগ-প্রবর্তন তিনি করেছেন। রঙ্গমঞ্চজগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি অবদানের তালিকা দেওয়া গেল।—

১৯৩০-৩২—উদয়শঙ্করের আবির্ভাব; উদয়শঙ্করের নৃত্য-চর্চা ও সদলে ভারত ভ্রমণের বিপুল আয়োজন;

১৯৩৩—উদয়শঙ্করের অভিযান.

—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীগঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ের ব্যাপক ভারতভ্রমণ;

১৯৩৪—বালা সরস্বতীর নৃত্য-প্রদর্শন (কলিকাতা);

১৯৩৫—উদয়শঙ্করের সদলে আমেরিকায় অভিযান; শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীগঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিযান;

১৯৩৬— ঐ ঐ ঐ

১৯৩৭— ঐ ঐ ঐ

—শ্রীমতী সাধনা বোসের "হিন্দ ডান্সার্স ও ম্যুজিসিয়ানস্" সহ ভারতাভিযান;

—শ্রীমতী এণাক্ষী রমা রাও-এর নৃত্যাভিযান;

—শ্রীমতী কণকলতা ও "কথাকলি"-গুরু শঙ্করণ নম্বুদ্রীর ভারতাভিযান:

১৯৩৯—"মণিপুরী" নৃত্যশিল্পীর ভারতাভিযান;

১৯৪০— ঐ ঐ ঐ

১৯৪১—সেরাইকেলার "ছউ" নৃত্য প্রদর্শনায়োজন—

[এই দলটি হরেনবাবু ইয়ুরোপ ও ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন]

১৯৪২-৪৪—সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুজ্ঞায় যুদ্ধরত ভারতীয় সৈনিক শিবিরে অবসর-বিনোদক কয়েকটি নৃত্যশিল্পী-সম্প্রদায়ের সংগঠন ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ—

[একটি দল ইরাক, ইরাণেও পাঠানো হয়েছিল]

১৯৪৫—উদয়শঙ্করের কৃতবিদ্য ছাত্রী জোহ্রা ও ছাত্র কামেশ্বর গঠিত "জোহ্রেশ" নৃত্য-সম্প্রদায়ের অভিযান;

—গোপীনাথের দল কর্তৃক "কথাকলি"র আধুনিক নৃত্য-পদ্ধতির প্রদর্শন (কলিকাতা)

১৯৪৬—"ভারত নাট্যম" নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী শান্তার অভিযান।

সংক্ষেপেই হরেনবাবুর বিরাট কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে হোলো। যে কোনো দেশের "ইমপ্রেসারিও"র পক্ষে এই রকম তালিকা গৌরবজনক। কিন্তু এ-দেশে, "ইমপ্রেসারিও"র যুগপ্রবর্তকের পক্ষে, এই কর্মকুশলতা শুধু ব্যক্তিগতভাবে গৌরব-জনক নয়, আশ্চর্যজনক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যে যুবক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের সংসারাবলম্বন ত্যাগ করে নাট্যকলা-চর্চা ও নৃত্যনাট্যশিল্পের তথা জাতীয় নাট্যকলাগৌরবের অবাধ উন্নতির মহাদর্শ ও সুদূর সংকল্প নিয়ে রঙ্গমঞ্চাত্মক আনন্দায়োজন জীবনে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই হরেন ঘোষ চিরকাল কৃতজ্ঞ জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধাকর্ষণ করে আধুনিক কলাকৃষ্টি বিকাশের ইতিহাসে অমর হয়ে রবেন, এ-কথা স্বতঃ স্বীকার্য নয় কি?

হরেন ঘোষের বিরাট কর্মকুশলতার মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমিকতা ও দেশাত্মবোধের ধারা লক্ষ্য না করে থাকা চলে না। আনন্দায়োজনের অবসরে জাতিকে ভারতীয় কলাকৃষ্টির গৌরবসমৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার মহদুদ্দেশ্যে হরেনবাবু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বদেশসেবার অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ আশৈশব তাঁর ছিল বলেই! দুঃখের বিষয় এই উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বমহান্ অবদান—"ন্যাশনাল থিয়েটার"-এর বিরাট কল্পনা—তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বাস্তব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর
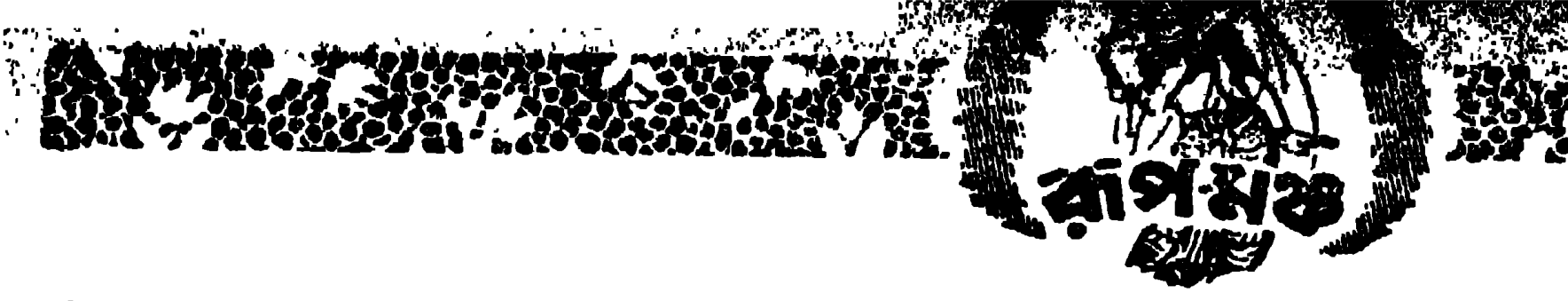
করিয়েও তার গৌরবময় সংযোজনা করে যেতে পারেন নি।

"ন্যাশনাল থিয়েটার" হরেন বাবুর জীবনে শেষ ও সর্বমহান্ প্রচেষ্টা, আগেই বলেছি। এই সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ও আদর্শের পরিচয় অনেকবার তিনি আমাদের বলেছেন। সে কথায় উল্লেখ না করলে তাঁর পুণ্য স্মৃতি-তর্পণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংক্ষেপে তাঁর পরিকল্পনাটি দেওয়া হোলো।

আধুনিক যুগে দেখা যায় যে, নাট্য-চর্চার প্রশস্তির সংগে জাতীয় শিক্ষা ও সমৃদ্ধি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে, সভ্য জগতে এই সত্য এখন সর্বজনস্বীকৃত। এই কারণেই প্রত্যেক দেশই জাতীয় শিল্পের আদর্শ পরিচায়করূপে "ন্যাশনাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেছে। এই "ন্যাশনাল থিয়েটার" স্থাপনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে "বিদেশী" সমস্ত নাট্য-প্রচেষ্টার সংগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের আসল উদ্দেশ্য এই যে, জাতীয় নাট্যকলার পরিপুষ্টি বিধানে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রচেষ্টার প্রদর্শন জাতীয় কলামোদী সমাজের সহজগোচর করে দেওয়া। এবং সেই সংগে বিশ্বকলাকৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিকাশের সমতুল্য জাতীয় শিল্পীদের কলাকুশলতার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া।

পরিকল্পনাটি অত্যন্ত বিরাট, সন্দেহ নাই। এ'কে বাস্তবে পরিণত করতে হলে, প্রথম প্রয়োজন জাতীয় নাট্যশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমূহ উন্নতি। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় নাট্য-প্রচেষ্টার বৈদেশিক গুণগ্রাহকবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা, এবং সেই উদ্দেশ্যে জগত-পর্যটক উপযুক্ত শিল্পী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—যেমন উদয়শঙ্কর গিয়েছিলেন সদলে সুদূর অভিযানে এবং পেয়েছিলেন "ভারতীয় কৃষ্টির রাজদূত" এই গৌরবময় আখ্যা। তৃতীয়তঃ, এদেশে এমন একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহের প্রতিষ্ঠা যেটাকে আমারা সর্বৈবভাবে আধুনিক নাট্যজগতে "জাতীয় নটশালা" আখ্যা দিয়ে গৌরব অনুভব করতে পারি,—এমন একটি সুগঠিত, সুদৃশ্য প্রেক্ষাগৃহ যাতে বিদেশীয় কলারসিক পদার্পণ করে ভারতীয় কলাকৃষ্টি ও নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ও সশ্রদ্ধ হ'তে পারেন। হরেন বাবুর সমস্ত জীবন প্রচেষ্টা পারম্পরিক যুক্তিসূত্রে সংযোগ করে সহজেই লক্ষ্য করা যায়, কত বিশাল ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি, কত গভীর তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও ভারতীয় কৃষ্টিগৌরবে অচলা প্রতিষ্ঠা। যদিও তিনি নিজে একজন নাট্য-বা নৃত্য-শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু নৃত্যনাট্য রসিকবর্গে তাঁর স্থান শীর্ষে এবং রঙ্গমঞ্চাত্মক আনন্দায়োজনের প্রযোজনায় অতুলনীয় তাঁর কৃতীত্ব।

হরেন বাবুর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেই তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের সব কথা বলা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন—আজ তাঁরা নিকটতম প্রিয়জন বিচ্ছেদ কাতর। তাঁর সংগে সামান্য আলাপেই তাঁর প্রতি মনপ্রাণ সহজে আকৃষ্ট হোতো। মননশীলতার অতি গোপন অন্তঃপুরে যেন তাঁর প্রাণের ডাক পৌঁছে অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে সকলকে সংযুক্ত করে দিত তাঁর সংগে। সংসারের বহু বিপরীত প্রতিক্রিয়া, সাময়িক দুর্যোগ বা বিচ্ছেদ সত্বেও সঙ্গলাভ মাত্রই প্রাণ আবার সরস করে তুলতো তাঁর প্রশান্ত সৌহার্দ্য ও আন্তরিক অমায়িকতা। হরেন ঘোষের মানবতার পরিচয় আমাদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের সঞ্চিত স্মৃতি চিরদিন থাকবে। তাঁর মহান্ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি তাঁর জীবন-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি, তাহলেই তাঁর পুণ্যস্মৃতি যথাযথ সম্মানিত হবে।

শিল্পী হরেন ঘোষ

বিমলেন্দু ঘোষ

★

সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে মোটা হরফে একটা লাইন চোখে পড়ল 'প্রযোজক হরেন ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু'। সারা সকাল তিক্ত হয়ে গেল। মানুষ মরে—আত্মীয় স্বজনের কোন চেষ্টাই তার যাত্রার পথ রোধ করতে পারে না। সান্ত্বনার সুরে আমরা বলি 'চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। কিন্তু একি মৃত্যু। এতবড় বীভৎস হত্যাকাণ্ড যে কল্পনায়ও আনা যায় না। গত ষোলই আগষ্ট থেকে যে হত্যাকাণ্ড সুরু হয়েছিল ক্রমেই তার পরিধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলার হাত থেকে আজ শিল্পী, কবি কিংবা দার্শনিকের উদ্ধার নেই। এই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীরা টলষ্টয়ের বাড়ী ধ্বংস করেছে; আজকের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও তেমনি এই দেশের শিল্পীদের আক্রমণ করছে। সেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন শিল্পী হরেন ঘোষ।

হরেনদার মৃত্যুর কয়েকদিন পর তাঁর বাড়ী রওনা হই। যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না—তবু তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যাই। বাড়ীতে পৌঁছেই চোখে পড়ে এক থমথমে ভাব। তাঁর ছেলেদের চোখে করুণ চাহনি। বেশ বোঝা গেল তারা এতবড় শোকের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। হরেনদার ভাই ধীরেনবাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি ধরা গলায় বল্লেন, এত করেও দাদাকে বাঁচাতে পারলুম না। কতবার বারণ করেছি, দাদা তুমি ধর্মতলার অফিসে যেও না। তিনি মুচ্‌কি হেসে বলেছিলেন, এরা আমার ভাইয়ের মত। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁর এই দৃঢ় ধারণা ছিল, আমি শিল্পী সকল দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি তার এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি যেন অফিসে দেখা না করে বাড়ীতে দেখা করেন। অথচ তিনি রোজ অফিস করতেন। কতখানি বিশ্বাস ছিল তাঁর মানুষের উপর। ধীরেনবাবু আবার বলে উঠলেন, "যেদিন দাদা মারা গেলেন, সেদিন সকাল নটা থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাদাকে যেতে দেব না এই ভেবে। দাদা বারোটা পর্যন্ত বাড়ী থেকে বেরোননি। দুবার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন। সবাই বারণ করলো, আজ তুমি যেওনা, আমারও ঠিক খেয়াল নেই তিনি চলে গেলেন।

"তারপর"—

"তারপর আবার কি। আজ পর্যন্ত কোন কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না—লালবাজার। পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীদের কাছে গিয়েছি কোন হোদিসই পাচ্ছি না। সবই রহস্য। মনে হয় কোন গভীর একটা ষড়যন্ত্র পেছনে আছে।"

"গভীর ষড়যন্ত্র?"

কথাটা কানে বাজল। যে হিংস্র ব্যক্তিরা এই ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা তাঁরা জানেনা কী ক্ষতিই না বাংলাদেশের করেছে। যিনি সারাজীবন ধরে বাংলাকে দান করে গেলেন—নৃত্য, চিত্র ও মঞ্চজগতে যিনি নূতন আলোক এনে দিলেন, তিনিও হলেন এদের শিকার। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে। হরেনদার বাড়ী থেকে চলে আসবার সময় তার ভাইয়ের কথাটা আবার মনে পড়ল, দাদা সারাজীবন সবাইকে বিশ্বাস করে এসেছেন। বিশ্বাস করে ঠকেছেন তবু বিশ্বাস করেছেন। তাঁর মৃত্যুও তাঁর বিশ্বাসের ফল। এই কথাই হরেনদার জীবনের মূলমন্ত্র।

ছাত্রাবস্থা থেকেই হরেনদার মধ্যে সংগঠন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কাজ সকলের নাগালের বাইরে তা তিনি অক্লেশে করতেন। Hare School-এ তিনিই প্রথম নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন। 'রণ ভেরী' নামক নাটক অভিনিত হয় এবং এই অভিনয়ের মধ্যেই তার মধ্যে প্রযোজক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। Presidency College-এও তিনি সেক্সপীয়ারের বহু নাট্যাভিনয়ের প্রযোজনা করেন। তাঁর সমসাময়িক বন্ধুগণ আজ পর্যন্ত সেই সব নাটকের অভিনয় উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করেন। এই সময় থেকেই তাঁর শিল্প
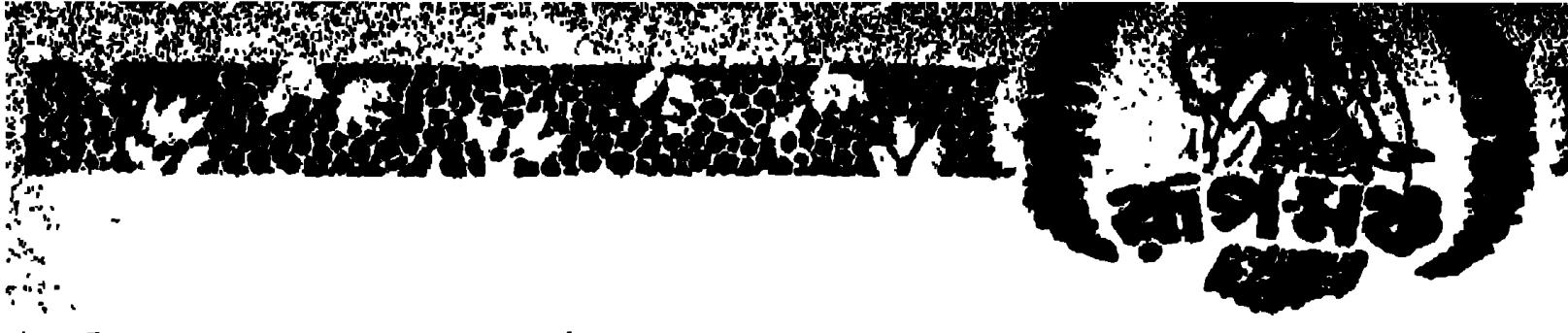
প্রতিভার পরিচয় পাই। পাঠ্যাবস্থায় ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটা মোটর ও পেট্রোলের দোকান দেন কিন্তু এমনই মজা এই ব্যবসায়টা হয়ে উঠ্‌লো শিল্পীদের আসর। তখনকার দিনের সকল শিল্পীর আসর বসতো দোকানে। ১৯২৪ সালে বীরেন মিত্রের লিখিত ইংরেজী নাটক 'শকুন্তলা'র প্রজোষনা করেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এমন কি মহিলারা পর্যন্ত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এম্পায়ার ষ্টেজে এই নাটক অভিহিত হয় এবং এত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, তিনি উহা বিলেতে নিয়ে যাবার মনস্থ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠেনি। ১৯২৯ সালে চিত্র ব্যবসার দিকে তাঁর নজর পড়ে। আর্যফিল্মস্‌ নামে একটী কোম্পানী গঠন করেন এবং তাঁরই কাহিনী 'বুকের বোঝা' চিত্রগ্রহণ করা হয়। তখন এদেশে ষ্টুডিও বলে কিছু ছিল না। বৈঠকখানা ঘরেই ছবি তোলা হত। বিদেশ থেকে লাইট সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি নিয়ে আসতে হত। পরীক্ষামূলক চিত্র হিসাবে তিনি ছবির প্রজোষনা সুরু করেন। এদের প্রথম ছবি হল "অপরাধী" পরিচালনা করেন দেবকী বোস। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া নায়কের ভূমিকায় যশ অর্জন করেন। বর্তমান নিউথিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন সরকার এদের মধ্যে ছিলেন। ১৯৩০ সালে তাঁর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। একদিন এক নবীন নৃত্যশিল্পী তাঁর কাছে এসে বলেন, আমি কল্‌কাতা এসেছি, পরিচয় বিশেষ কিছু নেই কাউকে চিনিও না। আমার কোন অর্কেষ্ট্রা নেই। শুধু নাচতে পারি, আপনি যাতে একটা শো হয় তার ব্যবস্থা করুন। হরেনদা এর চোখের ভিতর শিল্পীর পরিচয় পেলেন। তখনই এর নাচের ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শিল্পীর ছবি দিয়ে সারা কলকাতায় পোষ্টার দেওয়া হলো—পুরুষেরা নাচ্‌বে এই ধারণা করে যারা প্রথমে কটুক্তি করতেন তারাই তাঁর নৃত্য দেখে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। এই নবীন শিল্পীই হলেন উদয়শঙ্কর। শুধু পুরুষের নৃত্যের ব্যবস্থা করেই নয়, কনকলতার মত নৃত্যশিল্পীকেও তিনি আবিষ্কার করেন এবং নৃত্য জগতে তিনি এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন। ১২৩৪।৩৫ সালে Four arts নামে এক পত্রিকার সংকলন প্রকাশ করেন। এই উচ্চাঙ্গের সংকলন তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল।

মাত্র দুতিনটী সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। আজও পর্যন্ত সেই সব সংকলন চিত্রের বৈশিষ্ট্যতায়—ছাপার কারুকার্যে অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে আছে। এরপর তিনি সেরাই-কেলার নৃত্য, মণিপুরীর নৃত্য, কথাকলি নৃত্য প্রভৃতি প্রভুত ধরণের নৃত্যের প্রজোষনা করেন। তাঁর জীবনের শেষ স্মরণীয় ঘটনা দিল্লীতে আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সকলকে অভিভূত করে। এবং পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং তাঁকে অভিনন্দন জানান। হরেনদার এক ন্যাশনাল থিয়েটারের পরি-কল্পনা ছিল। তিনি পণ্ডিত নেহেরুকে তাঁর পরিকল্পনা বিষদভাবে বুঝিয়ে দেন। এই পরিকল্পনা পণ্ডিত নেহেরুকে বিস্ময়াভূত করে। তিনি এক কথায় বলেছিলেন, "আমি তোমার সাথে আছি, তবে পনেরই আগষ্টের পরে।"

যে স্বপ্ন তাঁকে কৈশোর থেকে মুগ্ধ করেছিল সেই স্বপ্নের দিন আজ আগত। তিনি জানতেন পরাধীন দেশে শিল্পের আদর নেই—স্বাধীন দেশেই তার বিকাশ। তিনি স্বপ্ন দেখতেন পনেরই আগষ্ট আসছে। স্বাধীনতার পতকা উত্তোলনের সাথে সাথে তাঁর জাতীয় থিয়েটারের পরিকল্পনা কার্যকরি হয়ে উঠ্‌বে। সেই পরিকল্পনা মস্কো আর্ট থিয়ে-টারের চেয়ে কোন অংশে নগন্য নয়। দিল্লী থেকে ফিরে তিনি সবাইকে একই কথা বলেছেন যে, পনেরই আগষ্টের পর শিল্প জগতে এই নূতন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবেন। সেই পনেরই আগষ্ট এসে গেছে।

●

লীলাময়ী পিকচার্সের সর্ব প্রথম বাংলা বাণী চিত্র 'দেবদূত'-এ নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়

—— শ্রীমতী ছন্দা ——

ইষ্টার্ণ ফিল্ম একস্‌চেঞ্জ প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রী দেবতা চিত্রে দেখা যাবে। চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

(উপন্যাস)

৮

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

●

কার্তিক সংক্রান্তির 'সঙ' দেখিয়ে হলধরেরা যখন বাড়ী ফিরলো তখন ভোর হ'তে আর বেশী বাকী নেই। হলধরের ভাগ্নেটা তার ছোট ছেলে বাঁশীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। কার্তিকের শেষ রাত। একটু একটু ঠাণ্ডাও পড়েছে। কুয়াসাও দেখা দিয়েছে। বাঁশী ওর কোলে ঘুমিয়ে-পড়া শ্যামের গা'টা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। অনেকক্ষণ ধরে ও কাঁধে কাঁধে রয়েছে—কাঁধটাও ব্যথা করছে। তাছাড়া ওর নিজেরও একটু শীত শীত করছে—চোখও জড়িয়ে আসছে ঘুমে। ছাপরার কাছে যেয়ে ঘুম ও বিরক্তি জড়িত কণ্ঠে ও ডেকে উঠলো, "ওদিদি দিদিরে! উট—দরোজা খুইল্যা দি।" হলধরদের একটু আগেই ও পা চালিয়ে হেঁটে এসেছে। ভেবেছিল ওরা বাড়ীতে পৌছবার পূর্বেই ও শ্যামকে দিদির কাছে ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এতে কিছুটা বাহাদুরী আছে বৈ কী? কিন্তু হলধরেরাও বাড়ীর উঠোনে পৌছে গেছে ততক্ষণ—। রাই ওঠেওনি, দরজাও খোলেনি। ওর সমস্ত বাহাদুরীটা নষ্ট হ'য়ে গেল। রাইর ওপর রেগে যায়। এবার আর দিদি বলে হাঁক দেয় না। ও ডেকে ওঠে, "ও রাই, খাসীটা—উঠফার না পারছি! ঘুম্যা—ঘুমাইয়া মর।"

জেলেবৌ এ ঘরে একটু আগেই জেগেছে। হলধরেরাও এসে পড়েছে। জেলেবৌ দরজা খুলতে খুলতে বাঁশীকে ডেকে বলে, "এই ঘরে নিয়া আইলো। ওয়া হইছেই [illegible] এহানেই হইয়া পড়ো।" কথাটা শুধু বাঁশীকেই নয়—বাদলকেও লক্ষ্য করে বলে। বৌ-টাও রাত করে শুয়েছে। তাকেও আবার উঠতে হবে। ব্যাটার বৌ—জেলেবৌর কী কম আদরের! বাদলের বৌ—তা বোঝে না—বাদলও না। না বুঝুক। তাতে জেলেবৌর কিছু যায় আসে না। কেউ গামছা বিছিয়ে, কেউ মাদুর টেনে যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে। ওদের সকলেরই চোখ ভরা ঘুম। শোবার সংগে সংগেই পদ্মলাভ করতে কারো দেরী হয় না। জেলেবৌ বাকী রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দেয়। কার্তিক খোলায় আনুষ্ঠানিক পূজা সারতে পুরোহিত এলেন বলে। কাক ডাকার সংগে সংগে জেলেবৌ উঠে পড়ে। ছড়া দিয়ে খোলাটা লেপে বেরোতেই পুরোহিত এসে যান। জেলে-বৌ কাপড় ছেড়ে পুজোর যোগাড় করে দেয়। আয়োজনে যতটুকু দেরী—পূজা সারতে আর পুরোহিতের বেশী সময় লাগে না। সময় নিয়ে পূজা করলে পুরোহিতের চলে না। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর অন্ততঃ তিরিশ বাড়ীর পুজো সেরে নিতে হবে। পুরোহিত পুজো সেরে চলে যান। জেলেবৌ বাড়ীর কাজগুলো এক এক করে সেরে ফেলে।

বেশ খানিকটা রোদ উঠে গেছে। রাই বা বাদলের বৌ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। জেলেবৌ হাঁক দেয়, "ও বৌ-বৌ—ও রাই—আরে তোরা উঠ, বেইল অইছে।" রাই কোন সাড়া দেয় না। বাদলের বৌ ঘুমের মাদকতায় তখনও বিভোর। রাইর দরজার সামনে যেয়ে দাঁড়ায়। জড়িত কণ্ঠে ডাকে, "ও টা-হু-র-ঝি টা-হু-র-ঝি! ননদাই—আরে ওটো। ন্যান ম্যালো, বেইল অইছে।" কিন্তু রাই ওঠেও না—সাড়াও দেয় না। বাদলের বৌ'র ঘুমের নেশা কেটে গেছে কতকটা এবার। ডাকের সংগে সংগে দরজায় ঘা মারে। দরজাটায় হাত লাগার সংগে সংগেই খুলে যায়। বাদলের বৌ—অবাক হ'য়ে যায়। "ওমা! উইট্যা গ্যাছিতো!" ভিতরে যেয়ে বিছানাটার অবস্থা দেখে বিরক্তি ভরে—"বিছনাটারে ক্যামন ধারা রাইকা গ্যাছে!
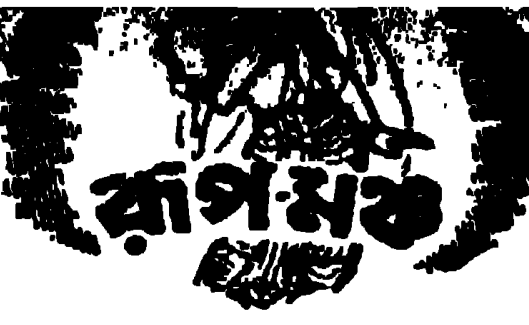
সব উলটি পালটি। রাইতি যুদ্ধ করছি।" ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শাশুড়ীকে বলে, "ননদাইত উইঠ্যা গেছি।" জেলেবৌ বিস্মিত হয়। রাগও হয় খানিকটা মেয়ের ওপর। বলে, "কখন উইট্যা গ্যালো! প্যাগলাম মা ত! উইঠলো বেইল তিন দণ্ডির হমর—এরি মধ্যি পাড়া না বেড়ালি অইছিল না!" এ অসইলে-পনা জেলেবৌ পছন্দ করে না। হাঁক ছাড়ে, "ও রাই—রাই—বাড়ী আইলি!" অনেকদিন ধরে জেলেবৌর এরকম চীৎকার সুনন্দা শোনেনি। সে কার্তিকের খোলার কাজে ব্যস্ত ছিল—পুণ্যঠাকুর পূজা করতে এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি লেখাকে ডেকে বলে, "যা বলে আয়ত তোর পিসীর মাকে, পিসী আসেনি এদিকে।" লেখা বলে আসে। জেলেবৌ বাড়ীর এধার ওধার খুঁজতে থাকে। কোথাও রাইকে পায় না। আশ্চর্য হ'য়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে না! রাইর পাত্তাই নেই। চিন্তিত হ'য়ে পড়ে জেলেবৌ। স্বামীকে ডেকে তোলে, "আরে শুনছো নি—উঠোতো—রাইড্যা আবার কিধার গ্যালো!" হলধর তন্দ্রাজড়িত বিরক্তির স্বরে বলে ওঠে, "যাবি আবার কোনধাবে? আছি কোথায়। যত সব মাগা থারাপি। ঘুমাতি দাও।" জেলেবৌ আশ্বস্ত হয় না। বলে, "না কুথাও খুঁজি পাইতিছি না। আরে উঠো, আমার ডর নাগছে।" এবার আর হলধর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। উঠে এধার ওধার রাইকে খোঁজে। রায়বাড়ী অবধি এসেও দেখে যায়। না—কোথাও রাই নেই। সেও ভেবে পড়ে। গেল কোথায়! জেলেবৌ আর ঠিক থাকতে পারে না। মায়ের মন সন্তানের অমংগল আশঙ্কায় ডুকরে কেঁদে ওঠে। হলধর তাকে এক দাবড়ি দিয়ে বলে, "নে থাম! পোলাপানির নাগাল কাঁদিস না।" হলধর বিল পাড়ে আসে। বাদলের বৌ ততক্ষণ বাদল ও তার ভাইদের ডেকে তুলেছে। হলধর বিলের পাড়ে এসে দেখে তাদের ছোট ডিংগিটা নেই। ডিংগিটা বড় নৌকাটার সংগে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আরো দেখে নৌকোর কাছটায় ভিজে মাটিতে বড় বড় কয়েক জোড়া সদ্য পায়ের দাগ। হলধর বিচলিত হ'য়ে পড়ে। রাইর শোবার ঘর থেকে সমস্ত বাড়ীটা পরখ করে দেখে। ছাপরার পেছনে বাদল কয়েক জোড়া পায়ের দাগের প্রতি হলধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হলধর আর দেরী না করে ছেলেদের নিয়ে বড় নৌকোটায় বেরিয়ে পড়ে ঝালডাংগার বিলের উদ্দেশ্যে। ওর বুকটা দুর দুর করে কাঁপতে থাকে। ওরা অনেক দূর এগিয়ে যায় বিল বেয়ে। উত্তর দিকে পরিষ্কার জল থৈ থৈ করছে—ওরা তাকিয়ে দেখে নৌকোটা দেখা যায় কিনা—। তারপর দক্ষিণ দিকে ছোটে। দূর থেকে দেখতে পায় কে যেন একজন ওদের দিকেই আসছে নৌকো বেয়ে। পেছনে ওদেরই ডিংগির মত একখানা নৌকোকে টেনে আনছে। কাছে আসতেই দেখে ওদের পড়শী ছদনের ছেলে জব্বর। জব্বর ওদের দেখে থেমে জিজ্ঞাসা করে, "চাচা গ্যাহোত তোমাগো নাও কিনা। আমি বিয়ান বেলা উইঠ্যাই বাথানে ঘাস কাটতে গ্যাছলাম। কচুরীতে দেহি ডিংগিট্যা আইটক্যা আছি। তোমাগো ডিংগির নাগাল মনে অইল। তাই নিয়া আইলাম।"

হলধর উত্তর দেয়, "হ্যাঁ বাজান, আমাগো ডিংগি। বড় ভাল কাজ করছো বাবা!"

জব্বর বলে, "কাইল তালা দ্যাও নাই?"

হলধর উত্তর দেয়, "নারে, এইট্যার সাথি কাছি দিয়া বাইনধ্যা রাকছিলো।" হলধরের মেঝ ছেলেটা ডিংগিটায় যেয়ে ওঠে। বাঁশী একটা চইড় দেয় হাতে। হলধর জিজ্ঞাসা করে, "নাওটারে পাইল্যা কোথায় বাজান!

জব্বর কোন বিপদের কথা আশঙ্কা করেই জিজ্ঞাসা করে, "ক্যান চাচা, কিছু অইছে লাহি।"

হলধর উত্তর দেয়, "তোমার রাই বইনরে পাবার নাগছি না।"

জব্বর যেন আকাশ থেকে পড়ে। ও বয়সে রাইর চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। রাইকে 'বইন' বলে ডাকে। বোন বলতে পশ্চিম বঙ্গের দিকে সাধারণতঃ ছোট বোনদেরই বোঝায়। পূর্ব বঙ্গে কিন্তু এর ব্যাতিক্রম আছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামীরা বোন বলতে ছোট বড় দুইকেই বোঝায়। জব্বর রাইর বড় অনুরক্ত। এইত সেদিনও ওর 'বাজান' ভাংগার হাট থেকে ওকে একগজ কাপড় কিনে এনে দিলে রাই তাই দিয়ে ওর গায়ের মাপে কেমন সুন্দর দু'টো ফতুয়া বানিয়ে দিয়েছে। মেজবানী খেতে যেতে হ'লে ওই ফতুয়া গায় দিয়েই যায়। দর্জিকে দিয়ে করাতে হ'লে অন্ততঃ বারো গণ্ডা পয়সা লেগে যেত। শুধু জব্বরই নয়—ওদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে ও বউরাও রাইর কাছ থেকে জামা সেলাই করে নিয়ে যায়। কোন পয়সা লাগে না। ওরা ভালবেসে কোন কোন সময় কেউ এক সের পাটালি গুড়—কেউ এক হাঁড়ি দুধ—কেউ গাছের এক ফানা কলা—কেউ বা একগোছা লাউ শাকই জোর করে দিয়ে যায়। আজ সেই রাই দিদিকে পাওয়া যাচ্ছে না—জব্বরের মাথাটা যেন বেতাল হ'য়ে যায়। ওই যেখান থেকে পারে খুঁজে এনে দেবে ওর রাই দিদিকে—এমনি ভাবে বলে, "চলো চাচা"—মুহূর্তে নৌকোটা ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চইড় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিছুদূর এগিয়ে নৌকোটা থামিয়ে বলে, "এখ্যানে পাইছিলাম।" ঐ স্থানটার আশপাশ দিয়ে ওরা চইড়ের ঘা দিয়ে পরখ করে দেখে কিছু ঠেকে কিনা। জব্বরের চইড়ে কী যেন বাধে। সে চইড়টা গেড়ে পরণের গামছাটা এটে জলে নেমে পড়ে। সংগে সংগে বাদলও। কতক্ষণ ডুবা-ডুবির পর ওরা উঠে এসে বলে, "না, গ্যাটডা গাছের

হ'য়ে ওঠে। হলধর ঐ ঘোলা জলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—হ্যাঁ রাক্ষুসী ঝালডাঙ্গা ওর মেয়ের জীবনে কলঙ্কের মসী লেপে দিয়েছে—সেও জেলের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। এমনি ভাবে ঝালডাঙ্গার উত্তাল জীবনের স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেবে। ওরা বাড়ী ফিরে আসে কিছুক্ষণ বাদে। আসবার সময় ওদের চোখ চারিদিক অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে বেড়ায়। ওরা যখন বাড়ীতে ফিরলো। উঠোনে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। খবরটা এবাড়ী থেকে ওবাড়ী—ওবাড়ী থেকে সেবাড়ী ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ এসেছে সহানুভূতির মন নিয়ে—কেউ এসেছে অনেকদিন বাদে রসালো একটা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে। বাইরে থেকে সোজা ভাবে তাকালে এদের সকলের দৃষ্টিই এক মনে হবে—একটু বক্র দৃষ্টি হানলে এদের অনেকের মনের বক্রভাব-গতির সন্ধান পেতেও বড় বেশী বেগ পেতে হবে না। সুনন্দাও রাংগা জেঠাই-মাকে সংগে নিয়ে এসেছে। ভিড় থেকে দূরে ঘরের আড়ালে ঘোমটা টেনে সে দাঁড়িয়ে আছে। শিবশঙ্কর বিলের ঘাটে দাঁড়িয়ে হলধরদের লক্ষ্য করছিলেন—ওরা আসতে তিনিও উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। ভিড় থেকে কেউ একবার ছাপরার চার পাশটা ঘুরে আসছে—কেউ বিলের ঘাটে যাচ্ছে—কেউ যাচ্ছে গাবতলা, কেউবা বাঁশের ঝাড়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে। কেউ খোঁজ নিচ্ছে, ঝগড়া ঝাটি কিছু হ'য়েছিল কিনা। জেলেবৌ কান্নার সংগে সংগে মাথা নেড়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, "ওগো নাগো না।" আর 'রাই রাই' বলে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে। কাঁদতে কাঁদতে ওর গলা বসে গেছে—স্বর বেরোচ্ছে না। কিছুক্ষণ থেমে থেমে "আহা—উহু" করে উঠছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন হলধরের অসাবধানতার কথা উল্লেখ করে বলে উঠলো, "বয়স্থা মাইয়াডারে একলা ঘরে রাখতাই বা কোন আক্কেলে?"

সুনন্দার গা জ্বলে যায় এ কথা শুনে। শিবশঙ্কর
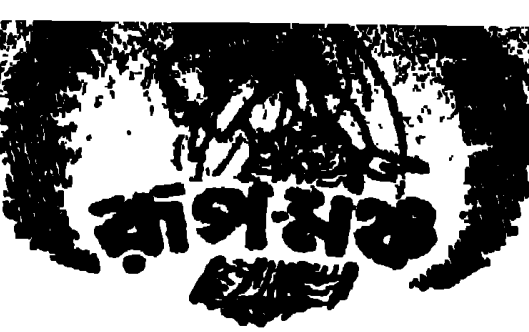
পিলেদের হটিয়ে দিয়ে বড়দেরও বলেন, "আপনারা যার যার বাড়ী যান না! এখানে থেকে আর কী করবেন।" কে যেন ভাঙ্গা যেয়ে থানায় ডায়রী করতে পরামর্শ দিল। তিনি সন্ত কলকাতা ফেরতা। শিবশঙ্কর তার উত্তরে বলে উঠলেন,—"হ্যাঁ তাতে হবে মাথা আর মুণ্ডু। অযথা হাঙ্গামা বাড়বে। যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে!"

মেজকর্ত্তাও এসেছেন। মোহন একটু করিত-কর্ম্মা হবার সুযোগ গ্রহণের ফাঁক খুঁজছে। বেশীর ভাগেরই বদ্ধমূল ধারণা হ'লো, জলে ডুবেই আত্মহত্যা করেছে। এমন আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে কেউ কোন মন্তব্য করতে পারলো না। কারণ, বিষয়টা অতি জটিল। তবে বর্ষীয়সী মেয়েদের অনেকে বাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, "আবাগী ক্যান যে একাজ করতে গ্যালো। বুদ্ধিবতী মাইয়া—আব অসুবিধাটাই বা কী অইছিল।"

মেজকর্ত্তা এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন—তার উপস্থিতিতে অনেকে যে ব্যাঙ্গের দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিলেন তা তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। কিছু না বলে চলে না। খুবই অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "যদি বিলেই ডুবে থাকে—বিকেলে বাইচের সময় লাস ভেসে উঠতেও পারে।" বাদলকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "বিকেলে তোরা নয় কয়েকজন একটা নৌকোয় করে ঘুরে দেখিস।" কথাটা অনেকেরই মনে ধরলো। শিবশঙ্করও সায় দিয়ে বল্লেন, "সেটা অবশ্য ঠিক। শেষ রাত্রে যদি ডুবে থাকে তাহলেও প্রাণের আশা নেই। লাসটা পাওয়া নিয়েই কথা—তখনই দেখা যাবে।" মোহনকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "তখন আর গেয়ে বেরিও না। চুপ চাপ থেকো।" মোহন ঘাড় নেড়ে মৌনসম্মতি জানায়।

সুনন্দা বাদলের বৌকে ডেকে কী যেন বলে চলে যায়। অন্যান্য দর্শকেরাও আস্তে আস্তে পাতলা হ'তে থাকে। শিবশঙ্কর একটু দূরে হলধরকে ডেকে নিয়ে কি যেন বলতেই ছোট্ট ছেলেটীর মত সে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। এতক্ষণ বাইরে থেকে হলধরের কিছু না বুঝতে পারলেও ওর ভিতরটা যে পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছিল সুনন্দাও যেমন বুঝেছিল, শিবশঙ্করও। শিবশঙ্করের সান্ত্বনা বাক্যে হলধরের চাপা বেদনা যেন একসংগে উপচে ওঠে। হলধর কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কাইল মুহাটা পইর‍্যা যাওয়োনেই আমার বুকটা ছ্যাক কইরা উঠলো। তহনও যদি বাড়ী ফিরতাম। এ্যাদ্দিন মার মুহা নেই কোন কিছু অয়না। মা সতক কইরা দেওনেও আমি বুইঝলাম না। আপনার বাক্যিও হুনলাম না।" শিবশঙ্কর হলধরের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন,"আর কেঁদে কী করবে। ভগবানকে ডাকো ওর আত্মার সদ্গতি যাতে হয়।" হলধর চোখ মুছতে মুছতে বলে, "বউমার কী বাধ্যিটাই না ছিলো। আমাগো ঘরে শাপ পাইয়া জন্মাইছিলো। শাপ ফুরাইয়া যাওনে চইল্যা গ্যালো।"

শিবশঙ্করও বিচলিত হয়ে পড়েন। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে টেনে টেনে বলেন "আমার যেন কেমন সন্দেহ হয় হলধর। এর ভিতরও তোমাদের মেজকর্ত্তার কোন···।" শিবশঙ্করকে কথা শেষ করতে না দিয়েই হলধর বল ওঠে, "ওই কালের দিষ্টিতেই মা আমাগো ছাইড়্যা গ্যালো। ওনি যেদিন থ্যা আসর বসাইছেন, স্যেদিন থ্যাই মার আর মুখে হাসি দেহি নাই। ওনার কুদিষ্টিই যত নষ্টের মূল। ঠাহুরের নামে এ্যামন ধারা করবেন তাত বুঝি নাই। আমার বুদ্ধির দোষে এমন সর্ব্বনাস অইল। ও ঠাহুর ঘর আমি পোড়াইয়া ফ্যালবো।" শিবশঙ্কর বাঁধা দিয়ে বলেন, "না—অমন কাজটী করো না। এখন মাথা খারাপের সময় নয়। দেখবে আসর আর এমনিই বসবে না। চুপ করে থাকো যা করবার আমিই করবো।" শিবশঙ্কর যখন চলে আসেন হলধরের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। ততক্ষণ যে যার বাড়ীতে যেয়ে যেণ

গন্ধ গায় লাগছে যে—একন দ্যাখ কেমন মজা!" কেউ বলছে, "আরে বাবা, মেয়েটাও বড় খারাপ ছিল। আইল্যার মাইয়ার সাজগোছের ঘটা গ্যাখো নাই- নষ্টামি ফষ্টামি একটু করতোইতো! হয়ত বাপ ভাইর সাথে মতান্তর অইছে। হলধর চাপা মানুষ বাইরে কিছু কয়না।" কেউ আবার একটু বেশী নিশ্চিতভাবে বলছে, "আরে তাও জাননা, মাইজা কত্তার সাথে লটর ঘটর ছিল। হয়ত কিছু বাইধ্যা গেছিলো। লাস ভাইস্যা ওঠলেই দ্যাখবার পারবা পেটের ভিতরও আর একটা ছিল।"

সুনন্দা আকাশ পাতাল ভেবেও কোন কূলকিনারা পায় না। মেয়েটা শেষকালে এই কেলেঙ্কারী করতে গেল কেন? তবে কী লোকে যা বলে তাই ঠিক! মনটা বড় খারাপ হ'য়ে যায় সুনন্দার। নারী হ'য়ে একটী নারীর জীবন এমনিভাবে চোখের সামনে নষ্ট হ'য়ে গেল অথচ সে কিছুই করতে পারলো না। সংগে সংগে নিজেকেই নিজে প্রবোধ দেয়—কীইবা করবার আছে তার। কত অসহায় নারীই না বাংলার ঘরে ঘরে এমনি বিড়ম্বনার সংগে জড়িত! সে বিড়ম্বনা থেকে তাদের বাঁচবার কোন উপায় নেই; বাঁচাতেও কেউ এগিয়ে আসে না। সমাজ নিশ্চল পাষাণের মত দূরে দাঁড়িয়ে ক্রূঢ় হাসি হাসে। সমাজই তার পাকচক্রে জড়িয়ে এদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে! সুনন্দাত সামান্য মেয়ে মানুষ। গৃহকোণের ঘোমটা দেওয়া বধূ। তার কীইবা করবার আছে। তবু তার অনুভূতির নাড়ীটা টনটনিয়ে ওঠে। একা রাইর অভিশপ্ত জীবনের হাহাকার শত সহস্র নিপীড়িতা অসহায় নারীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে এক সংগে তার কাছে আবেদন জানিয়ে বলে—'ওগো—চুপ করে থেকনা—ঘোমটা তোলো—এগিয়ে আস—। নারী হ'য়ে নারীর বেদনার ভার যদি মুছে না দিতে পার—কোনদিনই নারীর এই লাঞ্ছনা এই অভিশাপ দূর হবে না।'—সুনন্দা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। শত শত অসহায় নারীর আকুল আর্তনাদ এক সংগে ওর নারী হৃদয়ে যেয়ে আঘাত হানে। হ্যাঁ—সে এগিয়ে যাবে—এগিয়ে যাবে। তার শক্তি ও সামর্থ নিয়ে নারীর [illegible]

সুনন্দা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম' পদ্ধতির কথা এঁকে নেয়। তার নিশ্চিত ধারণা আছে—এ পরিকল্পনায় তার স্বামীর সম্মতি ও সাহায্য সে পাবেই। রাজাজ্যেঠাইমা দল বাঁধা দেবেন—কুৎসা রটনা করবেন? তা তারা করুক এদের ভয়ে ঘোমটা দিয়ে বসে থেকে আরো কত মেয়ের জীবন সে নষ্ট হ'তে দিতে পারে না। সে এর একটা বিহিত করবেই।—হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবে।

হলধর আর জেলেবৌর ওদিন মুখে আর ভাত উঠলো না হলধর ঘরে যেয়ে শুয়ে রইলো। জেলেবৌ গালে হাত দিয়ে বিলপাড়ে যেয়ে ঝালাডাঙ্গার বিলের দিকে তাকিয়ে বাঁশ ঝাড়ের কাছে বসে রইল। সুনন্দা এক ফাঁকে আবার এসে ঘুরে গেছে। বাদলের বৌকে সংসারের কাজ গুছিয়ে সেরে নিতে উপদেশ দিয়ে গেছে। বাদলের বৌ'র মুখে কোন কথা নেই। বাদল মনে মনে নিজেকেই বার বার ধিক্কার দিচ্ছে। এতখানি যে গড়াবে সে ভাবতেও পারেনি তারও খানিকটা দোষ রয়েচে বৈকী! সে যদি মেজকত্তার সংগে যোগ না দিত বুনটা আত্মঘাতী হতো না নিশ্চয়ই ভেবে আর কী হবে। যা হবার হ'য়ে গেছে। আর সে যাবে না মেজকত্তার দলে। রোজগার করে যা আনবে তাই দিয়ে নয় একবেলা খেয়ে থাকবে—নয় উপোসই করবে, সেও ভাল। ওর বাবা একাই এমনিভাবে এতবড় সংসার চালিয়ে এনেছে এতদিন। ওরা কভাই মিলেও কী তাকে চালাতে পারবে না? বাদল আর বসে থাকে না। রাইর জন্য সত্যই তার মনটা কেঁদে ওঠে। বুড়োবুড়ির মুখের দিকেও যেন তাকাতে পারে না। একটা ঝাকায় করে কার্তিকগুলো ও পূজোর ফুল বেলপাতা বাদল জলে দিয়ে এসে রীত রক্ষা করে।

জেলেবৌ কারোর ডাকাডাকিতেই বিলপাড় থেকে উঠলো না। ঝালডাঙ্গা রাক্ষসী ওর মেয়েকে গ্রাস করেছে। তার বিরুদ্ধে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা গঙ্গার কাছে বারবার নালিস করছে। মায়ের উদ্দেশ্যে আকুল মিনতি জানিয়ে বলছে—'দাও মা, আমার মেয়েকে আমার কোলে ফিরিয়ে দাও। তোমায় সোনার মুকুট গড়িয়ে দেবো। তোমার মকরের জন্য রূপোর ঝাঁকো

খানিয়ে দেবো। ষোড়শোপচারে পূজা দেবো মা।' ভিটেবাড়ী বিক্রী করেও মা গঙ্গার মুকুটের দাম কোন দিন জেলেবৌ যোগাড় করতে পারবে না। জেলেবৌ না বুঝলেও মা গঙ্গা হয়ত বোঝেন। মা গঙ্গা জানেন, ওরা মানতের সময় সামর্থের কথা ভুলে যায়। ওরা ভুলে যায়, সোনার মুকুট না হ'লে যে দেব-দেবতা কারো ব্যথায় ব্যথিত হয় না—সে দেবতা ওদের নয়। ওদের সামর্থের কথা দেবদেবতারা জানে বলেই'ত কোন দিন ওদের ব্যথা তাদের প্রাণে বাজে না। রোগ ব্যাধিতে এক ফোঁটা ওষুধও দিতে পারে না—ওরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকে দেবদেবতার ওপর। ওরা প্রাণ-ভরে ডাকে দেবদেবতাকে—ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও—স্বামীর প্রাণ রক্ষা করো—মেয়েকে ভাল করে দাও। কিন্তু ওদের ডাক কোনদিন দেবদেবতার কানে পৌঁছোয় না। ধীরে ধীরে তিল তিল করে চোখের সামনে রোগে-শোকে, অনাহারে ওদের কত প্রিয়জনদের জীবন দীপ নির্বাপিত হ'য়ে আসে। ধনীর দেবতা অলক্ষ্যে থেকে ব্যংগের হাসি হাসেন। ওরা চোখের জল দিয়ে ওদের প্রিয়জনদের বিদায় গীতি গায়। জেলেবৌ জানে না—বোঝে না তাই আজও তার মেয়েকে ফিরিয়ে দেবার জন্য মা গঙ্গার কাছে আকুল মিনতি জানায়।

প্রতি বছর ঝালডাঙ্গার বিলে নৌকো বাইচ হয়। এবারও দুপুরবেলা থেকেই একখানা দু'খানা করে প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকো জড়ো হ'য়েছে। বাইচের নৌকো বলতে যা বোঝায় এগুলির ভিতর তার একখানাও নেই। যার যার ঘাটের নৌকোই বেশভূষা করে বাইচ খেলতে জড়ো করা হ'য়েছে। মোহন মেজকত্তার নৌকোটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে। নাসিরুদ্দিন সময় মত পৌঁছে গেছে। বাইচের সময় মেজকত্তার নৌকোর মাঝে দাঁড়িয়ে ঢাল-সড়কি নিয়ে 'হইয়ো হো' শব্দে যেমনি বাহকদের উৎসাহিত করে তেমনি কেরামতি দেখিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। মেজকত্তা কাছারী ঘরে দাঁড়িয়ে কাপড়টা তরিজুত করে পরে নিচ্ছিলেন—আর আকার ইংগিতে নাসিরুদ্দিনের সংগে কথা বলছিলেন। কোঁচাটা আঁটতে আঁটতে মেজকত্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "সব ঠিক আছে'ত।" নাসিরুদ্দিন গর্বের সংগে উত্তর দেয়, "তয় বেঠিক অবার জো আছে নি! রাইতি যাবেন'ত! দেখতি পাবেন।"

মেজকত্তা বলেন, "না তাই বলছি! সাবধান।"

নাসিরুদ্দিন জবাব দেয়, "আমার কাজ্জি দিফাঁস অবার জোগার আছি নি।" একটু থেমে সোজাসুজি ভাবেই নাসিরুদ্দিন বলে, "খেয়াল কইর‍্যা কয়ড্যা টাহা লেবেন সাথি—নাগবো নি।"

মোহন এসে কখন বাইরে দাঁড়িয়েছে—সে হাঁক দেয়, "আইসেন হগ্গল নাও আইস্যা গ্যাছে।" মেজকত্তা কাপড় পরতে পরতে বলেন, "হু চল।" নাসিরুদ্দিন মোহনের দিকে তাকিয়ে মেজকত্তার অলক্ষ্যে চোখ দু'টোকে ঘুরপাক খাইয়ে নেয়। মোহন ভেঙচি কেটে তার প্রত্যোত্তর দেয়। যখনই ওদের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হয়, পরস্পরকে ওরা এই ভাবেই অভিবাদন জানায়। মনে মনে দু'জনেই দু'জনের প্রতি খুব খুশী নয়। দু'জনেই দু'জনকে অপদার্থ বলে মনে করে। তবে নাসিরুদ্দিন সম্পর্কে মনে মনে মোহনের একটু আধটু ভয় আছে। মোহন ভাবে, অযথা এই ডাকুটাকে মেজকত্তা কেন প্রশ্রয় দেয়! নাসিরুদ্দিন মনে করে এই অপদার্থটাকে মেজকত্তা অত খাতিরই বা করে কেন—যখন তখন টাকাটা পয়সটাই বা চাওয়া মাত্র দেয় কেন! আবার দু'জনেই বোঝে—দু'জনকেই মেজকত্তার প্রয়োজন—প্রতি কাজে-অকাজে দু'জনকেই মিলে মিশে কাজ করতে হয়। নইলে দু'জনেরই অন্ন
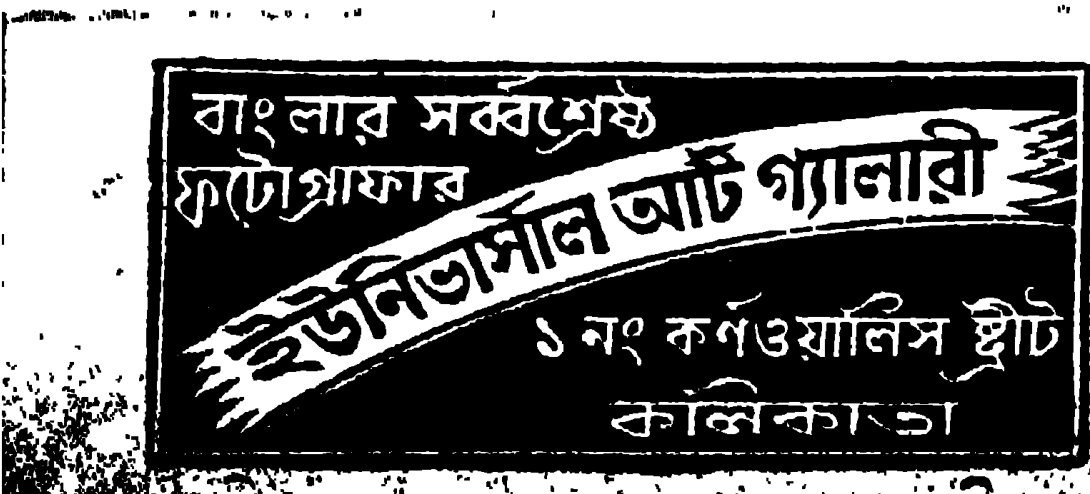
বাইচ শেষ হ'তে হ'তে সন্ধ্যা উত্তরে যায়। বাদল দু'একজনকে সংগে নিয়ে পূর্ব ব্যবস্থা মত বাইচের সময় ঝালডাঙ্গার বুকের পর দিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু রাইর লাস কোথাও ওদের চোখে পড়েনি। জেলের মেয়ে—পুরুষানুক্রমে মৎস্যজাতির সংগে ওদের শত্রুতা। কত মৎস্য-বংশ হলধরেরা ধ্বংস করেছে। কত মৎস্য-মাতাপিতার কোল থেকে হলধরেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ তারা যখন সুযোগ পেয়েছে একটু প্রতিশোধ নেবে না! হয়ত মাছের পেটেই যাবে রাইর গলিত দেহটা। হাড়গুলি পড়ে থাকবে ঝালডাঙ্গার বুকে। অদূর ভবিষ্যতে হলধরের ছেলেদের জালেই হয়ত সেগুলি জড়িয়ে উঠবে। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। জেলেবৌ ঘরে যেযে শুয়ে থাকে। তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়াতে থাকে।

বল্লভপুরের দক্ষিণে কয়েকটী গ্রামের পরেই আসফরদি। মুসলমান প্রধান গ্রাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে নাসিরুদ্দিনের বাড়ী। গ্রামের বসতি থেকে একটু বিচ্ছিন্নও বটে। মেজকর্ত্তাদেরই কয়েকটী পোড়ো ভিটে পর পর রয়েছে। এরই একটাতে নাসিরুদ্দিনের ঘর। ভিটেগুলি সব কয়টাই তার হেপাজাতে। তাছাড়া কয়েক বিঘে চাষের জমিও আছে। নাসিরুদ্দিনের বাড়ীর সামনে থেকে দক্ষিণে ধু ধু করে চাওচার মাঠ—চার পাঁচ মাইল বিস্তৃত। এই মাঠে আসফারদি গাঁয়ের অনেকেরই চাষের জমি রয়েছে। ধান—পাট—কলাই সবই এ মাঠে' জন্মে থাকে। মাঠের মাঝে মাঝে কয়েকটা পোড়ো পুকুর আছে। চাষাবাদের সুবিধার জন্যই বোধ হয় এগুলি কাটা হ'য়েছিল। শুকনোর দিনে এইসব পুকুরে প্রচুর মাছ থাকে। বল্লভপুরের অনেক জেলেরাই এসব পুকুর বাইতে আসে প্রতি বছর। মাঠের ওধারে সেনদিয়া ঘাট ষ্টীমার ষ্টেশন। ষ্টীমারগুলির হুইসিল বেশ পরিষ্কার ভাবে ভেসে আসে। অনেক সময় হুইসিল শুনে ষ্টীমারের চোঙ থেকে নির্গত ধুয়ো দেখতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীর সামনে ভিড় করে চায়—কি বর্ষা কি শুকনোর দিনে নাসিরুদ্দিনের বাড়ীর পাশ দিয়ে তাদের চলতেই হবে। নাসিরুদ্দিনের বাড়ীটা যেন পথিকদের নিশানা। বর্ষার দিনে 'লাইট-হাউসের' মত নাসিরুদ্দিনের বাড়ীটা অনেক বিভ্রান্ত পথিককে পথ দেখায়। তার বাড়ীর টিপ টিপ করে জ্বলা কেরোসিনের কুপির আলো অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। মাঠের একধারে বগাইল। সেখানকার লোকজনের সংগে নাসিরুদ্দিনের ভাবসাব আছে। নাসিরুদ্দিনকে ওরা মান্যি করে চলে। এরা বর্ষার দিনে রাত্রের অন্ধকারে পথযাত্রীদের মাঝে মাঝে সেলাম দিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিছু বকসিস না দিয়ে কারো যাবার উপায় থাকে না। তাহ'লেই ফল অন্যরকম দাঁড়ায়। বল্লভপুর এবং আসফরদি ও আশ পাশের গাঁয়ের অনেকেরা নাসিরুদ্দিনের পরিচয় দিয়ে অনেক সময় রেহাই পেয়ে থাকে। এই নাসিরুদ্দিনের বাড়ীর এক ঘরে অশোক কাননে বন্দিনী সীতার মত রাই গত রাত থেকে বন্দিনী হ'য়ে আছে। কে এনেছে—কোথায় এনেছে এখন অবধিও কিছু সঠিক জানতে না পারলেও নিজের ভবিষ্যৎ যে খুব গৌরবদীপ্ত নয়—রাই তা বেশ বুঝতে পেরেছে। ও বুঝতে পাচ্ছে, ওর অতীতকে আর ফিরে পাবে না—বল্লভপুরে 'সুবৌদি' বলে আর সুনন্দার সামনে যেয়ে দাঁড়াতে পারবে না। চিরদিনের মতই হয়ত সে পথ ওর সামনে বন্ধ হ'য়ে থাকবে। তবু অতীতের চিন্তায় মগ্ন থাকতে ভালবাসে রাই—ওর মা—বাবা—ভাই সুবৌদি—দেবুদা—ওদের বাড়ীর গাবগাছটা—পুকুর ঘাট বিলের ঘাট ওর স্মৃতি জড়িত বল্লভপুরের কথা। কত ভাবে—কত রূপেই না ওর মনে পড়ে। মাত্র একটা রাত আর একটা দিনের ব্যবধান—ও কোথায় ছিল আর কোথায় এসেছে—কী হবে! ভবিষ্যতের কথা যখনই মনে উঁকি মারে—তার বীভৎস রূপে শিউরে ওঠে। না—কিছুতেই না—ও হার মানবে না—ও হার মানবে না ওর ভবিষ্যতের

দেখবে! তাই বর্তমানের অনিশ্চয়তায়—ভবিষ্যতের বিভীষিকায় চমকে উঠলেও—কান্নায় মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়লেও নিজেই নিজেকে দৃঢ় করে তোলে। প্রতি মুহূর্তের জন্য তৈরী হয়ে থাকে।

নাসিরুদ্দিনের নাম রাই শুনেছে। চাওচার মাঠের কাহিনীও ওর অপরিচিত নয়। নাসিরুদ্দিনকে ইতিপূর্বে ও দেখেনি—এ অঞ্চলে আসবারও ওর সুযোগ হয় নি। ওকে যে এনেছে তার নামই যে নাসিরুদ্দিন তাও এখন পর্যন্ত রাই জানতে পারেনি। তাই ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না—কেন এই অপরিচিত লোকটা ওর সর্বনাশ করলো—ওর গায়ে ত কোন সোনা দানাও ছিল না। নাসিরুদ্দিনের বৌ মেহেরুন্নিসা দু'একবার রাইকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। হিন্দুর মেয়ে তাই দুধ, কলা, মুড়ি আর গুড় ছাড়া কিছু দেয় নি। কিন্তু সেগুলি যেমনি দিয়েছিল তেমনি পড়ে রয়েছে। বৌটাকে রাইর মন্দ লাগেনি। দেখতে বেশ। মুসলমানের ঘরে এত সুন্দরী ওদের গায়ের মধু সেখের বৌকেই দেখেছে। মধু শেখের বৌ বড্ড নোংরা। এ মেয়েটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া একটা কমনীয় ভাব যেন ওর সারা অংগে। কিন্তু তবু বৌটিকে কোন কথাই রাই জিজ্ঞাসা করে নি। যার স্বামী ওর এরকম সর্বনাশ করলো—তার বৌর সংগে কথা বলতে রাই ঘৃণা বোধ করে। সন্ধ্যা বহু পূর্বে উতরে গেছে। অন্ধকার ঘরে রাই। আলোর উপস্থিতি থেকে—এই অন্ধকার তবু ওর মন্দ লাগছে না। ঘাটে নৌকো লাগার শব্দ ওর কানে ভেসে এলো—সেই সংগে লোকজনের কথাবার্তাও। এতক্ষণ গৃহস্বামী বাড়ী ছিল না। তার উপস্থিতি নতুন পরিস্থিতির কথাই যেন ওকে জানিয়ে দেয়। গৃহস্বামী কথা বলতে বলতে কাকে সংগে নিয়ে উঠোনে এসে ওঠে। ওদের ফিস-ফিসানী রাইর একটু একটু কানে আসে। ওর ভিতর যেন চেনা গলার রেওয়াজ শুনতে পায় রাই।

নাসিরুদ্দিন বউকে হাক দিয়ে বলে, "আরে অ্যাট্টা কুপা দেওনাই—এ্যাট্টা কুপা দেও। ঠাইরেনরে অনাধারে বউ একটা কুপি এগিয়ে দেয়। নাসিরুদ্দিন কুপিটা নিয়ে ঘরের তালা খুলে ভিতরে যায়। কুপিটা রেখে বলে—"বিবিজান, তোমারে আনলাম ক্যান জানতি চাইছিলা না! এ্যানুহে জানতি পারবা ক্যাডা আইছে তোমার লাইগ্যা। আমি বোলাইয়া দিতাছি। বাচ্চিত হরো।" নাসিরুদ্দিন বেরিয়ে আসে। এবার ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন—তাকে দেখে সমস্ত বিষয়টা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় রাইর কাছে।

ফনিনীর মত যেন ও ফুলতে থাকে। ইচ্ছা হয় দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে টুকরো টুকরো করে দেবে ওকে! কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ না করে সংযত হ'য়েই থাকে রাই। মেজকর্তা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করেন, "কী রে রাই, একী পাগলামী কচ্ছিস—সারাদিন কিছু খাসনি।" রাই কোন কথা বলেনা। শক্ত হ'য়ে বসে থাকে। মেজকর্তা হাসতে হাসতে বলেন, "তোকে নিয়ে ভারি কাণ্ড হয়েছে। কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। সকলে মনে করেছে তুই জলে ডুবে মারা গেছিস।" রাই কোন উত্তর দেয় না—গুম মেরে বসে থাকে। মেজকর্তা বলে চলেন, "নাসিরুদ্দিনের পাশের ভিটেটায় তোকে ঘর তুলে দেবো। কয়েকমাস থাকার পর দেখবি সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বাপ-মায়ের জন্য মন খারাপ করছে—কেমন? কিছুদিন থাক নিয়ে আসবো এখানে। ঐত চাওয়ার মাঠে শীতের সময় বাদলারা পুকুর বাইতে আসবে।" রাই কোন কথা কয় না। মেজকর্তা মনে করেন, রাই বাগে এসে গেছে! বাগে যে আসবে তা তিনি জানতেন। তবে এত তাড়াতাড়ি আশা করতে পারেননি। মেজকর্তা দরজাটায় খিল দিয়ে দেন। রাই ঘরের এক কোনায় বসে আছে। মন এবং দেহ দুইই তার অবসন্ন। মেজকর্তা দু'পা এগিয়ে যান। রাই দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মন ও দেহ যতই ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ুক—এ পাষণ্ডটাকে আজ আর সে ক্ষমা করবে না। মিষ্টি কথায় ওর এগিয়ে আসার মতলব রাই বুঝতে পারে। মেজকর্তা এগিয়ে যেয়ে রাইর পিঠে হাত রাখেন—রাই এক ঝামটায় হাতটা ছুড়ে মারে। মেজকর্তা আদরের সুরে বলেন, "নে কাঁদিসনে, আর কাছে

কে, পিকচার্সের আগামী চিত্র 'তরুণের স্বপ্ন' অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হবে।

শ্রেষ্ঠাংশে পাহাড়ী ঘটক ও বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দেখা যাবে।

এখনও কোন কথা নেই মুখে। অস্পষ্ট আলোকে ওর ক্লান্ত মুখখানা কতইনা সুন্দর দেখাচ্ছে! চির ক্ষুধার্ত মেজকর্তা অনেক ধৈর্য ধরেছেন রাইর জন্য—আজকের মুহূর্তটাকে কাছে পেয়ে কী ছেড়ে দেবেন! আর এখনত তার হাতের মুঠোর ভিতর। মেজকর্তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি রাইর চোখ এড়ায় না। ওর বিষাক্ত ছোয়াচে ওর পবিত্রতা দেহে প্রাণ থাকতে কোন মতেই রাই নষ্ট হতে দিতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে ওর দেহে ও মনে অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত হ'লো। একদিকে জয়ের উল্লাস অন্যদিকে আসন্ন ক্ষুধা নিবৃত্তির আশা মেজকর্তাকে মাতাল করে তুলেছে। তিনি একটু বেশী নিশ্চিত হয়ে এবার রাইকে হাত বারিয়ে ধরতে যান—রাই আর দেরী করতে পারে না—জোড়ে মেজকর্তার গালে এক চড় বসিয়ে তার বাহুর বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। মেজকর্তা তৈরী ছিলেন না এজন্য। ধাক্কা খেয়ে কিছুটা দূরে সড়ে গেলেন। হাত দিয়ে গালটা বুলাতে লাগলেন। গালটা পুড়ে যাচ্ছে। ঐ কোমলতার অন্তরালে যে এত দংশন—এত জ্বালা থাকতে পারে মেজকর্তা কল্পনাও করতে পারেননি। গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, "কী চড়টাই দিয়েছিস। আরে সত্যিই কী আমি কিছু করতে চাইছিলাম নাকি। আমার কী জ্ঞান নেই যে তোর মন খারাপ—সারাদিন কিছু খাসনি। এত জোড়ে দিয়েছিস পুড়ে যাচ্ছে।" রাই নিজেও সংগে সংগে দূরে সড়ে যেয়ে দাঁড়িয়েছে। ফনিনীর মত গর্জে উঠছে। ওর প্রলয়ঙ্করী রূপ মেজকর্তাকে খানিকটা ভয়ার্ত করে তোলে। মেজকর্তা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না—দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। আসবার সময় বলে আসেন, "মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে ভাখ—কাল আসবো।" মেজকর্তা চলে যাবার পর রাই বসে পড়ে। ওর মাথাটা ঝিমঝিম করে। দেহটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়। আজকের বিপদ কাটলো কিন্তু এমনিভাবে সে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে পারবে!

নাসিরুদ্দিনের বৌ মেহেরুন্নিসা মেজকর্তা যখন ঘরে ঢোকেন, কৌতুকবশতঃ বেড়ার ফাক দিয়ে আড়ি পেতেছিল। [illegible] মেহেরুন্নিসা ভেবেছিল ও বুঝি নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে এসেছে। তাই রাইর প্রতি তার কোন সহানুভূতিই জাগেনি। এ ধরনের মেয়েরাত এই রকমই। কিন্তু আড়ি পেতে ওর সে ভুল ভাঙলো। রাই যখন মেজকর্তার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল ওর তখনই ইচ্ছা হচ্ছিল রাইকে যেয়ে জড়িয়ে ধরে। মেজকর্তার ওপর মেহেরুন্নিসারও কম রাগ নয়। হউক না মনিব—কিন্তু তারই জন্যত ওর স্বামী নানান কু-কাজ করে বেড়ায়! এজন্য মেহেরুন্নিসার কম দুঃখ নয়।

নাসিরুদ্দিনের হাতে কয়েকটা টাকা গুজে দিয়ে মেজকর্তা মোহনকে নিয়ে নৌকোয় ওঠেন। তখন অবধিও তার গালের জ্বালা দূর হয়নি। নৌকোয় উঠেও মাঝে মাঝে গালে হাত বুলাচ্ছেন। ব্যথাটা ঝির ঝির করছে। এক দিক দিয়ে মন্দও লাগছে না!

মেজকর্তা চলে যাবার পরই মেহেরুন্নিসা রাইর কাছে যায়। রাই বেড়ায় হেলান দিয়ে কাপড়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। কোন শব্দ নেই—সাড়া নেই। কাপড়টা চোখের জলে ভিজে উঠেছে! মেহেরুন্নিসা কখন ভিতরে যেয়ে দাঁড়িয়েছে ও টেরও পায়নি। মেহেরুন্নিসা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাইর কাছে যেয়ে বসে পড়ে। রাইকে দু'হাত দিয়ে কোলে টেনে নেয়। স্নেহের স্পর্শ রাই বুঝতে পারে। এলিয়ে পড়ে মেহেরুন্নিসার কোলে। মেহেরুন্নিসা বলে, "তোমারে ছুইয়া দ্যালাম—রাইগো না। আমি বাইর থ্যাম হব স্তাকছি। আমারে ডর কইরো না। তোমার মেয়াভাইর পর রাইগো না।" রাই মুখ তুলে তাকায়। কোন কথা বলতে পারে না। মেহেরুন্নিসার কথায় ও যেন ক্ষণিক আশার আলোক দেখতে পায়। এই মুসলমান বৌটির অন্তরের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সহস্রধারায় চোখের জল ওর দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। ওর ঠোট দুটী কেপে ওঠে—ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে, "না তোমাগো উপ্যার রাখ করবো ক্যান!" মেহেরুন্নিসা ওর এলোমেলো চুলগুলি হাতাতে হাতাতে বলে, "কাইন্দো না। পানি পুইছ্যা ফ্যালো।" রাই চোখের জল মুছে মেহেরুন্নিসার দু'টো হাত ধরে বলে, "ভাবী, তুমিই পারবা আমারে বাঁচাইতে—আমারে মাইজাকত্তার হাত থাইক্যা বাঁচাও—তোমাগো

কেনা অইয়া থাকপো।" মেহেরুন্নিসা রাইকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "ক্যাতদূর কী করা যাবে বলতি পারি না। আমাগো অ্যাতি যা করবার আছে তা করবানি। তুমি বইসো আমি তোমার মেয়াভাইরে ডাইহা আনি।"

মেহেরুন্নিসা বেরিয়ে আসে। রাই তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। ওর সুবৌদির সংগে কোথায় যেন মেহেরুন্নিসার মিল খুঁজে পায়। যারা ভাল, তাদের বুঝি কোন জাত নেই—ধর্ম নেই—তারা সবাই এক! নাসিরুদ্দিন গোয়ালে গরু গুলিকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। গোয়ালটা একটু দূরে। বউকে দেখেই নাসির বলে ওঠে, "মানা করছিনা আধারে গোয়ালে আসপি না। শ্যাপে না কাটলি তোর আক্কেল অবে না।"

মেহের হাসতে হাসতে বলে, "বেশ আমার জন্যিত মায়া। তয় এ্যাট্টা মাইয়ারে আবার ধইরা আনছো ক্যান! ওর সব্বনাশ করতি সরম নাগে না।"

নাসির গরুর চাড়িতে ঘাস দিতে দিতে বলে, "নে আইছিস যকন বাত্তিটা এ্যাটটু উচা কইর‍্যা ধর।" তারপর একটু থেমে বলে, "বিবিরে বুঝি ধরছে খুব। আর বিবির মন গইল্যা গ্যাছে। ও অইলো জাইল্যার মাইয়া, মাইজ্যা-কত্তার চোখে নাগছে ওরিত ভাল হবি।" মেহের উত্তর দেয়, 'হয় না। মাইয়াডার দুষ নাই। জোর কইরা তোমাগো দিয়া বাইর কইরা আনছে। তুমি রাইখ্যা আসো কোথায়।"

নাসির উত্তর দেয়, "ধ্যুৎ! তাই অয় নাকি। তাইলি গলা কাটা যাবি না। না খাইয়া থাকতি অবি। জানিসনাত ও কত্তারে।"

মেহের জোর দিয়ে বলে, "তা অয় অউক। তুমি মরদ ব্যাটা, অত ভয় কইর‍্যা চল ক্যান। নয় কিষাণ খাইটা ঘর চালাবা। আমি বাত দিছি। তোমার নাখতে অবি।"

নাসিরের গরুকে ঘাস খাওয়ানো শেষ হয়। বউকে বলে, "নে বাত্তি ধর ঘাটে যাবো।" মেহের বলে, "রাইত কইর‍্যা ঘাটে যাত্তি অবে না। পানি আইন্যা রাকছি।" দাওয়ায় [illegible] মেহের গারুতে করে জল দেয়। নাসির নামাজটা পারে না। ওর কেবলই মনে হয়—মেহেরের মত আল্লাও ওকে নির্দেশ দেয়—'নারে এমন কাজ করিসনা—কোন অন্যায়ই আমি সহ্য করতে পারি না—ন্যায় যে করে তার জন্যই আমি বেহেস্তে স্থান করে রাখি।' নামাজ পড়ে নাসিরের মনে ভাবান্তর দেখা যায়। জীবনে সেত কম অন্যায় করেনি—তাহলে তার স্থান হবে কী দোজকে! কিন্তু তার দোষ কী! কোন দিনইত এ অন্যায় সে নিজে ইচ্ছা করে করেনি। তার বাজান মারা যাবার পর সে চাষাবাদ করেই জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। দেনায় তাদের ভিটে বাড়ী নিলাম হ'য়ে যায়। মেজকত্তারাই এই বাড়ী দিয়ে—জমি দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। মেজকত্তার কথামতই ওর চলতে হয়। নইলে খাওয়া জুটবে না! খোদাকে যে এত ডাকে খোদা ত ওর কোন ডাকেই সাড়া দেয় না। শুধু ওর কেন, এই যে বগাইলের যদু মণ্ডল—ছব্দুমিঞা ওরাত ভাল লোকই ছিল—কিন্তু ওদের কোনদিনই দু'বেলা ভাত জোটেনি। যদু মণ্ডলের ছেলেটা বিনে চিকিৎসায় মাবা গেল। তাইত ওরা চুরি ডাকাতি করে। অবস্থা ফিরিয়েও ফেলেছে। গাঁয়ে দু'চারজন খাতির করেও চলে! তবু নাসিরের মনের মধ্যে খটকা লাগে। মেহেরকে ডেকে বলে, "চল যাই ও ঘরে।" মেহের খুশীতে ভরে ওঠে। নাসিরকে নিয়ে রাইর কাছে যায়। মেহেরের এত দেরী দেখে রাইর মনে সন্দেহ জেগেছিল। ওদের আসতে দেখে একটু আশ্বস্ত হয়। নাসির সবেমাত্র নামাজ সেরে এসেছে। তার মাথায় সাদা কাপড়ের টুপিটা তাড়াতাড়িতে ছেড়ে আসতে পারেনি। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে রাই নাসিরকে যতটুকু দেখতে পেয়েছিল সে নাসির আর এ নাসির-এ যেন অনেকটা তফাৎ। রাই প্রথমে একটু তন্ময় হ'য়ে যায়—ওই কাটখোট্টা নির্দয় পাষাণ লোকটার অন্তরের রূপ যেন রাইর কাছে প্রকট হ'য়ে ওঠে। রাই ছুটে যেয়ে নাসিরের হাত ধরে বলে, "তুমি আমার ভাইজান, তোমার নাম শুনছি। তুমি ছাড়া কেউ এ [illegible]

ভাইরা এ কাজ কইরো না।" নাসির কোন কথা কয় না। রাই বলে, "আমি তাইলে তোমাগো সাক্ষাতেই মাথা ঠুইক্যা মরবো। প্রাণ থাকতি মাইজ্যাকত্তার বাঁধি অবো না।" বলেই রাই নাসিরুদ্দিনের পা দু'টো জড়িয়ে ধরতে যায়। মেহেরুন্নিসা রাইকে তুলে ধরে। নাসির একটু দূরে সরে যেয়ে বলে, "আরে তোবা তোবা। করো কী। কতগুণাই তো করছি জীবন ভইর‍্যা। বইসো দেহি কী করা যায়। তয় কাইন্দো না। আমি ঐ পানি দেখতি পারি না।"

ওরা তিন জনেই বসে পড়ে। নাসিরুদ্দিন বলে, "তয় কোথায় যাতি চাও। যেথানেই যাবা আইজ রাইতির ভিতার চইল্যা যাতি অবি।" কোথায় যাবে রাইও ভেবে ঠিক করতে পারে না। অথচ ওর ভয়ও যায় না। যে সুযোগ পেয়েছে যদি চলে যায়। যেথানেই হউক সেখানেই ও যেতে রাজী আছে। শুধু মেজকত্তার ছোঁয়াচ থেকে দূরে। অনেক দূরে। কিন্তু রাই জানেনা যে, মেজকত্তার মত লোকের অভাব নেই। সব জায়গাতেই মেজকত্তার দল এমনি ভাবে রাইদের জন্য ওত পেতে আছে! মেহের একবার রাইর পানে একবার স্বামীর পানে তাকায়। ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে। কোন রকমে মেয়েটাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। নাসিরুদ্দিনই প্রথম বলে উঠলো, "ঘরে যাইতি পারবা না। তাইলে আমার আর বাচন নাই।" রাই উত্তর দেয়, "তাছাড়া তুমি সেথানের পথ বন্দি করছো। আমাদের রায়বাড়ীর ছোটকত্তা কইলকাত্তা থাহে—তা তারও ত ঠিহানা জানা নাই।" নাসিরুদ্দিন এবার সোৎসাহে বলে ওঠে, "অইছে, ছন্ধান পাইছি। কিন্তু—" বলেই চুপ করে। রাই ও মেহের এক সংগে বলে ওঠে—"কিন্তু কী!"

নাসির বলে, "খিরিসটান অবা। কও—তাইলি আর ভাবতি অবি না। জলিরপাড় তোমারে রাইথ্যা আসি।" জলিরপাড় সেনদিয়া ঘাটেরই পাশের গ্রাম। ষ্টীমার ষ্টেশন। ওখানে একটা গীর্জা আছে। রাইও জলির-পাড়ের নাম শুনেছে। আশপাশের বহু জেলে—মুসলমান পুরেরও অনেকে জানে। খৃষ্ট ধর্মের উদারতার জন্য বা যীশুর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে এ অঞ্চলের কেউ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে যায় না। জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিমায় যখন মাথা উঁচু করে কেউ চলতে পারে না—সারাদিন খেটেও যখন জঠরের জ্বালা নিবিয়ে উঠতে পারে না—তখন এ অঞ্চলের অনেকের সামনেই জলির-পাড়ের গীর্জার কথা মনে হয়। খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে যীশুকে পাবার আকুলি বিকুলি ভিতরে কতখানি দেখা যায় তা বলা দায়—তবে খেয়ে পরে দেহের দিক থেকে অনেকেই যে উন্নতি লাভ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উন্নতি লাভের আশা রাইর মনে স্থান না পেলেও—খৃষ্টান ধর্মের উদারতার কথা সে ভুলতে পারলো না। যে হিন্দু ধর্ম একটি অসহায় হিন্দু নারীকে স্থান দিতে পারে না—তারই বা কী দায় পড়েছে সে হিন্দুয়ানী বজায় রেখে চলতে। হ্যা ও জলিরপাড়ই যাবে। গীর্জায় যেয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবে। নাসিরুদ্দিনকে বলে, "তাছাড়া আর পথ কী—তুমি আমারে সেথানেই দিয়া আসো।"

নাসিরুদ্দিন বলে, "তাইলে আর দেরী কইরো না। কিছু খাইয়া নাও। আমারো চাইট্টা নাস্তা খাইতি অবি। বাইচে ছেরাস্ত হইছি। তোমারে দিয়া সক্কালেই চইল্যা আসতি অবি।" মেহেরকে লক্ষ্য করে বলে, "তোর দুইখান কাপড় দি। একখান পিনবি। একখান পরবি।"

রাইকে বলে, "সাবধানে বাচ্চিত করবা। আমি তোমার ভাইজান—আরে মেহের তর বুনের নামডা কইনা দি। সাহেবদের উথানে ঐ নাম বলতি অবি।"

রাই হাসতে হাসতে বলে, "ঠিক আছে আমি নাম কবানি নূর বিবি। আর সোয়ামীর নাম দেবু শেখ।" নাসির বলে, "কিন্তু প্রতিজ্ঞে করো—আগেই ঘরে খপর দিতে পারবা না—তাইলে আম্যাগো নক্ষা থাকপি না।" রাই একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়, "ভাইজান, তোমরা আমারে যে বিপত্ত-থ্যা বাচাইলা—তোমাগো আমি কোন দিন বিপত্তে ফ্যালবো না। আগে যদি কিছি তোমাগো

বাড়ীই আগে আসফো।” নাসির উঠে যায়। তার অনেক কাজ। নৌকোটায় তাড়াতাড়ি একটা ঘোনা টানিয়ে নেয়। নদী পার হ'তে হবে—বড় দেখে চইড় ও বৈঠা বের করে রাখে। নাস্তা সেরে নেয়। রাই এর মাঝে প্রস্তুত হ'য়ে নিয়েছে। রাই মেহেরের একটা রঙিন কাপড় পরেছে—আরেকটা গায় জড়িয়েছে। মেহের আবার দুগাছা কাচের চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে ওর হাতে। কে বলবে নূর বিবি হলধরের মেয়ে রাই। একটা নাক ছাপিও পরেছে পিতলের। মেহের হুকা কলকি ও গামছায় নাস্তা বেধে নিয়ে নৌকোয় উঠেছে। ঘাট থেকে সে হাঁক দেয়, “কৈ আইসো, দেইর কইরো না।”

মেহের রাইকে নিয়ে হাজির হয়। নৌকায় উঠবার সময় মেহেরকে জড়িয়ে বলে—“ভাবি, তুমি কাইল আমারে ছুইয়া গুণা করলা। তোমার মত মাইয়া লোকের ছোয়ায়—গুণা আরো নাশ অয়।” রাইয়ের চোখে জল মানে না। এই অনাত্মীয় বিধর্মী বৌটাকে ছেড়ে যেতেও যেন ওর কষ্ট হয়। মেহেরেরও চোখের পাতা জলে ভরে আসে। নাসির নৌকা ছেড়ে দেয়—মেহের বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নাসির চইড়ের খোচায় নৌকাটাকে ধানের জমি—পাটের জমি ছাড়িয়ে মুহূর্তে ছুটে চলে। রাই দেখতে পায় দূর থেকে—মেহের তখনও দাঁড়িয়ে কেরোসিনের বাতি হাতে নিয়ে। ওদের নৌকা ছুটে চলে। মেহেরকে আর দেখা যায় না—অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে নাসিরের বাড়ীটাও রাইর চোখের সামনে থেকে বিলীন হয়ে যায়। রাই এতক্ষণ ঘোনার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল এখন ভিতরে একটু আট সাট হয়ে বসলো। ভবিষ্যতের কোন অদৃশ্য গতিপথ বেয়ে ও চলেছে—বলতে পারে না—সেখানেও নতুন কোন বিপদ ওত পেতে আছে কি না জানেনা। সে সব চিন্তা করলে ও পাগলা হয়ে যাবে—তাই থাক। ওর মন মেহের আর নাসিরের কথায় ভরপুর। যতই ভাবে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। অশিক্ষিত এই মুসলমান বৌয়ের কথা ও জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না। নারীর সত্যিকারের মাধুর্য এদের মাঝে যেন অত্যাচার নারী ঢেকে রেখেছে তার অঞ্চল দিয়ে। মেহের বিবি—সুনন্দা এরাই ত বাংলার পল্লীর সম্পদ—এরাই সন্ধ্যা দীপ জ্বালিয়ে গ্রামের অন্ধকার দূর করে—স্নেহ মমতায় পল্লীর বুকের হাহাকার ভুলিয়ে রাখে। চির ভাস্বর—চির অমর। যুগ যুগ ধরে বিভিন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করে—নারীর আদর্শকে চির মহিমান্বিত করে রেখেছে। রাই এই দুই নারীর উদ্দেশ্যেই প্রনতি জানায়।—

আর এই নাসির, কত অন্যায়—কত জবরদস্তিই যে করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ নির্মমতার মাঝে এমনি সুকোমল হৃদয়টা আজও মরে নাই। নাসিরের এই হৃদয়টার—নাসিরের মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছে বলেইত রাই নির্ভয়ে এই রাতের অন্ধকারে তার সংগে একা চলেছে। আজ আর নাসিরকে তার একটুকুও ভয় নেই। নাসিরের প্রতি তার বিশ্বাস অটল!

নাসিরের ডাকে রাইর চমক ভাঙ্গে। এতক্ষণ রাই নিজের মাঝেই নিজে অভিভূত হয়ে ছিল। মাঠ পেরিয়ে কখন যে নাসির নদীতে পড়েছে ও টেরও পায় নি। নাসির চইড় রেখে বৈঠা ধরে দু'তিনবার রাইকে ডেকেছে উত্তর পায়নি। নাসির আবার ডাকে “রাই ও নূর বিবি! ঘুমাইছো নি।” রাই তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়। চার পাঁচটা ডাক দেবার পর সাড়া পেয়ে নাসির ভাবে, রাই বুঝি তাহলে কাঁদছিল এতক্ষণ। সান্ত্বনা দিয়ে বলে—“কাইন্দা কী করবা। একন খোদারে ডাহো। মাইজাকত্তার খাতিরে তোমার সব্বনাশ করলাম। আহো কী করবো। পেটের দায়ে বুন—পেটের দায়ে হব করতি অয়।” কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—“আহো এই বড় নোকগুলা টাহা দিয়া আমাগো কিনা নাগছে। টাহা দিয়া আমাগো বেমাহুষ হরছে। আর না। তুমি আমার চোক ফুটাইছে। খাই না খাই আর অমন কুকাজ হরবো না।” কিছুক্ষণ বৈঠা বেয়ে নাসির আবার বলে—“তোমরা ভাবো আমাগো পরাণ নাই—তা নয়—বুন তা নয়। ব্যামেই কোন কুকাম হরি, আমাগো পরাণও কাইন্দা [illegible]

[illegible] পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দেবদূত'-এ ভাস্কর দেব ও সন্তোষ চৌধুরী

রূপমঞ্চ

...দিবা উত্তর দেবে। শুধু তার মত অসহায় নারীই নির্যাতিত নয়। সমস্ত মানবাত্মাই নিপীড়িত। এই নিপীড়ন থেকে সমস্ত মানবাত্মাকে মুক্তি দিতে হবে। মুষ্টিমেয় জনকয়েকের বন্ধনে যারা বাঁধা—তারা যে দিন মুক্তি পাবে—পৃথিবীতে কোন হাহাকার থাকবে না—থাকবে না কোন অন্যায় অত্যাচার—। এই অন্যায় অত্যাচার থেকে কী মানবাত্মা কোন দিনই মুক্তি পাবে না—এমন কোন শক্তির আবির্ভাব হবে না যে ঐ অন্যায়ের নিগড় খান খান করে ভেঙ্গে ফেলবে! জ্যোতির্ময় আলোক বিকীরণে অন্ধকারের হাত থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দেবে! নিশ্চয়ই আছে। আকাশের নির্মল চাঁদের আলো তাই নির্দেশ দেয়—অন্ধকারের বুক চিরে জ্যোৎস্নার আলো ছিটকে পড়বে! সে দিন সমাগত। ঘোনার ফাঁক দিয়ে—আকাশের জ্যোৎস্না নৌকাটার ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারে। মাঝির বৈঠা বেয়ে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে নদীর বুক বেয়ে। (পূজার পর থেকে আবার চলবে)

প্রণামী

(ছোট গল্প)

শ্রীসনৎকুমার ভৌমিক

★

বৈকালিক আড্ডা। তরণী সেন বলে যাচ্ছিল :—Remember আমার Wife হচ্ছেন দিল্লীর মেয়ে। দিল্লীর আদব-কায়দাই ভাই আলাদা। শাশুড়ীকে পঁচিশ টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দিলেন। আমি কিছুতেই নেবোনা। বল্লাম—বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে এলে টাকা দিয়ে প্রণাম করতে হয় যে—তিনি বল্লেন :—ওমা সে কি কথা। জামাইয়ের টাকা কি নিতে পারি!

সুতরাং ডবল টাকা পেয়ে গেলাম। তরণী সেন Shrug' করলো সাহেবী কায়দায়।

সুরথ বিশ্বাস বল্ল :—বেশ তো মোটা টাকা পেলে ব্রাদার। এবার আমাদের খাইয়ে দাও। অনেক দিন পেটে মুরগী-টুরগী পড়ছেনা।

তরণী বল্ল :—আরে ভাই সে টাকা কি আর আছে! এই বলে সে পঞ্চাশ টাকার হিসাব দিতে বসলো—স্ত্রীর বডিস্-লিপষ্টিক-ইভিনিং ইন্ প্যারিস্, নিউভিট ইত্যাদি ইত্যাদি Remember আমার Wife হচ্ছেন দিল্লীর মেয়ে। দিল্লীর আদব-কায়দাই ভাই আলাদা। স্ত্রীর গর্বে সে যেন হাই-জাম্পে এভারেষ্টের চূড়ায় গিয়ে বসলো।—

দেবেন দাস বল্ল :—বউকে সংযম শেখাও। যা দিন কাল পড়েছে।

"আজ কাল কার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয়না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখ্‌ছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ"

তরণী [illegible] শুনিয়ে দেয় :—ওগো ব্যাচিলার মশাই, তুমি কি বুঝবে দিল্লীকা লাড্ডুর স্বাদ।

সে বল্ল :—তুমি হচ্ছ পয়লা নম্বরের Miser. [illegible] টাকা বউএর পায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছো। Henpecked কোথাকার। মথুর মাষ্টার মাথাটা চুলকে কি একটা [illegible] এঁটে নিয়ে বলে :—আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাদের খাওয়াব।

সেদিন কার মত আড্ডা এখানেই ইতি হলো।

তিন সপ্তাহ পরের কথা। স্থান—আড্ডা—কাল—সন্ধ্যা। শ্বশুর বাড়ী ফেরৎ মথুর মাষ্টার বলে যাচ্ছিল :—সে দিন আড্ডাতে তরণী সেনের কথা শুনে মনে মনে ঠিক করে ফেল্লাম যে আমিও শ্বশুর বাড়ী যাব।

সেখানে শাশুড়ীকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প্রণাম করবো। ওই কিপটে তরণীর মত পঁচিশ টাকা দিয়ে নয়। তারপর শ্বশুর বাড়ী তো গেলাম। এখানে বলে রাখা ভালো,—বিয়ের পর এই আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাওয়া। শাশুড়ীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। ব্যাস শাশুড়ী দিব্যি [illegible] গোছে পঞ্চাশ টাকা আঁচলে বাঁধলেন। তারপর তিনি একটু হেসে ইনিয়ে বিনিয়ে বল্লেন :—বাছা এ্যাত বেশী টাকা দিয়ে কি প্রণাম করতে আছে! আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। আমতা আমতা গলা করে বল্লাম—না……না……এ্যা—তো……আর কি!

চুপকরে ভাবতে লাগলাম—হায়রে সামান্য ইস্কুল মাষ্টার আমি! পঞ্চাশ টাকা মাইনে। এক মাসের মাইনে শুদ্ধ তুলে দিলাম ডবল পাবার আশায়।

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।"

ষ্টুপিড তরণীটার ওপর রাগে জ্বলতে লাগলাম। সে দিন ওকে কাছে পেলে নেকটাই ধরে আছাড় দিতাম। ইস্কুলের থেকে সাত দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। দুদিনের বেশী সেখানে থাকতে পারলাম না।

আমরা সবাই চুপ।

তরণীর মুখে বিদ্রূপের হাসি।

(গল্প)

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

★

সুবর্ণ-রেখার বন্ধুর বালুতট : সূর্যাস্তের শেষরশ্মি—জীবনের শেষ দীপ্তি ! সুদূর-আকাশের গাঢ় নীলিমার কোলে পাহাড় হোতে বনের শ্যামলিমা এসে শেষ হোয়েছে,—'রেখার শুভ্র তটরেখায়। কিশোরী মেয়ের চপল হাসির মতো বয়ে চলেছে 'রেখা।

বনানী ও শ্যামল বসেছিলো নদীর বুক চিরে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে মুসাবনীর দিকে তারই সাঁকোর পাশে। শ্যামল চেয়েছিলো অদূরে তামার কারখানার চিমনীর দিকে। বনানী লক্ষ্য করলে শ্যামলের নিস্পৃহ মন ও দৃষ্টিকে। পাশ হোতে একটা ছোট পাথর ছুঁড়ে ফেলে দিলে স্রোতের উপর। ছিটকে বেরিয়ে এলো কতকটা জল তাদেরই দিকে। শ্যামল একটু হাসলে। বনানী বল্লে—

"সত্যি, বড ভাল লাগচে, শ্যামল—"

"কাকে ?" শ্যামল প্রশ্ন করলে।

"কেন, এই নদী, এই পাহাড়, তুমি !"

"আমি ?" প্রশ্ন করলে, যেন শ্যামল মোটেই প্রস্তত ছিল না এর জন্যে।

"তোমাকে কি আজ প্রথম ভাল লাগলো ? আর কোনদিন লাগেনি ?"—জিগ্‌গেস করলে বনানী। একটু থেমে বনানী বলতে সুরু করলে—

"সত্যিই আমি ভাবতেও পারিনি, শ্যামল আজ এতদিন পরে তোমার সংগে দেখা হবে এখানে, এতো সহজে ও সহসা।"

"তাহলে বুঝি একটু প্রস্তুত হোয়ে আসতে ?"—শ্যামল একটু শ্লেষের সহিত প্রশ্ন করলে।

"আজ দশ বছর পরেও ভোলোনি সেই দিনকার একটা পুরানো স্মৃতি।"

—"ভুলতে আমি পারি না, কারণ, অতীতের উপরই গড়ে ওঠে আমাদের ভবিষ্যৎ, প্রাচীনের উপরই আসে নবীনের সমারোহ"—

—"যদি চিনতে সেদিন না পেরে থাকো—তবু সে ভুল আমারই"—বনানী উৎসুক হোয়ে রইলো উত্তরের জন্য।

—"ভুল আমি করিনি বনানী, নিজের বিবেক তার বিচার দিয়ে যেটুকু আমাকে দেখিয়ে দিলে সেই মতো কাজই করে চলেছি"—

—"কিন্তু বাবার জন্যে আমি কি দোষ কোরলাম ?"—বনানীর স্বরে কাকুতি।

—"দোষ তুমি করনি, তোমার বাবাও নয় তবে দোষী তোমাদের রক্ত !"—

শ্যামলের মুখটা লাল হয়ে ওঠ্‌লো।

—"শাস্তি পেলাম শুধু আমি"—বনানী নিশ্বেসটা যেন একটু চেপে ধরে রইলো।

—"আমি আমার নিজের পথ রচনা করে চলেছি, চল্‌তে যেতে হয়তো কাউকে আঘাত দিতে পারি, তবু যে পথ আমার নিজের, আমার দেশের সেই পথই আমার শ্রেয়"—

বনানী চুপ করে রইলো।

শ্যামল বলে যেতে লাগলো "তোমাদের শ্রদ্ধা কোরতুম, ভালও বাসতুম কিন্তু যেদিন তোমাদের সত্যিকার পরিচয় পেলাম, মন ভরে উঠলো ঘৃণায়, তিক্ততায়।

তোমাদের স্নেহ আজও অস্বীকার কোরবার মতো উপায় নেই, তবু মনের কাছে তোমরা হোয়ে গেছো অতি ছোট"—

—"শুধু বাবার দিকে তাকিয়েই গড়ে তুলেচ তোমার মতবাদ, আর কারুর দিকে তাকাবার সময় তোমার হোল না ?"—

—"আমার বিদ্রোহ শুধু তোমার বাবারই উপর নয়, তোমার বাবার সমপর্যায়ের যারা আছে তাদেরও উপর"—

"—তাহলে সমস্ত ধনী-সমাজটার উপর বল ?"—

—"এর চেয়ে আরও বড় করে ভাবতে পারো, দুনিয়ার যত ধনী আছে তাদের উপরই"—

—"কিন্তু এ পাগলামীতে কি লাভ ?"

—"তোমার কাছে এটা পাগলামী হোতে পারে, বিলাস হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটা আমার সাধনা, আমার আদর্শ"—

—"তুমি পারবে এই ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যকে তুলে দিতে ?"—

—"পারবো কি না জানি নে, তবে তোমাদের মতো অভিনয় করবো না"—দৃঢ়তার সংগে উত্তর দিলে শ্যামল।

—"যেখানে হার মান্‌লো লেনিন্, ট্রট্স্কি, সেখানে তোমার এটুকু আকাশ কুসুম—শ্যামল, তার চেয়ে ......"

কথা শেষ হোতে না হোতে শ্যামল বললে—"তার চেয়ে উপভোগ করি জীবনকে নিত্য নূতন পরিবেশের মধ্যে, থাকুক না আমাদের সমাজ, দেশ চিরকাল পঙ্গু হোয়ে, পরাধীন হোয়ে।—এই বলতে চাওতো ?"—

একটু স্থির হোয়ে শ্যামল ফের বল্‌লে—"আদর্শ কোন দিন মরে না, বনানী তার কোনদিন পরাজয় নেই। লেনিন্ যে সমাজ-ব্যবস্থা, যে রাষ্ট্রের কল্পনা করে গেছেন সেখানে আমরা পৌঁছিতে পারিনি। সে দোষ তাঁর নয়, সে দোষ আমাদের।"

বনানী ও শ্যামল উঠে পড়লো, যেতে যেতে বনানী বললে—"এখনও একটুকুও বদলাওনি, দেখছি"—

—"সেটুকু বোধহয় তোমার চোখের কাছে"—একটু হালকা ভাবে শ্যামল উত্তর দিলে।

বাড়ীর কাছা-কাছি এসে বনানী জিগ্‌গেস্ করলে—"আছোতো কয়েকটা দিন ?

যেতে যেতে শ্যামল উত্তর দিলে—"ঠিক বলতে পারিনে"—বনানী তখন ঢুকে পড়েচে বাড়ীর সামনের বাগানে, পুশ্-গেটের শব্দে ফিরে দাঁড়ালো বনানী। শ্যামল মিশে গেছে তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে।......
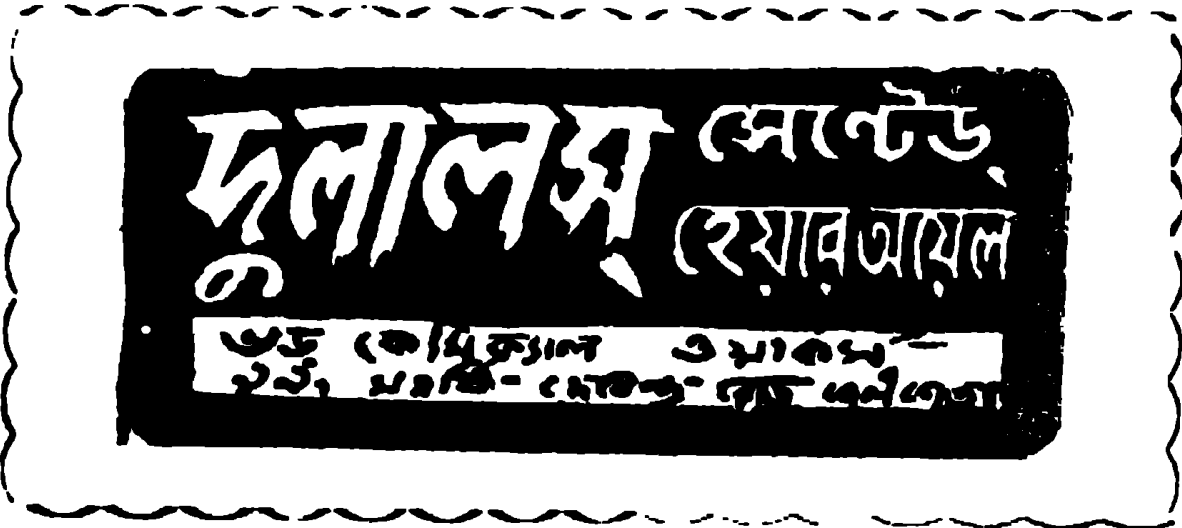
পরের দিন সুপ্তোত্থিত পৃথিবী চারিদিকে মহুয়ার মদির গন্ধ। দূরে অতি দূরে শ্যামায়মান পাহাড়ের শীর্ষে প্রভাতের স্বর্ণ-রেখা।

বনানীর শ্রান্ত মন আর অর্থশূন্য দৃষ্টি। ছোট একটা মেঘ ভেসে গেল জানালার সামনের আকাশটা দিয়ে। বনানী মাথার বালিশটা একবার বুকে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বিছানার এক প্রান্তে......কিছুই তার ভাল লাগছিলো না। উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে। রাত্রের শাড়ীটা নিলে বদলে। অবিন্যস্ত চুলগুলোকে কোন রকমে এঁটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো হরিণধুবড়ীর পথে। পথের মাঝে সহসা থেমে গেলো একটা বাংলোর সামনে। ভব-ঘুরে শ্যামলের ক্ষণিকের আশ্রয়। শ্যামল বসেছিলো একটা বই নিয়ে--নদীর ওপারের ঢেউ হয়তো এসে লেগেছিলো এপারের তটপ্রান্ত......কিন্তু ছিলনা কোন উচ্ছাস।

"এতো সকালে ?" জিগ্‌গেস করলে শ্যামল।

"এলুম, ভিক্ষা করতে ?"—

বিনয়ের সংগে উত্তর দিলে বনানী।

"আমার কাছে ?" শ্যামল বিস্ময়ের মাঝে প্রশ্ন করলে।

—"আর্থিক নয়"—

"তবে ?" ফের প্রশ্ন করলে শ্যামল।

"শুধু তোমার কাজ" বনানা উত্তর দিলে।

"একটু খুলে বলতো ?"—

অনুরোধ করলে শ্যামল।

—"জানি, তোমার অনেক কাজ তবু আজকের দিনটা আমি চাই তোমাকে—আমাদের সংগে ধারাগিরির পথে—"

—"কে কে যাবেন ?"—

—"আমাদের বাড়ীর শুধু আমি আর তোমাদের বাড়ীর তুমি, আর সকলে আমাদের প্রতিবেশী"—

—'বেশ'—

—"তাহলে তৈরী হোয়ে নাও"—

বনানী ও শ্যামল ও বন-পথ। 'ফুলডুবি' পাহাড়ের কাছাকাছি তারা মিল্‌লো বনানীর প্রতিবেশীদের সংগে। নমস্কার জানালো প্রথম শ্যামল তাঁদের উদ্দেশ্যে। বল্‌লে,

—হয়তো হবে আপনাদের অসুবিধে—তবু জানি আমি অতিথি—"

—"আমরা জানতুম, আপনি আসবেন" উত্তর দিলে একটি কিশোরী।

প্রশ্ন কোরবার অবকাশ না দিয়েই বনানী বললে আমি ওঁদের কাছে কাল তোমার কথা বলেছিলাম শ্যামল"—

অনেক দূরে তারা এগিয়ে এসেচে। এই পাহাড়টা পেরলেই একটা উপত্যকা তার পরই "ধারাগিরি"।

শ্যামল যেন একটু গম্ভীর হোয়ে পড়েছিলো মনে হচ্ছিল। এ আবহাওয়া যেন তার সহ্য হচ্ছে না।

এতো বাতাস তবু যেন তার দমবন্ধ হোয়ে আসতে লাগলো। বুকের সব-কটা বোতাম খুলে দিয়ে সে-অপেক্ষা করতে লাগলো সহ-যাত্রীদের জন্য।

বনানী পিছিয়ে পড়েছিলো তার বন্ধুদের সংগে।

শ্যামলের কাছে এসে জিগ্‌গেস করলে—"তুমি আমাদের এড়িয়ে চলছো, কেন বল'তো?"—

—"এড়িয়ে আমি চলিনি, বন, চলচো তোমরা"—

—"তোমার কি কিছুই ভাল লাগচে না?"

—"লাগচে"—ছোট একটা উত্তর পথে চল্‌তে চল্‌তে যেন একটা কাঁকর ছুটে গেলো বেরিয়ে।

—"আমার মনে হচ্ছে, কোমর বেঁধে ছুটা'—শ্যামলের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলে।

—"এতো তোমাদের আনন্দ নয় বন, এ তোমাদের বিলাস"—

—"আমার ভাষায় বলবো এটা উচ্ছ্বাস, প্রাণের পরিচয়"—

—"পরিচয় সত্যি—তবে অগভীর"—

—"কেন?"—

—"ভালোবাসা যদি গভীর হোতো বন, তাহলে আনন্দে আজ ফেটে পড়তে না। এই বনপথের সরল আনন্দের মাঝে ঐ যে জীর্ণ কঙ্কাল সার লোক কটা, তাদের অভাবও চোখে পড়তো। তোমরা ভালবাসনা দেশকে, যতটুকু ভালোবাসো সেটুকু শুধু ভাব-বিলাস"—একটু থাম্‌লো শ্যামল।

পাহাড়ের মাঝামাঝি তারা এসে পড়েচে। নীচের গভীর খাদটার দিকে তাকিয়ে বনানী চম্‌কে উঠলো।

—"ভয় করচে?"—একটু হেসে জিগ্‌গেস্‌ করলে শ্যামল।

—"কোরবে না?"—কথাটা এমন ভাবে বনানী বললে যেন তার বয়েসটা এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কয়েকটি বছর কেটে গেচে।

—"যদি তুমি পড়ে যাও,"—কতকটা হেসে শ্যামল বললে।

—"তাহলে এই পড়ে যাওয়াই শেষ পড়া"—

—"মন্দ কি?"—শ্যামল নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলে।

—"তোমার কাছে জীবনেরও কোন মূল্য নাই?" —

—"যদি সে জীবনের কোন প্রয়োজন না থাকে"—

—"কোন প্রয়োজনই নেই?"—

প্রশ্ন করলে বনানী।

বনানীর বন্ধুরা তখন পাহাড় হোতে নেমে এসেছে উপত্যকার ঝরণার কাছাকাছি ও বাসাডেরা গ্রামের প্রান্তে।

—"ঘাসের নীচে যেতে যাদের এতো ভয় তাদের বেঁচে থাকার কি লাভ? অথচ ঐ খাদেতেই কত লোক প্রতি-নিয়ত মরচে অনাহারে, অযত্নে—অভাবে—

তোমরা হ'লে বিলেতী বেগুন। পৃথিবীর সমস্ত রস শুষে নিয়ে নিজেরা লাল হোয়ে বসে রয়েছ। অথচ তোমাদেরই আত্মীয় প'ড়ে রয়েচে সমাজের গভীর খাদের তলায়। পীড়ন, অত্যাচার, ব্যাধি ঘিরে রয়েচে তাদের নাগ-পাশের মতো।"—

শ্যামল ও বনানী তখন এসে পড়েচে তাদের সংগীদের কাছে।

খোঁপা হোতে দুটো বন-ফুল শ্যামলের হাতে দিয়ে বল্‌লে—"চল একটু খেয়ে নেওয়া যাক, আবার তো অনেকখানি হাঁট্‌তে হবে"—

শ্যামল একটু হাসলে।

বিজন ও তাঁর স্ত্রী এরই মধ্যে টিফিন-কেরিয়ার হোতে খাবার বের ক'রে সাজিয়ে ফেলেছেন। বনানীকে দেরীতে আসতে দেখে রীণা একটু ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে—"কি বনদি তুমি না বলেছিলে তোমাকে আমরা কেউ হারাতে পারবো না হাঁটাতে—এইবার"—

—"দেখিস না তাড়িয়ে দোব তোদের ধারাগিরির কাছে"—

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে জানতে আমার আর বাকী নেই"—রীণা কথা কটা বললে—যেন উড়ে গেলো কতকগুলো তুলো ঝড়ের মুখে।

বনানী হেসে ফেললো রীণার ভাব দেখে। বিজন ও শ্যামল তখন চা খাওয়া প্রায় শেষ ক'রে এনেছে।

"শ্যামল বাবু, একটা কথা জিগগেস করবো, কিছু মনে কোরবেন না তো?"—বিজন বললে—

—"বলুন"—শ্যামল বিজনের প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা ক'রে রইলো।

"বনানীর কাছে শুনেছি, আপনি একনিষ্ঠ দেশ-সেবী। আমরা হয়তো আপনাদের তুলনায় অপাংক্তেয় তবু শ্রদ্ধা হয় আপনাদের দেখে—নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, আপনাদের সংগ-লাভে"—বিজন চা'তে শেষ চুমুকটা দিয়ে দিলে।

"দেশের-সেবায় অপাংক্তেয় কেউ নয় বিজনবাবু। সত্যিই আমি দুঃখ পাই এতে। মা'র পূজায় সকলের সমান অধিকার। তবে কেউ করে সামনে যুদ্ধ, আর কেউ বা জোগায় তাদের রসদ শান্তিময় গৃহ পরিবেশ হোতে—আপনি তাদের দলে"—

—"না, শ্যামলবাবু তাও না। আমি জানি আমি কোথায় পাপ করছি তবু যেন পারি না। মন ছটফট ক'রে ওঠে এগিয়ে যাবার জন্যে কিন্তু শত বন্ধন এসে পথ আগলে দাঁড়ায়"—

—"হয় এটুকু আপনার মনের ক্লীবতা নয় ভাব-বিলাস। বনানীকে আমি সেই কথাই সেদিন বলছিলাম যে, তাদের শ্রেণীর লোকগুলোই আমাদের পরাধীনতাকে রেখেছে কায়েমী করে। এই সামান্য একটু উপত্যকা এই সামান্য বাসাডোরা গ্রাম। কবির চোখ দিয়ে দেখলে কতনা সুন্দর, কিন্তু এর নগ্ন বুভুক্ষু মুমূর্ষু অধিবাসী! এদের সব থেকেও কিছু নেই।"

জগতের সব কিছু হোতে এরা বঞ্চিত : চতুর্দিকের পাহাড় গুলো চায় এদিকে পিষে মেরে ফেলতে। ঠিক তেমনি ভারতের স্বার্থান্ধ দেশদ্রোহী ধনী-সমাজ পরাধীন ক'রে রেখেছে আমাদের সোনার-ভারতকে।" — শ্যামল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—"ভারতের সমস্যা'র সমাধান কি শুধু ধন-শস্যে ?"— বিজন প্রশ্ন করলে।

"চলুন ওঁরা এসে পড়েছেন, আমরা এগুতে থাকি।" উপত্যকা হোতে পাহাড়োরা গ্রামের পথে শ্যামল বললে —"শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বের" কাছে আজ একই সমস্যা আর তার একই সমাধান" —

বনানী ও বিজনের ছোট ভাই চপল এসে ধরে ফেললে শ্যামল ও বিজনকে, শ্যামল তখন বলে চলেছে

"এইতো গ্রাম পেরিয়ে এসে উঠেছি আমরা পাহাড়ের গায়ে। আমরা এই মধ্যে ভুলে গেছি গ্রামকে। ঠিক এমনি ভাবে আমরা ভুলেছি দেশকে, তার সমস্যাকে ও সব-কিছুকে।" —

—"আমাদিকে ভুলিয়ে দিয়েছে, শ্যামল দা"—চপল পাশ থেকে বললে।

বিজন চপলের মুখের দিকে চাইলে।

—"সে দোষ আমাদের, চপল"—

শ্যামল তার দিকে চেয়ে বললে।

চপল চুপ করে রইলো।

—"হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন ·····ঠিক এমনি ভাবে আমাদের দেশের সমস্ত অর্থ গিয়ে পৌঁছেচে বিলেতে আর মাত্র কয়েকটি লোকের হাতে। বিলেতের বণিক আর আমাদের বণিক মিশে গেল—আর পড়ে রইলাম শুধু আমরা সেই আবর্জনার স্তূপে। তাদের হলো অট্টালিকা বাগিচা কত কি ? আর আমাদের শুধু অশ্রুজল। যুগের পর যুগ ভগবানকে জানিয়ে এলাম আমাদের দৈন্য--গণদেবতা শুধু হাসলেন"—

গভীর জঙ্গল পেরিয়ে তখন তারা প্রায় এসে পৌঁছেচে "ধারাগিরির" কাছাকাছি।

রিণা পিছন হোতে বনানীকে উদ্দেশ্য করে বললে— "বনদি, আমাকে হারাতে গিয়ে আবার যেন পা ভেঙ্গোনা। যা-পথ ! এপথে আবার মানুষ আসে"—

—"সে ভয় তোমার নেই রিণা, তোমার বনদি মচ্‌কাবে তবু ভাঙ্গবেনা"—শ্যামল উত্তর দিলে সামনে হোতে পিছন ফিরে।

—"আমরা একেবারে ভেঙ্গে যাইনে বলেই বেঁচে আছি, শ্যামলবাবু' —

বিজনের স্ত্রী বললে।

"এটুকু আমাদের বাঁচা নয়, বৌদি এ আমাদের বেঁচে থাকার ভান করা' — শ্যামল উত্তর দিলে।

—"স্বীকার কোরলুম ভান-করেই বেঁচে আছি, কিন্তু তার ভিতর কি কোন সত্তা নেই ?"—রমা পুনরায় প্রশ্ন করলে।

"কেমন জানেন বৌদি, ঠিক আমাদের হিন্দুসমাজের বিবাহের মতো তার চারিদিকে আনন্দের কোলাহল অথচ তার হাতে না আছে কোন অংশ না আছে সংস্রব। কিংবা রেঁস্তোরাতে খেয়ে যাচ্ছি নানান সুখাদ্য আর খোলা জানালার অন্তরালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক"—

মহুয়া গাছের তলাতেই ধারাগিরির প্রস্রবণের অগভীর খাদ। রিণা ও বনানীকে হাত ধরে নামিয়ে নিলে শ্যামল। সামনেই কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে ঝরে পড়ছে ধারা গিরির ক্ষীণ-ধারা। শ্যামল তন্ময় হোয়ে চেয়ে রইলো।

চমক ভাঙ্গলো বিজনের অনুরোধে—

—"নিন একটু চা খেয়ে নিন শ্যামল বাবু"—

চা'তে চুমুক দিয়ে শ্যামল বললো—"সত্যিই বিস্ময় লাগে বিজনবাবু, এতো কাঠিন্য ভেদ করে তবু অনন্ত কাল ধরে ঝরে পড়চে এই জল ধারা। ঠিক যেন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটী ক্ষীণ-স্রোত বয়ে আনচে সেই তৃতীয় শিখযুদ্ধের পর হোতে। ফরাসী, ইংরাজ, পর্তুগীজদের কত না অত্যাচার তবু মৃত্যুঞ্জয়ী হোয়ে আছে সেই স্রোত আমাদের অন্তরে - তাই আজ আমরা দেখতে পেয়েছি মহাত্মাকে, নেহেরুকে, সুভাষবাবুকে এবং আজাদকে—ফুটে রয়েছে পরাধীন ভারতের বুকে ঠিক এই অমলিন, রক্তরাঙ্গা স্বাধীন অশোক পুষ্প গুচ্ছের মতো—এক গোছা অশোক ফুল তুলে শ্যামল রমার হাতে
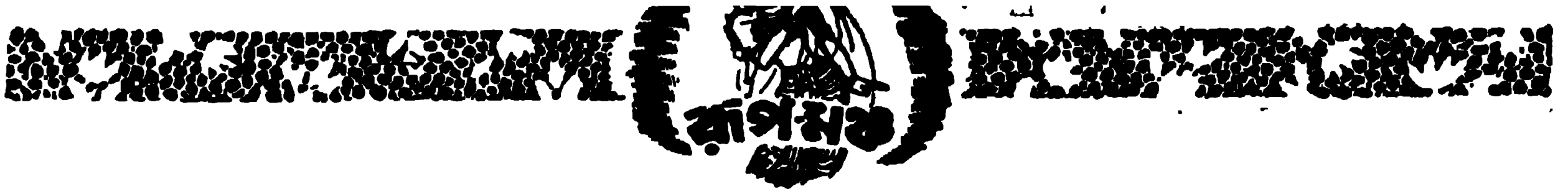
দিলে। দিয়ে বললে—"বৌদি, আপনার সংগে এই আমার প্রথম পরিচয়। আমি রিক্ত, দেবার আমার কিছু নেই যা দিয়ে মনে রাখবো আপনাদের—

তাই বন-ফুল দিয়ে সম্মান করলেম—জানি আমাদের সম্বন্ধ হবে শোকাতীত"—

রমা শ্রদ্ধার সংগে ফুল নিয়ে বললে, "চল ওঠা যাক ঠাকুরপো, আবার তো ফিরতে হবে"—

দুপুর কেটে গেলো বাসাডোরা গ্রামের প্রান্তে ঝরণার ধারে। তারা যখন ফিরে এলো মউভাণ্ড, তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হোয়ে গেচে। শ্যামল পথের মাঝেই তাদের কাছ হোতে ছেড়ে গেছে তার নিজের ডেরায়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে বিজনকে যে, সে নিশ্চয়ই আসবে কাল বিকেলে।

পৃথিবীময় অন্ধকারের মাঝে দেখা যাচ্ছিল মউভাণ্ডের আলোক-মালা। আর দূরে, অতি দূরে পাহাড়ের গায়ে জলমান শুক্‌নো-পাতার শিখা।

কে জানে কে ধরিয়ে দিলে......

তারপরের দিন অভ্যাগত সায়াহ্ন! মুমূর্ষু দিবসের শেষ প্রতীক্ষা! বিজনের বিলাস-ভবন—নাতিদূরে সুবর্ণ-রেখার শুভ্রবালুরেখা—যেন শুচিস্মিতা বিধবার শুভ্র উত্তরীয়! পরপারে পাহাড় ও অরণ্যের অস্পষ্ট অন্ধকার—আকাশতলে আগত রজনীর দুঃখময় ছায়া।

সকলেই এসেছে আসে নাই কেবল বনানী। একটা শূন্য আসন—একটা শূন্য হৃদয়! হয়তো ছিলো একদিন সেখানে প্রেমের সমারোহ নানান রংয়ের সমাবেশ—কিন্তু আজ তা শুধু শূন্য—রিক্ত !!

কে কোথায় রিক্ত, বেদনাহত আমরা কেই বা তার খোঁজ রাখি।" শ্যামল বলে চলেছে—"বিজনবাবু 'জালিয়ানাওয়ালবাগের' অত্যাচারের যেমন প্রয়োজন ছিল কে জানে এই সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার কোন মূল্য নেই বা প্রয়োজন নেই? সেই অত্যাচারের ফলে আমরা চিনতে শিখেছিলাম আমাদের দেশকে, অনুভব করে-ছিলাম মর্মে মর্মে দেশের পরাধীনতাকে। আজ হয়তো বুঝবো এই দাঙ্গার ভিতর দিয়ে যে আমাদের ভারত অবিভাজ্য আমরা একটা প্রকাণ্ড সম্মিলিত মানব-গোষ্ঠী। আমাদের বাঁচতে হলে চাই প্রেম, সত্য ও নিষ্ঠা।"—

"এই বিদ্বেষ ভুলতে পারবে, শ্যামলদা" জিগ্‌গেস করলে চপল।

"যেমন করে ভুলেছি আমরা নাদির শা'র লুণ্ঠন, ইংরাজের প্রবঞ্চনা, মিরজাফরের শঠতা—কাল সব ভুলিয়ে দেবে চপল"—উত্তর দিলে শ্যামল। বিজন একটা মাসিক-পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলে—"অনেক দূরে এসে পড়েছি শ্যামলবাবু—আমাদের ভেতর এসেছে একটা বিশাল পার্থক্য"—

—"অন্ধকারকে আমি ভয় পাইনা বিজনবাবু, জানি তার পিছনে আছে সত্যের আলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ভাগেও সৃষ্টি হয়েছিলো ঠিক এমন একটা ঘন-কুয়াসা—একটা বিশাল পার্থক্য কাটিয়ে এসেচি—এও তেমনি দূর হয়ে যাবে যে দিন আমরা বুঝব আমরা আগে "ভারতীয়" তারপর আমরা, "হিন্দু", "মুসলমান" ও "শিখ"।

ডিসে কয়েকটি খাবার এখনও পড়েছিল। রমা শ্যামলকে খেয়ে নিতে অনুরোধ জানালে।

—"ক্ষমা আমরা করতে পারবো পরস্পরকে, ঠাকুরপো"—প্রশ্ন করলে রমা।

—"নিশ্চয়ই, না হলে এ স্বাধীনতা আমাদের থাকবে-না। জানিনা এ স্বপ্ন আমার কোন দিন সফল হবে কি-না। তবু আমার বিবেক বলে একদিন আমরা ভুলে যাবো এই সংকীর্ণ দলাদলি এবং সেদিন অতি দূরে নয়, যেদিন সমগ্র-ভারতে আসবে একটা প্রবল বিপ্লব—একটা প্রচণ্ড ঝড়—সব মিশে এক হোয়ে যাবে বৌদি। এই অভাব, অভিযোগ অত্যাচারের একদিন প্রতিশোধ নেবে নীচেতলার লোক—সেদিন বিশ্বের কোন শক্তি তাদিকে ঠেকাতে পারবে না"—শ্যামল একটু থামলে, উদ্দীপনায় তার চোখ দুটো লাল হোয়ে গেছে।

—"আর একটা প্রচণ্ড ধ্বংস"—বিজন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—"হয়তো সেটা একদিকে ধ্বংস কিন্তু অন্যদিকে সেটা সৃষ্টি —ভারতের সেদিন নবজন্ম"—শ্যামল বললে।

—"যাক্ এবার উঠি বিজনবাবু, কেবল এই রাতটুকু, কাল সকালেই আবার যেতে হবে টাটানগর"—

—"আবার আসচো' তো ঠাকুরপো" 'রমা প্রশ্ন করলে।

—"হয়তো আসবো বৌদি, শুধু আপনার জন্যে। এতো আড়ম্বরের মাঝেও আপনি নিস্পৃহ সেইজন্যেই অন্তর হোতে শ্রদ্ধা করি আপনাকে"—

—"যাক আর পণ্ডিতিতে কাজ নেই চল দিকি শ্যামলদা একবার বনিদির খোঁজটা নিয়ে আসি"—রিণি একরকম জোর করেই শ্যামলকে ধরে নিয়ে গেলো। বিজন ও রমা একটু হাসলে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ সূর্য-রশ্মি। বনানী নিজের ঘরে বসে রূপ-মঞ্চের পূজা সংখ্যাটার পাতা উল্টাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল কতক্ষণ পূর্বেও তার মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। মনের ভাবের স্রোতে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার চিহ্ন এখনও চোখের তটরেখা হতে একেবারে মুছে যায়নি।

"বেশ আক্কেল তো তোমার বনিদি, শ্যামলদাকে আসতে বলে তুমিই গেলেনা"—রিণি একটু ঝঙ্কার দিয়েই কথাটা বলল।

"শরীরটা খুব খারাপ ছিলো, রিণি, সেজন্যেই যেতে পারেনি" ভারী গলায় বনানী উত্তর দিল।

শ্যামল বনানীর মুখের ভাব দেখেই কতকটা আঁচ করে নিয়েছিল যে, এসুখটা তার শরীরের নয়, অসুখটা মনের।

তেমনি ভারী গলায় শ্যামলকে বসতে বলে বনানী অত্যন্ত কাতরভাবে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁরে, বৌদি, খুব রাগ করেচে আমার উপর -না?"—

—"না রাগ করবে কেন, তোমার প্রশংসা করলে"—পরমাত্মীয়ের মতো রিণি জোর করে কথাটা বলল।

বনানী বুকের ব্যথাটা হেসে হালকা করবার চেষ্টা করল মাত্র।

—"যাক্ শ্যামলদা, টাটানগর হোতে ফেরবার পথে এসো. শ্যামলকে প্রণাম করে রিণি চলে গেল—বাতাসের ভরে উড়ে যাওয়া রংঙীন গোলাপের পাপড়ীর মতো।

—"তারপর কি ব্যাপার বলতো, বন্"—জিজ্ঞেস করলে শ্যামল।

—"এমন কিছুই না"—হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে বনানী।

—"তবু?"—প্রশ্ন করলে শ্যামল।

—"আজ যখন তুমি এসেচ তখন সত্যিই বলবো, তবে একটা প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দেবে?"—

—"অঙ্গীকারের কোন প্রয়োজন নেই—বন্। মনের সত্যকে ঢাকবার জন্যে মিথ্যের আশ্রয় কোনদিনই নোবো না—এতো তুমি জানো"—শ্যামল বললে।

—"সত্যই কি তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারোনা"—বনানী প্রশ্ন করলে।

—"না, বন"—শ্যামল উত্তর দিল।

—"কেন?"—বনানী প্রশ্ন করলে—

—"সে তুমি বুঝবে না,"

—"আমার এতদিনের স্বপ্ন—স্বপ্নই থাকবে?"

"ওটা, তোমার দুঃস্বপ্ন"—শ্যামল দৃঢ়তার সংগে বললে।

—"আমাদের হৃদয়ও তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। স্বপ্ন দেখে আমাদের দিন কাটে না বলেই, ছেলেবেলা হোতে আমরা ছোট বড় পুতুল নিয়ে সংসার পাতি"—বনানী অত্যন্ত বেদনার সংগে কথা কয়টা বললে।

—"সত্যিই দুঃখ হয় বন্, তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে—সামান্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমাকে ধরে রাখবার জন্যে এত চেষ্টা করে চলেছ!"

—"তোমাকে আমি ছোট করতে চাইনি—শ্যামল"—মুখ না তুলেই বনানী উত্তর দিলে।

—"আমি তোমার কাছে ছোট কি বড় তাতে কিছু আসে যায় না, বন। আসে যায় সেখানেই যেখানে তুমি নিজেকে ঠকালে—সংসারের কেনা-বেচায় লাভ-ক্ষতির জ্ঞান তোমার খুবই কম"—কথা কয়টা বলে শ্যামল একটু হাসলে।

হারের লকেটটা বাঁ-হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বনানী প্রশ্ন

"ভুল করলে আমাকে চিনতে, ভাবাবেগের প্রবণতায়।"—
—"যদি ভুলই করে থাকি, সে দোষ কি তোমার নয়?"—
"দোষ হয়তো তুমি আমাকে দিতে পারো, কিন্তু আমি নির্দোষ, আমার মনে তোমাকে নিজের করে পাবার অভিলাস কোন দিনই জন্মায় নি। তার ছিলো দুটো কারণ, একটা সেদিন সন্ধ্যে বেলা বলেচি, আর একটী হলো—
তোমার ও আমার পথ ভিন্ন। তোমার কাছে বড় সংসার আমার কাছে বড় রাষ্ট্র, আমার দেশ ও তার নানান সমস্যা। তুমি চাও যা আছে তাতে চুনকাম করে সংস্কার করতে আর আমি চাই প্রাচীন পৃথিবীর যা-কিছু জীর্ণ শীর্ণ তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে, নূতন করে গড়ে তুলতে। তুমি চাও শান্তিময় গৃহকোণে আমাকে আবদ্ধ রাখতে আর আমি চাই সেই গৃহপ্রাচীর ভেংগে একটা প্রচণ্ড বিপ্লবের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে।—
তোমার কোন কাজেইতো আমি বাধা দিতে চাইনে।
—বনানী কথার মাঝে বল্লে।
"যাক্ এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বোলবার ইচ্ছে আমার নেই। অপ্রিয় হোলেও আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আমার বন্ধু না হোতে পারো শত্রু হবার চেষ্টা করোনা"—শ্যামল বেরিয়ে গেল। বনানীর মনে হতে লাগল পৃথিবীতে বোধ হয় সে ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। এমনকি গাছপালা পর্যন্ত যেন কোথায় কর্পূরের মতো এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কে, সি, দে প্রডাকসনের 'পূরবী' চিত্রে কৃষ্ণচন্দ্র, তুলসী ও সন্ধ্যা।

ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

★

দেশ স্বাধীন হোলো। হিন্দু—মুসলমান ভাইয়েরা মহাত্মার বাণী মন্থন করে "মিলনের সুধা রস" আকণ্ঠ পান করলো। পূর্ব হিংসা-বিদ্বেষ তড়িতের মত ভুলে গিয়ে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি সুরু করে দিলে তাদের নিজ নিজ ঘরে। কিন্তু এক অপরিসিম বেদনার ধ্বনি ধ্বনিত হোলো এই ১৫ই আগষ্ট, ৪৭ সালে মদন বড়াল লেনে এক শান্তিপূর্ণ পরিবারের অন্তর থেকে যে, তারা এই হিন্দু মুসলমানের বিষ উদ্গারণ ফলে হারালো তাদেরই এক জনকে যে হচ্ছে আমাদের বাংলার মণি ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ।

খেলার মাঠে প্রথম পরিচয় পাই তার অদ্ভুত পারদর্শিতার। তখনি মনে হয়েছিল এ ব্যক্তি সাধারণ নহে। ফলও ফলতে সুরু করলো। ১৯১৫ সালে হেয়ার স্কুলে যখন হরেন ও আমি এক স্কুলেই সহপাঠি ছিলাম হঠাৎ হরেন ঘোষের নাম ছড়িয়ে পড়লো স্কুলময়। কৌতূহলতা বশতঃ কি ব্যাপার সন্ধান করে জানা গেল যে, হরেন আমাদের স্কুলে প্রথম এক ম্যাগাজিন বাহির করেচে। সম্পাদক নিজেই। বইখানি অল্প সময়ের মধ্যে সকলেরই এক একখানা করে হাতে এসে পড়লো। হেডমাষ্টার ঈশানবাবু তারিফ করলেন। অদ্ভুত ছেলে বটে। হরেন যে একাধারে খেলোয়াড়, সাহিত্যিক—এ ছিল স্বপ্নাতীত। এই সুরু হোলো তার জয় যাত্রার প্রথম সোপান।

অধুনা প্রত্যেক কলেজ, স্কুল মাসে মাসে পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। আমরা সেই হিসাবে হরেন কে অগ্রদূত রূপে গণ্য করতে পারি। যতদূর স্মরণে আসছে যে, হরেন কলেজে পড়ার কালে একখানি উপন্যাস লেখে এবং তাহা তখনকার দিনে আট আনা সিরিজ রূপে প্রকাশিত হয়।

স্বনামধন্য নিউ থিয়েটার্সের মালিক বীরেন সরকার মহাশয় হরেন ঘোষের উৎসাহে ও তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে সিনেমা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। "বুকের বোঝা" চিত্র তাঁর প্রমাণ দেবে।

হরেন ঘোষ তারপর মনোনিয়োগ করলেন নৃত্য কলার উন্নতি সাধনে। তাঁর প্রধান দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের এই উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা কি ভাবে পরিবেশন করলে ভারতবাসীরা আনন্দ পান সেদিকে। অবশ্য যখন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নৃত্যবিদ উদয়শঙ্কর ইউরোপ হতে দেশে আসেন নি হরেনকে তাঁর সুদক্ষ কর্মকুশলতার কথা শুনে তাঁকেই ব্যবস্থাপনার ভার দেন এবং হরেন সেই ভার সুযোগ্য ভাবে বহন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তারপর হরেন দেশ বিদেশে ঘুরে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের নানা বড় বড় সহরে বড় লাট সাহেবের পৌরহিত্যে—বহু নৃত্যকলার প্রদর্শন করেন ও সকল সময়েই সুনাম অর্জন করেন। তিনি ইউরোপে, লণ্ডনে সারাইকেলার রাজ পরিবার সহ নৃত্যকলায় অদ্ভুত দল গঠন করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ও ভারতবর্ষে ফিরে আসেন সুখ্যাতির ডালি ভরে নিয়ে। দেশময় ধ্বনিত হোলো হরেনের জয়ধ্বনি। ভারতবর্ষে বহু উচ্চ রঙ্গালয়ে তাঁর নৃত্যকলার প্রদশন ব্যবস্থা তিনি করতেন। এই মহাযুদ্ধের ভিতর ডাক পড়েছিল হরেনেরই। ফৌজ বিভাগে middle East এ তিনিই তাঁর দল নিয়ে সৈনিকদের নির্মম বর্বরতা দগ্ধময় জীবনের ভিতরও আনন্দ এনে দিয়েছিলেন। বর্তমান ইউ, পির—গভর্ণর ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই হরেন ঘোষকেই Inter Asian Relation Conference-এ আমন্ত্রণ জানান। দেশ বিদেশের বড় বড় গণ্য মান্য ব্যক্তিদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল তার মাত্র ৫০।৫১। নির্মম নিয়তি তাঁকে এমন অসময়ে টেনে নিল যে দেশপ্রেমিক হরেন ভারতের শৃঙ্খল মুক্তি দেখবার অবসরও পেলে না। রূপমঞ্চ আজ তাঁর সম্মান দেখাচ্ছেন এ অতি আনন্দের কথা।

HIMKANAN
হিমকানন
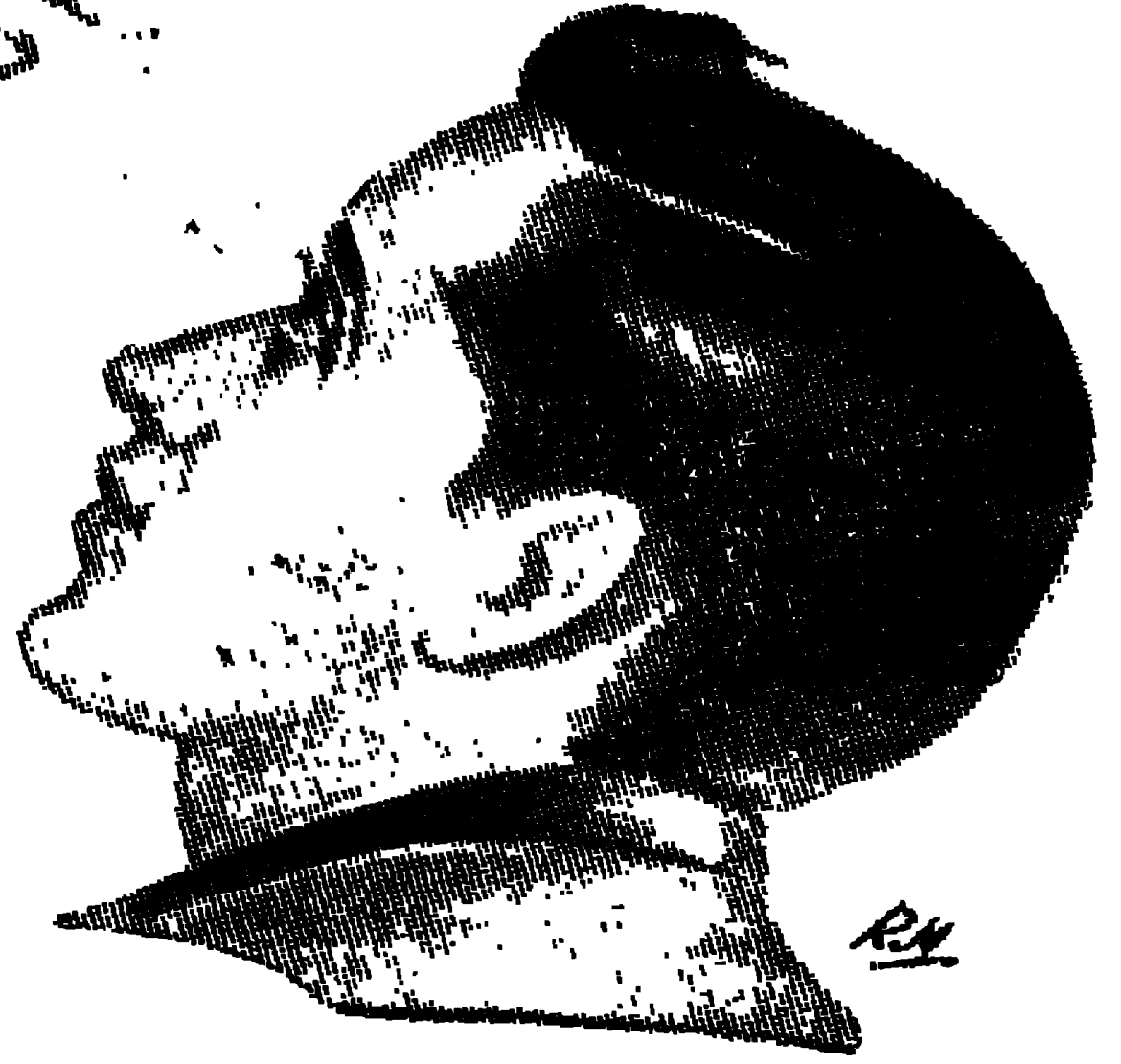
বাংলা সবাক ছায়াছবির প্রথম প্রকাশ

(৬)

সংগ্রাহক : শ্রীস্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

★

১৯৪৪ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল

১৩১। **অল ষ্টার ট্রাজেডি★** গ্রীণ পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—১৮-২-৪৪ : চিত্রগৃহ শ্রী : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র : পরিচালনা শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় : ভূমিকায়—জীবেন, তুলসী, বোকেন, শ্যামসুন্দর, সাবিত্রী, রেবা।

২৩২। **উদয়ের পথে** * * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—২-৯-৪৪ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীজ্যোতির্ময় রায় : চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল রায় : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল : ভূমিকায়—বিশ্বনাথ, রাধামোহন, দেবী, বিনতা, রেখা, দেববালা।

২৩৩। **গোঁজামিল★** রূপকথা

প্রথম আরম্ভ—১৮-২-৪৪ : চিত্রগৃহ—শ্রী : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীখগেন দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—নবদ্বীপ, দীপ্তেন্দ্র, পশুপতি, জীবন, মনোরমা, অরুণা, রমা।

২৩৪। **চাঁদের কলঙ্ক** * * *

প্রথম আরম্ভ—১৯-৫-৪৪ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : প্রযোজনা, পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—বড়ুয়া, ইন্দু, রবি, ললিত, যমুনা, পূর্ণিমা, দেববালা।

২৩৫। **ছদ্মবেশী** * * * ডিলুক্স পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—১৫-১-৪৪ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী—শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ শম্ভু সিং : সংগীত—শ্রীশচীন দেব বর্মন : ভূমিকায়—জহর, ছবি, শৈলেন, ইন্দু, মিহির, রবি, পদ্মা, শান্তি, সন্ধ্যা, মীরা।

২৩৬। **নন্দিতা** * * * রূপশ্রী

প্রথম আরম্ভ—১৬-৯-৪৪ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূরবী, পূর্ণ, আলেয়া : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, রবীন, শৈলেন, অমর, জীবেন, কানু, মলিনা, পূর্ণিমা, রাণীবালা, রেবা।

২৩৭। **প্রতিকার** * * * নিউ সেঞ্চুরী

প্রথম আরম্ভ—১১-১১-৪৪ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী ও গান—শ্রীপ্রেমেন মিত্র : পরিচালনা—শ্রীছবি বিশ্বাস : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া : সংগীত—শ্রীশচীন দেববর্মণ : ভূমিকায়—ছবি, শৈলেন, রবি, ফণী, বেচু, কানু, রেণুকা, রেবা, বন্দনা, বরুণা।

২৩৮। **বিরিঞ্চি বাবা★** এ্যালায়েড ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১৮-২-৪৪ : চিত্রগৃহ—শ্রী : কাহিনী—শ্রীপরশুরাম : পরিচালনা শ্রীমানু সেন : সংগীত—শ্রীকালী সেন : ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, অর্দ্ধেন্দু, জীবেন, কানু, শ্যাম, নৃপতি, পূর্ণিমা, রেবা।

২৩৯। **বিদেশিনী** * * এম, পি, প্রোডাকসন

প্রথম আরম্ভ—১৯-৫-৪৪ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীপ্রেমেন মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—ধীরাজ, শৈলেন, রবি, জীবেন, কানু, নৃপতি, আশু, শ্যাম, কানন, প্রভা, শান্তা, ছায়া।

২৪০। **মাটীর ঘর** * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

প্রথম আরম্ভ—২৯-৪-৪৪ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : কাহিনী—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য : পরিচালনা—শ্রীহরিচরণ ভঞ্জ।

আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া : সংগীত—শ্রীশচীন দেববর্মণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, জহর, রতীন, রবীন, মলিনা, পদ্মা, জ্যোৎস্না।

২৪১। **শেষরক্ষা** * * * চিত্র ভারতী
প্রথম আরম্ভ—১৫-১২-৪৪ : চিত্রগৃহ রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীঅনাদি দস্তিদার : ভূমিকায় অমর, জীবেন, রতীন, মনোরঞ্জন, বিপিন, পদ্মা, বিজয়া, প্রভা, রেবা।

২৪২। **সমাজ** * * * নিউ টকীজ
প্রথম আরম্ভ—২৫-৮-৪৪ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীহেমন্ত গুপ্ত : আলোক-শিল্পী—শ্রীশচীন দাশগুপ্ত : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমান্না লাডিয়া : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—জহর, ভূমেন, ফণী, শ্যাম, নরেশ, বেচু, ছায়া, রেণুকা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী।

২৪৩। **সন্ধি** * * * চিত্ররূপা
প্রথম আরম্ভ—২৬-১০-৪৪ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীঅপূর্ব মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীঅনিল বাগ্‌চি : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, বিমান, ফণী, শরৎ, বিপিন, মৃণাল, হরিধন, সুমিত্রা, দেববালা।

২৪৪। **সন্ধ্যা** * * * আরোরা ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২৯-৯-৪৪ : চিত্রগৃহ—উত্তরা : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীমণি ঘোষ : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীশম্ভু সিং : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, ইন্দু, শ্যাম, সন্তোষ, বিজয়া, মীরা, পূর্ণিমা, স্মৃতি।

১৯৪৫ সালের সবাক চিত্রের তালিকা বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল।

২৪৫। **অভিনয় নয়** * * * কালী ফিল্ম
প্রথম আরম্ভ—২-৩-৪৫ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীপরিতোষ বসু : সংগীত—শ্রীগিরীন চক্রবর্তী : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ইন্দু, দেবী, শৈলেন, অমল, পশুপতি, কানু, সন্তোষ, মলিনা, রেণুকা, পূর্ণিমা, সুপ্রভা।

২৪৬। **কতদূর** * * * এস, ডি, প্রোডাকসন্স
প্রথম আরম্ভ—২-২-৪৫ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী ও গান—শ্রীপ্রেমেন মিত্র : পরিচালনা—শ্রীচিত্ত বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ শম্ভু সিং : সংগীত—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—জহর, ধীরাজ, শৈলেন, কানু, জীবেন, শ্যাম, নৃপতি মলিনা, পূর্ণিমা, প্রভা, রেবা।

২৪৭। **কলঙ্কিনী** * * * ইন্দ্রপুরী
প্রথম আরম্ভ—১২-১০-৪৫ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী,

ছবিঘর : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীর বসু : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত – শ্রীশচীন দেববর্মণ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, ধীরাজ, রেণুকা, সাবিত্রী, পূর্ণিমা, শতদল, ঊষা, নমিতা।

২৪৮। **গৃহলক্ষ্মী** * * শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—১৪-১২-৪৫ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী – নিজস্ব : পরিচালনা – শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীবীরেন দে : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীপুরুষোত্তম গোয়েঙ্কা : সংগীত—শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, রতীন, মিহির, তুলসী, কানু, অজিত, চন্দ্রাবতী, পূর্ণিমা, পদ্মা।

২৪৯। **দোটানা** * * * ইউরেকা পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—৬-৪-৪৫ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূরবী : পরিচালনা -- শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতুল ঘোষ : আলোক-শিল্পী —শ্রীসুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত —শ্রীকালীপদ সেন : ভূমিকায়—জহর, রতীন, শৈলেন, রবি, শ্যাম, কানু, লতিকা, রমা, প্রভা, নিভাননী।

২৫০। **দুইপুরুষ** * * * নিউ থিয়েটার্স প্রথম আরম্ভ—৩০-৮-৩৫ : চিত্রগৃহ—চিত্রা, রূপবাণী : কাহিনী – শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা ও সম্পাদনা—শ্রীসুবোধ মিত্র : আলোকশিল্পী—মিঃ ইউসুফ মুলজী, শ্রীসুধীন মজুমদার : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু : সংগীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, নরেশ, জহর, শৈলেন, চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, লতিকা, রেণু।

২৫১। **পথ বেঁধে দিল** * * ডিলুক্স পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—১২-৫-৪৫ : চিত্রগৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী ও পরিচালনা –শ্রীপ্রেমেন মিত্র : আলোক-শিল্পী— শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত— শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন মিত্র : ভূমিকায় – ছবি, জহর, রবি, তুলসী, জীবেন, কৃষ্ণধন, কানন, পূর্ণিমা প্রভা।

২৫২। **বন্দিতা** * * * কে, বি, পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—১২-৫-৪৫ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীহেমন্ত গুপ্ত : পরিচালনা— শ্রীহেমন্ত গুপ্ত, শ্রীরাজেন চৌধুরী : আলোক-শিল্পী— শ্রীঅজয় কর : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত— শ্রীতিমির বরণ, শ্রীহিমাংশু দত্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, ছবি, জহর, রবীন, নরেশ, ফণী, ছায়া, মণিকা, সুপ্রভা, প্রভা।

২৫৩। **ভাবীকাল** * * কে, বি, পিকচার্স প্রথম আরম্ভ—১৪-১১-৪৫ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীপ্রমেন মিত্র : পরিচালনা, চিত্রনাট্য —শ্রীনীরেন লাহিড়ী : আলোক শিল্পী—শ্রীঅজয় কর : শব্দযন্ত্রী—শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীকমল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—দেবী, অমর, রতীন, মিহির, রবীন, জহর, রবি, ফণী, কানু, চন্দ্রাবতী, সিপ্রা, মীরা।

২৫৪। **মানে না মানা** * * নিউ সেঞ্চুরী প্রথম আরম্ভ—১-৯-৪৫ : চিত্র গৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ, কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী শ্রীসুধীর বসু : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে, ডি, ইরাণী : সংগীত—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র জহর, ফণী, ধীরাজ, তুলসী, মলিনা, রেণুকা, প্রভা সাবিত্রী।

১৯৪৬ সালের সবাক চিত্রের তালিকা
বর্ণনানুসারে দেওয়া হ'ল

২৫৫। **এই তো জীবন** * * চিত্রবাণী প্রথম আরম্ভ—৩১-৫-৪৬ : চিত্র গৃহ—শ্রী ও উজ্জ্বলা : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা— শ্রীদীরেশ ঘোষ, শ্রীমানু সেন : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিশু চক্রবর্তী, শ্রীঅনিল গুপ্ত : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীসিদ্ধি নাগ : সংগীত—শ্রীকালীপদ সেন, শ্রীগোপেন মল্লিক : ভূমিকায়— জহর, ইন্দু, জীবেন, তুলসী, হরিধন বিপিন, শ্যাম, সুনন্দা, প্রভা, সীতা, অমিতা, মুকুলজ্যোতি।

২১৬। **ভুমি আর আমি** * ডি ল্যুক্স পিক্চার্স প্রথম আরম্ভ—১৪-১২-৪৬ : চিত্র গৃহ—উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান – শ্রীশৈলেন রায় : পরিচালনা—শ্রীঅপূর্ব মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি লাহা : শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীযতীন দত্ত : সংগীত—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকায়—ছবি, জহর, পরেশ, কানন, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা।
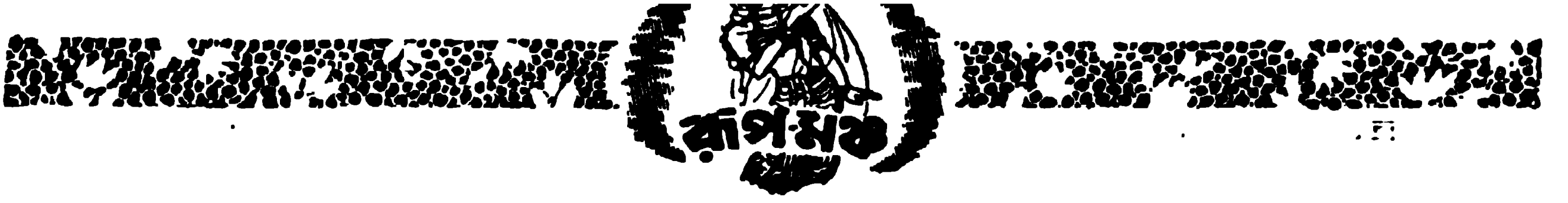
২৫৭। **দুঃখে যাদের জীবন গড়া** : ছায়ানট পিক্‌চার্স

প্রথম আরম্ভ—২০-১২-৪৬ : চিত্র গৃহ—শ্রী, রূপম, রূপালী : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীহিমাদ্রি চৌধুরী : আলোক শিল্পী—সুরেশ দাস : শব্দ-যন্ত্রী—শিশির চাটুজ্জে : সংগীত—আবদুল আহাদ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, জহর, নবদ্বীপ, কানু, কিরণকুমার, ভুজঙ্গ, রেণুকা, প্রভা, লীলা, রাজলক্ষ্মী, বেলা, হেনা।

২৫৮। **নতুন বৌ** * * * ইষ্টার্ণ টকীজ

প্রথম আরম্ভ—১৯-৭-৪৬ : চিত্র গৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার : আলোক-শিল্পী—শ্রীশচীন দাশগুপ্ত : শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ জে ডি, ইরাণী। শ্রীগৌর দাস : সংগীত—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, দেবী জহর, তুলসী, কানু, জীবেন, প্রভা, রাণীবালা, রেণুকা, সন্ধ্যা।

২৫৯। **নিবেদিতা** * * চিত্র ভারতী

প্রথম আরম্ভ—১০-৮-৪৬ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল : আলোক-শিল্পী—শ্রীসুধীর বসু : সংগীত—শ্রীদক্ষিণামোহন ঠাকুর। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, ছবি, ইন্দু, সন্তোষ, তুলসী, কমল, কানু, সুপ্রভা, মলিনা, রেণুকা, প্রভা রেবা।

২৬০। **পথের সাথী** * * অরোরা ফিল্ম

প্রথম আরম্ভ—১-৩-৪৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী, উজ্জ্বলা : কাহিনী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী : পরিচালনা—শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র : সংগীত শ্রীদুর্গা সেন : নির্মাণ—অরোরার কর্মিবৃন্দ। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, নরেশ, ইন্দু, জহর, মিহির, রেণুকা, সন্ধ্যা, লীলা, রাজলক্ষ্মী, বেলা।

২৬১। **প্রতিমা** * মুভি টেকনিক সোসাইটী

প্রথম আরম্ভ—২১-১১-৪৬ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীখগেন রায় : আলোক শিল্পী—নিমাই ঘোষ : শব্দ যন্ত্রী—নৃপেন পাল : সংগীত—শ্রীসমরেশ চৌধুরী ভূমিকায়—অজিত, পূর্ণেন্দু, ফণী, হরিধন, তুলসী, দেবু, সিপ্রা, প্রমীলা, আরতি।

২৬২। **বন্দেমাতরম্** * * চলন্তিকা

প্রথম আরম্ভ—২৮-৯-৪৬ : চিত্র গৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : শব্দযন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু : সংগীত—শ্রীসুকৃতি সেন : ভূমিকায়—ছবি, জহর, নির্মলেন্দু, অমর, ইন্দু, তুলসী, মলিনা, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, শকুন্তলা।

২৬৩। **বিরাজ বৌ** * * নিউ থিয়েটার্স

প্রথম আরম্ভ—৫-৭-৪৬ : চিত্রগৃহ—চিত্রা, রূপালী : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীঅমর মল্লিক : আলোকশিল্পী—শ্রীশৈলেন বসু : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় : সংগীত—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল : ভূমিকায়—ছবি, সিধু, দেবী, সুনন্দা বন্দনা।

২৬৪। **মাতৃহারা** * * সিনে প্রোডিউসার্স

প্রথম আরম্ভ—৬-১২-৪৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী : কাহিনী—শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীসুধীর বসু : শব্দযন্ত্রী শ্রীসমর বসু : সংগীত—শ্রীশচীন দেব বর্মণ : ভূমিকায়—জহর, কমল, সন্তোষ, মঙ্গল, ফণী, কানু, মলিনা প্রমীলা, প্রভা সুরুচী।

২৬৭। **সংগ্রাম** * * * মডার্ণ টকীজ

প্রথম আরম্ভ—২৬-৭-৪৬ : চিত্রগৃহ—রূপবাণী, উজ্জ্বলা কাহিনী—শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য : পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—শ্রীঅর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীপ্রবোধ দাস শ্রীপ্রভাত ঘোষ : শব্দ যন্ত্রী—শ্রীমণি বসু, শ্রীক্ষেত্র ভট্টাচার্য সংগীত—শ্রীনিতাই মতিলাল : ভূমিকায়—ছবি, বিপিন, কমল, ভানু, জীবেন, রবি, মলিনা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, রেবা।

২৬৮। **সাত নম্বর বাড়ী** * এম, পি, প্রোডাকসন্স

প্রথম আরম্ভ—১১-৪-৪৬ : চিত্র গৃহ—উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ

২৬৫। **মৌচাকে ঢিল** * রূপশ্রী

প্রথম আরম্ভ—৪-১-৪৬ : চিত্রগৃহ—শ্রী, পূর্ণ, আলেয়া

২৬৬। **শান্তি** * * চিত্ররূপা

প্রথম আরম্ভ—২৪-৫-৪৬ : চিত্রগৃহ—মিনার, বিজলী, ছবিঘর : কাহিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মালয় অভিযান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস

★

১৯৪৬-এর ২২শে জানুয়ারী—সিগামত পৌছলাম—সিগামত্ ছোট সহর—খাবার খুবই কষ্ট হলো সেখানে। অনেক জাপানী কয়েদীদের সংগে দেখা হলো—কি বলিষ্ঠ তাদের দেহের গঠন—ভাংগা ভাংগা ইংরাজীতে বল্‌ল—"আমরা কি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি?—চন্দ্রবোসের বাড়ী জানি কি ইত্যাদি।" চন্দ্রবোস অর্থাৎ নেতাজীর সম্বন্ধে তাদের অতি উচ্চ ধারণা। তাদের ধারণা, আমরা যখন চন্দ্রবোসের দেশের লোক—তখন আমরাও স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারি—তারা জাপানের কোন এক বিখ্যাত কলেজের ছাত্র—দেশের স্বাধীনতার জন্য সৈনিক বিভাগে যোগ দিয়েছে এবং প্রথমে জয়ী হয়েছিল তারা যুদ্ধে—কিন্তু অদৃষ্ট দোষে অর্থাৎ সূর্যদেব তাদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন তাই তাদের আজ এই দুর্দশা। তারা কবে দেশে ফিরবে জানে না। তবে তাদের বিশ্বাস তারা শীঘ্রই দেশে ফিরবে এবং আবার স্বাধীন হবে। যদি তারা স্বাধীনতা ফিরে পায় তবে একবার ভারতে আসবে। এই সব বন্দীরা রাস্তা তৈরী করে—জংগল পরিষ্কার করে—মিলিটারী কেম্পের সব কাজই তারা করে। এরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমী। সকাল ৮টা হতে বেলা ৫টা অবধি এরা কাজ করে। দুই দিন সিগামত থাকবার পর রওনা হলাম—মালাক্কার দিকে। ৮৫ মাইল রাস্তা সিগামত হতে মালাক্কা। মালাক্কা—অতি পুরাতন সহর মালয়ের। সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই ছোট সহরটী সত্যি দেখবার মত। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। মালাক্কা পোর্ট মালয়ের মধ্যে বেশ বড় পোর্ট। এখান হতে বহু নারকেল, খেজুর, নারিকেল তৈল—বার্মায় এবং ভারতে রপ্তানী করা হয়। মালাক্কায় অনেক মাদ্রাজী লোক আছে। এখানকার ঘরগুলি দেখ্‌লে মনে পড়ে মাদ্রাজের কথা—বেশ লম্বা টালিসেড্

'চন্দ্রশেখর' চিত্রে দলনী বিবির ভূমিকায় ভারতী

দেওয়া। খুবই নীচ ধরণের এখানে একটা বড় পুরাতন ফোর্ট আছে—ছোট টিলার উপর অবস্থিত। কেউ বলে—গ্রীকরা যখন বাণিজ্য করতে এসেছিল ঐ দেশে—তখন শত্রুর হাত হতে ধনরত্ন রক্ষা করবার জন্য ঐ ফোর্ট নির্মাণ করেছিল—আজ তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। ২৭শে জানুয়ারী বেলা ১২টায় রওনা হলাম টেম্‌পিন্। মালাক্কা হতে টেম্‌পিন্ ৩৮ মাইল—চারিদিকে পাহাড় ঘেরা ছোট সহর—দেখবার মত কিছুই নাই এখানে। পরের দিন রওনা হলাম সিরাম বাং—৩১ মাইল রাস্তা—সিরামবাং বেশ বড় সহর মালয়ের। এখানে পরিচয় হলো একজন বাংগালী ভদ্রলোকের সংগে। ইনি চট্টগ্রামের লোক—ওর কাছ হতে অনেক বিষয় জান্‌তে পারলাম নেতাজীর সম্বন্ধে। ওখানে জাভা রোডে বালসেনার অফিস ছিল। নেতাজীর উপস্থিতিতে ওখানের বড় মাঠে কুচ্ কাওয়াজ হয়েছিল। নেতাজী ৫।৬ বার ওখানে এসেছিলেন। এবং সমস্ত ভারতবাসীকে জাপানীর অত্যাচার হতে রক্ষা করেছিলেন। জাপানীরা যথেচ্ছা ব্যবহার করত ভারতীয়দের সংগে। চীনাদেরত দুর্দশার সীমাই ছিল না। চিয়াং কাইসের বংশধরদের প্রথমে মৃত্যু
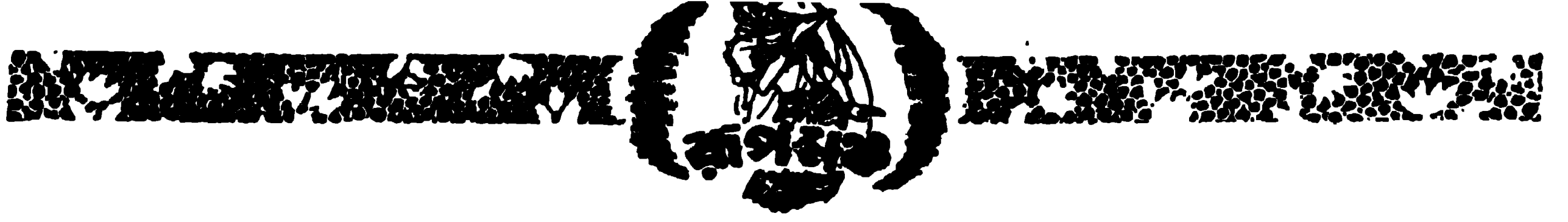
—তারপর মেয়েদের ওপর অত্যাচার—যা ভাবায় ব্যক্ত করা যায় না। তবে জাপানীদের আমলে চুরি ডাকাতি ছিলনা—কারণ কোন বাড়ীতে চুরি হলে—তার আসে পাশের অথবা যাকে যাকে সন্দেহ করা হতো তাদের ধরে এনে মাথা কেটে ঝুলিয়ে রাখতো লাইটপোষ্টের সংগে—নীচে লিখে রাখত, চুরির শাস্তি। যদিও এটা বর্বরোচিত প্রথা আধুনিক যুগে, তবুও এই প্রথা যদি প্রযোজ্য হতো দাংগা-কারী গুণ্ডার সর্দারদের প্রতি—তবে হয়ত ২।১ দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেত দেশের গুণ্ডার অত্যাচার। ৩রা ফেব্রুয়ারী রওনা হলাম কুয়ালালামপুর। এই সহরটী বেশ বড় সহর—এখানে সব নিউ, হেপী ওয়ালর্ড্ আছে। বহু হোটেল, দোকান আছে। রাস্তা ঘাট খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

কোয়ালালামপুর হতে ৩।৪ মাইল দূরে "বাতু কেপ" নামে একটী গুহা আছে—একদিন দেখতে গেলাম। জাপানীরা ওখানে নাকি অনেক গোলাবারুদ রাখত লুকিয়ে। এখান হতে একটী সোনার খনি দেখা যায়—সেখানে তখন দেখতে যাওয়ার আদেশ ছিলনা। আমরা প্রায় এক মাস এখানে ছিলাম এবং নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট গ্রাম গুলি প্রায়ই দেখতে যেতাম—চীনারা প্রায় সবই দখল করে বসে আছে সহরের। সহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনেক গুলি হোটেল। তবে এই সব হোটেলের বিশেষত্ব, এখানে খাবার ব্যবস্থা নেই, শুধু থাকবার বন্দোবস্ত আছে। এই সব হোটেলের মালিক বেশীর ভাগই চীনা এবং প্রত্যেক হোটেলের দরজায় ৭।৮ জন করে চীনা ও মালয়ান সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এই সকল হোটেলে মিলিটারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ১০ই ফেব্রুয়ারী রওনা হলাম ডুসাংতুয়া, সালফার, ওয়াটার দেখতে—ডুসাংতুয়ার মিলিটারী ট্রেনিং ক্যাম্প আছে, পাহাড় হতে ঝরণা নেমে এসেছে ছোট খালের মত -জল খুব গরম এবং সর্বদাই ধুয়া উঠছে জল হতে। এই জলে স্নান করলে নাকি কোন চর্মরোগ থাকে না। ২৪শে ফেব্রুয়ারী রওনা হলাম পোর্ট সুইডেন্ গ্রাম—রাস্তায় কয়েকটী নদী—তার উপর দেখলাম—ভগ্ন সেতু জাপানী যুদ্ধের স্মৃতি স্বরূপ এখন রয়েছে। আবার নূতন সেতু তৈরী হয়েছে—আমরা পাড় হলাম নূতন সেতুর ওপর দিয়ে, পোর্ট সুইডেন হাসে থাকতে হলো ৩ দিন। কারণ জাহাজ ছাড়বে ২৭শে সকালে। ২৭শে বেলা ১১টায় ছোট জাহাজে করে গিয়ে আমরা উঠলাম "নাভাসা" জাহাজে। বেলা ১টায় জাহাজ চলতে আরম্ভ করল ভারতের দিকে—৪ মাস পরে দেশে ফিরে যাচ্ছি—কত আনন্দ মনে। ২৮শে সকালে দেখা গেল সুমাত্রা দ্বীপ। এইভাবে ছোট ছোট আরও দুই একটী দ্বীপ দেখা গেল কিন্তু তার পরদিন হতে আর কোন স্থল ভাগ দেখা গেল না—২রা মার্চ বৈকালে বহু দূরে দেখা গেল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ৪ঠা মার্চ সকাল ১১টায় পৌছলাম মাদ্রাজ। এবং ৬ই মার্চ বেলা ৫টায় উঠে বসলাম কলিকাতা গামী ট্রেনে। ৮ই মার্চ বৈকাল ৫টায় পৌছলাম কলকাতা। (সমাপ্ত)

সম্পাদকের দপ্তর

[সম্পাদকের দপ্তরে যাঁরা প্রশ্ন করেন—তাঁদের কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। (১) প্রশ্নের সংগে পুরো নাম ঠিকানা থাকা আবশ্যক। যাঁরা খামে চিঠি লিখবেন, খামের ওপর ঠিকানা না লিখে প্রশ্ন পত্রে ঠিকানা লিখবেন। ঠিকানা এমন কী প্রশ্নকারীর অমত হ'লে নামও প্রকাশ করা হবেনা। (২) এক বা দুইটীর বেশী প্রশ্ন যেন কেউ না করেন। (৩) প্রশ্নগুলি সার্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) তিন মাসের ভিতর কোন প্রশ্নের উত্তর না পেলে পুনরায় প্রশ্ন করতে হবে। (৫) প্রশ্নপত্রে 'সম্পাদকের দপ্তর' পরিষ্কার করে লিখতে হবে। এবং প্রশ্নের সংগে রূপ-মঞ্চের অন্য কোন বিভাগ সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকতে পারবে না। (৬) বছরে দু'বারের বেশী একজন পাঠক বা পাঠিকার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে না। তাই যাঁরা দু'বার উত্তর পাবেন, পুনরায় বছর শেষ না হওয়া অবধি তাঁদের ধৈর্য ধরে থাকতে অনুরোধ করি। (৭) ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে উত্তরের আশায় কেউ অযথা ডাক টিকিট পাঠিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অনেক সময় অনেক পাঠক-পাঠিকারা শিল্পীদের ঠিকানা জানতে চেয়ে এভাবে টিকিট পাঠিয়ে পত্র লেখেন। কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পত্রের উত্তর দেওয়া হবে না। যে সব শিল্পীরা নিজেদের ঠিকানা প্রকাশে আপত্তি করেন না—তাঁদের ঠিকানা যথাসময়ে রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে এবং হবে। (৮) রুচি বিগর্হিত কোন প্রশ্নের উত্তর কোন সময়েই দেওয়া হ'বেনা। (৯) রূপ-মঞ্চের গ্রাহক-শ্রেণী এবং প্রতিমাসেই যাঁরা রূপ-মঞ্চ পড়েন তাঁদের প্রশ্নগুলিকেই আগে স্থান করে দেওয়া হবে। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত পাঠক-পাঠিকারা প্রশ্ন করবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন। যাঁরা প্রতিমাসে রূপমঞ্চ পড়েন—তাঁদের প্রশ্নের ধরণ থেকেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁরা রূপ-মঞ্চের প্রতিমাসের পাঠক কিনা। শারদীয়া সংখ্যার পর থেকে আমরা প্রতি সংখ্যায় 'কুপন' এর ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবো—ঐ কুপন প্রশ্ন করবার সময় সংগে দিয়ে দিতে হবে।]

ননী ভট্টাচার্য (ডিব্রুগড়, আসাম)

(১) সিনেমাতে নামলে লোকের 'চারিত্রিক স্খলন হয়, একথা বা যুক্তি সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমার মনে হয় নিজেকে ঠিক রাখার পক্ষে নিজের আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। আপনার এ বিষয়ে মত কি?

(২) ছোটবেলা থেকেই আমার নাটক ও সিনেমার দিকে ঝোঁক। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। আপনি কি এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারেন?

●● (১) 'চরিত্র' কথাটী ব্যাপক। কিন্তু আপনার প্রশ্নে চরিত্রের যে দিকটা সম্পর্কে আপনি ইংগিত করেছেন আমি শুধু সেই দিকটা নিয়েই আলোচনা করছি। সিনেমাতে নামলেই যে মানুষের 'চরিত্রের' স্খলন হয় আমি তা মেনে নিতে রাজী নই। মানুষ ষড়রিপুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই ষড়রিপু মানুষের জীবনযাত্রার যে কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং করেও। চিত্র জগতের বন্ধুরাই যে এ প্রভাবে প্রভাবান্বিত তা নয়। তবে তাঁরা নিজেদের দুর্বলতাকে একটা নৈতিক আবরণ দিয়ে ঢেকে না রেখে সহজভাবে সকলের সামনে নিজেদের প্রকাশ করেন। অর্থাৎ যে অন্যায় তাঁরা করেন, তা মেনে নেবার মত সৎসাহস তাঁদের মাঝ থেকে অন্তর্হিত হয় না। আর আমাদের সমাজের অন্যান্য স্তরের যাঁরা—তাঁরা অন্যায় করেন কিন্তু সে অন্যায়কে স্বীকার করে নেবার মত সাহসী নন বলেই আমাদের তথাকথিত সমাজে তাঁদের

খ্যাতি অম্লান আর যত কু-খ্যাতির বোঝা মাথা পেতে নিতে হয় চিত্রজগতের বন্ধুদের। তাই এই চারিত্রিক স্খলনের জন্য চিত্রজগৎ দায়ী নয়—দায়ী হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করতে হলে আত্মবিশ্বাসই যে শুধু সাহায্য করবে তা নয়—প্রবৃত্তিগুলির দোষগুণ বিচার করে যিনি দোষগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন—তিনিই জয়ী হবেন এবং একথা শুধু চিত্রজগত সম্পর্কে নয়—আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (২) ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নিয়েই আমরা উমেদারী করতে পারি না। আমাদের প্রচেষ্টা সমগ্রভাবে নূতনদের পথকে সুগম করে দেবার আন্দোলনেই নিয়োজিত। ব্যক্তিগতভাবে আপনি রূপ-মঞ্চে 'ফটো' প্রকাশ করে দেখতে পারেন। তাতে আপনার ৩০৲ টাকা লাগবে। রূপ-মঞ্চের এক চতুর্থাংশ পাতায় ফটোসহ আপনার বিস্তারীত বিবরণ প্রকাশ করা হবে। এ থেকে অনেকে সুযোগ পেয়েছেন। এবং সত্যিই যদি আপনার চেহারা ও আনুসংগিক গুণাবলী কর্তৃপক্ষদের মুগ্ধ করে আপনি সুযোগ পেতে পারেন। সংগে সংগে একথাও বলে রাখি, ফটো প্রকাশিত হলেই যে কোন সুযোগ আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা কতকটা অদৃশ্যে ঢিল মারার মত।

রাসবিহারী ঘোষ (দাসপাড়া, চুঁচুঁড়া)

রূপ-মঞ্চে আপনার লিখিত বিভিন্ন দেশের নাট্য-মঞ্চ সম্বন্ধে অনেক কিছু বিষয়ই পড়েছি। সেই হিসাবে আমার অনুরোধ, আপনি ছোটদের উপযোগী নাটক লিখে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা অভিনয় করতে পারি। বাজারে হয়ত ছোটদের অনেক রাজারাণী সম্বন্ধীয় বই আছে কিন্তু তা আমাদের পক্ষে অভিনয় করা অসম্ভব। সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে লেখা নাটক আমরা চাই! সংলাপও ভাল হওয়া চাই। অতএব আপনি আমাদের অভিনয়ের জন্য এমন নাটক লিখুন, যাতে ছোটরা অভিনয় করে ও দেখে দেশের ও সমাজের দোষগুণ বিচার করবার শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে।

●● আমি নিজে নাট্যকার নই। নাট্য-সমালোচনা করি বলেই নাট্য-রচনায় আমার ক্ষমতা আছে বলে মনে করিনা। আমায় যে অনুরোধ জানিয়েছেন—সেই অনুরোধ আমি অন্ততঃ কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্য-কারের কাছে পৌঁছে দেবো। এবং এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন সেন-গুপ্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বহু আদর্শ মূলক নাটক বড়দের উপহার দিয়েছেন—এবার ছোটদের কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাবো।

সুকুমার দে, পুষ্পগুপ্ত, রতন সেন ও শিতাংশু সরকার (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) ১৯৪৭ সালের ২৩শে মার্চ দিল্লীতে যে 'নিখিল এশিয়া মৈত্রী সম্মেলন' হ'য়ে গেল এই অধিবেশনের কোন চিত্রগ্রহণ বাংলা বা ভারতের কোন চিত্র প্রতিষ্ঠান করেছেন কি? (২) কাগজে বেরিয়েছিলো যে, পাকিস্থান ডোমিনিয়নের স্বাধীনতা উৎসবের চিত্র গ্রহণ করা হবে এবং তা পৃথিবীর নানা দেশে দেখাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। খবরটির সত্যতা কতদূর? ভারতীয় ডোমিনিয়নেরও কি অনুরূপ ব্যবস্থা হ'য়েছে।

●● (১) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এশিয়া সম্মেলনের চিত্রগ্রহণ করা হ'য়েছিল বলেই শুনেছিলাম। (২) পাকিস্থান কনসটিটিউয়াণ্ট এ্যাসেম্বলীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিরাট চন্দ্র মণ্ডল রূপ-মঞ্চের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি সম্প্রতি করাচী থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, পাকিস্থান ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠা উৎসবের চিত্র গ্রহণ করা হ'য়েছে এবং প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হবে। ভারত ডোমিনিয়নেরও স্বাধীনতা উৎসবের চিত্র গ্রহণ করা হ'য়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বহু বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানও এই অনুষ্ঠানের চিত্র গ্রহণ করেন। যথাসময়ে আপনারা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাবেন।

অজিত ভট্টাচার্য (বিষ্টুপুর, জামসেদপুর)

আচ্ছা নিউ থিয়েটার্সের ছবি কি আজকাল বেশী বেরোয় না? ভিতরে কি কিছু গোলমাল হ'য়েছে? নীতিন বসু, দেবকী বসুর মত শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকদের সেখান থেকে বিদায় দেবার কারণই বা কি?

●● কেন, নিউ থিয়েটার্সের ছবিত প্রতি বছরই পাচ্ছেন।
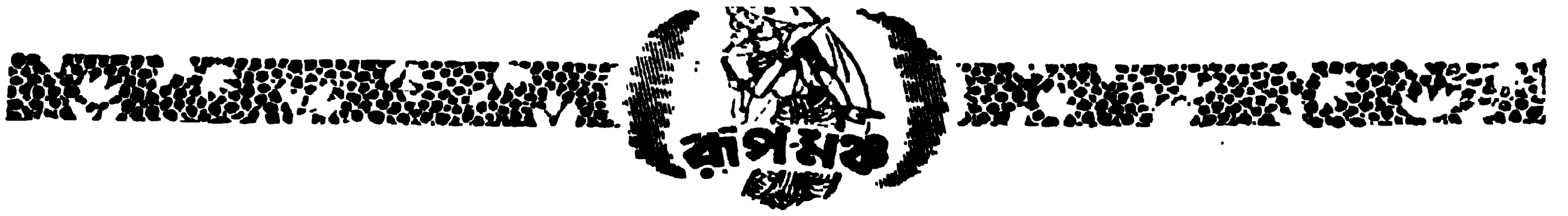
পূর্বে অন্যান্য প্রযোজকদের সংখ্যা খুব কম ছিল তাই নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলিই বেশী চোখে পড়তো। নীতিন বসু নিউ থিয়েটার্সের সংগে যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন ঠিক তা বলা চলে না। নিউ থিয়েটার্স এবং অন্যান্যদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পেছনে যে কারণ, তা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারেন। তবে এঁরা চলে আসাতে অন্ততঃ কয়েকজন নূতন যে সুযোগ পেয়েছেন সেকথা চিন্তা করেই এই সম্পর্ক-ছেদকে মেনে নেবেন আশা করি।

দ্বিজেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (তারাকুঠির, রাঙ্গামাটি)

●● গত সংখ্যায় আশা করি পূর্বরাগ সম্পর্কে আমাদের অভিমত জানতে পেরেছেন।

স্বদেশরঞ্জন দাস (রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● আপনার প্রশ্নের উত্তর এই বিভাগের প্রথমেই পেয়েছেন আশা করি।

তারক কৃষ্ণ মিত্র (সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা)

চলচ্চিত্রের জন্য সংগীত-রচনা পাঠাইতে হইলে আপনার সহযোগিতা পাব কি ?

●● উপযুক্তের জন্য আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি। লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিদের পথ করে দিতে আমারা অতীতেও চেষ্টা করেছি--বর্তমানেও করছি। আপনি কবি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে আমাদের সংস্পর্শে এলে সাহায্য করতে পারবো--তার পূর্বে নয়।

কান্তি লাল দত্ত (কালীতারা বসু লেন, বেলিয়াঘাটা)

শ্রীপার্থিব মহাশয় ভূমেন রায় এবং ছবি বিশ্বাসের বাড়ীতে কবে হানা দেবেন—জানতে পারলে বাধিত হবো। (২) শ্রীযুক্ত শচীন দেব বর্মণের গান রেডিওতে মোটেই শুনতে পাইনে—তাঁর খবরটা আশা করি জানাবেন।

●● (১) ছবি বিশ্বাসের বাড়ীতে ইতিমধ্যেই হানা দিয়েছিলেন—শারদীয়া সংখ্যায় তার বিবরণ জানতে পারবেন। ভূমেন রায় সম্পর্কে যথাসময়ে জানাবো। (২) তিনি বর্তমানে কলকাতাতে নেই। তাই রেডিওতে তাঁর গান শুনতে পাচ্ছেন না। তিনি বম্বে আছেন।

শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায় (বটুকপল্লী, বাঁকুড়া)

(১) আচ্ছা পূর্বে রূপ-মঞ্চে ফণীন্দ্র পাল লিখিত ষ্টুডিও সংবাদ ও শ্যামলশ্রী পরিচালিত রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতে ছিল --বর্তমানে সেগুলি আর দেখা যায় না কেন? (২) জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরীর মধ্যে সংগীতে কে শ্রেষ্ঠ।

●● (১) শারদীয়া সংখ্যার পর এগুলি পুনরায় যাতে দেখতে পান তার চেষ্টা করবো। (২) জাতীয় সংগীতে সত্য চৌধুরী আমার প্রিয়। প্রণয়মূলক সংগীতে জগন্ময়ের মিঠেল গলা আমায় মুগ্ধ করে।

অশোক মুখোপাধ্যায় (কাশিমবাজার রাজষ্টেট বহরমপুর)

কিং কং-এ মানুষ অভিনয় করেছে না সত্যিকারের গরিলা।

●● গরিলা।

শম্ভুনাথ বসু (নীলকমল কুণ্ডু লেন, হাওড়া)

সুগায়ক সত্য চৌধুরী কি চিত্রে নায়ক রূপে অভিনয় করেছেন ?

●● হ্যাঁ। এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের রাঙ্গামাটি চিত্রে।

অজিত-জয়ন্ত (ঘটক পাড়া, চুঁচুড়া)

পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা কি

●● ৭।সি, গোখেল রোড, ফ্লাট নম্বর ১৩, কলিকাতা।

অনিমা দাশগুপ্তা (গৌহাটি)

(১) বাংলার বিখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে ছবি বিশ্বাসের স্থান কোথায়। তিনি এখন কোন চিত্রে অভিনয় করিতেছেন। তাঁর সংগে পত্রালাপ করিতে চাই—ঠিকানাটা জানাবেন কী? (২) বাংলার চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী কে ?

●● (১) নিশ্চয়ইপ্রথম পর্যায়। তিনি বর্তমানে দৃষ্টিদান, উমার প্রেম, মহাসম্পদ, অনির্বান এবং আরো বহু চিত্রে অভিনয় করছেন। শারদীয়া সংখ্যা অবধি ধৈর্য ধরে থাকুন, ছবি বাবুর ঠিকানা জানতে পারবেন। শ্রীপার্থিবের সংগে যাঁদেরই আলাপ আলোচনা হয়—তাঁদের এই পত্রালাপ প্রসংগে অভিমত চাইলে—শ্রীপার্থিবের ওপরই দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। ছবি বাবু সম্পর্কেও ঐ একই কথা। (২) যদি

একককথায় উত্তর চান তাহলে বলতে হয়, ছবি বিশ্বাস ও চন্দ্রাবতী। কিন্তু একককথায় উত্তর দিয়ে অন্যান্যদের প্রতি অবিচার করতে চাই না। তাই অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দেবী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, মলিনা, কানন, সুনন্দা, এদের নামোল্লেখ করতে চাই।

সরোজ কুমার দাশগুপ্ত (প্রগতি পাঠাগার, দপ্তরখানা বরিশাল)

(১) অভিযাত্রী ছবির কমলমিত্র কি গান জানেন ?

●● না।

অনিল বসু (বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর)

স্যার শঙ্কর নাথ চিত্রটির নাম ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন।

●● অহীন্দ্র চৌধুরী।

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিপার্টমেণ্ট অব ওয়ার্কস, মাইনস এণ্ড পাওয়ার। নিউ দিল্লী)

(১), (২) শোনা যাইতেছে মেট্রোগোলডুইন মেয়ার কম্পানী নাকি এদেশীয় অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালক দ্বারা দেশী ছবি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা কি সত্য (৩) বিমল ঘোষ (মৌমাছি) পরিচালিত পুতুলের দেশ শিশুনাট্য কি চিত্রে রূপায়িত হবে ?

●● (১) আপনার এক নম্বর প্রশ্নে যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ অলীক। ওগুলি বিজ্ঞাপণ এবং দেখবেন, যে পাতায় ঐ ছবিগুলি মুদ্রিত হ'য়েছে সে পাতায় রূপ-মঞ্চের কোন নাম বা সংখ্যার উল্লেখ নেই -যা আমাদের প্রত্যেক ছবির পাতাতেই থাকে। (২) আমরাও এবিষয়ে শুনেছি। তবে সঠিক বলতে পারি না। আপনারা যে মহলে আছেন ওখান থেকেই ত এসম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে পারেন এবং জেনে আমাদের জানালে বাধিতই হবে। ব্রিটেনের চলচ্চিত্র জগতে আমেরিকান ছবিগুলির একাধিপত্য যখন ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম হ'য়েছিলো, তখনও চতুর আমেরিকান ব্যবসায়ীরা অনুসরণ করেছিলেন। ভারতে নিজেদের কে কায়েমী করতে যে ঠিক অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি ? (৩) এসম্পর্কে এখনও কোন সংবাদ পাইনি।

শ্রীফুল্ল রঞ্জন সাধু (পাবনা, খুলনা)

●● যে অনুষ্ঠানের কথা জানতে চেয়েছেন—সে সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী নই। কারণ কর্তৃপক্ষ এতগুলি পরিকল্পনা নিয়ে নামতে চাইছেন যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত শুনবেন কোনটাই হলো না।

করালীমোহন চট্টোপাধ্যায় (নবীন সরকার লেন, কলিকাতা)

(১) বিগত আগষ্ট হাংগামার সময় আমার ফিয়ার লেনের বাড়ী থেকে অনেকগুলি রূপ-মঞ্চ লুট হয়ে গেছে। আমি টাকা পাঠালে আপনাদের অফিস থেকে সেই সংখ্যাগুলি পেতে পারি কি ? এবং সম্ভব হ'লে কী রকম খরচা পড়বে জানাবেন কী ? (২) এটা কী সত্য যে, সাধনা বসু ও মধু বসুর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'য়েছে এবং তাঁরা উভয় উভয়কে পরিত্যাগ করেছেন ?

●● (১) আপনি এ বিষয়ে কোন কোন সংখ্যা আপনার প্রয়োজন বিস্তারীত লিখে আমাদের প্রচার বিভাগে জানাবেন। সব সংখ্যা নেই। যতগুলি থাকে পেতে পারেন এবং এজন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। অর্থাৎ যে সংখ্যাটির যে মূল্য ছিল তাই দিতে হবে। (২) হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত মধু বসুই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রথম আবেদন করেন। কোর্ট থেকে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তার সপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁকে প্রতি মাসে খোরাক-পোষাক বাবদ শ্রীমতী সাধনাকে মাসোহারা দিতে হবে। এই টাকার পরিমাণও কোর্ট থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রমোদরঞ্জন রায় (ওরিয়েণ্টাল টকিজ, শিলচর)

(১) কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে নেতাজী বসু ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্য-কলাপ সম্পর্কে একখানা চিত্র ভারতে প্রদর্শনের জন্য পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দেখানো হয়। সেই ছবির পরিচালককে এবং উহা

সাধারণে প্রকাশের কি ব্যবস্থা হ'য়েছে? (২) রূপ-মঞ্চে বম্বে স্টুডিওগুলির খবর সংগ্রহ করে দিতে পারলে আমাদের কাছে অর্থাৎ চিত্র প্রদর্শকদের কাছে রূপ-মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেত।

●● (১) এই ছবিগুলির কয়েকটি দৃশ্য সম্পর্কে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও কংগ্রেসের উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের সংগে মতদ্বৈধতার জন্যই সম্ভবতঃ প্রদর্শনায় বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে আছে। (২) বাংলা কাগজের সংগে বোম্বের চিত্র ব্যবসায়ীরা কোন ব্যবসায়গত সম্পর্ক রাখতে রাজী নন। তাই অযথা ঘরের খেয়ে বনের মশা তাড়ানো থেকে বিরত থাকাই কী উচিত নয়? আপনারা বাংগালী প্রদর্শকেরাও এই মনোবৃত্তি যদি গ্রহণ করেন - বাংলা কাগজ ও বাংলা চিত্র বম্বের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। ব্যক্তিগত ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ না দিলেও প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি যে মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি আশা করি তা লক্ষ্য করেছেন।

নবকুমার রায় (মিরবাজার, মেদিনীপুর)

রাত্রি চিত্রে পান্থশালার গানটী কী ধনঞ্জয় ভট্টাচায গেয়েছেন না অপর কেহ?

●● ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যই গেয়েছেন।

অরুণকুমার বর্মণ (রিহাবাড়ী, ডিব্রুগড়)

বোম্বের খ্যাতনামা অভিনেতা অশোককুমার কী বাংগালী?

●● হ্যা।

শিবুপ্রসাদ অধিকারী (দেবেনবাবু রোড, খুলনা)

রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, প্রমোদ গাঙ্গুলী, দেবী মুখার্জি ইহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কে? পর পর সাজিয়ে দিন।

●● নিঃসন্দেহে দেবী মুখোপাধ্যায়, তারপর অসিত বরণ, রবীন মজুমদার ও প্রমোদ গাঙ্গুলী।

ছাবু, ধপুমিয়া, রেণী, ছালাম (হাচ্ছান মঞ্জিল, ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ)

(১) অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর ঠিকানা কি? (২) ইন্দ্র মুভিটোনের বাংলা চিত্র **'শকুন্তলার'** নাম-ভূমিকায় কে অভিনয় করিয়াছিল?

●● (১) ৬, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা।
(২) জ্যোৎস্না গুপ্তা।

অনিমা দাশগুপ্তা (রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ)

●● শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল, ২৭।সি, চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ কলিকাতা, রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে এঁর কাছে চিঠি দিলে আপনার প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর জানতে পারবেন।

রবীনরঞ্জন চন্দ (জলপাইগুড়ি)

●● আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বে অন্যের মারফৎ রূপ-মঞ্চে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটী অবান্তর। তৃতীয়টীর উত্তর এই সংখ্যাতে অন্যত্র দেখুন।

অনিলকুমার মিত্র (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট লিঃ, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

(১) গত সংখ্যায় রূপ-মঞ্চে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায়ের একটী প্রশ্ন ছিল যে, শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী গান জানেন কি না? প্রশ্নটী চিত্র বা মঞ্চের গান সম্পর্কে নয় — তিনি গান জানেন কি না এই সম্পর্কেই ছিল। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা একমাত্র সিনেমা সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু মঞ্চে আমি তাহার গান শুনিয়াছি সেটা কি তাহা হইলে play back?

●● গত সংখ্যায় আমরই ভুল হয়েছিল। পর্দায় জহর বাবু গান না গাইলেও তিনি গান জানেন। এবং মঞ্চে তাঁর পরিচয় আপনার মত আমিও পেয়েছি। গত সংখ্যায় আমার নিজের একটু সন্দেহ ছিল কিন্তু আপনার চিঠি পাবার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম জহর বাবু গান জানেন।

প্রদীপকুমার মিত্র (শ্যামস্কয়ার, কলিকাতা)

●● আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। যেসব কথা জানতে চেয়েছেন—সম্পাদকীয় দপ্তরে দু'এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি খবর দিয়ে যে কোন দিন ১০-১২ টার ভিতর আমাদের কার্যালয়ে এসে দেখা করলে আলাপ আলোচনায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

হায়দার হোসেন আকন্দ
এলাহাবাদ)

আমি গান গাইতে জানি। হারমোনিয়ম, বেহালা বাজাতে জানি। স্বাস্থ্য মন্দ না। সাধারণ শিক্ষা ম্যাট্রিক পাশ। তাছাড়া সাত বছর টেকনিসিয়ান রূপে শিক্ষা লাভ করেছি। আমার পক্ষে ছায়াচিত্রে যোগদান সম্ভব হবে কি?

●● আপনি চলচ্চিত্র জগতের কোন বিভাগে যোগ দিতে চান আপনার প্রশ্ন থেকে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পরবর্তী চিঠিতে এ বিষয়ে বিস্তারীত জানালে উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

গিরিন ভৌমিক (গনেশ সরকার লেন, খিদিরপুর)
কলকাতায় কোন স্টুডিও সব চেয়ে বড়? আমার মনে হয় নিউথিয়েটার্স—তাই নয় কি?

●● আয়তন অথবা floor-এর দিক থেকে ইন্দ্রপুরীই সম্ভবতঃ বড়। তবে ষ্টুডিওর সাজ সরঞ্জাম ও মানের দিক থেকে নিউথিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে কেউই চাইবেন না।

সুনীলকুমার ঘোষ (হরিশ মুখার্জি রোড, কলিঃ)
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে যে সাহারা ছবিখানি উঠিতেছিল তাহা কতদূর হইয়াছে?

●● সাহারা শেষ হয়েছে বলেই সংবাদ পেয়েছি।

জয়ন্ত চন্দ্র মল্লিক (মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
দেবী মুখার্জি ও কমল মিত্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

●● দু'জনের ভিতরই প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি। দেবীবাবু একটু বেশী সূক্ষ্ম বলে আমায় মুগ্ধ করেছিলেন—কিন্তু ইদানীং তিনি যেন নিজেকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। আশা করি দেবীবাবু এবিষয়ে অবহিত হবেন।

নীনা দাস (জমির লেন, বালীগঞ্জ)
কলিকাতায় বিখ্যাত নৃত্য শিক্ষক কে? কাহার কাছে ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করা যায়?

●● এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রথমত সব নৃত্য-শিক্ষকদের সংগে আমি পরিচিত নই। দ্বিতীয়তঃ সঠিক উত্তর দিতে পারতেন আমাদের স্বর্গতঃ হয়েনদা—। আমি কয়েকজন নৃত্যশিক্ষকের নাম করছি। প্রহ্লাদ দাস, সমর ঘোষ, মণি বর্ধন, রণজিৎ রায়, নরেন্দ্র বসু মল্লিক, ভাস্কর দেব, বুলবুল, শান্তিদেব ঘোষ (সুরকার হলেও নৃত্য সম্পর্কে যথেষ্ট তাঁর জ্ঞান রয়েছে) এবং আরও অনেকেই রয়েছেন।

ইসমাইল (বজবজ, ২৪পরগণা)
●● আপনার চিঠিতে কোন নম্বর না থাকাতে আপনার কাছে কোন উত্তর যেতে পারেনি। তাই রূপ-মঞ্চ মারফতই জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ রূপমঞ্চের গ্রাহক মূল্য এখনও বার্ষিক সডাক আট টাকাই আছে। যে কোন মাস থেকে আপনি সভ্য হ'তে পারেন। গত শারদীয়া সংখ্যাটী পাবার কোন উপায়ই নেই। দুর্গাদাস, সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ আমাদের কার্যালয়েই পাওয়া যাবে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (শিলচর, আসাম)
অসিতবরণ ও ভারতীর কোন পারিবারিক সম্পর্ক আছে কী?

●● না।

শচ্চিদানন্দ দাশগুপ্ত (শিলচর, আসাম)
মিহির ভট্টাচার্য ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের মধ্যে কোন পারিবারিক সম্পক আছে কি?

●● না।

ধনঞ্জয় হাজরা (হুগলী, বালি)
ছায়া দেবী, কানন দেবী ও চন্দ্রাবতীর ভিতর কে কে শ্রেষ্ঠা।

●● নিঃসন্দেহে চন্দ্রাবতী। অভিনয়ে ছায়া দেবী কতগুলি বিশেষ ভূমিকায় কানন দেবীকে ছাড়িয়ে যাবার স্পর্দ্ধা রাখেন।

কুমারী লাবণ্য ঘোষ (আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা)
●● অশোককুমার সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিতে পারলুম না বলে ক্ষমা করবেন। তিনি কোন অভিনেত্রীকে বিয়ে করেননি—এইটুকু শুধু বলতে পারি।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী)
অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীর ঠিকানা কী ?

●● ৩৯।১এ, গোপালনগর রোড, আলিপুর।

প্রফুল্লচন্দ্র কর (হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত নীতিন বসু, দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ বই কি কি ?

●● শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর ভাগ্যচক্র, দিদি, কাশীনাথ, দেবকী বসুর, আপনাখর, বিদ্যাপতি, প্রমথেশ বড়ুয়ার রূপলেখা, জিন্দগী, অধিকার, আমার ভাল লেগেছিল।

জগদীশচন্দ্র দীন্দা (কাঁথি, মেদিনীপুর
এখানকার সিনেমা হাউস উদয়ণে-রূপ-মঞ্চ যা আসে তা চাহিদার তুলনায় খুব অল্প আশা করি এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

●● পূজার পর থেকে ওখানে যাতে আরো বেশী কাগজ আমরা পাঠাতে পারি তার ব্যবস্থা করবো।

হিমাংশুকুমার চক্রবর্তী (লাইব্রেরী রোড, মেদিনীপুর)
(১) সুনন্দা দেবীই কি প্রথম বাঙ্গালী মহিলা প্রযোজক ?
(২) নীরেন লাহিড়ী বাদে আর কি এমন কোন পরিচালক নেই যিনি একাধারে সুর শিল্পী ও পরিচালক ?

●● (১) না। ইতিপূর্বে চিত্র ভারতীর শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমলের সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছে।
(২) বাংলা চিত্র জগতে বর্তমানে আর কারোর সংগে পরিচয় নেই যিনি একাধারে সুরশিল্পী ও পরিচালক।

'ভাই বোন' চিত্রের একটী দৃশ্যে প্রমীলা ত্রিবেদীকে দেখা যাচ্ছে।

সমালোচনা, সংবাদ ও নানাকথা

স্বপ্ন ও সাধনা

এম পি প্রোডাকসন্সের ছবি। কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য। পরিচালনা: "অগ্রদূত।" সুরশিল্পী: রবীন চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায়: সন্ধ্যারাণী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র, জীবেন বসু, মাষ্টার শম্ভু প্রভৃতি।

গত ১৫ই আগষ্ট থেকে উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলা চিত্রগৃহে এম পি প্রোডাকসন্সের "স্বপ্ন ও সাধনা" চিত্রখানি দেখান হ'চ্ছে। এই ছবিখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাতে এর পরিচালনাভার ন্যস্ত না করে এম পি প্রোডাকসন্সের কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিভিন্ন বিভাগের টেকনিশিয়ানদের হাতে এই ছবিকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছবিখানির দায়িত্ব পড়ে আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি লাহা, শব্দযন্ত্রী যতীন দত্ত, প্রোডাকশন ম্যানেজার বিমল ঘোষ এবং রসায়নাগারিক শৈলেন ঘোষালের ওপর। অবশ্য, মূল দায়িত্ব ছিল শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহার ওপর। এঁরা আবার নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের উপর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় সুষ্ঠু করার দায়িত্ব অর্পন করেন।

"স্বপ্ন ও সাধনার" কাহিনী রচনা ক'রেছেন নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য। তাঁর ইতি পূর্বেকার কাহিনীগুলো যাই হোক, আলোচ্য ছবির কাহিনীর ভিতর আমরা কিন্তু কোনই নতুনত্ব খুঁজে পাই নাই। নায়ক (পরেশ ব্যানার্জি) উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, সুদর্শন, সবলচেহারা, গানবাজনা জানেন আবার খেলাধূলাতেও উৎসাহ অসামান্য। নিজে স্বাধীনভাবে একটা কিছু করবেন সেই চেষ্টায় আছেন। নায়িকা (সন্ধ্যারাণী) অগাধ বিত্তশালী পিতার একমাত্র দুহিতা। সুন্দরী, শিক্ষিতা, সংগীত পটীয়সী। তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মাঝে আর এইখান থেকেই তাঁদের মনে সঞ্চার হ'ল অনুরাগ। এদিকে নায়িকার বাবা (জহর গাঙ্গুলী) কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁর সারাজীবনের সাধনার ধন কারখানাটি তাঁর কর্মচারীদের হাতে দিয়ে নিজে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু কাজের নেশা কাটে না। আবার ডাক্তার, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বারণ করেন কাজ ক'রতে। তাই তিনি গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের নায়কের সংগে পত্তন ক'রলেন আর একটি কারখানা। নায়ক কিন্তু জানতেন না তাঁর অংশীদারটির সঠিক পরিচয়।

এদিকে নায়িকার সংগে নায়কের প্রায়ই দেখা হয় এই নতুন ছোট কারখানায়। সেখানে নানা মান-অভিমানের পালা চলে। তারপর একদিন এক দুর্ঘটনার ফলে ধ্বংস হ'য়ে যায় কারখানাটি। এর পর অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে মিলন হয় নায়ক-নায়িকার।

গল্পটি যতই হাল্কা হোক না কেন, তবু এত সহজ এবং সাধারণ দর্শকদের নিকট বোধগম্য ব'লে ছবিখানির জনপ্রিয়তাও অতিশয় সহজ হ'য়ে আসবে ব'লে আমরা মনে করি। পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান কর্ণধার বিভূতি লাহার এই প্রথম প্রয়াস। তবু তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। তবে চিত্রনাট্য রচনার দিক থেকে যে অনেকগুলো ভুল থেকে গেছে, এ প্রসংগে এ কথাও আমরা উল্লেখ ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছি। গল্প সাজানোর দিক থেকে ব'লতে পারি প্রথম যে-দৃশ্যে নায়ক প্রবেশ ক'রলেন, তা অবান্তর। এই দৃশ্যটি না রাখলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তারপর বারে বারে নায়িকার পিতার খাবার লুকোনোর দৃশ্য হাসির খোরাক যতই জোগাক না কেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভাঁড়ামো মনে হয়। আর, এত বড় একজন কর্মবীরের পক্ষে এই ধরণের ছেলেমি সম্ভবপর কিনা, সেটাও বিবেচ্য বিষয়। এরপর কথা আসে, অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য। এতবড় অগ্নিকাণ্ড যখন সব-কিছু ছারখার হয়ে গেল তখন সামান্য একটা ফার কোট যে কি ভাবে মোটরটা রক্ষা ক'রতে পারে, তা সত্যিই ভাববার কথা। ক'নে দেখার

এবং নায়ক ও নায়কের ভাগ্নের অমনভাবে দৌড়

রূপ-মঞ্চের পাঠকগোষ্ঠী চিত্রশিল্পী বিভূতি লাহা ও শব্দযন্ত্রী যতীন দত্তের রচনার সংগে পরিচিত আছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীর তরফ থেকে যারা ষ্টুডিও পরিদর্শনের অভিলাষ নিয়ে এম, পি'র ব্যবস্থাপক বিমল ঘোষের কাছে হাজির হয়েছেন—তাঁরা শ্রীযুক্ত ঘোষের অমায়িক ব্যবহারের বহুবার পরিচয় পেয়েছেন। রসায়নাগারিক - শৈলেন ঘোষাল নীরব কর্মী। সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ও আড়ালে থাকতে ভালবাসেন। রূপ-মঞ্চকে এঁরা যে স্নেহ এবং প্রীতির চোখে দেখে থাকেন—তা কোনদিনই ভুলবো না। এঁদের হাতে যখন 'স্বপ্ন ও সাধনা'র পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হয়—একদিক দিয়ে খুশীও যেমনি হয়েছিলাম, ভয়ও তেমনি জেগেছিল। স্বপ্ন ও সাধনা দেখে এসে সে ভয় আমাদের কেটেছে—এঁদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা 'স্বপ্ন ও সাধনায়' সার্থকতা লাভ করেছে—ব্যক্তিগত ভাবে চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহার ওপর—নূতন দায়িত্ব পালনে কতখানি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন সে সন্দেহ তাঁর মনে ছিল বলেই দর্শক সাধারণের কাছে 'অগ্রদূত' এই ছদ্মনামে পরিচালক রূপে দেখা দেন। স্বপ্ন ও সাধনায় নবীন পরিচালকের সাধনা কতখানি সার্থক হ'য়েছে, তাঁর বিচারক বাঙ্গালী দর্শকসমাজ—স্বপ্ন ও সাধনার গুণাগুণ বিচার করবার ভার রূপ-মঞ্চ সমালোচক গোষ্ঠীর ওপর এবং তার মাঝে চিত্র সম্পর্কে রূপ-মঞ্চের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু চিত্রখানি যে সর্বশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হ'য়েছে—ব্যক্তিগত ভাবে তা আমাদের খুবই খুশী করেছে তাই অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবেই অগ্রদূতকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিচালক জীবন গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক। যোগ্য বন্ধুদের সহযোগিতায় জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে এঁদের সকলের সংগ্রামমুখর চিত্র-জীবন দর্শক অভিনন্দনে সার্থক মণ্ডিত হ'য়ে উঠুক।

শুধুই যে-অবাস্তব তাই নয়, অসম্ভবও বটে। অবশ্য, এ সব হ'ল ছবির ছোটখাট ত্রুটি। মোটের ওপর ছবিখানির সামগ্রিক আবেদন খুবই ভাল। দৃশ্য পরিকল্পনা ও সংগীতের মূর্চ্ছনা নয়ন শ্রবণকে পরিতৃপ্ত করে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ভাল হ'য়েছে।

জহর গাঙ্গুলীকে নতুন ধরণের চরিত্রে দেখতে পেয়েছি। তিনি আমাদের আনন্দও দিয়েছেন প্রচুর। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় পরেশ এবং সন্ধ্যাকে প্রশংসা করবো—নরেশ মিত্র, জীবেন বসু প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। আর ভাল লেগেছে আলোকচিত্র, শব্দনিয়ন্ত্রণ এবং রসায়নাগারের কাজ। টেকনিশিয়ানদের ওপর ছবিখানি পরিচালনার ভার দেওয়ার জন্যই হয়ত এই দিকগুলো কালী ফিল্মস ষ্টুডিওর অন্যান্য ছবি থেকে অনেক ভাল হ'য়েছে। ছবিখানি বেশ কিছুদিন কলকাতায় চলবে বলে আশা করা যায়। —শশাঙ্ক।

শান্তিসাধনায় গান্ধীজী

এমন সব ছবি তোলা হোক, যা জাতির কাজে ও দেশের প্রয়োজনে লাগে। দেশের এই দুর্দিনে চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী বাহন যেন নিছক আমোদ প্রমোদ বিলাস নিয়েই মত্ত না থাকে—এই দাবী আমরা বহুবার রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে জানিয়েছি। আমাদের দাবীর সংগে সংগে চিত্রদর্শকরাও বলেছেন, "আমাদের দরকারে লাগে এমন ছবি চাই ?"

আশার কথা, এতদিনে প্রযোজকদের ঘুম ভেঙেছে। সত্যি ক'রে দেশের কাজে লাগে এমন ছবি তাঁরা আজ তুলতে লেগেছেন। "শান্তিসাধনায় গান্ধীজী" এইরকমই একখানা ছবি। ছবিখানা ছোট; —মাত্র এক হাজার ফিটের। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এর মূল্য নেহাৎ কম নয়। সাম্প্রদায়িক অশান্তি বিধ্বস্ত এই দেশে গান্ধীজী যে শান্তির মন্ত্র বিলিয়েছেন, বিহারের হাঙ্গামা বন্ধের জন্য তিনি যে জীবনযাপন ক'রেছিলেন, তাই রেকর্ড করা হ'য়েছে হাজার ফিট সেলুলয়েডের বুকে। রূপ-মঞ্চ গোষ্ঠীরই একজন কর্মী শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত মিত্র কর্তৃত্ব ক'রেছেন ছবিখানির। তাঁরই চেষ্টায় ছবিগুলি রূপ লাভ করে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ছবি তুলেছেন বিহারে গান্ধীজীর সংগে থেকে। আজ বাংলা দেশে ছবিখানির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছবিখানি ইতিমধ্যেই জনসমাদর লাভ করেছে এবং সর্বত্রই সমাদৃত হবে এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে ব'লতে পারি।

জয়তু নেতাজী

আর একখানি উল্লেখযোগ্য খণ্ডচিত্র আরোরা ফিল্ম প্রযোজিত 'জয়তু নেতাজী'। আরোরা ফিল্ম করপোরেশন বাংলা চিত্রজগতের পথপ্রদর্শক বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। বাঙালী দর্শক সাধারণের চাহিদাকে তাঁরা যতখানি মর্যাদা দিয়েছেন, অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানও তা দেন নি। শিশু চিত্রের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরাই সর্বপ্রথম অনুভব করেন। অরোরার প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার অনাদি বসু মহাশয় আজ স্বর্গগত—তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় ও প্রবীণ কর্মচারিবৃন্দ যে অরোরার দায়িত্বের কথা ভুলে যাননি তারই নিদর্শন 'জয়তু নেতাজী'। চিত্রখানি বহু পূর্বেই গৃহীত হয়। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনের কার্যাবলীই বেশী স্থান পেয়েছে আলোচ্য চিত্রে। সুভাষচন্দ্র তখন বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার। কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামী কর্মীরূপে এই সময় সমালোচকের কাজ করবার সুযোগ হ'য়েছিল বলে আরো বিশেষ করে এই চিত্রখানি আমাদের মুগ্ধ করেছে। সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্ম প্রতিষ্ঠার পরিচয় তখন আমার মত অনেকেরই পাবার সুযোগ হ'য়েছিল। খণ্ডচিত্র হ'লেও ছবিখানি সেই পুরোণ স্মৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়—আমাদের মত প্রত্যেক দর্শকেরই চিত্রখানি ভাল লাগবে। ---শ্রীকাঃ

অভিযোগ

পরিচালনা : সুশীল মজুমদার। কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র। সুরশিল্পী : শৈলেশ দত্তগুপ্ত। আলোক শিল্পী : শুধাংশু ঘোষ, অনিল দাস প্রভৃতি। শব্দ-যন্ত্রী : যতীন দত্ত। ভূমিকায় : অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, দেবী মুখার্জী, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী, বনানী চৌধুরী ও আরও অনেকে।

অভিযোগের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ এই যে, বর্তমানকালীন তথাকথিত দেশাত্মবোধক চিত্রের মতই কর্তৃপক্ষ কতকগুলি দেশ সেবার ভ্রান্ত রূপ পরিবেশ করে চিত্রটীকে সময় উপযোগী করবার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগ সত্যকার কোন গঠন মূলক কার্যের ইংগিত দিতে পারেনি। মোটের উপর কতকগুলি বাজে কথা ও দেশ সেবার ফাঁকা বুলি দিয়ে বইটীকে জুড়ে বড় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাহিনীটার প্রথম দিক থেকেই ধরা যাক। আমরা প্রথমেই দেখলাম "মুক্তিসঙ্ঘ" নামে একটী সংঘ যার কাজের মধ্যে কেবল বাজনা বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করা এবং কেবল একবার চরকা চালানর দৃশ্য দেখলাম। কাজ বলতে সংঘের আর কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। হঠাৎ সংঘের পরিচালক সর্বেশ্বর মহারাজ কিছুদিনের জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অবশ্য কেন বা কোন কারণে বিদায় নিলেন তার কিছুই বুঝতে পারা গেল না। যাবার সময় তিনি দুই শিষ্যের মধ্যে সুধীরের অনুপস্থিতির জন্য কৃপাশঙ্কর মারফত সুধীরের উপর সংঘের ভার দিয়ে গেলেন। কিন্তু কৃপাশঙ্কর সেই সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে সংঘের পরিচালক হিসাবে জাহির করলেন ও সুধীরকে তারই সহযোগিতা করতে আদেশ জানালেন। সুধীরকে একজন কর্মবীররূপে কথায় প্রকাশ করলেও তার কর্মের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কোন একটা অনাথ পরিবারের সাহায্যের জন্য সুধীরকে প্রতিদ্বন্দী কৃপাশঙ্করের কাছে যেতে হল সুধীরের বহু পরিশ্রমের উপার্জিত কতকগুলির পুরস্কার আনতে, যা ছিল কৃপাশঙ্করের কর্তৃত্বাধীনে সংঘের কক্ষে। কিন্তু দাম না জানায় দুর্ভাগ্য ক্রমে সামান্য মূল্যে সেটা বিক্রয় করতে হল কৃপাশঙ্করের কাছে। এটাও হাস্যকর ব্যাপার। সুধীর খেলোয়াড় হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। খেলার সে যথেষ্ট অনুরাগী। কিন্তু অনাথ পরিবারের জন্য মন খারাপ থাকাতে তাকে খেলায় বার বার দুর্নাম অর্জন করতে দেখেছি। মনে হল কাহিনীটি বাড়াবার জন্য এই ভাবের দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনাথ পরিবারের মধ্যে সুধীরের আশ্রিতা তরুণী বাসন্তী অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য চলে
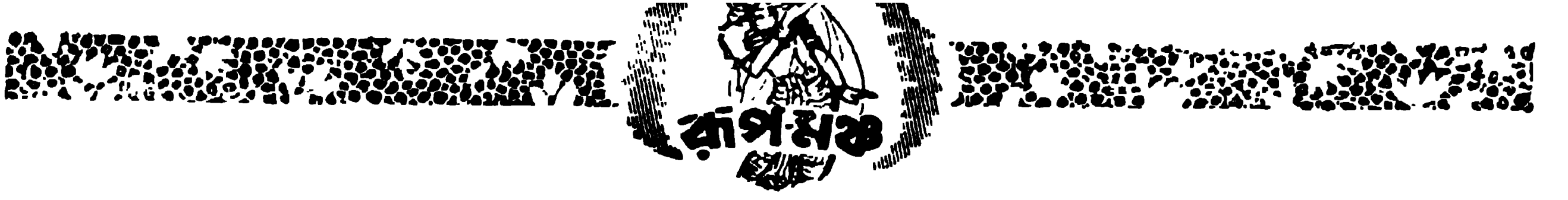
গেল রূপাশঙ্করের পরিচালনাধীন অবলা আশ্রমে। তাকে যেহেতু খুঁজে বার করতে হবে অমনি সুধীরের পরিচিতা রত্নাকে একটী কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে রাখবার জন্য যেতে হল সেই আশ্রমে। যেখানে বাসন্তীকে আটক করে রাখা হয়েছিল—সেখানে পাহারার খুবই কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পূর্বে বাসন্তীকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে পাছে জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়েই বাসন্তীকে অন্যত্র রাখতে হয়েছিল এবং এমনই পাহারায় রাখা হয়েছিল, যেখানে বাসন্তীর চলা ফেরা, কথাবার্তা সব কিছুই নজরের উপর রাখা হত। সেই দুরূহ স্থানে রাত্রে সুধীরের আবির্ভাবও নিতান্ত ছেলে মানুষের মতই মনে হয়। এমন সহজভাবে দর্শকদের মনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করায় পরিচালক যথেষ্ট কাঁচা মনের পরিচয় দিয়েছেন।

সাধারণ মানুষের মত জ্ঞান কেন যে পরিচালকরা কাজের সময় হারিয়ে ফেলেন, তা বুঝে ওঠা কঠিন ব্যাপার। অতঃপর আমাদের মাঝে সর্বেশ্বর মহারাজ আবির্ভূত হলেন। তিনি চলে যাবার সময় রূপাশঙ্করকে বলেছিলেন—"তোমার সামনে মহান পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছে—যদি জয় করতে না পার তাহলে তোমার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।" ফিরে এসেও তিনি রূপাশঙ্করের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জোর গলায় বললেন, "যে অত্যাচারী এত দিন জনসাধারণকে দেশের দোহাই দিয়ে নিপীড়ন করে এসেছে তার শাস্তির এখনও অনেক বাকী। যাই হোক সে মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম থেকে কার্যকরী হয়েছিল, তার পরিণাম কিছুই দেখা গেল না। রূপাশঙ্কর জীবিত কি মৃত এর উত্তর একমাত্র কাহিনীকার দিতে পারেন বলেই আমাদের মনে হয়। এরপরও অনেক হঠাৎ ঘটিত দৃশ্য আমাদের দেখিয়ে মন জয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সর্বক্ষেত্রে হঠাৎ ব্যাপারের ক্রীড়ায় পরিচালকের বেশ খানিকটা খেয়ালী মনের পরিচয় পেয়েছি। এইরূপ যা তা দৃশ্য কুড়িয়ে বইটীকে নষ্ট না করার জন্য চেষ্টা করাই তাঁর উচিৎ ছিল। চিত্রে সর্বেশ্বর মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁকে যেটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার মর্যাদা পুরোপুরি রাখতে সক্ষম হয়েছেন। রূপাশঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস। তিনি অভিনয় দক্ষতা পুরোপুরি বজায় রেখে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। সুধীরের ভূমিকায় দেবী মুখার্জি সুযোগ পেয়েও আশানুরূপ অভিনয় চাতুরী দেখাতে পারেননি। বাসন্তীর পিতার ভূমিকায় রবি রায় সুযোগ মত তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়ও সুযোগ মত সম্মান বজায় রেখেছেন। রঞ্জিৎ রায় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে দর্শকদের মনকে বিষাক্ত করে তোলেন। তাঁর অভিনয় খানিকটা জোর করে দর্শকদের হাসাবার

গৌতম গুপ্ত।—বয়স ২৫ বৎসর, উচ্চতা স্বাভাবিক। সৌখীন নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে। পর্দায় সুযোগ পেলে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। যদি কোন প্রতিষ্ঠান অভিনেতা রূপে এঁকে সুযোগ দিতে চান—এস, বি (১৩৬৮) উল্লেখ করে রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে সন্ধান নিতে পারেন।
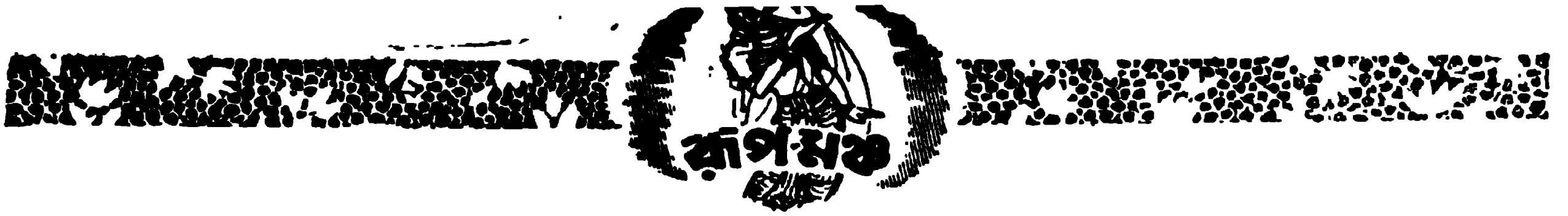
চেষ্টা করেছে। বাসন্তীর ভূমিকায় সুমিত্রা দেবীর অভিনয় প্রসংশনীয়। নবাগতা বনানী চৌধুরী রত্নার অভিনয়ে যে টুকু সুযোগ পেয়েছেন তার মর্যাদা সম্পূর্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্বে তাঁর দু'একটী অভিনয় দর্শকদের খুশী করতে পারেনি। নিজ চেষ্টায় তিনি তাঁর প্রতিভার বিকাশ করতে পারবেন এজন্য তাঁর সম্ভাবনার প্রতি আমরা বিশেষ রূপে আশা রাখি। সংগীত পরিচালক খুব বিশেষ কৃতিত্বর দাবী করতে পারেন না। দু'একটী সংগীত ছাড়া অন্যগুলি দর্শক মনকে নাড়া দিতে পারেনি। আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ মোটের উপর একরূপ হয়েছে। —মদন চক্রবর্ত্তী

খুলনায় নূতন প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তি স্থাপন

গত ৬ই আগষ্ট ছায়া ও কায়া লিঃ-এর নূতন প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তি স্থাপন চিত্র পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী, অভিনেতা রবি রায় ও শ্যাম লাহা, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ফণীন্দ্র পাল ও পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। ভিত্তি স্থাপন উৎসবের পর স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হ'লে স্থানীয় জনৈক মৌলভী সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক সমবেত জনমণ্ডলিদের সাথে ছায়া ও কায়া লিঃ-এর পক্ষ থেকে মাননীয় অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন। সভাপতির অনুরোধে চিত্র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসংগে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী বলেন, "সর্বাগ্রে সমবেত সকলকে আমার নমস্কার জানাই। আজ যে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তার জন্যে আপনরাও যেমন নিজেদের ধন্য মনে করছেন, আমিও ঠিক তেমনি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছি চলচ্চিত্র অর্থাৎ যাকে সর্বসাধারণের ভাষায় বলে সিনেমা—সেই শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে। কাজেই সেই দিক থেকেই দু'একটি কথা আমি আপনাদের বলবো। আমাদের দেশে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের মধ্যে দোষ-ত্রুটির যে অভাব নেই সে কথা আমি অস্বীকার করবো না। চলচ্চিত্রের আশানুরূপ ক্রমোন্নতি আজও হয়তো আমাদের দেশে হয় নি, বিদেশী ছবির তুলনায় আজও হয়তো খানিকটা পিছিয়ে আছে। তবু আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ—আমাদের দেশে চলচ্চিত্র যা হ'তে পারে নি সেই কথাটা মনে করতে গিয়ে ভবিষ্যতে তা কি হ'তে পারে সে কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

রাষ্ট্রীয় আদর্শের দিক দিয়েই বলুন আর শিক্ষা বা সভ্যতার আদর্শের দিক দিয়েই বলুন, সিনেমার মত সার্বজনীন প্রচারের এত বড় মাধ্যম বা medium আর নেই। আমি নিজে সিনেমা-শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট বলে এটা আমার অহঙ্কারের কথা বলে ভাববেন না, আজকের দিনে সিনেমার মত সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম খুঁজে পাওয়া শক্ত। সিনেমা রবীন্দ্রনাথের রচনা আর অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে একসংগে প্রকাশ করতে পারে। কারণ সিনেমা শুধু পরিচালকের পরিচালনা নয়, গল্প লেখকের গল্প নয়, সুরকারের সুর সৃষ্টি নয়, চিত্রশিল্পীর ছবি নয়, সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দিয়ে তৈরী একটা কিছু। তাই এর আবেদন এত ব্যাপক—সম্ভাবনা অফুরন্ত।

আজ আগষ্ট মাসের এই দিনটিতে আপনাদের নতুন সিনেমা গৃহের ভিত্তি স্থাপনা হলো। এই মাসটি আমাদের জাতীয় জীবন, জাতীয় চেতনার সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পাঁচ বছর আগে এই মাসেরই একটি দিনে সুরু হয়েছিল আমাদের দেশের মুক্তি-যুদ্ধের শেষ অধ্যায় রচনা, এই মাসের আর একটি দিনে আমরা পাব পরবশতার গ্লানি থেকে মুক্তি—এই মাসের একটি দিনে আমরা হারিয়েছিলাম কবিগুরুকে। কি সাহিত্য, কি রাজনীতি সব দিকেই এই মাসটি আমাদের দিয়েছে মহত্তর প্রেরণা, বৃহত্তর, পূর্ণতর জীবনের ইংগিত। আজ যাঁদের উদ্যোগে এবং আয়োজনে এই নতুন চিত্রগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হোলো তাঁরাও যেন সেই বৃহত্তর, মহত্তর
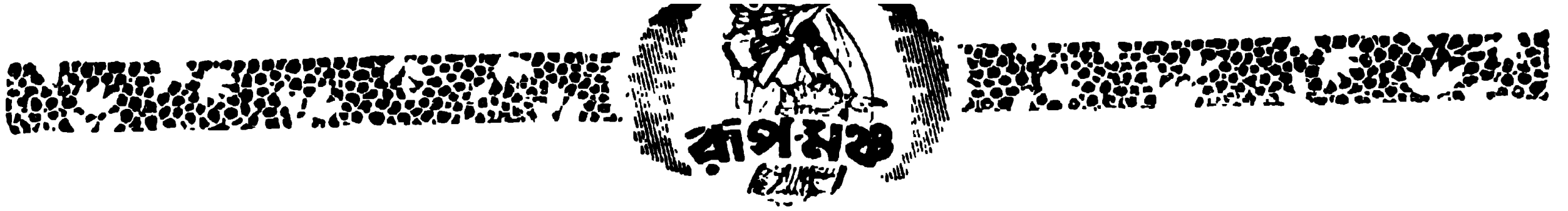
লক্ষ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পারেন, এইটুকুই আমার কামনা।"

নীরেনবাবুর বক্তৃতার পর সমবেত জনমণ্ডলীর অনুরোধে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকও বর্তমান ছায়াচিত্র সম্পর্কে কিছু বলেন। তিনি বলেন, "বর্তমানের ছায়াচিত্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ অনেক। কোন মতেই ছায়াচিত্রের সংগে যেন আমরা আত্মীয়তা স্থাপন করতে পাচ্ছিনে—আমাদের সমাজ জীবনের সংগে এর যোগ সূত্র খুঁজে পাওয়া দায়। তাই বর্তমান দেশীয় চিত্রের বিরুদ্ধে দর্শক সাধারণের অভিযোগ দূর করবার জন্য আমরা বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু এই আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হবে না। কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলেও আমাদের চলবে না। এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আমাদেরই। আমরা দর্শকসাধারণ যদি সংঘবদ্ধ হ'য়ে উঠি—সচেতন হ'য়ে উঠি—আমরাই পারবো দেশীয় চিত্রের মোড় ঘোরাতে। যে ছবির ভিতর আমাদের কোন কথা থাকবে না—যে ছবি আমাদের রুচি ও চাহিদাকে মর্যাদা দিতে চাইবে না—সে ছবির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। জাগ্রত—চেতনালব্ধ দর্শকসাধারণের চাহিদাকে তা'হলে কর্তৃপক্ষ কোনমতেই অস্বীকার করতে পারবেন না।" দর্শকসাধারণের সাথে রূপমঞ্চ সমসময় থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে সভাপতি মহাশয় এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং মাননীয় অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অভিনেতা রবি রায় অভিনেতাদের সম্পর্কেও কিছু বলেন।

সভার পর নীলা সিনেমার কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে অতিথিরা 'নীলা' সিনেমা পরিদর্শন করেন। এবং সমস্ত খুলনা সহর তাঁদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখানো হয়। ছায়া ও কায়া লিঃ-এর কে, ডি, ঘোষ রোডস্থিত কার্যালয়ও এঁরা পরিদর্শন করেন। মেসার্স বিল্লা ব্রাদাস লিঃ ও ছায়া ও কায়া লিঃ এর পক্ষ থেকে মিঃ এম, চ্যাটার্জি ও সুশোভন দত্ত সব সময়ই অতিথিদের প্রতি যত্নপর ছিলেন। অতিথিদের এবং রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে এদের আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া যেসব চিত্রামোদী ও রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠী এদের সংগে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়ে যে প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন—সে জন্য তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৃষ্ণা ফিলম্ লিঃ

গত ২০শে আগস্ট বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বিমল সিংহের প্রযোজনায় নবগঠিত কৃষ্ণা ফিল্ম লিঃ-এর প্রথম বাংলা চিত্র 'আনন্দ মঠ'-এর মহরৎ উৎসব বেঙ্গল ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত সন্তোষ হাজরা এবং চিত্র নাট্য রচনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ঋষি বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত সতজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি তাঁর অভিভাষণে বলেন,

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আজ আপনারা আমাকে কবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের শুভ মহরৎ উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যে সম্মান দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাদিগকে জানাইতেছি। ইহাতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। গৌরবের কারণ দুটি, প্রথমতঃ আনন্দমঠ প্রণেতা আমার নিকট আত্মীয়। আমার স্বর্গীয় পিতামহ—(বঙ্কিম সহোদর) ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আমার খুল্লপিতামহ। দ্বিতীয়তঃ "আনন্দমঠ" জাতির সম্পদ। আনন্দমঠই স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক। সেই আনন্দমঠের ছায়াচিত্রের উদ্বোধন সভায় আমার স্থান লাভ হওয়ায় আমি যে কতটা গৌরব অনুভব করছি—তাহা ভাষার দ্বারায় আমার পক্ষে বুঝান সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—আমার স্বপ্ন সফল হবে কি ?

আজ উঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে, তাঁহার বাসনা জীবিত কালে পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে কাল কাজ সমাধা করিয়াছেন।

চার বৎসর পূর্বে আনন্দমঠ আমি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিব বলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম। সরকার বাহাদুর হুকুম দেন নি। এর জন্য আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ ছিল।

আজ যে কাজ আমার দ্বারায় সম্ভব হয় নাই—আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের গুণগ্রাহী—আমার বন্ধুবর্গ মিলিত হইয়া সেই কাজ পূর্ণ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র।

এই আনন্দমঠের জাতীয় সংগীতের একটু ইতিহাস এখানে না উল্লেখ করিয়া পারিতেছি না।

যখন আনন্দমঠ লেখা হয় তখন আমার জন্ম হয় নি। তবে যে কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে আজ বলিব, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্র আমার পিতৃদেব ৺জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি :—

আমাদের কাঁঠালপাড়া বাড়ী থেকে "বঙ্গদর্শন" নামে একটি মাসিকপত্র বাহির হইত। এবং একটি ছাপাখানা ছিল—তাহার নাম ছিল—"বঙ্গদর্শন প্রেস।" বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচবৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন, পরে বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ আমার পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বাহির হইত। বঙ্গদর্শনের ম্যানেজার ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্র আমার পিতা ৺জ্যোতিষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। হিসাব পত্র দেখিতেন বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনের ও বঙ্গদর্শন প্রেসের মুদ্রাকর ছিলেন ৺রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ইহাকে আমরা রাধানাথ জ্যেঠা মহাশয় বলে ডাকিতাম। আবার বাপ—খুড়ারা রাধানাথ দাদা বলে ডাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বইই -এই বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রের মধ্যে প্রতিমাসে খানিকটা করিয়া বাহির হইত। পরে সম্পূর্ণ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তাকাকারে পৃথকভাবে প্রকাশিত করিতেন। আনন্দ মঠও প্রতিমাসে এই বঙ্গদর্শনে বাহির হয়।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট। কাঁঠালপাড়ার বাড়ী থেকে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। পাঁচটা বাজিলেই বঙ্কিমচন্দ্র কাজ ফেলিয়া এজলাস হইতে বাড়ীতে আসিতেন। একটু বিশ্রাম করিয়া তাঁহার বৈঠখানায় আসিয়া বসিতেন। মুরলী খানসামা তামাক দিয়া যাইত। উনি তামাক দেবীর আরাধনা করিতেন—মুখে থাকিত গুরসীর নল—হাতে নিতেন কাগজ কালি—সুরু হইত তখন বাকদেবীর আরাধনা। যথারিতী আনন্দমঠ তখন বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে বাহির হইতেছে।

একদিন তিনি কাছারী হইতে বৈঠকখানায় আসিয়াছেন—মুরলী খানসামা তামাক দিয়ে গেছে। সবে মাত্র তিনি তামাকে টান দিয়াছেন—রাধানাথ জ্যেঠামশায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে জানালেন, বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠের matter কম পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন—একটু পরে এস দিচ্ছি।

সংগে সংগে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বন্দেমাতরম গানটি রচনা করে রাধানাথ জ্যেঠামহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বঙ্গদর্শনে—"বন্দেমাতরম" স্থান লাভ করিয়া বঙ্গজননীর কাছে আত্মপ্রকাশ করিল।"

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কর্তৃপক্ষের সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা দেন এবং 'আনন্দমঠ'কে চিত্র রূপায়িত করে তুলবার সময় যথাসম্ভব বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে অনুরোধ জানান।

মজুমদার-স্বামী প্রডাকসন্স

পরিচালক সুশীল মজুমদার তার নবগঠিত মজুমদার-স্বামী প্রডাকসন্সের প্রথম ছবিখানির গঠন কার্যে অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েছেন। এবার শ্রীযুক্ত মজুমদারকে প্রযোজক রূপে আমরা দেখতে পাবো। এই ছবিখানি শ্রীযু · তুলসী লাহিড়ী রচিত মঞ্চ সাফল্যমণ্ডিত সামাজিক নাটক 'দুঃখীর ইমান' অবলম্বনে রচিত হচ্ছে। বিশিষ্ট চরিত্রে যাঁরা চিত্রায়ণ করছেন তাদের মধ্যে সুদর্শন ও সুকণ্ঠ রবীন মজুমদার, কানু বন্দ্যো, কৃষ্ণধন এবং লীলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নায়িকা চরিত্রে অভিজাত সমাজের একটী শিক্ষিতা তরুণী চিত্রাবতরণ করবেন বলে জানা গেল।
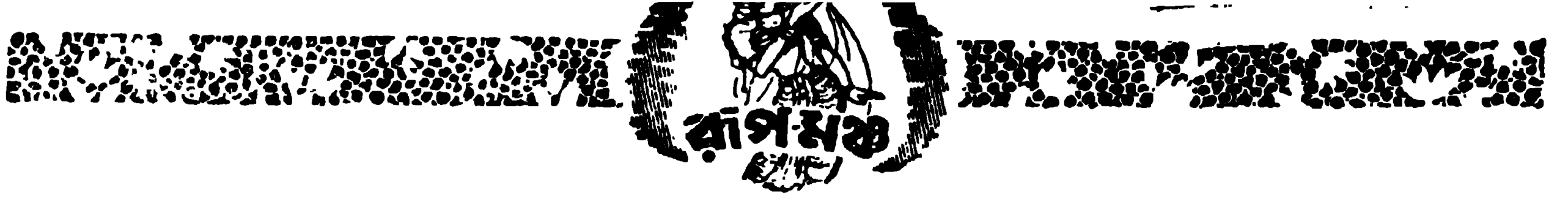
অমর মল্লিক প্রডাকসন্স

অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত অমর মল্লিকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ছবি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন নাট্য অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্সের কুশলী টেকনিশিয়ানগণ চিত্র প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। সংগীতাংশ ও আর্ট ডিরেকশনের কার্যে ব্রতী আছেন যথাক্রমে রাইচাঁদ বড়াল ও সৌরেন সেন। অজিত চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নবাগত ও সুদর্শন তরুণ এই চিত্রের নাম-ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে বহু কুশলী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে মূক অভিনয়

গত ২২শে আগষ্ট, শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক দ্বারিকানাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে ১২, রামকৃষ্ণ দাস লেনস্থ বালক বালিকাবৃন্দ "অমর ভারত" শীর্ষক একটা মূক অভিনয় করে। বৈদিক যুগ হ'তে আরম্ভ করে বর্তমান ভারতের স্মরণীয় দিন ১৫ই আগস্টে অভিনয়টী শেষ হয়। ছোট ছোট বালক বালিকাদের অসাধারণ নট-নৈপুণ্যে সমবেত দর্শকমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীত হন। কুমারী আরতি সিংহের অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে আরতি, অরুণা, শিবানী, কণিকা, অপর্ণা, নমিতা, মঞ্জুষা, দীপালী, গোপাল, রঞ্জিত, অশোক, অজিত (বুড়ো), বলাই। নাট্য পরিকল্পনা ও শিল্প নির্দেশনা করেন জ্যোতি রায়। সংগীত পরিচালনায় নিতাই ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। নেপথ্যে কুমারী অঞ্জলী সিংহের গান বিশেষ উপভোগ্য হয়। উৎসব প্রারম্ভে অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে কালীশ মুখোপাধ্যায় 'জাতীয় জীবনে মঞ্চাভিনয়' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ ঘোষ, ললিতমোহন পাকড়াশী, কালীপদ সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী আরতি সিংহের অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু তাকে একখানি রৌপ্য পদক প্রদান করেন। উপস্থিত অতিথিদের অভিনয় শেষে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নটনাট্যম

গত ৩১শে আগষ্ট, ২-৩০ মিনিটে ৭৬.২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'নটনাট্যম' এর উদ্বোধন উৎসব রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। জাতীয় আন্দোলনে সৌখীন নাট্যান্দোলনের দান ও কর্তব্য সম্পর্কে সভাপতি এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। 'নটনাট্যম' এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রধান সংগঠন-কর্তা শ্রীবিষাদ রায়চৌধুরী সভা প্রারম্ভে নটনাট্যমের' পরিকল্পনা ও কার্যসূচী সভায় প্রকাশ করেন। নাট্যাভিনয় ও বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনেই সমিতির প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটী পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয়। পৃষ্ঠপোষক (১) শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় (২) এস, কে, মুখার্জি, (৩) ডাঃ ভূপেন বসু (৪) হেমন্তকুমার বসু, এম, এল, এ। সভাপতি—শ্রীঅজিত বসু, স্বত্বাধিকারী অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, সহ সভাপতি—শ্রীরমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল চক্রবর্তী, শ্রীঅমিয় কুমার গুহ। সাধারণ সম্পাদক—শ্রীধীরেন দাস। যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীসত্য পাঠক, গৌর চক্রবর্তী। সহ-সম্পাদক—কমল মুখোপাধ্যায়, প্রধান সংগঠন কর্তা—বিষাদ রায় চৌধুরী অন্যতম সংগঠনকারিগণ: দেবেন বন্দ্যোঃ, গোরাচাঁদ শীল, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোঃ। পরিচালক নাট্য বিভাগ—সত্য পাঠক ও দেবেন বন্দ্যো। সংগীত পরিচালকদ্বয়—গৌর ঘোষ ও নৃপেন বন্দ্যোঃ। নটনাট্যমের প্রথম নাট্য নিবেদনের প্রযোজনা করবেন শ্রীমতী উমা চক্রবর্তী।

রামপ্রসাদ

প্রযোজনা : সুধাংশু মোহন ভট্টাচার্য। কাহিনী ও সংলাপ: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও দেবনারায়ণ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন। সুরসৃষ্টি : সত্যরঞ্জন দেব চৌধুরী। শিল্পনির্দেশ : নরেশ ঘোষ। রূপ সজ্জা : গুপী ব্যানার্জি। সম্পাদনা : অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। রসায়ন : ধীরেন দাশগুপ্ত। শব্দযন্ত্র : সত্যেন ঘোষ। আলোকচিত্র : অনিল গুপ্ত। বিভিন্নাংশে : সুজিত চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, বেচু সিং, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী, নিভাননী, শিশুবালা, উষাবতী, মণি শ্রীমাণী প্রভৃতি।

বেঙ্গল ফিল্মের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র রামপ্রসাদ ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্সে'র পরিবেশনায় কলকাতায় কিছুদিন পূর্বে মুক্তিলাভ করেছিল—বর্তমানেও চিত্রখানি স্থানীয় কয়েকটী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। সাধক ও ভক্ত রামপ্রসাদের কাহিনী আপামর বাঙালী জনসাধারণের কাছে পরিচিত। বাংলার এরূপ একজন জনপ্রিয় সাধকের জীবনীকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ যে চিত্রোপহার দিলেন এজন্য তাঁদের সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু সংগে সংগে আর একটী কথা বলেও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—ছবিটী চলছে রামপ্রসাদ দর্শক সাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই তাঁরা যেন মনে না করেন, তাঁদের দক্ষতা বা আন্তরিকতা আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছি। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন—চিত্রজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও পরিচালক হিসাবে এঁরা এই প্রথম আমাদের সামনে দেখা দিলেন। এঁদের সম্পর্কে এইটুকুই বলা চলে—কোন রকম বাহাদুরীর পরিচয় না দিয়ে খুব সতর্কতার সংগে চলে সহজ সরল ভাবে রামপ্রসাদকে তুলে ধরেছেন —এজন্য এদের কিছুটা প্রশংসা করবো বৈ কী। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত রূপ-মঞ্চের প্রথম জন্মদিন থেকেই আমাদের সংগে জড়িত—যে অধ্যবসায় ও সংগ্রামের দ্বারা চিত্র ও নাট্যজগতে তিনি পথ করে নিয়েছেন আমাদের তা অবিদিত নেই—রামপ্রসাদের পরিচালকরূপে তাঁকে দেখতে পেয়ে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। রামপ্রসাদের প্রযোজক শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য আজীবন রাজনীতির সংগে জড়িত ছিলেন—বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগে তাঁর সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ রয়েছে। চিত্রজগতে একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নবীন প্রযোজকের আগমনকেও আমরা সাদর অভিনন্দন জানাবো।

রামপ্রসাদের কাহিনী কাউকে বলতে হবে না। রামপ্রসাদ সম্পর্কে বহু কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে—এর কতগুলি আলোচ্য চিত্রেও স্থান পেয়েছে। রামপ্রসাদ শক্তির সাধক ছিলেন—তিনি তাঁর আরাধ্যা কালীরূপেই বিশ্বনিয়ন্তাকে পূজা করতেন। কিন্তু তাঁর আরাধনা বা ধর্ম মত তথাকথিত গোড়ামীর ছোঁয়াচে কোনদিনই কলুষিত হ'য়ে ওঠেনি। অন্যান্য বৈষ্ণব ও শক্তি সাধকদের মতই তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আলোচ্য চিত্রে রামপ্রসাদের জীবনের এই আদর্শও যেমনি ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে, তেমনি আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মহিমাকেও প্রচার করা হ'য়েছে। যে কোন আদর্শকে জয়মণ্ডিত করে তুলতে হ'লে আত্মাহুতি বা সর্বস্ব বলিদানের কথা হিন্দুপুরাণে বহু স্থানে পাওয়া যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও এই জীবন-দর্শনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন—তাই তাঁকে বলতে শুনি—'Give me all, I will give you freedom." মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদেও এই কথার সন্ধান মিলবে। রামপ্রসাদের জীবন-দর্শনের সংগে এই সত্যের যে যোগ ছিল আলোচ্য চিত্রে তা ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে এজন্য কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারদের প্রশংসা করবো।

প্রথমেই বলেছি, চিত্রামোদীরা চিত্রখানিকে গ্রহণ করেছেন বলেই কর্তৃপক্ষ নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন—একথা যেন মনে না করেন। চিত্রখানির প্রযোজনার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রথম অভিযোগ। প্রযোজনায় ফাঁকি দেখতে পেয়েছি অনেক। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ খানিকটা জোড়া তালি দিয়েছেন বৈকী? অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে

আমরা প্রযোজককে দোষ দিচ্ছি না—কারণ এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রয়োগ-শিল্পী বা পরিচালকদ্বয়ের ছিল। যে পটভূমিকায় রামপ্রসাদকে দাঁড় করানো হ'য়েছে—সেই পটভূমিকা সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত করে তুলতে তাঁরা পারেননি। এই প্রসংগে একথাও বলতে চাই, রামপ্রসাদের সমসাময়িকতাও ফুটে ওঠেনি। দোষ চিত্রনাট্যের নয়—দৃশ্যপটের বা পটভূমিকার। তারপর সাধক রামপ্রসাদের যে রূপ সাধারণের মনে অংকিত আছে তাও যথাযথ ফুটে ওঠেনি।

অভিনয়ে রামপ্রসাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগত সুজিত চক্রবর্তী। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক এই নবাগতটীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বহু চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাছেই তাঁর জন্য উমেদারী করেছিলেন। রামপ্রসাদের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সুযোগ দেওয়াতে রূপ মঞ্চের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং প্রথম প্রকাশে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী যে দর্শকসাধারণকে নিরাশ করেননি—এজন্য নবীনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর ভবিষ্যৎ অভিনেতা-জীবন গৌরবদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। কিন্তু রাম প্রসাদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের একটি অভিযোগ আছে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রয়োজনানুরূপ রূপ-সজ্জা দেখতে পাইনি। সুজিত বাবু তাঁর অভিব্যক্তিতে এই পরিবর্তন ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন অবশ্য। অভিনয়ে অন্যান্য ভূমিকায় নিভাননী, বেচুসিং, ইন্দু মুখার্জি, সাবিত্রী, সন্তোষ সিংহ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও যে মেয়েটী রামপ্রসাদের মেয়ের ভূমিকাভিনয় করেছে—এদের প্রশংসা করবো। মালিনীর ভূমিকায় শিশুবালা অনুল্লেখযোগ্য—এই চরিত্রটী অবশ্য চিত্রনাট্য-কারদের সৃষ্টি—এটির ভিতর দিয়ে রামপ্রসাদের চরিত্রের অন্য আর একটী দিক দেখাতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছেন। এটীর প্রয়োজনও তেমন ছিল না।

রামপ্রসাদের গুরু এবং তান্ত্রিকের ভূমিকায় কালী গুহ ও ডাঃ বোস যেন গুজরিয়েছেন। দর্শকদের অনুভূতির নাড়ী ধরে পরিচালক বেশ হু'চার বার নাড়া দিয়েছেন—তাতে তাঁদের বাহাদুরীই প্রকাশ পেয়েছে। ভূত বা সাপের দৃশ্যে চমক লাগাতে চেয়েছেন এবং কতকটা কৃতকার্যও হ'য়েছেন। কিন্তু এগুলি গভীর ভাবে যেন দাগ কাটতে পারে নি।

টেকনিকের দিক থেকে কোন বাহাদুরীর পরিচয় পাইনি। মনে হয় যেন দশবছর আগেকার বাংলা ছবিই দেখছি। সংগীতের প্রশংসা করবো। স্বাদেশিকতার জারজ রসে পরিপূর্ণ আধুনিক কালের বাংলা ছবি থেকে রামপ্রসাদ কিছুটা প্রশংসার দাবী করতে পারে এবং ধর্মানুরাগী দর্শকদের কাছে যেমনি সমাদর পাবে, তেমনি অস্পৃশ্যতা ও ভেদনীতির বিরুদ্ধে রামপ্রসাদের অভিযান সাধারণ দর্শকদের সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস। —শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

অলকানন্দা

প্রযোজনা: রূপাঞ্জলি পিকচার্সের পক্ষ থেকে সরোজ মুখোপাধ্যায়। কাহিনী: মন্মথ রায়। চিত্ররূপ: দেবকী বসু। পরিচালনা: রতন চট্টোপাধ্যায়। সংগীত: ধীরেন্দ্র মিত্র। চিত্রশিল্পী: ধীরেন দে। শব্দানুলেখক: অবনী চাটুজ্জে। শিল্প নির্দেশক: শুভো মুখো। সম্পাদক: রবিন দাস। রূপ-সজ্জা: কালিদাস দাস। ভূমিকায়: অহীন্দ্র, পরেশ, প্রমীলা, পূর্ণিমা, সুপ্রভা, প্রদীপ, ইন্দু, রবিবায়, তুলসী চক্রবর্তী, ডাঃ হরেন, অজিত চাটুজ্জে, আশু বসু প্রভৃতি। এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় রূপাঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'অলকানন্দা' মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

শিলংএর পর্বতময় তুষার সমাচ্ছন্ন ভূমিতে ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় বসুর 'অলকানন্দা' বাড়ীখানিকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। আনন্দময় মস্তবড় ব্যবসায়ী বোস এণ্ড রায় কোম্পানীর মালিক। তার বন্ধু ও অংশীদার যুধিষ্টিরই কারবার দেখতো। যুধিষ্টির ঐ বাড়ীটাকে একটা হোটেলে রূপান্তরিত করতে চাইলে আনন্দময় তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনে যোগদান করেন আনন্দময়। তার তিনবছরের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তার স্ত্রী অলকা মৃত্যু শয্যায়—কোম্পানীর ভরাডুবি হ'য়েছে এবং সাজানো

ডিক্রীদার মিঃ উইলিয়াম মহাপাত্রের কবলে যেয়ে বাড়ীটী পড়েছে। এক-ঘণ্টার সময় নেন আনন্দমোহন। অলকার মৃত্যু হয়। মেয়েকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি তার ব বিশবছর বাদের ঘটনা। 'অলকানন্দা' হোটেলে পরিণত হ'য়েছে—উইলিয়াম মহাপাত্র তার ম্যানেজার। যুধিষ্ঠির রায়ও মারা গেছে। তার বিরাট সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র ছেলে মৃদঙ্গ রায়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। হোটেলে নানান বাসীন্দা। একজন গাঙ্গুলী—শীত সইতে পারেন না—আর একজন বটব্যাল তার আবার গরম সহ্য হয় না। আর একজন এসেছেন বীরভূমের পড়ন্ত জমিদার চতুর্ভূজ হাতি—সংগে ভাগ্নী কেকা দেবী, অভিনেত্রী। রাকা দেবী এই ছদ্মনাম নিয়ে আছেন। কাগজে সংবাদ বেরোলো মৃদঙ্গ রায় নিরুদ্দেশ—যে খোঁজ দিতে পারবেন ১০ জাজার টাকা পুরস্কার। তার হাতে এম, আর, উলকী চিহ্নিত। পুরস্কারের লোভে হোটেল বাসীন্দাদের মাঝে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল। এর মাঝে ওদের মাঝে এলো এক ভাগ্যান্বেষী যুবক মানস রক্ষিত। তার হাতেও এম, আর চিহ্নিত। মিঃ হাতী ও রাকা মৃদঙ্গ রায় বলে তাকে হোটেলে নিয়ে এলো। মানস এই সুযোগ ছাড়লো না। আনন্দময়ও তার কন্যাকে নিয়ে এসে হাজির হ'য়েছেন ওই বাড়ীতে। তার বিদুষী কন্যা নন্দিতা মৃদঙ্গ রায়ের ভক্ত। সেও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো মৃদঙ্গ রায়কে দেখে। ইতিমধ্যে সত্যিই মৃদঙ্গ রায় ছদ্মবেশে ওখানে এসে হাজির হ'লেন। তাকে কেউ চিনলো না। এদিকে মানসের অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হ'য়ে উঠছে দিন দিন। রাকার সাথে তার ঘনিষ্ঠতাও জমে উঠেছে। সে সমস্ত বেফাঁস হ'য়ে পড়ার পূর্বেই সরে পড়তে চায়।

আমার দেশ-এ আশু বোস ও হাজু বাবু

কিন্তু পারে না। হোটেলের সকলে মিলে ঠিক করলো মৃদঙ্গ রায়কে এক অভিনন্দন দেবে। মিঃ হাতী পুরস্কারের লোভ ভোলেননি। তিনি আসল মৃদঙ্গ রায়ের ম্যানেজারের কাছে টেলিগ্রাম করে দিলেন। মানস ওদিন রাত্রে পালাতে চেষ্টা করলো নানান ভাবে। কিন্তু ব্যর্থ হ'লো। পরের দিন নকল মৃদঙ্গ রায় রূপেই তাকে অভিনন্দন নিতে হ'লো। আসল মৃদঙ্গ রায়ও সেখানে উপস্থিত। ম্যানেজার এসে পড়লো—সে মানসের ধাপ্পাবাজীর কথা প্রচার করে মানসকে পুলিসে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমনি সময় আসল মৃদঙ্গ রায় উঠে দাঁড়িয়ে মানসকে রক্ষা করে। মানসের সাথে রাকার এবং নন্দিতার সংগে মৃদঙ্গ রায়ের মিলনের ইংগিত দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টানা হ'য়েছে।

অলকানন্দা কৌতুক কাহিনী। কিন্তু গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলনের সংগে আনন্দময়কে জড়িয়ে—যে

দৃশ্যাবলীর অবতারণা করা হ'য়েছে, তাকে সমর্থন করতে পারবো না। এর পরের অংশ সম্পর্কে কাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। কৌতুকপ্রিয় মন্মথ রায় সাবলীল ভাবেই তাঁর কাহিনীর ভিতর দিয়ে কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন—কিন্তু যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হ'য়েছে তা যে বিদেশী গন্ধ থেকে মুক্ত নয় সংগে সংগে একথাও বলবো।

পরিচালক রতন চট্টোপাধ্যায়ের সংগে পরিচালক রূপে এই সর্বপ্রথম আমাদের পরিচয় হ'লো—ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর সহকারী রূপে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নূতন হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু কয়েকটী ছোট খাটো বিষয় তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে ব্যথিত হ'য়েছি। যেমন মনে করুন আনন্দময় যখন জেলে গেলেন। জেলে যে পোষাক পরে গিয়েছিলেন ফিরে আসবার সময় সেই পোষাক তেমনি ফিটফাট রয়েছে দেখতে পেলাম। এখানে একটা কথা বলবার আছে, যে পোষাক পরে রাজবন্দীরা জেলে যেতেন তা ফিরিয়ে দেবার রীতি থাকলেও জেল কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে কোনদিনই রাজবন্দীরা এই ধরণের ব্যবহার পান নি। ১৯২১ সালের সময়কার ইংরেজ সরকার ও তাদের হাতের ক্রীড়নকদের স্বরূপ হয়ত পরিচালক বর্তমান পরিস্থিতিতে ভুলে গেছেন। তারপর ঠিক একঘণ্টার মধ্যে অলকার মৃত্যু দৃশ্যও বিশদৃশ্য লাগে। কৌতুক রস পরিবেশন করতে যেয়ে অনেক সময় মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছেন। অজিত চাটুজ্জের দর্শকদের দিক পিছন দিয়ে কোমর দোলানোকেও আমরা সমর্থন করতে পারবো না। যদিও ইংরেজী বিদেশীয় কৌতুক চিত্রে ববহোপ প্রভৃতি কৌতুক অভিনেতারা এর চেয়ে আরও অনেকদূর অগ্রসর হ'য়ে থাকেন কিন্তু বিদেশীয় চিত্রে যা সহ্য করা চলে, দেশীয় চিত্রে তা দেশীয় দর্শকরা মেনে নিতে পারেন না। তারপর যখন আনন্দময় তার মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন অমনি একজন গান ধরে দিলেন—চিত্রজগতের এই পুরোণ প্যাঁচকেও সমর্থন করতে পারবো না। অভিনয়ে মানসের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জির চটুল অভিনয়ের প্রশংসা করবো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানাবো নবাগত প্রদীপ কুমারকে। এই নবাগত অভিনেতাটী প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছেন। তাঁর বাচন ভংগী—চেহারা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ইদানীং যতজন নবাগতের সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে। প্রদীপ কুমার তাঁদের শীর্ষস্থান অতি সহজেই আশা করতে পারেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ অভিনেতা জীবনের সাফল্য মণ্ডিত দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করে আজ তাঁকে শুধু স্বাগত অভিন্দন জানাচ্ছি।

মিঃ হাতীর ভূমিকায় ইন্দু মুখুজ্জেকেও প্রশংসা করবো। এই প্রবীণ কৌতুকাভিনেতাটী বহু দিন থেকেই আমাদের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন—অলকানন্দায় তাঁকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অজিত চাটুজ্জেও আমাদের আনন্দ দান করেছেন, হোটেল ম্যানেজার রূপে ডাঃ হরেন তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অহীন্দ্র, রবি, সুপ্রভা, তুলসী, আশু এদের চলনসই বলতে হবে। কেকার ভূমিকায় পূর্ণিমা চালিয়ে নিয়ে গেছেন শুধু বলা চলে। নন্দিতার ভূমিকায় প্রমীলা ত্রিবেদীকে প্রশংসা করতে পারবো না। সংগীত পরিচালনায় ধীরেন মিত্রকে প্রশংসা করবো। সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে যে গানখানি শুনতে পেয়েছি—সেখানি বিশেষ করে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। যে প্রকাশ ভংগীর সাহায্যে মানসের মনের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে তা প্রশংসনীয়। মাঝে মাঝে বাইরের দৃশ্য চোখকে তৃপ্তি দিলেও একটী বাড়ীকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটী ঘুরপাক খেয়েছে। কৌতুক চিত্র বলেই এসব দৃশ্য সহ্য করা চলে নইলে যে সব চরিত্রের আমদানী করা হ'য়েছে—তাদের দেখে মনে হয় ঐ হোটেলটী ছাড়া তাদের যেন বাইরে আর কোন জগত নেই। কৌতুকের ভিতর দিয়ে কতৃপক্ষ দর্শকদের খানিকটা আনন্দ দিতে চেয়েছেন, সেদিক থেকে তারা আংশিক কৃতকার্য হ'য়েছেন। তার বেশী যেমন তারাও দাবী করতে পারেন না, আমরাও দিতে নারাজ। একথা আমাদের পরিচালকরা ভুলে যান—কৌতুক বলতেই যথেচ্ছাচার নয়। কৌতুক রস পরিবেশন করবার সময় বাস্তবের কথা ভুলে গেলে

চলবে না। কৌতুককে বাস্তবের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিতে পারলেই সার্থকতা ফুটে ওঠে। নইলে তা কাতুকুতু দিয়ে রস সৃষ্টিরই প্রয়াস রূপে পরিগণিত হয়। অলকানন্দা এই শেষোক্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। অস্বাভাবিক পরিবেশ অলকানন্দার অনেকখানিই জুড়ে আছে —তাই সবশ্রেণীর দর্শকদের মন জয় করতে সে ব্যর্থই হবে। রুচিবান দর্শকদেরও অলকানন্দা ক্ষুণ্ণ করবে। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়। দৃশ্য রচনায় শুভো মুখোপাধ্যায় শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। —শীলভদ্র

রূপ-মঞ্চ-শারদীয়া সংখ্যা

রূপ-মঞ্চের পরবর্তী সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দু'শ বছরের ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে যে সব শহিদদের বিয়োগ ব্যথায় আমাদের মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে তাঁদেরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সংখ্যা নিবেদিত হবে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা একদিন যে লজ্জা ও ঘৃণার পরিচয় দিয়ে দেশ-মাতৃকার কপোলে কালিমা লেপে দিয়েছিলেন—দু'শবছরের সংগ্রামের কথা—আমাদের জয় পরাজয় ও আশা আকাঙ্খার কথা নিয়ে গড়ে উঠবে শারদীয়া সংখ্যার কয়েকটী অধ্যায়।

সংগ্রাম আমাদের জয়যুক্ত হ'য়েছে। এই জয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দেশ ও জাতি গঠনের যে বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে তাকে অবহেলা করবো কী করে? দীর্ঘদিনের পরবশতা আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে—আমাদের মনুষ্যত্ব ও মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে ধ্বংসের পথে টেনে এনেছে—আজ এই হীনতা ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করে আমাদের সবল ভাবে দাঁড়াতে হবে। বৈদেশিক শাসনের যে অভিশাপ এতদিন আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও বয়ে বেড়াতে হ'য়েছে, সেই জঞ্জালগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে—দেশ-মাতৃকার আশীর্বাদের প্রলেপে আমাদের দেহ ও মনকে পূতঃ করে নিতে হবে। আমাদের এই মহা কর্তব্য সাধনে চিত্র ও নাট্য-জগতের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই শুনতে পাবেন চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে। তাঁদের এই বাণী আপনাদের কাছে পৌছে দেবার দায়িত্ব রূপ-মঞ্চ সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া চিত্র ও নাট্য-জগতের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁদের জীবনের অপ্রকাশিত কথাগুলিও বলবেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা তাঁদের গল্পে নূতন বাণী শোনাবেন বলে কথা দিয়েছেন। ছবির পাতায় চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের পরিচিত ও অপরিচিত সকল শিল্পীদেরই দেখতে পাওয়া যাবে।

তাছাড়া রূপ-মঞ্চের রূপ-সজ্জার মূলে যে সব কর্মী ও বন্ধুরা রয়েছেন—যাঁরা রূপ-মঞ্চের প্রথম দিন থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা দ্বারা রূপ-মঞ্চকে সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন পাঠক সাধারণের সংগে তাঁদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। এবং পাঠক সাধারণের জন্য একটী বিশেষ বিভাগ রাখবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই বিভাগে চিত্র ও নাটক সম্পর্কে পাঠক সাধারণের অভিমত এই বিভাগে স্থান পাবে। যাঁরা এই বিভাগে যোগদান করবেন আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে—"কোন ধরণের চিত্র ও নাটক চাই" এই সম্পর্কে দশ লাইনের ভিতর নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে পাঠাবেন। এবং এই সংগে ১০৲ টাকা মণিঅর্ডার করতে হবে ও নিজেদের একখানা করে ফটো পাঠাতে হবে। আশা করি পাঠক সাধারণ এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠবেন। শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এই সংখ্যায় অন্যত্র যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'য়েছে তাতে দেখতে অনুরোধ করছি।

স্বাধীনতা দিবস

গত ১৫ই আগষ্ট আসাম বেঙ্গল মিলস লিঃ এর ৭ হেষ্টিং ষ্ট্রীটস্থিত কার্যালয়ে 'স্বাধীনতা দিবস' নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী আহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। এই ৭ নম্বর হেষ্টিং ষ্ট্রীটস্থিত বাড়ীটী ওয়ারেণ হেষ্টিং বসবাস করতেন। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ
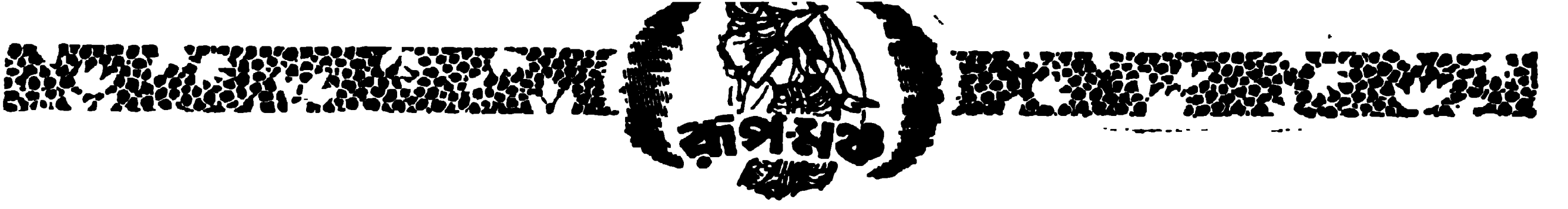
মুখোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন প্রসংগে সে সম্পর্কে ইংগিত করেন। সভাপতি মহাশয় ও প্রধান অতিথি সভায় বক্তৃতা করেন। এ, সি, মুখার্জি এ্যাণ্ড ব্রাদার্স লিঃ এর ম্যানেজিং ডাইরেকটর আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস এর কর্মী ও পরিচালকবর্গ এবং ম্যানেজিং এজেন্টস দের পক্ষ থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্যতম ডিরেকটর শ্রীযুক্ত শৈলেশ মুখোপাধ্যায় মাননীয় অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঐ কার্যালয়েই আরেকটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বি, মুখার্জি। ইনি দেশবন্ধু প্রভৃতি দেশ নায়কদের সহযোগী ছিলেন এবং পতাকা উত্তোলন করেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়। সভা শেষে কর্তৃপক্ষ সকলকে জল যোগে আপ্যায়িত করেন। বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ ধ্বনির ভিতর দিয়ে সভা ভংগ করা হয়।

রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন

রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এবং উপস্থিত অতিথি ও পাঠক সমাজকে জাতীয় পতাকা পরিয়ে দেওয়া হয়। ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাতটায় বৈঠকখানা ও রাজাবাজার থেকে রূপ-মঞ্চের দপ্তরী ও অন্যান্য মুসলমান কর্মীরা রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের বসতবাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ রূপ-মঞ্চ সম্পাদক এঁদের সকলকে জাতীয় পতাকা পরিয়ে দেন। তাছাড়া এই স্মরণীয় দিনে শিল্পী ও সুধীজনদেরও রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে মেটালে অংকিত জাতীয় পতাকা বিলি করা হয়। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ছবি বিশ্বাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীরেন লাহিড়ী, রবি রায়, মিহির ভট্টাচার্য, ফণী পাল, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৌলভী আহম্মদ আলী, নরেশ চক্রবর্তী, অলকা দেবী, সরযু দেবী, কমল চট্টো, শ্যাম লাহা, অখিল নিয়োগী, গোপাল ভৌমিক, প্রদ্যোত মিত্র, অমূল্য মুখোপাধ্যায় শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, কমল বসু, বীরেন ভদ্র, সজনী দাস, সুবল বন্দ্যো, ও আরো অনেককে জাতীয় পতাকা পরিয়ে দেন।

রঙমহল

স্বাধীনতা সপ্তাহে রংমহল বাংলার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার পরিচয় স্বরূপ বাংলার প্রতাপ নামক নাটকখানি মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক খানি রচনা করেছেন নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত—দীর্ঘকাল যিনি মঞ্চকে জাতীয়তাবাদী নাটক জুগিয়ে এসেছেন। বাংলার আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে শচীন্দ্র নাথ তার কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকেন নি। পর্তুগীজ বণিকদের কবল থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে বাংলার সিংহ প্রতাপ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ স্বাধীনতা অর্জনের সংগে সংগে বিভিন্ন সমস্যার ভারে বাংলা কণ্টকিত। শচীন্দ্র নাথের নূতন নাটক বাংলার প্রতাপ বাঙ্গালাকে নূতন ভাবে পথ নির্দেশ দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। নাটক-টির সুর সংযোজনা করেছেন অভ্যুদয়-খ্যাত সুরশিল্পী সুকৃতি সেন। পরবর্তী সংখ্যায় বাংলার প্রতাপের সমালোচনা প্রকাশ করবো। এই নাটকে কার্ভালোর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য ভূমিকায় প্রতাপ—মিহির ভট্টাচার্য, বসন্ত রায়—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, মনি রায়—রবি রায়, রুদ্র নারায়ণ—সন্তোষসিংহ, আঞ্জলিকা—রাণীবালা, কাদম্বিনী—বন্দনা, পার্বতী—রমা, করুণাময়ী—বেলারাণী।

সুভাষ চন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক নালান্দা প্রেস। ১৫নং—১৬০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা। পৃঃ ৩১০। শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সাধারণের কাছে কবি নামেই পরিচিত। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদানের মূলে যে তিনি ছিলেন—একথা অনেকেই হয়ত জানেন না। দেশের ডাকে বাংলার নেতা দেশবন্ধুর পার্শ্বে ছাত্র-বন্ধুদের ভিতর বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে সর্ব প্রথম দাঁড়াবার গৌরব তিনি দাবী করতে পারেন। সেদিনকার জাগ্রত বাংলার কথা কারো অবিদিত নেই। তখনই সাবিত্রী বাবু সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দের সংস্পর্শে আসেন। এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে রাজ-নৈতিক
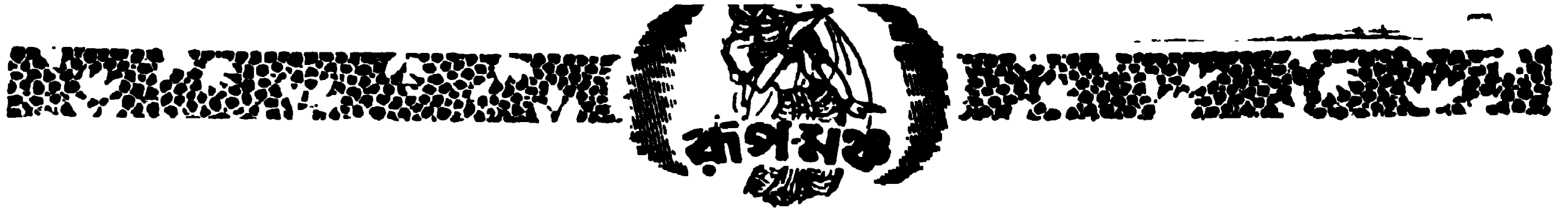
কর্ম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সংগে অন্তরতা জমাবার অবকাশ পান। সুভাষ চন্দ্রের জীবনের অনেক কথাই জানেন। তাই সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছুই জানতে পারবো আশা করেছিলাম -- আলোচ্য বইখানি পড়ে আমাদের সে আশা যে মিটেছে একথা বলাই বাহুল্য। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যতগুলি বই ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে, তার ভিতর সাবিত্রী বাবুর বইখানি যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বহু ছবি পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

নূতন পত্রিকা :

ধরিত্রী : সম্পাদক—বারীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও কনাদ গুপ্ত। ম্যাঙ্গো লেন থেকে সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা বারো আনা। পরবর্তী সংখ্যা থেকে সম্পাদনা করবেন কনাদ গুপ্ত। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

রূপ ও কথা : সম্পাদক—অনিল পাল। হরি ঘোষ ষ্ট্রিট থেকে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা। চিত্র ও মঞ্চ-সম্বলিত মাসিক পত্রিকা।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ষ্টুডিওস

গত ২৩শে আগষ্ট এদের হিন্দি চিত্র 'এক আওরৎ' এর মহরৎ উৎসব ৮৬, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা ও প্রযোজনা করবেন শ্রীযুক্ত এস, ডি, নারাঙ।

এম, জি পিকচার্স

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে ৪৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিও লিঃ-এ এদের প্রথম বাংলা বাণী চিত্র 'বিশ বছর আগে'র মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। নাট্যকার বিধায়কের এই জনপ্রিয় নাটকটীকে পর্দায় রূপায়িত করে তুলবার ভার গ্রহণ করেছেন পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র দেবদূত শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালপাঞ্জা' কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেবদূতের চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংগালী পাঠক সাধারণ ও চিত্রামোদীদের কাছে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ এর পক্ষ থেকে চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন চিত্র সার্ভিস লিঃ। কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় আমাদের মত অনেকেই বিস্মিত হবেন। গত ২ই মে ১৯৪৭ তারিখে রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে দেবদূতের মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। আর আগষ্টের ভিতর চিত্রের কাজ শেষ হ'য়ে যায়। চিত্রখানি এখন মুক্তির দিন গুনছে। দেবদূত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে বম্বেতে মিঃ অমিয় চক্রবর্তী ও এন, আর আচার্যের সহকারীরূপে ইনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর পিতা। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত বিনয় গোস্বামী। এবং তত্ত্বাবধায়ক রূপে কাজ করেছেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আভি ভট্টাচার্য, অমিতা বসু (এই সর্বপ্রথম নায়িকারূপে আপনাদের অভিবাদন জানাবেন), ভাস্কর দেব, প্রণব বাগচী, চিত্ত চৌধুরী, চৈতন্য বাগচী, অজন্তা কর, রমাপ্রসাদ মুহুরি, অচিন্ত্যকুমার, শঙ্কর বাগচী, সন্তোষ চৌধুরী, শমর মুখার্জি আরও অনেকে।

রূপশ্রী লিঃ

রূপশ্রী লিঃ এর বর্তমান বাংলা চিত্র বুভুক্ষার কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। মৌচাকে ঢিলের পর শ্রীযুক্ত ভঞ্জের এই দ্বিতীয় চিত্র; রূপশ্রী লিঃ এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত 'বুভুক্ষা'কে যথাযথ রূপায়িত করে তুলতে কোন দিক দিয়েই আয়োজনের কোন ত্রুটি করেন নি।

এস, বি, প্রডাকসন্স

শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় কাহিনী 'দৃষ্টিদান' পর্দায় রূপায়িত হয়ে উঠছে। দৃষ্টি দানের চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। অন্ধ স্ত্রীর প্রেম ও বিশ্বাস কবিগুরুর অন্তর্দৃষ্টিতে যে রূপ লাভ করেছে শনিবারের চিঠির সম্পাদক খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত (দাস) তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভংগী দিয়ে 'দৃষ্টিদান'কে চলচ্চিত্রোপযোগী প্রস্তুত করে দিয়েছেন। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসিতবরণ ও সুনন্দা। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে কে দেখা যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ।

মানসটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স

রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার পূর্বেই কবিগুরুর নৌকাডুবি এদের পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর, ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে হয়ত মুক্তিলাভ করবে। নৌকাডুবিকে পর্দায় রূপ দেবার জন্য বম্বে টকীজ কলকাতা থেকে নীতিন বাবুকে এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে যথাক্রমে পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার জন্য নিয়ে যান। এঁরা এঁদের দায়িত্ব সম্পাদনে যে বিন্দুমাত্র গাফিলতির পরিচয় দেন নি—বম্বের ইম্পিরিয়াল-এ নৌকাডুবি মুক্তি লাভ করে দর্শক সাধারণের যে সম্বর্দ্ধনা পেয়েছে তা থেকেই বলা যেতে পারে। এবং পরিচালক বসু যখন কলকাতায় এসে এস, বি, প্রডাকসন্সের দৃষ্টিদান ছবিখানি তুলতে অগ্রসর হলেন—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসেরই শরণাপন্ন হন। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মর্যাদা শ্রীযুক্ত দাস সম্পূর্ণভাবেই রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নৌকাডুবি বাংগালী দর্শক সাধারণেরও যে অভিনন্দন লাভে সমর্থ হবে এবিশ্বাস কর্তৃপক্ষের আছে।

নৌকাডুবির সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত অনিল বিশ্বাস। এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন রঞ্জনা, দিলীপকুমার, মিশ্র, পাহাড়ী সান্যাল, মণি চ্যাটার্জি, এস, নাজির, সুনলিনী দেবী প্রভৃতি।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক

গত সংখ্যায় ৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত নাটক' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বড়াল কয়েকখানি নাটক সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাকে আমাদের নিজস্ব অভিমত বলে যেন পাঠক-গোষ্ঠী মনে না করেন। নাটকগুলির ত্রুটিবিচ্যুতি আজ যাই চোখে পড়ুক না কেন—আমাদের জাতীয় আন্দোলনে একসময় এগুলি যে প্রেরণা জুগিয়েছিল—সেকথা আমরা ভুলতে পারিনা। রূপ-মঞ্চ যে, কোন বিশেষ দলের পত্রিকা নয়—প্রত্যেককেই নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করবার সুযোগ আমরা দিয়ে থাকি এই জন্যই রচনাটী প্রকাশ করা হ'য়েছিল।

ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স লিঃ

এদের প্রথম চিত্র 'মানুষের ভগবান' দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রচার সচিব বিমলেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন যে, পূজোর মধ্যেই এই চিত্র মুক্তি লাভ করবে। সম্প্রতি একটী বিরাট সেটে দৃশ্য গ্রহণ চলেছে। শিল্পী দেবব্রত মুখার্জী ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়োর .নং ফ্লোর ভরে দৃশ্যটীর পরিকল্পনা করেছেন। দৃশ্যটী হলো নায়িকার ড্রয়িংরুম। 'মানুষের ভগবান' পরিচালনা করছেন উদয়ন, ব্যবস্থাপনা করছেন সমর রায়। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন প্রমীলা ত্রিবেদী, বিপিন মুখার্জি, স্বপনকুমার, দেবকুমার, লুসি, শুভ্রা ও আরও অনেকে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্টস

এই প্রতিষ্ঠানটী ইতিমধ্যেই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এক বৎসরের মধ্যেই এরা প্রথম শ্রেণীর সিনেমা হাউস তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাণীরূপা টকী নামে গৌরীবাড়ী অঞ্চলে এদের চিত্রগৃহ মুক্তিলাভ করেছে এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বহুদিনের দাবী মিটিয়েছে। সম্প্রতি এরা চিত্র গ্রহণ সুরু করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর দিনদিন উন্নতি কামনা করি।
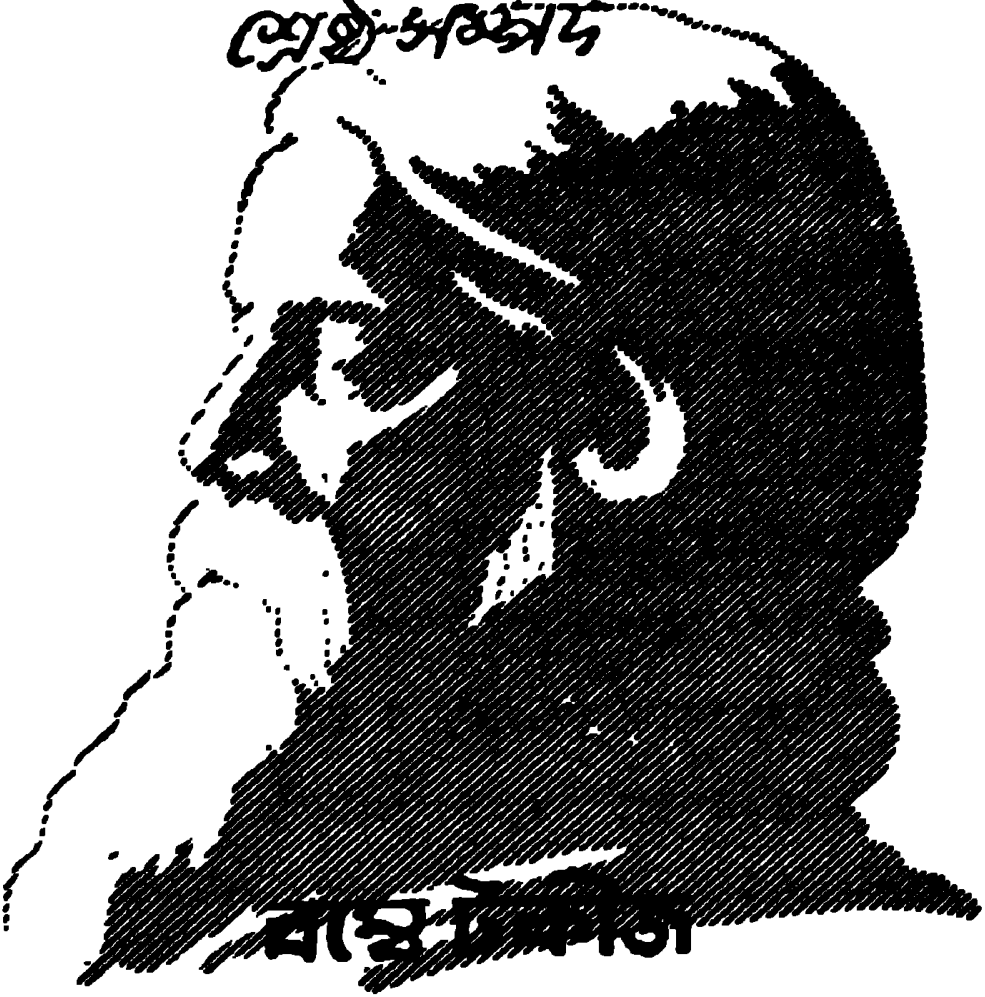
রামপ্রসাদ—

বাংলার শক্তিসাধক রামপ্রসাদ একদিন তাঁর সংগীতের ভিতর দিয়ে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির বাণীতে আপামর বাঙ্গালী জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেছিলেন—সেই রামপ্রসাদের জীবনালেখ্য পর্দায় রূপ-লাভ করে বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের অন্তর জয় করতে সমর্থ হ'য়েছে। আজ হিংসা ও বিদ্বেষের মাঝে রামপ্রসাদের বাণী একদিকে যেমন দর্শক সাধারণের প্রশংসা পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সুধীজন ও সংবাদপত্রের স্বীকৃতি পেয়েছে।

—ভূমিকায়—

সুজিত, মনোরঞ্জন, সন্তোষ, তুলসী, ইন্দু, বেচু, সাবিত্রী, নিভাননী, শিশুবালা প্রভৃতি

কাহিনী ও সংলাপ –

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও দেবনারায়ণ গুপ্ত

সুরসৃষ্টি ঃ সত্যরঞ্জন দেবচৌধুরী

কলিকাতায় বর্তমানে—

শ্রী'তে চলছে—

মফঃস্বল প্রদর্শকেরা সরাসরি প্রদর্শনের জন্য লিখুন

ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স

বর্মার পথে

ইউনিভার্সাল ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত 'বর্মার পথে' চিত্রখানি আমরা দেখে এসেছি। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত হিরন্ময় সেন। সংগীত পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও জি, কে, মেহতা। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, সমর, জ্যোৎস্না, পারুল, অহীন্দ্র, প্রদীপ, দাশু, রেবা, প্রফুল্ল প্রভৃতি। কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্মা জাপানীদের কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় পদব্রজে বর্মা পথ অতিক্রম করে যাঁরা ভারতে আসছিলেন—তাদেরই একজনের ফেলে আসা ছেলে রূপককে নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান রূপক কথাচিত্রটী। চিত্রটির ঘটনা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে পরবর্তী ভবিষ্যতের কুড়ি বছরকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত। ভবিষ্যতের পরিমাপে কাহিনীটী দাঁড় করালেও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে গড়ে তোলা হ'য়েছে—তাই কাহিনীর মূল কাঠামোতেই রয়েছে গলদ। সাপের দংশনকে শোষণের রূপক রূপে কাহিনীকার দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এই সাপের বিষের গবেষণার জন্য ছেলেটী সহরে আসে এবং তার জন্মদাতার সংগে পরিচিত হয়। বিভিন্ন ঘটনা সমাবেশে কাহিনীকে টেনে নেওয়া হ'য়েছে—এই সমাবেশে বাস্তবের গন্ধ মোটেই পাওয়া যায় না। তবু এই অবাস্তব ঘটনা ও সমাবেশের ভিতর দিয়ে কাহিনীকার শ্বেতজাতি ও শোষণের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে চেয়েছেন তার প্রশংসা করবো। কাহিনীর যোগসূত্র অনেকস্থানেই ছিন্ন হ'য়েছে। দৃশ্য রচনার প্রশংসা করবো। পরিচালক নিজে একজন শিল্পী—রূপ-মঞ্চের প্রথম প্রচ্ছদপদটী শ্রীযুক্ত সেনই এঁকেছিলেন। দৃশ্য রচনায় হিরন্ময় বাবু শিল্প-মনের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ে ছায়া, অহীন্দ্র, নবাগত সমর ও সংগীত পরিচালক প্রফুল্ল বাবুরও প্রশংসা করবো। নায়ক সমরের মিঠেল চেহারা ও বলবার ভংগী প্রশংসনীয়—তবে এই প্রথম চিত্রে একটু জড়তার পরিচয় পেলেও আশা করি পরবর্তী অভিনেতা জীবনে তা শুধরে নিতে পারবেন। নবাগতা পারুল করের উন্নতির আশা রাখি। সংগীত, শব্দ ও চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়।

সিনেমা-গৃহে হাঙ্গামা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর দুপুরের প্রদর্শনী থেকে রূপবাণী, উত্তরা, চিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহের সামনে বেশ হাঙ্গামা হয়। ইতিপূর্বে ছোটখাট হাঙ্গামার খবর আমরা পেয়েছি কিন্তু ওদিনকার হাঙ্গামা ইতিপূর্বেকার হাঙ্গামার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যাপক ধরণের। চিত্রগৃহ থেকে গুণ্ডাদের কাছে টিকিট বিক্রয়ের বিরুদ্ধে দর্শকসাধারণের অসন্তোষ দিন দিনই স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠছিল। আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রায় প্রত্যেকটী প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষের সংগে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাঁদের অবহিত হ'তে অনুরোধ জানাই, যাতে তাঁরা গুণ্ডাদের কাছে কোনমতেই টিকেট না বেচেন।

প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ বলেন, তারা গুণ্ডাদের কাছে জেনে শুনে টিকেট মোটেই বিক্রয় করেন না। তাহলে গুণ্ডারা টিকেট পায় কোথা থেকে? এর উত্তরে তাঁরা বলেন, যেমন মনে করুন চতুর্থ শ্রেণীর টিকেটের বেলায় কোন দর্শক একখানা টিকেট কিনতে গেলেন—তার পেছনেই ছদ্মবেশে একজন গুণ্ডা রয়েছে। ঐ দর্শকভদ্রলোকটিকে একখানার স্থানে তিনখানা টিকেট কিনতে অনুরোধ করলো—এই ভাবে অপরাপর দর্শকদের সাহায্যে গুণ্ডারা চতুর্থ শ্রেণীর টিকেট সংগ্রহ করে। উচ্চ শ্রেণীর টিকেট এমনিভাবে অন্যলোক পাঠিয়ে তারা কিনে নেয়। এতে প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারীরা কী করে বুঝবেন টিকেটগুলি গুণ্ডাদের কবলেই যাচ্ছে না সত্যিকারের দর্শকেরা কিনছেন। দর্শকেরা আবার বলেন তা নয়—টিকিট বিক্রয়কারী প্রত্যেকটী কর্মচারীর সম্মিলিত যোগাযোগের জন্যই গুণ্ডারা টিকিট পেয়ে থাকে। বুকিং অফিস থেকে এরাই অন্যত্র
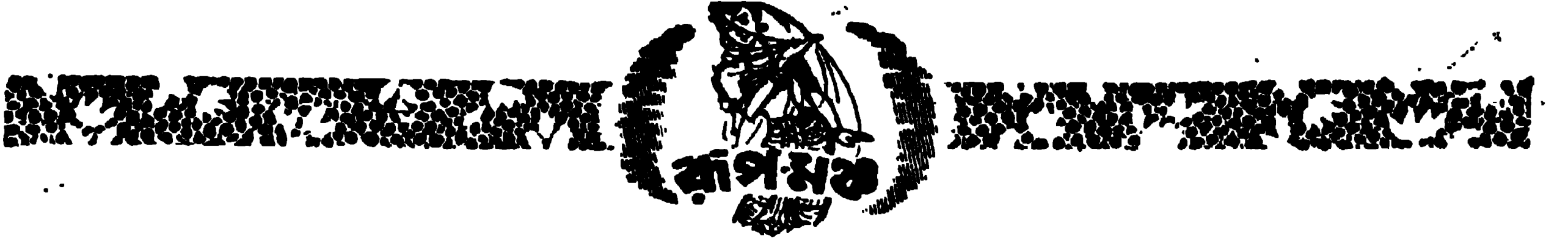
নিয়ে গুণ্ডাদের কাছে টিকিট বিক্রয় করে থাকে—এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়—তা আমরা কোনমতেই ক্ষমা করতে পারবো না। তাই এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করি, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারী বন্ধুদের কাছেও আবেদন জানাচ্ছি—তাঁরা যেন এই অসৎ পন্থা থেকে নিবৃত্ত হ'ন। কর্তৃপক্ষের যত দোষই থাক না কেন—তাঁরা যদি নিজেদের নির্দোষীতা প্রমাণ করাতে চান, যুক্তি তর্কের কাছে তা তাঁরা পারবেন। তাই এ বিষয়ে দায়িত্ব দর্শকসমাজের। কোন মতেই তাঁরা যেন গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকেট না কেনেন এবং যদি কোন দর্শককে গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকেট কিনতে দেখেন তাতেও বাধা দেন। পরিজনবর্গকে নিয়ে টিকেট না পেয়ে যদি ফিরে আসতে হয় সেও ভাল। প্রতিজন দর্শক যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, কোনমতেই তাঁরা গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকেট কিনবেন না—তাহ'লে প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ এবং গুণ্ডারা সবাই উচিত শিক্ষা পাবে।

আশা করি ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদর্শক সমাজ এরূপ চাঞ্চল্যের পরিচয় না দিয়ে গুণ্ডাদের কাছ থেকে টিকেট ক্রয় করবেন না এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে গুণ্ডাদের বেআইনী টিকেট বিক্রয় বন্ধ করবেন। —শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

সঙ্কটকালীন সংকল্প

বাংলা দেশ সম্প্রদায় ও দলগত বিভেদে বরাবরই জর্জরিত ১৫ই আগষ্টে স্বাধীনতা-উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে কলকাতায় এবং সংগে সংগে বাংলা দেশের সর্বত্র এদিক থেকে শুভ-বুদ্ধির আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু স্বার্থান্ধ লোকদের বেশিদিন তা সইল না। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে মহাত্মা গান্ধীকে অপমান ও উপেক্ষার মধ্যে সমাজবিরোধীদের অভিযান আবার আরম্ভ হয়েছে। আমরা আনন্দ ও আশ্বাসের সংগে লক্ষ্য করছি, জনসাধারণের সমর্থন এতে নেই, তবুও চুক্তিকারীদের ঘৃণ্য ও মিথ্যা প্রচারকার্যের ফলে অনেককে বিচলিত হতে দেখছি। এই বিভেদবুদ্ধির পাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কারও অপেক্ষা কম নয়। আমরা লজ্জা ও ও দুঃখের সংগে দেখতে পাচ্ছি, কোন কোন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র এখনও কুটিল চিকিৎসকের ভূমিকায় ঔষধের নামে ভেদবুদ্ধির বিষ প্রয়োগ করছেন। আমরা সমবেত-ভাবে এই সর্বনাশা আত্মঘাতী নীতির প্রতিবাদ করছি এবং চাইছি কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ এদের দমন করার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আমরা এই সব পত্র-পত্রিকার সংগে সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছি। যে সব মূঢ় বর্বর মহাত্মাজীর মত বিরাট মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের অবমাননা করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, বাংলার সুস্থ সবল যুবশক্তির কাছে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের কঠোর শাসন দাবি করছি। আজ নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় কারও ব'সে থাকবার অধিকার নেই—মৌখিক সহানুভূতি বা উষ্মা প্রদর্শন করাই আমাদের কর্তব্যের শেষ নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতিগঠনের কাজে সর্বপ্রথম কর্তব্য—এই সমাজবিরোধী শক্তিকে কঠোর হস্তে বিনষ্ট করা। এ না করতে পারলে আমাদের দুশো বছরের স্বাধীনতার সাধনাই বিফল হবে। মাত্র পনের দিনের জন্য বাংলা দেশ তার পূর্বগৌরব ফিরে পেয়েছিল, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই গৌরব থেকে যারা ষড়যন্ত্র ক'রে বাংলা দেশকে হীনতা ও কলঙ্কের মধ্যে নামাতে চাইছে, তারা মনুষ্যত্বের শত্রু, সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু,—বাংলা দেশের তো বটেই। সমবেতভাবে এদের সকল চক্রান্ত নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। আমরা বাংলা দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় এই ষড়যন্ত্র দমনের কাজে আমাদের সাধ্যানুযায়ী একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করলে আমরা সুখী হব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ ঘোষ।

'রূপ-মঞ্চ' ও 'খেয়া'

নিখিল-বঙ্গ-সাময়িক-পত্র-সংঘের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে আমি নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি 'রূপ-মঞ্চ' ও 'খেয়া' পত্রিকাদ্বয় নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্যক্তিগত কলহের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন। বাংলা দেশে এমনিতেই বিভেদ-দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে এই কলহ ব্যাপক ভাবে চলিতে থাকিলে পাঠকদের অর্থাৎ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়া বসিব। আমাদের দায়িত্ব নিজেদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। এক্ষেত্রে আমরা পত্রিকার পৃষ্ঠায় ব্যক্তিগত কলহ চলিতে থাকুক ইহা কল্পনাই করিতে পারি না। সুতরাং আমি 'রূপ-মঞ্চের সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ও 'খেয়া'র পক্ষে শ্রীঅখিল নিয়োগীর নিকট আবেদন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তাঁহারা উভয়েই ধীরতার সহিত আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রসংগ লইয়া কোনও ব্যক্তিগত কলহের অবতারণা নিজ নিজ পত্রিকায় না করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মাঝ পথে কলহ থামিয়া গেলে যে সকল কৌতূহলী ও নারদ মনোবৃত্তি সম্পন্ন পাঠকের কষ্ট হইবে তাঁহাদের নিকট আমি কালীশ বাবু ও অখিল বাবুর পক্ষ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি।

৫।১।৪৭ **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

ভ্রম সংশোধন

গত ৭ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যায় শ্রীপার্থিবের দপ্তরে অসাবধানতা বশতঃ আমরা একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি সেজন্য পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মিহির কুমার 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এবং রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটী তিনি আবৃত্তি করে খ্যাতি লাভ করেন, বাসবদত্তার আখ্যান ভাগ নিয়ে গড়ে উঠলেও কবিতাটীর নাম 'অভিসার'।

উক্ত সংখ্যায় সম্পাদকীয় দপ্তরে ভুলক্রমে অভিনেতৃদের স্থলে অভিনেত্রীদের মুদ্রিত হ'য়েছে। আমাদের জনৈক পাঠক এই ভুল ধরিয়ে দেওয়াতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি রূপ-মঞ্চের পাঠকগোষ্ঠী আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি এমনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।—